বাংলা
নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

(১৭৯৫-১৯০০)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক,
ভারতের জাতীয় সঙ্গীত-নাটক আকাদেমির রত্নসদস্য
শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত
তৃতীয় সংস্করণ

এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিমিটেড্
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

তৃতীয় সংস্করণ, ইং ১৯৬১

প্রথম ভাগ শ্রীপরেশচন্দ্র ভাওয়াল কর্তৃক মুদ্রণ ভারতী প্রাইভেট লিঃ, ২ রামনাথ বিশ্বাস লেন, কলিকাতা—৯ এবং দ্বিতীয় ভাগ শ্রীভোলানাথ হাজরা কর্তৃক রূপবাণী প্রেস, ৩১ বাদুড় বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯ হইতে মুদ্রিত।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

প্রথম ভাগ

আদিযুগ (১৭৯৫-১৮৭২)

প্রথম হইতে সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠাকাল পর্যন্ত

ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে

এম্. এ., ডি. লিট্., (লণ্ডন)

মহোদয় শ্রদ্ধাস্পদেষু

"Drama is undoubtedly the greatest form of literature, all thoughts are thought dramatically, all life is lived dramatically.........The earliest stage is man's mind, plays were enacted long before the first theatre was opened."

—Gerhart Hauptmann

न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला ।
न स योगो न तत्कर्म नाट्योऽस्मिन यन्न दृश्यते ॥

তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন

'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' প্রথম খণ্ড তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইহাতে কয়েকটি নূতন অধ্যায় যোগ করা হইল বলিয়া ইহার আকার অনেক বাড়িয়া গেল; সেইজন্য ইহাকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করা হইল। প্রথম হইতে সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত প্রথম ভাগ এবং সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার সময় হইতে প্রধানত ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দ্বিতীয় ভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হইল। অর্থাৎ সাধারণ ভাবে বাংলা নাট্যসাহিত্যের যে-যুগকে আদিযুগ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহাকে প্রথম ভাগের অন্তর্ভুক্ত এবং যাহাকে মধ্যযুগ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহাকে দ্বিতীয় ভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হইল। দ্রুত মুদ্রণ-কার্য নিষ্পন্ন করিবার জন্য দুইটি ভাগ দুইটি বিভিন্ন মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে; সেইজন্য দুই ভাগের মধ্যে মুদ্রণ বিষয়ে সমতা লক্ষ্য করা যাইবে না। দুই ভাগের পৃষ্ঠা সংখ্যা স্বতন্ত্র ভাবে নির্দেশ করা হইল।

ইহার প্রথম ভাগে দুইটি সম্পূর্ণ নূতন অধ্যায় সংযুক্ত করা হইয়াছে—একটির বিষয় গেরাসিম লেবেডেফ এবং আর একটির বিষয় উমেশচন্দ্র মিত্র। গেরাসিম লেবেডেফের একটি ইংরেজি নাটকের বাংলা অনুবাদের কথা শুনা গিয়াছিল। সম্প্রতি গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে, সেইজন্য তাহার বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় যোগ করিতে হইয়াছে; কারণ, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে ইহার একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। তারপর উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা-বিবাহ' নাটকটিরও ইতিপূর্বে সন্ধান করিতে পারি নাই, সম্প্রতি তাহার সন্ধান পাইয়া তাহার সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ পাইয়াছি। এইজন্য প্রথম ভাগে ইহাদের বিষয়ে দুইটি অধ্যায় আতিরিক্ত যোগ করিতে হইয়াছে।

দ্বিতীয় ভাগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক সম্পর্কে কিছু নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার সম্পর্কিত অধ্যায়টিতে ইহাদের ব্যবহার করিবার সুযোগ গ্রহণ করা হইয়াছে; সেইজন্য এই অধ্যায়টি দীর্ঘতর হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ বিষয়ক অধ্যায়েও তাঁহার প্রচলিত নাটকগুলির বিস্তৃততর আলোচনা করা হইয়াছে এবং এই অধ্যায়টির কলেবর বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

তারপর ইহাতে অতুলকৃষ্ণ মিত্র সম্পর্কেও একটি নূতন অধ্যায় যোজনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগের পরিশিষ্টে 'নীল-দর্পণ' নাটকের মানহানির মামলার আদালতের রায়টি নূতন সংযোজিত হইয়াছে। এই সকল বিভিন্ন বিষয় যোগ করিবার ফলে 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' প্রথম খণ্ডের আকার তিন শত পৃষ্ঠার অধিক বাড়িয়া গেল। সেইজন্য সামান্য মূল্য বৃদ্ধিও অপরিহার্য হইল।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, সম্প্রতি ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নাটকের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আমার তত্ত্বাবধানে আমার কয়েকজন ছাত্র গবেষণা করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'ডক্টর' উপাধি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীমান্ সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'গিরিশচন্দ্র ও ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সমাজ', শ্রীমান্ জয়ন্তকুমার গোস্বামী 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসনে সমাজ-চিত্র' এবং শ্রীমান্ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 'বাংলা নাটকের উপর পাশ্চাত্ত্য ও সংস্কৃত নাটকের প্রভাব' বিষয়ে বহু শ্রমসাধ্য মৌলিক গবেষণা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ইঁহাদের একজনেরও গবেষণার বিষয় আজও প্রকাশিত হইয়া সাধারণ নাট্যানুরাগী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার সুযোগ পায় নাই। গবেষণা গ্রন্থ সম্পর্কে প্রকাশকদিগের যে ভীতির ভাব আছে, তাহাই এখন পর্যন্ত ইহাদের প্রকাশের অন্তরায় হইতেছে। অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে ইহাদের প্রকাশের ব্যবস্থা না করিলে গবেষকদিগের দীর্ঘ পরিশ্রমের ফল হইতে সাধারণ পাঠক সমাজ বঞ্চিত হইবে।

এই গ্রন্থ প্রকাশের কার্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভূতপূর্ব কর্মচারী শ্রীসনৎকুমার গুপ্তের নিকট আমি কৃতজ্ঞ, তিনি আমাকে উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা-বিবাহ' গ্রন্থটি সংগ্রহ করিয়া ব্যবহার করিবার সুযোগ দিয়াছেন। আমার স্নেহভাজন ছাত্র অধ্যাপক শ্রীমান্ সনৎকুমার মিত্র শব্দসূচী রচনার দুরূহ কাজটি যোগ্যতার সঙ্গে সম্পন্ন করিয়া দিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলা বিভাগ
ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, ১৩৭৪ সাল

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। অনেক দিন আগেই ইহার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল, তথাপি ইহার সম্পর্কে পাঠক-সমাজের কৌতূহলের যে বিরাম ছিল না, তাহা অনুভব করিয়াই ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের কার্য আমি সাধ্যমত ত্বরান্বিত করিয়াছি। আজকালকার দিনে বড় বই প্রকাশ করা যে নানা কারণেই কত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। তথাপি যাঁহারা বইখানির অভাবে কিছু কাল অসুবিধা ভোগ করিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করিতেছি।

প্রথম সংস্করণে ১৮৫২ সন হইতে ১৯৫২ সন পর্যন্ত বাংলা নাটকের ইতিহাস বর্ণনা করা হইয়াছিল, তদতিরিক্ত আর কোন বিষয়ই তাহাতে ছিল না। এইবার ইহাতে অনুবাদ-নাটক নামক একটি এবং নাট্যশালা নামক আরও একটি অধ্যায় নূতন যুক্ত করা হইল। তাহার ফলে বিষয়টির আলোচনা যে সকল দিক দিয়াই এখন পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। প্রথম সংস্করণে বাংলার নব নাট্য আন্দোলনের কোন পরিচয় ইহাতে ছিল না। তাহার কারণ, যখন সেই বই লেখা হইয়াছিল, তখন পর্যন্তও তাহা একটি বিশেষ রূপ লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু এখন দেখিয়া মনে হইতেছে, ইহা যে কেবল এক বিশেষ শক্তি লাভ করিয়াছে, তাহাই নহে—ইহা বাংলা সাহিত্যের পূর্ববর্তী ধারাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়া নিজের শক্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। সুতরাং ইহারও বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। এই উদ্দেশ্যেও একটি সম্পূর্ণ নূতন অধ্যায় এই গ্রন্থে যোজনা করিতে হইয়াছে। নানা দিক দিয়া বিষয়-বিস্তার লাভ করিবার ফলে গ্রন্থখানিকে আর মাত্র এক খণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা গেল না—সকল বিষয়ক সুবিধার জন্যই ইহাকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ফেলিতে হইল; প্রথম হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রথম খণ্ডে এবং বিংশ শতাব্দীর আধুনিকতম কাল পর্যন্ত দ্বিতীয় খণ্ডে বিভক্ত হইল। সাধারণভাবে গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার সমসাময়িক নাট্যকারদিগকে লইয়া প্রথম খণ্ড রচিত হইয়াছে এবং রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৬০ সনে সর্বশেষ প্রকাশিত নাটক লইয়া দ্বিতীয় খণ্ড রচিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে বাংলা

নাটকের প্রতি সাধারণ পাঠক ও দর্শকের যে অনুরাগ সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা বিচার করিয়া দেখিলে এই বিষয়ক সুবিস্তৃত বর্ণনা কেহ অনাবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিবেন না। বিশেষত এই বৎসর হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা সাহিত্যে এম. এ. পরীক্ষার পাঠ্য তালিকায় বাংলা নাটক একটি বিশেষ বিষয় বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং পরীক্ষার্থীদিগের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করিলেও এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনার যে আবশ্যকতা আছে, তাহা নিশ্চিত। বাংলা সাহিত্যের আদি যুগের অনেক নাটকই লোকচক্ষুর অন্তরালবর্তী হইয়া পড়িয়াছে, বিস্তৃত আলোচনা ব্যতীত ইহাদের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় কেহই লাভ করিতে পারেন না। সুতরাং এই সকল দিক বিচার করিয়াই বাংলা সাহিত্যের এই একটি উপেক্ষিত বিষয়কে আমি সাধারণ পাঠকের সম্মুখে একটু বিস্তৃত ভাবেই উপস্থিত করিয়া ইহার গুরুত্ব বিষয়ে সচেতন করিয়া দিতে চাহিয়াছি। উদ্দেশ্য যে আমার ব্যর্থ হয় নাই, ইহার প্রথম সংস্করণ অল্পদিনের মধ্যে নিঃশেষিত হইয়া যাওয়াতেই তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। আশা করি এই দ্বিতীয় সংস্করণখানিও পাঠকদিগের অনুরূপ সহানুভূতি লাভ করিবে।

সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ভিতর দিয়া বিস্তৃত আলোচনা সত্ত্বেও আদিযুগের উল্লেখযোগ্য কতকগুলি নাটক যে বর্তমান যুগেও যথাযথভাবে সম্পাদনা করিয়া পুনঃপ্রকাশ করিবার প্রয়োজন আছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন কিন্তু বাংলা সাহিত্যানুরাগীদিগের মধ্যে এখনও যথেষ্ট পরিমাণে সেই প্রয়াস দেখা যায় না। আদিযুগের প্রথম সামাজিক নাটক রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' কিংবা দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল-দর্পণে'র মধ্যে যে বাস্তব জীবন-দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা বাংলার আধুনিকতম নাট্য-আন্দোলনের যুগে রচিত নাটকেরই যে সমগোত্রীয়, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু কেবলমাত্র সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকের বর্ণনাতেই এই বিষয় স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে না—মূল গ্রন্থগুলি অনুসরণ করিবার প্রয়োজন হয়। সুতরাং এই শ্রেণীর নাটকগুলি যথোপযুক্ত সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। আমি উপরোক্ত দুইখানি নাটকই সম্প্রতি সম্পাদনা করিয়া স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করিয়াছি। অনুরূপ আরও কয়েকখানি এই শ্রেণীর নাটকও এইভাবে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। অনুরাগী পাঠকগণ যাহাতে কেবলমাত্র সাহিত্যের ইতিহাস হইতে নহে, বরং তাহার পরিবর্তে মূল গ্রন্থ হইতেও ইহাদের সম্পর্কিত সকল কৌতূহল প্রত্যক্ষ ভাবে নিবৃত্ত করিতে পারেন, সেদিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, বাংলা নাটকের নানা বিষয় সম্পর্কিত বিস্তৃত আলোচনা সাম্প্রতিক কালে কয়েকটি

প্রকাশিত হইয়াছে। বন্ধুবর ডক্টর শ্রীযুক্ত অজিতকুমার ঘোষ তাঁহার 'বাংলা নাটকের ইতিহাস' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন, ডক্টর শ্রীযুক্ত সাধনকুমার ভট্টাচার্য বাংলা নাটকের রস, শিল্প ও তত্ত্ব সম্পর্কিত সূক্ষ্ম আলোচনা মূলক একাধিক মূল্যবান্ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, ডক্টর শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ রায় 'দ্বিজেন্দ্রলাল—কবি ও নাট্যকার' নামক গবেষণামূলক গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্পর্কেও স্বতন্ত্রভাবে বহু গ্রন্থ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং বাংলা সাহিত্যে—নাটকের আলোচনাও যে আজ মুখ্যস্থান লাভ করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমার বর্তমান গ্রন্থখানিও নানাভাবে এই সকল গ্রন্থের নিকট ঋণী, এ'কথা আমি এই সুযোগে স্বীকার করি।

এই গ্রন্থরচনায় আমি নাট্যসাহিত্যবিষয়ে অনুরাগী আমার ছাত্রদিগের নিকটও ব্যাপকভাবে সাহায্যলাভ করিয়াছি। তাঁহারা সকলেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিষয়ে আমার এই দুরূহ কার্যে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীমান্ জয়ন্তকুমার গোস্বামী এম.এ. ষষ্ঠ অধ্যায়ের 'বিবিধ নাট্যকার', শ্রীমান্ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এম. এ. 'অনুবাদ নাটক' এবং অধ্যাপক শ্রীমান্ নৃপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য এম. এ 'নাট্যশালা' প্রসঙ্গটি লিখিবার কার্যে সর্ববিধ সাহায্য করিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীমান্ গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ'র নিকট অমৃতলাল বসুর একটি নাটক বিষয়ে আলোচনায় সাহায্য লাভ করিয়াছি। শ্রীমতী অনিলা শাহ এম. এ শব্দসূচী সঙ্কলনের কার্যে সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই আমার পরম স্নেহাস্পদ ছাত্র কিংবা ছাত্রী। ইঁহাদের প্রত্যেককেই তাঁহাদের এই সহায়তার জন্য আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলা বিভাগ
কার্তিক-সংক্রান্তি, ১৩৬৭ সাল

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

১৯৩৯ সনে আমার 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইহার সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া তাহার পরের বৎসরই বাংলা সাহিত্যের অন্য আর একটি বিভাগ অবলম্বন করিয়া অনুরূপ আর একখানি ইতিহাস রচনা করিতে মনস্থ করি এবং এই সম্পর্কে বিশেষ কিছু বিচার না করিয়াই নাট্য-সাহিত্য বিভাগটি মনোনীত করিয়া লই।

বিষয়টি বিস্তৃত এবং দুরূহ হওয়া সত্ত্বেও এই দায়িত্ব গ্রহণ করিবার পক্ষে আমার কতকগুলি প্রাথমিক সুবিধাও ছিল। আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয় বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস রচনার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তিনি আদিযুগের কয়েকজন নাট্যকার সম্পর্কে বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি আলোচনা প্রকাশ করিয়া তাহার সূত্র পরিত্যাগ করেন। তাহা সত্ত্বেও তিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস অধ্যাপনা কালে তাঁহার ছাত্রদিগের সম্মুখে ইহার যে একটি সুনির্দিষ্ট খসড়া প্রস্তুত করিয়া দিতেন, তাহা অনুসরণ করিয়া যে কেহ অতি সহজেই ইহার একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লাভ করিতে পারিত। অতএব এই বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট খসড়ার নির্দেশ তাঁহার মত অভিজ্ঞ অধ্যাপকের নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলাম বলিয়া এই কার্যের পরিকল্পনা-বিষয়ে আমায় কোন বেগ পাইতে হয় নাই। তারপর আমি সুপ্রসিদ্ধ রবীন্দ্র-সাহিত্যরসিক ঔপন্যাসিক স্বর্গত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি-সমালোচক স্বর্গত মোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ের নিকট বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন নাটক বিশদভাবে অধ্যয়ন করিবার সৌভাগ্য লাভ করি। তাহার ফলে বাংলা নাট্যসাহিত্যের বিভিন্ন যুগের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যে পরিচয় স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাও আমার এই দুঃসাহসিক কার্যের অন্যতম নির্ভর হইতে পারিবে বলিয়া ভাবিয়াছিলাম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ হইতে উক্ত অধ্যাপকদিগের কেহ কেহ অবসর গ্রহণ করিবার পর হইতেই বাংলা নাট্যসাহিত্যের অধিকাংশ বিষয়েরই অধ্যাপনার দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়। উক্ত স্বনামখ্যাত অধ্যাপকগণ এই বিষয়ক অধ্যাপনার যে উচ্চ মান প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা যথাসম্ভব রক্ষা করিবার আগ্রহাতিশয্যে এই সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় বহু উপকরণ আমাকে একত্র সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। তাহাও আমার এই গ্রন্থ রচনা

সহায়ক হইবে বলিয়া ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু এই কার্যে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই ইহার বিস্তৃতি এবং গভীরতা দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িলাম। কিন্তু একবার যে কার্য আরম্ভ করিয়াছিলাম, তাহা মধ্যপথে পরিত্যাগ করাও সমীচীন বোধ করিলাম না, সাধ্যমত এই দুরূহ পথ অতিক্রম করিয়া চলিলাম। দীর্ঘকাল পরিশ্রমের পর এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানির রচনা-কার্য শেষ হইয়াছে।

আমি এই গ্রন্থে কেবল মাত্র মৌলিক নাটক লইয়াই আলোচনা করিয়াছি—অনুবাদ নাটক, নাটকান্তরিত উপন্যাস ও জীবন-চরিত ইহার আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করি নাই। বাংলা নাট্যসাহিত্যের পরিপূর্ণ একশত বৎসরের পরিচয় দিতে গিয়া অতি-আধুনিক নাট্যকারদিগের সম্পর্কেও একটি সংক্ষিপ্ত অধ্যায় ইহাতে যোগ করিয়াছি; কিন্তু জীবিত অতি-আধুনিক নাট্যকারদিগের সম্পর্কে আলোচনার একটি প্রধান অসুবিধা এই যে, তাঁহাদের নাট্যপ্রতিভার ক্রম-বিকাশের ধারা শেষ পর্যন্ত নির্দেশ করা যায় না, সেইজন্য তাঁহাদের সম্পর্কে চূড়ান্ত অভিমত প্রকাশ করা সম্ভব নহে। তথাপি তাঁহাদের প্রত্যেকের যে-সকল নাটক এযাবৎ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহাদের সম্পর্কে মতামত গঠন করিয়াছি। বলা বাহুল্য, যাঁহাদের নাট্যকার-জীবন এখনও সক্রিয় আছে, তাঁহাদের সম্পর্কে এই মতামত ভবিষ্যতে পরিবর্তিত হইতে পারে।

এখানে আরও একটি কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া রাখা প্রয়োজন মনে করি—আমি এই গ্রন্থে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস রচনা করিয়াছি, নাট্যশালার ইতিহাস কিংবা নাট্যকারদিগের জীবন-চরিত রচনা করি নাই। ইহার কারণ, স্বর্গত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' রচিত হইবার পর, এই বিষয়ক আর নূতন কোনও আলোচনার প্রয়োজন আছে বলিয়া আমি মনে করি না; তারপর এ পর্যন্ত আমাদের দেশে সাহিত্যের, বিশেষতঃ নাটকের, আলোচনার নামে যে-সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যে পরিমাণে নাট্যকারের জীবন-চরিত কীর্তিত হইয়াছে, সেই পরিমাণে তাঁহাদের সাহিত্যের আলোচনা বিশেষ কিছুই হয় নাই বলিতে হইবে; অতএব আমি গতানুগতিক পথ পরিত্যাগ করিয়াছি।

এই গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের কার্যে আমি যাঁহাদের নিকট ঋণী, তাঁহাদের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। একথা সত্য যে, তাঁহার উৎসাহ ও সহানুভূতি লাভ করিতে না পারিলে

কেবল মাত্র এই গ্রন্থখানিই কেন, আমার সাম্প্রতিক প্রকাশিত কোন গ্রন্থই বর্তমান অবস্থায় আমার পক্ষে প্রকাশ করা সম্ভব হইত না। আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য দর্শনসাগর মহোদয়ও আমাকে নানা ভাবে উৎসাহ দান করিয়া আমার এই দুরূহ কার্য সম্পূর্ণ করিতে সহায়তা করিয়াছেন। বন্ধুবর ডক্টর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাশগুপ্ত, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদীশ ভট্টাচার্য এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পৃথ্বীশ নিয়োগী মহাশয় সর্বদা উৎসাহ এবং পরামর্শ দ্বারা এই বিষয়ে আমার আগ্রহ অটুট রাখিয়াছেন। লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী তাঁহার স্বরচিত নাটক সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য আমাকে জানাইয়া উপকৃত করিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব সম্পাদক স্বর্গত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগার এবং স্বীয় গ্রন্থসংগ্রহ হইতে বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ আমাকে ব্যবহার করিবার সকল প্রকার সুযোগ না দিলে এই গ্রন্থ-রচনা কিছুতেই সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারিত না। পরিশিষ্টে প্রকাশিত একশত বৎসরের বাংলা নাটকের তালিকাটি প্রস্তুত করিবার কার্যে শ্রীযুক্ত সনৎকুমার গুপ্ত মহাশয় আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। গ্রন্থের কোন কোন অংশ রচনার সময় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কুলচন্দ্র সেন এম. এ. মহাশয়ের নিকট হইতে সাহায্য লাভ করিয়াছি। বাংলা সাহিত্যের পরম বান্ধব সদ্গ্রন্থ-প্রকাশক শ্রীযুক্ত অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহোদয় এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

সূচী

ভূমিকা

প্রথম ভাগ

আদিযুগ

(১৭৯৫-১৮৭২)

দ্বিতীয় ভাগ

মধ্যযুগ

(১৮৭৩-১৯০০)

বিষয় | পৃষ্ঠা

পরিশিষ্ট

* সংশোধন—গ্রন্থমধ্যে ভ্রমক্রমে ৩৮৬ পৃষ্ঠায় অষ্টম অধ্যায়ের পরিবর্তে সপ্তম অধ্যায় এবং ৪২১ পৃষ্ঠায় নবম অধ্যায়ের পরিবর্তে অষ্টম অধ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে।

ভূমিকা

নাটক

॥ ১ ॥ নাটক-বিচার

প্রত্যেক জাতির লোক-নাট্য (folk-drama) হইতেই তাহার নাটকের উদ্ভব এবং বিকাশ হইয়া থাকে, কিন্তু আমাদের দেশে কেবল মাত্র যে তাহার ব্যতিক্রম হইয়াছে, তাহাই নহে—ইহার বিপরীত ঘটিয়াছে। অর্থাৎ আমাদের দেশে যাত্রা হইতে নাটকের উৎপত্তি না হইয়া বরং যাত্রাই নাটক দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। বাংলা দেশের লোক-নাট্য বা বাংলা যাত্রা হইতে বাংলা নাটকের উদ্ভব না হইয়া বিদেশী ইংরেজি সাহিত্য হইতে বাঙ্গালীর নাট্যরচনার সূত্রপাত হইয়াছে। বাংলা নাটককে আজ পর্যন্তও এই ভুলের মাশুল জোগাইতে হইতেছে। সেইজন্য আধুনিক বাংলার কাব্য ও কথাসাহিত্য বিভাগে প্রথম শ্রেণীর রচনার কোন অভাব না থাকিলেও, নাট্যসাহিত্য বিভাগে ইহার অভাব আছে বলিয়া অনেকেই মনে করিয়া থাকেন। শতাধিক বৎসরের অনুশীলনের ফলে বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য সকল বিভাগেই বাঙ্গালী মনীষার চরমোৎকর্ষের বিকাশ হওয়া সত্ত্বেও, কেবল মাত্র নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে যদি তাহার ব্যতিক্রম দেখা দিয়া থাকে, তবে তাহার জন্য আর কে বা কি দায়ী, তাহা আজ গভীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এ কথা সত্য যে, মাইকেল এবং রবীন্দ্রনাথের মত প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাও বাংলা নাটক রচনায় নিয়োজিত হইয়াছিল। এই দুই ক্ষণজন্মা মনীষীর অনন্যসাধারণ প্রতিভার দুর্লভ স্পর্শে বাংলা সাহিত্যের বহু বিভাগেই নূতন প্রাণসঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁহাদের দান কেন যে সর্বজনগ্রাহ্য বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে নাই, তাহাও বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন। এ কথা সত্য যে, উনবিংশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত বাংলাসাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে যে সকল অলোক-সাধারণ প্রতিভার আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহাদের সাধনার ফলেও বাংলা নাট্যসাহিত্যের সৃষ্টি যদি প্রথম শ্রেণীর মর্যাদায় উন্নীত না হইয়া থাকে, তবে ইহার বর্তমান বৈশিষ্ট্যহীন যুগে কিংবা আসন্ন অনিশ্চিত ভবিষ্যতেও ইহার সম্বন্ধে আশাপ্রদ কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না।

যাঁহারা বাংলা সাহিত্যে উৎকৃষ্ট নাটক রচিত হয় নাই বলিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রধানত এলিজাবেথীয় যুগের ইংরেজি নাটককেই আদর্শ নাট্যরচনা মনে করিয়া, বাংলা সাহিত্যেও অনুরূপ রচনার প্রত্যাশা করিয়া থাকেন। বাংলা সাহিত্যের সমালোচকগণও এলিজাবেথীয় যুগের ইংরেজি নাটকের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত ইংরেজি সমালোচনা-পদ্ধতি দ্বারা বাংলা নাটকের মূল্য বিচার করেন। এই সম্পর্কে এই দেশীয় নাটক বিচারের যে পদ্ধতিটি আছে, তাহা কদাচ অনুসরণ করা হয় না। কিন্তু ইহা কতদূর সঙ্গত, তাহা প্রথমেই বিবেচনা করা প্রয়োজন।

এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, ইংরেজি সাহিত্যেও এলিজাবেথীয় যুগের নাটক এবং জর্জীয় যুগের নাটকের আদর্শ এক নহে—সেক্সপীয়র এবং বার্নার্ড শ'র নাটকের মধ্যে অঙ্গ ও ভাবগত পার্থক্য আছে। অথচ বার্ণার্ড শ'ও একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকাররূপেই সম্মান লাভ করিয়াছেন। ইংরেজি নাটক এবং ফরাসী নাটক এক নহে, অথচ কোন ফরাসী সাহিত্য-সমালোচককে তাঁহার ভাষায় পূর্ণাঙ্গ নাটক রচিত হয় নাই বলিয়া আক্ষেপ করিতে শোনা যায় না। অতএব এলিজাবেথীয় নাটকের আদর্শ যত উচ্চই হউক, যাঁহারা দেশকালকে উপেক্ষা করিয়া তাহারই সর্বত্র প্রতিষ্ঠা দেখিতে চান, তাঁহারা একটা মৌলিক বিষয়ে অত্যন্ত সাধারণ ভুল করিয়া থাকেন। নাটক যদি জাতির জীবনেরই প্রতিরূপ হইয়া থাকে, তবে সেই জীবন সেই জাতিরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না। বিশেষতঃ নাটকের জীবন কোন আত্ম-কেন্দ্রিক ব্যক্তি-জীবন নহে, বৃহত্তর সামাজিক জীবন। সামাজিক জীবন কতকগুলি পারিপার্শ্বিক অবস্থার অধীন—বিশেষ দেশ ও বিশেষ কাল সেই পারিপার্শ্বিক অবস্থান গঠন করিয়া থাকে। তবে এ কথা সত্য যে, বিশেষ দেশ ও বিশেষ কালের মধ্যে একটি চিরন্তন মানুষও আছে, কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা উপেক্ষা করিয়া সেই চিরন্তন মানুষটির সন্ধান নাটকের লক্ষ্য নহে—পারিপার্শ্বিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া তাহার পরিচয়টি আপনা হইতে প্রকাশ পাইবে। নাট্যকারের লক্ষ্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর, চিরন্তন মানবাত্মার উপর নহে; নাট্যকারের দৃষ্টির সঙ্গে দার্শনিকের দৃষ্টির এইখানেই পার্থক্য। তবে পারিপার্শ্বিক অবস্থার যথার্থ বর্ণনার ভিতর দিয়া নাটকীয় চরিত্রের আচরণকে নিখুঁত করিয়া তুলিতে পারিলেই চিরন্তন মানবাত্মাটি তাহার ভিতর হইতে আপনি প্রকাশ পাইয়া থাকে। সেক্সপীয়র

পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর ভিত্তি করিয়াই তাঁহার চরিত্রগুলি গঠন করিয়াছেন। বার্ণার্ড শ'র যুগে সেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে; শুধু তাহাই নহে, ইংলণ্ডের সামাজিক জীবনের আদর্শেরও সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন হইয়াছে। সেইজন্য যদি জর্জীয় যুগেই সেক্সপীয়র আবির্ভূত হইতেন, তবে ইহারই সামাজিক পরিবেশ ও আদর্শ বা যুগধর্মকে অবলম্বন করিয়াই যে তাঁহার নাট্যসাহিত্য রচিত হইত, এ' কথা নিতান্ত সহজ সত্য। আনুপূর্বিক পাশ্চাত্ত্য আদর্শে lyric বা গীতিকাব্য কিংবা epic বা মহাকাব্যও বাংলা সাহিত্যে রচিত হয় নাই—তথাপি নিজেদের বৈশিষ্ট্যেই বাংলা গীতিকাব্য ও মহাকাব্য বাংলা সাহিত্যে নিজেদের স্থান করিয়া লইয়াছে।

বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের নিজস্ব একটি সুস্পষ্ট পরিচয় আছে। বাঙ্গালীর নিজস্ব একটি সংস্কৃতি আছে, তাহার বলিষ্ঠ একটি জাতীয় ধর্ম আছে। তাহার রসবোধ তাহার জাতীয় সংস্কৃতি ও ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার সামাজিক জীবন তাহা দ্বারাই গঠিত। পাশ্চাত্ত্য আদর্শ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিবার পক্ষে এখানেই তাহার বাধা। যে সামাজিক পরিবেশ ও জীবন-দর্শনের উপর ভিত্তি করিয়া নাটক রচিত হইয়া থাকে, তাহা দেশ- ও কাল-সাপেক্ষ বলিয়াই এক দেশ হইতে অন্য দেশে নীত হইয়া নূতন পরিবেশের মধ্যে নিজের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে পারে না। অতএব এলিজাবেথীয় যুগের ইংরেজি নাটকের সর্ব বিষয়ে অনুকরণ করিয়া ইংরেজি আদর্শে সার্থক নাটক রচনা করা বাঙ্গালী নাট্যকারদিগের পক্ষে কখনই সম্ভব নহে। তবে এ কথা সত্য যে, জীবনের বহিরঙ্গগত উপকরণ ও নীতিবোধের দিক দিয়া জাতিতে জাতিতে পার্থক্য থাকিলেও ইহার মৌলিক বিষয়ে যে ঐক্য আছে, তাহার উপর ভিত্তি করিয়া দেশ ও কালোত্তীর্ণ সাহিত্য সৃষ্টি হইয়া থাকে। যে বিষয় লইয়াই হউক না কেন, প্রত্যেক দেশ ও জাতির অন্তর্ভুক্ত মানুষের মধ্যেই দ্বন্দ্ব আছে —তাহা যেমন আদর্শগতও হইতে পারে, তেমনি ব্যক্তিগত স্বার্থমূলকও হইতে পারে। পাশ্চাত্ত্য নাট্য-সমালোচনা-পদ্ধতি যেখানে সেই সর্বমানবিক মৌলিক ভিত্তি আশ্রয় করিয়াছে, কেবল সেখানেই তাহা সর্বদেশীয় নাট্যসাহিত্য বিচারের অবলম্বন হইতে পারে।

বিশেষত বাঙ্গালী নাট্যকারদিগের সম্মুখে এই বিষয়ে পূর্ববর্তী কোনই আদর্শ বর্তমান ছিল না, তাহাও নহে। প্রাচীনকাল হইতেই আমাদের দেশে এ বিষয়ে দুইটি ধারাই প্রচলিত—একটি সংস্কৃত নাটকের ধারা, আর একটি

দেশীয় যাত্রার ধারা। উনবিংশ শতাব্দীতে নব্য ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙ্গালী যখন ইংরেজি নাট্যসাহিত্যের পরিচয় লাভ করিল, তখন নিজের দেশের বিশিষ্ট এই দুইটি নাট্যধারার প্রতিও তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। বিশেষত দেখিতে পাওয়া যায়, বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রথম যুগে ইংরেজি ও সংস্কৃত নাটক দুইই সমানভাবে বাংলায় অনূদিত হইতে থাকে এবং সেই যুগের বাংলা নাটকে আঙ্গিকের দিক দিয়া সংস্কৃত ও ইংরেজি নাটক উভয়ই সমান প্রভাব বিস্তার করে। ক্রমে সেই যুগের বাংলা নাট্যরচনার দুইটি ধারা কিছু কালের জন্য স্বতন্ত্র হইয়া যায়—তারপর বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যযুগের শেষভাগে গিয়া এই দুইটি ধারা পুনরায় একাকার হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইংরেজি প্রভাবের প্রথম যুগ হইতেই বাংলা নাট্যরচনায় দেশীয় প্রভাবটি অত্যন্ত সক্রিয় ছিল এবং ইহার প্রভাব ইংরেজি ধারার মধ্যে কোনদিনই একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই। ইহা যে দেশীয় আদর্শের প্রতি সমসাময়িক বাঙ্গালী নাট্যকারদিগের শ্রদ্ধার পরিচায়ক, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বাংলা নাট্যসাহিত্যের আদি যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক যুগ পর্যন্ত কোন নাট্যকারই এই সংস্কারের হাত হইতে যে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই, তাহা সত্য। এই সংস্কারও ইংরেজি নাটকের আদর্শকে বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ গ্রহণ করিবার পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছিল। এইজন্যই আধুনিক কাব্য এবং কথাসাহিত্যের উপর পাশ্চাত্ত্য প্রভাব যত কার্যকর হইয়াছে, নাট্য-সাহিত্যের উপর তত কার্যকর হইতে পারে নাই। দেশীয় উপাদানে বহিরঙ্গ গঠিত হইলেও আধুনিক বাংলা কাব্য ও কথাসাহিত্যের প্রাণ-বস্তু পাশ্চাত্ত্য, কিন্তু অধিকাংশ বাংলা নাটক ইহার বিপরীত—পাশ্চাত্ত্য আদর্শে তাহাদের বহিরঙ্গ গঠিত হইলেও তাহাদের প্রাণ-বস্তু সম্পূর্ণ দেশীয়। ইহার কারণ, নাটক সাধারণের আসরে পরিবেশনের বস্তু বলিয়া বাঙ্গালী নাট্যকারগণ দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই সম্পর্কে প্রচলিত সাধারণ সংস্কারের ধারাটিই অনুসরণ করিয়াছিলেন—আধুনিক কাব্য ও কথাসাহিত্য সম্পর্কে এই প্রকার কোন দেশীয় সংস্কারের অস্তিত্ব ছিল না বলিয়া ইহাদের সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্য আদর্শের স্বাধীন বিকাশই সম্ভব হইয়াছে। অথচ আমরা যখন বাংলা নাটক বিচার করিয়া থাকি, তখন পাশ্চাত্ত্য নাট্য-সমালোচনার পদ্ধতিই আনুপূর্বিক ইহার উপর আরোপ করি; সেইজন্য বাংলা নাটক কখনও যথার্থ রসোত্তীর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয় না।

নাটক মাত্রেরই উপজীব্য বাস্তব জীবন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জীবন-দর্শনে যে মৌলিক পার্থক্য আছে, তাহার ফলে স্বভাবতই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য নাটকে প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্ত্য জীবন-দর্শনের আদর্শে ব্যবহারিক জীবনকে অতিক্রম করিয়া জীবনের আর কোনও মূল্য নাই—মৃত্যুতেই জীবনের চরম সমাপ্তি; সেইজন্য তাহাতে মৃত্যু দ্বারা ট্র্যাজিডি ও মিলন দ্বারা কমেডির সৃষ্টি হয়। কিন্তু প্রাচ্যের জীবনাদর্শ স্বতন্ত্র। ইহার মতে মৃত্যুতে প্রত্যক্ষ জীবনের বিচ্ছেদ ঘটিলেও পরোক্ষ বলিয়াও একটা জীবন সে স্বীকার করে এবং সেই পরোক্ষ জীবনের উপর লক্ষ্য রাখিয়া তাহার প্রত্যক্ষ জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা সুখ-দুঃখ সর্বদা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। পরলোক এবং পরজন্ম এ দেশের লোকের কেবল মাত্র মুখের কথা নহে, ইহা তাহার আচরিত ধর্ম ও ব্যবহারিক সংস্কারের মধ্যেও সুদৃঢ় শিকড় গাড়িয়া ইহার প্রত্যক্ষ জীবন নানা ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। এই বোধ যেখানে একান্ত সত্য, সেখানে মৃত্যু কখনও জীবনের সমাপ্তি আনিয়া দেয় বলিয়া মনে হইতে পারে না। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য জীবন-দর্শনে মৃত্যুর আর কোনও সান্ত্বনা নাই—ইহা চরম বিচ্ছেদ, সেইজন্য ইহার প্রতিক্রিয়াও তীব্রতম। বিচ্ছেদের মধ্যে তীব্রতা যত বেশী, ট্র্যাজিডিও তত গভীর হয়। অতএব, ক্রমাগত পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের ফলে প্রাচ্যের জীবনধারার যতদিন পরিবর্তন না হয়, ততদিন পর্যন্ত পরিপূর্ণ পাশ্চাত্ত্য আদর্শে বাংলা ট্র্যাজিডি রচিত হওয়া সম্ভব নহে।

॥ ২ ॥ চরিত্র ও নাটক

সমাজের অন্তর্ভুক্ত নরনারীর চরিত্রই নাটকের প্রাণ-স্বরূপ। নারীজীবন সমাজ-জীবনের একটি প্রধান অংশ। শুধু প্রধান অংশই নহে, এক দিক দিয়া বিবেচনা করিতে গেলে নারীই প্রকৃতপক্ষে সমাজ-জীবনের মধ্যমণি-স্বরূপ। বাংলা নাটকে নারীর একটি অতি প্রধান অংশ গ্রহণ করিবারই কথা। কিন্তু বাংলার সমাজে নারীর স্থান সম্পর্কে আলোচনা করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, তাহাও প্রধানত আদর্শমুখী; পাতিব্রত্যের আদর্শ তাহার প্রত্যক্ষ ও বাস্তব জীবনের সুখ-দুঃখের উপর কর্তৃত্ব করিতেছে। চারিদিকের সুকঠিন বিধি-ব্যবস্থার বাঁধাধরা গণ্ডির মধ্যে পড়িয়া তাহার আত্মবোধের বিকাশ একেবারেই অসম্ভব। ইহার মধ্যেই তাহাকে

সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া লইয়া নির্বিরোধে সংসার-জীবন যাপন করিতে হয়। এমন কি, আধুনিক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ফলেও নারীর মধ্যে যে আত্মবোধ জাগিয়াছে, এক সুদৃঢ় সমাজ-ব্যবস্থার বন্ধনে তাহারও বিকাশ তাহার মধ্যে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বহুকালের আদর্শ-সেবার ফলে তাহার বিদ্রোহ করিবার শক্তি পর্যন্ত বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে; সেইজন্য আজও সে তাহার ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখবোধ জলাঞ্জলি দিয়া চিরাচরিত প্রথারই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে।

দাম্পত্য জীবনের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা লইয়াই নারীজীবনের সর্বপ্রধান দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে। কিন্তু বাঙ্গালী নারীর দাম্পত্য জীবন আদর্শবাদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ব্যক্তিগত সুখদুঃখজনিত দ্বন্দ্ব ও বিরোধের স্থান সেখানে থাকিলেও, তাহা বাহিরে প্রকাশ করা সম্ভব নহে—অন্তরের মধ্যেই গোপনে তাহাকে বিলীন করিয়া দিতে হয়। দৃষ্টান্ত দিলে কথাটি বুঝিতে সহজ হইবে। নরওয়ে-দেশীয় নাট্যকার ইবসেন তাঁহার *A Doll's House* নাটকের মধ্যে নায়িকা চরিত্র নোরার মুখ দিয়া যে সামাজিক জিজ্ঞাসা তুলিয়াছিলেন, তাহা স্ত্রী-মাত্রেরই একটি দেশকাল-নিরপেক্ষ চিরন্তন জিজ্ঞাসা। নোরা যে সমাজে বাস করিত, সেই সমাজ তাহার এই আত্মবোধকে স্বীকার করিয়া স্বামীর সঙ্গে তাহার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরও তাহাকে সমাজে সম্মানিত স্থানেই অধিষ্ঠিত রাখিয়াছে। কিন্তু আধুনিক বাংলার সমাজ নারীর এই আত্মবোধের প্রতি মৌখিক স্বীকৃতি দেখাইলেও কার্যত তাহার এই বিষয়ক কোন অধিকারকে স্বীকার করিবে না। তাহার ফলে নারীকে ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক সকল দিক হইতে নোরার স্বামীর মত স্বামীকেই কেন্দ্র করিয়া সমগ্র জীবনের সুখ-দুঃখের স্বপ্ন সার্থক করিতে হইবে। মানুষ হিসাবে স্বামী যখন স্ত্রীর কাছে অনভিপ্রেত হইয়া পড়ে, তখন স্বামিসম্পর্কিত একটি আদর্শবোধ স্ত্রীর ধ্যান-দৃষ্টির সম্মুখে একটি ছায়ারূপ ধারণ করিয়া দাঁড়ায় এবং এই ছায়ারূপই তাহার সত্যকার স্বামীর বাস্তব দোষত্রুটি-গুলি আচ্ছন্ন করিয়া দেয়। বাঙ্গালী নারীর স্বামিসম্পর্কিত ধারণার মধ্যে আদর্শবাদ যে কত প্রবল, তাহা রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' উপন্যাসের কমলা এবং শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বের অন্নদাদিদি চরিত্রের কথা স্মরণ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। অতএব স্বামী যেখানে একটি আদর্শ মাত্র হইয়া রক্তমাংসের সম্পর্কের বহু উর্ধ্বে বাস করিয়া থাকে, সেখানে স্ত্রীর সঙ্গে তাহার দ্বন্দ্বের সংঘাত প্রবল ও সক্রিয় হইয়া উঠিতে পারে না। যেখানে যে ভাবেই

হউক সামঞ্জস্য বিধান করিয়া লওয়া ব্যতীত উপায় নাই ; সেখানে দ্বন্দ্বই বাধুক কিংবা সংঘাতেরই সৃষ্টি হউক, তাহার ফল কার্যকর হয় না। দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কার্যকারিতা যেখানে সুদূর-প্রসারী নহে, সেখানে তাহার উপর ভিত্তি করিয়া কোন সার্থক নাট্যিক চরিত্র সৃষ্টি করাও সম্ভব নহে। সেইজন্য হিন্দুর সনাতন সমাজ-ব্যবস্থার অন্তর্বর্তী নারীচরিত্র অবলম্বন করিয়া আধুনিক ইউরোপীয় আদর্শে নাটক কিংবা উপন্যাস কিছুই রচনা করা সম্ভব হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসগুলির মধ্যে সেইজন্যই রোহিণীর হত্যা, কুন্দের বিষপান এবং শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত লইয়া এত প্রশ্ন উঠিয়াছে। এমন কি, শরৎচন্দ্রও ইহার কোন সমাধান করিতে না পারিয়া অকারণ ট্র্যাজিডির ভিতর দিয়াই তাঁহার প্রায় সকল সামাজিক উপন্যাসেরই যবনিকাপাত করিয়াছেন। অতএব পাশ্চাত্ত্য সমাজের আদর্শে এদেশের নারী যতদিন পর্যন্ত সমাজে তাহার স্বকীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিবে এবং বাংলার সমাজও নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধকে স্বীকার করিয়া না লইবে, ততদিন বাংলা নাটকে পাশ্চাত্ত্য আদর্শে স্ত্রীচরিত্র পরিকল্পিত হওয়া অসম্ভব।

উপন্যাসের কথাটা যখন এখানে আসিয়া পড়িল, তখন উপন্যাসের সঙ্গে নাটকের যে এই বিষয়ে একটু পার্থক্য আছে, তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজন। নাটকের মধ্যে দ্বন্দ্বই প্রধান, উপন্যাসে তাহা নহে। বাংলার নারীজীবনে কোন দ্বন্দ্ব নাই বলিয়া, কিংবা থাকিলেও তাহার বহিঃপ্রতিক্রিয়া এই দেশীয় সামাজিক আদর্শে সম্ভব নহে বলিয়া, বাংলা নাটকের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য আদর্শে স্ত্রীচরিত্র পরিকল্পিত হওয়া যেমন সম্ভব নহে, উপন্যাস সম্পর্কে সে কথা বলা চলে না। কারণ, নাটকের মত একমাত্র দ্বন্দ্বই উপন্যাসের লক্ষ্য নহে। জীবনই উপন্যাসের উপজীব্য—সে জীবন দ্বন্দ্ব-সঙ্কুল যেমন হইতে পারে, তেমনি নির্দ্বন্দ্বও হইতে পারে। অতএব বাঙ্গালী নারীর জীবন বাহির হইতে নির্দ্বন্দ্ব বলিয়া বোধ হইলেও, উপন্যাসের উপজীব্য হওয়ার পক্ষে তাহার কোন বাধা নাই—তবে তাহা পাশ্চাত্ত্য সমাজভুক্ত নারীর সম্পূর্ণ অনুগামী হইতে পারে না, এই পর্যন্ত মাত্র।

বাঙ্গালীর জীবন প্রধানত অন্তর্মুখী এবং ইহার সমাজ স্ত্রীচরিত্র-প্রধান বলিয়া বাংলা সাহিত্যে উৎকৃষ্ট নাটক রচিত হইতে পারে নাই, কেহ কেহ এমন অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু নাটকের মধ্যে পুরুষোচিত নাট্যিক ক্রিয়ার (dramatic action) বাহুল্য এলিজাবেথীয় যুগের ইংরেজ

দর্শকদিগের নিকট রুচিকর বলিয়া বোধ হইলেও, পরবর্তী যুগ হইতেই তাঁহাদের মধ্যে এই বিষয়ে রুচির পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। রঙ্গমঞ্চের উপর ঢাল-তলোয়ার লইয়া লম্ফঝম্প, কামান-বন্দুকের গর্জন ও অন্যান্য লোম-হর্ষক ও অতি-নাট্যিক ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষ সংঘটন আধুনিক পাশ্চাত্ত্য নাটকের উপজীব্য নহে; এই নিষ্ক্রিয়তা সত্ত্বেও আধুনিক পাশ্চাত্ত্য নাটক উৎকর্ষ লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। অতএব বাঙ্গালীর তথাকথিত অন্তর্মুখীনতার জন্য বাংলা সাহিত্যে উৎকৃষ্ট নাটক রচিত হইতে পারে নাই, এ কথা বলা যাইতে পারে না। ইউরোপীয় সভ্যতার মধ্যযুগে যখন 'ক্রুসেড' এবং 'শিভ্যাল্‌রি' পৌরুষের আদর্শ ছিল, তখন স্বভাবতই ইহাদের প্রভাব তাহার নাট্যসাহিত্যে গিয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু আধুনিক যুগে ইউরোপের সামাজিক জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই নাট্যসাহিত্যও ইহাদের প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়াছে। এখন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত মন নাট্যাভিনয়ের মধ্যে নাট্যিক ক্রিয়ার বাহুল্যকে গ্রাম্যতা (vulgarity) বা বর্বরতা বলিয়া মনে করে। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নাট্যসাহিত্য সমসাময়িক কালের ইংরেজি নাট্যসাহিত্য দ্বারা প্রভাবান্বিত না হইয়া বরং এলিজাবেথীয় যুগের বিশেষত সেক্সপীয়রের ক্রিয়া-বহুল নাটকগুলি দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল বলিয়া, তদানীন্তন বাংলা নাটকেও ক্রিয়া-বাহুল্যের দিকটিই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল; তাহারই ফলে এই ক্রিয়া-বাহুল্যকেই কেহ কেহ নাটকের অপরিহার্য আদর্শ বলিয়া ভুল করিয়াছেন।

আধুনিক পাশ্চাত্ত্য নাটকে যে নাট্যিক ক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহা মানসিক দ্বন্দ্ব-সম্ভূত। এই মানসিক দ্বন্দ্বের অবকাশ বাঙ্গালী স্ত্রীপুরুষের জীবনে পাশ্চাত্ত্য জীবন হইতে কোন অংশেই কম নহে। অতএব যথাযথভাবে সেই দ্বন্দ্বকে ফুটাইয়া তুলিতে পারিলে অন্তর্মুখী বাঙ্গালীর জীবন এবং স্ত্রীচরিত্র-প্রধান বাঙ্গালীর পরিবার অবলম্বন করিয়া আধুনিক পাশ্চাত্ত্য আদর্শে উৎকৃষ্ট বাংলা নাটক রচিত হইতে পারে। বাংলা নাট্যসাহিত্যের আধুনিক যুগে সেই প্রয়াস রবীন্দ্রনাথের নাটকের ভিতর দিয়াই সর্বপ্রথম দেখা দিয়াছিল এবং তিনিই এই আদর্শে কয়েকখানি শ্রেষ্ঠ বাংলা নাটক রচনা করিবার গৌরব লাভ করিয়াছেন। কিন্তু একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত এলিজাবেথীয় যুগের ইংরেজি নাটকের প্রভাব আজ পর্যন্ত অতি অল্প নাট্য-কারই সম্পূর্ণ কাটাইয়া উঠিতে পারিয়াছেন বলিয়া, একান্তভাবে মানসিক দ্বন্দ্ব-

সংঘাতের উপর নির্ভর করিয়া বাংলা নাটক আর কেহ বড় রচনা করিতে পারেন নাই। এক বিষয়ে ইহার একটি বাধাও আছে। পাশ্চাত্ত্য সমাজে মানসিক দ্বন্দ্বের সামাজিক প্রতিক্রিয়ার যে একটি স্বচ্ছন্দ অবকাশ আছে, এ দেশের সমাজে তাহা নাই। নোরার মনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব জাগিয়াছিল, তাহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সে স্বামি-গৃহ পরিত্যাগ করিল; কিন্তু সেইজন্য তাহাকে সমাজ পরিত্যাগ করিতে হইল না,—সমাজের মধ্যে তাহার স্থান স্থিরই রহিল। সেই সমাজের মধ্যেই সে পত্নীরূপে ও জননীরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে। কিন্তু বাংলার সমাজে দাম্পত্যজীবন সম্পর্কিত দ্বন্দ্ব সর্বদাই শেষ পর্যন্ত একই জীবনকে কেন্দ্র করিয়া, হয় সামঞ্জস্য বিধান, নতুবা ট্র্যাজিডিতে পরিণতি লাভ করিতে বাধ্য হয়। ইহার গতিপথ নির্দিষ্ট করা আছে বলিয়াই এই সম্পর্কিত দ্বন্দ্বের প্রতিক্রিয়াসমূহ সম্পূর্ণ স্বাধীন হইতে পারে না—একটি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও নির্দিষ্ট আবেষ্টনীর মধ্যে ইহাকে আবর্তিত হইতে হয়। নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা ব্যতীত তাহার মানসিক দ্বন্দ্বের স্বাধীন প্রতিক্রিয়া সম্ভব নহে; সেইজন্য তাহার আত্মবোধ হইতে উদ্ভূত মানসিক দ্বন্দ্বের ধারাও শেষ পর্যন্ত সামাজিক বাঁধাখাতের মধ্যে পড়িয়া গিয়া একটি নির্দিষ্ট পথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়া যায়। সেইজন্য নারীর স্নেহ, বাৎসল্য, পারিবারিক কর্তব্যবোধ ইত্যাদির উপর ভিত্তি করিয়া তাহার মানসিক দ্বন্দ্ব যত স্বাধীনভাবে সৃষ্টি করা সম্ভব হয়, তাহার দাম্পত্য জীবনকে ভিত্তি করিয়া তাহা তত স্বাধীন ভাবে সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না। অথচ দাম্পত্য জীবনের মধ্যে যে সর্বজনীন উপাদান আছে, অন্যান্য বৃত্তির মধ্যে তাহা নাই; সেইজন্য দাম্পত্য জীবনের ভিত্তির উপর পরিকল্পিত দ্বন্দ্ব যেমন সর্বজনীন ঔৎসুক্য সৃষ্টি করিতে পারে, তেমন আর কিছুই পারে না। এইদিক দিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে মানসিক দ্বন্দ্বসংঘাতের ভিত্তিতে বাংলা নাটক রচনা করিবার সীমাও সঙ্কীর্ণ বলিয়া বোধ হইবে।

বিবাহের পূর্বে নরনারীর অবাধ মিলনের ভিতর দিয়া পরস্পরের মধ্যে যে অনুরাগ সঞ্চারিত হইয়া থাকে, তাহার আবেদনও যথেষ্ট ব্যাপক; কারণ, তাহাও দেশকাল-নিরপেক্ষ এক সর্বজনীন বৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি করিবারও প্রচুর অবকাশ আছে; এই মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত আধুনিক যে কোন উচ্চাঙ্গ নাটকেরই উপজীব্য হইতে পারে। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য নাটকসমূহে এই উপাদানের যথার্থ সদ্ব্যবহার করা হইয়া থাকে,

কিন্তু বাংলা দেশের সামাজিক ব্যবস্থায় অবিবাহিত নরনারীর এই অবাধ মিলনের প্রতি নৈতিক সমর্থন না থাকার জন্য ইহাও বাংলা নাট্যকাহিনীর উপজীব্য হইবার পক্ষে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, বাংলার সমাজে এই রীতি আজিও বহুল প্রচলন লাভ করিতে পারে নাই; এমন কি, আধুনিক বাংলার পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত সমাজেও ইহার প্রতি কোন প্রকার নৈতিক সহানুভূতি প্রদর্শন করা হয় না। সেইজন্য বাংলার সমাজে একমাত্র দাম্পত্য জীবন ব্যতীত নরনারীর প্রেমের স্থান নির্দেশ করা কঠিন। এই দেশের আদর্শে দাম্পত্য প্রেম ব্যতীত অন্য প্রেম অসামাজিক, এই অসামাজিক প্রেমের বর্ণনায় সুন্দর ও কল্যাণকে আঘাত করা হয়। এমন কি, কাব্যসাহিত্যে ইহার মহিমা বর্ণনা করিতে পারিলেও নাটক এবং রঙ্গমঞ্চের ভিতর দিয়া ইহা প্রকাশ করিবার উপায় নাই। অতএব যে বৃত্তির আবেদন সর্বাপেক্ষা ব্যাপক, তাহাকেও নানাদিক হইতে একটি অপরিসর গণ্ডির মধ্যে আনিয়া ফেলিবার জন্য ইহা অবলম্বন করিয়াও বাংলা নাটক রচনার অবকাশ খর্ব হইয়াছে। এখানে বাঙ্গালী জীবনের অন্তর্মুখীনতা অপেক্ষা ইহার বিশেষ সামাজিক অবস্থাই যে নাটক রচনার পক্ষে অন্তরায় হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে।

এ কথা সত্য যে, রবীন্দ্রোত্তর যুগের কোন কোন নাট্যকার বাংলার প্রত্যক্ষ সামাজিক জীবন হইতে উপাদান সংগ্রহ না করিয়া, ইহার এক আদর্শ রূপ কল্পনা করিয়া, তাহার মধ্য হইতেই নাটকীয় চরিত্রসমূহের উদ্ভাবন করিয়া লইতেছেন। তাঁহাদের রচিত এই শ্রেণীর নাটককে সামাজিক নাটকের পর্যায়ে আনিয়া বিচার করা যাইতে পারে না। ইহা বাংলা সাহিত্যে এক নূতন শ্রেণীর নাটক। ইহাকে রোমাণ্টিক নাটক বলা যাইতে পারে। ইহার কথা পরে আরও একটু বিস্তৃতভাবে বলিতেছি।

বিধবার চরিত্র বাংলার সামাজিক নারীচরিত্রের একটি প্রধান অংশ। এই দেশের সমাজে যুবতী বিধবাদিগের যে স্থান, তাহাতে তাহাদের মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টির প্রচুর অবকাশ ছিল। কিন্তু বিধবাদিগের চরিত্র সম্পূর্ণ আদর্শমুখী, বাস্তবতার সকল রকম 'অশুচি' তাহাদিগকে বাঁচাইয়া চলিতে হয়। এই অবস্থায় তাহাদের চরিত্রের যথার্থ নাট্যিক বিকাশ নির্দেশ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। যাঁহারা নাটকে কিংবা কথাসাহিত্যে এই বিষয়ে একটু আধটু দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহাদেরও কাহিনী শেষ

পর্যন্ত কোন সুনির্দিষ্ট পরিণতি লাভ করিতে পারে নাই। সেইজন্যই রোহিণী পিস্তলের গুলি খাইয়া মরিয়াছে, বিনোদিনী সন্ন্যাসিনী হইয়াছে এবং কিরণময়ী উন্মাদিনী হইয়াছে। বিধবার প্রেম এই দেশের সমাজে অচিন্তনীয় পাপ। কথাসাহিত্যের অন্তর্বিশ্লেষণের ভিতর দিয়া এই পাপ ততখানি প্রত্যক্ষ হইতে পারে না বলিয়া, ইহা উপন্যাসের মধ্যে এক রকম চলিয়া গেলেও নাটকের প্রত্যক্ষ অভিনয়ের ক্ষেত্রে একেবারে অচল হইয়া রহিয়াছে। শরৎচন্দ্রের 'বামুনের মেয়ে' উপন্যাস হিসাবে পাঠ্য হইলেও, নাটকরূপে যে দৃশ্য হইবার যোগ্য নহে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। সেইজন্য কোন বাংলা নাটকে এই প্রেমকে গৌরব দান করিতে কেহই সাহসী হন নাই। নীতিমূলক দুই একখানি নাটকে ইহার শোচনীয় পরিণাম দেখান হইলেও কোন উচ্চাঙ্গ সামাজিক নাটকে এই প্রসঙ্গ উপজীব্য করা হয় নাই। অথচ পূর্বেই বলিয়াছি, কর্তব্যবোধের (necessity without) সঙ্গে আত্মবোধের (freedom within) দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিবার পক্ষে যুবতী-বিধবাদিগের চরিত্র অপেক্ষা সার্থক অবলম্বন এ দেশের সামাজিক চরিত্রে আর নাই। কিন্তু এক সুকঠিন সামাজিক শাসন ও নীতিবোধ এখানে ইহার নাট্যিক বিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে।

উপরের আলোচনা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে, যে নারী সমাজের একটি প্রধান অংশ, তাহার জীবনের স্বাভাবিক স্ফূর্তি বাংলার সমাজে কতদিক দিয়া হ্রাস করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেইজন্য নাটকেও তাহার স্থান সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে। বাংলা নাট্যসাহিত্যের বিকাশের পথে ইহা যে কতদূর অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

॥ ৩ ॥ উপন্যাস ও নাটক

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস এবং নাটক উভয়েরই একই সময়ে জন্ম হয়; কিন্তু উপন্যাস বা কথাসাহিত্য আজ যে মর্যাদার অধিকারী হইয়াছে, নাট্যসাহিত্য যে সে মর্যাদার অধিকারী হইতে পারে নাই, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহার কারণ সম্পর্কে গভীর ভাবে কেহ অনুসন্ধান করিয়াছেন কি না জানি না; কিন্তু এ কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে সাধারণ ভাবেও ভাবিয়া দেখা যাইতে পারে। প্রথমত বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস

যে বিষয়বস্তু লইয়া প্রায় প্রথম হইতেই রচিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, নাটক সেই বিষয়বস্তু লইয়া রচিত হইতে আরম্ভ করে নাই। প্রথম যুগের কয়েকটি বাংলা নাটকের মধ্যে বাঙ্গালীর বাস্তব জীবনের যে স্পন্দন দেখা গিয়াছিল, পরবর্তী যুগে অর্থাৎ গিরিশচন্দ্রের যুগে তাহা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যায়—তখন পৌরাণিক বিষয়বস্তুই নাটকের উপজীব্য হইয়া দাঁড়ায়। পৌরাণিক নাটক যেমন বাংলা নাট্যসাহিত্যের একটি প্রধান শাখা, 'পৌরাণিক উপন্যাস' বলিয়া তেমন কোনও বস্তু কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে গড়িয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই। পৌরাণিক শব্দের অর্থই হইতেছে জীবন-বিমুখী অলৌকিকতা। বলাই বাহুল্য যে, অলৌকিকতার স্থান সাহিত্যে নিতান্ত পরিমিত। ইহাকে যথাযথ ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া কল্পনা-ধর্মী কাব্যসাহিত্য গড়িয়া উঠিতে পারে, কিন্তু বস্তুধর্মী নাটক কিংবা উপন্যাস গড়িয়া উঠিতে পারে না। বাঙ্গালী যতই ধর্মপ্রাণ হউক, বাঙ্গালীর উপন্যাস ধর্মাশ্রিত অলৌকিকতার প্রেরণা হইতে প্রথম হইতেই মুক্ত থাকিতে পারিয়াছে। কিন্তু বাংলা নাটক অন্তত প্রথম যুগে না হউক, ইহার পরবর্তী যুগে অতি সহজেই এই প্রভাবের অধীন হইয়া পড়িয়াছিল।

বাংলার সর্বপ্রথম উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হইবার চারি বৎসর পূর্বে প্রথম মৌলিক বাংলা নাটক তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' প্রকাশিত হয়। 'ভদ্রার্জুনে'র কাহিনী মহাভারত হইতে গৃহীত হইলেও ইহা যথার্থ পৌরাণিক নাটক বলিয়া নির্দেশ করা যায় না। কারণ, ইহার মধ্যে যেমন কোনও অলৌকিক শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা হয় নাই, তেমনই ইহাতে ভক্তির কোন ভাবও প্রকাশ পায় নাই। রচনার যে ত্রুটিই ইহাতে থাকুক, ইহার চরিত্রগুলি অবাস্তব ও একান্ত কল্পনাশ্রয়ী নহে। ইহার পর দীনবন্ধু মিত্রের সময় পর্যন্ত যে কয়খানি বাংলা নাটক রচিত হয়, তাহাদের কয়েকখানি সেক্সপীয়রের অনুবাদ, কয়েকখানি মৌলিক বাংলা রচনা। মৌলিক বাংলা রচনাগুলির একখানিও পৌরাণিক বিষয়াশ্রিত ছিল না—অধিকাংশই ছিল সমাজ-সংস্কারমূলক রচনা। প্রত্যক্ষ সমাজ ইহাদের লক্ষ্য ছিল বলিয়া অনেক ক্ষেত্রেই ইহাদের বাস্তব মূল্য প্রকাশ পাইয়াছে; কিন্তু সেই সঙ্গে একটি আদর্শ সমাজ-জীবনও ইহাদের' লক্ষ্য থাকিত বলিয়া অনেক সময় ইহাদের মধ্যে কল্পনারও প্রভাব আসিয়াছে। তথাপি এ কথা স্বীকার করিতেই হয় যে, গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা নাটক বাংলা

দেশের ধূলামাটির সম্পর্ক পরিত্যাগ করে নাই—বাংলাদেশের সমাজ, ইহার সহস্র ত্রুটি-বিচ্যুতি যেমন ইহাদের লক্ষ্য ছিল, তেমনই কোনও কোনও ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর জীবনই ইহাদের ভিতর দিয়া রূপায়িত হইয়াছে। বাংলার প্রথম উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলালে'র পার্শ্বে দীনবন্ধুর নাটক-গুলির কথা স্মরণ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, তখনও বাংলা নাটক এবং উপন্যাসের মধ্যে বিষয়গত কোন ব্যবধান সৃষ্টি হয় নাই। কেবলমাত্র মাইকেল মধুসূদন তাঁহার প্রহসন ব্যতীত তিনখানি নাটক রচনায় ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কোন দিক দিয়াই ইহারা অলৌকিকতা দ্বারা ভারাক্রান্ত হইয়া নাট্য-রসাস্বাদনের পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি করিতে পারে নাই। তথাপি স্বীকার করিতেই হইবে, মধুসূদন তাঁহার এই তিনখানি নাটকের ভিতর দিয়া বাঙ্গালীর বাস্তব-জীবন-নিরপেক্ষ যে উপকরণ পরিবেশন করিয়াছিলেন, তাহা পরবর্তী নাট্যকারগণ বাংলা নাটক রচনার একটি আদর্শ রূপে গ্রহণ করিয়া বাংলা নাটককে বাঙ্গালীর জীবন-বিমুখী করিয়া তুলিবার প্রেরণা লাভ করিয়া-ছিলেন; কারণ, আমরা দেখিতে পাইব যে, পরবর্তী নাট্যকারদিগের মধ্যে অনেকেই তাঁহার নাটক নানাভাবে অনুকরণ করিয়াছেন।

একান্ত বস্তুধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া দীনবন্ধু যখন তাঁহার নাটক এবং প্রহসনগুলি রচনা করিতেছিলেন, সেই সময় বাংলা কথাসাহিত্যের সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনারও সূত্রপাত হয়। দীনবন্ধুর নাটক রচনার প্রায় সমসাময়িক কালেই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিও প্রকাশিত হইতে থাকে। দীনবন্ধুর প্রতিভা ছিল মৌলিক. তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি দ্বারা প্রভাবিত হন নাই। বিশেষত দীনবন্ধু এবং বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেও পার্থক্য ছিল। একজন মর্ত্যের ধূলিমাটির উপর বিচরণসিদ্ধ, আর একজন মর্ত্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াও নভোমণ্ডলবিহারী। সুতরাং সমসাময়িক লেখক হওয়া সত্ত্বেও দীনবন্ধু এবং বঙ্কিমের মধ্যে বিষয়- ও আদর্শ-গত পার্থক্য সৃষ্টি হইল—অর্থাৎ বাংলার নাটক ও কথাসাহিত্য সেদিন বিষয় ও জীবন-দৃষ্টির দিক হইতে রক্ষা করিতে পারিল না। কিন্তু সেদিন যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, অল্পদিনের মধ্যেই তাহার বিপরীত অবস্থার উদ্ভব হইল। কারণ, দীনবন্ধুর যুগে নাটকই বস্তুধর্মী ছিল, উপন্যাসের ভিতর কল্পনা-বিলাসিতা স্থান পাইয়াছিল; কিন্তু ইহার কিছুকাল পরেই অর্থাৎ নাটকের

ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্র এবং কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই নাটকে কল্পনা-বিলাসিতা এবং উপন্যাসে বস্তুধর্মিতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। এই ধারাই আধুনিকতম কাল পর্যন্ত ক্রমাগত অগ্রসর হইতে হইতে নাটক এবং উপন্যাসের মধ্যে বিষয়গত এবং ভাবগত এক বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। এমন কি, দেখিতে পাওয়া যায় যে, একই লেখক যখন নাটক রচনা করিতেছেন, তখন তিনি রোমাণ্টিক বিষয়বস্তু অবলম্বন করিতেছেন, কিন্তু যখন তিনিই আবার কথাসাহিত্য রচনা করিতেছেন, তখন বস্তুধর্মিতার আশ্রয় লইতেছেন। রবীন্দ্র-নাথ যখন তাঁহার অপূর্ব বস্তুধর্মী কথাসাহিত্য 'গল্পগুচ্ছ', 'চোখের বালি' প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন, সেই যুগেই তিনি 'রাজা ও রাণী', 'বিসর্জন', 'চিত্রাঙ্গদা', 'মালিনী' প্রভৃতি রোমাণ্টিকতা-ধর্মী নাটক রচনা করিয়াছেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারার কোনও যোগ নাই; কিন্তু বাংলা নাটক রচনায় যে আদর্শবাদিতার প্রভাব সে যুগে যথার্থ নাটক রচনার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের নাটকেও সেই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে।

গিরিশচন্দ্রের পূর্ববর্তী পৌরাণিক নাটকের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের একটি স্থূল পার্থক্য অনুভব করা যায়। গিরিশচন্দ্রের পূর্ববর্তী পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে ভক্তি কিংবা অলৌকিকতার ভাব প্রবেশ করিতে পারে নাই। ইহাদের মধ্যে সঙ্গীতেরও বাহুল্য ছিল না। সুতরাং সে যুগের পৌরাণিক নাটকের সঙ্গে উপন্যাসের কেবলমাত্র রূপগত পার্থক্য ছিল, ভাবগত কোনও পার্থক্য ছিল না। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের সময় হইতে পৌরাণিক নাটকগুলি উপন্যাসের ধর্ম হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইয়া গিয়া একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিভাগ রচনা করিল—প্রকৃতপক্ষে তখন হইতেই বাংলা সাহিত্যে নাটক এবং উপন্যাস বিষয়ের দিক দিয়া দুইটি স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। কথাসাহিত্য ক্রমাগতই বস্তুমুখীন হইতে লাগিল, নাটক তাহার পরিবর্তে ক্রমাগতই কল্পনাশ্রয়ী বা রোমান্সধর্মী হইয়া উঠিতে লাগিল।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেই স্বদেশী আন্দোলনের ভিতর দিয়া বাংলার কথাসাহিত্য যখন নূতন বস্তুধর্মী বিষয়বস্তুর সন্ধান লাভ করিয়া সার্থকতার পথে অগ্রসর হইয়া চলিল, তখন বাংলা নাটক এই পথ

সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া ভারতীয় অতীত-ইতিহাসের মধ্যে বিষয়বস্তুর সন্ধান করিতে লাগিল। সেই যুগেই উপন্যাসের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' এবং বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের 'রাণা প্রতাপ', 'দুর্গাদাস', 'মেবার পতন' প্রভৃতি রচিত হয়। তারপর ক্রমে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের বস্তুধর্মিতার পথ অবলম্বন করিয়া বাংলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব হইল। তাঁহার সামাজিক উপন্যাসগুলির ভিতর দিয়া বাংলার পারিবারিক এবং সামাজিক জীবন অপরূপ মাধুর্যে মণ্ডিত হইয়া দেখা দিল। কথাসাহিত্যের ভিতর দিয়াই বাংলায় স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাংলার গৃহ ও পরিবার একান্ত পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সেই যুগে বাংলার নাট্যসাহিত্য এ দেশের প্রত্যক্ষ সমাজ-জীবন হইতে দূরে থাকিয়া কেবলমাত্র প্রাচীন ইতিহাসের জীর্ণ পাতায় নিজেদের উপকরণ সন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিল। জাতীয়তাবাদের আদর্শ প্রচার ইহাদের মধ্যে যতই সার্থকতা লাভ করুক, কিংবা এই সকল নাটকের অভিনয় দেখিয়া সেদিনের বাঙ্গালী যতই উন্মাদনা অনুভব করুক না কেন, ইহাদের মধ্যে বাঙ্গালীর বাস্তব জীবনের রূপায়ণ যে সার্থক হয় নাই, তাহা সহজেই অনুভব করা যায়। যে নাটকে জাতির বাস্তব জীবনের রূপায়ণ সার্থক হয় নাই, তাহার সাময়িক অন্য যে কোন মূল্যই থাকুক না কেন, সাহিত্যিক মূল্য যে নাই, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। দ্বিজেন্দ্রলাল কিংবা তাঁহার অনুসরণকারী নাট্যকারগণ সে যুগে যে ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিতেছিলেন, তাহা জাতির প্রত্যক্ষ জীবন হইতে এই ভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া স্থায়ী সাহিত্যিক আবেদন সৃষ্টি করিতে ব্যর্থকাম হইল। কিন্তু সেই যুগে বাংলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে বাস্তব জীবন-বোধ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে লাগিল। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, সেই যুগে রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ করিয়া কথাসাহিত্যের আকাশে শরৎচন্দ্রের উদয় হইল। যখন কথাসাহিত্যে শরৎচন্দ্র তাঁহার প্রত্যক্ষ-জীবন-অভিজ্ঞতাজাত উপন্যাসের কাহিনীগুলি রচনা করিয়া বাংলার গৃহ ও পরিবারের প্রতি বাঙ্গালীর হৃদয় মমতায় ভরিয়া দিতেছিলেন, সেই সময়ই ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রমুখ নাট্যকারগণ ঐতিহাসিক রোমান্সকে ভিত্তি করিয়া নাটক রচনা করিতেছিলেন। এই সকল নাটকের ভিতর দিয়া বাঙ্গালীর প্রত্যক্ষ জীবনের প্রতি যে

বিমুখীনতার ভাব দেখা গিয়াছিল, তাহাতেই সে যুগের নাট্যসাহিত্য কথা-সাহিত্যের তুলনায় নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল।

বাংলা নাটক প্রথম হইতেই দুইটি উদ্দেশ্য পালন করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল—প্রথমটি সমাজ-সংস্কার, দ্বিতীয়তঃ দেশাত্মবোধের জাগরণ। কথাসাহিত্য যে এই দায়িত্ব একেবারেই অস্বীকার করিয়াছে, তাহা নহে—কিন্তু এই দুইটি উদ্দেশ্যকে ইহা নাটকের মত একেবারে একান্ত বলিয়া গ্রহণ করে নাই। তবে এ কথাও সত্য, দেশাত্মবোধক কিংবা সমাজসংস্কারমূলক উপন্যাস যিনিই রচনা করুন না কেন, বাংলা সাহিত্যে তিনি কেবলমাত্র তাহা দ্বারাই স্থায়ী কীর্তি লাভ করিতে পারেন নাই। কথাসাহিত্যেই হউক, কিংবা নাটকেই হউক, উদ্দেশ্যমূলক রচনা যে স্থায়ী শিল্পগুণের অধিকারী হইতে পারে না, তাহা সকলেই জানেন। আমাদের দেশের অধিকাংশ নাট্যকারই ঐ কথাটি সম্পর্কে সম্যক্ অবহিত হইতে পারেন নাই। সেইজন্য প্রায় একটা না একটা কিছু উদ্দেশ্য লইয়াই তাঁহারা নাটক রচনা করিয়াছেন; কিন্তু সাহিত্য অকারণ আনন্দ ও সৌন্দর্য সৃষ্টি—ইহার কোন উদ্দেশ্য থাকিলেই ইহার স্বভাব-ধর্মের ব্যতিক্রম ঘটে। বাংলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের পথ অনুসরণ করিয়াই হউক, কিংবা স্বাধীনভাবেই হউক, আরও শক্তিশালী বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্যিকের যখন আবির্ভাব হইতে লাগিল, তখনও নাট্যসাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলাল-ক্ষীরোদপ্রসাদের পুরাণ, ইতিহাস ও রোমান্সভিত্তিক রচনার প্রথা নিরবচ্ছিন্নভাবে অগ্রসর হইয়া চলিল। কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে যখন তারাশঙ্করের আবির্ভাব দেখা দিল, নাট্যসাহিত্য তখনও ইহার পুরাতন ধারা অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইতে গিয়া নানা ঐতিহাসিক রোমান্স রচনা করিতে লাগিল। জাতির জীবনের সঙ্গে কথাসাহিত্যের যোগ যখন নিবিড় হইতে নিবিড়তর হইতে লাগিল, 'পথের পাঁচালী', 'পঞ্চগ্রাম', 'নাগিনী কন্যার কাহিনী', 'পদ্মানদীর মাঝি' প্রমুখ রচনার ভিতর দিয়া বাংলার পল্লী যখন জীবন্ত হইয়া দেখা দিতে লাগিল, তখনও বাংলা নাটক 'সিরাজদৌল্লা', 'গৈরিক পতাকা', 'নাদির শাহ' ইত্যাদির স্বপ্ন-বিলাসিতায় নিমগ্ন।

এই ভাবে বাংলা নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে কথাসাহিত্যের ব্যবধান ক্রমাগতই যখন বাড়িয়া চলিতে লাগিল, তখন অকস্মাৎ বাংলার সামাজিক জীবনে

এক বিপর্যয় দেখা দিল—তাহা ভারত-বিভাগ এবং তৎসঙ্গে বঙ্গবিচ্ছেদ। ইহার ফলে নাট্যসাহিত্যের লক্ষ্য সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গেল। যে ঐতিহাসিক নাটকগুলি এতকাল তথ্য এবং অতথ্যে পূর্ণ হইয়া পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্তির জয়গান গাহিতেছিল, তাহাদের সুর সহসা স্তব্ধ হইয়া গেল; কারণ, তাহাদের আবশ্যকতা দূর হইল। কঠিন হইতে কঠিনতর জীবন-সংগ্রামের ক্ষেত্রে উৎক্ষিপ্ত হইয়া এই জাতির কল্পনা-বিলাসিতা পূর্বেই ক্ষীণতর এবং ভক্তি বা ধর্মভাব বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছিল; সেইজন্য পৌরাণিক নাটকের মধ্যে গিয়া তাহা আর কোন নূতন আশ্রয় রচনা করিতে পারিল না। অথচ নূতন এক জীবনবোধের সঙ্গে সঙ্গে নাটক রচনার প্রেরণা ক্রমেই এই জাতির মনে শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিল। একশত বৎসরেরও অধিক কাল উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়া বাংলা নাটক অবশেষে বাংলার গৃহ এবং পরিবারকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইবার প্রয়াস পাইতে লাগিল। বিভাগোত্তর (post-partition) বাংলা নাটকে তাহারই পরিচয় প্রকাশ পাইতেছে। উপন্যাসের সঙ্গে ইহার বিষয়গত ব্যবধান প্রায় ঘুচিয়া গিয়াছে।

॥ ৪ ॥ দৃশ্যকাব্য ও নাটক

তবে একথা সত্য যে, বাস্তব জীবনের প্রত্যক্ষ খুঁটিনাটি অপেক্ষা কল্প-জগতের অবাধ বিস্তারের প্রতি বাঙ্গালী পাঠকের হৃদয় চিরদিনই আকর্ষণ অনুভব করিয়া আসিয়াছে। রোমান্স-বিলাসি মানব মাত্রেরই একটি সহজ ধর্ম। বাস্তব জগতের প্রত্যক্ষ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে মানুষের মন যখন পীড়িত হইয়া উঠে, তখন তাহা সাহিত্যের মধ্যে এক মনোরম কল্পজগৎ সৃষ্টি করিয়া সেখানে তাহার আত্মার বিশ্রামের স্থান সন্ধান করিয়া লয়। ইংরেজিতে ইহাকেই বলে escapism। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সভ্যতায় ইহার স্থান যেমন সঙ্কুচিত হইয়া আসিয়াছে, এ-দেশের সমাজে এখনও তাহা তেমন হইয়া উঠে নাই। বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রথম যুগ হইতেই ইহাতে রোমান্টিক নাটকের একটি ধারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত তাহা অব্যাহতভাবে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। বাঙ্গালীর এই অতি রোমান্স-প্রবণতাও পাশ্চাত্ত্য আদর্শে উচ্চাঙ্গ বাংলা নাটক রচনার অন্তরায় হইয়াছে। কারণ, বাস্তব জীবনকে অবলম্বন না করিলে নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত সুস্পষ্ট ও কার্যকর করিয়া তোলা সম্ভব হইতে পারে না। বাঙ্গালী চিরদিনই বাস্তবজীবন-বিমুখ,

ইহা তাহার একটি সহজাত জাতীয় ধর্ম। এমন কি, আধুনিক পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের ফলেও তাহার এই বিষয়ে কোন পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইবে না। অতএব ক্রমাগত কঠিন হইতে কঠিনতর জীবন-সংগ্রামের মধ্যবর্তী হইয়া যদি বাঙ্গালীর কোনদিন এই মনোভাবের পরিবর্তন হয়, তবেই যথার্থ নাট্যিক উপাদানের প্রতি তাহার আকর্ষণ প্রবলতর হইবে, তাহার পূর্বে ইহার ব্যতিক্রম হইবার উপায় নাই। তবে সেই অবস্থা সাম্প্রতিক কালে কিছু কিছু দেখা যাইতেছে। বাংলা নাটকের পক্ষে তাহা আশার বিষয় সন্দেহ নাই।

কিন্তু একথা সত্য যে, রোমান্সের প্রতি প্রবণতা বাঙ্গালীর চিরদিন বর্তমান থাকিলেও বাঙ্গালীর নাটক কোনদিন রোমান্টিক কাব্য হইয়া উঠে নাই। তবু কেহ কেহ বাংলা নাটককেও দৃশ্যকাব্য বলিয়া পরিচয় দিবার পক্ষপাতী। বলা বাহুল্য, দৃশ্যকাব্য সংজ্ঞাটি একমাত্র সংস্কৃত নাটকের সম্পর্কেই প্রযোজ্য, ইংরেজি নাটকের পক্ষেও প্রযোজ্য নহে। কারণ, সংস্কৃত নাটক প্রকৃতই কাব্যের লক্ষণাক্রান্ত, ইংরেজি নাটক তেমন নহে। বাংলা নাটক ইংরেজি নাটকেরই প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে সৃষ্ট এবং রূপ ও রসের দিক দিয়া বিচার করিলে তাহারই অনুকরণে রচিত; অতএব বাংলা নাটকের মধ্যে অন্য যে কোন লক্ষণই থাকুক না কেন, সংস্কৃত সংজ্ঞানুযায়ী কাব্যের লক্ষণ নাই। একথা সত্য যে, রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটকে কাব্যের লক্ষণ অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু সেই কাব্যরূপ রবীন্দ্রনাথেরই বিশিষ্ট প্রতিভার সৃষ্টি, সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের অনুকারী নহে। অবশ্য সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে কাব্য কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাতে গদ্য রোমান্সকেও গদ্যকাব্য বলা হয়। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে রোমান্সকে কাব্য বলিয়া নির্দেশ করা হয় না, আধুনিক বাংলা সাহিত্য কোন বিষয়েই সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের সংজ্ঞাকে গ্রহণ করে নাই, করিবার কথাও নহে; কারণ, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সকল বিভাগই প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবজাত, সংস্কৃতের ভাব-জাত নহে। অতএব নাটককেও সংস্কৃতের অনুযায়ী দৃশ্যকাব্য বলিয়া নির্দেশ না করিয়া ইংরেজি সাহিত্যের অনুরূপ drama বা নাটক বলিয়াই নির্দেশ করা সঙ্গত। আধুনিক ইংরেজি নাটকের প্রত্যক্ষতার (directness) যে একটি গুণ আছে, ইহার সম্পর্কে কাব্য কথাটি ব্যবহার করিলে তাহার সেই গুণটির বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা জন্মিতে পারে। বক্তব্য বিষয়ের প্রত্যক্ষতা (directness of expression)

আধুনিক ইংরেজি নাটকের একটি বিশিষ্ট ধর্ম ; সংস্কৃত নাটকের মধ্যে এক 'মৃচ্ছকটিক' ব্যতীত অন্য কোন নাটকের এই গুণটি একেবারেই নাই। অবশ্য অলঙ্কার শাস্ত্রানুযায়ী 'মৃচ্ছকটিক' অন্যান্য বিষয়েও সংস্কৃত নাট্যরচনার একটি ব্যতিক্রম বলিয়াই গ্রহণ করা হইয়া থাকে। আধুনিক বাংলা নাটকে এই প্রত্যক্ষতার গুণটি ইংরেজি নাট্যসাহিত্য হইতেই আসিয়াছে, 'মৃচ্ছকটিক' হইতে আসে নাই। কাব্য সংজ্ঞা দ্বারা বাংলা নাটকের এই প্রত্যক্ষতা-ধর্মের উপর স্বভাবতই আঘাত লাগিয়া থাকে। বিশেষত কাব্যের অবলম্বন ভাব ও নাটকের অবলম্বন ঘটনা—এইজন্যই আধুনিক বাংলা নাটককে দৃশ্যকাব্য সংজ্ঞা দ্বারা অভিহিত করা সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে না। জর্জীয় যুগের ইংরেজি নাটকের দৃশ্যগুণ অপেক্ষা পাঠ্যগুণই অধিক, রবীন্দ্র-নাটকেরও তাহাই। অতএব যেখানে দৃশ্যগুণ আপনা হইতেই একান্ত গৌণ হইয়া পড়িয়াছে, সেখানে দৃশ্য কথাটিও ব্যবহার করিবার কোন তাৎপর্য থাকিতে পারে না।

প্রাক্-জর্জীয় যুগের ইংরেজি নাটকে Dramatic Poetry ও Poetic Drama নামক এক শ্রেণীর রচনা প্রকাশ পাইয়াছিল—ইংরেজি সাহিত্যের রোমান্টিক Revival-এর যুগের কবিদিগের মধ্যে এই শ্রেণীর রচনা অত্যন্ত প্রিয় ছিল। কিন্তু তাহা কাব্য, নাটক নহে। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ইহার প্রভাব দেখিতে পাওয়া গেলেও এই শ্রেণীর রচনা বাংলা সাহিত্যে আর নাই বলিলেই চলে। Drama-র সঙ্গে এখানে Poetry কথাটিকে সংযুক্ত দেখিয়া, ইহা হইতেও আধুনিক বাংলা নাটককে কাব্য সংজ্ঞায় আখ্যাত করা সমীচীন হয় না। কারণ, Dramatic Poetry বা Poetic Drama প্রকৃতপক্ষে Drama নহে, Poetry-ই। অতএব বাংলা নাটককে কোন দিক দিয়াই দৃশ্যকাব্য বলিয়া নির্দেশ করা সমীচীন হয় না।

॥ ৫ ॥ রঙ্গমঞ্চ ও নাটক

কেহ কেহ মনে করেন, রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্ক না থাকিলে কেহ নাটক রচনা করিতে পারেন না—এইজন্য বহু উচ্চাঙ্গ নাট্যকারের প্রতিভা বিকাশলাভ করিবার সুযোগ পায় নাই। কারণ, মঞ্চাভিনয়ের ভিতর দিয়াই নাটকের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহারা ইংরেজি

সাহিত্যে সেক্সপীয়র এবং বাংলা সাহিত্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষের কথা উল্লেখ করিয়া থাকেন। এই দুইজন নাট্যকারই রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কের ফলেই নাটক রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, এই সম্পর্কের সুযোগ না থাকিলে আজ তাঁহাদিগকে কেহই চিনিতে পারিত কি না সন্দেহ।

অভিনয় নাটকের একটি প্রধান লক্ষ্য হইলেও, ইহা যে একমাত্র লক্ষ্য তাহা বলিতে পারা যায় না। সংস্কৃত নাটক কোনদিন কোথাও অভিনীত হইয়াছিল কি না, তাহা জানিতে পারা যায় না; সম্ভবত অধিকাংশ নাটকই অভিনীত হয় নাই,—পাঠ্য রূপেই শিক্ষিত সমাজের মনোরঞ্জন করিয়াছে। অথচ সংস্কৃত নাটক শত শত বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। বাংলা নাটকের সম্পর্কে সংস্কৃত নাটকের কথা বাদ দিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, আধুনিক ইউরোপীয় নাটকে দৃশ্যগুণ অপেক্ষা পাঠ্যগুণই অধিকতর বর্ধিত হইয়াছে। ইব্‌সেনের *A Doll's House*, মেটারলিঙ্কের *Blue Bird* কিংবা গল্‌স্‌ওয়ার্দি ও বার্নার্ড শ'র কোন নাটকেরই আমরা অভিনয় না দেখিয়াও ইহাদের অন্তর্নিহিত রস উপলব্ধি করিতে পারি। এমন কি, আপাতদৃষ্টিতে দৃশ্যগুণ-প্রধান সেক্সপীয়রের নাটকগুলিও বাঙ্গালী পাঠকগণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত না দেখিয়াও তাহাদের রস এবং সৌন্দর্য উপলব্ধি করিয়া আসিতেছেন। অতএব যথার্থ শিল্পগুণ নাটকের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইলে কেবলমাত্র পাঠ্যরূপেও তাহা রসিকমনকে আনন্দ দিতে পারে। সুতরাং রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ব্যতীত কেহই নাটক রচনার প্রেরণা অনুভব করিতে পারেন না—এরূপ ধারণার কোন সঙ্গত কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ আধুনিক Reading Drama বা Literary Dramaর সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের কোন সম্পর্কই নাই। সে কথা পরে উল্লেখ করিয়াছি। এই শ্রেণীর কয়েকখানি নাটক রচনায় রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব দক্ষতা দেখাইয়াছেন। অতএব রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে নাটকের সম্পর্ক আজকাল গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। তবে একথা সত্য, এমন একদিন ছিল, যখন রঙ্গমঞ্চের সহায়তা ব্যতীত কেবলমাত্র পাঠ্যরূপে নাটক কদাচ প্রচার লাভ করিতে পারিত না; অতএব নাট্যকারেরও যশোলাভ করা কঠিন হইত। বেলগাছিয়া নাট্যশালার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল বলিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাট্য-প্রতিভার বিকাশ সম্ভব হইয়াছিল, কলিকাতায় সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকিলে নাট্যকাররূপে গিরিশচন্দ্রেরও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইত কি না সন্দেহ। কিন্তু

আধুনিক নাটকের দৃশ্যগুণ অপেক্ষা পাঠ্যগুণ বৃদ্ধি পাইবার ফলে রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সম্পর্ক ব্যতীতও কাহারও নাট্য-প্রতিভা বিকাশের বাধা হইবার কথা নহে। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের নাট্য-প্রতিভা বিকাশের পথে কোন অন্তরায় হয় নাই।

একশত বৎসরের অধিক কালের সাধনায়ও বাংলা সাহিত্যে যে এ পর্যন্ত একখানিও সার্থক নাটক রচিত হইতে পারে নাই, তাহার মূলে যে সকল কারণ আছে বলিয়া অনুমান করা যায়, তাহাদের সঙ্গে বাংলার রঙ্গমঞ্চও কোনদিক দিয়া জড়িত কি না, তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। রঙ্গমঞ্চের একটি বিশিষ্ট আদর্শ যখন সমাজের সম্মুখে স্থির হইয়া যায়, তখন প্রধানত তাহা কেন্দ্র করিয়াই নাটক রচিত হইবার ফলে ইহার স্বাধীন বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি হয়। ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে'র আদর্শ যখন প্রাচীন ভারতের বিদগ্ধ সমাজের সম্মুখে নাটক রচনার একটি ধারা সুনির্দিষ্ট করিয়া দিল, তখন হইতেই সংস্কৃত নাটক রচনার মধ্যে বৈচিত্র্যহীনতা দেখা দিল; তাহার ফলে ইহার অধঃপতনও আসন্ন হইয়া আসিল। বাংলা দেশে সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার পর হইতে দীর্ঘকাল যে ভাবে বাংলা নাটক একান্ত মঞ্চাশ্রয়ী হইয়া ছিল, তাহার ফল বাংলা নাটকের পক্ষে যে নিতান্ত শুভ হইয়াছে, তাহা ত মনে হয় না। বিষয়টি একটু বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন।

একমাত্র মাইকেল মধুসূদন দত্ত ব্যতীত বাংলা নাট্যসাহিত্যের আদি যুগে আর কোনও নাট্যকার মঞ্চনির্ভর নাটক রচনা করেন নাই। রামনারায়ণ তর্করত্নের নাটক অভিনীত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তিনি সৌখীন কিংবা ব্যবসায়ী কোনও রঙ্গমঞ্চ লক্ষ্য করিয়া তাঁহার কোনও নাটকই রচনা করেন নাই। দীনবন্ধু মিত্রের কোন নাটকই বিশেষ কোনও রঙ্গমঞ্চ লক্ষ্য করিয়া রচিত হয় নাই। বরং তাঁহার নাটক লইয়াই সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সূত্রপাত হইয়াছিল।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রত্যেকটি নাটকই বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হইবার উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে, ইহার মঞ্চব্যবস্থা দ্বারা তাঁহার প্রত্যেকটি রচনা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। তৎকালীন এই সৌখীন রঙ্গমঞ্চটি মধুসূদনের নাটক রচনা যে কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল, তাহা তাঁহার জীবনী পাঠ করিলেই জানিতে পারা যায়। প্রথমত বেলগাছিয়া নাট্যশালায়

যখন 'রত্নাবলী' নাটকের অনুবাদের অভিনয় হইতেছিল, সেই সময়ই মধুসূদন তাঁহার বাংলা নাটক রচনার প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সেই প্রেরণার স্বাধীন বিকাশ যে কি ভাবে ব্যাহত হইয়াছিল, তাহা একটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

বেলগাছিয়া নাট্যশালায় একজন শক্তিশালী অভিনেতা ছিলেন, তাঁহার নাম কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁহার অভিনয়-গুণের উপর নাট্যশালার প্রতিষ্ঠাতাদিগের অগাধ বিশ্বাস ছিল এবং এই নাট্যশালায় অভিনীত হইবার উদ্দেশ্যে রচিত প্রত্যেক নাটকই তাঁহার মুখাপেক্ষী রচনা ছিল। মধুসূদন যখন বেলগাছিয়া নাট্যশালার জন্য নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাঁহারই পরামর্শ গ্রহণ করিয়া দৃশ্যের পর দৃশ্য রচনা করিতে লাগিলেন। কারণ, মধুসূদন বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হইবার উদ্দেশ্যেই তাঁহার নাটক রচনা করিয়াছিলেন এবং যাহাতে শেষ পর্যন্ত তাঁহার নাটকের অভিনীত হইবার পক্ষে কোন বাধা সৃষ্টি না হয়, প্রথম হইতেই তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতেছিলেন। এ সম্পর্কে মধুসূদনের জীবনী-লেখক লিখিয়াছেন, " 'শর্মিষ্ঠা' ও 'একেই কি বলে সভ্যতা' রচনার সময়ে তিনি, অনেক স্থলে, কেশববাবুর পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। নূতন নাটক রচনার সংকল্প হৃদয়ে উদিত হইলে মধুসূদন প্রথমে মহাভারতীয় সুভদ্রা-উপাখ্যান অমিত্রচ্ছন্দে লিখিয়া তাহা কেশববাবুকে দেখিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু, কাব্যাংশে সুন্দর হইলেও, তাহা অভিনয়ের উপযোগী হইবে না, কেশববাবু সুভদ্রা নাটক সম্পর্কে এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। মধুসূদন ইহার পর সম্রাট্ আলতামাসের দুহিতা, সুলতানা রিজিয়ার চরিত্র অবলম্বনে আর একখানি নাটক আরম্ভ করিয়া তাহার সংক্ষিপ্ত আদর্শ কেশববাবুকে এবং মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহকে দেখাইবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু মুসলমান-চরিত্র অবলম্বনে রচিত নাটক সাধারণ হিন্দু দর্শকের প্রীতিকর হইবে না ভাবিয়া রিজিয়া সম্বন্ধেও তাঁহারা কেহই উৎসাহ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। রিজিয়ার পরিবর্তে কোন হিন্দু ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে নাটক রচনা করিলে তাহা অধিকতর আদরণীয় হইবার সম্ভাবনা, তাঁহারা মধুসূদনকে এইরূপ পরামর্শ দিয়াছিলেন।"

সুতরাং মধুসূদনের মত শক্তিশালী ব্যক্তিও তাঁহার নাটক রচনায় স্বাধীন প্রতিভা বিকাশের পরিবর্তে রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালকদিগের পরামর্শ

গ্রহণ করিয়া নাটক রচনা করিয়াছেন। 'রিজিয়া' নাটকের পরিকল্পনা করিবার সময় মধুসূদন নিজে যথার্থই উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, 'We ought to take up Indo-Mussulman subjects. The Muhammadans are a fiercer race than ourselves and would afford splendid opportunity for the display of passion. Their women are more cut out for intrigue than ours.' কিন্তু এই বিষয়টিতে তিনি রূপদান করিতে পারেন নাই।

মধুসূদনকে তাঁহার পৃষ্ঠপোষকগণ এই বিষয় অবলম্বন করিয়া নাটক রচনা করিতে না দিলেও পরবর্তী কালে এই বিষয় লইয়া বাংলায় নাটক রচনা করিয়া কয়েকজন নাট্যকার যে জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন, একথা বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসের পাঠকমাত্রই জানেন। অতএব দেখা গেল, নাটক যে অনেক সময় রচনার দিক দিয়া ব্যর্থ হয়, তাহা কেবলমাত্র নাট্যকারের ত্রুটির জন্যই নহে, সমসাময়িক রঙ্গমঞ্চ ব্যবস্থার জন্যও তাহা হইয়া থাকে। নাটক রচনার শিল্পগুণ মধুসূদনের আয়ত্ত ছিল, পাশ্চাত্ত্য নাট্যসাহিত্যে অধিকার তাঁহার মত আর কাহারও সে যুগে ছিল না; বিশেষত যিনি কাব্য-রচনার ক্ষেত্রে সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার মধ্যে জীবনবোধেরও যে অভাব ছিল, তাহাও বলিবার উপায় নাই; অথচ তাঁহার নাট্যরচনা যে প্রথম শ্রেণীর সার্থকতা লাভ করিতে পারিল না, ইহার জন্য তিনি নিজেই যে দায়ী নহেন, এ কথাও ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। অতএব যখন নাটক রঙ্গমঞ্চের অধীন হইয়া পড়ে, রঙ্গমঞ্চ নাটকের অধীন হয় না, তখন যে নাটকের মধ্যে ত্রুটি দেখা দিবে, ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসেও এমন একটি যুগ আসিয়া পড়িয়াছিল, যখন নাট্যরচনা রঙ্গমঞ্চের আজ্ঞাবাহিনী হইয়াছিল। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই তদানীন্তন সমাজের নাট্যামোদীদিগের দৃষ্টি একান্তভাবে ইহার উপরই ন্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তখন হইতে সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণই তাঁহাদের সুনির্দিষ্ট মঞ্চব্যবস্থা অনুসরণ করিয়া নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং কেবলমাত্র সেই সকল রচনাই ইহাদের মধ্য দিয়া অভিনীত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। অভিন্ন একটি মঞ্চব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া দীর্ঘকাল যাবৎ বাংলা নাটক রচিত হইবার ফলে, ইহার মধ্যে কোনও

বৈচিত্র্য দেখা দিতে পারে নাই। এই যুগে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, রোমাণ্টিক সামাজিক বিবিধ বিষয়ক নাটক রচিত হইলেও ইহাদের বহিরঙ্গগত পরিচয়ের ভিতর দিয়া পরস্পর কোনও পার্থক্যই প্রকাশ পাইতে পারে নাই। পৌরাণিক নাটকের আঙ্গিক দ্বারাই ঐতিহাসিক এবং রোমাণ্টিক নাটক রচিত হইয়াছে; সেই আঙ্গিক সামাজিক নাটকেও ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার কারণ, ইহাদের প্রত্যেকটি নাটকই সেদিন একই মঞ্চ-ব্যবস্থার অধীন ছিল, প্রায় একই অভিনেতৃগোষ্ঠী কর্তৃক অভিনীত হইত এবং প্রধানত এক শ্রেণীরই দর্শক-সমাজের সম্মুখে পরিবেশন করা হইত। সেই যুগের শেষ প্রান্তে এই ব্যবস্থার একমাত্র ব্যতিক্রম সৃষ্টি করিলেন রবীন্দ্রনাথ। যখন এদেশের নাটক কেবলমাত্র ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চ অবলম্বন করিয়া বিস্তার লাভ করিতেছিল, তখনই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অলোক-সাধারণ প্রতিভা লইয়া বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। তিনি তাঁহার নাটক রচনার ভিতর দিয়া বাংলা নাটককে সে যুগে ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চের অধীনতা-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া আনিলেন। কিন্তু কলিকাতার ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চের মধ্য দিয়া যে দর্শক-সাধারণের নাট্যবোধ পুষ্টিলাভ করিতেছিল, রবীন্দ্রনাথের নাটক তাহাদের উপর কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না। তাহার ফলে রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনার সমান্তরালবর্তী হইয়া রঙ্গ-মঞ্চাশ্রিত নাটকের ধারাও অগ্রসর হইয়া চলিল; ক্রমে এই দুইটি ধারা বাংলা নাট্যামোদীকে দুইটি পৃথক্ ভাগে বিভক্ত করিয়া দিল। রবীন্দ্রনাথ ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চ কিংবা ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোন সৌখীন রঙ্গমঞ্চের সুনির্দিষ্ট আদর্শের প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিয়া নাট্যরচনায় তাঁহার মৌলিক প্রতিভার স্বাধীন বিকাশ করিবার প্রয়াস পাইলেন এবং যখন তাঁহার রচিত নাটকগুলির রূপ রঙ্গমঞ্চের ভিতর দিয়া প্রত্যক্ষ করিতে চাহিলেন, যখন নিজেই নিজের আদর্শ অনুযায়ী রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করিয়া লইলেন। অবশ্য তাঁহার রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার আদর্শ সম্পূর্ণ তাঁহার নিজের, একথাও বলা যায় না। এ সম্পর্কে তিনি এলিজাবেথীয় রঙ্গমঞ্চের আদর্শ অনুসরণ না করিয়া এই বিষয়ক ভারতীয় ঐতিহ্যের ধারাই অনুসরণ করিলেন; সেইজন্য ইহার মধ্যে ভারতীয় রস-সংস্কৃতির ধারা অক্ষুণ্ণ রহিল। কারণ, জাতীয় ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করিয়াই জাতির রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা হয়, ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া নহে। রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত মঞ্চব্যবস্থা পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণ-জাত আধুনিক বাংলার

রঙ্গমঞ্চ অপেক্ষা অধিকতর জাতীয়-ঐতিহ্যবাহী। কিন্তু সাধারণ দর্শকের পক্ষে পাশ্চাত্ত্য বস্তুধর্মী মঞ্চরূপ অধিকতর প্রীতিকর হইল। এই বিষয়ক ভারতীয় ঐতিহ্যের ধারাটি ইতিপূর্বেই অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছিল, সাধারণ দর্শকের সঙ্গে তাহার কোনও যোগ ছিল না; সুতরাং তাহারা যখন পাশ্চাত্ত্য রঙ্গমঞ্চের জাঁকজমকপূর্ণ উপকরণগুলি চোখের সম্মুখে দেখিতে পাইল, তখন তাহারা সহজেই তাহার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রত্যেকটি নাট্যরচনার ভিতর দিয়া এই বিজাতীয় মঞ্চ-ব্যবস্থার প্রতি উপেক্ষা দেখাইয়া তাঁহার নিজস্ব পথে অগ্রসর হইয়া গেলেন। সেইজন্য বাংলা সাহিত্যে যথার্থ পাঠ্য নাটক (reading drama) বলিতে যাহা বুঝায় এবং সাহিত্যে যাহার একটি স্থায়ী মূল্য আছে, তাহাই তিনি রচনা করিলেন।

রবীন্দ্র-নাট্যসাহিত্য ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চের উপর কোনও প্রভাব স্থাপন করিতে না পারিলেও একথা সত্য যে, রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমসাময়িক কাল হইতে বাংলা নাটক রচনায় রঙ্গমঞ্চের প্রভাব কমিয়া আসিতে লাগিল। দ্বিজেন্দ্রলাল তাহার অন্যতম প্রমাণ। যদিও তাঁহার নাটকগুলি ব্যাপকভাবে ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছে, তথাপি একথা সত্য যে, তিনি মঞ্চের নির্দেশে নাটক রচনা করেন নাই; বরং মঞ্চই তাঁহার নির্দেশ অনুসরণ করিয়াছে। কিন্তু তখনও বাংলা নাটকের একটি অংশ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে জড়িত হইয়া রহিয়াছে। ক্ষীরোদপ্রসাদ, অপরেশ মুখোপাধ্যায় এবং যোগেশ চৌধুরী তাহার প্রমাণ। কিন্তু তখন হইতে ধীরে ধীরে বাংলা নাটক মঞ্চের প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

কিন্তু বিভাগোত্তর যুগ পর্যন্ত এই মুক্তি একেবারে সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। বঙ্গবিভাগের পর পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক নাটক রচনার রীতির সম্পূর্ণ অবসান হইয়াছে; একান্ত বাস্তব জীবনাশ্রয়ী নাটক রচনার সূচনা দেখা দিয়াছে; ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চের সুনির্দিষ্ট গণ্ডি অতিক্রম করিয়া স্বাধীন-ভাবে একাধিক শক্তিশালী সৌখীন রঙ্গমঞ্চ গড়িয়া উঠিয়াছে। মনে হয়, ইহাদের মধ্য হইতেই ভবিষ্যতে একদিন সার্থক বাংলা নাটকের আবির্ভাব হইবে।

॥ ৬ ॥ সাময়িক সমস্যা ও নাটক

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতেই ইংরেজি নাট্যসাহিত্যে সমাজের অর্থনৈতিক সমস্যাকে ভিত্তি করিয়া নাটক রচনার প্রয়াস দেখা দিয়াছে। গলস্‌ওয়ার্দি এবং বার্নার্ড শ' উভয়েই এই বিষয় অবলম্বন করিয়া নাটক রচনায় যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিতে পারা যায় না। আধুনিক বাঙ্গালীর জীবনে বর্তমানে যে সকল অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়াছে, তাহাকে ভিত্তি করিয়া বাংলা নাটক রচিত হইতে পারে কি না, তাহাও গভীর ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। পূর্বেই বলিয়াছি, আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জীবন একান্ত বস্তুনিষ্ঠ (materialistic)। অতএব অর্থনৈতিক সমস্যা তাহার জীবনের একটি অতি গুরুতর এবং অপরিহার্য সমস্যা। ইহা দ্বারা তাহার জীবনের ব্যষ্টি ও সমষ্টির সকল ব্যবহারিক সুখদুঃখ নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে—অর্থনৈতিক সমতা (equilibrium) সৃষ্টিই আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সমাজভুক্ত নারী ও পুরুষের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। আধুনিক ইংরেজ সমাজ ক্রমাগতই যান্ত্রিক সভ্যতার দিকে আকৃষ্ট হইবার ফলে, সমাজে বেকার এবং তদনুষঙ্গিক অন্যান্য যে সকল সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাই এক দিক দিয়া সমগ্র জাতির জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে—অতএব গলস্‌ওয়ার্দি এবং বার্নার্ড শ'র মত আধুনিক নাট্যকারগণ তাঁহাদের রচনায় এই সকল বিষয় কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, অর্থনৈতিক সমস্যার মত একটা সাময়িক বিষয় উচ্চতর নাট্যরচনার উপজীব্য না হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল ; কারণ, ইহার সর্বকালীন আবেদন নাই। সেইজন্য সাহিত্যে ইহা চিরত্ব লাভ করিতে পারে না। কিন্তু যেখানে একান্তভাবে যন্ত্রাশ্রয়ী সমাজ একমাত্র অর্থনৈতিক বনিয়াদের উপরই নিজেকে প্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়াছে, সেখানে অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে পরিত্যাগ করিয়াও প্রকৃত কোন জাতীয় নাটক রচিত হইতে পারে না। মধ্যযুগের পাশ্চাত্ত্য সমাজে ধর্ম ও নীতির যে স্থান ছিল, আজ সেখানে অর্থনীতি তাহা অধিকার করিয়াছে ; আজ ধর্ম ও নীতির আদর্শ তথায় শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। সেইজন্য পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে আজ অর্থনৈতিক সমস্যার উপরও সার্থক নাটক রচিত হইয়াছে।

বাংলা দেশের সমাজও আধুনিক নাগরিক সভ্যতার প্রভাববশত এই যান্ত্রিক সভ্যতার দিকে ক্রমে ক্রমে আকৃষ্ট হইতেছে। তাহার ফলে, তাহার

মধ্যেও যন্ত্রশাসিত পাশ্চাত্ত্য সমাজ-জীবনের অনুরূপ সমস্যার উদ্ভব হইতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু একথা সত্য যে, এই সমস্যা এদেশের সমাজে এখনও পাশ্চাত্ত্য সমাজের আকার লাভ করে নাই। অতএব অর্থনৈতিক সমস্যা এখনও বাংলা নাটকের অপরিহার্য উপজীব্য হইয়া উঠিতে পারে না। 'বিশেষত নাগরিক সভ্যতার ক্রম-বিস্তৃতি সত্ত্বেও এখন এদেশের সমাজ নিজস্ব জাতীয় আদর্শের প্রতি বিমুখ হইয়া যায় নাই; এখনও ধর্ম, নীতি এবং আচার এই জাতির ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনকে প্রত্যক্ষভাবে শাসন করিতেছে। তবে যেদিন পাশ্চাত্ত্য সমাজের মত বাংলার সমাজেও এই সকল সামাজিক আদর্শ শিথিল হইয়া পড়িয়া একমাত্র অর্থনৈতিক সমস্যাই জাতির জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবে, সেইদিন অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তিতেও উচ্চতর বাংলা নাটক রচিত হইতে পারিবে, তাহার পূর্বে তাহা সম্ভব হইবে না।

॥ ৭ ॥ হৃদয়াবেগ ও ধর্মবোধ

বাঙ্গালী চরিত্রের অতিরিক্ত ভাবাবেগ-প্রবণতা (sentimentalism) তাহার সাহিত্যে সার্থক নাটক রচনার পক্ষে একটি বাধা হইয়া রহিয়াছে। কারণ, ভাবাবেগ-প্রবণতার উপর ভিত্তি করিয়া যে জিনিসের সৃষ্টি হয়, তাহা নাটক নহে, ইংরেজিতে তাহাকে melo-drama বলে, বাংলায় তাহাকে অতি-নাটক বলা যাইতে পারে। সঙ্গত এবং স্বাভাবিক ঘটনা-প্রবাহের সহিত মানবিক দৌর্বল্যের সংমিশ্রণেই যথার্থ নাটক রচিত হইতে পারে; যেখানে মানবিক দৌর্বল্যসমূহ অসঙ্গত এবং অস্বাভাবিক ঘটনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, সেখানেই নাটকের পরিবর্তে অতি-নাটকের (melo-drama) সৃষ্টি হয়। অলৌকিকতা-বিশ্বাসী অদৃষ্টবাদী বাঙ্গালীর মধ্যে সঙ্গত এবং স্বাভাবিক ঘটনার প্রতি যে আন্তরিকতা থাকিতে পারে না, তাহা অনুমান করিতে বেগ পাইতে হয় না। এ দেশে ন্যায়শাস্ত্র টোলে পঠিত হয় সত্য, কিন্তু টোলের বাহিরে যে বিস্তৃত জনসাধারণের পাঠশালা আছে, তাহাতে 'অ-ন্যায়ে'র সূত্র নিত্য ব্যাখ্যাত হইতেছে। 'বিশ্বাসে লভয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর'—এই যুক্তিকে ভিত্তি করিয়া বাঙ্গালীর যে ধর্ম এবং চিন্তার ধারা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতে ন্যায়-সূত্র শুষ্ক তৃণের মত ভাসিয়া গিয়াছে। অতএব ঘটনার দিক দিয়া অসঙ্গতি এবং অস্বাভাবিকতাবোধ এদেশের সংস্কৃতিতে প্রায় মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে।

তাহার সঙ্গে আসিয়া যোগ দিয়াছে এই জাতির অতিরিক্ত রোমান্স-বিলাসিতা। সুতরাং ঘটনার সঙ্গতি এবং স্বাভাবিকতা যে ইহাতে একান্ত গৌণ হইয়া পড়িবে, তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। অতএব বাংলা সাহিত্যে যত অতি-নাটক সৃষ্টি হইয়াছে, তত নাটক সৃষ্টি হয় নাই।

কেহ কেহ মনে করেন, আবেগ-প্রবণ জাতি বলিয়া বাঙ্গালীর সাহিত্যে সার্থক ট্র্যাজিডির সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। এই সম্পর্কে সেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট' নাটকটির কথা সহজেই স্মরণ হইতে পারে। আবেগ-প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার কৌশল জানা না থাকিলে ইহা দ্বারা দানবই সৃষ্টি হইতে পারে, মানব সৃষ্টি হইতে পারে না। এই কৌশল একটি অতি উচ্চাঙ্গের শিল্পকৌশল; বাংলা সাহিত্যে প্রায় কেহই এই কৌশল আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। ইহার জন্য বাঙ্গালীর চরিত্রও কতকটা দায়ী।

কিন্তু তথাপি বাঙ্গালীর জীবনে যথার্থ নাটকীয় উপাদানের অভাব আছে, এমন কথা বলিতে পারা যায় না। যে জাতির জীবন-দৃষ্টি কিংবা সমাজ-ব্যবস্থা যেমনই হউক, তাহার নিজস্ব দৃষ্টিকোণ হইতে সুগভীর অভিনিবেশের সঙ্গে তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে, তাহার ভিতর হইতেও যথার্থ নাট্যিক উপাদান সন্ধান করা যাইতে পারে। তবে একথা সত্য যে, এই সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিভঙ্গি সর্বত্র আরোপ করা চলে না—বাংলা নাটকের মূল্য বিচার করিতে গিয়া এখানেই আমরা একটা মৌলিক ভুল করিয়া থাকি। বাংলার নারীজীবনের আত্মস্ফূর্তির মূলে যে সকল সামাজিক বাধা-বিপত্তির কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা সত্ত্বেও ইহার আত্মবিকাশের একটি সুগভীর ক্ষেত্র আছে—তাহা তাহার অন্তরের অন্তস্তলে অবস্থিত; সমাজের উপরের দিক দিয়া তাহার কোন প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া দেখিতে পাওয়া না গেলেও, তাহার সেই গভীরতম স্তরে ইহা সর্বদা আন্দোলিত হইতেছে। কারণ, মানুষের মন উপরের দিক হইতে আত্মবিকাশের পথে বাধাপ্রাপ্ত হইলে, তাহা অন্তরের গভীরতর স্তরে আপনার পথ খুঁজিয়া লয়, ইহা কদাচ নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিতে পারে না। সামাজিক মানবের সুখদুঃখ সর্বদাই আপেক্ষিক, অতএব নর-নারীর মনের এই প্রচ্ছন্ন সুখদুঃখের আন্দোলনও বাহ্য ঘটনার অধীন। এই সকল ঘটনা সূক্ষ্ম অনুভূতি-সাপেক্ষ, দৃষ্টি-সাপেক্ষ নহে; অতএব সুগভীর অভিনিবেশ দ্বারা সামাজিক চরিত্রসমূহ প্রত্যক্ষ করিয়া ইহাদের সূক্ষ্ম কার্য ও চিন্তার ধারা অনুসরণ করিতে পারিলে, ইহাদের মধ্য হইতেও আধুনিক

নাটকের উপাদান সংগৃহীত হইতে পারে। কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, আধুনিক নাটক বাহ্যিক ক্রিয়া (action)-প্রধান নহে, বরং মানসিক বিশ্লেষণ-প্রধান এবং শেষোক্ত শ্রেণীর নাটক রচিত হইবার পক্ষে বাঙ্গালী-জীবনে উপাদানের অভাব ত নাই-ই, বরং প্রাচুর্যই আছে বলিয়া অনুভূত হইবে। কিন্তু বাঙ্গালী নাট্যকারদিগের মধ্যে প্রাচীন আদর্শে নাটক রচনার যে প্রবল সংস্কার এখনও বর্তমান আছে, তাহার আমূল পরিবর্তন ব্যতীত সার্থক আধুনিক বাংলা নাটক রচিত হইতে পারিবে না।

একমাত্র পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষিত নাগরিক সমাজ দেখিয়া যদি বাংলার সমাজের বিচার না করি, তবে বুঝিতে পারিব, বৃহত্তর বাংলার সমাজ এখনও ধর্মীয় ভিত্তির উপরই দাঁড়াইয়া আছে। এযাবৎকাল এই ধর্মীয় জীবনের মধ্যে কিংবা ধর্ম-বোধের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব ছিল না বলিয়াই ধর্ম-সম্পর্কিত বিষয়-বস্তু অবলম্বন করিয়া আমাদের দেশে যাত্রাই রচিত হইয়াছে, নাটক রচিত হয় নাই। কিন্তু বিগত উনবিংশ শতাব্দী হইতেই আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিবার ফলে বাংলার পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষিত সমাজের মধ্যে যে আত্মবোধের জন্ম হইয়াছে, তাহার সঙ্গে তাহার এই ধর্মবোধের সংঘাত উপস্থিত হইয়াছে। এই সংঘাত উচ্চাঙ্গ ট্র্যাজিডির ভিত্তিরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে কি না, তাহা বিবেচনার বিষয়। এই দিকে কোন কোন নাট্যকার যে প্রয়াস না পাইয়াছেন, তাহাও নহে ; কিন্তু তাঁহাদের প্রয়াস যে সার্থক হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। কারণ, এই বিষয়ে এখনও একটি বাধা আছে ; তাহা এই যে, আত্মবোধের শক্তি যতই প্রবল হউক, এই দেশে এখনও তাহাকে ধর্মবোধের উপরে স্থান দিবার উপায় নাই, শেষ পর্যন্ত ধর্মবোধকেই জয়ী করিতে হয়। অতএব ইহাও বাধ্য হইয়া একই বাঁধাধরা পথ অনুসরণ করিয়া বৈচিত্র্যহীনতার সৃষ্টি করে।

এই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও, এই পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে যে নাটক রচিত হইয়াছে, সংখ্যার দিক দিয়া তাহা যেমন বিপুল, বৈচিত্র্যের দিক দিয়াও তাহা তেমনই সমৃদ্ধ। ইহা বাঙ্গালীর সামাজিক এবং পারিবারিক জীবন, নীতি, ধর্ম ও রসবোধ, ইতিহাস প্রভৃতি অবলম্বন করিয়াই যে প্রধানত রচিত হইয়াছে, তাহাও কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ইউরোপীয় আদর্শে উচ্চ শিল্পগুণ ইহাদের মধ্য দিয়া প্রকাশ পায় নাই সত্য, তথাপি ইহা বাঙ্গালী-জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং স্বপ্নকে রূপ দিবার প্রয়াস

পাইয়াছে। ইহাদের শিল্পগত ত্রুটি যাহাই থাকুক, বাঙ্গালী ইহাদিগকে গ্রহণ করে নাই, তাহাও বলিতে পারা যায় না। কারণ, এক শত বৎসর যাবৎ সাহিত্য ও রঙ্গমঞ্চের ভিতর দিয়া বাঙ্গালী ইহাদের সঙ্গে পরিচয় রক্ষা করিয়া আসিতেছে। অতএব ইহাই বাঙ্গালীর নাটক। যাঁহারা বাংলা সাহিত্যে নাটক নাই বলিয়া পরিতাপ করিয়া থাকেন, তাঁহারা ইউরোপীয় আদর্শে নিজেদের মতামত গঠন করিয়া লইয়া, তাহার তিলমাত্র ব্যতিক্রম সহ্য করিতে না পারিলেও, সহস্র সহস্র সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক ও দর্শক যে এই নাটকই পাঠ ও দর্শন করিয়া আজ এক শত বৎসর যাবৎ আনন্দ ও বেদনা লাভ করিতেছে, তাহা উপেক্ষা করিতে পারেন কেমন করিয়া? অতএব আজ শতবর্ষের সাধনার ফলে যে নাটক আমরা পাইয়াছি, তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই বাঙ্গালীর নাট্যপ্রতিভার বিশ্লেষণ করিতে হইবে। ইউরোপীয় আদর্শে বাংলার সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের পুনর্গঠনের ফলে ভবিষ্যতে বাংলা নাটক কি রূপ লাভ করিবে, তাহা এখন হইতে অনুমান করিবার উপায় নাই; অতএব এযাবৎ বাঙ্গালী নাট্যকারের সাধনার ফলশ্রুতিরূপে আমরা নাটক বলিয়া যাহা লাভ করিয়াছি, তাহা দ্বারাই বাংলা নাট্যরচনার আদর্শ স্থির করিতে হইবে। যাহা হয় নাই, তাহার জন্য পরিতাপ করিয়া, যাহা হইয়াছে তাহা কি করিয়া উপেক্ষা করা সঙ্গত হয়?

॥ ৮ ॥ সাম্প্রতিক নাটক

আধুনিক বাংলা নাটক-রচনার প্রথম যুগে ইহার মধ্যে যে কোন কোন ক্ষেত্রে বাস্তব জীবন-বোধের বিকাশ দেখা গিয়াছিল, তাহা ক্রমবিকাশের সূত্র ধরিয়া যদি সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিতে পারিত, তবে বাংলা নাট্য-সাহিত্য আজ স্বতন্ত্র পরিচয় লাভ করিত। পূর্বেই বলিয়াছি, ইহার প্রথম যুগ অবসান হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কলিকাতায় যে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা হইল, তাহাই তখন হইতে বাংলা নাটক-রচনা নিয়ন্ত্রিত করিতে লাগিল। তাহার ফলেই বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য বিষয় যেমন স্বাধীনভাবে বিকাশ লাভ করিতেছিল, বাংলা নাটকের পক্ষে তাহা সম্ভব হইল না। ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চগুলি বাংলা নাটক-রচনা নিয়ন্ত্রিত করিবার ফলে ইহার মধ্যে অল্পদিনের মধ্যেই বৈচিত্র্যের অভাব দেখা দিল। সে-যুগে পুরাণ, নানা রোমান্টিক কাহিনী এবং ইতিহাস ইহার ভিত্তি হইল, বাঙ্গালীর

প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব জীবনের কোনও পরিচয় তাহার মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারিল না। একথা সত্য, বাংলা নাটক-রচনার মধ্যযুগে সামাজিক নাটকও রচিত হইয়াছিল, কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকটিই আদর্শমূলক ছিল, বাস্তব সত্যমূলক ছিল না। বিশেষত যাঁহারা পৌরাণিক, রোমান্টিক এবং ঐতিহাসিক নাটক-রচনার মধ্যে মধ্যে দুই একখানি সামাজিক নাটক রচনা করিতেন, তাঁহারা সামাজিক নাটক-রচনায়ও পৌরাণিক, রোমান্টিক এবং ঐতিহাসিক নাটক-রচনার সংস্কার এবং আঙ্গিক পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। তাহার ফলে তাঁহাদের সামাজিক নাটক বাংলার সমাজ-জীবনের বাস্তব পরিচয় প্রকাশ করিতে পারিত না। বাংলায় এ-পর্যন্ত যে উচ্চাঙ্গের নাটক রচিত হইতে পারে নাই, ইহার প্রধান কারণই এই যে, বাংলা কথা-সাহিত্য অর্থাৎ উপন্যাস এবং ছোট গল্প যে বাস্তব-জীবনানুগ, বাংলা নাটক তেমন নহে। সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি।

বাংলা কথাসাহিত্যের দৃষ্টান্ত হইতেই দেখা যায় যে, বাঙ্গালীর সুনিবিড় পারিবারিক জীবনের ভিত্তির উপর যাহাই রচিত হইয়াছে, তাহাই সার্থকতা লাভ করিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য জাতির মত বাঙ্গালী পুরুষের বহির্মুখী জীবন বলিতে কিছু নাই বলিলেই চলে। বাঙ্গালীর যে জীবন একান্ত পরিবার-কেন্দ্রিক তাহার মধ্যেই বাংলা বস্তুধর্মী সাহিত্যের যথার্থ রস এবং মাধুর্যের বিকাশ দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প এবং শরৎচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসগুলিই তাহার প্রমাণ। বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনের মধ্যে নারীর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে; সেইজন্য বাংলার সার্থক সামাজিক উপন্যাস মাত্রই স্ত্রী-চরিত্র-প্রধান। শরৎচন্দ্রের মধ্যে যে স্ত্রী-চরিত্র প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, ইহার অর্থ যদি এই হয় যে, তিনি স্ত্রীজাতি সম্পর্কে বিশেষ দরদ প্রকাশ করিয়াছেন, তবে সাহিত্য হিসাবে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের কোন মূল্য নাই; কিন্তু শরৎ-সাহিত্য যে অমূল্য তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। সুতরাং ইহার কারণ এই যে, শরৎচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসে বাঙ্গালী নারীর যথার্থ স্থানটি নির্দেশ করিতে পারিয়াছেন। বাংলার কথাসাহিত্য স্ত্রী-চরিত্র-প্রধান; বাংলা নাটকও যদি যথার্থই বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবন-চিত্র সার্থকভাবে রূপায়িত করিবার প্রয়াস পাইত, তবে তাহাতে স্ত্রী-চরিত্রকে প্রাধান্য দিতে হইত। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে নারায়ণী এবং দিগম্বরী রাম-শ্যামকে নিষ্প্রভ করিয়া দিয়া নিজেদের ব্যক্তিত্বে ভাস্বর হইয়া বিরাজ যেমন

করিতেছে, বাংলার কোনও নাটকে এই প্রকার স্ত্রী-চরিত্র প্রাধান্য লাভ করিতে দেখা যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দী হইতেই নাটক সম্পর্কে আমাদের একটা সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে—নাটক হইলেই যুদ্ধ, ষড়যন্ত্র, দুঃসাহসিক কর্ম, আকস্মিক দুর্ঘটনা ইত্যাদি তাহাতে স্থান পাইতে হইবে। অথচ স্ত্রী-চরিত্র-প্রধান বাঙ্গালীর পারিবারিক কিংবা সামাজিক জীবনে এই সকল ঘটনার স্থান নিতান্ত সীমাবদ্ধ। সেইজন্য এযাবৎ বাংলা নাটকের মধ্যে বাঙ্গালীর জীবন যেমন পূর্ণাঙ্গ বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই, তেমনই ইহার বস্তুধর্মিতাও রক্ষা পায় নাই। বলা বাহুল্য, আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের মধ্যে এই সকল অবাস্তব পরিকল্পনা স্থান পায় নাই বলিয়াই ইহার মধ্যে সাহিত্য-সৃষ্টির সার্থকতা সর্বাধিক দেখা দিয়াছে।

প্রথম দিকের কয়েকটি রচনা বাদ দিলে, স্বাধীনতালাভের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা নাটক বাঙ্গালী-জীবনের সঙ্গে কোনপ্রকার যোগ রক্ষা না করিয়াই রচিত হইয়া আসিয়াছে। তাহার ফল এই হইয়াছে যে, রঙ্গমঞ্চের মধ্যে ইহা সাময়িকভাবে যে উত্তেজনাই সৃষ্টি করুক না কেন, ইহা দ্বারা বাংলা নাট্যসাহিত্যের পরিপুষ্টি হয় নাই। কিন্তু স্বাধীনতা-লাভের পর অর্থাৎ বিভাগোত্তর যুগেই এই অবস্থার অকস্মাৎ পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। এই যুগে পৌরাণিক কিংবা অবাস্তব কল্পনাশ্রয়ী রোমান্টিক নাটক একেবারেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অথচ বিগত শতাব্দীর শেষভাগে পৌরাণিক এবং ভক্তি-মূলক নাটকই বাঙ্গালী দর্শকের নিকট সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। সর্বপ্রথম স্বদেশী আন্দোলনের যুগেই এই ধারাটি ব্যাহত হয়, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহা কোনমতে আরও কিছুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল। একদিন পৌরাণিক নাটক-রচনার ভিতর দিয়াই বাংলার একজন সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নাট্যকারের প্রতিভার বিকাশ হইয়াছিল, কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতেই বাঙ্গালী যে এক প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সম্মুখীন হইল, তাহার ফলেই তাহার মন হইতে সকল অবাস্তব কল্পনা দূর হইয়া গেল। ইহার পর হইতে পৌরাণিক নাটক আর ভক্তি কিংবা ধর্মবোধ প্রচারের বাহন হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারিল না, বরং অনেক সময় রাজনৈতিক চৈতন্যের বাহন-স্বরূপ হইয়া রহিল। কিন্তু তাহাও বিভাগোত্তর যুগে সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া গেল। বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যযুগে বাঙ্গালী যে বিষয়-বস্তু ভিত্তি করিয়া তাহার নাট্য-রচনাকে নানা দিক দিয়া স্ফীতকায় করিয়া

তুলিয়াছিল, তাহা বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আসিয়া বাংলার নাট্য-রচনার ক্ষেত্র হইতে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। ইহার একটি সুফল এই হইল যে, বাঙ্গালী নাট্যকারের যে দৃষ্টি একদিন অবাস্তব কল্পনাশ্রয়ী হইবার ফলে নাটক-রচনার অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা তখন দূর হইয়া গেল। সুতরাং বাংলার নাটক-রচনার একটি প্রধান বাধা তখন আর ছিল না।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতেই এক শ্রেণীর ঐতিহাসিক রোমান্স বাঙ্গালী নাট্যকারদিগের রচনার লক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ইতিহাস গৌণ ভিত্তি-স্বরূপ মাত্র ব্যবহৃত হইত এবং তাহার উপর কল্পনার অবাধ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইত। ইহাদের প্রধানত দুইটি উদ্দেশ্য ছিল—প্রথমত, ইতিহাসের মধ্য হইতে বাঙ্গালী বীর দেশাত্মবোধক চরিত্রের অনুসন্ধান এবং দ্বিতীয়ত, হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের বাণী-প্রচার। এমন কি, ইতিহাস যাহাদিগকে যথার্থ বীর এবং দেশপ্রেমিক বলিয়া নির্দেশও করে নাই, কেবলমাত্র কল্পনার বলে এই সকল নাটকের মধ্যে তাহাদিগকেও বীর চরিত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। সেইজন্য ইহারা যেমন ইতিহাসের চরিত্রও হয় নাই, তেমনি বাস্তব মানব-চরিত্র-রূপেও বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। অথচ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক হইতে আরম্ভ করিয়া ইহার প্রায় মধ্যভাগে বঙ্গ-বিভাগের সময় পর্যন্ত এই শ্রেণীর নাটক-রচনা বাঙ্গালী নাট্যকারদিগের প্রধান লক্ষ্য ছিল। বিভাগোত্তর যুগে এই শ্রেণীর নাটক-রচনার প্রেরণা বাঙ্গালী নাট্যকারদিগের মধ্যে আকস্মিকভাবে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কারণ, স্বাধীনতা-লাভের পর ইহাদের আর কোন মূল্য নাই। একান্ত উদ্দেশ্যমূলক রচনা ছিল বলিয়া উদ্দেশ্যসিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই ইহাদের সকল মূল্য দূর হইয়া গিয়াছে। অবশ্য ইহাদের উদ্দেশ্য যে সকল দিক দিয়াই সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা নহে; কারণ, যে প্রেরণা সামগ্রিকভাবে জাতির অন্তর হইতে আসে না, নাটকের মধ্য দিয়া তাহা প্রচার করিলেই যে তাহা সমগ্র জাতি গ্রহণ করিবে, তাহাও হইতে পারে না। প্রায় অর্ধশতাব্দী যাবৎ বাঙ্গালী নাট্যকার-রচিত ঐতিহাসিক বাংলা রোমান্সগুলি হিন্দু-মুসলমানের মিলনের বাণী নানা ভাবে প্রচার করিয়াছে; এই বাণী যে জাতির অন্তরের বাণী ছিল না, ভারত-বিভাগ দ্বারাই তাহা বুঝিতে পারা গিয়াছে। সুতরাং জাতির জীবনের পক্ষে যাহা সত্য নহে, বাঙ্গালী নাট্যকারগণ প্রায় অর্ধ-শতাব্দীকাল তাহাই কীর্তন করিয়াছেন।

সুতরাং বাংলা নাটক-রচনার ব্যর্থতা এই দিক হইতেও যে আসিয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যাইতে পারে না। যাহা হউক, ভারত-বিভাগ দ্বারা হিন্দু-মুসলমানের মিলনের স্বপ্ন আকস্মিকভাবে দূর হইয়া যাইবার ফলে বাংলার নাট্যকারদিগের মধ্যে এই শ্রেণীর ঐতিহাসিক রোমান্স-রচনার ধারাও আকস্মিকভাবে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের পক্ষে স্বাধীনতা-লাভ যেমন আকস্মিক হইয়াছে, বাঙ্গালী নাট্যকারদিগের মধ্যে এই শ্রেণীর ঐতিহাসিক রোমান্স-রচনার ধারা তেমনই আকস্মিকভাবেই লুপ্ত হইয়াছে; সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই শ্রেণীর নাটক ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনের স্বার্থ অপেক্ষা একটি জাতীয় আদর্শ লক্ষ্য করিয়া রচিত হইত। সেইজন্য জাতির প্রত্যক্ষ জীবনের সঙ্গে ইহাদের কোনও যোগ ছিল না। বিভাগোত্তর যুগে এই শ্রেণীর নাটক-রচনার ধারা লুপ্ত হইয়া যাইবার সঙ্গে বাংলা নাট্য-রচনা এই একটি কৃত্রিম আদর্শের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, স্বাধীনতা-লাভের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা নাট্য-রচনা বাস্তব-জীবন-বিমুখী যে প্রধান দুইটি ধারা অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইতেছিল, তাহাদের উভয়ই বিভাগোত্তর যুগে সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যে বাস্তব-বিমুখিতা বাঙ্গালী নাট্যকারদিগকে এতকাল পর্যন্ত ভ্রান্ত পথের নির্দেশ দিয়াছে, তাহা আজ তাহাদের সম্মুখে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বিভাগোত্তর যুগ বাংলা নাটক-রচনার পক্ষে যে নানা দিক দিয়া অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইতিমধ্যেই তাহার প্রমাণ নানা দিক দিয়া প্রকাশ পাইতেছে।

অতএব দেখা গেল, বাংলা নাট্য-রচনার ক্ষেত্রে পৌরাণিক নাটক, দেশাত্মবোধমূলক নাটক, রোমান্টিক নাটক ইত্যাদি প্রত্যেকরই যুগ অবসান হইয়াছে। এযাবৎকাল এই শ্রেণীর নাটকের প্রভাব-বশতই যে বাংলা নাট্যসাহিত্য যথার্থ বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই, সে কথাও পূর্বে বলিয়াছি। সুতরাং এই সকল অন্তরায় যদি দূর হইয়া গিয়া থাকে, তবে বাংলা নাটক-রচনার এখন আর কি বাধা থাকিতে পারে?

পূর্বেই বলিয়াছি, বাঙ্গালীর সুনিবিড় পারিবারিক-জীবনভিত্তিক রচনাই কথাসাহিত্যের সার্থকতার অন্যতম কারণ হইয়াছে। বাঙ্গালীর আধুনিক উপন্যাস অপেক্ষা যে ছোট গল্প অধিকতর আকর্ষণীয় হইয়াছে, ইহার প্রধান কারণ, ছোট গল্পের পরিমিত পরিসরের মধ্যে জীবনের খণ্ডাংশের

রস-নিবিড়তা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতে পারে না। সেইজন্য কুশলী শিল্পীর সৃষ্টিতে তাহাই অনবদ্য রস-রূপ লাভ করে। উপন্যাসের মধ্যে এক একটি সামগ্রিক জীবনের পরিচয় প্রকাশ পায় বলিয়া বিস্তৃত পরিসরের মধ্যে তাহাদের নিবিড়তা রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে। জীবনের খণ্ডাংশের পরিবর্তে সামগ্রিক জীবনই নাটকের লক্ষ্য বলিয়া ইহার মধ্যেও রস-নিবিড়তা রক্ষা করা কঠিন। কিন্তু একান্তভাবে বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবন ভিত্তি করিয়া লইলে এবং এক একটি বিশিষ্ট পরিবারের বাস্তব সুখ-দুঃখের মধ্যে নাট্যকাহিনী একান্তভাবে সীমায়িত রাখিতে পারিলে ইহার রস-নিবিড়তা ক্ষুণ্ণ হইবার কথা নহে। কিন্তু সাম্প্রতিক বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবন বহির্ঘটনা দ্বারাও বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়িতেছে; বিভাগোত্তর যুগে ইহার যে জীবন-সত্য ছিল, তাহা যে আজ সত্য নাই, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলির রস-নিবিড়তা বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের একটি সুস্থির অবস্থার উপর ভিত্তি করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসগুলিও এক একটি যৌথ পরিবারের রস-পরিচয়ে সার্থকতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু বিভাগোত্তর যুগে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের সেই অনায়াস-ভোগ্য ধীরমন্থরগামী সমাজ-জীবনও যেমন আর নাই, শরৎ-চন্দ্রের সামাজিক উপন্যাস-বর্ণিত বাঙ্গালীর যৌথ পরিবারও আর দেখা যায় না। নাগরিক ও শিল্পকেন্দ্রিক জীবনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ক্রমেই আত্মকেন্দ্রিক হইয়া পড়িতেছে। সুনিবিড় পারিবারিক জীবনের ভিত্তির উপর রচিত এতকাল কথাসাহিত্যের যে সার্থকতা দেখা গিয়াছিল, তাহা আজ বিষয়ান্তর অনুসন্ধান করিয়া লইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহার ফলে সাম্প্রতিক কালে রচিত উপন্যাসের সেই সার্থকতা আর বড় দেখা যাইতেছে না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পারিবারিক জীবনও আজ যে নূতন রূপ লাভ করিয়াছে, তাহার মধ্যেও নাটকীয় উপকরণের অভাব আছে, তাহা বলিতে পারা যায় না; বরং একদিক দিয়া দেখিতে গেলে, সেই উপকরণ আরও শক্তিশালী হইয়াছে।

স্বাধীনতা-লাভের পূর্ববর্তী যুগে পারিবারিক জীবনে নারীর স্থান সীমাবদ্ধ ছিল; অবশ্য সেই নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই নারী তাহার শক্তির পরিচয় দিয়াছে। কিন্তু তথাপি তাহার কর্তব্য মাত্র জননী, জায়া ও কন্যার মধ্যেই সীমায়িত ছিল। বিভাগোত্তর যুগে নারী পরিবারের বৃহত্তর বহির্মুখী

কর্তব্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। পরিবারের জীবিকা-অর্জনের সহায়িকা-রূপে সে পিতা ও পুত্রের দায়িত্বও পালন করিতেছে। সুতরাং নাটক যদি একান্তভাবে আজ পরিবার-ভিত্তিকও হয়, তথাপি যে পারিবারিক জীবনের পরিচয় আমরা রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে পাইয়াছি, সেই পরিবারের পরিচয় সাম্প্রতিক কালের নাটকে পাইতে পারি না। জননী, জায়া ও কন্যা-রূপে নারীর প্রাধান্য কেবলমাত্র তাহার পরিবারের মধ্যে, কিন্তু সাম্প্রতিক কালে তাহার যে পরিচয় প্রকাশ পাইতেছে, তাহা তাহাকে পারিবারিক জীবনের বাহিরে লইয়া গিয়াও কঠিনতর সংগ্রামে লিপ্ত করিতেছে। যৌথ-পরিবার-প্রথা ভাঙ্গিয়া পড়িবার ফলে এবং নারীকে জীবিকার অন্বেষণে অন্তঃপুর ত্যাগ করিয়া বহির্জগতে কর্মের সন্ধানে বাহির হইবার জন্য বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনের নিবিড়তা বিনষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছে; সেইজন্য আমাদের দেশের সনাতন আদর্শ অনুসরণ করিয়া পরিবার-ভিত্তিক নাটক রচিত হওয়া আজ আর সম্ভব হইতেছে না। নারী-চরিত্রের মধ্যে যে গুণটি আজ বিকাশ লাভ করিতেছে, তাহা পুরুষের গুণ—নারীর যে বিশিষ্ট গুণ তাহার স্নেহ, প্রীতি, মায়া, মমতা ও চরিত্র-মাধুর্যের মধ্যে সীমায়িত, বহির্জগতে জীবিকা-সন্ধানী নারীর মধ্যে সেই সকল গুণ বিকাশ লাভ করিবার সুযোগ পাইতে পারে না। বাংলার যৌথ-পরিবারভুক্ত নারীর মধ্যে সহানুভূতি, সহযোগিতা, স্বার্থত্যাগ, সেবা ও ভক্তির যে সকল গুণ স্বভাবতই বিকাশ লাভ করিয়া থাকে, আত্মকেন্দ্রিক পরিবারের মধ্যে তাহা সম্ভব হইতে পারে না; বরং তাহার পরিবর্তে সেখানে একান্ত স্বার্থপরতা দেখা দেয়। যে সমাজের নারী একদিন একাধিক সপত্নী লইয়াও সংসার করিয়াছে, সেই সমাজেরই নারী আজ নিতান্ত নিকটবর্তী আত্মীয়, শ্বশুর-শাশুড়ী, ভাসুর-দেবরকে লইয়াও প্রসন্ন মনে সংসার করিতে পারে না—সংসারে সে নিজে, তাহার স্বামী ও পুত্রকন্যা ব্যতীত কাহারও স্থান হয় না। এই কথাটি এত বিস্তৃত করিয়া বলিবার কারণ এই যে, বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনে যে পরিবর্তনই দেখা দিক, নারী এখনও ইহার প্রধান চরিত্র। বাংলা সামাজিক নাটকের মধ্যে তাহার স্থানটি যথাযথভাবে নির্দেশ করিতে না পারিলে ইহার বস্তুধর্মিতা রক্ষা পায় না—ফলে ইহার কাহিনী শক্তিশালী এবং চরিত্রগুলি জীবন্ত হইতে পারে না। সাম্প্রতিক বাংলার সমাজের নারী একান্ত স্বার্থপরতা-বশত তাহার পরিবারকে যতই আত্মকেন্দ্রিক ও সীমায়িত করিয়া লউক না

কেন, সে এখনও ইহার সর্বময়ী কর্ত্রী। তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই পরিবারের জীবন। যৌথ-পরিবারের নারী তাহার স্নেহ, প্রীতি, দাক্ষিণ্য ও মাধুর্য দ্বারা একদিন বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনকে সৌন্দর্য ও কল্যাণে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছিল, নারীর সেই বিচিত্র শক্তি আজ সংহত হইয়া আত্মমুখী হইয়াছে—আত্মসেবায় আজ তাহা নিয়োজিত হইতেছে। তাহার এই সজাগ আত্ম-বোধের ভিতর দিয়াই তাহার জীবনের দ্বন্দ্বটি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইতেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক বাংলা নাটকের মধ্যে নারী-চরিত্রের এই দিকটি যে খুব স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহা নহে। একটি কথা স্বীকার করিতেই হয় যে, যদিও এই কয় বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের আদর্শের বিপুল পরিবর্তন হইয়াছে, তথাপি নারী-চরিত্রের নূতন দিকগুলি নাটকের মধ্যে এখনও তেমন স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। বাঙ্গালী নারী-চরিত্র-সম্পর্কিত সনাতন ধারণা আমরা এখনও পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না; তাহার ফলেই বাংলা নাটকের নারী-চরিত্র তেমন শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারিতেছে না।

একদিক দিয়া নারী-চরিত্র সম্পর্কে সনাতন সংস্কার যেমন আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি নাই, এ কথা যেমন সত্য, অন্যদিক দিয়া আবার পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রভাবের ফলে, নারী-চরিত্রকে বাঙ্গালীর সমাজের পক্ষে সম্পূর্ণ অবাস্তব রূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে প্রয়াস দেখিতে পাইতেছি, তাহাও সত্য। বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনে যে পরিবর্তনই দেখা দিক, তাহা ইহার নিজস্ব ধারা অনুসরণ করিয়াই যে পরিবর্তিত হইতেছে, তাহাও স্বীকার্য। অর্থাৎ আফ্রিকার ক্রীতদাসেরা মার্কিন দেশে গিয়া যে ভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়া পাশ্চাত্ত্য জীবনকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে, বাঙ্গালী পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা দ্বারা সেভাবে প্রভাবিত হয় নাই—সে তাহার নিজস্ব ঐতিহ্যের ভিত্তির উপরই এখনও প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সুতরাং বাঙ্গালী নারী ইংরেজ মহিলায় পরিণত হয় নাই; তাহার শিক্ষা-দীক্ষা ধ্যান-ধারণা এখনও মূলত বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং ইব্‌সেনের *A Doll's House*-এর নোরাকে বাংলার সমাজে পাইব না। এই রকম চরিত্র যে আধুনিক বাংলার সমাজে একেবারেই থাকিতে পারে না, তাহা নহে; কিন্তু তাহা এখনও বাঙ্গালীর স্বভাবের ব্যতিক্রম হইবে; সুতরাং তাহাকে বাংলা নাটকের নায়িকা করা যাইবে না। সাম্প্রতিক বাংলা

নাটকের মধ্যে বাঙ্গালীর এই ঐতিহ্যপূর্ণ সমাজ-জীবনের ক্রমবিকাশের ধারাকেও কোন কোন সময় অস্বীকার করিয়া পাশ্চাত্ত্য সমাজ-জীবনের আদর্শ আনুপূর্বিক গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি দেখা যায়। বলাই বাহুল্য, এই জীবন বাঙ্গালীর পক্ষে সত্য নহে বলিয়াই বাংলা নাটকের মধ্যেও বাস্তব হইয়া প্রকাশ পাইতে পারে না। একদিন পুরাণ, রোমান্স এবং ইতিহাসকে অবলম্বন করিতে গিয়া বাংলা নাটক বাঙ্গালীর বাস্তব জীবন হইতে বহুদূরবর্তী হইয়া পড়িয়াছিল, আজ পাশ্চাত্ত্য সমাজ-জীবনকে অন্ধভাবে অনুকরণ করিয়া ইহা পুনরায় বাঙ্গালীর নিজস্ব জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে এরূপ আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। সাম্প্রতিক কালে পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক নাটক-রচনার পরিবর্তে সামাজিক নাটক রচিত হইতেছে সত্য, কিন্তু সেই সমাজ যদি বাঙ্গালীর সমাজের যথার্থ রূপ না হয়, তবে তাহার ভিতর দিয়াও সার্থক বাংলা নাটক কোনদিনই রচিত হইতে পারিবে না; ইহার ভিতর দিয়া যে চরিত্রগুলি রূপ পায়, তাহারা যদি বাঙ্গালী না হইয়া বিদেশীয়-ভাবাপন্ন হয়, তবে বাংলা ভাষায় রচিত হইলেও তাহাদিগকে বাংলা নাটক কি করিয়া বলিতে পারি? সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের নাট্যকারদিগের মধ্যে এই বিষয়ে অধিকতর দায়িত্ববোধ জন্মিলে বাংলা নাটকের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ বলিয়া মনে হইতে পারে।

বাংলা নাটকের স্বাধীন বিকাশের আর একটি বাধা সাম্প্রতিক কালে দূর হইয়া গিয়াছে—তাহা ইহার উপর ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চের প্রভাব; কেবলমাত্র প্রভাবই নহে, বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যযুগে ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চগুলি বাংলা নাটক-রচনা নিয়ন্ত্রিত করিত। তাহার ফলে বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের মত বাংলা নাটকের স্বাধীন বিকাশের পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চ কর্তৃক সে যুগে বাংলা নাটক-রচনা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবার ফলে ইহার মধ্যে নিতান্ত বৈচিত্র্যহীন একটি ধারা প্রবর্তিত হইয়াছিল। প্রত্যেক ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চের বিশিষ্ট অভিনেতৃগোষ্ঠীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই প্রধানত সে যুগে নাটক রচিত হইত। সে যুগের প্রায় সকল নাট্যকারই রঙ্গালয়ের পরিচালক ছিলেন। তাঁহাদের রচিত নাটকই অভিনীত হইবার সুযোগ লাভ করিত এবং রঙ্গালয়ের সঙ্গে যে সকল নাট্যকারের কোন সম্পর্কও ছিল না, তাঁহারাও তাহাদেরই আদর্শে নাটক-রচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। সে যুগে কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথ ইহার ব্যতিক্রম ছিলেন। কিন্তু

রবীন্দ্রনাথের আত্মবিশ্বাস আর কোনও নাট্যকারেরই ছিল না। সেইজন্য ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটকই সকলেরই অনুকরণীয় ছিল। সৌখীন রঙ্গমঞ্চগুলিও সেদিন কলিকাতার ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চগুলির অনুকরণ করিয়া তাহাতে অভিনীত নাটকেরই অভিনয় করিত। এই অনুকরণের মধ্য দিয়া নূতন নাটক-রচনার প্রেরণা যেমন প্রকাশ পাইবার সুযোগ পাইত না, তেমনই কোন উচ্চ অভিনয়-গুণ প্রকাশ পাইবারও উপায় থাকিত না। সাম্প্রতিক কালে এই অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। কিছুকাল যাবৎ ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চের বাহিরেও 'নাট্য-আন্দোলন' নামক একটি সংস্কৃতি-মূলক আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার ভিতর দিয়া সাধারণ নাট্যামোদী-দিগের ভিতরে গতানুগতিকতা হইতে পরিত্রাণ পাইবার একটি প্রেরণা দেখা দিয়াছে। কতকগুলি শক্তিশালী সৌখীন নাট্য-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়া তাহাদের অভিনয়-কৌশল দ্বারা সাধারণ দর্শককে মুগ্ধ করিতেছে। ইহার ফলে দেখা যাইতেছে, অভিনয়ের প্রতিভা কেবলমাত্র ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে—তাহাদের বাহিরে যে উচ্চাঙ্গ অভিনয়-গুণের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা অনেক সময় ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চেও দুর্লভ। এই সকল সৌখীন নাট্য-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নূতন নূতন যুগোপযোগী নাটক রচিত হইয়া অভিনীত হইতেছে—বাংলা নাটকের পুরাতন ধারাটি ইহার মধ্য হইতে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করা হইয়াছে। এতদিন ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চের সকল বিষয়ে অনুকরণ করিবার যে প্রবৃত্তি দেখা দিয়াছিল, তাহা আজ পরিত্যাগ করিবার ফলে স্বাধীন নাটক-রচনা করিবার প্রেরণা এবং মৌলিক অভিনয়-গুণের বিকাশ দেখা যাইতেছে। সাম্প্রতিক কালের ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চগুলি উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা রঙ্গমঞ্চগুলির মত নূতন নূতন নাটক পরিবেশন করিবার পরিবর্তে সুদীর্ঘকাল যাবৎ একই নাটক পরিবেশন করিয়া তাহাদের ব্যবসায়ের দিক হইতে লাভবান্ হইতেছে। পূর্বে দর্শক-সংখ্যা ছিল অল্প, সেইজন্য নূতন নূতন নাটক তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে না পারিলে তাহাদিগকে রঙ্গমঞ্চের দিকে আকর্ষণ করা সম্ভব হইত না; সেইজন্য ব্যবসায়ের দিক হইতেই নূতন নাটক রচনা করিবার প্রেরণা আসিত। কিন্তু এখন রঙ্গমঞ্চে দর্শকের সংখ্যা বাড়িয়াছে; সুতরাং একই নাটকের অভিনয় শত শত রাত্রি নির্বিবাদে চলিয়া যাইতে পারে। রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষও সেই সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিয়া নূতন নূতন নাটক পরিবেশন করিবার ব্যয়

হইতে অব্যাহতি লাভ করিতেছেন। সেইজন্য নূতন নাটক-রচনার প্রেরণা আজ আর রঙ্গালয়গুলির ভিতর হইতে আসে না, বরং সৌখীন নাট্যসম্প্রদায় এবং সাধারণ নাট্যামোদীদিগের নিকট হইতেই আসে। তাহার ফলে সাম্প্রতিক কালে ব্যবসায়ী রঙ্গালয়ের বৈচিত্র্যহীন আদর্শের প্রভাব-মুক্ত হইয়া স্বাধীন নাটক-রচনার প্রয়াস দেখা যাইতেছে। এই প্রয়াসের ভিতর হইতেই সার্থক বাংলা নাটক-রচনাও যে একদিন সম্ভব হইবে, তাহাও বুঝিতে পারা যাইতেছে।

সাম্প্রতিক বাংলা নাটক বাঙ্গালীর প্রত্যক্ষ জীবনের সঙ্গে যোগ স্থাপন করিয়া লইবার প্রয়াস পাইতেছে। যে কল্পনা ও ভাব-বিলাসিতা এতকাল পর্যন্ত বাংলা নাটকের অগ্রগতির পথে বাধা দিয়া আসিয়াছে, তাহা দূর হইয়া গিয়া আজ এক সুকঠিন বাস্তব-জীবনবোধ বাংলা নাটকের উপজীব্য হইয়াছে। প্রায় একশত বৎসর পর বাংলা নাটক আজ ইহার পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে। সুতরাং বাংলা নাট্যসাহিত্যের নবযুগের অরুণোদয় আসন্ন হইয়া আসিয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

কিন্তু নাটক-রচনার যে সুযোগই আজ আমাদের নিকট উপস্থিত হউক না কেন, তাহার কতদূর সদ্ব্যবহার হইতেছে, এখন তাহাই আলোচনা করিয়া দেখিতে হয়। এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, আজ বাঙ্গালীর সমাজ-জীবনে যে অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়াছে, তাহা দ্বারা ইহার ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনের সুখদুঃখ নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। সাম্প্রতিক বাংলা নাটকের মধ্যে ইহার কথা কি কিছুই থাকিবে না? উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর সমাজের কতকগুলি সমস্যা ছিল, আজ তাহা নাই। উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক সমস্যাগুলি লইয়া রচিত নাটক সম্পর্কেও আমাদের সকল ঔৎসুক্য দূর হইয়াছে। আজ যে বাংলার সমাজ-জীবনে অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়াছে, তাহাও সমাজের মধ্যে স্থায়িত্বলাভ করিবে না, এ কথা সত্য। সুতরাং একান্তভাবে তাহাই অবলম্বন করিয়া রচিত নাটকের কোনদিনই স্থায়ী মূল্য হইবে না। সাম্প্রতিক বাংলা নাটকের মধ্যে মধ্যবিত্ত সমাজের অর্থ-সঙ্কট, ধনী ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বার্থ লইয়া দ্বন্দ্ব ইত্যাদির কথা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই সাময়িক সঙ্কটের মধ্যেও মানুষের যে একটি শাশ্বত মন আছে, তাহার সন্ধানের প্রয়াস খুব অল্পই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। নানা সঙ্কটের মধ্যেও মানুষের মনের নানা ভাবে বিকাশ

হইয়া থাকে; মানব-সমাজ কোন কালেই যে একেবারে সম্পূর্ণ সঙ্কট-মুক্ত হইতে পারে, তাহা নহে। তবে এই সঙ্কটের প্রকার-ভেদ হইতে পারে মাত্র। সঙ্কটের ভিতর দিয়াই চরিত্রের যে বিকাশ হইয়া থাকে, তাহার মধ্যেই যথার্থ নাটকীয় গুণের সন্ধান পাওয়া যায়। সুতরাং বর্তমান সমাজের অর্থনৈতিক সঙ্কটের পটভূমিকায় নরনারীর চিত্তের যে বিকাশ দেখা দিতে পারে, তাহা উচ্চাঙ্গ নাটকের অবলম্বন হইবার যোগ্য। কিন্তু এই অর্থ-নৈতিক সমস্যা এবং তৎসম্পর্কিত বিশেষ কোন রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার যদি নাট্যরচনার উদ্দেশ্য হয়, তবে নাটক মাত্রেরই শিল্প-মহিমা ক্ষুন্ন হয়। সাম্প্রতিক বাংলা নাটকে এই ত্রুটি কিছু কিছু দেখা দিয়াছে। কিন্তু যাঁহারা এই জাতির জন্য সর্বকালীন নাট্যসাহিত্য সৃষ্টি করিতে চাহেন, তাঁহাদের ঐ পথ পরিত্যাগ ভিন্ন উপায় নাই। আর সাময়িক প্রয়োজনীয়তার জন্য যদি নাটক-রচনার প্রেরণা কেহ অনুভব করেন, তবে তাঁহার কথা স্বতন্ত্র।

সাম্প্রতিক কালে রচিত বাংলা নাটকের সংলাপে যে ভাষা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা পূর্ববর্তী কালের কৃত্রিমতা হইতে মুক্ত হইয়া আসিয়াছে। পূর্বে যে পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক নাটক কিংবা তাহাদেরই প্রভাব-জাত সামাজিক নাটক রচিত হইত, তাহাদের মধ্যে ব্যবহৃত ভাষা যে নিতান্ত কৃত্রিম ছিল, তাহা সকলেই অনুভব করিয়াছেন। তবে পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক নাটকের ভাষার কৃত্রিমতা দর্শক কিংবা পাঠককে সহজে আঘাত করিতে পারে না; কারণ, সে জীবন আমাদের অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত নহে। কিন্তু সামাজিক নাটকের ভাষার কৃত্রিমতা নাটকের রসস্ফূর্তির যে কতখানি ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, তাহা দীনবন্ধুর মত নাট্যকারের উচ্চশ্রেণীর চরিত্র-সম্পর্কে ব্যবহৃত ভাষা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। বিভাগোত্তর যুগের পূর্ব পর্যন্তও যাঁহারা সামাজিক নাটক রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের ব্যবহৃত ভাষাও সমসাময়িক পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক নাটকের ভাষার প্রভাবের ফলে বহুলাংশে কৃত্রিম হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে যেমন বাংলা নাটক বাঙ্গালী জীবনের নিকটবর্তী হইতেছে, তেমনই ইহার ভাষাও বস্তু-ধর্মিতা লাভ করিয়াছে। কারণ, ভাষাই নাটকীয় চরিত্রের যথার্থ পরিচয় প্রকাশ করিতে পারে। তাহা যদি অকৃত্রিম না হয়, তবে চরিত্রগুলি অকৃত্রিম হইতে পারে না। সাম্প্রতিক বাংলা নাটকের মধ্যে এই একটি প্রধান গুণের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহার ভাষার মধ্যে আর কৃত্রিমতা নাই।

বাস্তব জীবনের রূপায়ণে এই ভাষার উপযোগিতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বাংলা নাটকের ভাষা বাংলা নাটসাহিত্যের মধ্যযুগ হইতেই নিতান্ত কাব্যধর্মী হইয়া ছিল, কিন্তু সাম্প্রতিক কালে ইহা এই কাব্যধর্মিতা হইতে বহুলাংশে মুক্ত হইয়া সার্থক নাটক-রচনার উপযোগিতা লাভ করিয়াছে।

॥ ৯ ॥ পাঠ্য নাটক

সংস্কৃত নাটককে দৃশ্যকাব্য বলা হইয়া থাকে—ইহার তাৎপর্য এই যে, ইহার আবেদন কেবলমাত্র অভিনয় দর্শনের ভিতর দিয়াই প্রকাশ পায়। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে দৃশ্য কাব্যের বিপরীতার্থক শ্রব্য কাব্য বলিয়াও একটি কথা আছে—ইহার তাৎপর্য এই যে, এই শ্রেণীর কাব্য নিজে পাঠ করিয়া কিংবা অন্যের নিকট হইতে তাহার পাঠ শ্রবণ করিয়াই আনন্দ লাভ করা যায়—ইহা রঙ্গমঞ্চের ভিতর দিয়া অভিনীত হইতে দেখিবার কোনও প্রয়োজন নাই। কিন্তু নাটক অর্থে দৃশ্যকাব্য কথাটি কতখানি সার্থক, তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হয়।

প্রথমত সংস্কৃত নাটকের কথাই ধরা যাক। যদিও ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে' রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা আছে, তথাপি এ কথা সত্য, সংস্কৃত নাটক কোন কালেই যে নিতান্ত জনসাধারণের সম্মুখে অভিনীত হইত, তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। সংস্কৃত নাটক সাধারণ দর্শকের সম্মুখে অভিনীত হইবার প্রধান বাধা ইহার ভাষা। ইহাতে একই নাটকে সংস্কৃত, বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাকৃত, এমন কি, অপভ্রংশ ভাষাও একসঙ্গে ব্যবহৃত হইত। সুতরাং ইহার লিখিত রূপ বিদগ্ধমনের অনুশীলনের বস্তু—ইহার দৃশ্যরূপ সাধারণের অনুসরণের বস্তু নহে। নাটকের একটি প্রধান গুণ ইহার ভাষা বা ভাব-প্রকাশের প্রত্যক্ষতা। সংস্কৃত ভাষা কোন কালেই ভারতবর্ষের কথ্য ভাষা ছিল না, কথ্য ভাষারই একটি সাধুরূপ ছিল মাত্র; সুতরাং সংস্কৃত ভাষার মধ্যস্থতায় যে বিষয় পরিবেশন করা হইত, তাহা কখনই প্রত্যক্ষভাবে (directly) কোনও আবেদন সৃষ্টি করিতে পারিত না। কৃত্রিম ভাষার ভিতর দিয়া কোনও প্রত্যক্ষ আবেদন সৃষ্ট হইতে পারে না। সুতরাং সংস্কৃত ভাষা যে নাটকের বাহন, সেই নাটকের দৃশ্যগুণ প্রকাশ পাইবার পক্ষে স্বাভাবিক বাধা ছিল। তারপর সংস্কৃত নাটকে যে বিভিন্ন

শ্রেণীর প্রাকৃত ভাষা ব্যবহৃত হইত, তাহাও প্রকৃত জনসাধারণের ভাষার এক একটি সাধুরূপ মাত্র (literary form) ছিল। বিশেষত একই নাটকে শৌরসেনী, মহারাষ্ট্রী এবং মাগধী এই সকল বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রাকৃত ভাষা ব্যবহৃত হইত। এই সকল অঞ্চল যে পরস্পর সংলগ্ন অঞ্চল ছিল, তাহা নহে—শৌরসেনী প্রাকৃত মথুরা অঞ্চলের ভাষা, মহারাষ্ট্রী পশ্চিম বোম্বাই বা মহারাট্টার ভাষা এবং মাগধী প্রাকৃত উত্তর বিহারের তদানীন্তন কথ্যভাষার সাধুরূপ মাত্র। সুতরাং একটি মাত্র যে নাটকের ভিতর দিয়া মথুরা, মহারাষ্ট্র ও উত্তর বিহার এই পরস্পর স্বতন্ত্র অঞ্চলের ভাষা প্রকাশ পায়, তাহা কোন দিনই কোন বিশেষ শ্রোতৃমণ্ডলীর উপর প্রত্যক্ষ আবেদন সৃষ্টি করিতে পারে না। সেইজন্য দেখিতে পাওয়া যায়, সে যুগের একটি নাটকের ভিতর দিয়া কেবলমাত্র প্রাকৃত ভাষাকেই আদ্যোপান্ত অবলম্বন করা হইয়াছে — তাহার নাম 'কর্পূরমঞ্জরী'। কিন্তু তাহাতেও বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রাকৃত ভাষা অবলম্বন করা হইয়াছে বলিয়া তাহাও রসগত একটি অখণ্ড আবেদন সৃষ্টি করিতে ব্যর্থকাম হইয়াছে। সুতরাং দেখা যায়, সংস্কৃত নাটক মূলত যে উদ্দেশ্যেই লিখিত হইতে আরম্ভ করুক না কেন, ইহার সম্পর্কে অন্তত দৃশ্য-কাব্য এই সংজ্ঞাটি সার্থক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না—ইহা পাঠ্যরূপেই প্রথম হইতেই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। তবে একথা মনে হইতে পারে যে, ভরতমুনি যখন খ্রীষ্টজন্মের দুইশত বৎসর পূর্বে তাঁহার 'নাট্যশাস্ত্র' রচনা করেন, তখন বিভিন্ন শ্রেণীর লোক-নাট্য এ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। তাহাদের কোনও লিখিত রূপ ছিল না—কারণ, লোকসমাজে তখনও লেখার প্রচলন ব্যাপক হইয়া উঠিতে পারে নাই ; মৌখিক ঐতিহ্যের ধারা (oral tradition) অনুসরণ করিয়াই ইহাদিগকে পরিবেশন করা হইত। ইহাদের রূপায়ণের পদ্ধতিকে ভিত্তি করিয়া উচ্চতর সাহিত্যের উপযোগী নাটক রচনা করিবার জন্য ভরতমুনি তাঁহার 'নাট্যশাস্ত্রে' নির্দেশ দিয়াছিলেন, একথা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এখানে গ্রীক্ নাটকের প্রভাবের কথাও যদি স্বীকার করা যায়, তথাপি মনে হইতে পারে যে, গ্রীক্ নাটকের বহিরঙ্গগত প্রভাব ভরতমুনির 'নাট্যশাস্ত্রে' স্বীকৃত হইলেও, তাহার অন্তঃপ্রকৃতির সন্ধান তিনি লাভ করিতে পারেন নাই। গ্রীক্ নাটকে ট্র্যাজিডির বিশিষ্ট স্থান আছে, অথচ ভরতমুনি সংস্কৃত নাটকে বিয়োগাত্মক বিষয়ের কোনও স্থান দেন নাই। নাটক মিলনাত্মক হইতে হইবে, সংস্কৃত

নাটকের এই নির্দেশটি তদানীন্তন লোক-নাট্য হইতেই আসা সম্ভব। কারণ, জনসাধারণের নিরক্ষর সমাজ মিলনের আবেদনটি সহজভাবে উপলব্ধি করিতে পারে, বিচ্ছেদজাত সুতীব্র বেদনার অনুভূতি হইতে রসানন্দ (relief) সহজে লাভ করিতে পারে না। সুতরাং নানাদিক দিয়া বিচার করিয়াই দেখা যাইতেছে, সংস্কৃত নাটক কাব্য, কিন্তু দৃশ্য নহে, বরং শ্রব্যই বলা যাইতে পারে। ইংরেজিতে যাহাকে reading drama বলে, তাহাকেই শ্রব্য নাটক বলা যাইতে পারে—তাহাই পাঠ্য নাটক।

বাংলা নাটকের যখন প্রথম জন্ম হয়, তখন ইহার সম্মুখে কোনও রঙ্গমঞ্চ ছিল না। সমসাময়িক কালে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি ইংরেজি নাট্যশালায় ইংরেজি নাটকের অভিনয় দেখিয়া কয়েকজন বাঙ্গালী নাট্যকার বাংলা নাটক রচনার প্রেরণা লাভ করেন। তাহার ফলেই ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা ভাষায় প্রথম নাটক তারাচরণ শিকদার প্রণীত 'ভদ্রার্জুনে'র জন্ম হয়। 'ভদ্রার্জুন' অভিনীত হইবার জন্যই রচিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু ইহা কদাচ অভিনীত হয় নাই। এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, ইহার দৃশ্যগুণ অপেক্ষা পাঠ্যগুণ অধিক। ইহার বহু দৃশ্যই নাটকে অভিনীত হইবার যোগ্য ছিল না। ইহার নাট্যকারের সম্মুখে সেদিন কোনও রঙ্গমঞ্চের অদর্শ ছিল না বলিয়া তিনি এই বিষয়ে নিরঙ্কুশ হইয়া ইহা রচনা করিয়াছেন।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত যে সকল নাটক রচিত হইয়াছে, তাহা প্রধানত পাঠ্যনাটক, দৃশ্যনাটক নহে; ইহাদের মধ্যে দৃশ্যনাটকের বহু গুণেরই অভাব আছে। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটক এবং মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' ও 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক সৌখীন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তথাপি ইহাদিগকে রঙ্গমঞ্চের ভিতর দিয়া সার্থক রূপায়ণের বহু বাধা ছিল; অভিনয়ের ভিতর দিয়া সে সব বাধা যে দূর হইয়াছিল, তাহাও নহে। ইহাদের সুদীর্ঘ গদ্য পদ্য মিশ্র সংলাপ, রঙ্গমঞ্চে অভিনেতা অভিনেত্রীর মুখে শুনিয়া তৃপ্তিলাভের পরিবর্তে নিজে পাঠ করিয়া অনেক সময় আনন্দলাভ করা যাইতে পারিত। ইহারা বহুলাংশে কাব্যধর্মী রচনা। তারপর সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রও কোনও রঙ্গমঞ্চ সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার নাটক রচনা করেন নাই। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বেলগাছিয়া নাট্যশালার অভিনেতৃ-গোষ্ঠী এবং মঞ্চ-ব্যবস্থা সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার নাটকগুলি রচনা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু

তথাপি সেই নাট্যশালার ত্রুটির জন্যই হউক, কিংবা নিজস্ব কবিমনোভাব দুরতিক্রম্য বলিয়াই হউক, তাঁহার নাটকগুলিকে তিনি যথার্থ দৃশ্যগুণ-সমন্বিত করিয়া তুলিতে ব্যর্থকাম হইয়াছেন। দীনবন্ধু বিশেষ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া তাঁহার প্রথম নাটক 'নীলদর্পণ' রচনা করেন—মধুসূদনের মত রঙ্গমঞ্চে তাঁহার নাটক অভিনীত হইবার উদ্দেশ্যে রচনা করেন নাই। সেইজন্য তাঁহার 'নীলদর্পণ' নাটকে এমন কয়েকটি দৃশ্য সমাবেশ করিয়াছেন, যাহা অভিনয়ের জন্য নানা দিক দিয়াই অযোগ্য। প্রথমত কতকগুলি দৃশ্য অভিনয় করাই অসম্ভব, দ্বিতীয়ত কয়েকটি দৃশ্য অভিনয় করা সম্ভব হইলেও নীতি এবং রুচির দিক দিয়াও ইহারা পরিত্যাজ্য। সুতরাং দীনবন্ধু তাঁহার প্রথম নাট্যরচনাকে যে সর্বাংশেই সার্থক দৃশ্যকাব্য করিয়া তুলিতে চাহেন নাই, তাহা সত্য। দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' সম্পর্কেও একথাই বলা যাইতে পারে। ইহা যে সুখপাঠ্য রচনা, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন; কিন্তু ইহা যে সার্থক 'দৃশ্যকাব্য' এ কথা সকলে স্বীকার করিবেন না। দীনবন্ধুর অন্তরটি কবিত্ব-রসে সমুজ্জ্বল—দীনবন্ধু মূলত কবি। সেই জন্য তাঁহার রচনায় মধ্যে মধ্যে কাব্য পাঠের আনন্দ পাওয়া যায়, কিন্তু দৃশ্যগুলির প্রত্যক্ষ অভিনয়ের ভিতর দিয়া সে আনন্দ সব সময় প্রকাশ পায় না।

যে সকল নাটক প্রধানত রঙ্গমঞ্চের বাহিরে রচিত হইয়াছে এবং প্রচলিত রঙ্গমঞ্চের কোনও বাঁধা-ধরা নির্দেশ স্বীকার করে নাই, এপর্যন্ত সেই নাটকগুলির কথাই বলা হইল। কিন্তু দীনবন্ধুর পর বাংলাদেশে ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে নাটকগুলি একান্ত মঞ্চমুখী হইতে লাগিল—তাহার ফলেই ইহাদের পাঠ্যগুণ বিনষ্ট হইয়া গেল। পাঠ্যগুণের অর্থ সাহিত্য-গুণ—যথার্থ সাহিত্যিক আবেদন প্রকাশ পাইলেই তাহার পাঠ্যগুণ প্রকাশ পায়; যাহার সাহিত্যিক কোনও মূল্য নাই, তাহার পাঠ্যগুণও নাই। সেইজন্য অনেক নাটকের এক পৃষ্ঠাও পড়িতে পারা যায় না, অথচ অভিনয়ের ভিতর দিয়া ইহারা পরম সার্থকতা লাভ করিয়া থাকে। গিরিশচন্দ্র এবং তাহার সমসাময়িক কালের যে সকল নাট্যকার ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশের নাটকই পাঠ্যগুণ-বিবর্জিত—কেবল মাত্র ইহাদের দৃশ্যগুণই বর্তমান থাকিতে দেখা যায়। এই বিষয়ে রাজকৃষ্ণ রায় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত; তাঁহার রচনামাত্রই নীরস ও অপাঠ্য—মধ্যে মধ্যে তাঁহার গীতিরচনা সুখপাঠ্য হইয়াছে। কিন্তু গদ্য সংলাপ রচনায়

তিনি কোনও স্থির আদর্শের সন্ধান পান নাই। সেইজন্য তাহা পাঠের অযোগ্য। অভিনয়ের ভিতর দিয়াই ইহার প্রকাশ—পাঠকের নিকট ইহার কোনও মূল্য নাই।

বাংলা সাহিত্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথের নাটক। ইহাদের সম্পর্কে নাট্যকার নিজেও অনুভব করিয়াছেন যে, তাহা প্রধানত কাব্য, নাটক নহে।

তাহার 'লিরিক' বা গীতিধর্মী রচনা কাব্যের মত সুখপাঠ্য, কিন্তু ইহাদিগকে রঙ্গমঞ্চের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিবার প্রয়োজন যখন দেখা দেয়, তখন ইহা নিতান্ত বৈচিত্র্যহীন বা একঘেয়ে হইয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথের নাটকের মঞ্চসাফল্য প্রকাশ না পাইবার ইহাই কারণ। রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত রঙ্গমঞ্চ সম্মুখে রাখিয়া নাটক রচনা করেন নাই; সুতরাং তিনিও তাঁহার নাট্যরচনাকে কদাচ দৃশ্যকাব্যরূপে প্রকাশ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট একটি আদর্শবোধ ছিল; তিনি রঙ্গমঞ্চের উপকরণবাহুল্যকে অভিনয়ের দৈন্য বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। একান্ত মঞ্চমুখীনতা নাটকের সাহিত্যিক আবেদন সৃষ্টি করার পক্ষে অন্তরায় হয় বলিয়াই তিনি বিশ্বাস করিতেন। এই বিশ্বাস তাঁহার ছিল বলিয়াই মঞ্চ-সংস্কার হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিয়া তিনি তাঁহার নাটকগুলিকে এক একটি সার্থক পাঠ্যরূপ দিতে পারিয়াছেন। এইজন্যই তাঁহার নাটকগুলির একটি চিরন্তন মূল্য প্রকাশ পাইয়াছে। যে সকল নাটক একান্ত মঞ্চাশ্রয়ী, বিশেষ রঙ্গমঞ্চকে অন্ধভাবে অবলম্বন করিয়া যাহা বিকাশ লাভ করে, তাহারা মঞ্চব্যবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হইয়া যায়। মঞ্চব্যবস্থা চিরদিনই পরিবর্তনশীল; বিশেষ কোন যুগের একান্ত মঞ্চনির্ভর নাটক ইহার পরিবর্তিত যুগে আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। সংস্কৃত নাটক মঞ্চ ত্যাগ করিয়া কাব্য হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া আজও সার্থক সাহিত্যিক আবেদন সৃষ্টি করিয়া থাকে—রবীন্দ্রনাথের নাটকও এই পথই অনুসরণ করিয়াছিল বলিয়া বাংলা সাহিত্যের চিরন্তন সৃষ্টি রূপে ইহারা সার্থকতা লাভ করিতে পারিয়াছে।

১০ একাঙ্ক নাটক

সাম্প্রতিক কালে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর বিভিন্ন অগ্রসর দেশের সাহিত্যেই একাঙ্ক নাটক একটি বিশেষ স্থান লাভ করিয়াছে। ইহা আকারে ক্ষুদ্র হইলেও পূর্ণাঙ্গ নাটকের মতই ইহার রচনা নিতান্ত সহজসাধ্য নহে। সামগ্রিক জীবনের পরিবর্তে জীবনের একটি নাটকীয় মুহূর্তই ইহার অবলম্বন। জীবনের মধ্য হইতে যথার্থ সেই নাটকীয় মুহূর্তটির সন্ধান লাভ করা অনেক সময়ই কঠিন বলিয়া এই বিষয়ক অনেক রচনাই রসোত্তীর্ণ হইতে পারে না।

একাঙ্ক নাটক প্রকৃতপক্ষে এক দৃশ্যে সম্পূর্ণ নাটক, ইহার মধ্যে দৃশ্যবিভাগও থাকিতে পারে না। কারণ, বিভিন্ন দৃশ্যের মধ্যে দিয়া রস-নিবিড়তা যে ক্ষুণ্ণ হয়, তাহাতে একাঙ্ক নাটকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। একদৃশ্যে সম্পূর্ণ নাটক বলিয়াই ইহার মধ্যে কাল, স্থান এবং উদ্দেশ্যগত একটি সুনিবিড় অখণ্ডতা রক্ষা পায়। একাঙ্ক নাটকের প্রকৃত রস এখানেই প্রকাশ পায়। অথচ এই একটি মাত্র দৃশ্যের মধ্যেই নাটকীয় ঘটনার ক্রমোন্নয়ন, চরমোন্নয়ন, সংঘাত এবং পরিণতি সকলই নির্দেশ করিতে হয়। সেইজন্যই ইহার রচনাকর্ম অত্যন্ত দুরূহ।

ঊনবিংশ শতাব্দীতেও বাংলা সাহিত্যে একাঙ্ক নাটক রচিত হইয়াছে সত্য, যেমন মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' ইত্যাদি, কিন্তু যে প্রয়োজনে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইহারা রচিত হইয়াছে, বিংশ শতাব্দীতে তাহা সেই প্রয়োজনে রচিত হয় না। একাঙ্ক নাটক প্রকৃত পক্ষে বিংশ শতাব্দীরই সমাজ-মানসের যুগন্ধর সৃষ্টি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ক্ষুদ্রতর নাটক রচনা লইয়া নাট্যকারদিগের মধ্যে কেবল পরীক্ষা নিরীক্ষা চলিয়াছিল, কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে যুগের প্রয়োজনে একাঙ্ক নাটক রচিত হইয়াছে। সেইজন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর রচনাগুলি নাট্যসাহিত্যের মধ্যে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন কীর্তি মাত্র হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু সাম্প্রতিক কালের একাঙ্ক নাটক সাহিত্যে একটি ধারা সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছে।

একাঙ্ক নাটকের প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্র স্বতন্ত্র বলিয়া ইহা কখনও পূর্ণাঙ্গ নাটকের স্থান সম্পূর্ণ অধিকার করিতে পারিবে, তাহা নহে। সাহিত্যে ছোটগল্প যেমন উপন্যাসের স্থান অধিকার করিতে পারে না, একাঙ্ক নাটকও পূর্ণাঙ্গ নাটকের স্থান অধিকার করিয়া লইতে পারিবে না। আধুনিক সামাজিক এবং

সাংস্কৃতিক জীবনের প্রয়োজনে ইহার জন্ম হইয়াছে, এই প্রয়োজনীয়তা যতদিন থাকিবে, ততদিন ইহার জনপ্রিয়তা হ্রাস পাইবে না।

বাংলা ছোটগল্প সাম্প্রতিক কালে যে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, তাহা হইতে সহজেই মনে হইতে পারে যে, উপযুক্ত শিল্পীর হাতে পড়িলে ইহার একাঙ্ক নাটকও অনুরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারিবে। কারণ, কতকগুলি বিষয়ে ছোটগল্পের সঙ্গে একাঙ্ক নাটকের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু ছোটগল্পের সঙ্গে একাঙ্ক নাটকের যদি কেবলমাত্র সাদৃশ্যই থাকিত—কোন বৈসাদৃশ্য না থাকিত—তবে আধুনিক কালে বাংলা একাঙ্ক নাটকের পক্ষে ছোটগল্পের সমপর্যায়ে উন্নীত হইতে কোনও বাধা ছিল না। ছোটগল্পের সঙ্গে একাঙ্ক নাটকের কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য আছে, সে পার্থক্য কেবলমাত্র আঙ্গিকের নহে—ভাবগতও বটে। আধুনিক কালে যে কয়জন বাংলায় একাঙ্ক নাটক রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহ কেহ ছোটগল্পেরও লেখক; ছোটগল্প এবং একাঙ্ক নাটকের মৌলিক পার্থক্যের কথা ইঁহারা প্রায়ই ভুলিয়া গিয়া ছোটগল্পের উপকরণ এবং আঙ্গিক দ্বারাই একাঙ্ক নাটক রচনা করিয়া থাকেন; সেই জন্য ইঁহাদের জীবন-বোধে কোন ত্রুটি না থাকিলেও একাঙ্ক নাটক রচনায় বহিরঙ্গগত ত্রুটি প্রকাশ পাইয়া থাকে।

বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত একাঙ্ক নাটক রচনার পথ-প্রদর্শক। বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম সার্থক একাঙ্ক নাটক তাঁহার 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'। কিন্তু এই একাঙ্ক নাটকখানি প্রহসন বলিয়া পরিচিত। সেই যুগে আরও একখানি একাঙ্ক নাটক রচনায় যথার্থ শিল্পগুণের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল—তাহা দীনবন্ধু মিত্রের 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'। কিন্তু তাহা মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'র ছয় বৎসর পর রচিত হয়। তথাপি বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে এই দুইখানি রচনাকে একাঙ্ক নাটক রচনার কেবল মাত্র আদিযুগের বলিয়া নহে, উল্লেখযোগ্য নিদর্শনরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহাদের সুদূরপ্রসারী প্রভাব বাংলা নাট্যসাহিত্যের উপর বিস্তৃত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু ইহাদের আভ্যন্তরীণ প্রাণধর্মের সন্ধান বড় কেহই লাভ করিতে পারেন নাই; সেইজন্য কেবলমাত্র ইহাদের বহিরঙ্গগত সুলভ আবেদনটুকু সকলেই গ্রহণ করিয়াছেন।

বাহিরের দিক হইতে বিচার করিয়া এই দুইখানি রচনাকেই 'প্রহসন' বলিয়া নির্দেশ করা হইয়া থাকে। অবশ্য বাংলা নাট্যসমালোচকগণ প্রহসন

কথাটি যে কি ভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। তাঁহাদের মতে রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা'ও যেমন প্রহসন, তাঁহার 'গোড়ায় গলদ'ও তেমনই প্রহসন। কিন্তু একথা কেহ স্বীকার করিতে পারিবেন না যে, উভয়ের ভিতর দিয়া যে রস ও ভাবের অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহা অভিন্ন। অতএব প্রথমেই প্রহসন কথাটি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থের তাহা লক্ষ্য নহে। বাংলা নাট্য-সাহিত্যের আদিযুগের দুইখানি নাট্যরচনার কথা উল্লেখ করিলাম, কি বৈশিষ্ট্য-গুণে ইহারা একাঙ্ক নাটকের মর্যাদা লাভের অধিকারী এখানে তাহাই বিবেচনা করিয়া দেখিতে চাই। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' এবং 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' ইহাদের উভয়ের মধ্য দিয়াই চিরন্তন মানবিক দুর্বলতার কথা প্রকাশ করা হইয়াছে। যে পরিবেশের ভিতর দিয়া এই কথা প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা নিতান্ত লঘু এবং হাস্যরসাত্মক; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, এইজন্য ইহাদের বক্তব্য বিষয় নিতান্ত লঘু কিংবা কোন দিক হইতেই হাস্যরসাত্মক (Humorous) নহে। বক্তব্য বিষয় যেখানে হাস্যরসাত্মক নহে, যেখানে তাহার ভিতর দিয়া মানব-জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করা হইয়া থাকে, সেখানে রচনার নাম প্রহসন দিবার কোনই সার্থকতা নাই। মধুসূদন এবং দীনবন্ধু ইহাদের উভয়ের জীবন-দৃষ্টিতে গভীরতা ছিল—ইহারা কেহই জীবনের কেবলমাত্র উপরি-স্তরে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সেখান হইতে লঘু কৌতুকের বিষয় সংগ্রহ করেন নাই। অতএব তাঁহারা কেহই প্রহসন রচনা করেন নাই। ইহাদের বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টি সমসাময়িক সমাজের লঘুস্তর অবলম্বন করিয়াই ইহার গহন তল পর্যন্ত নামিয়া গিয়াছে; সেইজন্য তাঁহাদের রচনার বহিরঙ্গের পরিচয় নিতান্ত লঘু এবং কৌতুকের হইলেও ইহাদের অন্তস্তল অত্যন্ত গভীর। একাঙ্ক নাটক নাটকই, প্রহসন নহে—ইহা জীবনের গভীরতম স্তরের বিষয়, উপরিস্তরের সাময়িক কোনও উপকরণ নহে। সেইজন্য জীবনের মর্মমূলে যাঁহাদের দৃষ্টি পৌছিতে পারে না, তাঁহারা কখনই একাঙ্ক নাটক রচনায় সার্থকতা লাভ করিতে পারেন না। মধুসূদন এবং দীনবন্ধুর সেই দৃষ্টি ছিল, সেইজন্যই তাঁহাদের একাঙ্ক নাটক-রচনা সার্থকতা লাভ করিয়াছে। যাঁহারা ইহাদের এই রচনা দুইটিকে 'প্রহসন' বলিয়া ভুল করিয়া থাকেন, তাঁহারা একাঙ্ক নাটকের প্রাণধর্ম কি ভাবে গঠিত হয়, তাহা বুঝিতে পারেন না।

মধুসূদন এবং দীনবন্ধুর পর বাংলা নাট্যসাহিত্যে একাঙ্ক নাটক রচনার প্রতিভা লইয়া যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি রবীন্দ্রনাথ—তাঁহার পূর্ববর্তী আর কোনও নাট্যকার নহেন। এই বিষয়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাম কাহারও কাহারও মনে হইতে পারে। তাঁহারও জীবন-দৃষ্টিতে যে গভীরতা ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু তাঁহার জীবন-দৃষ্টির একটি প্রধান ত্রুটি এই ছিল যে, তাহা বাস্তবধর্মী ছিল না, তাহা ছিল আদর্শমুখী। জীবন-দৃষ্টি বাস্তবধর্মী না হইলে তাহা দ্বারা যে নাটক রচনা সম্ভব নহে, তাহা বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ধারা যাঁহারা অনুসরণ করিয়াছেন, অন্তত তাঁহারা স্বীকার করিবেন না। আদর্শবাদী গিরিশচন্দ্র এক শ্রেণীর নাটক রচনায় যে সফলকাম হইয়াছেন, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না—তাহা পৌরাণিক নাটক। কিন্তু একাঙ্ক নাটক সংক্ষিপ্ত বলিয়াই ইহা যদি একান্ত বাস্তবানুগ না হয়, তবে সাফল্য লাভ করিতে পারে না। কারণ, জীবনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ অপেক্ষা ইহার প্রত্যক্ষ রূপায়ণই ইহার বৈশিষ্ট্য। অতএব গিরিশচন্দ্র যদিও সংক্ষিপ্ত নাটক এমন কি, এক অঙ্কে সম্পূর্ণ নাটকও রচনা করিয়াছেন, তথাপি প্রকৃত একাঙ্ক নাটক বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা তিনি একখানিও রচনা করিতে পারেন নাই। উচ্চ নৈতিক বিষয় লইয়াও ইংরেজীতে সার্থক One Act Drama রচিত হইয়া থাকে; কিন্তু নীতিই সেখানে মুখ্য হইয়া উঠে না, নীতিগত আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সেখানে মানবিক ভিত্তিটির সর্বদাই সন্ধান করা হইয়া থাকে। 'Bishop's Candlestick' এই বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য রচনা—ভিক্টর হিউগো'র অমর কীর্তি 'লা মিজারেবলে'র কাহিনীর একাংশের ইহা একাঙ্ক নাট্যরূপায়ণ; ইহার মধ্যে যে উচ্চ নৈতিক আদর্শের কথা আছে, তাহা প্রত্যক্ষ জীবনের আচরণের মধ্য দিয়া দেখানো হইয়াছে—কেবলমাত্র মৌখিক বক্তৃতার ভিতর দিয়া প্রকাশ করা হয় নাই। কিন্তু গিরিশচন্দ্র অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৌখিক বক্তৃতার সাহায্যে চারিত্রনীতি বা জীবনাদর্শ প্রচার করিয়াছেন। সেইজন্যই মনে হয়, গিরিশচন্দ্র একাঙ্ক নাটক রচনার প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ যে এই প্রতিভার যথার্থ ই অধিকারী ছিলেন, তাঁহার 'বৈকুণ্ঠের খাতা' নাটকখানিই তাহার সার্থকতম প্রমাণ। কিন্তু 'বৈকুণ্ঠের খাতা'ও রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচকদিগের নিকট সাধারণ ভাবে প্রহসন বলিয়াই পরিচিত; ইহাকে কেহই একাঙ্ক নাটক বলিয়া উল্লেখ করেন নাই।

ইংরেজি নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে One Act Drama কথাটি খুব প্রাচীন

নহে ; কারণ, এই শ্রেণীর রচনা প্রধানত জঙ্গীয় যুগের সৃষ্টি। ইংরেজি One Act Drama সচেতনভাবে অনুকরণ করিয়া কিংবা তাহা হইতে প্রত্যক্ষ প্রেরণা লাভ করিয়া বাংলা একাঙ্ক নাটক নিতান্ত আধুনিককালে রচিত হইলেও উপরে যে কয়টি রচনার কথা উল্লেখ করিলাম, তাহাদের মধ্যে আধুনিক একাঙ্ক নাটকের বৈশিষ্ট্যের যে অভাব নাই, তাহা স্বীকার করিতেই হয়। অতএব বাংলা নাট্য রচনার ক্ষেত্রে ইংরেজি One Act Dramaর প্রত্যক্ষ-প্রভাব-নিরপেক্ষ পূর্বোক্ত একাঙ্ক নাটকগুলির অস্তিত্ব হইতে এ কথা সহজেই অনুমান করা যায় যে, বাংলা সাহিত্যেও একাঙ্ক নাটক রচনার মৌলিক উপাদানের অভাব নাই। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একাঙ্ক নাটক রচনার প্রতিভার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ইহার মধ্যেও একটি ত্রুটি ছিল তাহা এই যে, বাস্তব জীবনদর্শনে রবীন্দ্রনাথের বৈচিত্র্য ছিল না। একমাত্র 'বৈকুণ্ঠের খাতা' বাদ দিলে আর একখানিও সার্থক একাঙ্ক নাটক যে রবীন্দ্রনাথ রচনা করিতে পারেন নাই, ইহাই তাহার কারণ। বিশেষত 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র কাহিনী বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেও বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহার মধ্য দিয়া যে জীবন-পরিচয় অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে, তাহা রবীন্দ্রনাথের কল্পনালব্ধ নহে—বরং নিতান্ত প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব অভিজ্ঞতাজাত। ইহার নায়ক চরিত্র বৈকুণ্ঠ রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব পরিবার-ভুক্ত একজন নিকট আত্মীয়ের চরিত্রের সম্পূর্ণ অনুরূপ ; অতএব বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়া চরিত্রটি পরিকল্পিত হইয়াছে বলিয়া ইহা যে সার্থকতা লাভ করিয়াছে, তাহা সহজেই অনুভব করা যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর অভিজ্ঞতা নিতান্ত সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া এই প্রকার দ্বিতীয় একাঙ্ক নাটক তিনি আর রচনা করিতে পারেন নাই। তাঁহার 'বশীকরণ' নাটকের কথা এই সম্পর্কে কাহারও মনে হইতে পারে, কিন্তু 'বশীকরণ' নাটকের বিষয় জীবনের গভীর স্তর স্পর্শ করিতে পারে নাই, ইহা নিতান্ত উপরি-স্তরের বিষয় ; অতএব ইহা প্রহসন হইতে পারে, কিন্তু নাটক হয় নাই। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, একাঙ্ক নাটক নাটকই—প্রহসন নহে। বাস্তব 'জীবনদর্শনে রবীন্দ্রনাথের বৈচিত্র্য ছিল না, এমন কি, এই বিষয়ে তাঁহার নিজস্ব যে অভিজ্ঞতা ছিল, তাহাও তাঁহার নিজস্ব পারিবারিক জীবন অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই। সেইজন্য মাত্র একখানি ব্যতীত তাঁহার আর কোনও একাঙ্ক নাটক সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই। ছোট গল্পগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বাস্তব জীবনদর্শনের সার্থকতার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহার

মধ্যেও যে খুব বেশি বৈচিত্র্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাও বলিতে পারা যায় না। বিশেষত ছোটগল্পগুলির ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণাত্মক মনোভাবের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, অতএব ইহা কথাসাহিত্যেরই যথার্থ উপযোগিতা লাভ করিয়াছে। জীবনদর্শনের বিশ্লেষণাত্মক গুণ নাট্যরচনার অনুকূল নহে—ইহাতে কেবলমাত্র নাট্যিক ক্রিয়ার ভিতর দিয়া বক্তব্য বিষয় সুপরিস্ফুট করিয়া তুলিতে হয়, বিশ্লেষণ দ্বারা তাহা প্রকাশ করিবার উপায় নাই। মানব-চরিত্রে রবীন্দ্রনাথের যে সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল, তাহা তাঁহার কথাসাহিত্যের কাব্যধর্মী বিশ্লেষণের ভিতর দিয়া অপরূপত্ব লাভ করিয়াছে। এই বিশ্লেষণের ভিতর দিয়া রবীন্দ্র-কথাসাহিত্যের রস প্রকাশ পাইয়াছে; বিশ্লেষণের অংশ পরিত্যাগ করিয়া ইহাদের ভিতর হইতে কেবল মাত্র নাট্যিক ক্রিয়ার অংশ সন্ধান করিতে গেলে ইহাদের রস-পরিচয়ে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। বিশেষত রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের জীবনচেতনা, অবিমিশ্র বাস্তবধর্মী নহে—ইহার মধ্যে কবির স্বপ্নদৃষ্টিও জড়িত হইয়া আছে; সেইজন্য তাঁহার মধ্যে নাটক রচনার প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও বাস্তব জীবন-দর্শনে বৈচিত্র্যহীনতার জন্য তাহা সার্থকভাবে রূপায়িত হইতে পারে নাই।

রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগে সচেতনভাবে ইংরেজি One Act Dramaর অনুকরণে বাংলা সাহিত্যে কয়েকজন একাঙ্ক নাটক রচনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ইতিপূর্বে এই শ্রেণীর যে কয়খানি নাটকের কথা উল্লেখ করিলাম, তাহাদের একটিও ইংরেজি আদর্শে রচিত একাঙ্ক নাটকের অনুকরণে কিংবা প্রেরণায় রচিত নহে—তবে তাহাদের মধ্যে আধুনিক ইংরেজি একাঙ্ক নাটকের ধর্ম প্রকাশ পাইয়াছে এই মাত্র। রবীন্দ্রোত্তর যুগে যাঁহারা ইংরেজি আদর্শে একাঙ্ক নাটক রচনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা করিয়া যশোলাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের একাঙ্ক নাটক রচনায় একটি প্রধান ত্রুটি এই প্রকাশ পাইয়াছে যে, তাঁহারা পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনার আঙ্গিক ইহার উপর ব্যবহার করিয়াছেন। একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, একাঙ্ক নাটক নাটক হইলেও আনুপূর্বিক পূর্ণাঙ্গ নাটকের সমধর্মী নহে। পূর্ণাঙ্গ নাটকের বিস্তৃতির মধ্যে জটিল দ্বন্দ্ব এবং কুটিল ঘটনার আবর্ত সৃষ্টি করা যেমন সম্ভব, একাঙ্ক নাটকে তাহা সম্ভব হইতে পারে না। অথচ যাঁহারা পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে নাট্যরচনা সম্পর্কে যে একটি সুদৃঢ় সংস্কার গড়িয়া উঠে, তাহার প্রভাব হইতে তাঁহারা সহজে পরিত্রাণ পাইতে পারেন না। বাংলা

সাহিত্যেও যে কয়জন পূর্ণাঙ্গ নাটক রচয়িতা একাঙ্ক নাটক রচনায় মনোযোগী হইয়াছেন, তাঁহারা পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনার আঙ্গিক তাঁহাদের রচিত একাঙ্ক নাটকের উপরও আরোপ করিয়া এই বিষয়ে ব্যর্থকাম হইয়াছেন। একজন ছোটগল্প রচয়িতা সার্থক একাঙ্ক নাটক রচয়িতা হইতে পারেন, কিন্তু একজন নাট্যকার সার্থক একাঙ্ক নাটক রচনা করিতে পারেন না। কারণ, পূর্ণাঙ্গ নাটকের ক্রমপরিণতি কিংবা তাহার ক্রমবিকাশের বিশিষ্ট কোনও ধারা অনুসরণ করিয়া একাঙ্ক নাটকের বিকাশ হয় নাই—একাঙ্ক নাটক আধুনিক ছোটগল্প রচনার প্রেরণা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। অতএব ইহা বিশ্লেষণ করিলে ইহার মধ্যে ছোট গল্প রচনার উপকরণের সন্ধান যত পাওয়া যাইবে, পূর্ণাঙ্গ নাটকের উপকরণের সন্ধান তত পাওয়া যাইবে না। বাংলা সাহিত্যের ছোট গল্প ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে; অতএব ছোটগল্পের উপকরণ অথবা বিষয়বস্তু যদি একাঙ্ক নাটক রচনায় সার্থকভাবে নিয়োজিত হইতে পারে, তবে বাংলা সাহিত্যের একাঙ্ক নাটকও ইহার ছোট গল্পের মত বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী হইতে পারে। আধুনিক বাংলা পূর্ণাঙ্গ নাটক তেমন উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই, অতএব তাহার বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক দ্বারা রচিত একাঙ্ক নাটকও যে উচ্চ গৌরবের অধিকারী হইতে পারিবে না, ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

আধুনিক নাটক কেবল দৃশ্যই নহে, পাঠ্যও বটে। যাঁহারা মনে করেন যে, পূর্ণাঙ্গ নাটকের মত একাঙ্ক নাটকেও দৃশ্যগুণ বর্ধিত করিবার জন্য ইহার মধ্যে রোমাঞ্চকর ঘটনার সমাবেশ করা প্রয়োজন, তাঁহারা ইহার সম্পর্কে যে একটি মৌলিক ভুল করিয়া থাকেন, তাহার ফলেই সাধারণ পাঠক ইহাদের জন্য কোনও আকর্ষণ অনুভব করিতে পারেন না। একাঙ্ক নাটকের পরিমিত পরিসরের মধ্যে রোমাঞ্চকর নাট্য-ক্রিয়া (dramatic action)-র কোনও অবকাশ নাই। কিন্তু আমাদের দেশের নাট্যকারদিগের উপর হইতে এলিজাবেথীয় যুগের নাট্যরচনার সংস্কার আজিও সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই—তাহারই অসংযত প্রকাশ সার্থক একাঙ্ক নাটক রচনার অন্তরায় হইয়াছে।

॥ ১১ ॥ কাব্য-নাটক

সাম্প্রতিক বাংলা নাট্যসাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য নাটকের প্রভাব বশতই এক শ্রেণীর নাটক আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা কাব্য নাটক নামে পরিচিত। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের নাটকগুলিকেও কাব্য-নাট্য কিংবা নাট্য-কাব্য সংজ্ঞায় অভিহিত করা যায় তবে তাহাদের প্রকৃতি সাম্প্রতিক কাব্য-নাটকগুলি হইতে স্বতন্ত্র। আধুনিক কবিতার আঙ্গিক ব্যবহার করিয়া ইহাতে কবিতায় যে নাট্যকাহিনী বর্ণিত হয়, তাহার মধ্যে আধুনিক কবিতার মতই অস্পষ্টতা এবং দুর্বোধ্যতা দেখা দেয়। অথচ নাটকের পক্ষে ইহা একটি গুরুতর ত্রুটি। ইহাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ জীবনানুভূতির যে অভাব দেখা যায়, তাহার ফলেই ইহাদের নাটকীয় গুণও অনেকখানি বিনষ্ট হয়। আধুনিক কবিতার মত ইহাদের মধ্যেও অলঙ্কার-শাস্ত্রের শাসনমুক্ত নূতন নূতন উপমা এবং শব্দ-গুচ্ছের ব্যবহার হইয়া থাকে, ইহাদের মধ্যে কাব্যত্বই প্রাধান্য লাভ করিয়া নাটকীয়তা গৌণ হইয়া যায়। তাহার ফলে ইহাদের মধ্যে যে গুণটি প্রকাশ পায়, তাহা কদাচ নাটকের গুণ নহে, বরং আধুনিক কবিতারই গুণ।

নাটকের বস্তুলীনতাকে ক্ষুণ্ণ করিয়া যখন তাহার মধ্যে কাব্য অনধিকার প্রকাশ করে, তখনই বুঝিতে পারা যায় যে, জাতির জীবন হইতে বলিষ্ঠ জীবন-চেতনা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আধুনিক যুগেও জীবন হইতে নাটকের প্রত্যক্ষ উপকরণ সংগৃহীত হইতে পারিতেছে না বলিয়াই নানা কল্পিত উপকরণ এবং কাব্যধর্মী ভাষা তাহার মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। জীবন-বোধের অস্পষ্টতার জন্যই নাটকে কাব্য প্রাধান্য লাভ করে; জীবন-বোধের যে অস্পষ্টতা আধুনিক কবিতাকে অস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে, তাহা হইতেই কাব্য-নাটকের সৃষ্টি হইয়া তাহার মধ্যেও অস্পষ্ট জীবনের রূপ প্রকাশ করিতেছে মাত্র। সুতরাং নাটকে কাব্যধর্মী রচনার প্রভাব নাটকের পক্ষে কোন আশার কথা নহে। কিন্তু এ কথা আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সমালোচকগণও অনেকেই স্বীকার করিতে চাহেন না। একজন আধুনিক শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্ত্য সমালোচক লিখিয়াছেন, 'Poetry is the natural and complete medium for drama.' এই বিশ্বাস হইতেই আধুনিক নাট্য-সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্যেও কাব্য-নাটকের উদ্ভব হইয়াছে।

সাম্প্রতিক কাব্য-নাটকের দুইটি রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার একটি রূপ প্রাচীনপন্থী কবিতার আঙ্গিক অনুসরণ করিয়া রচিত হইতেছে, আর একটি ধারা আধুনিক কবিতার আঙ্গিক অনুসরণ করিয়া রচিত হইতেছে। বাংলা নাট্যসাহিত্যে এই লক্ষণ কেবল মাত্র পশ্চিমবঙ্গের নাট্যকারদিগের মধ্যেই যে

দেখা দিয়াছে তাহা নহে, পূর্ববঙ্গের কবিগণও এই দুইটি ধারা অনুসরণ করিয়া কাব্যনাট্য রচনা করিতেছেন। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য হইতেই ইহার এই উভয় ধারাই বাংলা সাহিত্যের প্রবাহে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। পূর্ব বাংলার কবিগণ এই বিষয়ে পশ্চিম বঙ্গের কবিদিগকে অনুসরণ করিতেছেন, এমন কথা বলা যায় না।

যাঁহারা কাব্যরচনার প্রাচীন ধারা অনুসরণ করিয়া কাব্য-নাটক রচনা করিতেছেন, তাঁহারা তাঁহাদের রচনায় মধুসূদন-প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিতেছেন। কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার আজ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে ইহার উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া ইহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিবার প্রয়াস দেখা দিয়াছে। কিন্তু এই প্রয়াস সার্থক হইতে পারে না। কাব্যভাষার ক্রমবিকাশের ধারায় যাহা বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহাকে নূতন যুগে নূতন কোন প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ করিবার জন্য পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব নহে। যাহা ক্রমবিকাশের ধারার অন্তর্নিবিষ্ট হইতে পারে নাই, তাহার পুনরাবির্ভাব ঘটিলে তাহা প্রাণশক্তি হইতে বঞ্চিত হয়। সুতরাং অমিত্রাক্ষর ছন্দের ভিতর দিয়া রচিত কাব্যনাট্য যেমন আধুনিক কাব্যও হইতে পারে নাই, তেমনই তাহা প্রত্যক্ষতা এবং বস্তুধর্মিতার গুণ হইতে বঞ্চিত হইয়া যথার্থ নাটকও হইয়া উঠিতে পারে নাই ; তাহাতে কবিতার গুণই অধিক প্রকাশ পাইতেছে।

আধুনিক কবিতার আঙ্গিক অনুসরণ করিয়া যাঁহারা নাট্যকাব্য রচনা করিতেছেন, তাঁহাদের রচনায় আধুনিক কবিতার সকল ত্রুটিই বর্তমান। তাহার মধ্যে ভাবের অস্পষ্টতা এবং দুর্বোধ্যতা নাট্যকাহিনীর সহজ ধারাটি অনেক সময় বিপর্যস্ত করিয়া তুলিতেছে। নাটকের বিষয় এবং কাব্যের বিষয় এক নহে, সুতরাং কাব্য দিয়া নাটকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। বিশেষত সেই কাব্যের ভাবে যদি অস্পষ্টতা প্রকাশ পায়, তবে তাহাতে নাট্য-কাহিনীর প্রধানতম যাহা গুণ অর্থাৎ ভাবপ্রকাশের প্রত্যক্ষতা তাহা বিনষ্ট হয়। তবে কাব্য-নাট্যকে যদি আধুনিক কাব্য হিসাবেই গ্রহণ করা যায়, তবে তাহার সম্পর্কে এত কথা বলিবার কোন প্রয়োজন হয় না। আধুনিক কাব্য-নাট্য প্রধানত আধুনিক কবিদেরই রচনা, সুতরাং ইহা প্রধানত কাব্য তবে নাটকের ভঙ্গিতে লেখা এই মাত্র। বাংলা নাট্যরচনার মধ্যযুগে গিরিশচন্দ্র এবং পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথও যে কাব্য-নাটক রচনা করিয়াছেন, তাহা যতখানি কাব্য, ততখানি নাটক নহে।

॥ ১২ ॥ অনুবাদ নাটক

বাংলা নাটকের জন্মকাল হইতেই অনুবাদ নাটকেরও একটি ধারা এদেশের সাহিত্যে প্রবর্তিত হইয়াছিল; কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে সংস্কৃত হইতেই হউক কিংবা ইংরেজি নাটক হইতেই হউক, যাহা হইত তাহা অনুবাদই হইত; কিন্তু সম্প্রতিক কালে তাহার পরিবর্তে যাহা হইতেছে, তাহা আক্ষরিক অনুবাদ নহে, বরং প্রধানত ভাবানুসারী রচনা। সাম্প্রতিক কালে বাংলা নাটকের অনুবাদ-কার্যে যাঁহারা ব্যাপৃত আছেন, তাঁহারা তাঁহাদের একটি প্রধান দায়িত্ব বিস্মৃত হন; তাহা এই যে, তাঁহারা এ কথা ভুলিয়া যান, যে-দেশের নাটক তাঁহারা অনুবাদ করেন, তাহার সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের রস এবং চিন্তার বিশিষ্টতা দ্বারাই সে দেশের নাটক রচিত হইয়া থাকে, সুতরাং ইহার কেবল মাত্র ভাষান্তরণের মধ্য দিয়াই ইহাকে আপনার করিয়া লওয়া যায় না। এমন কি, এই বিষয়ে কাব্য কিংবা উপন্যাস অনুবাদকের যে দায়িত্ব আছে, নাট্যকারের দায়িত্ব তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি। কারণ, কাব্য এবং উপন্যাস ব্যক্তিকেন্দ্রিক উপলব্ধির বিষয়, একজন তাঁহার ব্যক্তিগত শিক্ষা এবং সংস্কার অনুযায়ী যে কোন দেশের কাব্য এবং কথাসাহিত্য মূল রচনা হইতেও উপভোগ করিতে পারেন। কিন্তু নাটক দৃশ্য এবং এই গুণের জন্যই, এমন কি, নিরক্ষর জনসাধারণের উপরও ইহার ব্যাপক প্রভাব রহিয়াছে। সুতরাং যাঁহারা প্রকৃত সমাজ-হিতৈষী তাঁহারা সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যাহা ব্যাপকভাবে সমাজের পক্ষে হানিকর, তাহার প্রচার করা যে অসঙ্গত তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন।

দুর্ভাগ্যের বিষয় সাম্প্রতিক নাট্যকারগণ দলীয় স্বার্থকে যত বড় করিয়া দেখিতেছেন, বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থকে তত বড় করিয়া দেখিতেছেন না। সেইজন্য দলীয় স্বার্থে এমন বিষয়কেও তাঁহারা বাংলা সাহিত্যের ভিতর দিয়া পরিবেশন করিতে চাহিতেছেন, যাহা বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থের পরিপন্থী। এই শ্রেণীর নাটককে প্রধানত দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়, প্রথমত নৈতিক এবং দ্বিতীয়ত রাজনৈতিক। প্রথম শ্রেণীর নাটকের মধ্যে দেখা যায়, যাঁহারা ইহাদের অনুবাদ করেন, তাঁহারা মনে করেন, পৃথিবীর সকল দেশের মানুষই এক, তাহাদের সমস্যাও এক, সমস্যা সমাধানের পথও এক। ইহার মত ভুল আর কিছুই হইতে পারে না। নাটকের মধ্যে যে চরিত্রগুলিকে আমরা পাই, তাহা দেশে দেশে অভিন্ন নহে, তাহাদের অন্তর্মুখী পরিচয়

অর্থাৎ ক্ষুধা-তৃষ্ণা বাসনা-কামনার অনুভূতির মধ্যে ঐক্য থাকিলেও ইহাই তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় নয়। ইহার বহির্মুখী যে আর একটি পরিচয় আছে, তাহার দ্বারা মানুষের অন্তর্মুখী পরিচয় সর্বদাই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে, এই বহির্মুখী পরিচয়ের মধ্যেই দেশে দেশে এবং জাতিতে জাতিতে পার্থক্য। এই পার্থক্য যদি না থাকিত, তবে মানুষও পশুপক্ষীর মত বৈচিত্র্যহীন জীব হইয়া থাকিত। মানুষের বহির্মুখী আচার আচরণে পার্থক্য আছে, তাহার ভাষার মধ্যে পার্থক্য আছে, তাহার বহির্মুখী জীবনের কর্মে পার্থক্য আছে; ভূমণ্ডলের প্রাকৃতিক পার্থক্যই ইহার মূল বলিয়া ইহা এত শক্তিশালী যে তাহাকে অস্বীকার করিলে জীবন কিংবা মানুষ সম্পর্কে কোন সত্যোপলব্ধি সম্ভব হয় না। যে সকল অনুবাদক সম্পূর্ণ দায়িত্বহীন, তাঁহারাই ইহা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া ভিন্ন দেশের কথা, তাহার জীবনাচরণ অনুবাদের মধ্য দিয়া দেশান্তরে আরোপ করিতে যান। তাহার যে কি বিষময় প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে, তাহা তাঁহারা ভাবিয়াও দেখেন না।

সাম্প্রতিক কালে পৃথিবীর কোন কোন জাতি ধর্মের প্রয়োজনীয়তাকে সমাজ ও ব্যক্তি জীবনে একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছে। কি ভাবে সেই সকল দেশে ধর্মচিন্তাহীন সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা অনুসন্ধান না করিয়া তাহাদের জীবনাচরণের কথা যদি ভারতীয় জীবনের উপর আজ আমরা আরোপ করিতে যাই, তাহা হইলে আমরা যে ভুল করি, তাহা কেবল মাত্র ইতিহাসেরই ভুল নহে, মানব চরিত্রের মৌলিক ধর্ম সম্পর্কেই ভুল। পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, ইহাতে এমন কতকগুলি দেশ এবং জাতি আছে, যাহাদের মধ্যে সমাজের সংহতি-সৃষ্টির মূলে উচ্চতর ধর্মচিন্তার বিকাশ নিতান্ত আধুনিক নহে। নিতান্ত বর্বর অবস্থা হইতে সহসা বিশেষ কোন সুযোগ লাভ করিয়া পৃথিবীর কোন কোন জাতি অতি অল্পদিনের মধ্যে 'সভ্যতা'র মঞ্চে আরোহণ করিয়াছে। কিন্তু ভারতীয় জীবনে ধর্মসাধনের ধারা সহস্র বৎসর ধরিয়া বিস্তার লাভ করিয়াছে। ইহার অগ্রগতির মধ্যে ইহা যে প্রাণশক্তি (vitality) সঞ্চয় করিয়াছিল, তাহা দ্বারাই ইহা জাতির জীবনে নিজের পরিচয়কে সুদৃঢ় করিয়া লইয়াছে। ভারতীয় জীবনের এই ধর্মবোধের মধ্যে সত্য আছে নাই, তাহা বিচারের বিষয় নহে; যাঁহারা নাটক লেখেন, অনুবাদ করেন, কিংবা সমালোচনা করেন, ভারতীয় জীবনকে রূপায়িত করিতে গিয়া তাঁহারা ইহার প্রভাব কতদূর লক্ষ্য

করিয়া থাকেন, তাহাই কেবলমাত্র বিচারের বিষয়। যদি এ বিষয় তাঁহারা লক্ষ্য না করেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, এ দেশের কথা তাঁহারা বলিতে চাহেন না, কিংবা বলিতে পারেন না এবং যে দেশের কথা তাঁহারা বলিতে চাহেন, তাহার সঙ্গে এ দেশের অনুভূতি ও বিশ্বাসের কোন আন্তরিক যোগ নাই। এই যোগ নাই বলিয়াই তাঁহাদের অনুবাদই হউক কিংবা মৌলিক রচনাই হউক, তাহা দীর্ঘ কাল স্থায়িত্ব লাভ করিয়া জাতির কোন স্থায়ী সম্পদ রূপে গণ্য হইতে পারিতেছে না। ক্ষণিক উত্তেজনা কিংবা ব্যক্তিগত কোন মোহ যদি কোন সৃষ্টির প্রেরণা দেয়, তবে তাহা যে যথার্থ সৃষ্টি নহে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

সাম্প্রতিক বাংলা নাটকের অনুবাদের কাজ দুই ভাবে চলিতে দেখা যায়, প্রথমত স্বীকৃত অনুবাদ, দ্বিতীয়ত অস্বীকৃত অনুবাদ। অনুবাদ স্বীকৃত হউক কিংবা অস্বীকৃত হউক, তাহা জাতির জীবন-রসে জারিত না হইলে তাহা দ্বারা জাতির সম্পদবৃদ্ধি হইতে পারে না; বরং আপদ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। দায়িত্বজ্ঞানশূন্য অনুবাদকগণ অনূদিত বিষয়বস্তুকে জাতির জীবন-রসে জারিত করিয়া লইবার প্রয়োজনীয়তাটুকু উপলব্ধি করিতে পারেন না বলিয়া তাঁহাদের এই শ্রেণীর রচনা দ্বারা যে পরিমাণ জাতির অকল্যাণ সাধিত হইতেছে, অন্য কোন বিষয় দ্বারা তাহা তত হইতে পারিতেছে না। অনুবাদ নাটক অভিনয় কিংবা পাঠ করিবার মূল্য একমাত্র শিক্ষাগত বা academic; ইহার মধ্যে জাতির নিজস্ব রূপটি বিধৃত থাকে না বলিয়া ইহার সঙ্গে জাতির নিজের চিন্তা এবং কর্মের কোন সম্পর্ক প্রকৃতপক্ষে থাকিতে পারে না, তবে এই সম্পর্ক আছে বলিয়া এক শ্রেণীর দর্শক এবং পাঠকের ভ্রমোৎপাদন হইয়া থাকে। এই ভ্রম হইতেই অকল্যাণের সূচনা হয়। জাতির জীবনের সঙ্গে তাহার ভাষা এবং আচার আচরণের সঙ্গে যাঁহাদের সুনিবিড় যোগ নাই, তাঁহারাই প্রধানত অনুবাদ রচনার সহজ পথ অবলম্বন করিয়া জাতির সর্বনাশ অনিবার্য করিয়া তুলেন। অনুবাদ যদি অনুবাদ রূপেই গৃহীত হইত অর্থাৎ অনুবাদের দৃষ্টিতেই অনুবাদকে দেখা হইত, তবে ইহা দ্বারা অকল্যাণ হইবার কিছু আশঙ্কা ছিল না; কিন্তু সাম্প্রতিক আনুবাদকারিগণ এমন এক সুচতুর কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকেন, যাহার জন্য জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষপরিচয়হীন দর্শকের নিকট অনুবাদকে মূল বলিয়া ভ্রম হয়। একদিন যখন দেশের সমাজ-জীবনের সঙ্গে মানুষের পরিচয় নিবিড়তর ছিল, তখন নাটকের অনুবাদ অভিনয়ের ভিতর দিয়া কতদূর

সার্থকতা লাভ করিত, বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে তাহার একটি বিশিষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। বিগত শতাব্দীতে গিরিশচন্দ্র ঘোষ সেক্সপীয়রের সুপ্রসিদ্ধ নাটক 'ম্যাক্‌বেথ' বাংলায় অনুবাদ করিয়া অভিনয়ের আয়োজন করিয়াছিলেন, এ কথা সকলেই জানেন। এমন কি, আধুনিকতম কাল পর্যন্ত বিদেশী নাটকের যত অনুবাদ হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র কৃত সেক্সপীয়রের 'ম্যাক্‌বেথ' নাটকখানির অনুবাদই যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। সুতরাং যে নাটকের লেখক সেক্সপীয়র এবং অনুবাদক গিরিশচন্দ্র তাহার যে নানা আকর্ষণীয় গুণ থাকিবে, তাহা বলাই বাহুল্য। বহু অর্থব্যয়ে গিরিশচন্দ্র তাঁহার তদানীন্তন পরিচালিত রঙ্গমঞ্চে ইহার অভিনয়ের ব্যবস্থা করিলেন; কিন্তু তখন পর্যন্তও বাঙ্গালী নিজের সমাজ-জীবনের আদর্শ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। সেইজন্য গিরিশচন্দ্রের এই প্রচেষ্টার কি পরিণাম দেখা দিয়াছিল? এই নাটকের অভিনয়ের প্রথম রাত্রিতে কৌতুহলাক্রান্ত জনতায় প্রেক্ষাগৃহ এক প্রকার পূর্ণ থাকিলেও, দ্বিতীয় রাত্রি হইতেই দর্শকের সংখ্যা হ্রাস পাইয়া গেল এবং তৃতীয় রাত্রির অভিনয়ের পরই দর্শকাভাবের জন্য গিরিশচন্দ্র ইহার অভিনয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। পরের সপ্তাহেই গিরিশচন্দ্র নূতন এক পৌরাণিক নাটক মঞ্চস্থ করিয়া পুনরায় বিপুল দর্শক আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে উত্তম অভিনীত অনুবাদ নাটকের অভিনয়ে যে দর্শকের অভাব হয় না, ইহার প্রধান কারণ, এই ৬০।৭০ বৎসরের ব্যবধানে শিক্ষিত বাঙ্গালী তাহার নিজের সমাজ এবং ধর্মজীবনের আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, অন্য কোন বিশিষ্ট আদর্শকেও যে সুনিবিড়ভাবে আকর্ষণ করিয়া ধরিয়াছে, তাহাও নহে—তবে দিশাহারার মত এ-দিকে সে-দিকে তাকাইতেছে মাত্র। কারণ, দেশান্তরের সমাজ-জীবনের আদর্শের মধ্যে যে শক্তিই থাকুক না কেন, তাহা দেশান্তরেরই শক্তি, এ-দেশের জলবায়ুতে তাহার মূল কখনও গভীরে গিয়া প্রবেশ করিতে পারে না। দেশান্তরের নীতি অন্য দেশের দুর্নীতি হইতে পারে, পাশ্চাত্ত্যের বহু সমাজ-নীতিই আমাদের দেশে দুর্নীতি ব্যতীত আর কিছুই নহে; সুতরাং পাশ্চাত্ত্য জীবনের আদর্শকে যাঁহারা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাহার নীতিবোধকে জীবনে গ্রহণ করিতে চাহেন, তাঁহারা সমাজের নৈতিক শক্তিকে দুর্বল করিয়া থাকেন, সমাজের কোন কল্যাণ করেন না।

'নাট্য আন্দোলন'

বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ বাংলাদেশে সৌখীন এবং ব্যবসায়ী রঙ্গ-মঞ্চের অভিনয়ে নূতন প্রাণসঞ্চার হইয়াছে। যদিও কলিকাতার ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চ সংখ্যার দিক দিয়া বৃদ্ধি পায় নাই, এমন কি, নব-প্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চ একটি অকালে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তথাপি যে কয়টি রঙ্গমঞ্চ নিয়মিত অভিনয় করিয়া যাইতেছে, বহু অর্থব্যয়ে তাহাদের বহিরঙ্গের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং ইহাদের প্রত্যেকটিতেই প্রচুর দর্শক আকৃষ্ট হইতেছে। মঞ্চোপকরণ, আলোকসজ্জা প্রভৃতি বিষয়ে প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে উচ্চাঙ্গের অভিনয়-গুণেরও বিকাশ দেখা যাইতেছে। এই সকল ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চের অভিনয় হইতে প্রেরণা লাভ করিয়া এবং অনেক ক্ষেত্রে স্বাধীন ভাবেও কলিকাতা এবং মফঃস্বলের বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে অভিনয় করিবার স্পৃহা জাগ্রত হইয়াছে। কলিকাতার বিশিষ্ট কোন ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চ এদেশের সৌখীন নাট্যাভিনয় ও নাট্য-রচনায় উৎসাহ দিবার জন্য একাঙ্ক ও পূর্ণাঙ্গ নাটক 'প্রতিযোগিতা'র আয়োজন করিয়াছেন এবং তাহাতে দেশবাসীর পক্ষ হইতে আশাতীত সাড়া পাওয়া যাইতেছে।

স্বাধীনতা লাভের পূর্বে কলিকাতা ও বাংলার পল্লী অঞ্চলে 'ক্লাব' কিংবা বিভিন্ন সমিতি নামক যে সকল প্রতিষ্ঠান ছিল, তাহাদের অধিকাংশেরই 'গ্রন্থাগার পরিচালনা' ও সমাজসেবা গৌণ উদ্দেশ্য থাকিলেও সন্ত্রাসবাদের পৃষ্ঠপোষকতাই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময় সেগুলি বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে, স্বাধীনতা লাভের পর ইহারা নূতন পরিবেশে নূতন করিয়া গঠিত হইয়াছে। পল্লীর সমাজ-জীবন আজ বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, কলিকাতা এবং তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যে নূতন সমাজ-জীবন গঠিত হইতেছে, তাহাতে সেই 'ক্লাব'গুলি নূতন রূপ লাভ করিতেছে। রাজনৈতিক মতবাদের পৃষ্ঠপোষকতা ইহাদের মধ্য হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়া সাংস্কৃতিক জীবনের অনুশীলন ইহাদের লক্ষ্য হইয়াছে। সেই সূত্রেই নাট্যাভিনয় প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেরই একটি বাৎসরিক কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতার সরকারী এবং সদাগরী আপিস-গুলিতে আজকাল শিক্ষিত কর্মচারীর অভাব নাই, তাহাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই যে সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠান আছে, নাট্যাভিনয় তাহাদেরও

বাৎসরিক কর্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। ইতিপূর্বে এই সকল প্রতিষ্ঠানে নাট্যাভিনয়ের কালে সাধারণত পুরুষেরা স্ত্রী-অংশেরও অভিনয় করিতেন; কিন্তু বর্তমানে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা বিস্তারের ফলে ভদ্রগৃহের শিক্ষিতা বিবাহিতা ও কুমারী মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করিতেছেন। তাহার ফলে সৌখীন সম্প্রদায়গুলির অভিনয় বহুলাংশে জীবন্ত ও বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে। সেইজন্য অভিনয়ের প্রতি নানাদিক দিয়া আকর্ষণ সৃষ্টি হইয়াছে। সকল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গতি সমান নহে,—কোন প্রতিষ্ঠান বহু অর্থব্যয় করিয়া সাধারণ রঙ্গমঞ্চ ভাড়া লইয়া পূর্ণাঙ্গ নাটক অভিনয় করিতে পারে, আবার কোন প্রতিষ্ঠান সঙ্গতির অভাবে ক্ষুদ্রতর নাটক অভিনয় করিতে বাধ্য হয়; তাহাদের জন্য একাঙ্ক নাটকের প্রয়োজন হয়। এই সকল অগণিত সৌখীন প্রতিষ্ঠানের অভিনয় করিবার মত নাটকের দাবী মিটাইবার জন্য যেমন নূতন নূতন পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনার প্রেরণা দেখা দিয়াছে, তেমনই ক্ষুদ্রতর প্রতিষ্ঠানগুলির অভিনয়-সামর্থ্যের অনুকূল একাঙ্ক নাটক রচনার প্রেরণাও কার্যকরী দেখা যাইতেছে। নাটক অভিনয় ও রচনার প্রতি আধুনিক কালে এই যে ব্যাপক আকর্ষণ সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাকেই কেহ কেহ 'নাট্য আন্দোলন' নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে, ইহার সঙ্গে নবনাট্য আন্দোলনের পার্থক্য আছে। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে নবনাট্য আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে; কারণ, কালানুক্রমের বিচারে ইহা দ্বিতীয় খণ্ডেরই বিষয়।

যুগ-বিভাগ

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসকে সাধারণত চারি ভাগে ভাগ করা যায়;—প্রথমত আদি যুগ, দ্বিতীয়ত মধ্যযুগ, তৃতীয়ত আধুনিক যুগ এবং সর্বশেষ সাম্প্রতিক যুগ। রামনারায়ণ তর্করত্ন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্র এই তিনজনকেই বিশেষ করিয়া আদিযুগের প্রতিনিধি বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। তারপর মধ্যযুগ আরম্ভ হয় মনোমোহন বসুকে লইয়া এবং রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পর সে-যুগের অবসান ঘটে। এই যুগকে যাঁহারা বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বাংলা নাট্যসাহিত্যের

আধুনিক যুগের প্রকৃতি একটু জটিল। রবীন্দ্রনাথ হইতে এই যুগের সূত্রপাত হইয়াছে বলিয়া যদি ধরিয়া লওয়া হয়, তবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আদি যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলা নাট্যসাহিত্যের যে ধারাটির সূত্রপাত হইয়াছিল, ইহার সহিত তাহার কোন যোগ নাই, কিংবা রবীন্দ্রোত্তর যুগেও ইহার কোন প্রভাব বিস্তৃত হইতে পারে নাই। তবে রবীন্দ্রনাথকেই যদি আধুনিক যুগের একমাত্র প্রতিনিধি বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে ইহার অসঙ্গতি কতকটা দূর হইতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে বাংলা নাট্যসাহিত্যের একটা সম্পূর্ণ যুগের প্রতিনিধি বলিয়া ধরিয়া লইতেও বাধা আছে। সাহিত্যে যাঁহারা একটা যুগের প্রতিনিধি বা স্রষ্টা তাঁহাদের সঙ্গে সমসাময়িক যুগচৈতন্যের যোগ থাকা যে একান্ত প্রয়োজন, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না; কিংবা যদি একান্ত তাহা না-ই থাকে, তবে তাঁহাদের সাহিত্য-সৃষ্টি দ্বারা অন্তত যুগের রুচি নিয়ন্ত্রিত করিবার শক্তিও তাঁহাদের থাকা প্রয়োজন। বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে যাঁহারা যুগসৃষ্টি করিবার গৌরব লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই সমসাময়িক যুগের রস-চৈতন্যকে অস্বীকার করিয়া থাকিতে পারেন নাই। মাইকেল মধুসূদন দত্তের মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কারমুক্ত বাঙ্গালীর নবপ্রবুদ্ধ মানবতার বাণী ধ্বনিত হইয়াছে, বৃহত্তর যুগ-জীবনের ভিত্তিভূমির উপর বঙ্কিমের সাধনপীঠ স্থাপিত হইয়াছিল, এমন কি, রবীন্দ্রনাথও কাব্যসাহিত্যে যে নূতন যুগের সৃষ্টি করিলেন, বিহারীলাল, কামিনী রায় প্রভৃতির কাব্যসাধনায় তাহার পটভূমিকা পূর্ব হইতেই রচিত হইয়াছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নাট্যরচনার ভিতর দিয়া নাট্যসাহিত্যের পূর্ববর্তী কোন ধারা কিংবা সমসাময়িক কোন যুগচৈতন্যকে যেমন স্বীকার করেন নাই, তেমনই তাঁহার নাট্যসাহিত্য সৃষ্টি যতই সমৃদ্ধ হউক না কেন, তাহা দ্বারাও তাঁহার পরবর্তী নাট্যকারদিগের জন্য কোন সুস্পষ্ট ধারার নির্দেশ দিয়া যাইতে পারেন নাই। এক দিক দিয়া বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাধনাও তাঁহার কাব্যসাধনার সঙ্গেই অখণ্ডভাবে জড়িত, এক হইতে অপরকে বিচ্ছিন্ন করিবার উপায় নাই।

কিন্তু তাহা হইলে বাংলা নাট্যসাহিত্যের আধুনিক যুগ বলিয়া কি কিছু নাই? এখনও কি ইহা মধ্যযুগেরই পর্যুষিত রীতিরই অনুগমন করিতেছে? কিন্তু তাহাও ত বলিতে পারা যায় না। রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্যসৃষ্টি

এতই অভিনব, এক দিক দিয়া এতই সমৃদ্ধ ও এতই বিচিত্র যে, ইহাকে ত মধ্যযুগের সঙ্গে অভিন্ন করিয়া কিছুতেই বিচার করা চলে না। অথচ আধুনিক যুগেও এমন কোন শক্তিমান্ নাট্যকারের আবির্ভাব হয় নাই, যাহার দ্বারা প্রকৃত যুগসৃষ্টি কিংবা যুগের প্রতিনিধিত্ব করা সম্ভব হইয়াছে। যদি তাহাই হইত,—যদি কোনও প্রকৃত প্রতিভাশালী নাট্যকার আধুনিক যুগে আবির্ভূত হইয়া বাঙ্গালীর আধুনিক যুগচৈতন্য হইতে রস সংগ্রহ করিয়া নব নব সৃষ্টির চমৎকারিত্বে নাট্যসাহিত্যে সত্যকার যুগসৃষ্টি করিতে সক্ষম হইতেন, তাহা হইলে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের আজ স্বতন্ত্র স্থান হইত। কিন্তু আজ তাহার অভাবে আধুনিক যুগ বলিয়া যদি নাট্যসাহিত্যের কোন যুগ-নির্দেশ করাই প্রয়োজন হয়, তবে তাহাতে রবীন্দ্র-নাট্যসাহিত্যের দাবী কিছুতেই উপেক্ষা করা যাইতে পারে না। কিন্তু এই সঙ্গে একথাও স্বীকার করিতে হয় যে, রবীন্দ্র-নাট্যসাহিত্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে পূর্বাপর সম্পর্কহীন রবীন্দ্র-ব্যক্তিমানসের এক অভিনব রসসৃষ্টি—ইহার নিজের মধ্যে যে বিস্তৃতি, বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি আছে, তাহা দ্বারাই ইহা আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। অতএব রবীন্দ্রনাথকে বাংলা নাট্যসাহিত্যের আধুনিক যুগের সর্বপ্রধান প্রতিনিধি বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। রবীন্দ্র-প্রতিভার বহুমুখী ধারা বাংলা গীতিকাব্যের ক্ষেত্রে এক নূতন যুগের সৃষ্টি করিলেও নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁহার দানের অভিনবত্ব গীতিকাব্যের এই যুগসৃষ্টির তুলনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নহে।

নাট্যরচনায় রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের সমসাময়িক লেখক হইলেও উভয়ের নাট্যিক আদর্শ স্বতন্ত্র ছিল বলিয়া, প্রথম হইতেই উভয়ের নাট্যরচনা স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছিল। সমসাময়িক বিষয়বস্তু ও ভাবধারার চমৎকারিত্বে দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্র-নাট্যপ্রতিভার প্রথম অংশ সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া দিলেও, কালক্রমে সমসাময়িকতার মোহ যখন জাতির জীবন হইতে দূরবর্তী হইয়া পড়িল, তখনই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নাট্যরচনার ভিতর দিয়া সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের বাণী লইয়া সাধারণের দৃষ্টির সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আসিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই আত্ম-সচেতনতার ভিত্তিতে নাটক রচনা করিয়াছেন, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের সচেতনতা দেশ ও সমাজকে লইয়া, রবীন্দ্রনাথের সচেতনতা একান্তভাবে তাঁহার নিজস্ব ধ্যান-ধারণা লইয়া।

রবীন্দ্রপূর্ব নাট্যসাহিত্যের প্রধান উপজীব্য ছিল সমসাময়িক সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক চৈতন্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে যুগের প্রতিনিধি হইয়া নাট্যসাহিত্যের ভিতর দিয়া আবির্ভূত হইলেন, তাহার মধ্যে এই সকল বিষয়ে জাতি সামগ্রিকভাবে প্রায় একটা স্থৈর্যের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। নাটক বিক্ষুব্ধ বহির্ঘটনার বৈচিত্র্যময় ঘাত-প্রতিঘাত হইতেও উপকরণ সংগ্রহ করিয়া থাকে। রবীন্দ্র-নাট্যপ্রতিভার যখন প্রৌঢ়কাল তখন এদেশে কোনও প্রবল সামাজিক বিক্ষোভ দেখা না দিলেও, রাজনৈতিক বিক্ষোভের অভাব ছিল না। এই রাজনৈতিক বিক্ষোভ হইতে যে তিনি কোন উপকরণই সংগ্রহ করেন নাই, তাহাও নহে; আবার অলক্ষ্যে যে সকল বিষময় ত্রুটি সমাজ-দেহে সঞ্চারিত হইয়া তাহা ভিতরের দিক হইতে ইহাকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া দিবার আয়োজন করিতেছিল, কিংবা স্মরণাতীত কাল ধরিয়া এই সমাজ-দেহে সঞ্চিত হইতেছিল, তাহাও তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারে নাই। কিন্তু তাহা বাহ্যাড়ম্বরের পরিবর্তে সূক্ষ্ম অভিনিবেশের বিবয়ীভূত ছিল বলিয়া তাহা দ্বারা সহজে দর্শকের চোখ ভুলাইতে পারা যায় নাই।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের যে যুগকে মধ্যযুগ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি, তাহাতে যে সকল নাটক বাংলা সাহিত্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশই যুগের সমসাময়িক বিশিষ্ট চিন্তাধারার বাহন ছিল। কিন্তু বাংলা নাট্যসাহিত্যের সাম্প্রতিক যুগে ব্যাপকভাবে সমষ্টির উপর হইতে দৃষ্টি ব্যষ্টির উপর আসিয়া ন্যস্ত হইয়াছে। সমাজে এখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা হইতেছে, সেইজন্য ইহাতে সমাজ-জিজ্ঞাসা অপেক্ষা আত্ম-জিজ্ঞাসাই প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছে। কেবল মাত্র বাংলা নাট্যসাহিত্যের আধুনিক যুগেই যে এই লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা নহে—ইউরোপীয় নাট্য সাহিত্যে এই লক্ষণটি ইতি-পূর্বেই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

তথাপি রবীন্দ্রনাথ এই দেশের ব্যাপক কোন সামাজিক প্রশ্ন লইয়াই কোন নাটক রচনা করেন নাই, তাহাও বলিতে পারা যায় না; কিন্তু রবীন্দ্র-প্রতিভার যাহা বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ তীব্র আত্মসচেতনতা, তাহা দ্বারাই তিনি এই সামাজিক প্রশ্নগুলির বিচার করিয়াছেন। এই বিষয়ে প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন' নাটকখানির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহার ভিতর তিনি রূপকের সহায়তায় প্রাচীন ভারতের যে সঙ্কীর্ণতার চিত্র

আঁকিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক সমাজ-হিতৈষী ব্যক্তিরই চিন্তনীয় বিষয় হইয়া রহিয়াছে। ধর্ম ও সত্যের নামে আচারসর্বস্ব এই সমাজ কি করিয়া যে তাহার চারিদিক ঘিরিয়া সংস্কার ও মিথ্যার সীমাহীন প্রাচীর তুলিয়া তাহার মধ্যে নিজের সমাধি-শয্যা রচনা করিতেছে, কবি 'অচলায়তন' নাটকের ভিতর দিয়া তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এখানেও তিনি সমাজকে সম্পূর্ণ আত্মনিরপেক্ষ হইয়া প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই; এই দেশের সমাজ-সম্পর্কে তাঁহার ব্যক্তিগত যে একটি আদর্শবোধ ছিল, তাহা দ্বারাই তিনি নাট্যবর্ণিত সমাজটির মূল্য বিচার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ সমাজ-বিষয়ক রচনায় হস্তক্ষেপ করিলেও, সেই সমাজকে প্রত্যক্ষ করিবার মধ্যে যে একটি আত্মনির্লিপ্ত বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন হয়, তাহার অধিকারী ছিলেন না বলিয়াই, এই বিষয়ক রচনা তাঁহার অন্যান্য রচনা হইতে শক্তিহীন হইয়াছে। গীতি-কবির পক্ষে এই ত্রুটি অপরিহার্য; সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত কাব্যধর্মী যে-সকল বিষয় লইয়া নাট্য-রচনা করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রচনা বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

সমসাময়িকতা রবীন্দ্র-নাট্যসাহিত্যের আদৌ উপজীব্য ছিল না, এমন কথাও বলিতে পারা যায় না। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া ভারতীয় সভ্যতার আদর্শ যে ক্রমেই শিথিল হইয়া আসিতেছে, রবীন্দ্রনাথ তাহা অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। চিরসরল সৌন্দর্যবিলাসী ভারতীয় জীবনাদর্শের সম্মুখে পাশ্চাত্ত্য যান্ত্রিক সভ্যতা যে কি ভয়াবহ রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, 'রক্তকরবী' নাটকখানিতে রবীন্দ্রনাথ তাহাই দেখাইয়াছেন। জীবনের সরসতা নিঃশেষে শোষণ করিয়া যন্ত্রদানব যে কি করিয়া মানুষকে ক্রমেই অন্তঃসারশূন্য করিয়া দিতেছে, কবি সুগভীর আন্তরিকতার সঙ্গে তাহা এখানে অনুভব করিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মোহগ্রস্ত এই সমাজ এই কথা এমনভাবে আর কোনদিন ভাবিতে শিখে নাই।

বিংশ শতাব্দীর একটি সামাজিক আন্দোলন রবীন্দ্রনাথের একখানি ক্ষুদ্র নাটিকাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। তাহা আধুনিক হরিজন আন্দোলন। 'চণ্ডালিকা' নামে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যটি এই হরিজন আন্দোলনের ভিত্তির উপরই রচিত। যদিও এই সামাজিক সমস্যার পূর্ণাঙ্গ কিংবা আংশিক পরিচয়ও এই নাটকে নাই, এক অস্পৃশ্যা রমণীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষাই ইহার বিশিষ্ট উপজীব্য, তথাপি যে ভিত্তির উপর কবি তাঁহার এই নাট্য-

কাহিনীকে সংস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবেই সমসাময়িক উপকরণ দিয়া রচিত। তাহা ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি রূপক নাট্যের কোন কোন অংশ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক প্রবর্তিত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ছায়াতলে রচিত হইয়াছে।

কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, সমসাময়িক সামাজিক কিংবা আধ্যাত্মিক অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া নাট্যরচনার রীতি বাংলা নাট্যসাহিত্যের আদি ও মধ্যযুগেই প্রচলিত ছিল। আধুনিক নাট্যসাহিত্যের আদর্শ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আত্ম-সচেতনতা আধুনিক কেবল নাট্যসাহিত্য কেন, কথাসাহিত্য ও কাব্যসাহিত্য প্রত্যেকেরই বিশেষত্ব। সেইজন্য আধুনিক নাট্যকারদিগের দায়িত্বও অনেক বেশি। বাস্তব সমাজটিকে রঙ্গমঞ্চে আনিয়া নিখুঁতভাবে উপস্থিত করিয়া দিতে পারিলেই সেকালের নাট্যকারদিগের দায়িত্ব শেষ হইয়া যাইত; কিন্তু আধুনিক কালে এই নিতান্ত সহজ উপায়ে দর্শকের চোখ ভুলাইবার রীতি একেবারেই অচল হইয়া গিয়াছে। ব্যক্তিমনের জটিলতা, তাহার অনন্ত জিজ্ঞাসা—এই সকল নিপুণভাবে কথোপকথনের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া লইয়া নাট্যিক চরিত্রের বিকাশ এই যুগে দেখাইতে হয়। আধুনিক ইউরোপীয় নাটক হইতেই নাট্যরচনার এই আদর্শ বাংলা সাহিত্যেও প্রবেশ লাভ করিয়াছে। আধুনিক গণতান্ত্রিকতার যুগে ব্যক্তি-সত্তার যে মর্যাদা দান করা হইয়াছে, তাহা হইতেই ব্যক্তিমনের ক্ষুদ্রতম সুখদুঃখবোধও সাহিত্যের বিষয়ীভূত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের নাটকেও সর্বসংস্কারমুক্ত এই আধুনিক মনোভাবেরই বিজয় ঘোষিত হইয়াছে—সচেতন মন সর্বত্রই নির্জীব সংস্কারকে আঘাত করিয়া জয়লাভ করিয়াছে।

রবীন্দ্রোত্তর যুগের বাংলা নাটক আঙ্গিকের দিক দিয়া এখনও প্রধানতঃ মধ্যযুগের ধারাই অনুসরণ করিলেও ভাবের দিক দিয়া কতকটা নূতনত্ব লাভ করিয়াছে বলিয়া অনুভূত হইবে। পূর্বেই বলিয়াছি, ইহার সঙ্গে রবীন্দ্র-নাট্যসাহিত্যের কোন যোগ নাই। মধ্যযুগের বাংলা নাটকের যেমন ধর্ম ও সমাজই লক্ষ্য ছিল, রবীন্দ্রোত্তর যুগের নাটকে তাহাদের পরিবর্তে ব্যক্তিস্বার্থই প্রধান লক্ষ্য হইয়াছে। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু লইয়া রচিত নাটকগুলির মধ্যেও আধুনিক যুগোচিত প্রেরণা আসিয়া প্রবেশ করিয়া ইহাদের নিছক বস্তুগুণকে (objectivity) বিকৃত করিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সঙ্গে প্রথম সংঘর্ষের ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে এদেশে যে সংস্কৃতির

সঙ্কট দেখা দিয়াছিল, তাহা নানাভাবে সেই যুগের বাংলা নাট্যসাহিত্যে আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই স্বদেশী আন্দোলনের পরই সেই সঙ্কট এই জাতি কাটাইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া ইহার পরবর্তী নাট্যসাহিত্যে ইহার প্রভাব আর অনুভূত হয় না। তখন যে সঙ্কট দেখা দিয়াছিল, তাহা ব্যক্তিস্বার্থেরই সঙ্কট—নূতন পরিস্থিতিতে গঠিত পারিবারিক জীবনের ভিতর দিয়া এই সঙ্কটের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাই রবীন্দ্রোত্তর যুগের সামাজিক নাটকের প্রধান উপজীব্য। পূর্বেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রোত্তর যুগের পৌরাণিক বিষয়বস্তু লইয়া রচিত বাংলা নাট্যসমূহ রোমান্টিকতা-ধর্মী হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ববর্তী যুগের পৌরাণিক নাটকের সঙ্গে ইহাদের এখানেই প্রধান পার্থক্য দেখা যায়। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য'কে যে কারণে রোমান্টিক মহাকাব্য বলা হয়, সেই কারণেই এই শ্রেণীর পৌরাণিক নাটককেও রোমান্টিক নাটক বলা যাইতে পারে—কারণ, অনেক বিষয়েই ইহা বস্তু-নিরপেক্ষ হইয়া নাট্যকারের নিজস্ব কল্পনার অনুগামী হইয়াছে। ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু লইয়া রচিত নাটকগুলিও প্রধানত তাহাই হইয়াছে। প্রকৃত ইতিহাস ইহাতে গৌণ হইয়া পড়িয়া নাট্যকারের কতকগুলি বিশেষ বক্তব্য বিষয় ইহাদের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়া গিয়াছে। এই হিসাবে ইহারাও রোমান্টিকতা-ধর্মী হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, আত্ম-সচেতন বাঙ্গালীর সর্বজয়ী রোমান্স-বিলাস রবীন্দ্রোত্তর যুগের বাংলা নাট্যসাহিত্যেও আপনার কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহার উচ্চাঙ্গ নাট্যরচনার পথে বাধা সৃষ্টি করিতেছে।

তাহা সত্ত্বেও রবীন্দ্রোত্তর যুগের সামাজিক নাট্যরচনার ক্ষেত্রে কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য নাটক যে রচিত হয় নাই, তাহাও নহে। কিন্তু কয়েকটি বিচ্ছিন্ন প্রয়াসের ভিতর দিয়াই এই সার্থকতার পরিচয় প্রকাশ হইয়াছে বলিয়া সমগ্র-ভাবে ইহা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই।

বাংলা নাটককে সাধারণতঃ কয়েকটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে; যেমন, পৌরাণিক, সামাজিক, রোমান্টিক ও ঐতিহাসিক। । পৌরাণিক নাটকের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই—ইহা প্রধানতঃ বাঙ্গালীরই পুরাণ; কৃত্তিবাস-কাশীরাম ইহার ভিত্তি, বাল্মীকি-বেদব্যাসের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক নাই। অতএব বাঙ্গালীর জাতীয় সংস্কৃতির ধারাই ইহার ভিতর দিয়া অব্যাহত ভাবে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে।। সামাজিক নাটকের দুইটি ভাগ—একটি

গুরু, অপরটি লঘু। গুরু ধারাটির মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর সামাজিক ও পারিবারিক নানা সমস্যার কথাই প্রধানতঃ বর্ণিত হইয়াছে ও লঘু প্রহসন-শ্রেণীর রচনার মধ্য দিয়া বাঙ্গালী-জীবনের ছোটবড় নানা অসঙ্গতি ও ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করা হইয়াছে। জীবন-দর্শনে ত্রুটি থাকিলেও বাঙ্গালীর জীবনই ইহাদের ভিত্তি। রোমান্টিক নাটকেরও দুইটি ভাগ—একটি নাটক, অপরটি গীতিনাটক। ইহাদের মধ্য দিয়া কল্পনাপ্রবণ বাঙ্গালীর মন সহজ মুক্তির সন্ধান করিয়াছে। বাংলা সাহিত্য রোমান্স-প্রধান। নাটকের মধ্যেও এই রোমান্সকে স্থান দিয়া বাঙ্গালী নাট্যকার নিজস্ব জাতীয় রস-বোধেরই বিকাশ করিয়াছেন। চিরন্তন সাহিত্যিক বিচারের চূড়ান্ত তুলাদণ্ডে যখন বাংলার এই রোমান্টিক নাটকগুলিকে বিচার করিতে যাই, তখন বাঙ্গালীর মজ্জাগত রোমান্স-পিপাসার কথা কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারি না—তারপর ঐতিহাসিক নাটক। এই ইতিহাসও বাংলারই ইতিহাস যদিও রাজপুতানার কাহিনী ইহাদের কাহারও কাহারও অবলম্বন, তথাপি বাংলার নবপ্রবুদ্ধ দেশাত্মবোধের চৈতন্যেই ইহারা সঞ্জীবিত—ইহাদের দেহ রাজপুতানার, কিন্তু প্রাণ বাংলার। এই হিসাবে ইহারাও বাংলারই নিজস্ব। ঐতিহাসিক নাটকের একটি প্রধান অংশ চরিত-নাটক। যে সকল মহা-পুরুষের জীবনাদর্শ বাঙ্গালীর চিন্তা ও কর্মকে শত শত বৎসর যাবৎ নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, তাঁহাদের বিচিত্র জীবনের ঘটনাবহুল বৃত্তান্ত বাঙ্গালীকে নাটক রচনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল—এই সকল ঐতিহাসিক চরিত্র বাঙ্গালী দর্শকের কেবল মাত্র যে শিক্ষাগত (academic) ঔৎসুক্য নিবৃত্তি করিয়াছে, তাহা নহে ; তাহা হইলে বাংলা নাটক হিসাবে ইহাদের কোন মূল্যই থাকিত না। যাঁহাদের চরিত্র ইহাদিগের মধ্যে কীর্তিত হইয়াছে, তাঁহাদের সাধনা দ্বারা বাঙ্গালীর ধর্মীয় ও সামাজিক জীবন নানাভাবে প্রভাবিত হইয়াছে বলিয়া ইহাদের সঙ্গে বাঙ্গালী দর্শক অতি সহজেই তাহার অন্তরের যোগ স্থাপন করিতে পারিয়াছে। সেইজন্য বাংলার ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবির্ভূত না হইয়াও, তাহার অন্তর অধিকার করিয়া, ইহারাও বাংলার একান্ত আপনার হইয়া গিয়াছে। এই চরিত-নাটক রচনার ভিতর দিয়া ইহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ বাঙ্গালী ভক্তের শ্রদ্ধাঞ্জলিই নিবেদিত হইয়াছে। ইউরোপীয় আদর্শে নাটকীয় গুণ ইহাদের রচনায় প্রকাশ পায় নাই সত্য, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহাতে বাঙ্গালীর রস-পিপাসা চরিতার্থ হইবার পক্ষে

অনেক সময়ই কোন বাধা হয় নাই। সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথের নাটক। ইহাও বাঙ্গালী নাট্যকারের রচিত এক নূতন পদ্ধতির নাটক। চিরন্তন জীবন ইহাদের লক্ষ্য হইলেও বাংলার পরিবেশ ও বাঙ্গালীর সূক্ষ্ম রস এবং সৌন্দর্যানুভূতির উপর ভিত্তি করিয়াই যে ইহা রচিত, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। রবীন্দ্রনাথের অলোকসামান্য প্রতিভা দ্বারা নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে ইহার নাটকীয় জীবন প্রত্যক্ষ হইয়াছে; অতএব গতানুগতিক সাহিত্যবিচারের তুলাদণ্ডে ইহার মূল্য নির্ধারণ করা যাইবে না—স্বতন্ত্র মূল্য দিয়া নূতন সমালোচনা পদ্ধতিতে ইহার মূল্য বিচার করিতে হইবে। ইহা স্বতন্ত্র হইলেও ইহার রস আছে, বিস্তার আছে, গভীরতা আছে ও বৈচিত্র্য আছে। যেদিন বাংলায় ইহা হইতেও উচ্চতর শিল্পসম্মত নাটকের সৃষ্টি হইবে, সেদিন কেবল মাত্র নাট্যকারের ব্যক্তিপ্রতিভা দ্বারা তাহা সৃষ্ট হইবে না, বাংলার জীবনও সেদিন সেই আদর্শেই পূর্ব হইতে নূতন রূপ লাভ করিবে—তাহার পূর্বে নাট্যসাহিত্যের বর্তমান ধারার কোন ব্যতিক্রম দেখা দিতে পারে না।

যাত্রা

॥ ১ ॥ সূর্যোৎসব

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা-সম্পর্কে এদেশের যাত্রাভিনয় বিষয়েও আলোচনা অপরিহার্য হইয়া উঠে; কারণ, বাংলা নাটকের উপর ইহার প্রভাব এককালে অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল এবং এখনও পর্যন্ত তাহা একেবারে হ্রাস পাইয়া যায় নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, বাংলা যাত্রাভিনয়ের ধারাটি বাংলা নাট্যরচনার ধারার সঙ্গে একাকার হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। সেইজন্য বাঙ্গালী দর্শক বাংলা নাটক হইতেই এককালে যাত্রার আনন্দলাভ করিয়াছে।

বাংলা দেশের যাত্রা সম্বন্ধে বিগত শতাব্দীর শেষভাগ হইতে দেশে এবং বিদেশে যত আলোচনা হইয়াছে, এই দেশের অন্য কোন লোক-সঙ্গীত সম্পর্কে তত আলোচনা হয় নাই। অথচ এই সকল আলোচনা কোনটিই সর্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া স্বীকার করা যায় না। এই বিষয়ে যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে একদল মনে করেন, খ্রীষ্টজন্মের পূর্ব হইতেই ভারতবর্ষে কৃষ্ণ-বিষয়ক কাহিনী অবলম্বন করিয়া যাত্রা রচিত হইত এবং তাহারই ধারা জয়দেবের ভিতর দিয়া মধ্যযুগের বাংলায় বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। আর একদল মনে করেন, মধ্যযুগের বাংলাদেশে যে পাঁচালীগান প্রচলিত ছিল, তাহা হইতেই যাত্রার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার পূর্বে ইহার অস্তিত্ব ছিল না। এতদ্ব্যতীত এই বিষয়ে আরও অনেকে অনেক রকম মতই পোষণ করিয়া থাকেন। উপরে যে দুইটি মাত্র মতের উল্লেখ করিলাম, তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহাদের পরস্পর ব্যবধান কত বিস্তৃত। অতএব এই সকল মতের যৌক্তিকতা বিচার করিতে প্রবৃত্ত না হইয়া, এই বিষয়ে যাহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহাই এখানে উল্লেখ করিতেছি।

অভিনয় অর্থে যাত্রা শব্দটির উৎপত্তি লইয়াও মতবিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও সংস্কৃত অভিধানে উৎসব অর্থে যাত্রা শব্দটি গৃহীত হইয়াছে,

তথাপি এ কথা সত্য যে, শব্দটি যদি মূলতঃ ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দ হইয়া থাকে, তবে 'যা' ধাতু হইতে ইহা উৎপন্ন বলিয়া গমন অর্থেই ইহা সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হইত। এই গমন উপলক্ষে উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইত বলিয়া কালক্রমে উৎসব অর্থেই যাত্রা শব্দটি সংস্কৃতে ব্যবহৃত হইতে থাকে। এই-ভাবে দেবযাত্রা শব্দের অর্থ দেবতা-সম্পর্কিত কোন উৎসবের অনুষ্ঠান। কিন্তু 'যা' ধাতু অর্থে যে গমনের কথা পূর্বে উল্লেখ করিলাম, তাহা কাহার গমন এবং কোথায় গমন? প্রাচীন কালে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই গ্রহ-নক্ষত্রাদির কক্ষ হইতে কক্ষান্তর গমন উপলক্ষে উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইত। গ্রহদিগের মধ্যে সূর্যই প্রধান এবং সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ; শুধু তাহাই নহে, ইহা নানাভাবে মানুষের ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে জড়িত। ইহাই পৃথিবী-ব্যাপী বিভিন্ন জাতির মধ্যে সূর্যোপাসনার উৎপত্তির মূল। পূর্বভারত অঞ্চলেও যে অতি প্রাচীন কাল হইতেই সূর্যোপাসনার ব্যাপক অস্তিত্ব ছিল, তাহা জানিতে পারা যায়। বৎসরের মধ্যে সূর্যের চারিবার চারিটি উল্লেখযোগ্য 'যাত্রা' বা, কক্ষান্তরগমন অনুষ্ঠিত হয়। তাহাদের মধ্যে দুইটি প্রধান ও দুইটি অপ্রধান। সূর্যের প্রধান দুইটি গতিপরিবর্তন বা নূতন যাত্রার মধ্যে একটি ইহার উত্তরায়ণ ও অপরটি দক্ষিণায়ন। কৃষিজীবী সমাজের নিকট সূর্যের উত্তরায়ণ অপেক্ষা দক্ষিণায়নের ব্যবহারিক মূল্য অনেক বেশী; কারণ, তখন গ্রীষ্মের অবসানে বর্ষার সূচনা হইয়া থাকে এবং এই সময়ের মধ্যেই সমগ্র কৃষিকার্য শেষ করিয়া কৃষিজাত দ্রব্যাদি গৃহে তুলিয়া লওয়া হয়। সেইজন্য এক হিসাবে সূর্যের দক্ষিণ দিকে যাত্রা আরম্ভ হইবার মুহূর্তেই যে সূর্যোৎসব অনুষ্ঠিত হইত, তাহা পূর্বভারত অঞ্চলের সর্বশ্রেষ্ঠ সূর্যোৎসব। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের সূর্যের দক্ষিণায়নে ও শীতপ্রধান দেশে সূর্যের উত্তরায়ণেই প্রধান সূর্যোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সেইজন্য যেদিন হইতে বড়দিন আরম্ভ হয়, পাশ্চাত্ত্য জগতের তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসবের দিন এবং যেদিন হইতে 'ছোট দিন' আরম্ভ হয় প্রাগার্য ভারতীয় সমাজে তাহাই সর্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য উৎসবের দিন ছিল। তাহার প্রমাণ, উড়িষ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া দাক্ষিণাত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব রথযাত্রা। বাংলাদেশেও যে এককালে রথ-যাত্রাই অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎসব ছিল, তাহার এখনও প্রমাণ পাওয়া যায়। এই রথযাত্রা সূর্যের দক্ষিণায়ন উৎসব ব্যতীত আর কিছুই নহে। উত্তরায়ণ পথে অগ্রসর হইতে হইতে সূর্য যখন আষাঢ় মাসে উত্তরায়ণ বিন্দুতে আসিয়া

উপনীত হইত, তখন পুনরায় তাহার দক্ষিণায়ন যাত্রার সূচনার মুহূর্তেই রথযাত্রার অনুষ্ঠান হইত। পরবর্তী হিন্দু, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব বশতঃ উড়িষ্যা ও বাংলায় এই রথযাত্রা জগন্নাথদেবের রথযাত্রা, মাধাই বা মাধবের রথযাত্রা ইত্যাদি বলিয়া পরিচিত হইলেও, ইহা যে মূলতঃ সূর্যেরই দক্ষিণায়ন যাত্রার উৎসব ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়।

অয়নের শেষ বিন্দুতে উপস্থিত হইলে সূর্যের প্রতীককে রথে স্থাপন করিয়া সেই রথ টানিয়া লইয়া সূর্যের নূতন যাত্রা সুরু করাইয়া দেওয়ার প্রবৃত্তির মধ্যে আদিম সমাজের একটি ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাকে ইংরেজিতে sympathetic magic বলে। আদিম সমাজের ধারণা ছিল, সূর্যের প্রতীককে রথে তুলিয়া যাত্রা করাইয়া না দিলে আকাশস্থ সূর্যও নূতন যাত্রাপথে অগ্রসর হইতে পারিবে না—তাহাতে নানা অঘটনের সৃষ্টি হইবে। সেইজন্য সূর্যের এই যাত্রা উপলক্ষে সমাজে মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইত। যদিও গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সূর্যের দক্ষিণায়ন যাত্রাই সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব, তথাপি রাশিচক্রে সূর্যের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য যাত্রা উপলক্ষেও উৎসবের অনুষ্ঠান করা হইত। সূর্য বিষুবরেখায় অবস্থিত হইলে যখন দিনরাত্র সমান হয়, তখন বঙ্গদেশে যে চড়কোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তাহাও সূর্যোৎসব ব্যতীত আর কিছুই নহে; এই সময়ে সূর্যের যে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হইত, তাহাই বৈষ্ণবপ্রভাব বশতঃ বর্তমানে শ্রীকৃষ্ণের পুষ্পক রথ বলিয়া পরিচিত। মাঘ মাসে দক্ষিণায়ন বিন্দুতে সূর্য অবস্থিত হইলে সূর্যের যে রথযাত্রার অনুষ্ঠান হইত, তাহা এখনও 'রথাখ্যা সপ্তমী' নামে বাংলা পঞ্জিকাদিতে উল্লেখিত হইয়া থাকে। সূর্যের নব নব যাত্রা উপলক্ষে এই সকল উৎসবের অনুষ্ঠান হইত বলিয়া কালক্রমে দেবতা-বিষয়ক যে কোন উৎসবকেই যাত্রা বলিত। ইহার সঙ্গে অন্য কোন দেবতাকে লইয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাত্রা কিংবা 'মিছিল ক'রে যাওয়া'র কোন সম্পর্ক নাই। কালক্রমে বাংলা দেশের উপর যখন বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাপক প্রভাব বিস্তৃত হইল, তখন কৃষ্ণবিষয়ক উৎসবাদিই এই দেশে প্রাধান্য লাভ করিল; এই কৃষ্ণোৎসবসমূহ কৃষ্ণযাত্রা নামে পরিচিত হইল। যেমন ঝুলন বা হিন্দোলযাত্রা, রাসযাত্রা, দোলযাত্রা ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, রাস-যাত্রাও দ্বাদশ রাশির পথে সূর্যের পরিক্রমণই বুঝায়। বৈষ্ণবপ্রভাববশতঃ সূর্যই এখানে কৃষ্ণ ও দ্বাদশ রাশি দ্বাদশ গোপিকার রূপ লাভ করিয়াছে।

পুরীর রথযাত্রাও এখন সূর্যের পরিবর্তে জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার রথ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ ধামরাইর রথ মাধবের রথ বলিয়া পরিচিত। পূর্বে সূর্যের কোন প্রতীক রথারূঢ় করিয়া সেই রথ টানিয়া লইয়া অনুকারক ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া (sympathetic magic) দ্বারা যে সূর্যকে নূতন অয়নপথে গতিদান করা হইত বলিয়া মনে করা হইত, বর্তমানে সেই সূর্যের স্থান কৃষ্ণ কিংবা জগন্নাথ গ্রহণ করিয়াছেন—সূর্যের নূতন যাত্রাপথে রথ টানিয়া লইয়া যাইবার রীতিটি এখন কৃষ্ণ কিংবা জগন্নাথ সম্পর্কেই প্রচলিত হইয়াছে। নতুবা কৃষ্ণ কিংবা জগন্নাথকে আষাঢ়ী শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে রথে তুলিয়া টানিয়া লইয়া যাইবার আর কোন তাৎপর্য থাকিতে পারে না।

॥ ২ ॥ ওরাওঁ যাত্রা

এইখানে আরও একটি বিষয় গভীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। যাত্রা শব্দটি প্রকৃতই সংস্কৃত গমনার্থক 'যা' ধাতু হইতে উৎপন্ন, কিংবা ইহা উৎসব অর্থবাচক কোন অনার্য শব্দ হইতেই সংস্কৃতে গৃহীত হইয়াছে। যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে শব্দটির উৎপত্তির মূলে সূর্য কিংবা অন্য কাহারও এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনের কোন সম্পর্কই নাই। এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী ছোটনাগপুরের আদিম অধিবাসী ওরাওঁদিগের মধ্যে যাত্রা নামে একটি অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। ওরাওঁগণ দ্রাবিড়-ভাষাভাষী, ইহাতে শব্দটি মূলতঃ দ্রাবিড় ভাষা হইতে আসিয়াছে বলিয়াও অনুমিত হইতে পারে। এখানে ওরাওঁ জাতির যাত্রা অনুষ্ঠানটির একটু পরিচয় দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ওরাওঁদিগের মধ্যে প্রতিবেশী গ্রামসমূহের অধিবাসী অবিবাহিত যুবক-যুবতীদিগের সমবেত নৃত্যানুষ্ঠানের নাম যাত্রা। এই অনুষ্ঠানের একটি প্রধান সামাজিক মূল্য এই যে, ইহার মধ্য হইতেই প্রধানত যুবক-যুবতীগণ তাহাদের ভবিষ্যৎ বিবাহিত জীবনের সঙ্গী ও সঙ্গিনীর সন্ধান পাইয়া থাকে এবং ইহার ভিতর দিয়া তাহাদের যে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া থাকে, তাহা কালক্রমে বিবাহবন্ধনে পরিণতি লাভ করে। সেইজন্য অবিবাহিত যুবক-যুবতীমাত্রই এই অনুষ্ঠানটির জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। বহু লোক-সঙ্গীতের মধ্য দিয়া ওরাওঁ যুবক-যুবতীর প্রাণের এই আকুতি প্রকাশ পাইয়াছে।

বৎসরের মধ্যে যে কোন অবসর সময়ে বিশেষ কোন অঞ্চলের গ্রামসমূহের যে কোন এক কিংবা একাধিক স্থানে যাত্রা নামক এই নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে 'জেঠ্ যাত্রা' নামে পরিচিত জ্যৈষ্ঠ মাসে যে নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন হয়, তাহাই প্রধান। সপ্তাহকাল পূর্ব হইতেই গৃহে গৃহে এই উপলক্ষে পচাই তৈরী করিবার ধুম পড়িয়া যায়। তারপর নির্দিষ্ট দিনে যুবক-যুবতীগণ পত্র-পুষ্পে সুসজ্জিত হইয়া নির্ধারিত যাত্রার স্থানে আসিয়া সমবেত হয়। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গ্রামসমূহ হইতে আগত নিমন্ত্রিতগণকে বিশেষ-ভাবে আপ্যায়িত করা হয়; এইভাবে এক গ্রাম অন্য গ্রামকে নিমন্ত্রণ করিবার ফলে বিবাহযোগ্য যুবক-যুবতীদিগের মধ্যে পরস্পর পরিচয় স্থাপিত হয়। ভাণ্ডের পর ভাণ্ড পচাইর সদ্ব্যবহার করা হইলে পর সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া যুবক-যুবতী-দিগের সমবেত সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠান চলিতে থাকে। যে স্থানে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়, তাহাকে সাধারণতঃ 'যাত্রাটাঁড়' বলা হয়। উৎসব-ক্ষেত্রে একটি কাঠের খুঁটি ঘেরিয়া এই নৃত্যানুষ্ঠান হইয়া থাকে, সেই খুঁটিকেও 'যাত্রা খুঁটিয়া' বলা হয়। এই নৃত্যানুষ্ঠানের জন্য যুবক-যুবতীগণ বিশেষ পোষাকও পরিধান করিয়া থাকে, তবে পত্রপুষ্পই অধিকাংশ দেহসজ্জার কাজ করে। দূরবর্তী গ্রাম হইতে নিমন্ত্রিত যুবক-যুবতীগণ রীতিমত শোভাযাত্রা করিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে বাহির হয়—শোভাযাত্রাকারীদিগের মধ্যে কেহ পতাকা, কেহ অন্য কোন অভিজ্ঞান সঙ্গে করিয়া লইয়া অগ্রসর হয়। প্রকৃত নৃত্য বা যাত্রা-স্থানটিকে (Jatra-ground) বিশেষ পবিত্র বলিয়া বিবেচনা করা হয়। আনুষ্ঠানিক ভাবে কতকগুলি নির্ধারিত আচার পালন করিয়া বিভিন্ন দল সেই স্থানে প্রবেশ করিয়া থাকে এবং সমস্ত রাত্রিব্যাপী অনুষ্ঠিত নৃত্যোৎসবে তাহাদের সাধ্যমত কৃতিত্ব দেখাইয়া থাকে। যে গ্রামে এই যাত্রার অনুষ্ঠান হয়, সেই গ্রামের বর্ষীয়সী কয়েকজন মহিলা 'মঙ্গল কলস' (করসা) মাথায় করিয়া লইয়া সেইস্থানে উপস্থিত থাকে। কোন কোন সময় তাহারাও ঐ ভাবে নৃত্যে যোগদান করে। এই উপলক্ষে বিভিন্ন গ্রামের কর্তৃপক্ষীয় লোকজনও সমবেত হইয়া নিজেদের সামাজিক বিভিন্ন সমস্যার কথাও আলোচনা করিয়া থাকে।

ওরাওঁ যাত্রার এই বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, পশ্চিম বাংলার প্রান্তবর্তী অঞ্চল হইতে যাত্রা কথাটি গিয়া যে ওরাওঁদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা নহে। ওরাওঁদিগের ইহা একটি বিশিষ্ট সামাজিক অনুষ্ঠান;

শুধু সামাজিকই নহে, ইহার মধ্যে ধর্মীয় (religious) সম্পর্কও আছে—বিশেষতঃ ইহার উপরই একটি উপজাতির সামাজিক জীবন প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বোধ হইবে—কারণ, ইহার মধ্য দিয়াই তাহাদের সর্বপ্রধান সামাজিক ক্রিয়া বা বিবাহের উপায় হইয়া থাকে। অতএব ইহা বাহির হইতে পরবর্তী কালে অন্তের নিকট হইতে ধার করা জিনিস বলিয়া মনে হইতে পারে না। বাংলা ভাষায় যাত্রা কথা যে অর্থে প্রচলিত আছে, তাহাতেও ধর্ম ও আনন্দ এই উভয় ভাবই যুক্ত আছে। অতএব শব্দটি একই ক্ষেত্র হইতে উদ্ভূত বলিয়াও মনে হওয়া অস্বাভাবিক নহে। এই সূত্রে শব্দটি মূলত দ্রাবিড় হওয়াও আশ্চর্য নহে, পরে সম্ভবত সংস্কৃতে গৃহীত হইয়াছে।

কেবলমাত্র ওরাওঁ জাতিই নহে, দ্রাবিড়-ভাষাভাষী দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন অঞ্চলের সাধারণ অধিবাসীর মধ্যেও ধর্মোৎসব অর্থে যাত্রা শব্দটির ব্যাপক প্রচলন আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, দাক্ষিণাত্যের গ্রাম্য দেবী মারী বা মারী-আম্মার বাৎসরিক পূজানুষ্ঠানকে 'মারীযাত্রা' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। মাদ্রাজ উপকূল অঞ্চলের নিরক্ষর পত্তনবান জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্যজীবিগণ গ্রাম্যদেবতার নৈমিত্তিক পূজোৎসবকে এখনও 'যাত্রে' (Jatre) বলিয়া উল্লেখ করে। উড়িষ্যায় সাধারণ লোকের মধ্যে বাংলার গাজনোৎসবের মত যে এক অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে, তাহার নাম 'সাহীযাত্রা'; ওড়িয়া ভাষায় মেলা অর্থে 'যাত' শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। সাঁওতাল পরগণার সাঁওতাল ও ভূইঞাদিগের মধ্যেও 'যাত্রা-পরব' নামক একটি অনুষ্ঠান আছে; ইহা সাধারণত মাঘমাসে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। পশ্চিম বাংলার নিম্নজাতির মধ্যে লৌকিক দেবতার উৎসবকে 'যাত' বলিয়া উল্লেখ করা হয়। উড়িষ্যা ও পশ্চিম বাংলার জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত 'জাত' বা 'যাত' শব্দটি ওড়িয়া ও বাংলা ভাষায় দ্রাবিড় ভাষার দান বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে 'যাত্রা' শব্দটি মূলত দ্রাবিড় ভাষা হইতে আগত বলিয়া মনে করা অসঙ্গত নহে। দ্রাবিড় ভাষা হইতেই সাধারণ উৎসব অর্থে শব্দটি সংস্কৃতেও প্রবেশ করিয়া থাকিবে। পূর্বেই বলিয়াছি, তাহা হইলে সৌরযাত্রার সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক কল্পনা করা যায় না। 'যাত্রা' শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করিবার পূর্বে এই বিষয়গুলি গভীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন।

॥ ৩ ॥ নাটগীত

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে যাত্রা বলিতে দেবোৎসব মাত্রই বুঝাইত। এই উৎসব উপলক্ষে নৃত্য ও গীত অনুষ্ঠিত হইত বলিয়া সাধারণভাবে ইহাকে নাটগীতও বলিত। কৃত্তিবাস-রচিত রামায়ণের উত্তরা কাণ্ডে শিবদুর্গার বিবাহোপলক্ষে বর্ণিত হইয়াছে—

নাটগীত দেখি শুনি পরম কুতূহলে।
কেহো বেদ পড়ে কেহ পড়এ মঙ্গলে ॥
নানা মঙ্গল নাটগীত হিমালয়ের ঘরে।
পরম আনন্দে লোক আপনা পাসরে ॥

(সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, পৃঃ ৬)

জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দ' ও বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এই নাটগীত শ্রেণীর রচনা। সে কথা পরে বলিব। যাত্রা বা উৎসব উপলক্ষে নাটগীতের অনুষ্ঠান হইত বলিয়া ক্রমে নাটগীতকেই যাত্রা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে কেবলমাত্র নাটগীত বা গীতাভিনয় অর্থে যাত্রা শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায় না, তথাপি শব্দটি এই অর্থে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়; কারণ, তখন গীতাভিনয়ের মধ্যে নূতনত্ব লক্ষ্য করিয়া ইহাকে 'নূতন যাত্রা' বলিয়া সর্বত্র উল্লেখ করা হইয়াছে। 'নূতন যাত্রা' কথাটি হইতেই পুরাতন যাত্রা কথাটি স্বভাবতঃই আসিয়া পড়ে; অতএব মনে হয়, মধ্যযুগে নাটগীত যাত্রা বা উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হইত বলিয়া, তাহাকেও সাধারণভাবে যাত্রাই বলা হইত। কিন্তু তথাপি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কোন প্রকার অভিনয় অর্থেই যাত্রা শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায় না—উৎসব অর্থেই যাত্রা শব্দ সর্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। বৃন্দাবন দাস রচিত 'চৈতন্যভাগবত' নামক গ্রন্থে চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে চৈতন্যদেব তাঁহার পার্ষদদিগকে লইয়া যে অভিনয় করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে, তাহাও যাত্রা বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই, বরং তাহাকে 'অঙ্কের বিধানে নৃত্য' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহাতেও সংস্কৃত নাটকের অঙ্ক-বিধানকেই মনে করা হইয়াছে। তথাপি ইহা ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র নির্দেশিত সংস্কৃত নাটকের অনুযায়ী অভিনয় ছিল না, ইহা এই সম্পর্কিত লৌকিক ধারাকেই যে অনুসরণ করিয়াছে, তাহা ইহার বর্ণনা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। পূর্বেই বলিয়াছি, যাত্রা বা দেবোৎসবের মধ্যে ক্রমে

গীত ও অভিনয় ব্যাপার প্রাধান্য লাভ করিবার ফলেই উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কাল হইতেই যাত্রা শব্দ দ্বারা কেবলমাত্র গীতাভিনয়কেই বুঝাইতে থাকে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিনয়োপযোগী উপাদানের কোন অভাব ছিল না। জয়দেব-রচিত 'গীতগোবিন্দ'কে কেহ কেহ প্রাচীন বাংলার যাত্রার অন্যতম উল্লেখযোগ্য নিদর্শন বলিয়া মনে করিয়াছেন। 'গীত-গোবিন্দ' সর্গবদ্ধ কাব্য হইলেও ইহাতে যে রাগ ও তালের লিখিত নির্দেশ পাওয়া যায়, তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, নৃত্য ও গীতের জন্যই ইহা ব্যবহৃত হইত এবং 'পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্তী' কবি জয়দেবও এই উদ্দেশ্যেই ইহা রচনা করিয়াছিলেন। প্রাচীন যাত্রা বা নাটগীত কি প্রকার ছিল, তাহা সুস্পষ্টভাবে জানিবার উপায় নাই; কিন্তু তাহা যে প্রকারেরই হউক, তাহাতে যে উনবিংশ শতাব্দীর যাত্রার বীজ নিহিত ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; কারণ, যাত্রার মধ্যে নৃত্য এবং গীতের ধারাটি উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্তও অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে।

'গীতগোবিন্দে'র পরই উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'ও যে বাস্তবত 'গীতগোবিন্দে'রই আদর্শে রচিত, তাহা ইহার মধ্যে 'গীত-গোবিন্দে'র বহু শ্লোকেরই বঙ্গানুবাদ হইতে প্রমাণিত হইবে। ইহার মধ্যে তিনটি চরিত্র প্রধান—শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকা ও বড়াই; ইহাদের গীতি-সংলাপ নাটকীয় ভঙ্গিতেই রচিত। পাত্রপাত্রীর বেশ ধারণ করিয়া ইহা উন্মুক্ত মঞ্চে অভিনীত না হইলেও কোন প্রকার নাটকীয় ভঙ্গিতেই যে ইহাকে রূপদান করা হইত, তাহা অনুমান করিতে বেগ পাইতে হয় না। কারণ, ইহার মধ্যেই সঙ্গীতের ভিতর দিয়া সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ উক্তি-প্রত্যুক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। অতএব উনবিংশ শতাব্দীর যাত্রার লক্ষণ ইহার মধ্যে স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে। বলা বাহুল্য, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' ব্যবহৃত এই রীতিটি তৎকালীন একটি ব্যাপক প্রচলিত রীতিরই প্রতিনিধি মাত্র; কারণ, পরবর্তী যুগের বাংলা লোক-সঙ্গীতের ধারায় অনুরূপ রীতির বহুল প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়; তাহা কৃষ্ণধামালী নামে পরিচিত। এই সকল সঙ্গীত সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত ছিল বলিয়া, ইহা স্বভাবতই সাধারণের রুচি ও নীতিবোধের অনুগামী করিয়া রচিত হইত এবং ইহাদিগকে রূপদান করিবার জন্যও সাধারণের সহজবোধ্য প্রণালী অবলম্বন করিবার আবশ্যক

হইত। অতএব মনে হয়, পাত্রপাত্রীর বেশ ধারণ না করিলেও অন্তত অঙ্গভঙ্গি সহকারে ইহার উক্তি-প্রত্যুক্তিগুলি সাধারণের সম্মুখে প্রকাশ করা হইত। ইহার মধ্যেও 'নূতন যাত্রা'র পূর্বাভাস সূচিত হইয়াছে।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব হইতেই বাংলা দেশে যে সকল মঙ্গল ও পাঁচালী গান প্রচলিত ছিল, তাহাদের মধ্যেও নাটকীয় উপাদানের অভাব ছিল না। প্রাচীন মঙ্গল ও পাঁচালী গান যে কি প্রণালীতে জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করা হইত, তাহার সুস্পষ্ট বিবরণ কোথা হইতেও সংগ্রহ করিবার উপায় নাই। তথাপি মনে হয়, প্রাচীন পাঁচালী কিংবা মঙ্গল গান একজন মূল গায়েন কর্তৃকই গীত হইত, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র মত তাহাতে পাত্রপাত্রীর উত্তর-প্রত্যুত্তরের ভিতর দিয়া কাহিনী অগ্রসর হইত না। এখনও বাংলা দেশের কোন কোন অঞ্চলে শ্রীরাম-পাঁচালী বা রামায়ণ গাহিবার যে প্রণালী অবলম্বন করা হইয়া থাকে, তাহাই প্রাচীন পাঁচালী বা মঙ্গল গান গাহিবার প্রণালীর অনেকটা অনুরূপ বলিয়া মনে হইতে পারে। ইহা হইতে মনে হইবে যে, প্রাচীন পাঁচালী ও মঙ্গল গান অপেক্ষা উল্লেখিত দুইখানি শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক কাব্যেই নাটকীয় রূপ অধিকতর প্রত্যক্ষ। সেইজন্য কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে, একমাত্র কৃষ্ণ-সম্পর্কিত বিষয়বস্তু লইয়াই প্রাচীন যাত্রা রচিত হইত। কিন্তু একথা সত্য নহে। কারণ, চৈতন্য-পূর্ববর্তী কাল হইতেই এদেশের উপর বৈষ্ণবধর্মের প্রভাববশত কৃষ্ণ-সম্পর্কিত বিষয়বস্তু জনসাধারণের স্বভাবতই অধিকতর প্রীতিকর হইত বলিয়া, এই বিষয়ের উপরই গীত-রচয়িতাদিগের মনোযোগ অধিক আকৃষ্ট হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও শাক্তধর্ম সম্পর্কিত বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়াও যে অনুরূপ রচনা সেইযুগে প্রচলিত ছিল, তাহাও অনুমান করিতে পারা যায়। বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনী অবলম্বন করিয়া উনবিংশ শতাব্দীতে যে ভাসান-যাত্রা নামক এক শ্রেণীর যাত্রার ব্যাপক প্রচলন হইয়াছিল, তাহা এই বিষয়ক পূর্ববর্তী কোন ধারা অনুসরণ করিয়াই রচিত হইত বলিয়া মনে হয়। এই প্রকার রামযাত্রা ও চণ্ডীযাত্রাও মধ্যযুগে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে; কিন্তু একথা সত্য যে, এই বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলিবার উপায় নাই, কারণ, অন্তত 'গীতগোবিন্দ' ও 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে'র মতও এই সকল বিষয়ের লিখিত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না এবং উনবিংশ শতাব্দীতে রামায়ণের দল ভাঙিয়া রামযাত্রা, কিংবা চণ্ডীমঙ্গলের

দল ভাঙ্গিয়া চণ্ডীযাত্রার যে সকল দল সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়, তাহা হইতে ইহাদের পূর্ববর্তী অবস্থা কিছুই অনুমান করা যাইতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গের গাজন ও পূর্ববঙ্গের কুমারী মেয়েদিগের মাঘমণ্ডল ব্রতের কতকগুলি আচারের ভিতর দিয়া উত্তর-প্রত্যুত্তর জাতীয় যে সকল ছড়া অদ্যাপি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাদের সঙ্গে যাত্রার কোনও যোগ আছে বলিয়া মনে করা সমীচীন হইবে না। অনুকরণ করিবার প্রবৃত্তি মানুষের স্বভাবজ। সেইজন্য কোন বিষয় বুঝাইয়া বলিতে হইলে তাহারা সহজেই অভিনয় বা অঙ্গভঙ্গির অনুকরণ করিয়া থাকে। এই সকল উত্তর-প্রত্যুত্তর সেই প্রবৃত্তি হইতে জাত।

(ঊনবিংশ শতাব্দীর নব সংস্কৃত পাঁচালী গানের রূপ দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে, পাঁচালী হইতেই যাত্রার উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু ইহা ভুল।) প্রাচীন পাঁচালীর যে কি প্রকৃতি ছিল, অর্থাৎ মধ্যযুগে মনসার পাঁচালী, শ্রীরাম-পাঁচালী বা ভারত-পাঁচালী সমূহ যে কি প্রণালীতে গাওয়া হইত, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর যে পাঁচালীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হইয়াছে, তাহার সঙ্গে প্রাচীন পাঁচালীর কোনই যোগ ছিল না। বরং কালক্রমে তাহার উপর 'নূতন যাত্রা'র প্রভাব সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। আখ্যানমূলক রচনা মাত্রকেই মধ্যযুগে পাঁচালী বলিত; সুদীর্ঘ রচনা মঙ্গল গান, রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদও যেমন পাঁচালী, অনতিদীর্ঘ লৌকিক দেবতার মাহাত্ম্য-বিষয়ক আখ্যায়িকা যেমন, শনির পাঁচালী, সত্যপীরের পাঁচালী, ত্রিনাথের পাঁচালী, লক্ষ্মীর পাঁচালী প্রভৃতিও পাঁচালী। কিন্তু ইহাদের সঙ্গে নূতন পাঁচালীর কোনই সাদৃশ্য নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর পাঁচালী সমসাময়িক হাফ-আখড়াই, দাঁড়া কবি এমন কি নূতন যাত্রার আদর্শেও পুনর্গঠিত হইয়াছিল—ইহাতে পূর্বাভ্যস্ত ছড়া ও গানের লড়াই হইত; এমন কি, অনেক সময় পাত্রপাত্রীর সাজও গ্রহণ করা হইত। বলা বাহুল্য, ইহা সমসাময়িক অন্যান্য লৌকিক সঙ্গীতানুষ্ঠানেরই প্রভাবের ফল।

অতএব ইহা হইতে যাত্রার উৎপত্তি হইয়াছে, এমন অনুমান করা সমীচীন হইবে না। হাফ্-আখড়াই, দাঁড়া কবি, কবি ও নূতন যাত্রা হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর পাঁচালী এক নূতন পাঁচমিশেলী রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। চামর-মন্দিরার সাহায্যে দোহারের সহযোগিতায় একজন

মাত্র গায়েনকে আসরে দাঁড়াইয়া সামান্য অঙ্গভঙ্গি দ্বারা এখনও যে রামায়ণ কিংবা মঙ্গলগান কোন কোন স্থানে গাহিতে শোনা যায়, তাহাই দীর্ঘতর পাঁচালীগুলির প্রাচীনতম প্রকাশ-ভঙ্গি ছিল বলিয়া মনে হয়; কিন্তু ইহাদের সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর পাঁচালীর কোন যোগ নাই। নূতন পাঁচালীতে দুই দলে 'সঙ্গীত সংগ্রাম' হইত, প্রাচীন পাঁচালীতে তাহা হইত না; এক দলই আনুপূর্বিক বিষয়-বস্তু পালায় পালায় বিভক্ত করিয়া দিনের পর দিন গাহিয়া যাইত। প্রাচীন পাঁচালী বর্ণনাত্মক—লাচাড়ী ও পয়ার ব্যতীত ইহাতে আর কোন রাগ-রাগিণী ছিল না, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর পাঁচালী প্রধানত ভাবাত্মক; সেইজন্য রাগ-রাগিণীর নানা বৈচিত্র্যও ইহাতে দেখা দিয়াছিল। অতএব নূতন পাঁচালীর প্রকৃতি দেখিয়া বাংলার প্রাচীন কিংবা নূতন যাত্রার সঙ্গে তাহার সম্পর্ক অনুমান করা যায় না।

তথাপি একথা কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারা যায় না যে, যাত্রার মত এক শ্রেণীর লৌকিক নাটক (Folk drama) অতি প্রাচীনকাল হইতেই এদেশে চলিয়া আসিতেছে। মধ্যযুগে ইহাকেই নাটগীত বলিত। এমনকি, ইহা স্পষ্টতই বুঝিতে পারা যায় যে, ভরতের নাট্যশাস্ত্রে একটি প্রচলিত লোক-নাট্যের ধারাকেই সংস্কার করিয়া ইহার একটি আদর্শ রূপ নির্দেশ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও প্রাচীনতর কাল হইতে প্রচলিত সেই লোক-নাট্যের ধারাটি লুপ্ত হইয়া যায় নাই—তাহা কখনও লুপ্ত হইয়া যাইতে পারেও না। ভরত-নির্দিষ্ট নাট্যশাস্ত্রের আদর্শ সমাজের উচ্চতর স্তরের নাট্যরচনায় নিয়োজিত হইলেও, সমাজের নিম্নতর স্তরে সেই লোক-নাট্য রচনার ধারাটি বহুদূর পর্যন্ত অব্যাহতভাবে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। এই সম্পর্কে একথাও স্বীকার করিতে হয় যে, সমগ্র ভারতব্যাপী সেই লোক-নাট্যের ধারাটি অভিন্ন ছিল না; কারণ, এই বিস্তৃত দেশের বিভিন্ন সমাজ-সংহতির ভিতর হইতে বিভিন্ন প্রকৃতির লোক-নাট্যের উদ্ভব হইয়াছিল। যাত্রার অনুরূপ একটি ধারা হয়ত পূর্বভারতীয় অঞ্চলে নানা কারণে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, তাহাই কালক্রমে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' ও বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র ন্যায় গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া তাহার কতকটা পরিচয় প্রকাশ করিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে যাত্রা শব্দটি দেবোৎসব ব্যতীত অন্য কোন অর্থে ব্যবহৃত হইত না, সেইজন্য অভিনয় অর্থে যাত্রার উল্লেখ মধ্যযুগের সাহিত্যে কোথাও পাওয়া যায় না

দেবমাহাত্ম্য কীর্তন সম্পর্কে 'জাগরণ' কথাটির উল্লেখ আছে; যেমন, 'পূজিয়া ত ভগবতী করিল জাগরণে' ('শ্রীকৃষ্ণবিজয়'), 'মঙ্গল চণ্ডীর গীতে করে জাগরণে' ('চৈতন্যভাগবত'); কিন্তু জাগরণ-গানের যে ধারা আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, যাত্রা হইতে ইহা সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিল।

একদিকে 'গীতগোবিন্দ', 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এবং অপর দিকে উনবিংশ শতাব্দীর নব সংস্কৃত যাত্রা—বাংলার লোক-নাট্যের এই দুই প্রান্তবর্তী দুইটি নিদর্শনের উপর লক্ষ্য রাখিয়াই ইহার মধ্যবর্তী সময়ের ইতিহাস রচনা করিতে হইবে। 'নূতন যাত্রা'র ভিতর হইতে প্রাচীন ধারাটিকে উদ্ধার করিয়া বহুলাংশে ইহাকে যিনি উনবিংশ শতাব্দীতে নব সংস্কৃত রূপ দিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাঁহার নাম কৃষ্ণকমল গোস্বামী। অতএব একদিকে যেমন 'গীতগোবিন্দ', 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র মধ্যে প্রাচীন যাত্রার প্রত্যক্ষ নিদর্শন কিছু কিছু বর্তমান আছে বলিয়া মনে হইতে পারে, তেমনই অন্য দিকে উনবিংশ শতাব্দীর কৃষ্ণকমল গোস্বামীর নব সংস্কৃত কৃষ্ণযাত্রার মধ্যেও তাহার অন্যান্য কোন কোন উপাদানের অস্তিত্ব অনুভব করা যাইতে পারে। এই সকল নিদর্শন বিচার করিলে কৃষ্ণযাত্রা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রূপ ধারণায় আসিয়া পৌঁছান যায়।

॥ ৪ ॥ কৃষ্ণযাত্রা

ধর্ম-সম্পর্কিত বিষয়বস্তুই যাত্রার একমাত্র অবলম্বন ছিল। এই সম্পর্কে যে সকল বিচ্ছিন্ন নিদর্শনের কথা উপরে উল্লেখ করিলাম, তাহা সকলই বৈষ্ণবধর্ম-সম্পর্কিত এবং কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক। সেইজন্য কৃষ্ণলীলা-সম্পর্কিত বিষয়বস্তুকেই কেহ কেহ যাত্রার একমাত্র উপজীব্য বলিয়া মনে করিয়াছেন। অবশ্য এমনও হইতে পারে যে, কৃষ্ণলীলা বিষয়কে অবলম্বন করিয়াই প্রাচীন-তর যাত্রাসমূহ রচিত হইয়াছিল; কালক্রমে রামায়ণ, চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গল সম্পর্কেও এই রীতি অনুসরণ করা হয়—তাহার ফলেই অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে রামযাত্রা, চণ্ডীযাত্রা ও ভাসান যাত্রাসমূহের উদ্ভব হয়।

কৃষ্ণবিষয়ক যাত্রাসমূহে যথার্থ নাটকীয় উপাদান (dramatic element) যে খুবই বেশি ছিল, তাহা নহে; শ্রীকৃষ্ণের বাল্যজীবন নানা প্রতিকূল ঘটনার ভিতর দিয়া অতিবাহিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু এই সকল প্রতিকূল ঘটনা সর্বদাই দৈবশক্তি দ্বারা প্রতিহত হইত বলিয়া, ইহারা যথার্থ নাট্যিক গৌরব

লাভ করিতে পারে নাই। অতএব যথার্থ নাটক রূপে এই সকল যাত্রার ক্রমপরিণতি লাভ করা সম্ভব হয় নাই। কৃষ্ণযাত্রার অন্যতম প্রধান ত্রুটি—ইহার গদ্য সংলাপের অভাব। সেইজন্য ইহার নাটগীত নামটি যথার্থ ই সার্থক। সঙ্গীতের পর সঙ্গীতের যোজনার দ্বারা ইহার শিথিল কাহিনী সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া যাইত; কাহিনী ইহার লক্ষ্য ছিল না, রসই ছিল ইহার লক্ষ্য এবং তাহা সৃষ্টি করিবার জন্য যতটুকু কাহিনী অপরিহার্য, তাহাই শুধু ইহাতে অবলম্বন করা হইত। ইহাও ইহার নাটক রূপে ক্রমপরিণতি লাভ করিবার পক্ষে অন্তরায় ছিল।

তবে একথা সত্য যে, কৃষ্ণবিষয়ক যাত্রার কাহিনীর মধ্যে নাট্যিক উপাদান খুব বেশি না থাকিলেও, মঙ্গলকাব্য-বিষয়ক কাহিনীর মধ্যে যথার্থ নাট্যিক উপাদান ছিল; কৃষ্ণলীলার কাহিনী অপেক্ষা মঙ্গলকাব্যের কাহিনী অধিকতর মানবিক গুণ-সমৃদ্ধ। কিন্তু মনে হয়, স্বাধীন যাত্রার আকারে মঙ্গলকাব্যের কোন কাহিনী আপনা হইতে বিকাশ লাভ করে নাই, কৃষ্ণলীলার অনুকরণে পরবর্তী কালে এই বিষয়ক যাত্রা রচিত হইয়াছিল—সেইজন্য ইহাদের মধ্যে নাট্যিক উপাদান থাকা সত্ত্বেও ইহা যথার্থ নাটক রূপে পরিণতি লাভ করিতে পারে নাই।

কৃষ্ণযাত্রার আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার কাহিনীর ধারায় কোন বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায় না, কিংবা কোন নাট্যিক ঔৎসুক্য (suspense) সৃষ্টি করিবারও ইহাতে কোন প্রয়াস নাই। একটানা গীতি-প্রবাহের বৈচিত্র্যহীন পথে ইহার কাহিনী অগ্রসর হইতে থাকে এবং একটি পরিমিত ছেদে আসিয়া ইহা থামিয়া যায়; ইহার গতি নাটকের কাহিনীর মত ক্ষিপ্র নহে, বরং ইহা মাহাত্ম্যপ্রচার-মূলক আখ্যায়িকার মত মন্দগতি। অতএব ইহা দ্বারা কোনদিনই নাটক সৃষ্টি সম্ভব হয় নাই।

কৃষ্ণযাত্রাকে কেহ কেহ মধ্যযুগীয় ইউরোপের Mystery এবং Miracle Playর সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। মধ্যযুগের এই সকল Mystery ও Miracle Play হইতেই যেমন ইউরোপীয় সাহিত্যে আধুনিক নাটকের সৃষ্টি হইয়াছিল, বাংলা দেশের কৃষ্ণযাত্রাও ক্রমে আধুনিক নাটকে পরিণতি লাভ করিয়াছে, একথা কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভুল। মধ্যযুগের ইউরোপে Renaissanceএর ভিতর দিয়া প্রাচীন কুসংস্কারের সহস্র নাগপাশ হইতে মুক্তিলাভের ফলে তাহার আত্মবোধের যে আনন্দ জাতীয়

জীবনের সকল দিকেই বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার নাট্যসাহিত্যের ভিতর দিয়াও তাহারই প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু বাংলা দেশ ইংরেজি শিক্ষার সংস্পর্শে আসিবার পরও সমগ্রভাবে যে প্রাচীন সংস্কারের সর্ববিধ দাসত্ব হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে, তাহা কিছুতেই মনে হইতে পারে না। অর্থাৎ ইউরোপীয় সমাজের মত সর্বতোমুখী Renaissance বাংলার সমাজে আজিও দেখা দেয় নাই; অতএব অর্থহীন প্রাচীন সংস্কারের দাসত্ব-বন্ধন হইতে তাহার সম্পূর্ণ মুক্তি এখনও আসে নাই। সুতরাং যে ব্যাপক সামাজিক ও মানসিক পরিবর্তনের ফলে ইউরোপের Mystery ও Miracle Playসমূহ নাটকে পরিণতি লাভ করিয়াছে, এই দেশে তাহার অনুরূপ পরিবর্তনের অভাবে ইহার কৃষ্ণযাত্রাপ্রমুখ ধর্মবিষয়ক রচনা নাটকে রূপান্তরিত হইতে পারে নাই। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম যে নাট্যরচনা আবির্ভূত হইল, তাহা প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবের ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে।

উনবিংশ শতাব্দীতে প্রাচীন কৃষ্ণযাত্রার ধারাটিকে যিনি পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিবার সর্বাধিক সার্থক প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাঁহার নাম কৃষ্ণকমল গোস্বামী। তিনি ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে 'নিমাই সন্ন্যাস' পালা রচনা করেন, তারপর ক্রমে 'স্বপ্নবিলাস', 'রাই উন্মাদিনী', 'বিচিত্র বিলাস', 'ভরত মিলন', 'সুবল সংবাদ', 'নন্দ বিদায়', 'গন্ধর্বমিলন' প্রভৃতি পালা রচনা করেন। কিন্তু তাঁহার ধারা তাঁহার দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই লুপ্ত হইয়া যায়।

খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দী হইতেই যাত্রার মধ্যে নূতন উপাদান প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়া ইহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য লুপ্ত করিয়া দেয়। ধর্মভাবের বিকাশই কৃষ্ণযাত্রাসমূহের লক্ষ্য ছিল, কিন্তু এই সময় হইতেই কৃষ্ণযাত্রায় ধর্মভাব হ্রাস পাইতে থাকে। ইহা অবশ্য যুগ-চেতনার ফল বলিতে হইবে। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতচন্দ্রের মধ্যেই বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম ধর্মবিষয়ে শৈথিল্যের ভাব দেখা দিয়াছে এবং ইহার পরবর্তী কাল হইতেই, বিশেষত একদিকে ভারতচন্দ্রের সর্বব্যাপী প্রভাবের ফলে ও অন্যদিকে প্রাচীন ধর্মাশ্রিত সমাজ-ব্যবস্থা ধ্বসিয়া পড়িবার জন্য, যাত্রা হইতেও এই ভাব বিদূরিত হইয়া গিয়াছে। তখন হইতেই কৃষ্ণযাত্রার মধ্যে সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে গদ্য-সংলাপ প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। এই সংস্কার বিষয়ে যিনি অগ্রদূত তিনি খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেই

বীরভূম জেলায় জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার নাম পরমানন্দ অধিকারী। তিনি 'কালীয়দমন যাত্রা' লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। যদিও তাঁহার রচনার পূর্ণাঙ্গ নিদর্শন আমাদের হস্তগত হয় নাই, তথাপি জানিতে পারা যায় যে, তাঁহার মধ্যেই সর্বপ্রথম একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন বৈষ্ণব গীতির পরিবর্তে নাট্যিক ক্রিয়া (dramatic action) এবং সংলাপ (dialogue) প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। তারপর খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই বিদ্যাসুন্দর এবং নলদময়ন্তীর কাহিনী অবলম্বন করিয়া 'নূতন যাত্রা' রচিত হয়। এই যাত্রার মধ্যে মালিনীর নৃত্য একটি বিশিষ্ট অঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়। গোপাল উড়ে এই বিষয়ের প্রথম প্রবর্তক বলিয়া কথিত হয়। ক্রমে অন্যান্য বিষয়ক যাত্রার কাহিনীর মধ্যেও অপ্রাসঙ্গিক ভাবে এই নৃত্য ও তৎসম্বলিত সঙ্গীতের প্রবর্তন হয়। ইহার সূত্র ধরিয়া ক্রমে ক্রমে 'নূতন যাত্রা'য় কালুয়া-ভুলুয়া, মেথর-মেথরাণী, ঘেসেড়া-ঘেসেড়ানী, নাপিত-নাপিতানী প্রভৃতি অশ্লীল নৃত্যগীতাদি প্রবেশ করিয়া ইহাকে রুচির দিক দিয়া বিকৃত করিয়া তুলে। শিক্ষিত মন তখন হইতেই ইহার প্রতি বিরূপ হইয়া উঠে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কৃষ্ণকমল গোস্বামী তাঁহার তিনখানি রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক যাত্রা রচনার ভিতর দিয়া প্রাচীন কৃষ্ণযাত্রার আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু ব্যাপক ভাবে সমাজ হইতে মধ্যযুগসুলভ ধর্মভাব বিদূরিত হইয়া যাইবার ফলে, এই প্রয়াস শেষ পর্যন্ত সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই—প্রায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই ইহার ধারাটি লুপ্ত হইয়া যায়। ক্রমেই বৈদেশিক আদর্শে প্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চের প্রভাব সর্বজয়ী হইয়া উঠিতে লাগিল এবং তাহার কোন কোন উপকরণ গিয়া 'নূতন যাত্রা'র মধ্যে প্রবেশ করিল—তখন যাত্রা আর এক নূতন পরিচয় লাভ করিল—তাহা গীতাভিনয়।

॥ ৫ ॥ গীতাভিনয়

কৃষ্ণকমল গোস্বামীর কৃষ্ণযাত্রা-পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস ফলপ্রসূ না হইলেও কৃষ্ণযাত্রার অনুরূপ একান্ত সঙ্গীত-নির্ভর এক শ্রেণীর গীতিনাট্যরচনা সেযুগে আবির্ভূত হইতে লাগিল, তাহা সাধারণ ভাবে গীতাভিনয় নামে পরিচিত। কৃষ্ণযাত্রা একান্ত কৃষ্ণপ্রসঙ্গ-ভিত্তিক, কিন্তু গীতাভিনয়ের মধ্যে সকল শ্রেণীর পৌরাণিক কাহিনীই অবলম্বন করা হইত। কৃষ্ণযাত্রার সঙ্গীত-সুরে

কোন বৈচিত্র্য ছিল না, প্রধানতঃ প্রচলিত কীর্তনের সুরেই ইহার সঙ্গীত আদ্যোপান্ত পরিবেশন করা হইত, বাদ্যযন্ত্রের মধ্যেও মৃদঙ্গ ও মন্দিরাই ইহার অবলম্বন ছিল। কিন্তু গীতাভিনয়ের সঙ্গীতের ভিতর সে যুগের বিবিধ রাগরাগিণী ব্যবহৃত হইত, দেশী এবং বিদেশী সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হইত। সুতরাং ইহা কৃষ্ণযাত্রা অপেক্ষা অধিকতর বৈচিত্র্যপূর্ণ হইয়া উঠিল। কৃষ্ণলীলার কাহিনী নিতান্ত বৈচিত্র্যহীন এবং শিথিলবদ্ধ ছিল, সুপরিচিত কৃষ্ণপ্রসঙ্গই ইহার উপজীব্য ছিল; কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ক পুরাণকে অবলম্বন করিবার ফলে গীতাভিনয়ে অতি সহজেই কাহিনীগত বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হইল। বিষয়ের দৈন্য কৃষ্ণযাত্রার যে ত্রুটির কারণ হইয়াছিল, তাহা গীতাভিনয়ের মধ্যে দূর হইয়া গেল, ক্ষীণতম বিষয়বস্তুর পরিবর্তে বিস্তৃত কাহিনী গীতাভিনয়ের ভিত্তি হইল, ইহাতে কাহিনীর ক্রমবিকাশের ধারা ও চরিত্র সৃষ্টির অবকাশ রচিত হইল। কেবলমাত্র অহৈতুকী কৃষ্ণভক্তির পরিবর্তে সমাজ-জীবনের উচ্চ নৈতিক আদর্শের প্রচার গীতাভিনয়গুলির লক্ষ্য হইল, সুতরাং ইহা সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ ব্যাপকতর আবেদন সৃষ্টি করিবার সম্ভাবনা প্রকাশ করিল। কৃষ্ণযাত্রাগুলি সংক্ষিপ্ত রচনা ছিল, কিন্তু গীতাভিনয়-গুলি পঞ্চাঙ্ক নাটকের মত সুদীর্ঘ রচনা, অনেক সময় প্রয়োজন অনুসারে অঙ্কের মাত্রা আরও বাড়িয়া যাইত এবং দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া ইহার বিচিত্র ঘটনার প্রবাহ অগ্রসর হইয়া যাইত। সেইজন্য অতি সহজেই কৃষ্ণযাত্রার পরিবর্তে ইহার প্রতি সাধারণের আকর্ষণ দেখা দিল।

একথা পূর্বেই বলিয়াছি, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই নূতন যাত্রা শিক্ষিত জনসাধারণের সহানুভূতি হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইয়াছিল। ইহার প্রধান কারণ ইহার আঙ্গিকের কোন ত্রুটি নহে, ইহার রুচির বিকার। এদিকে কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ও ধনী পরিবারের সখের রঙ্গমঞ্চগুলিতে যেসমস্ত নাটক অভিনীত হইতেছিল, তাহাতে সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না বলিয়া, কোন নূতন কৌশল অবলম্বন করিয়া জনসাধারণের মধ্যে নাট্যরস পরিবেশন করিবার প্রয়োজনীয়তাও কেহ কেহ অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন, সর্বসাধারণের মধ্যে নাটকের রস পরিবেশন করিবার পক্ষে নূতন যাত্রার আঙ্গিকই সর্বাপেক্ষা উপযোগী, অতএব ইহারই এক উন্নত রূপের ভিতর দিয়া তাঁহারা এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। ইহার মধ্যে কৃষ্ণযাত্রার ও নূতন যাত্রার গীত অংশকে সংক্ষিপ্ত

করিয়া তাহার স্থানে আধুনিক নাটকের অভিনেয় অংশের প্রাধান্য দেওয়া হইল—সেইজন্য ইহার নামকরণ করা হইল গীতাভিনয়। ইহা প্রাচীন কৃষ্ণযাত্রা কিংবা নূতন যাত্রার অবশ্যম্ভাবী ক্রমপরিণতিরূপে আবির্ভূত হইল না, বরং প্রাচীন যাত্রা ও নূতন যাত্রা উভয়েরই ভিত্তির উপর ইংরেজি আদর্শে রচিত বাংলা নাটকগুলির প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে সৃষ্ট হইল। আঙ্গিকের দিক দিয়া স্থূল দৃষ্টিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কৃষ্ণযাত্রা হইতে ইহার গীত, নূতন যাত্রা হইতে ইহার নৃত্য, ও তদানীন্তন বাংলা নাটক হইতে ইহার সংলাপের অংশ গৃহীত হইয়াছে। রসের দিক দিয়া ইহাতে প্রাচীন যাত্রার ভক্তি, নূতন যাত্রার আনন্দ ও ইংরেজি আদর্শে রচিত বাংলা নাটকের কারুণ্য একসঙ্গে গৃহীত হইয়াছে। ইহার সঙ্গে ভিতর ও বাহিরের দিক হইতে দেশীয় প্রাচীন ও নূতন যাত্রার যোগ ছিল বলিয়া ইহা এক দিক দিয়া যেমন দেশীয় রস-সংস্কারের অনুগামী হইয়াছিল, তেমনি অন্য দিক দিয়া যাঁহারা যুগপ্রভাববশত নূতন রসের অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহাদের রস-পিপাসা চরিতার্থ করিতেও সক্ষম হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই কবি, টপ্পা, কীর্তন, পাঁচালী, ঢপ প্রভৃতি সঙ্গীত মৌলিকতার অভাবের জন্য জনসাধারণের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইল। তখন এই সকল বিভিন্ন সঙ্গীতের স্বতন্ত্র সম্প্রদায়গুলির স্বাধীন অস্তিত্ব রক্ষা করাও কঠিন হইয়া পড়িল—ইহারা ইতিপূর্বেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়া কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিতেছিল। তবে প্রায় এক শত বৎসর বাংলার রসিক সমাজের মধ্যে রস বিতরণ করিয়া ইহারা যে রস-সংস্কার গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহা তখনও সম্পূর্ণভাবে দেশ হইতে লুপ্ত হইয়া যায় নাই; অতএব ইহারা অধঃপতনের যে স্তরেই নামিয়া যাউক না কেন, ইহাদেরও পৃষ্ঠপোষক একটি সম্প্রদায় এদেশে তখনও বর্তমান ছিল। নব-পরিকল্পিত গীতাভিনয়ের মধ্যে এই সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিচিত্র উপকরণগুলি গিয়া প্রবেশ লাভ করিল এবং তাহাতেই এই সকল বিলুপ্তপ্রায় সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকদিগের রসপিপাসা চরিতার্থ হইল। ইহাতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাঙ্গালী যে বিভিন্ন প্রকৃতির উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সাধনা করিয়াছিল, তাহাদের প্রায় প্রত্যেকটি রূপকেই কোন না কোন উপায়ে রক্ষা করা হইল। অবশ্য কবি-সঙ্গীতের মধ্যে ইতিপূর্বেই এদেশের সম-সাময়িক রাগসঙ্গীতসমূহ প্রবেশ করিয়াছিল; কবি-সঙ্গীতের ধারা খেউড়, আখড়াই, হাফআখড়াই ও

তর্জার ভিতর দিয়া যখন সকল বিষয়ে অধঃপতনের শেষ স্তরে নামিয়া গিয়া বিলুপ্ত হইবার উপক্রম করিতেছিল, তখন দেশীয় সঙ্গীতের উচ্চতর ধারাগুলি গীতাভিনয়কে আশ্রয় করিয়া কোনমতে আত্মরক্ষা করিল। অর্থাৎ একটি উৎকৃষ্ট গীতাভিনয়ের আনুপূর্বিক অনুষ্ঠান শুনিলে তাহাতে সমসাময়িক সকল প্রকৃতির সঙ্গীতের সাক্ষাৎকার লাভ করা যাইত। এইভাবে তদানীন্তন বাংলার বিশিষ্ট সঙ্গীতসাধনার ধারাগুলি যখন শুষ্ক হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতেছিল, তখন গীতাভিনয়ের মত একটি বিচিত্র রসানুষ্ঠানকে অবলম্বন করিয়া তাহারা কোন প্রকারে বাঁচিয়া গেল—কারণ, স্বাধীনভাবে আত্মরক্ষা করিবার মত জীবনীশক্তি তাহাদের আর ছিল না। অতএব গীতাভিনয়ের সাহিত্যিক মূল্য যাহাই হউক না কেন, ইহা উনবিংশ শতাব্দীর সাধারণ বাঙ্গালীর বিচিত্র রস-সংস্কারের এক শক্তিশালী বাহন হইয়া রহিয়াছে।

॥ ৬ ॥ পৌরাণিক যাত্রা

বাংলা লৌকিক নাট্যরচনার ক্ষেত্রে গীতাভিনয়গুলি ক্রমে এক নূতন প্রেরণার সঞ্চার করিল, তাহার ফলে যাত্রা-রচনার ধারায় কিছু পরিবর্তন দেখা দিল। গীতাভিনয়ের গীত এবং নৃত্য অংশ ক্রমে আরও সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিতে লাগিল এবং তাহাদের পরিবর্তে সংলাপ-অংশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইতিমধ্যে বাংলা সাহিত্যে নাটকের যে বিকাশ দেখা গিয়াছিল প্রধানত তাহারই প্রভাববশত গীতাভিনয়গুলি অধিকতর নাট্যধর্মী হইয়া উঠিতে লাগিল। সমসাময়িক বাংলা নাটকের মধ্যে সেক্সপীয়রের ক্রিয়া-বহুল নাটক-গুলির প্রভাব অত্যন্ত সক্রিয় হইয়া উঠিল। তাহার ফলে যুদ্ধবিগ্রহ, গুপ্ত ষড়যন্ত্র, হত্যা, বিদ্রোহ ইত্যাদি বিষয় বাংলা নাটকের উপজীব্য হইল। গীতাভিনয়ের মধ্যে জাতীয় জীবনের আদর্শ প্রচার করাই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, এবং তাহা প্রচার করিবারও একটি সুনির্দিষ্ট ধারা ছিল; সুতরাং প্রথমত ইহারা যে আবেদনই সৃষ্টি করুক ক্রমে ইহারাও বৈচিত্র্যহীন হইয়া উঠিতে লাগিল। এই যুগে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাটকের রচয়িতা গিরিশচন্দ্র ঘোষের আবির্ভাব হয়, তাঁহার রচিত পৌরাণিক নাটকগুলি দ্বারা সমসাময়িক যাত্রাগুলি প্রভাবিত হয়। তাহার ফলে নূতন একশ্রেণীর যাত্রা রচিত হয়, তাহা সাধারণভাবে যাত্রা বলিয়া পরিচিত হইলেও পৌরাণিক যাত্রা কথাটি ইহাদের সম্পর্কে অধিকতর সার্থক বলিয়া বোধ হইতে পারে। 'নূতন' যাত্রার

মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবের কোন স্পর্শ ছিল না, ধর্মবোধ-নিরপেক্ষ (secular) আনন্দ ও কৌতুক সৃষ্টিই ইহার লক্ষ্য ছিল, কিন্তু পৌরাণিক যাত্রার মধ্যে ভক্তি ও বিশ্বাসের ভাবটি আত্মপ্রকাশ করিল। ভক্তির কথা হইলেই কৃষ্ণ-ভক্তির কথা আসিয়া যায়, কারণ, কৃষ্ণ-উপাসনা অবলম্বন করিয়াই এই জাতির ভক্তির ভাব বিকাশ লাভ করিয়াছে ; সুতরাং পুরাণের যে অংশে কৃষ্ণপ্রসঙ্গ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, পৌরাণিক যাত্রার তাহাই অবলম্বন হইয়াছে। রামায়ণ, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, হরিবংশ ইত্যাদিই প্রধানত পৌরাণিক যাত্রার ভিত্তি হইয়াছে। বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটক রচনার সমান্তরাল ভাবে এই পৌরাণিক যাত্রা রচনার ধারা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে ; ইহা একদিক দিয়া যেমন পৌরাণিক নাটকের অনুকরণের ফল, আবার অন্য দিক দিয়া বাংলার সমাজের সমসাময়িক যুগের চিন্তা ও সাধনার বাহন। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলি নাগরিক জীবনের মধ্যে সমসাময়িক বাংলার সমাজ জীবনের আধ্যাত্মিক আদর্শ প্রচার করিবার যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছিল, পৌরাণিক যাত্রাগুলি বাংলার সুদূর পল্লী অঞ্চল পর্যন্ত পুরাণের বাণী প্রচার করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। প্রাচীন পল্লীর সমাজ-ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িবার ফলে সেখানে একদিন চণ্ডীমণ্ডপে কিংবা বারোয়ারীতলায় যে আসর সহজেই জমিয়া উঠিয়া কথক ঠাকুরের মুখ হইতে পুরাণ-প্রসঙ্গ শ্রবণ করিত, তাহা তখন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, অথচ পুরাণ শুনিবার যে সংস্কার এদেশের সমাজে গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা চরিতার্থ হইবার আর কোন উপায় ছিল না ; সুতরাং পৌরাণিক যাত্রাগুলি অতি সহজেই সেই স্থান অধিকার করিয়া লইল। ইহারা বাংলার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত জাতিবর্ণনির্বিশেষে বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজের উচ্চ নৈতিক আদর্শসমূহ প্রচার করিতে লাগিল। গিরিশচন্দ্র-প্রবর্তিত ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুকরণে ইহাদের সংলাপ প্রধানত রচিত হইত, তবে গিরিশচন্দ্রের নাটকের মত অহৈতুকী কৃষ্ণভক্তি কিংবা সর্ব-ধর্ম-সমন্বয়বাদ সর্বদাই যে ইহাদের ভিতর দিয়া প্রচারিত হইত, তাহা নহে ; অদৃষ্টবাদ, কর্মফলে বিশ্বাস প্রভৃতির কথাও ইহাদের ভিতর দিয়া শুনিতে পাওয়া যাইত। পৌরাণিক নাটকের মতই পৌরাণিক যাত্রাগুলিও কদাচ বিয়োগান্তক হইত না, কাহিনী বিয়োগান্তক হইলেও পরিণামে সকলের একটি মিলন দৃশ্য বা 'মেল্‌তা' দেখান হইত। সেই মিলন মর্তলোকে সম্ভব না হইলে

গোলোকে কিংবা বৈকুণ্ঠ কিংবা শিবলোকেও নির্দেশ করা হইত। পৌরাণিক যাত্রাগুলি অনুসরণ করিলেও বুঝা যায় যে বাংলা নাটক যখন যে ভাব ও রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, যাত্রাও তাহাই অনুসরণ করিয়াছে। কারণ, দেখা যায় যে, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রেও ভক্তিমূলক পৌরাণিক নাটক রচনার যুগের অবসান হইয়া যখন ঐতিহাসিক ও দেশাত্মবোধক নাটক রচনার সূত্রপাত হয়, সেই যুগেই যাত্রা রচনার ক্ষেত্রেও এক শ্রেণীর নূতন যাত্রার আবির্ভাব হয়—তাহা স্বদেশী যাত্রা নামে পরিচিত। তাহার কথা পরে বলিব। তাহার পূর্বে পৌরাণিক যাত্রার বিশেষ কতকগুলি লক্ষণ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

পৌরাণিক যাত্রা দীর্ঘকাল যাবৎ ব্যাপক প্রচার লাভ করিবার ফলে কালক্রমে ইহার মধ্যে কতকগুলি বিশিষ্ট আঙ্গিক গড়িয়া উঠিয়াছিল। যেমন পৌরাণিক যাত্রার কাহিনী কখনও বিয়োগান্তক হইত না, সর্বদাই মিলনান্তক হইত, শেষ পর্যন্ত ধর্ম এবং ভক্তির জয় প্রচার করাই ইহার মূল উদ্দেশ্য ছিল। আখড়াই বন্দী নাচ দিয়া কাহিনীর সূত্রপাত হইত। আখড়া শব্দের অর্থ নৃত্যগীত স্থান। যাত্রার আসরিক বন্দনা করা আখড়াই বন্দীর উদ্দেশ্য। অল্পবয়স্ক ছেলেরা নর্তকী সাজিয়া গীত সংযোগে আখড়াই বন্দী নাচিত। এই নৃত্যে বিদেশী বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে বেহালা ব্যবহৃত হইত, দেশীয় বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ঢোল, বাঁয়া তবলা ও মন্দিরা থাকিত। আখড়াই বন্দী নৃত্যের পর দেবদেবী বন্দনা হইত। আখড়াই বন্দী নৃত্যের রীতি লোক-সঙ্গীত হইতে এবং মঙ্গলাচরণ গান মঙ্গলগান হইতে হইয়াছে। মঙ্গলাচরণের গানকে আভিজাত্য দিবার জন্য তাহাতে অনেক সময় সংস্কৃত শব্দও ব্যবহৃত হইত। মঙ্গলাচরণের পরই প্রকৃত যাত্রার পালা আরম্ভ হইল, কাহিনীর সূচনায় প্রস্তাবনা থাকিত। পৌরাণিক যাত্রার মধ্যে জুড়ি গায়কের গানের প্রচলন ছিল। ইহারা কাহিনীর কোন স্বতন্ত্র চরিত্র নহে, পাত্র পাত্রীর মনোভাব তাহারা সঙ্গীতের মধ্য দিয়া পরিবেশণ করিত। তাহাদের পোষাক বিচিত্র ছিল। গায়ে সাদা চোগা চাপকান এবং মাথায় পাগ্ড়ি। চারিজন আসরের চারি কোণে দাঁড়াইয়া তারস্বরে চীৎকার করিয়া গান গাহিত। কোন কোন সময় দলের কোন সুদক্ষ বেহালা বাদক তাহার আসন হইতে উঠিয়া আসিয়া জুড়ির পিছনে দাঁড়াইয়া তাহার সঙ্গীতের সঙ্গে সুর যোজনা করিত। জুড়ির গানকে 'উক্তি গীত' বলিত। জুড়ির মত আর এক শ্রেণীর গায়ক ছিল, তাহাকে 'হাফ জুড়ি' বলিত। অল্পবয়স্ক বালকদিগের

সহযোগিতায় একজন বয়স্ক গায়কও অনুরূপ ভাবে কাহিনীর ভাব প্রকাশ করিত। তাহাকেই 'হাফ জুড়ি' বলিত। 'হাফ আখড়াই'র মতই 'হাফ জুড়ি' কথাটির সৃষ্টি হইয়াছিল। সেযুগে যাত্রার দলের অভিনেতা, বাদ্যকর এবং অন্যান্য কর্মচারীদের আসামী বলিত। উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষদিকে কলিকাতার কয়েকটি যাত্রার দল পৌরাণিক যাত্রার অভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে সক্ষম হইয়াছিল, ইহাদের মধ্যে শ্রীচরণ ভাণ্ডারীর দল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মতিলাল রায় এবং নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের পৌরাণিক যাত্রার দলও সেযুগে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল।

ইঁহারা উভয়েই যাত্রা পালার লেখক ছিলেন, মতিলাল প্রায় চল্লিশখানি পৌরাণিক যাত্রার পালা রচনা করেন। মতিলাল উত্তম সঙ্গীত রচয়িতা ছিলেন, তাঁহার এই চল্লিশ খানি বইয়ের মধ্যে যে সহস্রাধিক সঙ্গীত রচিত হইয়াছিল, তাহা জনসাধারণের মধ্যে একদিন মুখে মুখেই ব্যাপক প্রচার লাভ করিয়াছিল। নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে একজন লেখক লিখিয়াছেন, 'কীর্তনাঙ্গ যাত্রার পূর্ণাঙ্গ মৌলিক পালা নীলকণ্ঠই প্রথম রচনা করেন।' কীর্তনাঙ্গ যাত্রা প্রধানত কৃষ্ণযাত্রার ধারা অনুসরণ করিয়াই বিকাশ লাভ করিয়াছে। সুতরাং কৃষ্ণবিষয়ক এবং ভক্তিমূলক পৌরাণিক যাত্রার মধ্যে বিলুপ্তপ্রায় কৃষ্ণযাত্রার ধারাটির সন্ধান পাওয়া যায়।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে কৃষ্ণভক্তির সঙ্গে সঙ্গে যে শ্যামাভক্তিও আসিয়া মিশিয়াছিল, সে যুগের পৌরাণিক যাত্রা রচনায় তাহাও প্রকাশ পাইয়াছে।

যদিও সাধারণত পৌরাণিক যাত্রার যুগ পর্যন্ত যাত্রার অভিনয়ে পুরুষ অভিনেতারাই স্ত্রীভূমিকায় অংশ গ্রহণ করিতেন, তথাপি কিছু কালের মধ্যেই যাত্রার অভিনয়ে অভিনেত্রীরও আবির্ভাব ঘটিতে লাগিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগ হইতেই কলিকাতায় কয়েকটি মেয়ে যাত্রার দল গঠিত হইল।

॥ ৭ ॥ স্বদেশীযাত্রা

খ্রীষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেই লর্ড কার্জন কৃত বঙ্গবিচ্ছেদের প্রতিবাদ স্বরূপ বাংলা দেশে যে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, তাহার ফলে বাংলা নাট্যসাহিত্যের লক্ষ্য আমূল পরিবর্তিত হইয়া যায়। একদিন সমাজ-সংস্কার ও ভক্তিভাবের প্রচার ইহার উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু এই সময় দেশাত্মবোধ-প্রচারই ইহার একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠিল। এই দেশাত্মবোধ প্রচার করিতে গিয়া

বাংলা দেশের অতীত ইতিহাস হইতে বীর চরিত্রের অনুসন্ধান করিয়া স্বাধীনতা রক্ষায় তাহাদের ত্যাগ, দুঃখ ও আত্মবিসর্জনের কথা ইহাতে নানাভাবে বর্ণনা করা হইতে লাগিল। এমন কি, যে গিরিশচন্দ্র ঘোষ কেবলমাত্র পৌরাণিক নাটক রচনার মধ্যে তাঁহার জীবনের প্রায় সমগ্র অংশই নিয়োজিত রাখিয়াছিলেন, তিনিও তাঁহার চিরাচরিত পথ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার জীবনের সায়াহ্নে নূতন বিষয় লইয়া নাটক রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। এতদ্ব্যতীত দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলিও সমসাময়িক বাংলার সমাজের মধ্যে নূতন উত্তেজনার সৃষ্টি করিল। বাংলার যাত্রাগুলি স্বভাবতই ইহার প্রভাবমুক্ত থাকিতে পারিল না।

পূর্বেই বলিয়াছি, সমসাময়িক নাটক হইতেই যাত্রাগুলি সর্বদা প্রেরণা লাভ করিয়াছে, সুতরাং তখনও দেশাত্মবোধক নাটকগুলির অনুকরণে যাত্রা রচিত হইতে আরম্ভ করিল। একদিন যাত্রার আসর কেবলমাত্র রাধাকৃষ্ণ, ভীমার্জুনই অধিকার করিয়াছিল, কিন্তু নূতন যুগে প্রবেশ করিয়া ঐতিহাসিক চরিত্রও ইহার লক্ষ্য হইয়া উঠিল। এই ঐতিহাসিক চরিত্রের সূত্র ধরিয়াই ক্রমে ইহাতে সামাজিক চরিত্রের আবির্ভাবের সূচনা দেখা দিল। তখন আর কেবল পৌরাণিক চরিত্র নহে, এমন কি ঐতিহাসিক চরিত্রও নহে, আমাদের চারিদিককার সমাজের নরনারীও ইহার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিল। স্বদেশী যুগের যাত্রায় প্রধানত ঐতিহাসিক চরিত্রই স্থান লাভ করিলেও স্বদেশী আন্দোলন ক্রমে স্থিতি লাভ করিয়া যখন মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাত হইল, তখন ইহাতে সাধারণ মানুষের নানা সমস্যার কথাও নানা ভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিল। একদিন এই শ্রেণীর যাত্রায় মহাপুরুষের জীবন-কথা কীর্তিত হইয়াছে, কিন্তু ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষের জীবনও ইহার বিষয়ীভূত হইল। এই যুগে একজন শ্রেষ্ঠ যাত্রা-রচয়িতার জন্ম হয়, তাঁহার নাম মুকুন্দ দাস। তিনি বাংলায় সর্বশ্রেষ্ঠ স্বদেশী যাত্রার লেখক। শুধু তাহাই নহে, তিনি সুগায়ক, উত্তম অভিনেতা ও স্বয়ং যাত্রাদলের পরিচালক ছিলেন। যাত্রাগানের ভিতর দিয়া দেশাত্মবোধের বাণী তিনি বাংলার দূরতম পল্লী অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। কেবল রাজনৈতিক মুক্তি সংগ্রামই তাঁহার যাত্রা রচনার বিষয় ছিল না, সমাজ সংস্কারও তাঁহার লক্ষ্য ছিল। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই স্বদেশী যাত্রার ধারা এক প্রকার লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

স্বদেশী যাত্রার কাহিনীর মধ্যে হৃদয়াবেগ যত প্রবল বেগে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে, কাহিনীর দৃঢ় সংবদ্ধতা সেই পরিমাণে প্রকাশ পায় নাই। কাহিনীর দিক দিয়া ইহারা অকিঞ্চিৎকর এবং নিতান্ত শিথিলবদ্ধ ছিল। সেই অভাব প্রধানত উচ্ছ্বাস দ্বারাই পূর্ণ করা হইত। তাহার ফলেই ইহারা যতখানি যুগের প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ করিয়াছে, তত স্থায়ী কীর্তি রাখিয়া যাইতে পারে নাই। অধিকাংশ যাত্রারই স্থায়ী কোন সাহিত্যগুণ নাই, স্বদেশী যাত্রার সেই ত্রুটি আরও বেশি পরিমাণে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাদের সঙ্গীতেও যত গর্জন শুনিতে পাওয়া যায়, বর্ষণের পরিমাণ সেই অনুপাতে নগণ্য।

স্বদেশী যাত্রা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা হইতে ভক্তির ভাব দূর হইয়া গেল, এমন কি এতদিন পর্যন্ত যে রামায়ণের দলে একজন মাত্র গায়েন ৩।৪ জন দোহারের সহায়তায় রামায়ণের এক একটি অংশ দিনের পর দিন পরিবেশন করিয়া যাইত, তাঁহার সেই দল ভাঙ্গিয়া গিয়া রামযাত্রার দল গঠিত হইল। ইহাতে হনুমানের বেশ ধারণ করিয়া অভিনেতাকে আসরে আবির্ভূত হইতে হইত। ভক্তির ভাব দূর হইয়া গিয়া এখানে কৌতুকের ভাব প্রাধান্য লাভ করিল। এইভাবে চণ্ডীমঙ্গলের দল ভাঙ্গিয়া চণ্ডী যাত্রার দল হইল। মনসা-মঙ্গলের কাহিনীরই সর্বাপেক্ষা দুর্গতি দেখা দিল। কাহিনীর কারুণ্য ও উচ্চ নৈতিক আদর্শ বিসর্জিত হইয়া ইহারও যাত্রারূপ ভাসান-যাত্রা হাস্যরসের ভাণ্ডার হইয়া উঠিল। ইহার চরিত্রগুলি অক্ষম অভিনয় ও অযোগ্য বেশভূষা দিয়া কাহিনীকে কদর্য শৈবালে আচ্ছন্ন করিয়া দিল। অল্পদিনের মধ্যেই শিক্ষিত দর্শকের মন ইহাদের উপর বিরূপ হইয়া উঠিল।

॥ ৮ ॥ সামাজিক যাত্রা

স্বাধীনতা লাভের পূর্ব হইতেই প্রধানত মহাত্মা গান্ধীর হরিজন আন্দোলনের সমসাময়িক কাল হইতে যাত্রার মধ্যে আর একটি নূতন উপাদান গিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা সামাজিক জীবনের নানা সমস্যা। নানা সমস্যার মধ্যে অর্থ-নৈতিক সমস্যা প্রাধান্য লাভ করিবারই কথা; কিন্তু তাহার পরিবর্তে দেখা যায়, তাহাতে অস্পৃশ্যতা, অসবর্ণ বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক সমস্যাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। মূলত যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল, ভক্তি এবং ধর্মভাব প্রচার, কিন্তু স্বদেশী যুগের পরই সমাজের একটি স্তর হইতে ধর্মভাব বহুলাংশে তিরোহিত হইয়া যায়; কিন্তু যাত্রার সাধারণত যে স্তরের সমাজ পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া থাকে,

তাহাদের মধ্য হইতে ধর্মভাব তখনও সম্পূর্ণ দূর হইয়া যাইতে পারে নাই ; কিন্তু তাহার মধ্যেও আর একটি ভাবের তাহাতে জন্ম হইয়াছে, তাহা আত্মবিশ্বাসের ভাব এবং আত্মমর্যাদাবোধের প্রেরণা। মহাত্মা গান্ধীর হরিজন আন্দোলন, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের আন্দোলন, মন্দির প্রবেশে সর্বজনীন অধিকার স্বীকরণ ইত্যাদির ভিতর দিয়া সাধারণ স্তরের সম্পদের মধ্যেও যে ধীরে ধীরে সংস্কার মুক্তির প্রেরণা দেখা দিয়াছিল, তাহাই সেই যুগের কিছু কিছু যাত্রার প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিল। যাত্রার মধ্যে আমোদ প্রমোদই একদিন যে প্রাধান্য লাভ করিত, সেই যুগে তাহার পরিবর্তন দেখা দিল এবং তাহার পরিবর্তে যাত্রার কাহিনীর মধ্য দিয়া সমাজ-জীবনের গভীর সমস্যার বিষয় নানা ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবার সুযোগ উপস্থিত করা হইত। কিন্তু সামাজিক সমস্যামূলক নাটকের মধ্য দিয়া যাত্রার কতকগুলি মৌলিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিবার অন্তরায় দেখা দেয়। সমস্যার বিশ্লেষণ এবং বিচার অন্তর্দ্বন্দ্বমূলক, কিন্তু যাত্রা বহির্মুখী ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত-মূলক অর্থাৎ অতিনাটকীয় ক্রিয়া (action)-র উপর ইহাতে প্রাধান্য দিয়া চমক সৃষ্টি করিবার উপরই গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকে। কিন্তু সামাজিক সমস্যামূলক নাটকে তাহার অবকাশ কম। বিশেষত যাত্রার দৃশ্যগুণ একটি প্রধান আকর্ষণ, যাত্রায় রোমান্টিক জগতের বিচিত্র বেশভূষা ধারণকারী অভিনেতা অভিনেত্রী যে আকর্ষণ সৃষ্টি করিতে পারে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের পরিচিত নরনারী চরিত্র সেই আকর্ষণ সৃষ্টি করিতে পারে না। জীবনের সমস্যার কথা কেহ যাত্রায় শুনিতে যায় না, প্রত্যক্ষ আচরণটি তাহাতে দেখিতে পাইয়া কৌতুক এবং কৌতূহল অনুভব করে। সুতরাং সামাজিক সংস্কারের সদিচ্ছা লইয়া এই শ্রেণীর যাত্রার পালা রচিত হইলেও ইহারা যে ব্যাপক নিষ্ক্রিয়তা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। যাত্রার মধ্যে গিয়া দুঃখ দারিদ্র্য অভাব অনটনের কথা শুনিতে অভ্যস্ত নহে। প্রাত্যহিক জীবনের দুঃখ দৈন্য হইতে ইহাতে মুহূর্তের জন্য মানুষ মুক্তির সন্ধান করে, ইহাতেই যাত্রার দর্শক অভ্যস্ত হইয়াছে। সুতরাং যাত্রার মূল বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া যেখানে এই শ্রেণীর কাহিনী পরিবেষণ করা সম্ভব হইয়াছে, সেখানেই এই প্রকার যাত্রা জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে, কিন্তু তাহার পরিবর্তে যেখানে সামাজিক সমস্যাকেই একান্তভাবে নির্ভর করা হইয়াছে, সেখানেই ইহাদের আবেদন ব্যর্থ হইয়াছে।

যাত্রা প্রধানত ঐতিহ্যমূলক (traditional) কাহিনী অবলম্বন করিয়া রচিত হয়। সেই জন্য সামাজিক জীবনের কোন কল্পিত কাহিনী যতই সুবিন্যস্ত হউক, তাহাতে যথার্থ আবেদন সৃষ্টি করিতে পারে না। সেইজন্যই সামাজিক নাটক যথার্থ জনপ্রিয় হইতে পারে নাই। তথাপি ইহাদের রচনা দ্বারা যাত্রার বিষয়বস্তুর মধ্যে যে কত বৈচিত্র্য প্রবেশ করিয়াছে, তাহা অনুভব করিতে পারা যায়। ইহার মধ্য দিয়া আরও একটি বিষয় বুঝিতে পারা যায়, তাহা এই যে যাত্রা কেবলমাত্র একটি গতানুগতিক ধারা অনুসরণ করিয়াই রচিত হয় না, নানা দিক দিয়া ইহার মধ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চলিয়াছে।

হিন্দু-মুসলমানের মিলনাত্মক বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়াও একটি শ্রেণীর যাত্রা রচিত হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে সর্বদাই যে ঐতিহাসিক উপাদান ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা নহে, কোন কোন সময় সামাজিক নাটকের ভিতর দিয়াই এই বিষয়টি প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহাদের উদ্দেশ্য যতই সাধু হউক না কেন, যাত্রার সাফল্য কেবল মাত্র উদ্দেশ্যের সাধুতার উপরই নির্ভর করে না, বরং তাহার পরিবর্তে ইহার প্রয়োগ-কৌশলের উপরও অনেকখানি নির্ভর করে। পূর্বেই বলিয়াছি, সামাজিক নাটকের মধ্য দিয়া যাত্রার মৌলিক আঙ্গিক আরোপ করা অনেক সময় কঠিন হইয়া উঠে।

॥ ৯ ॥ যাত্রার পুনর্জন্ম

স্বাধীনতা লাভের কিছুকাল পর হইতেই যাত্রার মধ্যে এক নূতন প্রাণ-স্পন্দন অনুভূত হইতেছে। স্বাধীনতা সংগ্রাম, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মড়ক, দেশ বিভাগ, ইত্যাদি অবলম্বন করিয়া যে সামাজিক বিপর্যয় দেখা দিয়াছিল, তাহার প্রতিক্রিয়া অনেকটা স্তিমিত হইয়া যাইবার পর দেশের লুপ্ত সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের জন্য দেশবাসী যে মনোযোগী হইয়াছে, তাহার ফলেই যাত্রার মধ্যে নূতন প্রেরণা সঞ্চারিত হইয়াছে। যে সকল যাত্রার প্রতিষ্ঠান উক্ত বিপর্যয়ের মধ্যে নিজের অস্তিত্ব কোন রকমে রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল, তাহারা জন-সাধারণের সহানুভূতি লাভ করিয়া পুনরায় নূতন করিয়া গঠিত হইল। কলিকাতা মহানগরীর কেন্দ্রস্থলে মাসব্যাপী যাত্রা উৎসবে সহস্র সহস্র নরনারী অভূতপূর্ব উৎসাহ প্রকাশ করিয়া যোগদান করিল এবং ইহার পর হইতে কলিকাতায় প্রতি বৎসরই এই প্রকার উৎসব অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। নির্জীব যাত্রার প্রতিষ্ঠানগুলি পুনরায় সক্রিয় হইয়া নিজেদের পুনর্গঠন করিয়া নূতন

করিয়া ব্যবসায় ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। যাত্রার প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারী আনুকূল্য লাভ করিয়া উৎসাহিত হইতে লাগিল। ১৯৬৬ সনের অক্টোবর মাসে দিল্লীর সঙ্গীত নাটক আকাদেমির ব্যবস্থাপনায় যে East West Theatre Seminar and Theatre Arts Festival হইয়াছিল, তাহার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলার যাত্রা স্থান লাভ করিয়া নিজস্ব একটি বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্তমানে যাত্রা সম্পর্কিত আলোচনার নানা সুযোগ সৃষ্টি করা হইয়াছে; সহরের নানা আলোচনা সভায়, রাজধানীতে আন্তর্জাতিক লোক-নাট্যের উৎসব এবং আলোচনায় বাংলার নাটক সম্পর্কে আলোচনা হইয়া থাকে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই ডক্টর নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় যাত্রা সম্পর্কে গবেষণা করিয়া জার্মাণী হইতে ডক্টরেট উপাধি লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার পর এই বিষয়ে আর কোন উল্লেখযোগ্য আলোচনাই দেখা যায় নাই। কিন্তু এখন নানা পত্র-পত্রিকায় যাত্রার নানা সমস্যা লইয়া আলোচনা হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকগণ যাত্রা লইয়া গবেষণা করিতেছেন। সম্প্রতি যাত্রা সম্পর্কিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হইয়া যাত্রা ও ইহার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত নানা সমস্যার তাহাতে আলোচনা হইতেছে। এই সম্পর্কে দুইখানি পত্রিকার বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে পারা যায়; একখানি 'যাত্রাজগৎ'; ইহা বর্ধমান হইতে প্রকাশিত হয় এবং আর একখানি 'নাট্যলোক', ইহা কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। ইহাদের মধ্যে যাত্রাবিষয়ক গবেষণামূলক প্রবন্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া যাত্রার আঙ্গিকের উন্নতি বিষয়ে নানা আলোচনা প্রকাশিত হয়। প্রাচীন এবং আধুনিক যাত্রাশিল্পীদিগের জীবন এবং তাহাদের প্রতিভার পরিচয় প্রকাশিত হয়। একদিন এই সমাজ যে অবহেলিত এবং সমাজের উপেক্ষিত জীবন যাপন করিয়াছে, আজ তাহা হইতে ইহা মুক্তি লাভ করিয়া সমাজের বৃহত্তর শিল্পিগোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করিতেছে। দেশব্যাপী যেমন আজ নানা নাট্যসংস্থা স্থাপিত হইয়াছে, তেমনই দেশব্যাপী আজ যাত্রা-সংস্থাও স্থাপিত হইয়াছে। যাত্রা-সংস্থাগুলির মধ্যে কতকগুলি সৌখীন, কতকগুলি ব্যবসায়ী। সৌখীন অভিনেতা এবং অভিনেত্রীদিগকে লইয়া যেমন সৌখীন সংস্থাগুলি স্থাপিত, ব্যবসায়ীদিগকে লইয়া ব্যবসায়ী সংস্থাগুলি স্থাপিত হইয়াছে। গ্রামাঞ্চলেও এই শ্রেণীর সংস্থা স্থাপিত হইয়া নিজেদের মধ্যে যাত্রা বিষয়ে আলোচনা এবং যাত্রার অভিনয় করিয়া সমাজকে প্রভূত আনন্দ দান করিতেছে।

পল্লী অঞ্চলের একটি প্রতিষ্ঠানের নাম 'সূত্রধর,' ইহা হাওড়া জিলার চাকপোতা গ্রামে প্রতিষ্ঠিত। ইতিমধ্যেই ইহা বহু যাত্রা পালার অভিনয় করিয়া যশস্বী হইয়াছে। এই প্রকার আরও বহু প্রতিষ্ঠানের নাম করা যায়।

আধুনিক যাত্রার একটি শাখা যেমন রঙ্গমঞ্চ এবং চলচ্চিত্র দ্বারা প্রভাবিত হইয়া ইহার মৌলিক বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিতে উদ্যত হইয়াছে, তেমনিই আর একটি শাখা ইহার প্রাচীন ধারাটি যথাসম্ভব অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। রঙ্গমঞ্চ এবং চলচ্চিত্রের প্রভাবকে স্বীকার করিয়াই যাত্রার সর্বনাশ যে অনিবার্য হইয়া উঠিবে, তাহা আজ অনেক যাত্রাশিল্পীই বুঝিতে পারিয়াছেন।

আদি যুগ

(১৮৫২—১৮৭২)

প্রথম হইতে সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত

॥ সূচনা ॥

যদিও সংস্কৃত নাট্যরচনার একটি ধারা মধ্যযুগ পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল, তথাপি একথা সত্য যে, উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা নাটকের উৎপত্তির মূলে সংস্কৃত নাটকের কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব নাই। এমন কি, মধ্যযুগ পর্যন্ত নাটগীত শ্রেণীর যে সকল রচনা বাংলা ভাষাতেও এদেশে প্রচারলাভ করিয়াছিল, তাহাও বাংলা নাটকের উৎপত্তির মূলে কোন প্রভাবই স্থাপন করিতে পারে নাই। ইংরেজি নাটক বিশেষত সেক্সপীয়রের নাটকসমূহের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলেই, বাংলা নাটকের সর্বপ্রথম উৎপত্তি হইয়াছিল। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপনের পর হইতে বাংলা গদ্য রচনার অনুশীলনের মধ্যে ইহার প্রথম সম্ভাবনা স্থাপিত হইয়াছিল এবং কলিকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পর, দেশে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইহার অঙ্কুর চারিদিকে বিকাশ লাভ করিতেছিল। সেইজন্য বাংলা নাট্যরচনার প্রথম প্রয়াসের মধ্য দিয়াই ইহার মধ্যে ইংরেজি-সুলভ ভাব ও আঙ্গিকের আত্মপ্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও একটি কথা এখানে বিস্মৃত হইবার উপায় নাই যে বাংলা নাটকের প্রথম উৎপত্তির যুগে সংস্কৃত নাটকের বহু বাংলা অনুবাদও রচিত হয়। সকল অনুবাদের মধ্যে স্বভাবতই সংস্কৃত নাটকের ভাব ও আঙ্গিককে রক্ষা করা হইত—ইংরেজি ও সংস্কৃত আদর্শের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিবার প্রয়াস কিছুদিন পর্যন্ত তখনও দেখা দেয় নাই। বিশেষত এই সকল অনুবাদ যাঁহারা রচনা করিতেন, তাঁহাদের অধিকাংশই ইংরেজি ভাষায় অনভিজ্ঞ ও ইংরেজি নাট্যসাহিত্যের প্রকৃতির সঙ্গে অপরিচিত ছিলেন। তাহার ফল এই দাঁড়াইল যে, যদিও প্রত্যক্ষ ভাবে ইংরেজি নাট্যসাহিত্যের প্রভাব বশতই বাংলা নাটকের জন্ম হইয়াছিল, তথাপি ইহার প্রথম যুগে রচিত বহু মৌলিক ও অনুবাদ নাটকের মধ্য দিয়াই যথার্থ ইংরেজি নাটকের রস পরিবেশন করা সম্ভব হয় নাই। এই যুগে বাংলা ভাষার ভিতর দিয়া এই দেশে সংস্কৃত

নাটকের পুনরভ্যুদয় দেখা দিয়াছিল মাত্র। কোন কোন নাট্যকার সংস্কৃত নাটকের রসপাত্রে বাংলা নাটক পরিবেশন করিতে গিয়া বাঙ্গালী জীবনের কোন কোন বিচ্ছিন্ন দিককে সার্থক বস্তুরূপ দান করিতেও সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংস্কৃত নাটকের অনুবাদসমূহ একান্ত মূলানুগ হওয়ার ফলে, ইহা বাঙ্গালী পাঠকের চিত্তে যথার্থ নাট্যরস জাগ্রত করিতে সক্ষম হয় নাই। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের পৃষ্ঠপোষকতায় কলিকাতায় সখের রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা নাটকের অভাব অনুভূত হয়। এই অভাব পূর্ণ করিবার জন্য প্রথমত সংস্কৃত নাটকেরই দ্বারস্থ হইতে হইয়াছিল। কি সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদ দ্বারা এই অভাব যে পূর্ণ হইতে পারে ন তাহাও অল্প দিনের মধ্যেই সকলে অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। সেইজ কেহ কেহ মৌলিক নাটক রচনা করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। এইভা মৌলিক নাটক রচনার দুইটি ধারার উদ্ভব হয়—প্রথমত পৌরাণিক বিষ বস্তু অবলম্বন করিয়া একটি ধারা ও দ্বিতীয়ত তদানীন্তন সমাজের সাময়ি ত্রুটি-বিচ্যুতি অবলম্বন করিয়া অপর আর একটি ধারা। প্রথমোক্ত শ্রেণী নাটকের মধ্যে গুরু-বিষয়ের অবতারণা থাকিলেও, দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর নাট নিতান্ত লঘু-বিষয়ক ছিল ; ইহা সাধারণত প্রহসন বলিয়াই পরিচিত হইত এই সকল নাটক ও প্রহসনের মধ্যে জীবনের যে রূপ প্রতিবিম্বিত হইত, তা বহুলাংশে কৃত্রিম ও অতিরঞ্জিত হইলেও ইহাদের মধ্যে বাঙ্গালীর সজী প্রাণের স্পন্দনও মধ্যে মধ্যে অনুভব করা যাইত।

সামাজিক নাটক বলিতে সেই যুগে কেবলমাত্র প্রহসন ও সামাজি অব্যবস্থার চিত্র মাত্র ব্যতীত আর কিছুই বুঝাইত না। ইহার কার ইংরেজি সভ্যতার সংস্পর্শে আসিবার প্রথম অবস্থায় এদেশের সমাজের সং রূপটির উপর কঠিন আঘাত লাগিয়াছিল। তাহাতে সমাজের বাহিরের দিক উচ্ছল হইয়া উঠিয়া ইহার অন্তরের রসরূপটিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছি সেইজন্য তখন বাংলার সমাজের অন্তর্লোকে প্রবেশ করিয়া তাহা হই ইহার রস-পরিচয়টি উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। সমাজ বলিতে ত সমাজের ত্রুটিগুলিই সর্বপ্রথম চোখের উপর ভাসিয়া উঠিত। রাজা রা মোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পর্যন্ত বাংলার প্রত্যে মনীষীই বিভিন্ন দিক হইতে বাংলার সমাজের ত্রুটিগুলি জনসাধারণে সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। তাহার ফলে এদেশের প্রত্যেক চিন্তা

ব্যক্তিই সেইগুলি লইয়া নানা দিক হইতে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিলেন। বাংলার প্রথম যুগের নাট্যসাহিত্যের মধ্যে তাহারও অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল।

পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিদৃষ্ট কেবলমাত্র বাংলার সমাজের দোষত্রুটিগুলি অবলম্বন করিয়াই যে প্রথম যুগের বাংলার সামাজিক প্রহসন বা নাটকগুলি রচিত হয়, তাহা নহে—প্রায় এক শত বৎসর পাশ্চাত্ত্য সাহচর্যের ফলে পাশ্চাত্ত্য সমাজের যে সকল দোষত্রুটি বাংলার সমাজদেহে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাদের কুফলগুলিও ইতিমধ্যে জনসাধারণের দৃষ্টিতে প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাও তখন বাংলার সামাজিক প্রহসনগুলির অবলম্বন হয়। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত বিষয়বস্তু লইয়া কোন পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনার প্রয়াস প্রথম অবস্থায় অনেক দিন পর্যন্ত দেখা যায় নাই। কতকগুলি অতিরঞ্জিত চিত্রের সহায়তায় প্রধানত কথোপকথনের ভঙ্গিতে বিষয়গুলি পরিবেশন করা হইত—ইহাদের মধ্যে যেমন বাস্তবকে বহুদূর অতিক্রম করিয়া যাইবার প্রবণতা দেখা যাইত, তেমনই ইহাদের রূপায়ণেও যথেষ্ট শৈথিল্য প্রকাশ পাইত। অতএব কোন দিক দিয়াই ইহারা সাহিত্যিক লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারে নাই। সুতরাং বাংলা নাট্যসাহিত্যের আলোচনায় ইহারা স্থান পাইবার কতদূর যোগ্য, তাহা বিবেচনা করিতে হয়।

কিন্তু সেইযুগে রচিত কয়েকখানি সামাজিক নাটক বা প্রহসনের এই প্রকার অতিরঞ্জিত চিত্রের মধ্যেও যথার্থ বস্তুরস পরিবেশন ও চরিত্রসৃষ্টির আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা সমস্তই বিচ্ছিন্ন প্রয়াস মাত্র—ইহাদের ধারা পূর্বাপর রক্ষা পায় নাই; কিংবা রক্ষা পাইলেও তাহা বহুদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। কোন সুপ্রতিষ্ঠিত আদর্শের অভাবে সে যুগের প্রত্যেক নাট্যকারই কেবলমাত্র নিজস্ব প্রেরণা অনুযায়ী নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন; মুখ্যত কেহ কাহারও পুচ্ছগ্রাহিতা করিবার উদ্দেশ্যে নাট্যরচনায় প্রবৃত্ত হন নাই। কিন্তু সেইযুগেই কালক্রমে যখন দুইজন প্রতিভাবান্ শিল্পীর নাট্যরচনার আদর্শ সমাজের লক্ষ্যগোচর হইয়া পড়িল, তখনই এই পুচ্ছগ্রাহিতার সূত্রপাত হইল; কিন্তু এই পুচ্ছগ্রাহিতার প্রবৃত্তি প্রথম যুগের নাট্যসাহিত্যে নিতান্ত পীড়াদায়ক হইয়া না উঠিলেও, ইহার পরবর্তী যুগের নাট্যসাহিত্যকে বৈচিত্র্যহীন করিয়া তুলিয়াছিল।

প্রথম যুগের অধিকাংশ নাটকই অভিনীত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে নাই। বিশেষত যে কয়খানি নাটক এই দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী

হইয়াছিল, তাহাদের দর্শক-সমাজ নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া, সাধারণ সমাজের উপর ইহাদের কি প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল, তাহা অনুমান ভিন্ন বলিবার উপায় নাই। অতএব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, যতদিন পর্যন্ত সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা না হইয়াছে, ততদিন পর্যন্ত বাংলার নাটক ব্যাপকভাবে বাংলার সমাজের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় বিদগ্ধজনের মনস্তুষ্টি করিয়াছে মাত্র। অতএব সেই যুগের নাটকের জন্য সমাজের সাধারণ লোক কোন সাড়া অনুভব করিতে পারে নাই। ইহা ধনীর নির্দেশমত রচিত হইয়াছে, তাঁহাদের অনুমোদন লাভ করিয়া অভিনীত হইয়াছে, তাঁহাদের অর্থব্যয়েই মুদ্রিত হইয়াছে এবং তাঁহাদের বন্ধু-স্বজনের মধ্যেই প্রচারিত হইয়াছে। সেই যুগে যে সকল নাট্যকার ধনীর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের সকল প্রয়াসই অঙ্কুরে বিনষ্ট হইয়াছে। অতএব সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত বাংলা নাট্যসাহিত্যের আদি যুগ বলিয়া নির্দেশ করিতে হয়।

প্রথম অধ্যায়

গেরাসিম লেবেডেফ

(১৭৯৫—১৭৯৬)

"আধুনিক বাংলার নাটক ও নাট্যশালার উদ্ভবের সঙ্গে একজন অনন্যসাধারণ প্রতিভাশালী রুশদেশীয় মনীষীর নাম যুক্ত হইয়া আছে, তিনি গেরাসিম স্টেপানোভিচ্ লেবেডেফ্ (Geracim Stepanovich Lebedeff)। তিনি ১৭৪৯ সন হইতে ১৮১৭ সন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। এক অত্যন্ত উদার মনোভাব লইয়া তিনি আধুনিক ভারতের সর্বপ্রথম রুশ-ভারতীয় মৈত্রীবন্ধন স্থাপন করিয়াছিলেন, রুশদেশে ভারতীয় জ্ঞান-বিদ্যার বিষয় অনুশীলন করিবার প্রথম সোপান রচনা করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে তাঁহার কোন সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক কিংবা ব্যবসায়িক বুদ্ধিও ছিল না, বরং তিনি প্রকৃত সত্যসন্ধানীর দৃষ্টি লইয়া ভারতীয় তত্ত্ব এবং তথ্য সেদিন স্বদেশবাসীর নিকট যথাযথভাবে পরিবেষণ করিয়া রুশ দেশের নিকট ভারতবর্ষকে যথার্থ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাহার বিস্তৃত জীবনের বহুমুখী কর্মধারার পরিচয় দেওয়া এখানে অনাবশ্যক, কেবলমাত্র বাংলা নাটক এবং নাট্যশালার উদ্ভবের মূলে তাঁহার যে বিশিষ্ট দান ছিল, তাহারই কথা এইখানে কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করিব।'

গেরাসিম লেবেডেফ ১৭৮৫ সনে সর্বপ্রথম আসিয়া ভারতের উপকূলে পৌছান। প্রথমত দুই বছর মাদ্রাজ শহরে অতিবাহিত করিয়া ১৭৮৭ সনে তিনি কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন। তারপর সুদীর্ঘ বিশ বৎসর কাল একাদিক্রমে তিনি কলিকাতা শহরেই বাস করেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলের কলিকাতা তখন ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক রাজধানী শহররূপে গড়িয়া উঠিতেছে। গেরাসিম কলিকাতার সেইদিনকার সাংস্কৃতিক জীবনের রূপটি গভীর ভাবে লক্ষ্য করিয়া তাহার পরিপুষ্টিকল্পে স্বোপার্জিত অর্থ ও শ্রম নিয়োগ করিবার কাজে অগ্রসর হইয়া গেলেন এবং এই বিষয়ে যে সকল দুঃসাহসিক কাজে অগ্রবর্তী হইলেন, বাংলা নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা তাহাদের মধ্যে প্রথম এবং প্রধান।

রুশদেশের একজন প্রতিভাবান্ অধিবাসী কেন যে নাগরিক জীবনের সাংস্কৃতিক রূপকে দৃঢ়মূল করিবার উদ্দেশ্যে সাংস্কৃতিক জীবনের অন্যান্য বিষয়

বাদ দিয়া প্রথমেই নাট্যশালা প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হইয়াছিলেন, তাহা রাশিয়ায় গিয়া নিজের চোখে রাশিয়ার সাংস্কৃতিক জীবনের রূপটি প্রত্যক্ষ না করিলে বুঝিতে পারা যায় না। রাশিয়ার নাগরিক জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ নাট্য-শালা। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাট্যশালা মস্কোর বলশয় থিয়েটার, মস্কো আর্ট থিয়েটার, লেনিনগ্রাডের কিরোভ থিয়েটার ইত্যাদি রাশিয়ার জাতীয় সংস্কৃতির পরম গৌরব। সুতরাং লেবেডেফ যখন কলিকাতায় আসিয়া কলিকাতার সেদিনকার সাংস্কৃতিক রূপটি প্রত্যক্ষ করিলেন, তখন ইহার মধ্যে অন্যান্য দেশীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান দেখিতে পাইলেন সত্য, কিন্তু লেবেডেফের নিজস্ব জাতীয় গৌরব যাহার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে এবং যাহার সঙ্গে স্বভাবতই তাঁহার অন্তরের সুনিবিড় যোগ ছিল, তাহার কোন দেশীয় রূপ এখানে দেখিতে পাইলেন না। কোম্পানির থিয়েটার কলিকাতায় সেদিন ছিল সত্য, কিন্তু তাহার সঙ্গে বাঙ্গালী সমাজের কোন সম্পর্ক ছিল না; তাহাতে ইংরেজ দর্শকের সামনে ইংরেজ অভিনেতা-অভিনেত্রীর সহায়তায় ইংরেজি নাটক অভিনীত হইত, তাহাতে দেশীয় জন-সাধারণ প্রবেশাধিকার পাইত না। সুতরাং তাহা হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিবার তাহাদের কোনও উপায় ছিল না। একটি অত্যন্ত উদার দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া লেবেডেফ তাহা লক্ষ্য করিলেন এবং নিজে রুশ-দেশীয় হইয়াও এবং রুশ দেশ নাট্য-সংস্কৃতিতে এত সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এই বিষয়ে নিজস্ব সকল জাতীয় অভিমান বিসর্জন দিয়া দুইখানি ইংরেজি নাটক নিজের চেষ্টায় এবং নিজস্ব অর্থব্যয়ে বাংলায় অনুবাদ করিতে অগ্রসর হইলেন। তারপর বাঙ্গালীর জন্য নিজস্ব একটি নাট্যশালা নির্মাণ করিয়া তাহার ভিতরে বই দুইখানি অভিনয় করিবার দুরূহ সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন। 'কেবলমাত্র বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবনের পরিপুষ্টির সহায়তা ছাড়া এই বিষয়ে আর তাঁহার কোন ব্যক্তিগত কিংবা জাতীয় স্বার্থ ছিল না। বিজয়ী জাতি ইংরেজের বিজিত জাতি বাঙ্গালীর উপর যেমন একটি স্বাভাবিক প্রভুত্ববোধ ছিল, গেরাসিমের স্বভাবতই তাহা ছিল না; নিজের সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাবোধ ছিল বলিয়াই দেশান্তরের সংস্কৃতি-রূপের একটি বিশেষ দৈন্য দূর করিবার জন্যই তিনি সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন।' তিনি ব্যবসায়ী ছিলেন না, বরং কোম্পানীর শাসক সম্প্রদায়ই ব্যবসায়ী ছিল; সুতরাং কেবলমাত্র সংস্কৃতির স্বার্থ রক্ষা করার জন্য গেরাসিম যে ভাবে এই বিষয়টিকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, ইংরেজের সেদিন সেই ভাবে এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করিবার সাধ্য ছিল না। তাই

গেরাসিমের এই বিষয়ক আগ্রহ যেমন আন্তরিক হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইল, তাহা অন্য কোন দিক হইতে লাভ করিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

গেরাসিম স্বয়ং বেহালা-বাদক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি ইতিপূর্বেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এবং ভারতবর্ষেরও কোন কোন অংশে তাঁহার এই বিষয়ক গুণের পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশে তাঁহার মধ্যে অন্য একটি পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছিল। কারণ, বাংলাদেশে আসিয়া ইহার ভাষা, সাহিত্য এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে তিনি এমন কোন কোন বিষয়ের সন্ধান পাইলেন, যাহা হইতে তিনি ইহার সাংস্কৃতিক জীবনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিষয়ে একটি বিশ্বাস গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তাই তিনি একটি অত্যন্ত দুরূহ কার্যে সেদিন অগ্রসর হইয়া গিয়াছিলেন। গেরাসিম কলিকাতায় আসিয়া প্রথম হইতেই বাংলা ভাষা শিখিতে লাগিলেন; সাধুভাষা এবং চলিত ভাষা উভয় রীতির সঙ্গেই তিনি পরিচিত হইলেন। তারপর ক্রমে সংস্কৃতও শিখিলেন। সংস্কৃত ভাষা শিখিয়া এ দেশের জ্যোতিষশাস্ত্র এবং পুরাণগুলিও কিছু কিছু পড়িলেন। এখানে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তিনি সে-যুগের ইংরেজ কর্মচারী ছিলেন না, সুতরাং রাজকর্মচারীরা সেদিন দেশীয় পণ্ডিত লোকদিগের কাছে যে ভাবে সুবিধা গ্রহণ করিবার সুযোগ লইতেন, তিনি সেই ভাবে তাহা লইতে পারেন নাই; তাঁহাকে নিজের প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া নানা অসুবিধার ভিতর দিয়া এই দুরূহ জ্ঞানান্বেষণের কার্যে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। এই কার্যে যে সকল পণ্ডিত তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে গোলোকনাথ দাস, জগমোহন বিদ্যাপঞ্চানন এবং জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। প্রত্যেকেই সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত। ইঁহারা শিক্ষক ও অধ্যাপকের কাজ করিতেন। সুতরাং দেখা যায়, গেরাসিম ভারতীয় বিষয়সমূহ অধ্যয়ন করিতে গিয়া এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য অবলম্বনই আশ্রয় করিয়াছিলেন। তাহার সঙ্গে নিজের অধ্যবসায় যুক্ত হইয়াছিল বলিয়া এই সকল বিষয়ে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই বিশেষ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন।

বাংলা ভাষায় যখন গেরাসিমের যথেষ্ট অধিকার হইয়াছে বলিয়া তাঁহার মনে হইল, তখন তিনি 'দি ডিস্‌গাইজ' এবং 'দি লাভ ইজ দি বেস্ট ডক্টর' নামে দুইখানি ইংরেজি প্রহসন বাংলায় অনুবাদ করিলেন। ইংরেজি ভাষা হইতে নাটক দুইখানি নির্বাচন করিবার মধ্যেও তাঁহার চরিত্রের বিশেষ একটি

দিকের পরিচয় পাওয়া গেল ; তাঁহার যদি নিজের জাতি ও ভাষা সম্পর্কে কোন গোঁড়ামি থাকিত, তবে তিনি স্বচ্ছন্দেই কোন রুশ নাটকের বাংলা অনুবাদ করিতে পারিতেন এবং সে-কাজ তাঁহার পক্ষে আরও সহজ হইত। কারণ উক্ত নাটক দুইখানির মূল ইংরেজি ভাষা এবং বাংলা ভাষা কিছুই তাঁর নিজস্ব ভাষা ছিল না। সুতরাং রুশ ভাষার মূল গ্রন্থ হইলে তিনি যে সুযোগ পাইতেন ইংরেজি ভাষার মূল হইতে তিনি তাহা পাইতে পারেন নাই। এই বিষয়ে তাঁহার যে একটি অত্যন্ত উদার এবং সংস্কারমুক্ত মনোভাব ছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। *The Disguise* নামে যে ইংরেজি নাটক তিনি অনুবাদের জন্য নির্বাচন করিয়াছিলেন, তাহা কোন সুপরিচিত ইংরেজ নাট্যকারের রচিত নয়, ইহা এম্. জোড্রেল নামক একজন নিতান্ত অপরিচিত নাট্যকার কর্তৃক রচিত। *The Love is the Best Doctor*-ও তাহাই ; তবে কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, তাহা ফরাসী প্রহসন-রচয়িতা মলিয়ারের কোনও রচনা হইতে পারে ; কিন্তু এই অনুবাদখানি পাওয়া যায় নাই বলিয়া এই বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলিবার উপায় নাই। *The Disguise* নাটকটির বাংলা অনুবাদ হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি যে কেবলমাত্র আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা নহে। এক দেশের রস-বস্তু অন্য দেশের ভাষায় আক্ষরিক অনুবাদ করিবার মধ্য দিয়া যে তাহার সার্থকতা দেখা দেয়, তাহা নহে, তাহা যদি দেশের রস-সংস্কারের মধ্যে স্বাঙ্গীকৃত হয়, তবেই তাহার সার্থকতা দেখা দিতে পারে ; এই উদ্দেশ্যেই তিনি সমসাময়িক কলিকাতার নাগরিক সমাজের রুচির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহাতে কতকগুলি দেশীয় প্রকৃতির অতিরিক্ত চরিত্র সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। মূল কাহিনীটি প্রহসন শ্রেণীর ছিল বলিয়া নতুন চরিত্রগুলিও প্রহসনধর্মী করিয়া পরিকল্পনা করিয়াছেন। চৌকিদার, খুনিয়া, মহুরি, 'গাউয়্যা', 'বাজিয়্যা', 'নাচিয়্যা' নাটকের এই সকল লঘু চরিত্র সেদিনকার কলিকাতার সমাজ-জীবনের পটভূমিকায় সৃষ্ট হইয়াছে।

গেরাসিম লিখিয়াছেন যে, নাটক দুইটি অনুবাদ করিবার পর, তিনি দেশীয় পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের তাঁহার রচনা শোনান এবং তাঁহারা তাহা গভীর ভাবে বিচার করিয়া তাঁহাদের অনুমোদন জানান। 'When my translation was finished I invited several learned Pandits who perused my work several times very attentively,......After the applause of the Pundits Goloknat Dash, my linguist, made me

a proposal if I chose to represent this play publicly he would engage to supply me with Native actors of both sexes, and I was exceedingly delighted with the idea'.

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে, গেরাসিমের আত্মবিশ্বাস অত্যন্ত প্রবল ছিল, তাঁহার অনুবাদ-কার্যের মধ্যে তাঁহার আত্মবিশ্বাসের শক্তি যত সক্রিয় ছিল, বাংলা ভাষার জ্ঞান তত গভীর ছিল না; অবশ্য তাহা থাকিবার কথাও নহে। তাঁহার *The Disguise* নাটকের বাংলা অনুবাদের যে কোন অংশ লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, তাহা আদর্শ বাংলা গদ্য ভাষায় রচিত নহে। গেরাসিম এই বিষয়ে নিজের বুদ্ধি দিয়া যতদূর পরিচালিত হইয়াছেন, দেশীয় পণ্ডিতদিগের উপদেশ ও পরামর্শ দ্বারা ততদূর পরিচালিত হন নাই। তাঁহার অনুবাদের একটু দৃষ্টান্ত এখানে উদ্ধৃত করিলেই বিষয়টি স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে।

প্রথমত তিনি *The Disguise* কথাটির বাংলা অনুবাদ সাধারণ ভাবে 'ছদ্মবেশ' শব্দটির পরিবর্তে গ্রহণ করিয়াছেন, 'কাল্পনিক সংবদল'। তারপর ইংরেজি Act শব্দটির সাধারণ সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত 'অঙ্ক' শব্দটি গ্রহণ না করিয়া তিনি তাহার পরিবর্তে 'ক্রীয়া' শব্দটি ভুল বানান সহ ব্যবহার করিয়াছেন। Scene শব্দটিকে 'ব্যক্ততা' বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন। তারপর তাঁহার অনুবাদের ভাষারও এই নিদর্শন পাওয়া যায়—

[নানান বাজিয়্যারা ভিন্ন ভিন্ন পোসাখেতে আর আর মখসের কাব্য করেন জানালার সম্মুখে।]

ভাগ্যবতি: [বাজীয়ারদিগকে কয়।] মহাসএরা, এই ভাল! ঠাকুরানি তুষ্ট হইয়াছেন শুনিয়া আর উনি বলেন আমার-(তোমার)-দিগকে জাইতে। সুভ হউক। [বাজীয়ারা গেল।] ভাল, আমি প্রাথনা করি জে এই আয়জন ফুরিয়াছে। আমি নিতান্ত উতপাতগ্রহস্ত ছিলেম। সে কি নিমিত্থে! কিবল একটি মনুস্যর কারণ। পশ্চাত তারে পাইলে কিছু মন্দ শুবে ঠাহঁরিবেন না! একটি স্বামির নিমিত্থে। ও কি দুর্দসা এ, তা আমি জানি বিলক্ষণ রুপে। রাম বল! রক্ষা পাই—কি চমৎকার আকার এ আসিতেছে এখানে এবং কথা কহিতেছে আপনা-আপনি। এ বুঝী—। জা হউক, আমি সাহস করিয়া খানিক দেখি উহাকে, সতর্ক হই উহাকে।

[ভাগ্যবতি (ঘোমটা দিয়া লুকায়) ঘোমটা টেনে দীলে। প্রবেস হইল রামসন্তোস গোঁপের সহিত, জামা গায়, তোগ, টুপি পাখনা দেয়া। মৌজে বেড়ায়।] —১।১

তখনও বাংলায় সাহিত্যিক গদ্যভাষার জন্ম হয় নাই এই কথা সত্য; কিন্তু তথাপি সাধারণের জন্ম মৌখিক প্রচলিত যে গদ্যভাষা ছিল, তাহার সঙ্গেও ইহার কিছুমাত্র যোগ স্থাপিত হইতে পারে নাই। সুতরাং দেশীয় পণ্ডিত

সমাজ যে গভীর ভাবে বিচার করিয়া এই রচনা অনুমোদিত করিয়াছিলেন, তাহা মনে করা কঠিন হইতে পারে। কারণ, তাহাতে ইংরেজি শব্দবিন্যাস-রীতি (Syntax) অনুযায়ী যে সকল বাক্য রচনা করা হইয়াছে, তাহা দেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর সমর্থন করিবার কথা নহে। তখনও সাহিত্যিক গদ্যভাষার উদ্ভব না হইলেও দলিল এবং চিঠিপত্রে এক শ্রেণীর যে গদ্য ভাষার ব্যবহার হইত, এই গদ্য তাহার কোন ধর্মই স্বীকার করে নাই। সুতরাং পণ্ডিতমণ্ডলীর অনুমোদনের কথা উল্লেখ করা হইলেও এই অনুবাদ যে গেরাসিমের নিজস্ব রচনা, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং তাহার কৃতিত্ব কিংবা ব্যর্থতার সকল দায়িত্বও তাঁহারই; দেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর এই বিষয়ে কোন দায়িত্ব আছে বলিয়া মনে হয় না।

অনুবাদের এই ভাষা হইতে বুঝিতে পারা যায়, কোন লিখিত আদর্শের অভাবে তখনকার কলিকাতার সাধারণ লোকের মুখে গদ্য ভাষা শুনিয়াই গেরাসিম বাংলা কথ্যভাষার আদর্শ রূপটির সন্ধান করিতে গিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে সফল হন নাই। এই বিষয়ে আরও নানা অসুবিধাও সেইদিন ছিল। কলিকাতা অঞ্চলেও অখণ্ড একটি আদর্শ কথ্যভাষার রূপ তখনও গড়িয়া উঠে নাই। সেইজন্য গেরাসিম তাহা অনুসরণ করিবার সুযোগ পান নাই। তবে কথ্যভাষায় নাটকীয় সংলাপ রচনার যে প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা তিনি উপলব্ধি করিয়া, এই বিষয়ে তাঁহার যতটুকু জ্ঞান ছিল, ততটুকুই তিনি কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সে জ্ঞান যে তাঁহার নিতান্ত পরিমিত ছিল, তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

যদিও গেরাসিম লিখিয়াছেন যে, নাটক দুইটি অনূদিত হইবার পর তাঁহার বাংলা শিক্ষক গোলোকনাথ দাস *The Disguise* নাটকের অনুবাদটি মঞ্চস্থ করিবার পরামর্শ দেন, তথাপি মনে হয়, মঞ্চস্থ করিবার সঙ্কল্প লইয়াই গেরাসিম তাঁহার অনুবাদ দুইখানি রচনা করিয়াছিলেন, নতুবা কেবলমাত্র নাটক দুইখানি তাঁহার পক্ষে সেই দিন অনুবাদ করিবার কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না; বিশেষত সেই অনুবাদ যখন মুদ্রিত হইবার কোন উপায় ছিল না এবং শেষ পর্যন্ত তাহা হয়ও নাই। সুতরাং এই কথা মনে করা যায়, নাটক দুইখানি মঞ্চস্থ করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি ইহাদের অনুবাদ করিয়াছিলেন; এই বিষয়ে গোলোকনাথের কথা যে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার লৌকিক সৌজন্য প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নহে।

The Disguise নাটকের অনুবাদটির অভিনয় হইবার আয়োজন হইতে লাগিল। তখন ১৭৯৫ সনের নভেম্বর মাস। কলিকাতায় তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একটি নিজস্ব রঙ্গালয় ছিল।' কোম্পানির মালিকেরা গেরাসিমের এই প্রচেষ্টাকে তাঁহাদের প্রতিযোগিতা-মূলক অনুষ্ঠান বলিয়া মনে করিলেন। সুতরাং নিজেদের ব্যবসায়ের দিক হইতে তাঁহারা তাঁহার উদ্দেশ্যকে অভিনন্দিত করিয়া লইতে পারিলেন না, বরং এই বিষয়ে নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অভিনয়ের জন্য যে অনুমতি লইবার প্রয়োজন ছিল, তাহা তিনি তখনকার গবর্ণর জেনারেলের নিকট হইতে সংগ্রহ করিলেন; কিন্তু নিজের রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত অন্য রঙ্গমঞ্চের অভাবে তিনি কোম্পানির রঙ্গমঞ্চটি ভাড়া লইয়া নাটক অভিনয় করিবার যে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহা ব্যর্থ হইয়া গেল। কোম্পানির রঙ্গমঞ্চের কর্মকর্তারা তাঁহাকে রঙ্গমঞ্চ ভাড়া দিতে অস্বীকৃত হইলেন এবং যাহাতে তাঁহার সঙ্কল্প সকল দিক দিয়াই ব্যর্থ হয়, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু গেরাসিমের চরিত্র অন্য উপাদানে গঠিত ছিল, তিনি কিছুতেই পরাজয় স্বীকার করিলেন না; নিজের রঙ্গমঞ্চ নির্মাণের কাজ দ্রুততর করিয়া তুলিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার স্বপ্ন সফল হইল। তিনি বাংলাদেশে বাংলা নাটকের জন্য রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ-কার্য সম্পন্ন করিলেন। কলিকাতার অধুনা বিলুপ্ত ২৫নং ডুমতলা স্ট্রীটে (বর্তমান এজরা স্ট্রীট) Bengallie Theatre প্রতিষ্ঠিত হইল এবং ১৭৯৫ সালের ২৭শে নভেম্বর তাহাতে বাঙ্গালী অভিনেতা-অভিনেত্রী লইয়া আধুনিক বাংলার প্রথম বাংলায় রচিত নাটকের অভিনয় হইল। বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিহাসে ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলার রঙ্গমঞ্চ আজ যে মর্যাদায়ই প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, তাহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিতটুকু এইভাবে যে একজন বিদেশী আমাদের জাতির সামনে সর্বপ্রথম দেখাইয়া দিয়া গিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ ভাবে স্মরণ করিবার যোগ্য।

নিজের চেষ্টায় ও যত্নে তৈরী বেঙ্গলী থিয়েটারে গেরাসিম দুই রাত্রি তাঁহার অনূদিত 'কাল্পনিক সংবদল' (The Disguise) নাটকটির অভিনয় করাইলেন। দ্বিতীয় অভিনয় হইল প্রথম অভিনয়ের প্রায় চার মাস পর—২১শে মার্চ, ১৭৯৬ সন। প্রথম দিনের অভিনয়ে নাটকটির পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রকাশিত হইতে পারে নাই; মাত্র একটি অঙ্ক অভিনীত হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিনের অভিনয়ে তিনটি অঙ্ক অভিনীত হইয়া নাটকটির পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রকাশ পাইল। ইহার অভিনেতা-

অভিনেত্রীদের মধ্যে দেশীয় এবং বিদেশীয় পুরুষ এবং মহিলা যেমন ছিল, তাহার ঐকতান বাদ্যের (Orchestra) মধ্যেও দেশীয় এবং বিদেশীয় বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল। দেশীয় এবং বিদেশীয় বাদ্যযন্ত্র দিয়া ঐকতান বাদ্য (Orchestra) রচনা করিবার প্রয়াসও এই দেশে এই প্রথম। পরবর্তী কালে যাত্রা এবং রঙ্গমঞ্চে এই ধারা বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল এবং আজ পর্যন্তও তাহার ধারা অব্যাহত আছে।

দুই দিনের অভিনয়ের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া গেরাসিম নাটকটি পুনরায় অভিনয় করিবার সঙ্কল্প করিয়া একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি এমন আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, 'for the express purpose of enlivening the scene will be introduced some select Bengallie songs, adapted to, and accompanied by European Instruments, and since he has enlarged the peformance to three complete acts, and taken particular pains to instruct all the actors and actresses in their assigned parts, he humbly confides that increased amusement will be now afforded to every auditor.

এই বিজ্ঞপ্তির গেরাসিম-কৃত একটি বাংলা অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় প্রতিপক্ষের শত্রুতার জন্য গেরাসিমের এই নাটকটির তৃতীয় বার অভিনয়ের প্রয়াস ব্যর্থ হইল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপট যিনি আঁকিতেন, তিনি এক গুপ্ত অভিসন্ধি লইয়া গেরাসিমের দলে যোগদান করিলেন, তারপর তাঁহার কৌশলে গেরাসিমের দলের সকল অভিনেতা ও অভিনেত্রী একে একে তাঁহার দল ছাড়িয়া চলিয়া গেল। তাহাদের এইভাবে দল ছাড়িয়া যাইবার কোন অধিকার ছিল না; কারণ, তাহারা সকলেই গেরাসিমের সঙ্গে চুক্তিপত্রে আবদ্ধ ছিল। সুতরাং গেরাসিম ইহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ লইয়া বিচারালয়ে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু সেখানেও কোম্পানির রঙ্গমঞ্চের উদ্যোক্তাদের চক্রান্তে কো'ন ইংরেজ ব্যবহারজীবীই রুশ নাট্যানুরাগীর পক্ষ সমর্থন করিয়া মোকদ্দমা চালাইতে রাজি হইলেন না। গেরাসিম নিরুপায় হইয়া পড়িলেন; নিজের ঐকান্তিক যত্ন এবং চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র ইংরেজের ষড়যন্ত্রে সেদিন তাঁহার সকল সঙ্কল্প ব্যর্থ হইয়া গেল। তিনি আর্থিক দিক হইতে গভীর ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন; যে সকল মঞ্চোপকরণ বহু মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়াছিলেন, কিংবা বহু ব্যয় করিয়া নিজে তৈরী করিয়াছিলেন, তাহা

তিনি সামান্য মূল্যে বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য হইলেন। কোম্পানির হীন ষড়-যন্ত্রের জন্য বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবনের একটি বিরাট সম্ভাবনা সেদিন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া গেল। নিঃস্ব এবং ভগ্নোদ্যম হইয়া গেরাসিম সেদিন লণ্ডনের রুশ রাজদূতের নিকট তাঁহাকে দেশে ফিরাইয়া লইবার ব্যবস্থা করিবার জন্য যে করুণ আবেদন জানাইয়াছিলেন, তাঁহার সেই আবেদন-পত্রের আংশিক বঙ্গানুবাদ এই প্রকার :

'আপনার অনুগ্রহ পাইলে আমি লোভী ও কুখ্যাত ব্যবসাদার ও নীচস্বভাব (ইংরেজ) রাজকর্মচারীদের কবল হইতে রক্ষা পাই। এই কর্মচারীদের মিথ্যা ও কুৎসিত আচরণ অন্য দেশের মানুষ ও দেবতার নিকট সমানই ঘৃণার বিষয়।......আমি আমার পিতৃভূমির প্রতি অনুরাগ বশতঃ বাংলা ভাষায় যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছি এবং বিশেষ যত্ন ও শ্রদ্ধার সঙ্গে যে সকল বাংলা গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছি, তাহা আমাকে আপনার পুত্র জ্ঞান করিয়া আমার দেশবাসীর মধ্যে প্রচার করিতে আপনি সাহায্য করিবেন'। ('দেশ', সাহিত্য-সংখ্যা, ১৩৬২ সাল দ্রষ্টব্য।)

গেরাসিমের মত একজন স্বার্থবুদ্ধিহীন শিল্পীর মনে সেদিন কোম্পানীর ইংরেজ শাসক ও ব্যবসায়ীদের হৃদয়হীন ব্যবহার যে কি কঠিন আঘাত দিয়াছিল, তাহা তাঁহার এই পত্রটির আরও নানা অংশ হইতে জানিতে পারা যায়।

গেরাসিম বাংলা ভাষার অনুশীলন করিতে গিয়া তাঁহার দৃষ্টি কেবলমাত্র যে নাটকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, তাহা নহে; তিনি একটি উন্মুক্ত দৃষ্টি লইয়া সেদিনকার বাংলা ভাষার সকল বিষয়ই গভীর ভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। বাংলা সাহিত্যে তখনও মধ্যযুগের শেষ উল্লেখযোগ্য কবি 'অন্নদা-মঙ্গল' রচয়িতা ভারতচন্দ্রের কাব্যের অপ্রতিহত প্রভাব, গেরাসিম তাঁহার কাব্যখানিও রুশ ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুঁথি মস্কোর Central State Historical Archives of the USSR-এ সংরক্ষিত আছে। গেরাসিম একখানি ব্যাকরণের বই লিখিয়াছেন, তাহার নাম *The Grammar of the Pure and Mixed East Indian Dialects* (১৮০১); একখানি জাতিতত্ত্বমূলক বই লিখিয়াছিলেন—*An Impartial Contemplation of the East Indian System of Brohmins* (১৮০৫), *A collection of Indosthani and Bengali Aryas* (?)। তিনি বাংলা পাটীগণিতের একটি রুশ অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন; তাহা লেনিনগ্রাদের প্রাচ্য বিদ্যাভবনের (Oriental Institute) ভারতীয় বিভাগের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। মস্কো State Historical Archives-এ তাঁহার স্বহস্তলিখিত বহু কাগজপত্র

রক্ষিত আছে। এই রুশ মনীষী আধুনিক বাংলার সংস্কৃতিক জীবনের ভিত্তি স্থাপনের মুহূর্তে তাঁহার উদার দৃষ্টি, সুগভীর বৈদগ্ধ্য এবং সংস্কার-মুক্ত শিল্পিমন লইয়া এই দেশের মাটিতে আসিয়া পদার্পণ করিয়াছিলেন এবং এই বিষয়ে তাঁহার শক্তি এবং সাধনাকে নানা বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্য দিয়াও নিয়োজিত করিয়াছিলেন।

কিন্তু গেরাসিম সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে যদি তাঁহার পথে চলিবার সুযোগ পাইতেন, তাঁহাকে যদি তাঁহার সঙ্কল্প অসম্পূর্ণ রাখিয়াই ভগ্নোদ্যম হইয়া দেশে ফিরিতে না হইত, তবে তিনি সেদিন হইতেই বাংলা নাটক রচনা ও তাহার অভিনয়ের যে ধারা রচনা করিবার সুযোগ পাইতেন, তাহা অব্যাহত ভাবে পরবর্তী কাল পর্যন্তও চলিয়া আসিতে পারিত। কিন্তু তাঁহার পরিকল্পনা অসম্পূর্ণ ছিল বলিয়াই তিনি বাংলা নাটক রচনা কিংবা তাহার অভিনয়ের বিষয়ে এদেশে কোন উত্তরাধিকার সৃষ্টি করিয়া যাইতে পারেন নাই; তাঁহার ধারা অল্পদিনেই লুপ্ত হইয়া গেল এবং বহুকাল পর্যন্ত তাঁহার নাম বাঙ্গালী পণ্ডিত সমাজ বিস্মৃত হইয়া রহিল। মাত্র সাম্প্রতিক কালে তাঁহার সম্পর্কে নানা মূল্যবান্ তথ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। (মদনমোহন গোস্বামী, 'কাল্পনিক সংবদল', যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকাশিত ১৯৬৩, ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

'কাল্পনিক সংবদল' নাটকের যে দুইটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের একটিতে কুশীলবদিগকে 'লেট্‌া বেক্তি' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। দ্বিতীয়টিতে 'কাব্যের লোক' বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। পুরুষ চরিত্রদিগের নাম প্রথম পাণ্ডুলিপিতে ভোলানাথ বাবু, রামসন্তোষ (উহার চাকর) এবং সইস (সহিস); স্ত্রীচরিত্রের নাম সুখময়, ভাগ্যবতী (উহার সহচরী), 'গাউয়্যা', 'বাজিয়্যা', 'নাচিয়্যা'। ইহাদের মধ্যে ভোলানাথ বাবু নায়ক এবং সুখময় নায়িকা। গেরাসিমের বাংলা ভাষার জ্ঞান এবং বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের সঙ্গে পরিচয় যে খুব ঘনিষ্ঠ ছিল না, নায়িকা চরিত্রের সুখময়ীর পরিবর্তে সুখময় নামকরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। অথচ এই বিষয়ে তিনি যে দেশীয় কোন পণ্ডিতের কোন সাহায্য যথার্থই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও মনে হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে নায়িকার নামকরণে এই ত্রুটি কিছুতেই প্রকাশ পাইতে পারিত না। ইংরেজি *The Disguise* নাটকে যে তিনটি পুরুষ আছে, যেমন Don Lewis, Bernardo (his servant) এবং Hostler, গেরাসিম তাঁহার অনুবাদেও সেই তিনটি চরিত্রকেই গ্রহণ করিয়াছেন,

তবে ইহাদের বাঙ্গালী নামকরণ করিয়াছেন। ইংরেজি নাটকে স্ত্রীচরিত্র মাত্র দুইটি—নায়িকা ক্লারা (Clara) এবং তাহার পরিচারিকা বিয়েট্রিক্স (Beatrix), ছদ্মবেশে সুখময় মোহন চাঁদ নাম গ্রহণ করিয়াছে, ইংরেজি নাটকে ছদ্মবেশিনী ক্লারার নাম Don Pedro। গেরাসিম তাঁহার অনুবাদে ক্লারাকে সুখময় রূপে এবং বিয়েট্রিক্সকে ভাগ্যবতী রূপে গ্রহণ করিবার পরও 'গাউয়্যা', 'বাজিয়্যা', 'নাচিয়্যা' প্রভৃতি কয়েকটি অতিরিক্ত চরিত্রও গ্রহণ করিয়াছেন। দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিতে আরও কয়েকটি চরিত্র অতিরিক্ত। আছে। সমসাময়িক কলিকাতার সমাজ-জীবনের উপর নৃত্যগীতের প্রভাব অনুভব করিয়াই যে তিনি ইহাদিগকে নাট্যকাহিনীতে স্থান দিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

নাটকের পাণ্ডুলিপিটির প্রতিটি পৃষ্ঠার তিনটি ভাগ—প্রথম ভাগে মূল ইংরেজি নাটকের পাঠ, দ্বিতীয় ভাগে তাহার রুশ অনুবাদ এবং তৃতীয় ভাগে ইহার লেবেডেফ-কৃত বাংলা অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে প্রতিটি বাংলা শব্দের রুশ উচ্চারণ অনুযায়ী প্রতিশব্দও ব্যবহার করা হইয়াছে। এই কার্য যে একজন বিদেশীর পক্ষে সেই যুগে কত দুরূহ ছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

এই নাটকের যে দুইটি পাণ্ডুলিপি মস্কোতে সংরক্ষিত আছে, তাহাদের মধ্যে একটি ইহার সংক্ষেপিত অনুবাদ, তাহা একাঙ্কে সম্পূর্ণ। দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিটি পূর্ণাঙ্গ নাটকের, ইহা তিন অঙ্কে সম্পূর্ণ। পূর্ণাঙ্গ নাটকটির অনুবাদে আরও কয়েকটি অতিরিক্ত চরিত্র আছে। যেমন, পুরুষ চরিত্রের মধ্যে তিনকড়ি, পাচকড়ি, ইহাদের পরিচয় খুনিয়া এবং 'পুরুস কান' (গাউয়্যা, বাজিয়া), পেয়াদা স্ত্রী চরিত্রের মধ্যেও পূর্ণাঙ্গ নাটকের অনুবাদে 'রতন মনী' ও মায়্যা কান এই দুইটি চরিত্র অতিরিক্ত। ইহার কাহিনীটি প্রথমেই সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইতেছে।

ভোলানাথ বাবুর ভৃত্যের নাম রামসন্তোষ। রামসন্তোষের স্ত্রীর নাম ভাগ্যবতী। ভোলানাথ রামসন্তোষকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন। ভোলানাথ বাবুর প্রণয়িনীর নাম সুখময়। সুখময় সুদূর লক্ষ্ণৌ শহরে থাকে। ভোলানাথ বাবু প্রকৃতই তাহাকে ভালবাসেন কি না সুখময় তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য ভাগ্যবতী এবং সহচরী রতনমণিকে সঙ্গে করিয়া গোপনে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হয়। সেখানে সে পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ

করিয়া মোহন চাঁদ নাম গ্রহণ করে। ভোলানাথের সঙ্গে সে পরিচিত হয়, কিন্তু ভোলানাথ তাহার ছদ্মরূপ চিনিতে পারেন না। কলিকাতায় আসিয়া ভোলানাথ বাবু শশিমুখী নামক এক ভ্রষ্টা রমণীর প্রতি আকৃষ্ট হইলেন।

রামসন্তোষ পথিমধ্যে একদিন এক অবগুণ্ঠনবতী রমণীকে দেখিয়া তাহার প্রতি আসক্ত হয়। রমণী আর কেহই নহে, তাহারই স্ত্রী ভাগ্যবতী। রামসন্তোষ তাহাকে চিনিতে পারিল না। সুখময় ভোলানাথ বাবুর প্রতি শশিমুখীর আসক্তির কথা জানিতে পারে। স্বামীকে তাহার কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য সে উপায় সন্ধান করিতে থাকে। বন্ধুবেশী মোহন চাঁদ একদিন ভোলানাথ বাবুর নিকট শশিমুখী সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে তাহার সংসর্গ পরিত্যাগ করিতে বলে। তিনি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন এই মর্মে একটি পত্র লিখাইয়া লয়। ভাগ্যবতীর নিকট মোহন চাঁদ চিঠিখানি শশিমুখীর নিকট পৌঁছাইয়া দিবার দায়িত্ব দেয়। ভাগ্যবতী রামসন্তোষের উপর এই দায়িত্ব ছাড়িয়া দেয়। রামসন্তোষ শশিমুখীর নিকট পত্র দিতে গিয়া লাঞ্ছিত হয়। প্রতিবিধানের জন্য রামসন্তোষ উকিলের সাহায্যপ্রার্থী হয়।

ভোলানাথ বাবু এইবার সুখময়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য লক্ষ্মৌ রওনা হইতে চাহেন। সহসা মোহনচাঁদের নিকট সুখময়ের একটি চিত্র দেখিয়া তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়। মোহনচাঁদ সেই চিত্রটিকে তাহার এক প্রতিবেশিনীর চিত্র বলিয়া পরিচয় দেন। ভোলানাথ বাবু একদিন সহসা পথি-পার্শ্বস্থ এক গৃহে তাহার প্রণয়িনী সুখময়ের কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠেন। তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তিনি সুখময়কে চিনিতে পারেন। ভোলানাথ বাবু শশিমুখীর সঙ্গে তাঁহার প্রণয়ের বৃত্তান্ত স্বীকার করেন, তাহার প্রতি তাঁহার আর কোন আকর্ষণ নাই তাহাও তিনি স্বীকার করেন। ভোলানাথ বাবু এখনও মোহনচাঁদকে চিনিতে পারেন নাই। তাহার সঙ্গে সুখময়ের পরিচয় আছে, একথা ভাবিতে তাঁহার ভাল লাগে না। সুখময় প্রকৃত কাহাকে ভালবাসে, তাহা পরিষ্কার জানিয়া লইবার জন্য তিনি উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠেন। এদিকে মোহন চাঁদের বিবাহোপলক্ষে গীতবাদ্যের আয়োজন হইতেছে, ভোলানাথ বাবু তাহা দেখিতে পাইলেন। এই বিবাহ কাহার সঙ্গে তাহা ভাবিয়া তিনি স্বস্তি পাইতেছিলেন না। শেষ পর্যন্ত সুখময় মোহনচাঁদের ছদ্মবেশ ঘুচাইয়া দিয়া

আত্মপ্রকাশ করে। তাহার প্রণয়ের পরীক্ষা করিবার জন্যই যে সুখময় ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিল, তাহা সে ঘোষণা করে। শুনিয়া ভোলানাথ বাবু আনন্দিত চিত্তে প্রণয়িনীকে গ্রহণ করেন। এদিকে রামসন্তোষ পথিমধ্যে যে অবগুণ্ঠনের অন্তরালে ভাগ্যবতীর প্রতি প্রণয় নিবেদন করিয়াছিল, সেই কথা তুলিয়া ভাগ্যবতী কিছু কঠিন কথা শুনাইল। পথিমধ্যস্থ অবগুণ্ঠনবতী নারী কে, তাহা এইবার রামসন্তোষ চিনিতে পারিল। সে হাসিয়া তাহার সকল তিরস্কার হজম করিল। প্রণয়ের পরীক্ষা করিবার জন্য উভয়ে যে সং বদল বা সাজ বদল করিয়াছিল, তাহা তাহারা এইবার সম্পূর্ণ ঘুচাইয়া ফেলিল।

পূর্বেই বলিয়াছি, মূল নাটকটি কোন উল্লেখযোগ্য ইংরেজি নাট্যকারের রচিত নহে; সুতরাং ইহার রচনা কিংবা ঘটনা সংস্থাপনার মধ্য দিয়া কোন উচ্চাঙ্গের সাহিত্যগুণ প্রকাশ পাইতে পারে নাই; কৌতুক রসকে প্রাধান্য দিতে গিয়া ইহার মধ্যে ঘটনা অতিরঞ্জিত এবং চরিত্রগুলি অনেক ক্ষেত্রে অসঙ্গত হইয়া উঠিয়াছে। ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আত্মগোপনের ফলে যে সাধারণ কৌতুক রসের সৃষ্টি হয়, তাহা হইতে উচ্চাঙ্গের কোন রস সৃষ্টি সম্ভব হইতে পারে না, ইহাতেও তাহা হয় নাই। ইহার কাহিনীর একটি প্রধান অসঙ্গতি এই যে, ভোলানাথ বাবু ছদ্মবেশের মধ্য দিয়া তাহার প্রণয়িনীকে চিনিতে পারেন নাই, অথচ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে তাহার সঙ্গে তিনি মিশিয়াছেন; কিন্তু একদিন অন্তরাল হইতে কেবলমাত্র তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহাকে তাঁহার প্রণয়িনী সুখময় বলিয়া তিনি সন্দেহ করিয়াছিলেন। চরিত্র এবং ঘটনার এই প্রকার বহু অসঙ্গতি ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। তবে ইহা অনুবাদকারীর কোন দোষ নহে, মূল নাটকেরই দোষ। লেবেডেফ নাটকখানির অনুবাদ করিতে গিয়া ইহাতে বাঙ্গালীর জীবনের সঙ্গে অনেকখানি সামঞ্জস্য স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিন্তু বাঙ্গালীর ভাষা এবং বাঙ্গালীর জীবন সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞান অপ্রচুর ছিল বলিয়া সেই বিষয়েও তিনি সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি নায়িকা চরিত্রের নাম দিয়াছেন সুখময়; কিন্তু বাঙ্গালী নায়িকার নাম যে সুখময় না হইয়া সুখময়ী হওয়া আবশ্যক, তাহা তিনি নিজেও যেমন বুঝিতে পারেন নাই, তেমনই তাঁহার রচনা যাঁহারা দেখিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারাও সংশোধন করিয়া দেন নাই। সেইজন্যই পূর্বে বলিয়াছি, ইহার রচনা গেরাসিমের নিজস্ব, ইহাতে অন্য কাহারও

সংশোধনের কোন নিদর্শন দেখা যায় না। পূর্ণাঙ্গ কিংবা সংক্ষিপ্ত দুইখানি অনুবাদের মধ্যেই তিনি যতখানি মূলের অনুসরণ করিয়াছেন, ততখানি বাংলা ভাষার বিশিষ্ট বাগ্‌ভঙ্গির প্রতি লক্ষ্য রাখেন নাই। তাহার নাটকের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদের একটু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা হইতেই ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। মূল নাটকে আছে—

Act II

Scene I

The street. Bernerdo (is) seen running across the stage in haste. Carva and Velasco appear watching and then came forward.

Carva : That is certainly the man, Velasco. But he runs so quick, we shall never overtake him.

Velasco : Hold a moment, Carva. He seems coming this way again. Let us retire. (They retire to the side-scene).

(অনুবাদ)

দ্বিতিয় ক্রীয়া

প্রথম ব্যক্ততা

(পথ। রামসন্তোষ দউড়ে গেল কাছ দিয়া সিগ্র। তিনকড়ি আর পাঁচকড়ি আইলেন চৌকি দেয়নে, আর নিকট চলিলেন পরে।)

তিনকড়ি : এ সেই মানুষ সত্তি। কিন্তু ও দওড়ে এমন সিগ্র জে আমরা উঁহার নাগালি ধরিতে পারব না।

পাঁচকড়ি : রস্থ মহর্ত্তিক, তিনকড়ি দাদা! এ বুঝ জায় আসিবে ফিরে এই পথে। চল, আমরা ক্ষেণেক তিষ্ঠী ও দিগে তাবত।

রামসন্তোষ : (প্রবেশ হয়। অন্তবধি দউড়ান আর খাড়াইলে নির্ত্তসাগর সম্মুখে।) হায়, হায়, কি এ চাতুরি মায়্যা মানুসের আর ঘোমটা দেয়ন! আমি এ পত্র লইয়া জায়নের ফল পাইলাম সত্তি! ঘামে সর্বঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে সিতকালেতে। হে! আমি নিষ্ঠা বলি, এ গোলাব নয়। ভাল যদি আমী জানি যে উঁনি এমন ভক্তবিটুল, তেমনি আমি প্রতিফল দিব।

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, ইহাতে ইংরেজি অনুযায়ী বাক্যের মধ্যে শব্দবিন্যাস প্রণালী (syntax) অনুসরণ করা হইয়াছে। বাংলা প্রণালী অনুসরণ করা হয় নাই।

এমন কি, বিশিষ্টার্থক কোন শব্দগুচ্ছ (idiom) কোথাও ব্যবহৃত হইলেও তাহা রচনার মধ্যে স্বাঙ্গীকৃত হইতে পারে নাই। মূল নাটকের মধ্যে কোন সঙ্গীত নাই; গেরাসিম ইহাতে কয়েকটি সঙ্গীতের যোজনা করিয়া যে ইহাকে বাঙ্গালী জীবনের সন্নিকটবর্তী করিতে চাহিয়াছেন, সে কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু অনুবাদের পাণ্ডুলিপির মধ্যে গানগুলি নাই। গানগুলির বিষয় লেখক অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছেন।

নাটকটির সংক্ষিপ্ত কিংবা সম্পূর্ণ অনুবাদ কোনটিই গেরাসিম কর্তৃক মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হয় নাই। মস্কোতে যে ইহার পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে, তাহা ভিত্তি করিয়াই সাম্প্রতিক কালে ইহা প্রথম মুদ্রিত হইয়াছে। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসের ধারায় এই অনুবাদখানি কোন যোগ স্থাপন করিতে পারে নাই, ইহা পূর্বাপর সকল ঐতিহ্যের ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তারাচরণ শিকদার

১৮৫২

(তারাচরণ শিকদার প্রণীত 'ভদ্রার্জুন' নামক নাটকখানিই বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক বলিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে চরিত্রসৃষ্টির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য দেখিতে না পাওয়া গেলেও, ইহার কাহিনীর মধ্যে যে নাটকীয় গুণ আছে, তাহা ইহার পরবর্তী অনেক নাটকের মধ্যেই নাই।) এই নাটকখানির ভূমিকায় তারাচরণের একটি উক্তি হইতে জানিতে পারা যায় যে, তাঁহার পূর্বে বাংলা ভাষায় মৌলিক কোন নাটক না থাকিলেও সংস্কৃত নাটকের কয়েকটি অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছিল; তিনি লিখিয়াছেন 'এতদ্দেশীয় কবিগণ প্রণীত অসংখ্য নাটক সংস্কৃত ভাষায় প্রচারিত আছে, এবং বঙ্গভাষায় তাহার কয়েক গ্রন্থের অনুবাদও হইয়াছে।' কিন্তু এই অনুবাদগুলি মুদ্রিত হইয়া ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, এই উক্তি হইতে তাহা জানিবার উপায় নাই।

প্রধানত কাশীরাম দাসের মহাভারত হইতে অর্জুন কর্তৃক সুভদ্রা-হরণের বৃত্তান্তটি অবলম্বন করিয়া তারাচরণ তাঁহার 'ভদ্রার্জুন' নাটক রচনা করেন। ইহার কাহিনী-বিন্যাস এই প্রকার:

ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের সভায় একদিন নারদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, 'নিজেদের মধ্যে কোন প্রকার কলহ যাহাতে না হয় সেই জন্য দ্রৌপদী সম্পর্কে তোমরা পঞ্চভ্রাতার মধ্যে এক নিয়ম স্থাপন কর।' দেবর্ষি নারদের মুখে তাঁহাদের ভ্রাতায় ভ্রাতায় কলহের আশঙ্কার কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠির বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। নারদ পৌরাণিক বহু দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিলেন, 'ভবিষ্যতে কি হয়, তাহা কেহই বলিতে পারে না, অতএব কলহের সকল রকম সম্ভাবনা দূরে রাখাই আবশ্যক।' অবশেষে যুধিষ্ঠির সম্মত হইলেন। নারদ বলিলেন, 'তোমরা এক একজন দ্রৌপদীর সহিত কালক্ষেপণ করিবে, এবং একের সময়ে অন্য যিনি দ্রৌপদীর গৃহে প্রবেশ করিবেন, তাঁহাকে দ্বাদশ বৎসর তীর্থ পর্যটন করিতে হইবেক; নতুবা সে পাপ ধ্বংস হইবেক না।' পঞ্চভ্রাতা নারদের পরামর্শ গ্রহণ করিলেন।

একদিন যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর নিকট অবস্থান করিতেছেন, এমন সময় এক ব্রাহ্মণ আসিয়া অর্জুনকে জানাইলেন যে, একদল তস্কর তাঁহার গোধন হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। তিনি তস্করের হাত হইতে তাঁহার গোধন উদ্ধার করিয়া দিবার জন্য বলিলেন। অর্জুন তাঁহাকে কিছুক্ষণ বিলম্ব করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন; কারণ, তাঁহার অস্ত্রশস্ত্র সকলই দ্রৌপদীর গৃহমধ্যে ছিল, এই মুহূর্তে সেই গৃহে প্রবেশ করিলে নারদের ব্যবস্থামত তাঁহাকে দ্বাদশ বৎসরের জন্য তীর্থ পর্যটনে বাহির হইতে হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'বিলম্ব করিলে তস্কর দল গাভী লইয়া অদৃশ্য হইয়া যাইবে, তখন আর অস্ত্র দিয়া কোন কাজ হইবে না।' অর্জুন মহাবিপদে পড়িলেন, তিনি ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া ব্রাহ্মণ তাঁহাকে অভিশাপ দিতে চাহিলেন। অবশেষে অর্জুন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া অস্ত্র বাহির করিয়া আনিয়া তস্করের হস্ত হইতে ব্রাহ্মণের গোধন উদ্ধার করিলেন। তারপর অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছেন বলিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট দ্বাদশ বৎসর তীর্থভ্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। যুধিষ্ঠির দুঃখিত চিত্তে অনুমতি দিলেন।

এদিকে দ্বারকায় দেবকী বসুদেবকে গিয়া বলিলেন, 'সুভদ্রার বয়স হইয়াছে, এখন তাহাকে বিবাহ না দিলেই নয়।' শুনিয়া বসুদেব বলরামকে ডাকাইয়া তাঁহাকে সুভদ্রার বিবাহের একটা উপায় করিতে বলিলেন। বলরাম বলিলেন, 'দুর্যোধনকে সুভদ্রার পাত্র স্থির করিয়া রাখিয়াছি, কিন্তু ইহাতে কৃষ্ণের হয়ত আপত্তি হইতে পারে; কারণ, কৃষ্ণ কৌরবের বিপক্ষীয় পাণ্ডবের সহায়ক।' বসুদেবও ইহা শুনিয়া চিন্তিত হইলেন, কৃষ্ণের বিপক্ষীয়ের নিকট কন্যাদান করা সঙ্গত হইবে কিনা ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু বলরাম বসুদেবকে অভয় দিয়া বলিলেন, 'কৃষ্ণের অজ্ঞাতে আমি এই বিবাহকার্য নিষ্পন্ন করিব, বিবাহ হইয়া গেলে কৃষ্ণ কি করিবে?' বসুদেব বলিলেন, 'তুমি জ্যেষ্ঠ পুত্র, তোমাকে আর কি বলিব, সকল দিক বাঁচাইয়া কাজ করিও; দেখিও কৃষ্ণের সঙ্গে যেন কলহ করিও না।' বলরাম তাঁহাকে অভয় দিয়া বলিলেন, 'আপনি সে বিষয় নিশ্চিন্ত থাকুন।' বলরাম দুর্যোধনের সঙ্গে সুভদ্রার বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

এদিকে তীর্থ ভ্রমণ ব্যপদেশে অর্জুন প্রভাসে আসিয়া উপনীত হইলেন। কৃষ্ণ তাঁহার আগমন সংবাদ শুনিতে পাইয়া নিজে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া

লইবার জন্য অগ্রসর হইয়া গেলেন এবং রৈবত পর্বতোপরে এক মনোরম উপবনস্থ অট্টালিকাতে তাঁহার বাসস্থান স্থির করিয়া দিলেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনার জন্য দ্বারকার পুরমহিলাগণ সকলেই সেখানে গেলেন। সত্যভামার সঙ্গে সুভদ্রাও গেলেন। সুভদ্রা কোনদিন অর্জুনকে দেখেন নাই। সত্যভামার মুখে তিনি পাণ্ডবের গুণের কথা শুনিলেন।

যখন কৃষ্ণের সমভিব্যাহারে অর্জুন রথে আরোহণ করিয়া তাঁহার নির্দিষ্ট বাসস্থানের দিকে আসিতেছিলেন, তখন অট্টালিকার উপর হইতে সুভদ্রা অর্জুনকে দেখিলেন; দেখিবামাত্র তাঁহার অর্জুনের প্রতি সুগভীর অনুরাগের সঞ্চার হইয়া গেল। সুভদ্রা সত্যভামার নিকট তাহার মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন। সত্যভামা তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন যে, যে ভাবেই হউক তিনি তাঁহাদের মিলন করিয়া দিবেন। সুভদ্রা তাঁহার কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া স্থির রহিলেন।

সত্যভামা কৃষ্ণকে সুভদ্রার মনের কথা খুলিয়া বলিয়া ইহার উপায় করিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। কৃষ্ণ সত্যভামাকে বলিলেন, 'তুমি অর্জুনের মনের ভাব বুঝিয়া দেখ, যদি সে সুভদ্রাকে বিবাহ করিতে চায়, তবে ইহাতে আমার আপত্তি নাই।' সত্যভামা নিশীথে সুভদ্রাকে লইয়া অর্জুনের শয়ন-গৃহে উপস্থিত হইলেন। অর্জুন সুভদ্রাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং সত্যভামার মুখে তাঁহার সহিত বিবাহে কৃষ্ণের সম্মতি আছে জানিতে পারিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। সেই রাত্রেই সত্যভামার সাক্ষাতে গান্ধর্ব মতে তাঁহাদের বিবাহ হইয়া গেল।

এদিকে নারদ গিয়া বলরামকে সংবাদ দিলেন যে, কৃষ্ণ অর্জুনের সঙ্গে সুভদ্রার বিবাহ দিয়া দুর্যোধনের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দিবার পথ রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। শুনিয়া বলরাম সত্বর বিবাহকার্য নির্বাহ করিয়া ফেলিবার জন্য দেশবিদেশে নিমন্ত্রণ পাঠাইয়া দিলেন। হস্তিনাপুরেও আমন্ত্রণ পৌছিল।

বরসজ্জায় সজ্জিত হইয়া দুর্যোধন আত্মীয়স্বজন ও সামন্তরাজদিগকে বরযাত্রী লইয়া দ্বারকার দিকে যাত্রা করিলেন। পাণ্ডবদিগের মধ্য হইতে ভীমও সেই বরযাত্রীর সঙ্গী হইলেন। বলরামের আমন্ত্রণে দুর্যোধন সুভদ্রাকে বিবাহ করিতে আসিতেছেন শুনিতে পাইয়া সত্যভামা কৃষ্ণের নিকট গিয়া ইহার উপায় করিতে বলিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন, কুলাঙ্গনাগণ যখন সুভদ্রাকে

হরিদ্রাদি মাখাইয়া স্নানের জন্য অন্তঃপুরের বাহিরে বাপীতটে লইয়া যাইবে, তখন অর্জুন কৃষ্ণের প্রদত্ত রথে আরোহণ করিয়া আসিয়া সুভদ্রাকে তাহাতে আরোহণ করাইয়া লইয়া অদৃশ্য হইবেন—অর্জুনকেও তিনি সেইমত ব্যবস্থা করিতে বলিয়া দিলেন। এদিকে দুর্যোধনের দূত আসিয়া দ্বারকায় দুর্যোধনের আগমনবার্তা জানাইল। পরদিন প্রভাতে সুভদ্রাকে যখন স্নানের জন্য বাপীতটে লইয়া যাওয়া হইতেছিল, তখন পূর্বনির্দিষ্টমত পথিমধ্য হইতে অর্জুন আসিয়া সুভদ্রাকে রথে আরোহণ করাইয়া লইয়া দ্রুতবেগে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

দূত গিয়া দুর্যোধন ও সমবেত বরযাত্রীদিগকে এই সংবাদ জানাইল। দুঃশাসন ইহা শুনিয়া অর্জুনকে ইহার জন্য সমুচিত শাস্তি দিবে বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিল। ভীষ্ম তাহাকে শান্ত হইতে বলিলেন। দুর্যোধন নিজে এই নিদারুণ অপমানে নীরব হইয়া রহিলেন। ভীষ্ম ও অন্যান্য সকলে তাহাকে প্রবোধ দিলেন। অগত্যা তাঁহারা সকলে হস্তিনায় ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন।

দূত গিয়া বলরামকে সংবাদ দিল যে, অর্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন এবং অপমানিত দুর্যোধন দেশে ফিরিয়া গিয়াছেন। বলরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, 'যদুসৈন্য তাহাদিগকে রোধ করিল না কেন?' দূত বলিল, 'অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে যদুসৈন্য পরাজিত হইয়াছে, সুভদ্রা স্বয়ং অশ্বরজ্জু ধারণ করিয়া অর্জুনের রথ চালাইয়াছেন।' বলরাম বসুদেবের নিকট আসিয়া অভিমানভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'যদি সুভদ্রাকে অর্জুনের হাতে অর্পণ করাই আপনাদের অভিপ্রায় ছিল, তবে দুর্যোধনকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিবার পূর্বেই আপনি কেন তাহা আমাকে বলিলেন না? আমাকে এই অপমান করিলেন কেন?' বসুদেব সকল কথা খুলিয়া বলিলেন, কিন্তু ইহাতে বলরামের অভিমান দূর হইল না; তিনি এই অপমানের জন্য আর লোকালয়ে মুখ দেখাইবেন না বলিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

এই নাটকখানি সম্পর্কে তারাচরণ ভূমিকায় যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সর্বাগ্রে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন মনে করি। তিনি লিখিয়াছেন,—'এই পুস্তক অত্যন্ত নূতন প্রণালীতে রচিত হইয়াছে, অতএব তাহার যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ প্রকাশ করা উচিত ও অত্যাবশ্যক বোধ হওয়াতে, তাহা সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতেছি। এই নাটক ক্রিয়াদি ও ঘটনা-স্থানের নির্ণয় বিষয়ে ইওরোপীয়

নাটক প্রায় হইয়াছে, কিন্তু গদ্য পদ্য রচনার নিয়মের অন্যথা হয় নাই। সংস্কৃত নাটকসম্মত কয়েকজন নাট্যকারকের ক্রিয়াদি গ্রহণ করি নাই; যথা—প্রথমে নান্দী, তৎপরে সূত্রধার ও নটীর রঙ্গভূমিতে আগমন, তাহাদিগের দ্বারা প্রস্তাবনা ও অন্যান্য কার্য, এবং বিদূষক ইত্যাদি। এতদ্ব্যতিরিক্ত সংস্কৃত নাটক প্রায় ইওরোপীয় নাটক হইতে বিভিন্ন নহে। সংস্কৃত নাটক প্রথমতঃ অঙ্কে বিভক্ত, যাহাকে ইঙ্গরাজি ভাষায় (Act) এক্ট কহে; কিন্তু প্রত্যেক (Act) এক্ট যেরূপ Scene সিনে বিভক্ত আছে, সংস্কৃত নাটক তাদৃশ নহে, তন্নিমিত্ত Scene শব্দের পরিবর্তে সংযোগস্থল ব্যবহার করা গেল। যে স্থান ঘটিত ক্রিয়াদি নাটক ব্যক্ত হয়, তাহাকেই (Scene) সিন্ কহে।... নাটক নির্ণীত সংযোগস্থলের প্রতিকৃতি প্রায় ইওরোপীয় নাট্যশালায় প্রদর্শিত হয়। ইওরোপীয়দিগের স্বতন্ত্র নেপথ্যের প্রয়োজন থাকে না, যেহেতু তাহারা এতদ্দেশীয় কুশীলবগণের ন্যায় স্বতন্ত্র স্থান হইতে সজ্জাদি করিয়া রঙ্গস্থলে প্রবেশ করে না। অতএব এই গ্রন্থ ইওরোপীয় নাটকের শৃঙ্খলানুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিলাম।'

তারাচরণ প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজি নাটকের আঙ্গিক দ্বারা প্রভাবিত হইয়া যে এই নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার এই উক্তি হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে। এই বিষয়ে প্রথম বাংলা নাটক রচনার মধ্যেই তারাচরণ যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা বিস্ময়কর সন্দেহ নাই; কারণ, দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, তারাচরণের পরবর্তী কিছুকাল পর্যন্তও সংস্কৃত নাটকের প্রভাব বাংলা নাট্যরচনার উপর প্রায় অব্যাহত ছিল। তারাচরণের মধ্যে সংস্কৃত নাটকের কোন প্রভাবই নাই, কেবলমাত্র তাঁহার নাটকে 'গদ্য পদ্য রচনা'র কথা যে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও সংস্কৃত-প্রভাবজাত নহে, তদানীন্তন বাংলা সাহিত্যের প্রভাবজাত। অতএব সংস্কৃত নাটক কিংবা দেশীয় যাত্রা ইহাদের উভয়ের প্রভাব সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া তারাচরণ বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম নাটক রচনা করিয়াছিলেন। ইহা তারাচরণের কম কৃতিত্বের কথা নহে।

তারাচরণের যে উক্তি উপরে উদ্ধৃত হইল, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, নান্দী, সূত্রধার, প্রস্তাবনা, বিদূষক ইত্যাদি বাদ দিলে 'সংস্কৃত নাটক প্রায় ইওরোপীয় নাটক হইতে বিভিন্ন নহে।' তিনি অবশ্য এখানে নাটকের আঙ্গিকের কথাই বলিয়াছেন, ইহার প্রাণ-বস্তুর কথা বলেন নাই। অতএব

পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য উভয় নাটকেরই আঙ্গিক সম্পর্কে তারাচরণের যে যথার্থ জ্ঞান ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই অবস্থায় তিনি প্রাচ্য নাটকের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া, বাংলা ভাষায় প্রথম নাটক রচনা-কালেই যে পাশ্চাত্ত্য নাটককেই সর্বতোভাবে অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার দূরদর্শিতারই পরিচায়ক।)

(তারাচরণের অন্যতম কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, তাঁহার নাটকের বিষয়-বস্তু নির্বাচনে। মহাভারতের যে অংশ তিনি তাঁহার বিষয়-বস্তু রূপে নির্বাচিত করিয়াছিলেন, তাহা উচ্চাঙ্গ নাট্যগুণ-সমৃদ্ধ। ইহার ঘটনার প্রবাহ অত্যন্ত দ্রুত সঞ্চারিত হইয়াছে এবং ইহা সুস্পষ্টভাবে বিচ্ছিন্ন প্রত্যেকটি দৃশ্যের ভিতর দিয়া অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বের প্রচুর অবকাশ দিয়া গিয়াছে। অবশ্য তারাচরণ ইহাদের প্রত্যেকটি অবকাশকেই কৃতিত্বের সঙ্গে ব্যবহার করিয়াছেন, এমন কথা বলিতে পারা যায় না; তথাপি তিনি তাহার যে ব্যাপক সম্ভাবনার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাও উপেক্ষা করা যায় না। তারাচরণের সম্মুখে বাংলা নাটকের আর কোন আদর্শ ছিল না; বাংলায় নাটকীয় ভাষার তখনও জন্ম হয় নাই—এই সকল বাধাবিঘ্নের সম্মুখে তারাচরণের প্রতিভা স্বাভাবিক ভাবে বিকাশ লাভ করিবার সুযোগ পায় নাই। অতএব বাংলা নাটক রচনার প্রথম প্রয়াসের মধ্যেই তাঁহার নিকট হইতে ইহার পূর্ণাঙ্গ কৃতিত্ব আশা করা যাইতে পারে না। তবে তিনি তাঁহার নাটকের বিষয়-নির্বাচনে, নির্বাচিত বিষয়ের একটি সুসংহত নাট্যরূপ দানে এবং সর্বোপরি তাঁহার সুবিন্যস্ত নাট্যকাহিনীর মধ্যে পূর্ণতর সাফল্যের সম্ভাবনা সৃষ্টিতে যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাদের গৌরব হইতে তাঁহাকে কিছুতেই বঞ্চিত করিতে পারা যায় না।)

এই সম্পর্কে প্রথমেই 'ভদ্রার্জুনে'র কাহিনীটি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হয়। প্রথম দৃশ্যেই নারদের আগমন দ্বারা একটি স্থির পরিবেশের মধ্যে চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইল। এইখান হইতেই নাট্যকাহিনীর অগ্রগতির সূত্রপাত। দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, প্রকৃতই এখান হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ দৃশ্যে অভিমানাহত বলরামের গৃহত্যাগের সঙ্কল্প ব্যক্ত করা পর্যন্ত মুহূর্তের জন্য কাহিনীটি কোথাও বিরাম লাভ করে নাই। দৃশ্যের পর দৃশ্যের ভিতর দিয়া (তারাচরণ ইংরেজি scene অর্থে 'সংযোগস্থল' কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন, তখনও এই অর্থে 'দৃশ্য' কথাটি ব্যবহৃত হয় নাই) কাহিনীটি শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। তথাপি

একটি কথা এখানে অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ইহার পয়ার ও ত্রিপদীর দীর্ঘ অংশসমূহ ইহার আশানুরূপ নাট্যিক গতি সৃষ্টি করিতে পারে নাই। কিন্তু সেই যুগে এই বাধা অতিক্রম করিবার তারাচরণের অন্য কোন উপায় ছিল না। ইহার দৃশ্যগুলি সংক্ষিপ্ত হইলেও সুস্পষ্ট নাট্যক্রিয়া অবলম্বন করিয়াই গঠিত হইয়াছে বলিয়া, ইহাদের সংক্ষিপ্ততা দ্বারা কোন বিষয়েরই অসম্পূর্ণতা প্রকাশ পায় নাই। মনে হয়, তারাচরণ নাটকখানি অভিনয়ের উদ্দেশ্যেই লিখিয়াছিলেন ; কারণ, ব্যবহারত অভিনয়ের অনুপযোগী কোন দৃশ্যেরই তিনি ইহাতে সমাবেশ করেন নাই। সেই জন্যই মনে হয়, একান্ত প্রয়োজনীয় যুদ্ধ-দৃশ্যগুলিও ইহাতে পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্বেও নাটকখানি কোথাও অভিনীত হইয়াছিল বলিয়াও জানিতে পারা যায় না।

কাহিনীর দিক দিয়া এই নাটকের শেষাংশ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। কারণ একমাত্র দূতের মুখে ঘটনার সংবাদ প্রচার ব্যতীত এই অংশে নাট্যক্রিয়া অল্পই প্রকাশ পাইয়াছে। অথচ ইহার কাহিনীর শেষাংশই ঘটনা-বহুল ছিল। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, সম্ভবত অভিনয়ের উদ্দেশ্যেই নাটকখানি লিখিতে গিয়া নাট্যকার ইহার মধ্যে এই ত্রুটি অপরিহার্য করিয়া তুলিয়াছেন। সৌখীন কিংবা ব্যবসায়ী কোন প্রকার রঙ্গমঞ্চই তখনও এদেশে বাঙ্গালী কর্তৃক স্থাপিত হয় নাই—অতএব রঙ্গমঞ্চের উপর নাট্যক্রিয়াকে রূপায়িত করিবার সম্ভাবনা কতদূর, সেই বিষয়ে তারাচরণের কোনই জ্ঞান ছিল না। অতএব তাঁহাকে এই বিষয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হইতে হইয়াছে বলিয়াই, আধুনিক রঙ্গমঞ্চের আশানুরূপ কোন ব্যবস্থার উপরই নির্ভর করিতে দেখা যায় না।

চরিত্রসৃষ্টির দিক দিয়া 'ভদ্রার্জুন' নাটকের সার্থকতার কথা এইবার আলোচনা করিতে হয়। একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে, এই নাটকে চরিত্রসৃষ্টির অস্ফুট প্রয়াস মাত্র দেখিতে পাওয়া গেলেও, ইহার সর্বাঙ্গীণ সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যাইবে না। মহাভারত হইতে কাহিনীটি গ্রহণ করিয়া তারাচরণ ইহার একটি বাহির হইতে নাট্যরূপ দিয়াছেন, কিন্তু অন্তরের দিক দিয়া ইহাকে পুরাপুরি নাটক গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই—সেইজন্য ইহাতে চরিত্রসৃষ্টিও সেই পরিমাণেই অপরিস্ফুট বলিয়া বোধ হইবে।

নাটকের যে নামকরণ করা হইয়াছে, তাহাতে বোধ হইবে যে অর্জুনই ইহার নায়ক। কিন্তু একথা স্বীকার করিতেই হয় যে, অর্জুন ইহাতে নায়-

কোচিত প্রাধান্য কিংবা গৌরব কিছুই লাভ করিতে পারেন নাই। সত্যরক্ষার জন্য অর্জুন তীর্থভ্রমণে বাহির হইলেন সত্য, কিন্তু নাটকে তাঁহার তীর্থনিষ্ঠার কথা কোথাও নাই, বরং তাহার পরিবর্তে প্রভাস তীর্থে গিয়া সত্যভামার সমভিব্যাহারে সুভদ্রাকে দেখিবামাত্র তাঁহার কোন পরিচয় পর্যন্ত জিজ্ঞাসা না করিয়া, তিনি তাঁহার হস্তধারণ করিয়া বলিতেছেন, 'মন্মথ-বাণানল আমার বক্ষঃস্থল দগ্ধ করিতেছে, এসো—স্পর্শ করিয়া শীতল হই (৩৮)।' অর্জুন-চরিত্রের সকল প্রকার গৌরব ইহাতে বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া বোধ হইবে। অবশ্য সেই মুহূর্তে সুভদ্রাকে কৃষ্ণের ভগিনী বলিয়া চিনিতে পারিয়া, তারপর হইতে তিনি তাঁহার সঙ্গে যে আচরণ করিয়াছেন, তাহা যথার্থ শিষ্টজনোচিত; তথাপি ইহা দ্বারা তাঁহার পূর্ববর্তী ব্যবহারের নীচতা কিছুতেই দূর হইতে পারে না। এই নাটকের অবশিষ্ট অংশে অর্জুনের আর কোন প্রকার কৃতিত্বের কথা প্রকাশ করা হয় নাই; কিন্তু একথা সত্য যে, ইহার প্রচুর অবকাশ ছিল, নাট্যকার তাহার ব্যবহার করেন নাই। যদুসৈন্য অর্জুনের হস্তে যে পরাজিত হইল, তাহা কেবলমাত্র দূতের মুখেই প্রকাশ পাইয়াছে, নাট্যিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়া কোথাও প্রকাশ পায় নাই। সেইজন্য অর্জুন চরিত্রের গৌরবের এই দিকটা প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে পারে নাই। অর্জুনকে সুভদ্রার কুশলী অপহারক মাত্র রূপেই দেখা গিয়াছে, প্রতিরোধকদিগের মধ্য হইতে নিজের শক্তিদ্বারা তাঁহাকে প্রকৃত লাভ করিতে দেখিলে তাঁহার চরিত্রের গৌরব অধিকতর বৃদ্ধি পাইত।

সুভদ্রার চরিত্রও নায়িকার মত প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। ইহার কারণ, নাট্যকার সুভদ্রার চরিত্রে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিবার সুযোগটুকুর সদ্ব্যবহার করেন নাই। সুভদ্রা অর্জুনকে দেখিবামাত্র তাঁহার প্রেমপাশে আবদ্ধ হইয়া গেলেন, এবং সেই মুহূর্তেই অকপটে তাহা সত্যভামার নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলেন—

> বল সত্যভামে আর কি কব তোমায়।
> অর্জুনে হেরিয়া আজ বুঝি প্রাণ যায়॥
> তোমারে কহিতে আ'জ লজ্জা নাহি করি।
> কি হইল সখি আজি দেখ প্রাণে মরি॥ (৩৬)

একথা সত্য যে, অর্জুনের কথা সত্যভামার মুখে সুভদ্রা এই নাটকে পূর্বেও শুনিয়াছেন, কিন্তু তাহা দ্বারা তাঁহার মধ্যে তখনও প্রণয়ের সঞ্চার হয়

নাই। বরং পাণ্ডবগণ পাঁচজনে দ্রৌপদীকে বিবাহ করিয়াছে বলিয়া তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহার যৌক্তিকতা লইয়া সত্যভামার সঙ্গে তর্কও করিয়াছেন। কিন্তু যেই মাত্র সেই পাণ্ডবেরই একজনকে তিনি চোখে দেখিলেন, সেই মুহূর্তেই তিনি তাঁহার প্রণয়-পাশে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। বলরাম কর্তৃক উত্থাপিত বাধাটিকে এখানে দুরতিক্রম্য করিয়া তুলিতে পারিলে, কাহিনীর নাট্যিক গৌরব একদিক দিয়া যেমন বৃদ্ধি পাইত, তেমনই সুভদ্রা চরিত্রের ক্রমবিকাশের পক্ষেও সহায়ক হইত। প্রণয়-সঞ্চারের আকস্মিকতা সুভদ্রা চরিত্রের একটি প্রধান ত্রুটি। এখানে নাট্যকার সুভদ্রার মনে একটি জটিল নাট্যিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিবার অবকাশ পাইয়াছিলেন, অনুরাগ ও বিরাগের মধ্য দিয়া অর্জুনের প্রতি তাঁহার মনোভাবকে অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইতে পারিতেন, তারপর অনুরাগকেই জয়ী করিয়া তাঁহার চরিত্রের মধ্যে একটি উচ্চাঙ্গ মানবিক গৌরব দান করিতে পারিতেন; কিন্তু তারাচরণ এই পথ পরিত্যাগ করিয়া গিয়া সুভদ্রার চরিত্রকে অপরিস্ফুট রাখিয়াছেন; শুধু তাহাই নহে, এইজন্যই ইহার মধ্যে কতকটা অসঙ্গতিও আসিয়া পড়িয়াছে। অর্জুনকে দেখিবার পর হইতে সুভদ্রার মনে একমাত্র তাঁহার প্রতি নির্লজ্জ আসক্তি ব্যতীত আর কিছুই প্রকাশ পায় নাই। ইহার মধ্যে কুমারী-হৃদয়োচিত লজ্জাকাতরতার স্পর্শ মাত্রও নাই। সুভদ্রার চরিত্র দেখিয়া অন্তত একথা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নহে যে, তারাচরণের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ নাট্যিক চরিত্র-সৃষ্টির কোন প্রতিভা ছিল না। কারণ, অর্জুনের মত বীরকে দেখিয়া সুভদ্রার কুমারী হৃদয়ের মধ্যে কমনীয় প্রেমের ক্রমবিকাশের যে একটি দুর্লভ সুযোগ এখানে ছিল, নাট্যকার তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই।

ইহার পরই সত্যভামার কথা আলোচনা করিতে হয়। সত্যভামার চরিত্রও নিতান্তই অপরিস্ফুট রহিয়াছে; এই নাটকের মধ্যে একমাত্র সুভদ্রা ও অর্জুনের মিলন সংঘটিত করাইয়া দেওয়া ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন কাজ নাই। উভয়ের মিলন সত্যভামার আকাঙ্ক্ষিত সন্দেহ নাই, তথাপি পূর্ব হইতে এই মিলনের জন্য কোন প্রকার আয়োজন করা কিংবা ইহার মধ্য হইতে কোন বাধা দূর করিয়া দিবার জন্য যত্ন ও আগ্রহ করার মধ্য দিয়া যদি তাহার পরিচয়টি প্রকাশ পাইত, তাহা হইলে তাঁহার চরিত্র স্ফুটতর হইত। সত্যভামার এই মিলন-দৌত্যের

মধ্যে কোন সুনিপুণ চাতুর্য কিংবা দুঃসাহসিক কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায় না। সুভদ্রা ও সত্যভামা রৈবত পর্বতে অর্জুনকে সম্বর্ধনা করিবার জন্য গিয়াছেন, সেখানে অন্য কাহারও সহায়তা ব্যতীতই সুভদ্রা অর্জুনকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন, তারপর সত্যভামা কৃষ্ণের অনুমতি লইয়া সুভদ্রাকে অর্জুনের শয়নগৃহে লইয়া উপস্থিত করিয়াছেন। এই সকল কার্য যন্ত্রচালিতবৎ ঘটিয়াছে—মানবিক কোন অনুভূতি দ্বারা চালিত হইয়া ঘটে নাই। এই নাটকের মধ্যে সত্যভামা যন্ত্রচালিতের মতই কার্য করিয়াছেন; নাট্যকার তাঁহার মধ্যে লজ্জা, দ্বিধা, সংশয়, সঙ্কোচ—নারীজনোচিত এই সকল কোন গুণই আরোপ করিতে পারেন নাই। সুভদ্রার প্রতি দাক্ষিণ্যবশতঃ যে সত্যভামা দৌত্যকার্যে নিয়োজিত হইয়াছিলেন তাহাও বোধ হইবে না। যেখানে সুভদ্রার প্রেমই অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়, সেখানে সেই প্রেমের দ্বারা কাহারও সহানুভূতি সঞ্চার করাও সম্ভব হয় না। সেই জন্যই বলিয়াছি, সত্যভামা এই নাটকের মধ্যে যন্ত্রচালিতবৎই আচরণ করিয়াছেন, কোন প্রকার মানবিক অনুভূতি বা কর্তব্যবোধ দ্বারা চালিত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইবে না। কৃষ্ণের সঙ্গে সত্যভামার সম্পর্কের দিকটাও এই নাটকে অপরিস্ফুট রহিয়াছে, অর্থাৎ এই দৌত্যকার্যে সত্যভামার যে একটি বিশেষ স্থান ছিল, তাহা নাট্যকার উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না।

ইহার পরই বলরামের চরিত্রের কথা আলোচনা করিতে হয়। বলরামের চরিত্রের মধ্যেও নাট্যিক ক্রিয়ার প্রচুর অবকাশ ছিল, কিন্তু নাট্যকার তাহাদের কোনটির সদ্ব্যবহার করেন নাই। চরিত্রটি এখানে কেবলমাত্র বাক্সর্বস্ব হইয়া রহিয়াছে। দূতের মুখে যদুসৈন্যের পরাজয়ের কথা শুনিয়া তিনি গৃহে থাকিয়াই আস্ফালন করিয়াছেন—ইহার প্রতিবিধান করিবার কিংবা প্রতিশোধ লইবার কোন চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু তাঁহার শেষ দৃশ্যের চিত্রটি বড়ই করুণ। পিতা বসুদেব তাঁহার উপর এই বলিয়া সুভদ্রার বিবাহের সকল ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, 'তুমি বাপু জ্যেষ্ঠপুত্র কি কব তোমারে।' কিন্তু কনিষ্ঠ কৃষ্ণের চক্রান্তে যখন জ্যেষ্ঠের এই অধিকার আর রক্ষা পাইল না, তখন তিনি অভিমানাহত হইয়া আসিয়া পিতার নিকট এই বলিয়া অভিযোগ করিলেন—'হে পিতঃ, আপনকার জ্ঞাতসারে আমার এই হইল?' বসুদেব তাঁহাকে নানা কথায় বুঝাইবার

চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু বলরাম বড় অভিমানী, তিনি কিছুতেই কিছু বুঝিতে চাহিলেন না ; তিনি বলিলেন, 'আজ অবধি আমি তোমারদিগের পুত্র নহি এমত জ্ঞান করিবেন।' কনিষ্ঠ কৃষ্ণের হস্তে তাঁহার এই অপমানের দুঃখ তিনি কিছুতেই ভুলিতে পারিলেন না ; তিনি বলিলেন,

কৃষ্ণেরে কনিষ্ঠ জানি সতত ছিলাম মানী
সে মান হইল ছারখার। (৫।১০)

এই উক্তির মধ্যে কনিষ্ঠ কর্তৃক অপমানাহত জ্যেষ্ঠের মনোভাব সুন্দর পরিস্ফুট হইয়াছে। ভাষার ত্রুটি সত্ত্বেও বলরামের মানসিক পরিচয়টি নাটকের শেষ অংশে যে প্রকার প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বিস্ময়কর। অতএব একমাত্র এই বলরামের চরিত্রের এই অংশটি হইতেই তারাচরণের নাট্যিক চরিত্র সৃষ্টির যে ক্ষমতা ছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। তবে অনুকূল অবসরের সদ্ব্যবহার করিতে না পারার জন্য অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁহার এই প্রয়াস সার্থক হয় নাই।

এই নাটকে আর কোন চরিত্রের বিষয়ে উল্লেখ করিবার মত কিছু নাই। কৃষ্ণের চরিত্র নিতান্ত সংক্ষিপ্ত। কেবলমাত্র ভীমের চরিত্রটি সংক্ষিপ্ত হইলেও তাঁহার পরিচয়ের মর্যাদা রক্ষায় সার্থক বলিয়া বোধ হইবে। দুর্যোধন, দুঃশাসন, ভীষ্ম, বসুদেব, দেবকী, রোহিণী ইঁহাদের কাহারও চরিত্র রসোত্তীর্ণ হইতে পারে নাই।

'ভদ্রার্জুন' নাটকের ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করিবার পূর্বে একথা প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে যে, তখনও বাংলায় নাটকের ভাষার সৃষ্টি হয় নাই, তখনও ইহাতে পদ্যের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক এবং এই পদ্যও বৈচিত্র্য-হীন পয়ার ও ত্রিপদী ব্যতীত অন্য কোন ছন্দে রচিত হইত না। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তখন বাংলা সাহিত্যের প্রধান পথ-প্রদর্শক এবং কবি হিসাবেই তাঁহারও খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই পরিবেশের মধ্যে তারাচরণকে তাঁহার নাটকের ভাষা সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। অতএব ইহার মধ্যে যাহা আশা করা যায়, তাহার কিছুই ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় না। সেইজন্য পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত দীর্ঘ অংশসমূহ তাঁহার নাটকের সংলাপ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে কাহিনীর স্বচ্ছন্দ গতি যে ব্যাহত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তারাচরণের আর কোন উপায় ছিল না। তারাচরণ ইংরেজি নাটকের আঙ্গিক দ্বারা প্রভাবিত হইয়া বাংলা নাটক রচনায় প্রবৃত্ত

হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সমসাময়িক বাংলা ভাষাকে যথার্থ নাটকীয় রূপ দিয়া তাহা তাঁহার নাটকে ব্যবহার করিবার প্রতিভা অর্জন করিতে পারেন নাই, সেইজন্য প্রচলিত বাংলা রচনা-পদ্ধতিকেই তিনি তাঁহার নাটকে গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য তারাচরণ সর্বত্রই যে পদ্য ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা নহে; তিনি মধ্যে মধ্যে গদ্য সংলাপও ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু এই গদ্যও তাঁহার সর্বত্র একই আদর্শ সাধুভাষায় রচিত হইয়াছে, কথ্যভাষায় রচিত হয় নাই। বলা বাহুল্য, সাধু গদ্যও নাটকীয় সংলাপের ভাষা হইবার পক্ষে অনুপযোগী, নিম্নোদ্ধৃত দৃষ্টান্ত হইতে তাহা প্রমাণিত হইবে—

নারদ। ভবানুজদিগের যেরূপ ভক্তি এবং তাহাদিগের প্রতি তোমারও যেরূপ স্নেহ, এমত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, কিন্তু এরূপ স্থলে বিরোধাঙ্কুর উৎপন্ন হইলে অত্যন্তাক্ষেপজনক হইবে, যেহেতু সেই অঙ্কুরে সকলকেই বিনাশ করিবে।

যুধিষ্ঠির। মহর্ষে, এপ্রকার ঘটনা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনাই নাই।

নার। বড় আশ্চর্যও নহে।

যুধি। আপনি এ কি আজ্ঞা করিলেন, ইহা কিরূপে সম্ভবে, এ পঞ্চমধ্যে বিরোধাঙ্কুর উৎপত্তির বীজ কোথায়?

নার। ইহার বীজ আপনাদিগের গৃহমধ্যেই আছে।

অতএব দেখা যাইতেছে, এই গদ্যও অত্যন্ত আড়ষ্ট। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ গদ্যলেখকদিগের রচনার সহজ ভঙ্গির সন্ধান তারাচরণ কদাচ পান নাই, তাহা হইলে গদ্যসংলাপের মধ্যে তিনি প্রাণের স্পর্শ দান করিতে পারিতেন।

এই নাটকের মধ্যে কয়েকটি ইতর শ্রেণীর চরিত্র আছে, যেমন মদ্যপায়ী ও বাতুল। কিন্তু তাহাদের ভাষাও সাধু ভাষা। দেখা যাইতেছে যে, সংস্কৃত নাটক দ্বারা তারাচরণ কোন দিক দিয়াই প্রভাবান্বিত হন নাই, তাহা হইলে তাহার রীতি অনুসারে চরিত্রের পরিচয় অনুযায়ী তাহাদের সংলাপের ভাষায়ও তারতম্য দেখা যাইত।

পূর্বেই বলিয়াছি, তারাচরণের গদ্যসংলাপের ভাষা আড়ষ্ট ও প্রাণহীন বলিয়া বোধ হয়। তিনি এই প্রকার সন্ধির ব্যবহার করিয়াছেন, যেমন, 'মাত্রাজ্ঞা', 'মাত্রাজ্ঞাবহ', 'মাত্রাজ্ঞানুগামী', 'ভবানুজেরা', 'মমানুজ' ইত্যাদি। অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিবায়ন' নামক কাব্যে এই শ্রেণীর সন্ধির ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, বাংলা গদ্যে তারাচরণের মত

ইহার এত ব্যাপক প্রয়োগ সেই যুগে আর কেহ করেন নাই। অতএব ইহা রামেশ্বরের প্রভাব-জাত বলিয়া অনুমান করা ভুল হইবে না।

তারাচরণের পদ্যসংলাপের মধ্যেও ভারতচন্দ্রের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এই সম্পর্কে নিম্নোদ্ধৃত অংশ উল্লেখ করা যাইতে পারে—

রোহিণী। বিরক্ত হ'বার কথা এ নহে।
সুভদ্রাকে দেখি অন্তর দহে॥
হইলে বিবাহ হইত ছেলে।
প্রবোধিয়া কত রাখিব টেলে॥
পাত্র অন্বেষণ কর ত্বরিতে।
এখনি উচিত বিবাহ দিতে॥
সুভদ্রা বড়ই সুবোধ মেয়ে।
কোন দিক পানে না দেখে চেয়ে॥
আর নহে তারে অনূঢ়া রাখা।
হয়েছে উদয় রতির সখা॥
আপনে আপনি বুঝ মননে।
এত সহ্য করা যায় কেমনে॥ (২।১)

ইহার সঙ্গে ভারতচন্দ্রের নিম্নোদ্ধৃত পদগুলি তুলনা করা যাইতে পারে—

শুন লো মালিনী কি তোর রীতি।
কিঞ্চিৎ হৃদয়ে না হয় ভীতি॥
এত বেলা হৈল পুজা না করি।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় জ্বলিয়া মরি॥
বুক বাড়িয়াছে কার সোহাগে।
কালি শিখাইব মায়ের আগে॥ ইত্যাদি।

সমসাময়িক ভাষা সম্পর্কে তারাচরণ তাঁহার নাটকের ভূমিকায় যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতে তিনি যে ইহার দোষত্রুটি বিষয়ে নিজেও সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন, তাহা অনুভব করা যাইবে। তিনি লিখিয়াছেন, 'বাঙ্গালা ভাষা এখনও নবীনা ও অলঙ্কার পরিহীনা, এবং তাহার দরিদ্রাবস্থারও শেষ হয় নাই। সংস্কৃত হইতে উপযুক্ত অলঙ্কারাদি আহরণ না করিলে তাহাকে সর্বাঙ্গসুন্দরী করা যায় না। যাহা পাঠ করিলে পাঠকবৃন্দের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া ক্রমশঃ অধিকতর পাঠেচ্ছার আবির্ভাব হয়, ইহাকেই সুভাষা কহা যায়। কেবল কোমল কিম্বা অতি কঠিন শব্দ প্রয়োগ করিলেই যে ভাষার চিত্তাকর্ষিণী শক্তি জন্মে এমত নহে; কিন্তু তাহার জীবনস্বরূপ অর্থসৌন্দর্য না থাকিলে

সকলই নিষ্ফল। অতএব তাহার প্রাণ প্রদান পূর্বক অলঙ্কারাদি দ্বারা তদীয় সৌন্দর্যকে অধিকতর জাজ্বল্যমান করাই কর্তব্য; তাহা হইলে নাটকাদি গ্রন্থ সকল সমীচীনরূপে রচিত হইতে পারে।' তথাপি একথা সত্য যে, তারাচরণ তাঁহার রচনায় 'প্রাণ প্রদান' করিতে পারেন নাই।

তারাচরণের একটি প্রধান গুণ এই যে, ভারতচন্দ্রের রচনা দ্বারা প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার নীতিবোধ উন্নত ছিল। যে রুচি দ্বারা সমসাময়িক বাংলা পদ্যসাহিত্য দূষিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার কোন প্রভাব তাঁহার রচনায় অনুভব করা যায় না; এমন কি, নিম্ন জাতীয় চরিত্রের মধ্যেও তিনি এই সংযম কদাচ লঙ্ঘন করেন নাই। ইহাও তারাচরণের উপর ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবের ফল। পূর্বেই বলিয়াছি, তারাচরণ সংস্কৃত সাহিত্য দ্বারা কোনরূপেই প্রভাবিত হন নাই, তাহা হইলে তাঁহার রুচিবোধ স্বতন্ত্র হইত। শুধু সংস্কৃত সাহিত্যই নহে, তাঁহার সমসাময়িক কালে প্রচলিত 'নূতন' কিংবা পুরাতন যাত্রা দ্বারাও যে তিনি আদৌ প্রভাবিত হন নাই, তাহাও তাঁহার রচনা হইতে বুঝিতে পারা যায়। যাত্রার প্রধান অঙ্গ গান, অতএব যাত্রা দ্বারা প্রভাবিত হইয়া সমসাময়িককালে যাঁহারা নাটক রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের রচনায় ব্যাপকভাবে গানের যোজনা করিয়াছেন, কিন্তু 'ভদ্রার্জুন' নাটকে গান নাই বলিলেই চলে। কেবলমাত্র প্রথম সংযোগস্থলে নারদের 'বীণাযন্ত্রে হরিগুণ গান' ও তৃতীয় অঙ্কের পঞ্চম সংযোগস্থলে মদ্যপায়ীর একটি সংক্ষিপ্ত গান ইহাতে শুনিতে পাওয়া যায়। এই গান দুইটি মূল নাট্যকাহিনীর অন্তর্ভুক্তও নহে। অতএব যাত্রারও কোন কার্যকর প্রভাব তারাচরণের নাটকে যে অনুভব করা যায়, তাহা নহে।

তারাচরণের নাটকের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, যদিও তিনি ইহাতে মহাভারতীয় অভিজাত চরিত্রসমূহেরই বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন, তথাপি তিনি তাহাদিগের উপর অনেক স্থলেই সাধারণ বাঙ্গালীত্ব আরোপ করিয়া লইয়াছেন। দুর্যোধনের সঙ্গে সুভদ্রার বিবাহের প্রস্তাব হইলে দেবকী বলিতেছেন—

> কানা বেয়াই হইলে লোকে কি বলিবে? তাতে কুটুম্বিতার সুখ হইবে না। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ বলিয়া গান্ধারী বস্ত্রদ্বারা আপন চক্ষুদ্বয় আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছেন। সে আজি পর্যন্ত চক্ষু মেলে চায় না। বেয়াই বেয়ানের মধ্যে কেহই বধূর মুখ দেখিতে পাবে না, এ কি খাট দুঃখের কথা? (২।৩)

ইহার মধ্যে সাধারণ বাঙ্গালীর বৈবাহিক-বৈবাহিকা সম্বন্ধের মধ্যে যে একটি রহস্য-মধুর সম্পর্ক আছে, তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। এই প্রকার প্রতিবেশিনী ও সহচরীর চরিত্র দুইটির কথোপকথনের ভিতর দিয়াও বাঙ্গালী নারীসুলভ হৃদয়বৃত্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। বিবাহের স্ত্রী-আচারের বর্ণনায় এই ভাব অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। এমন কি, এই বাঙ্গালীত্বের স্পর্শ হইতে দুর্যোধন প্রমুখ বীরচরিত্রও সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারে নাই। সেইজন্য অপমানিত দুর্যোধন এই বলিয়া অশ্রুমোচন করিয়াছেন—

নয়নের নীর আমি কিরূপে নিবারি।
দুঃখের বচন আর কহিতে না পারি॥
জ্ঞানে কভু হয় নাই হেন অপমান।
ইচ্ছা হয় এইক্ষণে ত্যজি ছার প্রাণ॥ (৫।৮)

পরবর্তী বাংলা নাটক রচনায় 'ভদ্রার্জুন' নাটকের কোন প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া অনুভূত হয় না। তথাপি সুসংবদ্ধ কাহিনীযুক্ত বাংলা নাটক রচনায় তারাচরণ সর্বপ্রথম যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ একটি বিশেষ স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসর কেবলমাত্র যে একখানি পূর্ণাঙ্গ বাংলা নাটক সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় তাহাই নহে, এই বৎসর এই দেশীয় নাট্যসাহিত্য সম্পর্কিত সকল প্রকার সংস্কারের বিরোধিতা করিয়া বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম বিয়োগান্তক নাট্য রচনার সক্রিয় প্রয়াস দেখা দেয়। এই বৎসর প্রকাশিত যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত রচিত 'কীর্তি-বিলাস' নাটকখানিই তাহার প্রমাণ। প্রকৃতপক্ষে এই নাটকখানি 'ভদ্রার্জুনে'র কয়েক মাস পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু নাটক হিসাবে 'ভদ্রার্জুন' অপেক্ষা ইহার ত্রুটি অনেক বেশী। ইহার কাহিনীও মৌলিক নহে। লেখক ইংরেজি সাহিত্যে প্রচলিত বিয়োগান্তক নাট্যসমূহের সার্থকতা দেখিতে পাইয়া বাংলা ভাষায়ও তাহা প্রবর্তন করিবার জন্য উৎসাহিত হন এবং তাহারই ফলে তাঁহার 'কীর্তিবিলাস নাটক' রচিত হয়। কিন্তু তিনি এই দেশের রস-সংস্কার সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন; সেইজন্য

যাহাতে তাঁহার বাংলা ভাষায় এই বিষয়ক সর্বপ্রথম প্রয়াসকে নিতান্ত কোন দুঃসাহসিক পরীক্ষামূলক কার্য (experiment) বলিয়া কেহ মনে না করেন, সেই উদ্দেশ্যে এতদ্দেশীয় ভাষায়ও বিয়োগান্তক নাটকের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করিয়া তিনি এক সুদীর্ঘ ভূমিকার অবতারণা করিয়াছেন। এই ভূমিকাটিতে বাংলায় বিয়োগান্তক নাটক রচনা করিবার জন্য যেমন একদিক দিয়া তাঁহার ব্যক্তিগত প্রবল আগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছে, আবার অন্য দিকে তেমনই সমসাময়িক সমাজের রস-বোধেরও পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। অতএব তাহা আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

অধর্মের প্রাতিকূল্যে প্রতিপত্তি প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত ধর্মের বিবিধ প্রকার প্রযত্ন অবলোকন করিলে, আমারদিগের শরীর পুলকিত হয়। ফলতঃ এবিষয় যদি দর্শনও দুর্লভ, তত্রাপি ইহার বিবরণও শ্রবণ করিলে অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হয়। সরস বসন্ত সমাগমে মনোহর বিহঙ্গিনীর নানাস্বরে গীত শ্রবণে শ্রবণদ্বয় বিমোহিত হয় বটে, কিন্তু অধর্ম বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের বিবরণ শুনিলে মনোমধ্যে অনির্বচনীয় সুখোদয় হয়। এই যুদ্ধের অভিনয়ও দর্শন করিলে অন্তরে হর্ষ জন্মে। তদ্দারা অহঙ্কারের খর্বতা এবং মনোদুঃখের শান্তি হয়। যদি দুরদৃষ্টক্রমে সাধুব্যক্তিগণের অপকার এবং কুমার্গগামি-সমূহের জয় হয়, তবে আমাদিগের অন্তঃকরণে অশেষ শোক জন্মে।

অনেকের এইরূপে ভ্রান্তি জন্মাইতে পারে যে, যে অভিনয় অবলোকন করিলে অন্তরে অশেষ শোক উপস্থিত হয়, সে অভিনয় দর্শন করিতে কিরূপে মানবগণ স্বভাবতঃ অভিলাষী হইবে। অত্যল্প বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, শোকজনক ঘটনা আন্দোলন করিলে মনোমধ্যে এক বিশেষ সুখোদয় হয়, একারণ সেক্‌সপীয়র নামা ইংলণ্ডীয় মহাকবি লিখিয়াছেন—

আমার অন্তঃকরণ শোকানলে দগ্ধ হইতেছে, তত্রাপি আমার মন অবিরত ঐ শোক-প্রয়াসী।

এক পরম সুন্দরী মৃদুভাষিণী কামিনী নিজ সহচরীর সমীপে পতির বিয়োগান্তর মনের সমস্ত অসুখ প্রকাশ করিতেছেন…

আমার হৃদয়ে প্রাণনাথের সরসিজ নয়ন অহরহ বিরাজিত। অহরহ আমার নয়ন হইতে অশ্রুপতন হইতেছে—হে সহচরি! কি হেতু বিলাপ করিতেছি তাহা কিছুই কহিতে পারি না। ইচ্ছা হয় যে নিবিড় কাননে গমন করিয়া শোকানল জ্বালাইয়া তাহাতে দগ্ধ হই, ভালবাসিয়া যে কুকর্ম করিয়াছি তাহার প্রায়শ্চিত্ত করি।

আরিস্টটল নামা গ্রীশ দেশীয় সুপণ্ডিত লিখিয়াছেন, যে যদি কখনও উক্ত দেশস্থ নাট্যশালে অভিনয়কালীন দুই বা অধিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইত, যে কাহার অভিনয় উৎকৃষ্ট তখন করুণাভিনয়কারকেরাই জয়-পতাকা পাইত। আশঙ্কা এবং অনুকম্পা সাধারণ জনগণের মনোমধ্যে অশেষ মায়া উপস্থিত করিয়া অন্যান্য অভিনয়ের ক্ষণিক হর্ষ এবং উল্লাস নির্বাণ করিত। পতি লইয়া পতিব্রতা কামিনী পতিসহ আমোদ প্রমোদে কালযাপন করিতে লাগিল, শুনিলে হর্ষ

জন্মে, কিন্তু পতিবিয়োগে পতিব্রতা কামিনী পতিসহ প্রাণত্যাগ করিল, শ্রবণে করুণা উপস্থিত হয়। হর্ষ ক্ষণিক, কিন্তু করুণা বহুকালস্থায়িনী।

ভারতবর্ষীয় পূর্বতন পণ্ডিতেরা অনুমান করিতেন যে, ধার্মিক ব্যক্তির দুঃখাভিনয় করিবার সময় তাঁহাকে দুঃখার্ণবে রাখিয়া গ্রন্থ শেষ করিতে নাহি। ইহা কেবল তাঁহাদিগের ভ্রান্তি মাত্র। জীবন ধারণ করিলেই ইষ্ট-অনিষ্ট উভয়েরই ভোগী হইতে হইবে, ধার্মিক হইলেই যে আপদ-গ্রস্ত হইতে হইবে না, এমত নহে।

অপিচ ধর্মশীল ব্যক্তি ক্লেশপ্রাপ্ত হইলে অন্তঃকরণে অধিক শোক হয়, সুতরাং যে করুণাভিনয়ে অধর্ম বিরুদ্ধে পুণ্যবান্ ব্যক্তির প্রাণত্যাগ, সেই করুণাভিনয় দেখিলে অধিক তাপ জন্মে।

ভারতবর্ষস্থ পণ্ডিতেরা দুঃখাভিনয় করণের এতাদৃশ বিপক্ষ ছিলেন যে, অদ্যাবধি তাঁহারদিগের মতানুসারে মহাভারত কিংবা অন্য অন্য কাব্য পাঠ করিবার সময়ে কোন দেবতা বা বীরের মরণ পাঠ করিয়া সে দিবস ঐ দেবতা বা বীরের উদ্ধার ব্যতীত পাঠ বন্ধ করিতে নাহি।

অস্মদ্দেশীয় লোকেরা করুণাভিনয় করিয়া অবশেষে সেই ব্যক্তির সুখাভিনয় না করিলে অধর্মভোগী হইতে হইবে তাহা স্থির জানিতেন। অদ্যাবধি যাত্রার সময়ে অধিকারী কোন বীরের মরণান্তরে সে বীরের উদ্ধার না করিয়া যাত্রা বন্ধ করে না।

দেশ বিদেশে মানবগণের মনের ভাব ভিন্ন ভিন্ন হয়। শীতল দেশনিবাসিগণ স্বভাবতঃ প্রগাঢ় চিন্তায় মত্ত হইতে অভিলাষ করে, কিন্তু উষ্ণদেশীয় লোকেরা হাস্যরসে প্রবৃত্ত। বঙ্গদেশ অতিশয় উষ্ণ; সুতরাং বঙ্গদেশীয় লোকেরা হাস্যরসাভিনয় অবলোকন করিতে সর্বদাই অভিলাষী।

এই ভূমিকা পাঠ করিয়া জানিতে পারা যায় যে, লেখকের পাশ্চাত্ত্য নাটকের সঙ্গে পরিচয় স্থাপিত হইয়াছিল এবং তাহারই প্রত্যক্ষ প্রভাব বশত তিনি বাংলা ভাষাতেই পাশ্চাত্ত্য নাটকের আদর্শ অনুসরণ করিবার প্রয়াসী হইয়াছিলেন—এই পাশ্চাত্ত্য আদর্শ দ্বারা এতদ্দেশীয় চিরাচরিত রীতিসমূহকে আঘাত করা হইতেছে বলিয়া, এই সুদীর্ঘ ভূমিকায় তিনি তাঁহার কৈফিয়ৎ দিয়াছেন।

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সংস্কৃত নাটকের অনুযায়ী নান্দী ও 'নান্দ্যন্তে সূত্রধার' দ্বারাই তাঁহার নাটকের সূত্রপাত হইয়াছে। একমাত্র নাট্যকাহিনীর পরিণতি সম্পর্কে তিনি পাশ্চাত্ত্য আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ বাংলায় বিয়োগান্তক নাটক রচনা করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, অন্যান্য বিষয়ে তিনি এতদ্দেশীয় নাটকের আর কোন দোষত্রুটির কথা উল্লেখ করেন নাই। ইহা গদ্যপদ্যমিশ্র রচনা এবং ইহাতে একটি সঙ্গীতও যোগ করা হইয়াছে। নাট্যকার এখানে ইংরেজি scene কথাটিকে 'অভিনয়' বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন; যেমন 'প্রথমাঙ্ক প্রথমাভিনয়', 'প্রথমাঙ্ক দ্বিতীয়াভিনয়' ইত্যাদি।

প্রচলিত রূপকথার একটি সুপরিচিত কাহিনীর শেষ পরিণতি অংশ অতি-মাত্রায় করুণরসোদ্দীপক করিয়া তিনি এই নাটকটি রচনা করিয়াছেন। নাটকটি পঞ্চাঙ্ক হইলেও ক্ষুদ্রকায়। ইহার 'অভিনয়' বা দৃশ্যগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। নাটকটিকে সকল দিক দিয়া অতি মাত্রায় করুণ ও বিয়োগান্তক করিতেই হইবে, একমাত্র এই উদ্দেশ্য লইয়াই নাট্যকার ইহা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া, কাহিনীর দিক দিয়া ইহা রসোত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। বিশেষত কাহিনীটি নিতান্ত শিথিল-বদ্ধ এবং কোন প্রকার নাট্যিক গৌরব লাভ করিবার অনুপযুক্ত। এই বিষয়ে তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুনে'র মধ্যে যে কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, ইহাতে তাহার অভাব আছে। কেবল মাত্র বিয়োগান্তক কাহিনী অবলম্বন করিয়া বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম নাট্যরচনার প্রয়াস হিসাবে ইহার যে একটু ঐতিহাসিক মূল্য আছে—ইহা ব্যতীত ইহার আর কোন মূল্য নাই। চরিত্রসৃষ্টির কোন চেষ্টাই ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল মাত্র জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রের চরিত্রের উপর সেক্সপীয়র রচিত 'হ্যামলেট' নাটকের নায়ক-চরিত্রের ক্ষীণতম প্রভাব অনুভব করা যায়। কাহিনীটি বৈচিত্র্যহীন ; তথাপি নিম্নে তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে—

হেমপুরাধিপতি মহারাজ চন্দ্রকান্তের দুই পুত্র—কীর্তিবিলাস ও মুরারি। তাঁহারা মাতৃহীন, সংসারে তাঁহাদের বিমাতা আছেন, নাম নলিনী। বৃদ্ধ রাজা তরুণী মহিষী নলিনীর একান্ত বশীভূত। নলিনী জ্যেষ্ঠ যুবরাজ কীর্তিবিলাসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু কীর্তিবিলাস তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করায় তিনি রাজার নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে কুৎসিত অভিযোগ করিলেন। রাজা তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন; কিন্তু তিনি অনুতপ্ত চিত্তে নিজেই প্রাণত্যাগ করিলেন, মৃত্যুর পূর্বে রাজকুমারের প্রাণদণ্ড রহিত করিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে রাজপুত্রের পত্নী স্বামীর প্রাণদণ্ডের সংবাদ শুনিয়াই আত্মঘাতিনী হইলেন, পত্নীকে মৃত দেখিয়া রাজকুমারও নিজদেহে অস্ত্রাঘাত করিয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন।

কাহিনীটি বাংলার সুপরিচিত রূপকথা বিজয়-বসন্ত বা শীত-বসন্তের বিয়োগান্তক রূপ মাত্র। হিন্দী লোক-কথা পূরণ-ভকতের কাহিনীও ইহারই অনুরূপ রূপকথায় বিমাতা কর্তৃক নির্যাতিত সপত্নীর গর্ভজাত রাজপুত্রদ্বয় পুনরায় পিতৃরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, এখানে নাট্যকার নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাঁহাদের একজনকে বিনাশ করিয়াছেন ; তদুপরি আরও কয়েকটি মৃত্যু-

ঘটনা কাহিনীর শেষাংশে যোগ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার করুণ রসকে নিবিড় করিয়া তুলিতে পারেন নাই। 'কীর্তিবিলাস নাটকে'র ভাষা সম্বন্ধেও উল্লেখযোগ্য কিছু নাই। গদ্যসংলাপের মধ্যে স্বচ্ছন্দ গতির অভাব আছে; ইতিপূর্বে বাংলা গদ্য রচনার যে আদর্শ প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার সঙ্গে নাট্যকারের কোন পরিচয় ছিল বলিয়া মনে হয় না। নিম্নোদ্ধৃত অংশ তাহার প্রমাণ—

রাজপুত্র—হায় হায়, রমণীগণের কি খল স্বভাব! বিমাতার পীড়নে আমি কি পর্যন্ত কষ্ট স্বীকার না করিতেছি, যাহার যে প্রকার স্বভাব তাহা কোনমতেই নিবারণ করা যায় না।......

দেখ রজনীযোগে কুমুদিনীর সুশীতলকর সুধাকর সহ বিহার সন্দর্শনে নলিনী নম্রমুখী হইয়া আক্ষেপনীরে ভাসিয়া থাকেন, পরে প্রভাকর উদয় হইবামাত্র অশ্রুজল সম্বরণ করিয়া নিজ নায়কের নিকট মনের সমস্ত দুঃখ ব্যক্ত করেন, হে নাথ! তোমার প্রচণ্ড প্রখর তেজোময় কিরণদ্বারা সংসারের সমস্ত প্রাণীর দেহ দগ্ধ হইতে থাকে; কিন্তু কুমুদিনী নায়কের কোমল জ্যোতিদ্বারা সর্বসাধারণের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হয়। প্রেয়সীর খেদ শ্রবণ করিয়া প্রভাকর তেজ সাম্য করিতে অভিলাষ করিলেন, কিন্তু কেমন স্বভাবের প্রভাব সে তেজের হ্রাসতা হওয়া দূরে থাকুক ক্রমশঃ অত্যন্ত প্রচণ্ড হইয়া উঠিল। (২।৩)

পদ্যসংলাপ রচনায় নাট্যকারের উপর কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। নিজের কোন মৌলিক প্রতিভা এই বিষয়ে তাঁহার ছিল বলিয়া মনে হয় না।

সৌদামিনী— নিজে মান অভিমানী কাহাকে না মানে।
অপমান ভয় হেতু জিজ্ঞাসেন মানে॥
কি দেখি এমন সাধ হইল তোমার।
ইহাতে এতই সুখ ভাবিয়াছ সার॥
মান বলে কহিব কি মম অভিলাষ।
দুঃসাধ্য অসাধ্য যাহা কে করে প্রয়াস। (৪।১)

একটি চরিত্রের মুখে সামান্য কথ্য ভাষাও ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু তাহাও রচনার দিক দিয়া অকিঞ্চিৎকর। ইংরেজি নাট্যসাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে রচিত হইয়াছিল বলিয়া 'কীর্তিবিলাস নাটক' নীতি ও রুচির দিক দিয়া নিন্দনীয় হইতে পারে নাই।

তৃতীয় অধ্যায়

হরচন্দ্র ঘোষ

(১৮৫৩—১৮৭৪)

যিনি বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম একাধিক নাটক রচনা করিবার গৌরব অর্জন করিয়াছেন, তাঁহার নাম হরচন্দ্র ঘোষ। প্রায় ২০ বৎসরের ব্যবধানে তিনি মোট চারিখানি নাটক রচনা করেন; ইহাদের মধ্যে দুইখানি অনুবাদ, একখানি বৈদেশিক উপাখ্যানমূলক ইংরেজি রচনার ভিত্তির উপর রচিত এবং একখানি মৌলিক। যদিও হরচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভা তাঁহার পূর্ববর্তী নাট্যকার দুই জনের তুলনায় নিম্নস্তরের ছিল, তথাপি বিভিন্ন ক্ষেত্র হইতে বাংলা নাটকের উপাদান সংগ্রহ করিবার সর্বপ্রথম কৃতিত্ব তাঁহারই প্রাপ্য। তাঁহার রচিত কোন কোন নাটকের ভূমিকা পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, তাঁহার একখানি নাটকও সমাদর লাভ করে নাই এবং তাঁহার কোন নাটকই অভিনীত হয় নাই, তথাপি দীর্ঘ ২০ বৎসর যাবৎ যে তিনি নাট্যরচনার ঔৎসুক্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নাট্যসাহিত্যের প্রতি বিশেষ আকর্ষণের পরিচায়ক। তিনি ইংরেজিতে সুশিক্ষিত ছিলেন এবং তাঁহার নাট্য-প্রীতি ইংরেজি শিক্ষারই ফল। এই শিক্ষা এবং অধ্যবসায়ের সঙ্গে যদি একটু প্রতিভার মিশ্রণ হইত, তাহা হইলে বাংলা সাহিত্যে সেই যুগেই একজন উল্লেখযোগ্য নাট্যকারের সন্ধান পাওয়া যাইত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়. নাট্যপ্রতিভা বলিতে যাহা বুঝায়, হরচন্দ্রের মধ্যে তাহার অভাব ছিল।

হরচন্দ্রের সর্বপ্রথম নাটক 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়া পরের বৎসর, অর্থাৎ ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়; মনে হয়, ইহা তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' নাটকেরও পূর্ববর্তী রচনা। সেইজন্য হরচন্দ্র তাঁহার পূর্ববর্তী কোন বাংলা নাটকের আদর্শ হইতে সহায়তা লাভ করিতে পারেন নাই, অতএব এক হিসাবে হরচন্দ্রকেও 'বাংলা নাটকের অন্যতম জন্মদাতা' বলা হইয়া থাকে। কিন্তু হরচন্দ্র যাহা রচনা করিয়াছেন, তাহা কোন দিক দিয়া যদি যথার্থই নাট্যিক গৌরব লাভ করিতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে এই সম্পর্কে কিছু বলিবার ছিল না। এই বিষয়ে হরচন্দ্রের যে নাটকটি

মৌলিক তাহার গুণ বিচার করিয়া দেখিলে তাহা নাট্যগুণ-বিবর্জিত বলিয়াই মনে হইবে। নাট্যকাররূপে তারাচরণের যে গুণ ছিল, হরচন্দ্রের তাহা ছিল না; অতএব, 'বাংলা নাটকের জন্মদাতা'র যে গৌরব তাহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে তারাচরণেরই প্রাপ্য। বিশেষত একথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 'ভদ্রার্জুন' মৌলিক রচনা এবং হরচন্দ্রের প্রথম নাটক 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' অনুবাদ মাত্র। 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' নাটক সেক্সপীয়র রচিত *The Merchant of Venice* নাটকের অনুবাদ; অবশ্য এই সম্পর্কে তিনি কতকটা স্বাধীনতাও গ্রহণ করিয়াছিলেন। শুধু যে চরিত্রের নামগুলিই তিনি ইংরেজির পরিবর্তে ভারতীয় রূপে রূপান্তরিত করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই নহে—অনেক স্থলে তিনি 'আখ্যানের মর্ম মাত্র গ্রহণ' করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম তিনটি নাটকেই দুইটি করিয়া ভূমিকা—একটি বাংলায় লিখিত, অপরটি ইংরেজিতে লিখিত। 'ভানুমতী চিত্তবিলাসে'র বাংলা ভূমিকায় তিনি উল্লেখ করিয়াছেন,

> এতদ্দেশীয় বালকবৃন্দের জ্ঞান বৃদ্ধ্যর্থ উৎসাহান্বিত ইংলণ্ডীয় কোন বিচক্ষণ মহাজনের পরামর্শক্রমে আমি 'সেক্সপিয়র' নামক ইংলণ্ডীয় মহাকবির স্বনামপ্রসিদ্ধ মহানাটক হইতে 'মরচেণ্ট-অফ-ভিনিস' ইত্যভিধেয় অপূর্ব কাব্যের আনুপূর্বিক অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু ঐ কাব্যের অনেকানেক স্থানের ভাব দেশীয় ভাষার ভাবের সহিত ঐক্য হয় না দেখিয়া কতিপয় প্রাচীন জ্ঞানবান্ মহাশয় উল্লিখিত কাব্যের আখ্যানের মর্মমাত্র গ্রহণ পূর্বক আমূলাৎ দেশীয় প্রণালীতে রচনা করিতে যুক্তিদান করেন। আমি উক্ত উক্তি যুক্তিযুক্ত বোধে তদনুসারে এই 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' নাটক গদ্যপদ্যে রচনা করিলাম। যদ্যপিও ইহাতে উল্লিখিত ইংরেজী কাব্যের আনুপূর্বিক অনুবাদ না হউক, তথাপি বর্ণিত মহাকবি সেক্সপিয়রের সদ্ভাবের বহুলাংশ অথচ সম্পূর্ণ আখ্যানের মর্ম গ্রহণ করিয়াছি; তবে বহু স্থানে মূল কাব্যের সহিত মিলন করিলে নিবর্তন পরিবর্তনাদি দৃষ্ট হইবেক বটে, কিন্তু তাহা শুদ্ধ মহাশয়দিগের অবকাশকালে গ্রন্থপাঠামোদের আনুকূল্য বিবেচনায় করা হইল। অতএব যদি এতন্নাটক এতদ্দেশীয় ভদ্রসমাজের মনোনীত হয় তবে আমি প্রকৃষ্ট রূপে কৃত স্বীয় পরিশ্রম সফল বোধ করিবে।

কিন্তু 'ভদ্রসমাজ' যে তাঁহার এই নাটকখানি খুব সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। কারণ, তিনি তাঁহার পরবর্তী নাটক 'কৌরব বিয়োগে'র ইংরেজি ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন,

> In 1852, I published my vernacular Drama of 'The Merchant of Venice' which was written at the suggestion of an European friend of native education. A few copies of the work were

presented to the learned Editors of the English and Vernacular journals of the Presidency and to some of the Native nobility of the country. The former with the politeness which characterizes superior civilization, acknowledged the gift, but the latter—though accepting the present—did not acknowledge it, and I cannot say whether they have even opened the Book at all.

হরচন্দ্র তাঁহার এই নাটকখানি কলেজের পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিবার উদ্দেশ্যেই যে প্রধানত রচনা করিয়াছিলেন, তাহাও উক্ত 'কৌরব বিয়োগে'র বাংলা ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁহার সেই অভিলাষ পূর্ণ করেন নাই; ইহার কারণ তাঁহার কাছে 'দুর্জ্ঞেয়' বলিয়া বোধ হইলেও, তিনি ইহার দুইটি কারণ অনুমান করিয়াছেন; প্রথমত ইহা 'নানা রসঘটিত, ও স্থানে স্থানে এতদ্রূপ সরস আদিরস রচিত যে নীতি-জ্ঞানান্বেষী ছাত্রগণের তাহা পাঠের যোগ্য বোধ করিলে "ভারতচন্দ্রে" স্থান নির্যাপন করা নৈষ্ঠুর্য বোধ হয়।' দ্বিতীয়ত পদ্য রচনার প্রতি তদানীন্তন শিক্ষিত সমাজের বৈরাগ্য। সেইজন্য এই দুইটি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখিয়া হরচন্দ্র তাঁহার দ্বিতীয় নাটক 'কৌরব বিয়োগ' রচনা করেন। অতএব ইহা নীতির দিক দিয়া উন্নত ও ইহাতে 'স্বল্প' মাত্র পদ্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

ইহা হইতে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে পারা যায় যে, হরচন্দ্রই সবপ্রথম নাট্যকার যিনি সমসাময়িক পাঠকের রুচির উপর লক্ষ্য রাখিয়া নাট্য-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার নাট্য-রচনার প্রতিভা আদৌ ছিল না বলিয়া যদিও তাহা বিশেষ কার্যকরী হইতে পারে নাই, তথাপি নাট্যরচনায় সমাজের রুচি যে উপেক্ষণীয় হইতে পারে না, তাহা তিনিই সর্বপ্রথম অনুভব করিয়াছিলেন।

'ভানুমতী চিত্তবিলাস' রচনায় পাঁচ বৎসর পর হরচন্দ্রের দ্বিতীয় নাটক 'কৌরব বিয়োগ' রচিত হয়। ইহাই তাঁহার একমাত্র মৌলিক রচনা। মহাভারত হইতে কাহিনীভাগ গ্রহণ করিয়া তিনি ইহাতে তাহার একটি নাট্য-রূপ দিয়াছেন। যদিও বাংলা সাহিত্যে ইতিমধ্যে একাধিক উল্লেখযোগ্য নাটক ও অন্যান্য বিষয়ক মৌলিক রচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তথাপি হরচন্দ্র তাহাদের দ্বারা ইহাতে আদৌ প্রভাবান্বিত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। অতএব ইহাতেই হরচন্দ্রের মৌলিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে, সুতরাং নাটকখানি নানাদিক হইতে একটু বিশেষণ করিয়া দেখিবার যোগ্য। এই সম্পর্কে প্রথমেই

নাটকের বাংলা ভূমিকাটি, বিস্তৃত হইলেও, সম্পূর্ণই উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি তাহাতে লিখিয়াছেন,

এতদ্দেশীয় আপামর সাধারণ লোকেরই অবগতি আছে যে প্রচরদ্রূপে প্রচলিত 'মহাভারত' ভারতবর্ষের প্রাচীন ও সমীচীন গ্রন্থ, এবং গার্হস্থ্য ও ব্রহ্মচর্য ও রাজধর্ম ও জ্ঞানযোগ ও যোগধর্মাদি নানা বিষয়ের উপদেষ্টা বিধায় সর্বত্রে সর্বদা প্রকৃষ্টরূপে সমাদৃত হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক অধ্যাপক ও অধ্যাপিতেরদের পদ্য রচিত গ্রন্থে বিশিষ্টরূপ অনুরাগ দৃষ্ট হয় না। একারণ সুরচিত মহাভারতও একাল পর্যন্ত কষ্টশ্রষ্টে অস্মদাদির কালেজ ও পাঠশালা প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইতে প্রাপ্তাভীষ্ট হন নাই। এবঞ্চ নব রচিত পদ্য গ্রন্থেও বিদ্যালয়ের বিরতি দেখা যায়। যে হেতুক তাহার অধিকাংশই প্রায় সুশ্রাব্য কাব্যরস ঘটিত; এই হেতু ইত্যগ্রে কিয়দংশ পদ্যে বিরচিত 'ভানুমতী' চিত্তবিলাস' ইত্যভিধেয় যে নাটক আমি প্রস্তুত পূর্বক হুগলীর কালেজের কৃপালু প্রধান অধ্যাপক সাহেবের মধ্যবর্তিতায় বিদ্যাদানার্থ কৌন্সেলে প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহা মহানুভব সভ্য মহাশয়েরা সুরচিত বোধ করিলেও অদ্যাপি কালেজাদিতে ব্যবহৃত হয় নাই; অথবা বর্ণিত মহা-মহিমেরা তাহা তদর্থে উপযোগী জ্ঞান করেন নাই, ইহা মদীয় দুর্জ্ঞেয়। বস্তুতঃ প্রাগুক্ত নাটক 'সেক্সপিয়র' কৃত মহানাটকের মনোনীত একাংশের (অর্থাৎ মরচ্যাণ্ট-অফ-বেনিসের) দেশীয় পরিচ্ছদ মাত্র। কিন্তু এতদ্দেশস্থ যে সমস্ত মহাশয়েরা সেক্সপিয়র সাহেবকৃত স্বনামপ্রসিদ্ধ মহানাটক পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই বিবেচনা করিয়া থাকিবেন যে ঐ প্রতিষ্ঠিত কাব্য নানা রসঘটিত, ও স্থানে স্থানে এতদ্রূপ সরস আদিরস রচিত যে নীতি জ্ঞানান্বেষী ছাত্রগণের তাহা পাঠের যাগ্য বোধ করিলে 'ভারতচন্দ্রে' স্থান নির্যাপন করা নৈষ্ঠুর্য বোধ হয়। ফলতঃ পদ্য রচিত গ্রন্থে সংপ্রতি বিদ্যালয় সমূহের অনুরাগ মাত্র নাই, এ কারণ দুর্ভাগ্য বশাৎ 'মহাভারত'ও 'ভারতচন্দ্রের' ভাগ্য ভোগ করিয়া উজ্জ্বল বিদ্যার্থি সমাজে দিবা প্রদীপের ন্যায় অপ্রজ্বল হইয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের অনবগত নহে যে মহাভারত গ্রন্থ নীতিগর্ভ ও সন্দর্ভশুদ্ধির আশ্রম, এবং সাংসারিক ও পারলৌকিক বিষয়েরও উপদেশ নিকরের নিকেতন। এ কারণ আমি ঐ মহাগ্রন্থের কিয়দংশ এতাবতা রাজা দুর্যোধনের উরু ভঙ্গাবধি ও অন্ধরাজাদির যজ্ঞানলে দগ্ধ হওয়া পর্যন্ত অপূর্ব বৃত্তান্ত সুমার্জিত সাধু ভাষায় বহুলাংশ গদ্যছন্দে ও অতি স্বল্পাংশ মাত্র পদ্য প্রবন্ধে ইংলণ্ডীয় নাটকের প্রচলিত প্রণালীতে রচনা করিয়া 'কৌরব বিয়োগ নাটক' এই আখ্যা দানে প্রকাশ করিলাম। ভরসা করি যে নীতি নিপুণেরা এই নীতি গ্রন্থে আমূলাৎ কৃপা দৃষ্টিপাত করিয়া মদীয় শ্রম সফল, অথবা ভ্রম সকল দূর করেন। কিন্তু এতদ্রূপ গ্রন্থ রচনে বারংবার উদ্যম করাতে আমার এমত অভিপ্রায় নহে যে আমি অগণ্য মান্য গ্রন্থকর্তাদিগের মধ্যে গণ্য হইয়া তাঁহাদের পুণ্য নামের সহিত বরেণ্য সমাজে ধন্যবাদ প্রাপ্ত হই। আর যদিও উপযুক্ত জ্ঞানিব্যতীত অন্যান্যের এতদ্রূপ উদ্যম করা অনধিকার চর্চা ভিন্ন নহে, কিন্তু ইংলণ্ডীয় ও এতদ্দেশীয় বহুতর বিজ্ঞবরের অভিপ্রায় মতে আমি এই অভিলষিত অভিনব রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া 'কাশীদাসের' কিয়দ্ভাগের প্রাচীন পরিচ্ছদ যাহা মলিন মুদ্রাযন্ত্রের মুদ্রাদোষে ক্রমশঃ মলিনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা পরিবর্তন করিলাম। তাহাতে যদি এই নববেশে এতদ্দেশের নবীন ও প্রবীণ সমাজের উল্লাস জন্মে, তবে আমি আপনাকে নিতান্তই লব্ধ-প্রত্যাশ বোধ করিব।

দেশীয় কোন বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া নাটক রচনা করিলে তাহা তাঁহার পূর্ববর্তী অনুবাদ-রচনা 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' হইতে অধিকতর জনপ্রিয়তা অর্জন করিবে বলিয়া উপদিষ্ট হইয়া যে তিনি এই নাটকখানি রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহাও তিনি তাঁহার এই নাটকখানির ইংরেজি ভূমিকায় এই ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন,

In consequence, however, of a suggestion that I received, I thought it advisable to change the topic, and write upon a subject of purely Indian origin, and for this purpose, I cast my eyes upon the interesting subject of '*Mahabharuth*' which in its present dress does not seem to be in great favour with the *alumni* of our colleges or with the preceptors who direct their steps, though it is admitted on all hands that the subject comprised in that work is at once edifying and sublime, and has never failed to keep the attention of the reader who has once made his way to it, "irresistibly fixed."

এই উক্তি হইতে হরচন্দ্রের একটি অতি উদার দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যাইবে। তিনি সেই যুগেই অনুভব করিয়াছেন যে, এতদ্দেশীয় যে সকল বিষয় নীতির দিক দিয়া উন্নত ও আদর্শস্থানীয় তাহা তৎকালীন উচ্চশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই তিনি মহাভারতের এই সমুন্নত বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া এই নাটকখানি রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাও যে তদানীন্তন শিক্ষাকর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয় নাই, তাহা বলাই বাহুল্য।

ভারতীয় নিজস্ব এক অতি উচ্চ নৈতিক আদর্শকে তদানীন্তন আত্মভ্রষ্ট শিক্ষিত সমাজের সম্মুখে স্থাপন করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই হরচন্দ্র এই নাটকখানি রচনা করিয়াছিলেন, কোন যথার্থ নাট্য-প্রেরণার বশবর্তী হইয়া ইহা রচনা করেন নাই। সেজন্য নাট্যরস অপেক্ষা ইহার মধ্যে নীতিকথা বড় হইয়া উঠিয়াছে, নিম্নলিখিত নাট্যকাহিনীটি ইহার প্রমাণ।

নান্দীতে সূত্রধার কর্তৃক বাগ্‌বাদিনীর বন্দনার পর নর্তকী প্রবেশ করিয়া কৌরব কর্তৃক উপদ্রুত হস্তিনার প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন, কিন্তু সূত্রধার তাঁহার বিরোধিতা করিয়া কহিলেন, 'বিপত্তিকালে রাজার উপেক্ষারূপ অনুচিত কর্ম করিয়া অযশভাজন হওয়া সত্যের স্বীকর্তব্য নহে'—বলিয়া উভয়েই রঙ্গভূমি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এই বিষয়

প্রথম অঙ্ক, প্রথম 'অঙ্গে'র অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ইহার পরবর্তী 'অঙ্গ' হইতেই প্রকৃত নাট্যকাহিনীর সূত্রপাত হইয়াছে।

দুর্যোধনের উরুভঙ্গের সংবাদ পাইয়া ধৃতরাষ্ট্র দুঃখ করিতেছেন, বিদুর দুর্যোধনের দুষ্কার্যসমূহ ধৃতরাষ্ট্রকে স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহাকে তাঁহার জন্য অনুতাপ করিতে নিষেধ করিতেছেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র পুনঃ পুনঃ রোদন করিতে লাগিলেন। সঞ্জয়ও ধৃতরাষ্ট্রকে সংসারের অনিত্যত্ব সম্পর্কে উপদেশ দিয়া এবং পাণ্ডবদিগের ধর্মপরায়ণতার সঙ্গে কৌরবদিগের অধর্মপরায়ণতার তুলনা করিয়া তাঁহাকে শোক হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিতেছেন। ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের বর্তমান অবস্থা জানিতে চাহিলে সঞ্জয় তাঁহাকে জানাইলেন যে, দুর্যোধন 'শিবাবৃন্দমধ্যে পড়িয়া ভীমাদির নিধন চিন্তা করিতেছেন।' এদিকে অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা তাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছেন। পাণ্ডবগণ রথারূঢ় হইয়া হৃষ্টমনে 'বহির্গমনে'র জন্য সুসজ্জিত হইয়াছেন এবং পাণ্ডব শিবিরমধ্যে দ্রৌপদী ও তাঁহার পঞ্চপুত্রকে রক্ষা করিবার জন্য স্বয়ং মহাদেবকে প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছেন। সঞ্জয়ের এই কথা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

ভগ্নউরু দুর্যোধন শবপরিবেষ্টিত যুদ্ধক্ষেত্রে পড়িয়া আছেন, রাত্রি গভীর হইয়াছে, পিশাচেরা চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এমন সময় অশ্বত্থামা প্রমুখ কৌরব পক্ষীয়গণ আহত দুর্যোধনকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিলেন। অশ্বত্থামাকে সেনাপতিত্বে বরণ না করিবার জন্যই যে কৌরবের আজ এই বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, অশ্বত্থামা দুর্যোধনকে এই অনুযোগ দিলেন। দৈবই যে বলবান এই সম্পর্কে কৃপ একটি কাহিনী সেই অবস্থায় দুর্যোধনকে শুনাইলেন। দুর্যোধন অশ্বত্থামাকে কৌরব সৈন্যের সেনাপতিত্বে বরণ করিলেন। অশ্বত্থামা দুর্যোধনকে আশ্বাস দিলেন যে, 'পৃথ্বী অচিরে নিষ্পাণ্ডবা করিয়া' তাঁহাকে সমর্পণ করিবেন; বলিয়া অশ্বত্থামা, কৃপ ও কৃতবর্মা পাণ্ডব শিবিরের দিকে গমন করিলেন। এদিকে পাণ্ডব শিবিরে যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের পতনের জন্য অনুতাপ করিতে লাগিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে পাণ্ডবগণ তখন 'অগ্নিদত্ত রথারূঢ় হইয়া কুরুক্ষেত্রের দিগ্দেশ' দর্শন করিতে বাহির হইয়া গেলেন। শিবির রক্ষার ভার ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীর উপরই রহিল। শ্রীকৃষ্ণ শিবকে স্মরণ করিলেন এবং

শিবিরের 'পুরঃ দ্বার' রক্ষার ভার তাঁহার উপর দিয়া গেলেন। শিব শিবিরের দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত রহিলেন।

এমন সময় অশ্বত্থামা, কৃপ ও কৃতবর্মা শিবিরের সম্মুখীন হইলেন, শিবকে পূজা দ্বারা তুষ্ট করিবা মাত্র অশ্বত্থামার অনুরোধে শিব অন্তর্হিত হইলেন। অতঃপর অশ্বত্থামা শিবিরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী সহজেই পরাজিত ও নিহত হইলেন। অতঃপর অশ্বত্থামা পঞ্চপাণ্ডব মনে করিয়া নিদ্রিত পাণ্ডব-পুত্রদিগের শিরশ্ছেদ করিলেন, তারপর সেই ছিন্ন শিরগুলি লইয়া আসিয়া দুর্যোধনকে উপহার দিলেন, দুর্যোধন 'হর্ষবিষাদে' প্রাণত্যাগ করিলেন।

রোরুদ্যমান দূত আসিয়া যুধিষ্ঠিরকে পাণ্ডব-পুত্রদিগের হত্যার সংবাদ জানাইল। যুধিষ্ঠির বিলাপ করিতে লাগিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিলেন; দ্রৌপদী আসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকেও সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। ভীম জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোন কার্য করিলে তোমার শোক প্রশমিত হইতে পারে?' দ্রৌপদী বলিলেন, 'অশ্বত্থামার মাথার মণি আনিয়া দিলে আমার এই শোক প্রশমিত হইবে।' ভীম প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে।' যুধিষ্ঠির এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন না। কিন্তু অর্জুন অচিরকালমধ্যেই এই প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন।

সঞ্জয়ের নিকট হইতে ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের মৃত্যু-সংবাদ শুনিতে পাইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন; ব্যাসদেব, বিদুর ও সঞ্জয় তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী বিধ্বস্ত রণাঙ্গনে মৃত পুত্রদিগের সন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইলেন, ধৃতরাষ্ট্র ভীমকে আলিঙ্গন করিতে চাহিলেন, শ্রীকৃষ্ণ লৌহ-ভীম তাঁহার সম্মুখে স্থাপন করিলেন, ধৃতরাষ্ট্র তাহা আলিঙ্গন করিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণ কৌরবদিগের দুষ্কার্যের কথা উল্লেখ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে শোক সংবরণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

কুন্তীর সঙ্গে পাণ্ডবদিগের সাক্ষাৎ হইল। কর্ণের নিধনের সংবাদ শুনিয়া কুন্তী রোদন করিতে লাগিলেন, যুধিষ্ঠির ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কুন্তী তাঁহার সঙ্গে নিজের সম্পর্কের কথা সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। শুনিয়া যুধিষ্ঠির কুন্তীকে এই কথা তাঁহাদিগকে পূর্বে খুলিয়া না বলিবার জন্য অনুযোগ দিতে

লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুরুবধূগণ কুরুক্ষেত্রে তাঁহাদের মৃত আত্মীয়-স্বজনকে দেখিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। মৃত রাজ ও সেনাগণের সৎকার করিবার ব্যবস্থা হইল, কুরুনারীগণ নিজ নিজ স্বামীর জলন্ত চিতায় আরোহণ করিয়া সহমৃতা হইলেন। দেখিয়া যুধিষ্ঠির বিলাপ করিতে লাগিলেন; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন।

বিদুর ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে হস্তিনাপুরে ফিরিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন, যুধিষ্ঠিরও ভ্রাতৃগণ সহ হস্তিনায় যাইবেন স্থির হইল। নগরে উৎসবের আয়োজন হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ, পঞ্চপাণ্ডব, কুন্তী, দ্রৌপদী ও উত্তরা হস্তিনাপুরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে নগরের শোভা দেখাইতে লাগিলেন। সমবেত নগরবাসী কর্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া তাঁহারা প্রাসাদে গিয়া প্রবেশ করিলেন।

প্রাসাদে আসিয়া যুধিষ্ঠির আরও বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন, নিহত জ্ঞাতিবন্ধু আত্মীয়-স্বজনের কথা তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে পাণ্ডবগণ শরশয্যাগত ভীষ্মের নিকট শান্তিপর্বের বাণী শুনিবার জন্য যাত্রা করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, বিদুরও গেলেন। যুধিষ্ঠির কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ভীষ্ম মৃত্যু ও ব্যাধির রহস্য, প্রেতপুরীর বর্ণনা, জীব-জন্ম-বৃত্তান্ত ও অন্যান্য ধর্মোপদেশ বলিলেন। শুনিয়া সকলের 'মায়া ও মোহের খণ্ডন' হইল। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার পরামর্শ দিয়া হস্তিনাপুর ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। ভীষ্ম সেই মুহূর্তেই যোগাসনে তনুত্যাগ করিলেন। গঙ্গাতীরে ভীষ্মকে দাহ করিয়া পাণ্ডবগণ হস্তিনায় ফিরিয়া গেলেন। ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীও ফিরিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীসহ সংসার ত্যাগ করিয়া দ্বৈপায়ন তপোবনে গিয়া যোগ সাধন করিতে মনস্থ করিলেন। বিদুরও তাঁহাদের সঙ্গী হইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। যুধিষ্ঠির ইহা শুনিয়া বড়ই ব্যথিত হইলেন, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র কাহারও কথা শুনিলেন না। কুন্তীও ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গিনী হইলেন। পঞ্চপাণ্ডব ও পুর-বধূগণ সাশ্রুনয়নে তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন।

দ্বৈপায়ন বনে কুটীর নির্মাণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, গান্ধারী ও কুন্তী বাস করিতে লাগিলেন। মুনিগণ তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। হস্তিনা হইতে একদিন পঞ্চপাণ্ডব ও পুরবধূগণ তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য

আসিলেন। যোগাসনে বিদুর তনুত্যাগ করিলেন। ব্যাসদেবের গৃহে পাণ্ডব ও কৌরবগণ তাঁহাদের মৃত আত্মীয়-স্বজনকে প্রত্যক্ষ করিলেন। অতঃপর যুধিষ্ঠিরাদি হস্তিনায় ফিরিয়া গেলেন।

একদিন ধৃতরাষ্ট্র, কুন্তী ও গান্ধারী যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন, এমন সময় যজ্ঞ-স্থান হইতে অগ্নি উৎক্ষিপ্ত হইয়া কুটীর দগ্ধ করিতে লাগিল। ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তী সেই অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ব্যাসদেবের নিকট হইতে যুধিষ্ঠির এই দুঃসংবাদ শুনিতে পাইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। ব্যাসদেব তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন।

হরচন্দ্র নাটকখানির ইংরেজি ভূমিকায় বলিয়াছেন, "It is a Historical tragedy out of the '*Mahabharuth*'"; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা যেমন ঐতিহাসিকও নহে, তেমনই ট্র্যাজিডিও নহে। কারণ, মহাভারতের ঐতিহাসিক ভিত্তি যাহাই থাকুক না কেন, কাশীরাম দাস তাহা বাঙ্গালীকে যে ভাবে পরিবেশন করিয়াছেন, তাহাতে ইহার ইতিহাসের কোন মর্যাদাই রক্ষা পায় নাই, বরং তাহা পুরাণেরই স্বধর্মী হইয়া পড়িয়াছে। অতএব ইহা পৌরাণিক নাটক। তারপর যে পরস্পরবিরোধী আদর্শের সংঘাতের ফলে যথার্থ ট্র্যাজিডির সৃষ্টি হইতে পারে, ইহার কাহিনী-ভাগে তাহার সঙ্গেও সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় না। ইহা একান্তভাবে আখ্যান-মূলক (narrative)—ঘটনার সংঘটন ইহাতে নাই, বরং তাহার বর্ণনাই ইহার বৈশিষ্ট্য। দুর্যোধনের উরুভঙ্গের পর হইতে অগ্নিদাহে ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির মৃত্যু পর্যন্ত কাহিনী ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে; এই বর্ণনায় বাহ্যতঃ নাট্যিক আঙ্গিককে স্বীকার করিয়া লওয়া হইলেও, অন্তরের দিক দিয়া ইহার বর্ণনাত্মক ধর্মের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। ইহাতে ঘটনা খুব অল্পই সংঘটিত হইয়াছে, তাহার পরিবর্তে কেবলমাত্র নেপথ্য-সংঘটিত ঘটনার মৌলিক বিবরণ উপস্থিত করা হইয়াছে। নাটকের মৌলিক ধর্মের সঙ্গে এই রীতির যে বিরোধ আছে, তাহা হরচন্দ্র বুঝিতে পারেন নাই; সেইজন্য হরচন্দ্রের নাট্যকারের প্রতিভা ছিল বলিয়া মনে হয় না; মহাভারত হইতেই বিষয়-বস্তু সংগ্রহ করিয়া তারাচরণ যে নাটকখানি ইতিপূর্বে রচনা করিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে ইহার তুলনা করিলেই হরচন্দ্রের প্রকৃত ত্রুটি যে কোথায়, তাহা প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিবে।

বিষয়-নির্বাচনে হরচন্দ্র কোন কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। প্রথমতঃ ইহা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরিশিষ্ট অংশ মাত্র। যুদ্ধের মূল ঘটনা ইতিবেই

সংঘটিত হইয়া গিয়াছে, এখন শুধু তাহার প্রতিক্রিয়া চলিতেছে মাত্র। অতএব নাট্যোপযোগী স্বাধীন ঘটনা ইহাতে অল্পই আছে। তথাপি যে দৃষ্টিগুণে ঘটনা-বিরল ক্ষেত্র হইতেও যথার্থ নাটকীয় উপাদান সংগৃহীত হইতে পারে, হরচন্দ্রের সেই দৃষ্টিগুণ ছিল না। অতএব বিষয়-নির্বাচনের মধ্যেই তাঁহার সর্বাধিক ত্রুটি প্রকাশ পাইয়াছে।

ঘটনার বিবরণদাতা ও নাট্যিক চরিত্রে যে পার্থক্য আছে, সে সম্বন্ধে হরচন্দ্রের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল বলিয়া মনে হয় না। মহাভারতের মধ্যে বৈশম্পায়নের যে স্থান, হরচন্দ্রের অধিকাংশ চরিত্রেরও সেই স্থান, অর্থাৎ একজন কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ইহারা ঘটনার এক একটি বর্ণনা দিয়াছেন মাত্র—এই বর্ণনার স্থান, কাল এবং পাত্রাপাত্র পর্যন্ত বিবেচনা করা হয় নাই। দৈবই যে বলবান্ ইহা বুঝাইতে কৃপাচার্য একটি উপাখ্যানের ইঙ্গিত দিলেন; অমনই ভগ্নউরু দুর্যোধন ভূমিতলে পড়িয়াই বলিয়া উঠিলেন, 'হে কৃপ, কৃপা করিয়া এই উপাখ্যান আমাকে বিস্তারপূর্বক কহ (১।৩)।' তখনই কৃপ মুমূর্ষু দুর্যোধনের নিকট একটি সুদীর্ঘ নীতিমূলক কাহিনীর অবতারণা করিলেন। যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিবার প্রসঙ্গে অর্জুন একবার বীরবাহুর রাজলক্ষ্মী প্রতিষ্ঠা-বিষয়ক একটি কাহিনীর আভাস দিলেন। তৎক্ষণাৎ শোকাকুল যুধিষ্ঠির উৎসুক হইয়া অর্জুনকে বলিলেন, 'শ্রুতিধর, বীরবাহু রাজলক্ষ্মী কিরূপে সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা আমাকে কহ (৪।২)।' ইহাতে উৎসাহিত হইয়া অর্জুন সুদীর্ঘ দুই পৃষ্ঠাব্যাপী এক কাহিনী এখানে বর্ণনা করিয়া গেলেন। শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের নিকট যুধিষ্ঠির গিয়া মৃত্যুর স্বরূপ, প্রেতপুরীর বর্ণনা, জীবজন্মের রহস্য, দানধর্মমাহাত্ম্য, যোগতত্ত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশ্ন করিলেন; ভীষ্ম মহাভারতের সমগ্র শান্তি পর্বটি এখানে গদ্যে পদ্যে বর্ণনা করিয়া যুধিষ্ঠিরের কৌতূহল দূর করিলেন। ইহার নাট্যিক সাফল্য সম্বন্ধে যে হরচন্দ্রের নিজেরও সন্দেহ ছিল, তাহা তিনি নিজেই পাদটীকায় এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, 'মহাভারত দৃষ্টে জানা যায় যে ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠিরে যে কথোপকথন হয়, তাহার বহুলাংশই উপাখ্যানঘটিত ও ধর্মসংসৃষ্ট। ঐ উপাখ্যান বর্তমান প্রণালীতে সংক্ষেপে লিখিলেও বাহুল্য হয় ও সর্বসাধারণের মনোরম্য না হইতে পারে এই বিবেচনায় তাহার অনেক পরিত্যাগ করা গেল।' অতএব ইহা আর যাহাই হউক, নাটক নহে। সেক্সপীয়রের একাধিক নাটক অনুবাদ করিয়াও হরচন্দ্র যে নাটকের সাধারণ আঙ্গিক ও প্রাণধর্ম সম্পর্কে কোন জ্ঞানই লাভ করিতে পারেন নাই, ইহা

প্রকৃতই বিস্ময়ের বিষয়। অতএব 'কৌরব বিয়োগ' কাশীরাম দাস রচিত মহাভারতেরই অংশবিশেষের একটি গদ্যরূপমাত্র, নাটক নহে; ইহাতে ঘটনার বর্ণনাকারী আছে, কিন্তু সংঘটনকারী নাই; কাশীরাম দাসের রচনাতেও ইহার বড় ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

ইহাতে কোন নাট্যিক চরিত্র নাই বলিয়াই ইহার কোন নায়ক-নায়িকাও নাই। এখানে যদিও ধৃতরাষ্ট্র নাট্যকাহিনীর সর্বত্রই প্রায় বর্তমান রহিয়াছেন এবং তাঁহার মৃত্যুতেই নাটকের যবনিকাপাত হইয়াছে, তথাপি তিনি এখানে শ্রোতা মাত্র, নাট্যিক কোন ক্রিয়া দ্বারা তিনি নায়কের আসনে অধিরূঢ় হইতে পারেন নাই। নায়িকা বলিতেও ইহাতে কেহ নাই। গান্ধারী ইহার সর্বত্রই আছেন সত্য, কিন্তু তিনি প্রাণহীনা ছায়া-পুত্তলিকা মাত্র—তাঁহার মধ্যে মানবিক চরিত্রের বিকাশ সম্ভব হয় নাই। মহাভারতের নীতিমূলক অংশটিকে গদ্যে পরিবেশন করিবার উদ্দেশ্যেই হরচন্দ্র ইহা রচনা করিয়াছিলেন, কোন নাট্য-রচনার প্রেরণার বশবর্তী হইয়া তাহা করেন নাই।

'কৌরব বিয়োগে'র সর্বাপেক্ষা ত্রুটি ইহার ভাষা। ইহা প্রধানত গদ্যে রচিত হইলেও শেষের দিকে কতকাংশ পয়ার ছন্দযুক্ত পদ্যেও রচিত হইয়াছে। হরচন্দ্রের পূর্ববর্তী রচনা 'ভানুমতী-চিত্তবিলাস' অধিকাংশ পদ্যে রচিত হইয়াছিল, সেইজন্য ইহা সমাদর লাভ করিতে পারে নাই; এইজন্যই যে তিনি ইহাতে গদ্যেরই প্রাধান্য দিয়াছেন, সে কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। সুতরাং গদ্যে লিখিয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে বলিয়াই ইহা গদ্যে রচিত হইয়াছে, অন্য কোন প্রেরণা হইতে ইহা গদ্যে রচিত হয় নাই। বিশেষত প্রচলিত বাংলা গদ্যরীতির সঙ্গেও হরচন্দ্রের বিশেষ পরিচয় ছিল বলিয়া মনে হয় না, কিংবা থাকিলেও তিনি সেই রীতি আদৌ আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহার গদ্য অত্যন্ত আড়ষ্ট এবং নীরস—কোন কোন স্থলে অর্থ দুর্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। ইহা অত্যন্ত সংস্কৃত-ঘেঁষা, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সংস্কৃতের গুণটুকু অপেক্ষা দোষটুকু ইহার মধ্যে অধিকতর প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। একটু দৃষ্টান্ত দিবার লোভ সংবরণ করা কঠিন,—

সঞ্জয়। হে নরপতে, যাঁহারা সম্পত্তিকালে প্রাপ্তবিকার ও বিপত্তিকালে অতিবিষণ্ণ না হন, এবম্প্রকার মহোদয়দিগকে মহাত্মারা মহাপুরুষরূপে বর্ণিয়াছেন। অতএব অভিমুখ সংগ্রামে পতিত বিক্রমবিশারদ বিগত পুত্রাদির শোকে ঈদৃশ বিলাপপর হওয়া সর্বজ্ঞানসম্পন্ন মহারাজের কর্তব্য নহে। আর মরু মান্ধাতা প্রভৃতি মহীপালেরা চতুরঙ্গিনী সেনা ও বলবান্ধবাদি সহিতে কোথায় গিয়াছেন তাহা চিন্তা করিয়া দেখুন, এবং তাঁহাদের বিয়োগের সাক্ষিণী পৃথিবী অদ্যাপি আছেন (১।২)।

বরং তাঁহার পদ্য রচনা ইহা অপেক্ষা কতকটা সরল—

গান্ধারী। ত্রিলোকে নাহিক কর্ম্ম অসাধ্য তোমার।
দেবের আরাধ্য ত্বং হি দেব অবতার॥
পুত্রশোক সম মুনে নাহি মর্ত্ত্যপুরে।
ভুবন পূজিত পুত্র পড়িল সমরে॥
শতেক পুত্রের শোকে বিকল শরীর।
তিলেক বিরাম নহে নয়নের নীর॥
বারেক দেখিব চক্ষে বিগত তনয়।
এই বরদাতা হও মুনি মহাশয়॥ (৫।৭)

নাট্যকার মঞ্চনির্দেশরূপে অনেক সময় 'সর্বেষাং প্রস্থানং' এই প্রকার সংস্কৃত বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত সংস্কৃত নাটকের অনুযায়ী নান্দী ও সূত্রধার দ্বারা তাঁহার নাটকের আরম্ভ হইয়াছে।

ছয় বৎসর পর হরচন্দ্রের তৃতীয় নাটক 'চারুমুখ-চিত্তহরা' প্রকাশিত হয়। ইহা সেক্সপীয়রের প্রসিদ্ধ নাটক 'রোমিও জুলিয়েটে'র বাংলা অনুবাদ, তবে ইহাতেও সংস্কৃত নাটকের অনুযায়ী নান্দী, সূত্রধার ও নর্তকী বা নটী যোগ করা হইয়াছে। ভারতীয় বিষয়-বস্তু লইয়া নাট্যরচনার প্রয়াস যে তাঁহার ব্যর্থ হইয়াছিল, তাহা সম্ভবতঃ অনুভব করিয়াই তিনি পুনরায় অনুবাদ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অবশ্য এই বিষয়ে তিনি ইহার ইংরেজি ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন,

Some time ago, I was desired by a learned friend of mine, who is no more, to "show Romeo and Juliet in an oriental dress"—"rich not gaudy." It was also suggested that it should be rendered in the simplicity and elegance of colloquial language with the view to adapt the same more to the stage than to the study.

এই নাটকের ঘটনা-স্থল নির্দেশ করা হইয়াছে কর্ণাট। ভোজবংশের রাজা মহীশূরের পুত্র চারুমুখ এবং সিন্ধুবংশের রাজা অংশুমানের কন্যা চিত্তহরা যথাক্রমে রোমিও ও জুলিয়েটের স্থান গ্রহণ করিয়াছে। একথা সত্য যে, এই নাটকের ভাষা হরচন্দ্রের পূর্ববর্তী নাটক দুইখানির ভাষা অপেক্ষা অনেক সরল; তবে একথাও স্বীকার্য যে, ইতিমধ্যে দীনবন্ধু তাঁহার নাটকের একশ্রেণীর চরিত্র সম্পর্কে সহজ কথ্যভাষা ব্যবহার করিয়া তাহার প্রতি সাহিত্যরসিক মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। আলালী ভাষাও ইতিপূর্বে সাহিত্যের মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছিল। অতএব ইহাদের দ্বারা হরচন্দ্র স্বভাবতঃই

প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। তাহার ফলেই তাঁহার ভাষার আদর্শ এইভাবে পরিবর্তিত হইয়াছিল, যেমন,—

সূত্রধার। প্রিয়ে। সে কথাটি কি?

নর্ত্তকী। তা আমি তোমাকে বলবো না। তোমার পেটে কথা থাকে না। আমি যে মেয়েমানুষ, তবু কথা চেপে রাখি। তুমি পুরুষ মানুষ হয়েও একটি কথা চেপে রাখতে পার না।

সূত্রধার। প্রিয়ে! তুমি এইবার খালি বল, আমি যেমন করে পারি পেটে রাখবো। আমার দিব্বি, যদি না বল। দেখ, আমি তোমা বই আর কারু নই।

দীনবন্ধুর আদর্শ অনুসরণ করিয়াই গুরুগম্ভীর বিষয় বর্ণনা করিবার কালে হরচন্দ্র ইহাতে সাধুভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তবে তাঁহার এই সাধুভাষা 'কৌরব বিয়োগ' নাটকের ভাষার মত নীরস নহে।

ইহার দশ বৎসর পরে হরচন্দ্র তাঁহার সর্বশেষ নাটক 'রজত-গিরি-নন্দিনী' রচনা করেন। এতদিন পর পুনরায় তাঁহার নাট্যরচনায় এই উৎসাহের কারণ তিনি নিজেই ইহার 'ভূমিকা'য় উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,

পূর্বে এতদ্দেশে সাধারণ নাট্যশালা না থাকায় সুরচিত নাটক গ্রন্থের সৌন্দর্য প্রায় অন্তঃপটে থাকিত। রচনার পারিপাট্যে কেবল বিদ্বান্ লোকেরই অনুরাগ জন্মে। কিন্তু অভিনয় ব্যতীত সর্বসাধারণের আমোদ হয় না। ইদানীং সে অভাব দূর হওয়াতে নাটক রচনার চর্চা বৃদ্ধি হইয়াছে। অতএব এই সুসঙ্গতি হেতু ব্রহ্মদেশীয় এক মনোহর কাব্য আধুনিক নাটকের প্রণালীতে লিখিয়া প্রকাশ করিতেছি। যদি এই অভিনয় নাটকগুণজ্ঞ লোকের মনোরম্য হয়, তবেই আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। তদ্ভিন্ন আর কোন স্বার্থ নাই।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা হয় এবং তাহাতে উৎসাহিত হইয়া খ্যাত ও অখ্যাতনামা বহু নাট্যকার যে অসংখ্য নাটক রচনা করেন, হরচন্দ্র ঘোষের 'রজত-গিরি-নন্দিনী' ইহাদেরই অন্যতম।

নাটকের বিষয়-বস্তুটি হরচন্দ্র একজন ইংরেজ গ্রন্থকার রচিত ব্রহ্মদেশীয় উপাখ্যানমূলক *Silver Hill* নামক পুস্তক হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন. এই কাহিনীটি অবলম্বন করিয়া বাংলা সাহিত্যে আরও পরবর্তী দুইজন নাট্যকার দুইখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাহা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রজত-গিরি' ও ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'কিন্নরী'।

ইতিমধ্যে বাংলা নাট্যসাহিত্য ইহার প্রথম যুগ অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় যুগ বা মধ্যযুগে প্রবেশ করিয়াছে। এই নাটকখানির ভিতর দিয়া হরচন্দ্র বাংলা নাটকের মধ্যযুগোচিত বৈশিষ্ট্যগুলিই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন; ভাষা ও নাটকীয় দৃশ্য পরিকল্পনায় হরচন্দ্রের প্রথম মৌলিক নাটকখানিতে যে ত্রুটি দেখা গিয়াছিল, তাহা যুগোচিত পরিমার্জনা লাভ করিয়াছে, চরিত্র-সৃষ্টিও কতকটা সার্থক হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়

রামনারায়ণ তর্করত্ন

(১৮৫৪—১৮৭৫)

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালীর প্রত্যক্ষ ও বাস্তব জীবনাশ্রিত প্রথম নাটক রচিত হয়, ইহার নাম 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটক এবং ইহার রচয়িতার নাম রামনারায়ণ তর্করত্ন। ইতিপূর্বে বাংলা ভাষায় যে সকল নাটক রচিত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটিই রোমান্টিক বা পৌরাণিক বিষয় মাত্র অবলম্বন করিয়াই রচিত হইয়াছে, সমসাময়িক বাংলার সমাজ-জীবনের বাস্তব রূপ তাহাতে প্রকাশ পাইতে পারে নাই। সুতরাং ইহারা বাংলায় রচিত হইলেও যথার্থ বাঙ্গালীর নাটক হইয়া উঠিতে পারে নাই। বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম নাটক রচিত হইবার মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে এই অভাব পূর্ণ হইয়া গেল, মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর সামাজিক সমস্যা-ভিত্তিক নাটক প্রথম প্রকাশিত হইল। আখ্যায়িকা-কাব্যই হউক কিংবা কথাসাহিত্যই হউক, তখনও আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ইহাদের কাহারও জন্মই হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম আখ্যায়িকা-কাব্য রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'পদ্মিনী উপাখ্যান' ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং প্রথম বাংলা উপন্যাস প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইহাদেরও পূর্বেই রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটকে সাধারণ বাঙ্গালী জীবনের বাস্তব রূপায়ণের প্রয়াস দেখা দিয়াছিল। সুতরাং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রামনারায়ণ তর্করত্নের এবং তাঁহার 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটকের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান রহিয়াছে।[1]

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে চব্বিশ পরগণা জিলার হরিনাভি গ্রামে রামনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই তিনি মাতৃপিতৃহীন হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়ার নিকট সন্তান-স্নেহে লালিত-পালিত হন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর, তিনি গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে কিছুকালের জন্য অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। রামনারায়ণ বাল্য কালেই দেশীয় টোলে ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্রের কিছু বিষয় পাঠ করেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের পরিবারে দেশীয় আবহাওয়ার ভিতরই তিনি মানুষ হইয়া উঠিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি কলিকাতা আসিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট থাকিয়া সংস্কৃত কলেজের একজন মেধাবী ছাত্ররূপে

নানা বৃত্তি লাভ করেন। কর্মজীবনের সূত্রপাতেই তিনি হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদ লাভ করেন। দুই বৎসর পর তিনি কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আটাশ বৎসর কাল গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক রূপে কাজ করিয়া ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

অবসর গ্রহণ করিবার পরও তিনি স্বগ্রামে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া বালকদিগকে সংস্কৃত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি শীঘ্রই দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন এবং ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে পরলোকগমন করিলেন।

রামনারায়ণ ইংরেজি ভাষায় শিক্ষিত ছিলেন না; কিন্তু তাঁহার নাটক পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবের ফলে উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত বাঙ্গালীর সমাজে যে সংস্কারমুক্ত উদার মনোভাবের বিকাশ হইয়াছিল, রামনারায়ণ ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত না হইয়াও তাহার অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত পণ্ডিত হইয়াও সে যুগে বাংলা ভাষার অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা যে কি ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার এক বক্তৃতার নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে। তিনি কলেজের ছাত্রদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন,

> 'তোমরা যেমন মনোযোগ পূর্বক ইংরাজী শিখিবে বাঙ্গালাও সেইরূপ শিক্ষা করিবে, বাঙ্গালার প্রতি কদাচ অনাস্থা করিবে না; বাঙ্গালা এতদ্দেশীয় মাতৃভাষা, সুতরাং মাতৃবৎ এই মাতৃভাষার প্রতি ভক্তি রাখা নিতান্ত আবশ্যক॥'

সেই যুগে বাংলা ভাষা সম্পর্কে এই আন্তরিক উদারতা-বোধ যে কয়জন মাত্র সংস্কৃত পণ্ডিতের মধ্যে দেখা দিয়াছিল, রামনারায়ণ তাঁহাদের অন্যতম। বাংলা ভাষার প্রতি এই অনুরাগবশতই একান্ত আন্তরিকতা লইয়া তিনি আজীবন ইহার সেবা করিয়াছেন, সংস্কৃতের পাণ্ডিত্য তাঁহার সহজাত এই অনুরাগকে বিমূঢ় করিয়া দিতে পারে নাই। বাংলা ভাষার প্রতি তাঁহার যে উদার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, বাংলার সমাজ-জীবনের প্রতিও তিনি সর্বসংস্কার-মুক্ত সেই উদার মনোভাবের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার সমাজ-ভিত্তিক বিভিন্ন বাংলা রচনায় তাহারই পরিচয় পাওয়া যাইবে।

ইংরেজি ভাষায় কিংবা পাশ্চাত্ত্য আদর্শে শিক্ষা লাভ না করিয়াও রামনারায়ণ যে কি ভাবে বাঙ্গালীর পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত উনবিংশ শতাব্দী-সুলভ

উদার মনোভাবের অধিকারী হইয়াছিলেন, সে-কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার রচিত সাহিত্যের ভিতর দিয়া তিনি তাহার কি প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন, এখানে তাহারই আলোচনা করা যাইবে।

রামনারায়ণের প্রথম রচিত প্রবন্ধ পুস্তক 'পতিব্রতোপাখ্যান' ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ তাঁহার 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটক রচনার এক বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হয়। ইহার মধ্য দিয়াই এই দেশের স্ত্রী-সমাজের দুর্গতির প্রতি তাঁহার যে সহানুভূতির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতেই তাঁহার অন্তরের পরিচয়টি অনাবৃত হইয়া পড়িয়াছে; এই মনোভাব অনুসরণ করিয়াই তাঁহার পরবর্তী রচনা 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটকও প্রকাশিত হয়। সুতরাং যদিও এই কথা সত্য যে, 'পতিব্রতোপাখ্যান' রংপুরের জমিদার কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় কর্তৃক বিজ্ঞাপিত প্রতিযোগিতামূলক বিষয় অবলম্বন করিয়া রচিত, তথাপি এই বিষয়ের প্রতি রামনারায়ণের যদি আন্তরিক সহানুভূতি না থাকিত, তাহা হইলে ইহার রচনা এমন শক্তিশালী হইতে পারিত না। বহু রচনার মধ্যে রামনারায়ণের রচনাই যে কেন শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইল, 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটকের স্ত্রী-চরিত্রগুলি যখন আমরা বিশ্লেষণ করিব, তখন তাহা আরও স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিব। রামনারায়ণের প্রধান গুণ ছিল এই যে, তিনি কেবলমাত্র পণ্ডিত ছিলেন না, তিনি হৃদয়বান্ ব্যক্তি ছিলেন। এই হৃদয়ের অনুভূতি দিয়াই তিনি এই দেশের অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন স্ত্রী-সমাজের দুঃখ-দুর্দশার বেদনা নিজের অন্তর দিয়া অনুভব করিয়াছিলেন এবং সেইজন্যই তাঁহার 'পতিব্রতোপাখ্যান' প্রবন্ধ-গ্রন্থই হউক, কিংবা তাঁহার 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাট্যরচনাই হউক, ইহাদের উভয়ের মধ্যে স্ত্রী-চরিত্রের দুঃখ-দুর্দশার অনুভূতি জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই গুণেই তাঁহার নাট্যরচনা তাঁহার প্রবন্ধ-রচনা হইতেও যে সার্থক হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা, বিধবা-বিবাহ, স্ত্রীজাতির উন্নতি-সম্পর্কিত এই শ্রেণীর বিবিধ প্রয়াস সেই যুগের অনুভূতিশীল ব্যক্তিমাত্রেরই মনের উপর গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। রামনারায়ণ তাহারই বশবর্তী হইয়া প্রবন্ধপুস্তক ও নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার আলোচ্য বিষয়-বস্তুর সঙ্গে তাঁহার অন্তরের সুনিবিড় যোগ স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার রচনা কৃত্রিম হইয়া উঠিতে পারে নাই, বরং তাহার পরিবর্তে অনেক স্থলেই মর্মস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু প্রবন্ধের রূপ কতকটা কৃত্রিম, প্রত্যক্ষ মনোভাব অনেক

সময় ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশ করিবার অন্তরায় সৃষ্টি হয়; নাটকের মধ্যে বাস্তব চরিত্র সৃষ্টি করিয়া তাহার মাধ্যমে লেখকের মনোভাবের অভিব্যক্তি অনেক সময় প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে পারে, সেইজন্য প্রবন্ধের গ্রন্থ অপেক্ষা রামনারায়ণের নাটক কয়খানি শক্তিশালী রচনা।' দুইখানি প্রবন্ধপুস্তক (তন্মধ্যে একখানি তাঁহার বক্তৃতা-সংগ্রহ) প্রকাশিত হইবার পর ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রামনারায়ণ তাঁহার প্রথম নাটক 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' রচনা করেন। ইহাও রংপুরের জমিদার কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় কর্তৃক ঘোষিত পুরস্কার-প্রাপ্ত রচনা, কিন্তু একথা সত্য যে, এই বিষয়ের প্রতি লেখকের সহানুভূতি ও এই বিষয়ে তাঁহার প্রত্যক্ষ ও ব্যাপক অভিজ্ঞতা না থাকিলে যেমন তাঁহার রচনার পুরস্কার-প্রাপ্তির যোগ্যতাও হইত না, তেমনই ইহা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও কোন স্থায়ী কীর্তি রাখিয়া যাইতে পারিত না। (রামনারায়ণের 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটক পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, এই কুপ্রথার প্রতি তাঁহার ঘৃণা যেমন দুর্বার হইয়া উঠিয়াছিল, তেমনই যে সমাজের মধ্যে এই কুপ্রথা প্রচলিত ছিল, সেই সমাজ সম্পর্কেও তাঁহার অভিজ্ঞতা তেমনই ব্যাপক ছিল। সুতরাং 'পতিব্রতোপাখ্যানের'ও লেখক কুলীন-কন্যাদিগের দুঃসহ দুঃখ-বেদনায় বিগলিত-চিত্ত হইয়া তাঁহার অনুভূত বেদনার কথা লেখনীমুখে প্রকাশ করিবেন, ইহা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিকই হইয়াছে। রামনারায়ণ যদিও ব্যাকরণ এবং অলঙ্কার-শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন, তথাপি তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভা নাট্যকারেরই প্রতিভা। সেইজন্য 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটক রচনার ভিতর দিয়া তিনি নিজের প্রতিভার যে সন্ধান পাইলেন, তারপর হইতে তিনি প্রধানত সেই পথই অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। 'কুলীন কুল-সর্বস্বে'র পর তিনি ক্রমান্বয়ে আরও ১০।১১ খানি নাটক ও প্রহসন রচনা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে সংস্কৃত নাটকের অনুবাদগুলির কথা বাদ দিলেও, যে কয়খানি মৌলিক নাটকও তিনি রচনা করিয়াছেন, তাহাই নাট্যকাররূপে তাঁহার পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। তিনি বিদগ্ধ সমাজে সেদিন 'নাটুকে রামনারায়ণ' বলিয়াই পরিচিত হইলেন, তাঁহার অন্য সকল খ্যাতি একমাত্র তাঁহার নাট্যরচনার মধ্যেই প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে এদেশে একমাত্র ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই যে দেশের সামাজিক কুপ্রথাগুলি দূর করিবার জন্য দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই আকস্মিক ভাবে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা নহে—সেযুগে যদি এদেশে

ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তিত না-ও হইত, তথাপি উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক আন্দোলনের ফলে যে সকল কুপ্রথা দূর হইয়াছিল, তাহারাও অনতিকালের মধ্যেই আপনা হইতেই লুপ্ত হইয়া যাইত। কারণ, ইংরেজি শিক্ষার প্রত্যক্ষ প্রভাবের ক্ষেত্রের বাহিরেও এদেশের সাধারণ জনগণের মধ্যেও ইহাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল। যদি তাহা না হইত, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষার প্রভাব যত শক্তিশালীই হউক, তাহা এদেশবাসীর এত ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করিতে পারিত না। সমাজ যে সকল প্রথার ত্রুটি অন্তরে অন্তরে পূর্ব হইতেই অনুভব করিয়া তাহাদিগকে বিসর্জন দিবার জন্য আপনা হইতেই সে-যুগে উদ্যত হইয়াছিল, উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক আন্দোলনের ফলে তাহাই পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন বিধবা-বিবাহ; ইহা প্রবর্তন করিবার দাবী সমগ্রভাবে সমাজের মধ্য হইতে আসে নাই, ব্যক্তিগতভাবে এবং প্রধানত একজন মাত্র সমাজ-সংস্কারকের মনেই উদিত হইয়াছিল; সেইজন্য ইহা বিধিবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সমগ্রভাবে সমাজ আজ পর্যন্ত ইহা গ্রহণ করিতে পারে নাই। কিন্তু কুলীনের বহুবিবাহের দোষত্রুটির বিষয়-সম্পর্কে সমাজ ইতিমধ্যেই সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল; বল্লালের আমল হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া ইহা সমাজের একটি অংশকে কি প্রকার বিষক্ষতে পরিণত করিয়া দিয়াছিল, তাহা অনুভব করিতে কাহারও বাকি ছিল না। সেইজন্য কোন প্রকার আইনের সহায়তা ব্যতীতও সেদিন ইহা সমাজ-দেহ হইতে দূর হইয়া গিয়াছিল। 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটকের রচয়িতা এবং পৃষ্ঠপোষক কেহই ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত কিংবা ইংরেজি জীবনাদর্শে দীক্ষিত ছিলেন না। তথাপি এই নাটকের বর্ণনা ও ভাষায় নাট্যকারের যে ক্রোধ ও ব্যঙ্গ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা কেবলমাত্র পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবেরই ফল মাত্র, এমন কথা বলিতে পারা যায় না। সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীতে উত্তীর্ণ হইয়া আমরা একদিক দিয়া যেমন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবের ফলটুকু লাভ করিয়াছিলাম, আবার আর এক দিক দিয়া তেমনই সুদীর্ঘকালব্যাপী কুসংস্কারের প্রতি অন্ধতার বিষক্রিয়ার ফল ভোগ করিতেছিলাম। এই দুইয়ের সমন্বয় হইয়াছিল বলিয়াই উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর সকল সমাজ-সংস্কারমূলক কর্মসাধনার মধ্যে এত শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল। ইহা কেবলমাত্র পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত-সমাজাশ্রয়ী হইলে ইহার এত শক্তি থাকিতে পারিত না।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে কুলীনের বহুবিবাহ প্রথার উপর এই দুই দিক হইতেই আঘাত আসিয়াছিল, দুইটি আঘাতেরই শক্তি সমান ছিল। একদিকের আঘাতের তাড়নায় রামনারায়ণ তাঁহার 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটকের রূপ দিয়াছিলেন, আর একদিকের আঘাতের ফলে সেদিন ইহার অভিনয় পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত সমাজে বার বার অভিনন্দিত হইয়াছে। এই জন্যই বাঙ্গালীর পরবর্তী নাট্যকারদিগের মধ্যে ইহার সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

ইহা সত্ত্বেও 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটক রচনার মুখ্য একটি কারণ উপস্থিত হইয়াছিল। সে কথা পূর্বে একবার উল্লেখ করিয়াছি, এখানে আরও স্পষ্ট করিয়া বলি। তাহা এই—রংপুরের জমিদার কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে 'সম্বাদ ভাস্কর', 'রঙ্গপুর বার্তাবহ' প্রভৃতি পত্রিকায় নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি প্রচার করেন, ইহা হইতেই ইহার উদ্দেশ্যের কথা বুঝিতে পারা যাইবে—

পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক

এই বিজ্ঞাপন পত্রদ্বারা সর্বসাধারণ কৃতবিদ্য মহোদয়গণকে বিজ্ঞাত করা যাইতেছে, যিনি সুললিত গৌড়ীয় ভাষায় ছয় মাস মধ্যে 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নামক একখানি মনোহর নাটক রচনা করিয়া রচকগণ মধ্যে সর্বোৎকৃষ্টতা দর্শাইতে পারিবেন, তাঁহাকে সঙ্কল্পিত ৫০ পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক প্রদান করা যাইবেক।'

মুখ্যত এই বিজ্ঞাপন দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই রামনারায়ণ তাঁহার 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটক রচনা করেন এবং যথাসময়ে বিজ্ঞাপিত পুরস্কার লাভ করেন। এই নাটকের মধ্য দিয়া তিনি অনাচারী কুলীন সমাজের হৃদয়হীনতার যে চিত্র পরিবেশন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অন্তরের একান্ত অনুভূতিজাত, কেবলমাত্র গতানুগতিক নহে। এই বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতাও সক্রিয় ছিল। সেইজন্যই ইহার রচনায় যথার্থ শক্তির প্রকাশ দেখা যায়।

কুলীন ব্রাহ্মণ কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায় বন্দ্যঘটীয় কেশব চক্রবর্তীর বংশধর, সেইজন্য সমাজে তাঁহার বিশেষ একটি সম্মানিত স্থান আছে। তাঁহার বৈষয়িক অবস্থা বেশ সচ্ছল, কোন বিষয়ের জন্য কাহারও মুখাপেক্ষী হইতে হয় না। তাঁহার চারিটি কন্যা, অনুরূপ বংশের পাত্রের অভাবে একটিরও এ পর্যন্ত তিনি বিবাহ দিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাহাদের বয়স যথাক্রমে ৩২, ২৬, ১৫ ও ৮। বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে বলিয়া কুলপালক সমাজের নিন্দাভাজন হইয়াছেন;

কিন্তু ইহার কোন উপায় করিতে পারিতেছেন না; দুশ্চিন্তায় তাঁহার দিনের আহার ও রাত্রির নিদ্রা দূর হইয়াছে। অনৃতাচার্য এবং শুভাচার্য নামক দুই ঘটককে পাত্রের সন্ধান করিবার জন্য নিয়োজিত করিয়া তাহাদের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় তিনি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছেন। অনৃতাচার্য ধূর্ত, শঠ ও প্রবঞ্চক, ধর্মবোধ-বিরহিত, অর্থাৎ সাধারণ ঘটক যেমন হইয়া থাকে, তাহাই। সে কপটতা করিয়া 'সাবর্ণ গৃহে কত শত কৈবর্ত কন্যা,' 'শুদ্ধ শ্রোত্রিয় বরে ক্ষত্রিয় কন্যা', বিষ্ণু ঠাকুরের বংশে বৈষ্ণব কন্যা' ইত্যাদির বিবাহ ঘটাইয়াছে। 'আর কানা খোঁড়া অন্ধ আতুর এ সমস্ত ত তাহার শরীরের আভরণ'। কিন্তু শুভাচার্য এই প্রকৃতির ব্যক্তি নহে—তাহার কিছু বিদ্যা, বুদ্ধি ও দায়িত্ব-জ্ঞান ছিল; কিন্তু সে কোন বিবাহ স্থির করিতে পারিল না। অনৃতাচার্য কুলপালকের চারিটি কন্যার জন্য একটি পাত্র স্থির করিয়া ফিরিয়া আসিল। পাত্রের বয়স ষাট বৎসর। কুলপালক অগত্যা তাহার নির্দেশে তাঁহার চারি কন্যাকেই ইহার হস্তে সমর্পণ করিয়া কুলরক্ষা করিবার প্রয়াসী হইলেন। বিলম্ব হইলে বরের 'গুণ' প্রকাশ পাইয়া যাইবে, সেইজন্য অনৃতাচার্য সেইদিনই বিবাহের দিন ধার্য করিলেন—কুলপালককেও উদ্‌যোগ আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিবার পরামর্শ দিলেন। সেদিন বিবাহের কোন তারিখও ছিল না, তথাপি অনৃতাচার্য নিরস্ত হইবার পাত্র নহে—সেইদিনই বিবাহের দিন ধার্য হইল।

কুলপালকের স্ত্রী বিবাহের উদ্‌যোগ আয়োজন করিতে লাগিলেন। এতদিন পর বহু সন্ধানের ফলে তাঁহার কন্যাদিগের পাত্র জুটিয়াছে জানিয়া তাঁহার আনন্দের আর সীমা রহিল না। জামাতার সঙ্গে তিনি কি ব্যবহার করিবেন, কি ঔষধ প্রয়োগ করিবেন, এই সকল কথাও ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু কন্যাদিগকে তখনও তিনি এই আনন্দ-সংবাদ জানাইতে পারেন নাই, প্রথম সে কাজই করা কর্তব্য বলিয়া মনে করিলেন। তিনি গৃহের বাহির হইয়া চারি কন্যার নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন। কনিষ্ঠা কন্যা কিশোরী ব্যতীত সকলে আসিয়া উপস্থিত হইল। জননী তাহাদিগকে বলিলেন, 'ওগো তোদের "বে" হ'বে গো, "বে" হ'বে।'

শুনিয়া জ্যেষ্ঠা কন্যা জাহ্নবী বলিল, 'আর কেন? এইবার যমের সঙ্গে মিলন হইলেই মানায়। বুড়ো বয়সে এই ধেড়ে রোগ কেন?' তাহার কনিষ্ঠা শাম্ভবী বলিল, 'আমরা কুলীনের মেয়ে, আমাদের আবার বিবাহ কোথায়?'

পঞ্চদশ বর্ষীয়া কন্যা কামিনী উৎসুক হইয়া উঠিল, বলিল, 'শুনিয়া এ' শুভ কথা হয়েছি চঞ্চল।' 'বর যেমনই হউক, বিবাহ হইলেই হইল।' সর্বকনিষ্ঠা কিশোরী তখন পাড়ায় সঙ্গিনীদিগের সঙ্গে লুকোচুরি খেলিতে গিয়াছিল। অনেক ডাকাডাকির পর সে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে যখন জননী বলিলেন, তাহার বিবাহ হইবে, সে আকাশ হইতে পড়িল। জিজ্ঞাসা করিল, 'বে আবার কি? ওটা কি খাবার জিনিস?' জননী সকল কথা বুঝাইয়া দিলেন। কিশোরী কিছু বুঝিল, কিছু বুঝিল না। ব্রাহ্মণী এইবার প্রতিবেশীদিগকে সংবাদ দিবার জন্য বাহির হইলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহারা আসিয়া কুলপালকের গৃহে সমবেত হইল। বিবাহের কথা শুনিয়া তাহারা নিজেদের বিবাহিত জীবনের দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করিল, তারপর সকলে 'জল সইতে' বাহির হইয়া গেল। যথা সময়ে শুভকার্য নির্বাহ করাইবার জন্য কুলপালকের কুলপুরোহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সহকারী রূপে তাঁহার একটি ছাত্রকেও লইয়া আসিলেন। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণও আসিয়া যথাসময়ে উপস্থিত হইলেন।

এতক্ষণ জ্যেষ্ঠা কন্যা জাহ্নবী ও তৎকনিষ্ঠা শাম্ভবী কল্পনাও করিতে পারে নাই যে তাহাদের যথার্থই বিবাহ হইবে। কারণ, জননী এই প্রকার বহু মিথ্যা প্রবোধ তাহাদিগকে ইতিপূর্বেও দিয়াছেন। কিন্তু এখন উদযোগ আয়োজন দেখিয়া সত্য সত্যই মনে করিল, বিবাহ হইলেও হইতে পারে। জাহ্নবী তাহার বিগত যৌবনের জন্য অনুতাপ করিতে লাগিল। শাম্ভবী ভাবিল, 'হউক না, দেখা যাউক।' কামিনী ও কিশোরী বর আসিয়াছে শুনিয়া ছুটিয়া দেখিতে গেল। তাহারা মুখ কালো করিয়া ফিরিয়া আসিল, বড়দি ও মেজদির নিকট বরের রূপ বর্ণনা করিল,—'প্রবীণ বয়স শীর্ণজীর্ণ কলেবর।' কামিনী বলিল, 'একমাত্র বড়দির সঙ্গে মানাইলেও মানাইতে পারে।' শাম্ভবী বলিল,'পিতার নিকট গিয়া ইহার প্রতিবাদ করিব'। কিন্তু সকলে বুঝিল, প্রতিবাদ করিয়া কোন ফল হইবে না। বিবাহ-সভায় সকলেই দেখিতে পাইল, বর যে কেবলমাত্র বয়সে প্রবীণ, তাহাই নহে, অত্যন্ত কদাকার, অকাট মূর্খ, কাণা ও বধির। কুলপালক তাহার হস্তেই চারিটি কন্যাকে সমর্পণ করিয়া কুলরক্ষা করিলেন। অনৃতাচার্য তাহার পারিশ্রমিক গুণিয়া লইল।

'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটকের প্রধান ত্রুটি এই, ইহার কাহিনীর মধ্যে বিচিত্র নাটকীয় উপকরণ থাকা সত্ত্বেও নাট্যকার তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন

নাই—নাটকীয় কোন ঘটনা বা dramatic action-এর ভিতর দিয়া বক্তব্য বিষয়ই হউক, কিংবা জীবন-দর্শনই হউক, তাহা প্রকাশ পায় নাই, বরং তাহার পরিবর্তে কেবল মাত্র বক্তৃতার ভিতর দিয়াই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। উপরে নাটকের যে মূল কাহিনী বর্ণনা করা হইল, তাহার অতিরিক্ত ইহার মধ্যে কয়েকটি শাখা-কাহিনী(episode)ও আছে। ইহাদের অন্তত একটির মধ্যে উচ্চাঙ্গের নাটকীয় গুণ ছিল, তাহা ফুলকুমারীর বৃত্তান্ত। ফুলকুমারী বিবাহিতা কুলীন-কন্যা, বিবাহের পর হইতে সে যথারীতি পিত্রালয়েই বাস করিতেছে, বহুপত্নীক স্বামী কদাচ তাহার সংবাদ লইবার সুযোগ পান না। একদিন অর্থের প্রয়োজনে জামাতা শ্বশুর-গৃহে আসিয়া উদয় হইলেন। সেই একদিনের ঘটনা একটি নাটকীয় দৃশ্যের ভিতর দিয়া যদি ঘটনার আকারে পরিবেশন করা যাইত, তবে ইহা এই নাটকের একটি বিশিষ্ট গুণ হইতে পারিত।✓ কারণ, ইহার মধ্য দিয়া দুইটি স্বার্থের একটি নাটকীয় দ্বন্দ্ব প্রকাশ পাইয়াছে। পিশাচ-প্রকৃতির কুলীন স্বামীর অর্থলোলুপতার সঙ্গে এখানে ফুলকুমারীর নারী হৃদয়ের স্বাভাবিক সুকুমার বৃত্তিগুলির সংঘাত বৃত্তান্তটিকে উচ্চাঙ্গ নাটকীয় গুণান্বিত করিয়াছে। কিন্তু নাট্যকার সমগ্র বিষয়টি কেবলমাত্র ফুলকুমারীর ভাষণের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন; যাহা ঘটনার ভিতর দিয়া প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে পারিত, তাহা কেবলমাত্র পরোক্ষ মৌখিক বর্ণনার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিবার ফলে ইহার একটি উচ্চাঙ্গের নাটকীয় সম্ভাবনা বিনষ্ট হইয়াছে। অথচ বর্ণনাটির মধ্য দিয়া নাট্যকার বঞ্চিতা নারীর মর্মবেদনাটিকে যে গভীর ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা সচরাচর বাংলা নাট্যকারদিগের মধ্যে আজিও দেখিতে পাওয়া যায় না। ঘটনা-বর্ণনা নাটক নহে, ঘটনা-সংঘটনই যে নাটক রামনারায়ণ পাশ্চাত্য নাটকের এই আদর্শটির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না, সেইজন্য তিনি সংস্কৃত নাটকের অনুযায়ী বর্ণনার উপরই অধিক নির্ভর করিয়াছেন।

'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটকের মধ্যে কাহিনী দৃঢ়-সংবদ্ধতা লাভ করিতে পারে নাই, ইহা প্রধানত কতকগুলি পরস্পর শিথিলবদ্ধ চিত্র ও চরিত্রের সমবায়ে রচিত হইয়াছে। ইহার সকল চরিত্রই যে নাটকের পক্ষে অপরিহার্য এমন নহে, কুলীন সমাজের বিচিত্র রূপ প্রত্যক্ষ করাইবার জন্য মূল-কাহিনী-নিরপেক্ষ কতকগুলি চিত্র ও চরিত্র আনিয়া ইহাতে সংযুক্ত করা হইয়াছে। ইহাতে নাট্যকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়তা হইলেও তাঁহার রচনায় নাট্যগুণ অনেকাংশে

প্রত্যক্ষ সমাজ-জীবনের বিশিষ্ট পরিচয় ইহাদের অধিকাংশের মধ্যেই প্রকাশ পাইত না। আধুনিক কালেও রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটক প্রকাশিত হইবার পূর্বে বাংলায় যে সকল রচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই সংস্কৃত কাব্য-নাটকের অনুবাদ বা অনুকরণ, কিংবা একান্ত রোমান্টিক-ধর্মী রচনা। কেবলমাত্র ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় কিছু কিছু বাস্তবানুগত্য দেখা দিয়াছিল; কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত খণ্ড বস্তুকে বিদ্রূপের বাণে বিদ্ধ করিয়াছেন —বৃহত্তর জীবনের গভীরতর বিষয় তাঁহার লক্ষ্য হইতে পারে নাই; খণ্ড বস্তুর রস-সন্ধানের প্রয়াস সেখানে থাকিলেও গভীরতর জীবন-বেদ তাহাতে ছিল না। রামনারায়ণের নাটক ব্যাপক বাস্তব জীবনাশ্রয়ী, কেবলমাত্র জীবনের বহিরূপকরণের ভিত্তির উপরই রচিত নহে। সুতরাং এই শ্রেণীর রচনা কেবলমাত্র আধুনিক বাংলা সাহিত্যেই নহে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও ছিল না। জীবনের গভীরতর সমস্যা সন্ধান করিবার দৃষ্টি যে আমরা ইংরেজি শিক্ষার ফলেই লাভ করিয়াছি, তাহা নহে—তাহা পুথিলব্ধ জ্ঞান-নিরপেক্ষ; নিরক্ষর কবির রচিত মৌখিক সাহিত্য হইতেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। রামনারায়ণও এই বিষয়ে তাঁহার সহজাত প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, পুথিলব্ধ জ্ঞানের পরিচয় মাত্র দেন নাই।

সংস্কৃত কাব্য-নাটকে সাধারণ জীবনের কথা স্থান পায় নাই, তাহাতে শাশ্বত মানবিক বৃত্তির বিকাশ অনেক সময় সার্থক হইলেও, তাহা নিতান্ত পরিচিত জীবনের মধ্য হইতে উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। রামনারায়ণ বাংলা ভাষার ভিতর দিয়া সে কার্য সহজভাবেই সম্ভব করিয়া তুলিয়াছেন। বাঙ্গালীর সাধারণ জীবন, তাহার সমাজ-জীবনের বিচিত্র সমস্যা ইত্যাদি দ্বারা যে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে, তাহা তাহার পরিমিত শক্তির ভিতর দিয়াও তিনি প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটকে সাধারণ বাঙ্গালীর যে জীবন ও তাহার সমস্যা রূপায়িত হইয়াছে, তাহা পরবর্তী কালে বাংলা সাহিত্যের মধ্য দিয়া নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, এমন কি শরৎচন্দ্রের 'বামুনের মেয়ে'র ভিতর দিয়া বিংশ [illegible] পর্যন্ত তাহা উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছে; কিন্তু রামনারায়ণ হইতেই যে তাহার সূচনা হইয়াছিল, তাহা আমরা বিস্মৃত হইতে পারি না।'

প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত 'আলালের ঘরের দুলাল' কথ্য ভাষায় রচিত প্রথম বাংলা গ্রন্থ বলিয়াই সাধারণত গৃহীত হইয়া থাকে।

'আলালের ঘরের দুলাল' ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, কিন্তু তাহারও চারি বৎসর পূর্বে রামনারায়ণই সর্বপ্রথম তাঁহার 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটকে বাংলা সাহিত্যে কথ্যভাষার ব্যাপক ব্যবহারের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। রামনারায়ণের সম্মুখে এই বিষয়ে সে দিন কোনও আদর্শ ছিল না। বাংলা গদ্যে পণ্ডিতি বাংলার তখন অপ্রতিহত প্রভাব। সেই প্রভাবকে সে দিন কেহই অস্বীকার করিতে পারেন নাই, এমন কি, আলালী ভাষার ভিতর দিয়া পরবর্তী কালের বাংলা কথ্য ভাষা সম্পর্কে যে সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেখা গিয়াছিল, রামনারায়ণ তাহারও সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। বিশেষত রামনারায়ণ সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার পক্ষে সংস্কৃত ভাষার প্রতি আনুগত্য দেখাইবার সঙ্গত কারণও ছিল। কিন্তু রামনারায়ণ কোন বিষয়েই রক্ষণশীল-মনোভাব-সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন না। এক মুক্ত এবং উদার দৃষ্টি লইয়া যেমন তিনি সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং সহানুভূতি লইয়া যেমন তিনি স্বাধীন চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনই বাংলা ভাষা সম্পর্কেও তিনি একটি উদার মনোভাব পোষণ করিতেন। বাংলা কথ্যভাষার যে একটি যথার্থ সম্ভাবনা আছে, পণ্ডিতি বাংলা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের জীবনাচরণের মতই যে কৃত্রিম হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা তিনি অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। সেইজন্য সামান্য একটি নিরক্ষর ভৃত্যের চরিত্র যথাযথ রূপায়িত করিবার জন্য তাহার ভাষা তিনি পরিত্যাগ করেন নাই। সাধারণত প্রাকৃত বা জনসাধারণের ভাষা সম্পর্কে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের যে অবহেলা ও উপেক্ষার ভাব দেখা যায়, রামনারায়ণের মধ্যে তাহা ছিল না। তাহা হইলে এই নাটক রচনা আনুপূর্বিক ব্যর্থ হইত। তিনি নিরক্ষর ভৃত্যের রূপটি যেমন তাহার নিজস্ব ভাষার ভিতর দিয়াও লক্ষ্য করিয়াছেন, তেমনই সমাজ-জীবনের ভাষার বিভিন্ন স্তরের স্ত্রীচরিত্রগুলির বিচিত্র প্রকৃতি তিনি তাহাদের ব্যবহৃত ভাষার ভিতর দিয়াও উদ্ধার করিয়াছেন। বাংলা কথ্যভাষার যে একটি সাহিত্যিক সম্ভাবনা আছে, ইহার শক্তি কৃত্রিম সাধুভাষা হইতে যে অল্প নহে, সে দিন এই বিষয়টি উপলব্ধি করিবার মধ্যে রামনারায়ণের এক সুগভীর ও দূরদৃষ্টির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। আজ বাংলা কথ্যভাষা যে মর্যাদায়ই প্রতিষ্ঠিত হউক, যাঁহার স্বপ্নের মধ্যে ইহার এই সম্ভাবনা সর্বপ্রথম জাগ্রত

হইয়াছিল, তাঁহার কথা আমরা কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারি না। 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটকের প্রভাব বশত ইহার পরবর্তী কাল হইতে নাটকীয় সংলাপে কথ্যভাষা ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ করে। মাইকেল মধুসূদন দত্তই হউন, কিংবা দীনবন্ধু মিত্রই হউন, ইহারা সকলেই যে এই বিষয়ে রামনারায়ণের প্রবর্তিত পথই অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে যে এ দেশে নাটকের সূত্রপাত হইয়াছিল, সে কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু এই সকল নাটকের অধিকাংশই ছিল অনুবাদ এবং অবশিষ্টাংশ ছিল সংস্কৃত এবং পৌরাণিক আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া রচিত। 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটক রচিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য-জীবন-ভিত্তিক মৌলিক নাটক ছিল না, সেই জন্য তাহার অভিনয়ের কথাও আসিতে পারে না। 'ভদ্রার্জুন' এবং 'কীর্তিবিলাস' নামক দুইখানি নাটক ইতিপূর্বে রচিত হইয়াছিল, তাহাদের একখানি পৌরাণিক, একখানি রোমান্টিক—ইহাদের কোথাও অভিনয় হয় নাই। 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটকই প্রথম অভিনীত বাংলা মৌলিক নাটক। ইহার অভিনয় সম্পর্কিত বিস্তৃত বিবরণ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' গ্রন্থে (৩য় সং, পৃ ৩৬-৪০) পাওয়া যায়। এখানে তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যায়।

১৮৫৭ সনের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে কলিকাতায় 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। জয়রাম বসাক কলিকাতায় চড়কডাঙ্গা স্ট্রীটে তাহার নিজ বাটীতে একটি রঙ্গালয় স্থাপন করিয়া ইহাতে এই নাটকের প্রথম অভিনয় করান। এই বিষয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্তের আজন্ম সুহৃদ্ গৌরদাস বসাক তাঁহার স্মৃতিকথায় লিখিয়াছেন,—

'The credit of organizing the first Bengali Theatre belongs to the late Babu Jayram Bysack of Churruckdanga Street, Calcutta, who formed and drilled a Bengali dramatic corps and set up a stage in his house on which was performed, in March 1857, the sensational Bengali play of *Kulin Kula Sarvasva*.

ইহার অভিনয় অল্পদিনের মধ্যেই জয়রাম বসাকের বাটীতেই আরও একবার এবং গদাধর শেঠের বাড়ীতে একবার অনুষ্ঠিত হয়। গদাধর শেঠের বাড়ীর অভিনয় এই নাটকের তৃতীয় অভিনয়; ইহার এক বিস্তৃত বৃত্তান্ত 'সংবাদ

প্রভাকর' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, 'বড় বাজারস্থিত এই রঙ্গভূমি প্রায় ছয় সাতশত লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, তন্মধ্যে শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীমোহন মিত্র প্রভৃতি অনেকানেক মহোদয়গণ আগমন করিয়া সভামণ্ডপ শোভিত করিয়াছিলেন। অভিনয় প্রক্রিয়া যে কত দূর সুন্দর হইয়াছিল, তাহা লেখনী সম্যক্ রূপে প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে······পূর্বে শ্রীযুক্ত রামজয় বসাকের বাটীতে এই 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নামক নাটকের আর দুইবার অভিনয় হয়, কিন্তু উপরোক্ত দিবসে যে অভিনয় হইয়াছিল, তাহা পূর্বাপেক্ষা সমধিকতর উৎকৃষ্ট।'

অতঃপর কলিকাতার বাহিরে চুঁচুড়ায় নরোত্তম পালের বাড়ীতে এই নাটকের চতুর্থ অভিনয় হয়। ইহারও বিস্তৃত বিবরণ 'সংবাদ-প্রভাকরে' প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, 'এই উপলক্ষে প্রায় নয় শত দর্শক সমুপস্থিত হইয়া সভাকে শোভায়মান করিয়াছিলেন, যেরূপে অভিনয় প্রদর্শনের কার্য নিষ্পাদিত হইয়াছিল, তদ্দর্শনে দর্শক মাত্রেই আমোদী হইয়াছিলেন এবং নটগণের অঙ্গ-ভঙ্গী ও বাক্য-কৌশল দর্শন ও শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন।' এই অভিনয়ের পর হইতে চুঁচুড়ায় 'নাটকের নটীর গান হাটে বাজারে গীত হইতে লাগিল।'

কিন্তু স্থানীয় কুলীন সমাজের মধ্যে এই নাটকের অভিনয় বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিল। ১৮৫৮ সনের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়—

The acting of the Koolin Koolo-Shurboshwo Natack at Chinsurah has, it appears, given great offence to the Koolins of the locality...The acting took place in the house of a gentleman of the Banya caste, and the Koolin Brahmins intend, it is said, to retaliate in kind.

● 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটক বাংলার তদানীন্তন একটি সামাজিক কুপ্রথা দূর করিবার উদ্দেশ্যে রচিত হইলেও, ইহা প্রধানত ব্যঙ্গাত্মক রচনা নহে, বরং ইহার মধ্যে যে রস প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহা হাস্যরস। ঈশ্বর গুপ্তের ভিতর দিয়া আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গাত্মক রচনার সর্বপ্রথম সূত্রপাত হইলেও, রামনারায়ণের মধ্যে ইহার প্রভাব সামগ্রিক ভাবে কার্যকর হইয়া উঠিতে পারে নাই। রামনারায়ণের সাহিত্য-চেতনা প্রধানত সংস্কৃত কাব্য-

নাটক ও অলঙ্কার শাস্ত্রের রসপুষ্ট। অলঙ্কারশাস্ত্রে শ্লেষ নামক অলঙ্কারের স্থান থাকিলেও সংস্কৃত সাহিত্যে যেমন ইহার ব্যাপক অনুশীলন হয় নাই, ইংরেজি satire বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার সঙ্গে ইহার উদ্দেশ্য অভিন্ন হইলেও তাহার মত ইহা এত শক্তিশালী নহে। সুপ্রতিষ্ঠিত কোন ব্যবস্থাকে আঘাত করা শ্লেষ বা ব্যঙ্গের উদ্দেশ্য, কিন্তু যে ব্যবস্থায় ইতিপূর্বেই ভাঙ্গন ধরিয়াছিল, যাহার প্রতি সমাজের কোনও স্তরেরই কোনপ্রকার সহানুভূতিরই অস্তিত্ব ছিল না, লঘু কৌতুকের মধ্য দিয়াই তাহার পরিচয় প্রকাশ করা স্বাভাবিক; কারণ, সমগ্র বিষয়টিই তখন জাতির কৌতুকের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, ইহার মধ্যে আর কোন গুরুত্বই ছিল না। অথচ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে আঘাত করিয়াই ব্যঙ্গ। রামনারায়ণ হাস্যরসের ভিত্তিতেই তাঁহার বিষয়টি পরিবেশন করিয়াছেন, বিষয়টির উপর একটি অনাবশ্যক গুরুত্ব আরোপ করিয়া ইহাকে লইয়া একান্ত শ্লেষ কিংবা ব্যঙ্গের বিষয় করিয়া তুলেন নাই। পুরোহিতের মূর্খতা, ব্রাহ্মণের দারিদ্র্য ও তজ্জাত লোভ, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কৃত্রিম জীবনাচরণ, ঘটকের শঠতা এই সকল বিষয় জাতির ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়াই এই নাটকের মধ্যে আসিয়াছে, রামনারায়ণ ইহাদের মধ্যে তাঁহার ব্যক্তিগত মত দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়া কোন বিশেষত্ব দান করেন নাই। এই সকল বিষয় চিরদিনই কৌতুকেরই বিষয় হইয়া আসিয়াছে। 'হিতোপদেশ' 'পঞ্চতন্ত্রে'র যুগ কিংবা তাহারও আরও পূর্ববর্তী বৌদ্ধ জাতকের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণ সম্পর্কে যে ধারণা এ দেশের সমাজ পোষণ করিয়া আসিতেছে, রামনারায়ণের নাটকে তাহারই ধারা অনুসরণ করা হইয়াছে। সুতরাং রামনারায়ণ ইহাদের সম্পর্কিত কৌতুক-রচনার মধ্যে নিজস্ব কোন বিশ্বাস কিংবা ধারণার পরিচয় দিতে যান নাই। কিন্তু ব্যঙ্গের লক্ষণ তাহাই—ইহাতে একটি প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গকারকের ব্যক্তিগত মনোভাবই প্রকাশ পায়। রামনারায়ণ এখানে তাহার কেবলমাত্র ব্যক্তিগত মনোভাবের পরিচয় দেন নাই, বরং যে সমাজরূপটিকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহাই তিনি তাঁহার লেখনীর মুখে মূর্ত করিয়া তুলিয়াছেন। এই গুণেই নাটক হিসাবে তাঁহার রচনা সার্থক হইয়াছে, তাহা না হইয়া যদি ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত ব্যঙ্গাত্মক মনোভাবের বাহন মাত্র হইত, তবে ইহা মত-প্রচারমূলক রচনা হইত, নাটক হিসাবে ইহার কোন মূল্যই থাকিত না।

ব্যক্তি কিংবা সমাজ-জীবন হইতে ছোটখাট অসঙ্গতির সন্ধান করিয়া তাহার উপর নির্মল রসালোকপাত করিলেই তাহা দ্বারা সার্থক হাস্যরসের সৃষ্টি হয়। ব্যঙ্গ কিংবা শ্লেষ যেমন ব্যক্তি কিংবা সমাজ-জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে কঠিন আঘাত করে, হাস্যরস (humour) তাহা করে না। সমাজ কিংবা ব্যক্তিজীবনের যে সকল সাধারণ ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে সকলে সজাগ থাকে না, তাহার প্রতি সচকিত করিয়া দেওয়াই হাস্যরস সৃষ্টির উদ্দেশ্য। ইহার ফল সুদূরপ্রসারী নহে। ব্যঙ্গের জ্বালা দীর্ঘস্থায়ী, কিন্তু হাস্যরসের আনন্দ ক্ষণস্থায়ী। এই সকল দিক হইতে বিচার করিলে 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটককে হাস্যরসাত্মক রচনা বলিয়াই গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়। অবশ্য ব্যঙ্গের ভাব যে ইহাতে আদৌ নাই, তাহা নহে, তবে ইহাতে নাট্যকারের ব্যক্তিগত মত অপেক্ষা তদানীন্তন সমাজের মনোভাবই অধিকতর সার্থক হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

কিন্তু হাস্যরস বলিতে ইংরেজি সাহিত্যে যাহা বুঝায়, তাহার সঙ্গে রামনারায়ণের কোন যোগ ছিল না, থাকিবার কথাও ছিল না; কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, রামনারায়ণ ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না। সুতরাং প্রকৃত ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব-জাত হাস্যরসের সঙ্গে রামনারায়ণের কোন সম্পর্ক ছিল না। 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' রচনায় রামনারায়ণের ব্যক্তিগত হাস্যরস-বোধের সঙ্গে এই বিষয়ক সংস্কৃত সাহিত্যে প্রচলিত দেশীয় সাহিত্য-ধারার সংযোগ ঘটিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে শুচি-শুভ্র ও সুনির্মল হাস্যরসের জন্ম হয় নাই। হাস্যরসের জন্ম হইয়াছিল সত্য, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতে তাহা সুনির্মল ও শুভ্র ছিল না। রামনারায়ণের হাস্যরসও সর্বত্র সুনির্মল ও শুভ্র নহে। ইহা তদানীন্তন বিদগ্ধ সমাজের উপর একদিক দিয়া যেমন সংস্কৃত কাব্য-নাটক-পুরাণ ইত্যাদির প্রভাবের ফল, আর একদিক দিয়া তেমনই তদানীন্তন সমাজের উপর ভারতচন্দ্র-দাশরথি-কবিওয়ালা-ঈশ্বর গুপ্তেরও প্রভাবের ফল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। রামনারায়ণ তাঁহার নাটক রচনায় 'রস' ও 'আঙ্গিকে'র দিক দিয়া প্রাচীন ধারা অনুসরণেরই পক্ষপাতী ছিলেন এবং সেই সূত্রেই 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটকের মধ্যে হাস্যরসের অবলম্বনরূপে এই সকল স্থূল ও অমার্জিত উপকরণরাশি সঞ্চিত হইয়াছিল। একান্ত বাস্তবধর্মী-লেখকের পক্ষে ব্যক্তিগত রসবোধ দ্বারা শোধিত করিয়া কোন বিষয়কেই গ্রহণ করা সম্ভব হয় না, তাহা হইলে তাঁহার মূল জীবন-চেতনার

মধ্যেই আঘাত লাগে। রামনারায়ণও তাঁহার পরিচিত কোন জীবনোপকরণকেই তাঁহার নিজস্ব রসবোধ দ্বারা মার্জিত করিয়া লইতে যান নাই। পরবর্তী নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের হাস্যরসেরও ইহাই প্রকৃতি ছিল।

'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটকে রামনারায়ণ যে রুচির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা তাঁহার যতখানি ব্যক্তিগত রুচিবোধের পরিচায়ক, তদপেক্ষা অধিক তদানীন্তন সমাজ-রুচির পরিচায়ক। রামনারায়ণ সম্পর্কে এই কথাটি বুঝিতে পারিলেই আমরা বাংলা সাহিত্যের পরবর্তী কয়েকখানি প্রত্যক্ষ সমাজ-ভিত্তিক রচনা, যেমন মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ', দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল-দর্পণ', 'সধবার একাদশী' প্রভৃতির রুচির কথা বুঝিতে পারিব। ইহারা একই সূত্রে গ্রথিত, একই ঐতিহ্যের অনুসরণকারী এবং একই সমাজ-ব্যবস্থার সৃষ্টি। সুতরাং ইহাদের চিত্র ও জীবনানুভূতির মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যায় না। 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটকের ভিতর দিয়া সমাজের বিশেষ একটি অংশ আশ্রয় করিয়া নাট্যকার যে রুচির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা যে লক্ষ্যহীন আদর্শচ্যুত এবং অধঃপতিত একটি সমাজ-জীবন হইতে স্বভাবতই উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিয়া নাট্যকারকে এই জন্য দায়ী করা যায় না। যে অবস্থার তাড়নায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বাল্য-বিবাহ ও বহুবিবাহ রোধ এবং বিধবা বিবাহ প্রচার-মূলক আন্দোলনে তাঁহার সমগ্র জীবন সমর্পণ করিতে হইয়াছিল, ইহা যে কি অবস্থা, তাহা এক শতাব্দীর ব্যবধানে আজ আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিব না; কিন্তু ইহার মধ্যে যে একটি বিশেষ গুরুত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। মাইকেল মধুসূদন দত্তের পূর্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের প্রত্যক্ষ ফলের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় নাই—স্ত্রীজাতি সম্পর্কে আমাদের সনাতন ধারণা তখন পর্যন্ত বিন্দুমাত্রও শিথিল হয় নাই— ইহার প্রতি অবিশ্বাস, অশ্রদ্ধা ও কৌতুকই ছিল জাতির লক্ষ্য। জাতির অন্তর হইতে যখন ইহার পৌরুষ লুপ্ত হইয়া গিয়া ইহা নানা দিক দিয়া উচ্চ আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে, তখনই নারী সম্পর্কে ইহার হীন কৌতুক-বোধ জাগিয়া উঠে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা সবে মাত্র প্রতিষ্ঠার ফলে যদিও সেই ভাব এই জাতির মন হইতে লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তথাপি তখন পর্যন্ত ইহার প্রভাব সমাজ অনুভব করিতে পারে নাই। সেই জন্য রামনারায়ণ এই বিষয়ে চিরাচরিত প্রথার অনুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর নূতন সমাজ-চেতনার ফল স্বরূপ তাঁহার মধ্যে দুর্গত

নারীসমাজের প্রতি তাঁহার যে একটি গভীর সহানুভূতিরও সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি।

রামনারায়ণ আঙ্গিকের দিক দিয়া প্রাচীন বাংলা আখ্যায়িকা কাব্যের ধারাটির অনুসরণ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার নাটকের মধ্যে মঙ্গলকাব্যের অনুযায়ী 'নারীদিগের পতিনিন্দা'র প্রসঙ্গ আনিয়াও যুক্ত করিয়াছেন। 'পতিব্রতোপাখ্যান' রচয়িতার নিকট 'নারীদিগের পতিনিন্দা'র প্রসঙ্গ আলোচনা কেবল মাত্র প্রচলিত রীতির মুখরক্ষা ব্যতীত আর কিছুই নহে। নারী জাতি সম্পর্কে তাঁহার বিশ্বাস ও আশা ছিল বলিয়াই তিনি যেমন 'পতিব্রতোপাখ্যান' রচনা করিয়াছিলেন, তেমনিই 'কুলীন-কুল-সর্বস্বে'র স্ত্রীচরিত্রগুলিও সহানুভূতি দিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই সহানুভূতি হইতেই তাঁহার সৃষ্টির প্রেরণা আসিয়াছিল, কিন্তু যে বিষয়টি তাঁহার সৃষ্টির অবলম্বন হইয়াছিল, তাহার মধ্যে তাঁহার নিজস্ব আদর্শ অনুযায়ী চিত্র ও চরিত্রের সন্ধান পান নাই। সেই জন্যও তাঁহার রুচিবোধ মধ্যে মধ্যে নিতান্ত গ্রাম্যতার পরিচায়ক হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাহা গ্রাম্যতার সীমা অতিক্রম করিয়া অশ্লীলতার পর্যায়ে পৌছিতে পারে নাই। এখানে গ্রাম্যতা এবং অশ্লীলতা এই দুইটি বিষয়ে পার্থক্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা আবশ্যক, নতুবা রামনারায়ণকেও দীনবন্ধুর মত ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে। গ্রাম্যতা স্থূল অমার্জিত জীবনের স্বাভাবিক ধারা অনুসরণ করিয়াই আসিয়া থাকে; কিন্তু অশ্লীলতা জিনিসটি কৃত্রিম, সচেতন ভাবে ইহাকে রূপায়িত করিতে হয়। সেইজন্য মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গলে' গ্রাম্যতা থাকিলেও অশ্লীলতা নাই, কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্যে অশ্লীলতা আছে, গ্রাম্যতা নাই। যাহা সহজ ও স্বাভাবিক জীবনের অভিব্যক্তি, তাহা স্থূল হইলেও অশ্লীল নহে—রামনারায়ণে এই স্থূল গ্রাম্যতা থাকিলেও যথার্থ অশ্লীলতা বলিতে যাহা বুঝি, তাহা নাই।

'কুলীন কুল-সর্বস্ব' সামাজিক নাটক হওয়া সত্ত্বেও বাংলার বৃহত্তর সমাজ-জীবনের কোন রূপ ইহার ভিতর দিয়া প্রকাশ পায় নাই, বরং ইহার মধ্য দিয়া তদানীন্তন কেবলমাত্র অধঃপতিত কুলীন ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সমাজের কিছু পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। কুলীন ও বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজ ইহাতে তাঁহার আক্রমণের লক্ষ্য হইয়াছে; সুতরাং তাহাদের চিত্র যে কিছু অতিরঞ্জিত, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তারপর ব্রাহ্মণ-সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত ঘটক সম্প্রদায়ও তাঁহার তীব্রতম আক্রমণের লক্ষ্য হইয়াছে। এমন কি, তিনি

পুরোহিত সম্পর্কে এ' কথা পর্যন্ত লিখিয়াছেন, 'বিধাতা পুরীষের " পু" রোষের "রো" হিংসার "হি" আর তস্করের "ত" এই চারি অক্ষর একত্র করিয়া "পুরোহিত" করিয়াছেন।' সুতরাং দেখা যাইতেছে, বাংলার সমাজ-জীবনের বিশেষ একটি অংশ সম্পর্কে তাঁহার নিজস্ব মনোভাব ইহার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। সেইজন্য ইহা প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহা যে সকল শ্রেণীর বাঙ্গালী পাঠক অভিনন্দিত করিয়া লইয়াছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না; বরং আহত পণ্ডিত এবং কুলীন সমাজ ইহার বিরোধিতা করিয়াছিলেন। তিনি আত্মনির্লিপ্ত হইয়া সমাজ-জীবনের বাস্তব চিত্র ইহাতে যদি পরিবেশন করিতে পারিতেন, অর্থাৎ 'নীল-দর্পণে'র মত যদি ইহা সমাজ-দর্পণ হইতে পারিত, তবে ইহা যেমন সর্বজনীন আকর্ষণের বস্তু হইতে পারিত/ইহা বহুলাংশে তাহা হইতে পারে নাই। বরং রামনারায়ণের আরও পরবর্তী কালে রচিত সামাজিক নাটক 'নব-নাটক' ইহা অপেক্ষা এই বিষয়ে অনেক নির্দোষ রচনা। তাহাতে প্রত্যক্ষ ভাবে কাহাকেও আক্রমণ করা হয় নাই, বাস্তব জীবন রূপের অভিব্যক্তি তাহাতে নাট্যকারের নিজস্ব মনোভাবে অনুরঞ্জিত না হইয়াই সেখানে প্রকাশিত হইয়াছে; সেইজন্য সামাজিক নাটক হিসাবে তাঁহার 'নব-নাটক' যে জনপ্রিয়তা ও আবেদন সৃষ্টি করিয়াছিল, 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটক তাহা করিতে পারে নাই। কুলীন ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজের যে চিত্র ইহাতে পরিবেশন করা হইয়াছিল, তাহা সেই সমাজের মধ্যে ইহার সম্পর্কে স্বভাবতই বিরূপ মানাভাবের সৃষ্টি করিয়াছিল। রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে ইহার সম্পর্কে নিতান্ত সংযত ভাষায় এই বিরোধী মনোভাব কতকটা প্রকাশ পাইয়াছে।

প্রায় সমসাময়িক কালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজের একজন প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তি রামগতি ন্যায়রত্নের 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' সম্পর্কিত অভিমতটি এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন,

> 'তর্করত্ন বড় শ্লেষোক্তি প্রিয়; তাঁহার শ্লেষবচন সকল অনেক স্থলেই প্রীতিপদ হইয়াছে, কিন্তু কোন কোন স্থলে নিতান্ত অতিরিক্ত হওয়ায় বিরক্তিকরও হইয়াছে। তদ্ভিন্ন তিনি বাঙ্গালার মধ্যে মধ্যে যে সকল স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক বিন্যস্ত করিয়া তাহার বাঙ্গালা অর্থ করিয়া দিয়াছেন, সে স্থলে কেবল সেই বাঙ্গালাগুলি থাকিলেই সুসঙ্গত হইত। যাহা হউক, যখন কুলীন কুল-সর্বস্ব বাঙ্গালায় সর্বপ্রথম নাটক, তখন উহার সহস্র গুরুতর দোষ থাকিলেও উহা মার্জনীয়—আমাদের উল্লিখিত দোষ সকল ত সামান্য।'

এ' কথা সত্য, একই নাটকে বৃহত্তর কোন সমাজ-জীবনের পরিচয় প্রকাশ পাইতে পারে না, একটি পরিবারের কথাই তাহাতে প্রকাশ পাইতে পারে, তবে তাহা অবলম্বন করিয়া সমাজের নানা সমস্যারও পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে একটি পরিবারকে রামনারায়ণ লক্ষ্য করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সেই পরিবারের মধ্যেই তাঁহার দৃষ্টি সীমায়িত রাখিয়া যদি তাহারই সুখদুঃখের পরিচয়কে আরও গভীর ও বিস্তৃত ভাবে রূপায়িত করিতে পারিতেন, তবে এই নাটক সামাজিক নাটক রূপেই অধিকতর সার্থকতা লাভ করিতে পারিত। কিন্তু সেই সূত্রটি তিনি ধরিয়াও তাহা শেষ পর্যন্ত রক্ষা করিতে পারেন নাই। কুলপালকের পত্নী ও তাঁহার চারিটি কন্যার বঞ্চিত জীবনে নাটকীয় উপাদানের কিছুমাত্র অভাব ছিল না, তাহাদের সন্ধানও তিনি পাইয়াছিলেন, কিছু দূর তাহাদিগকে লইয়া অগ্রসর হইবার পর, তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য বহির্মুখী চরিত্র এই প্রসঙ্গের মধ্যে টানিয়া আনিলেন, কিন্তু যাহাদের ভিতর দিয়া তাঁহার নাটকীয় চরিত্রের রূপায়ণ অধিকতর সার্থক হইত, তাহাদিগকে যবনিকার অন্তরালবর্তী করিয়া রাখিয়া দিলেন।

স্ত্রী-চরিত্র প্রধানতঃ রক্ষণশীল, সেইজন্য ইহার মধ্য দিয়া সমাজের একটি অপরিবর্তিত রূপ সহজেই ধরা পড়ে। স্ত্রীচরিত্রের সৃষ্টিতেও রামনারায়ণ যথার্থ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, কিন্তু নাটকের প্রধান ত্রুটি এই, ইহাদিগকে তিনি যথোচিত স্থান না দিয়া, কতকগুলি অবান্তর কৌতুককর চিত্রকেই তিনি এখানে প্রাধান্য দিয়াছেন। সেইজন্য ইহার কাহিনী যেমন একটি অখণ্ড রূপ লাভ করিতে পারে নাই, তেমনই তাঁহার রচনাও নিতান্ত চিত্রধর্মী হইয়া রহিয়াছে, সুতরাং ইহা সমাজ-চিত্র, সমাজ-জীবন নহে। সমাজ-জীবন হইতে ইহার যে দূষিত অঙ্গটি ইতিমধ্যেই গলিত হইয়া খসিয়া পড়িয়া যাইতেছিল, ইহা তাহারই একটি বিকৃত পরিচয় মাত্র, সুতরাং ইহা কোনদিক দিয়াই সমাজের এক সুস্থ, স্বাভাবিক ও সঙ্গত পরিচয় বলিয়া গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইতে পারে নাই। সুতরাং 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' প্রথম বাংলা সামাজিক নাটক হওয়া সত্ত্বেও সুস্থির সমাজ-জীবনের যে একটি সুস্থ পরিচয় আছে, তাহা ইহার মধ্যে নাই; ইহার মধ্যে যে সমস্যার কথা আছে, তাহাও নূতন সমাজ-জীবনের আদর্শের সম্মুখীন হইয়া আপনা হইতেই লুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, এই সমস্যার জন্য জাতির কোনও দুশ্চিন্তার কারণ আর ছিল না। বরং ইহার পরবর্তী দুই তিন বৎসরের মধ্যে বিধবা-বিবাহ বিষয়ক যে সামাজিক নাটকগুলি রচিত হইয়াছিল, তাহাদের সমস্যা

অধিকতর প্রত্যক্ষ এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ ছিল ; তাহা লঘু কৌতুকের বিষয় ছিল না। কিন্তু বাংলার প্রথম সামাজিক নাটক রামনারায়ণের 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' এমন একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, যাহার প্রভাবের ফলে সমাজ-জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলিও সেদিন লঘু কৌতুকের বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। রামনারায়ণের 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটকের একটি অতি সুদূর-প্রসারী প্রভাব বিস্তৃত হইবার ফলে সে-যুগে সামাজিক নাটক রচয়িতা মাত্রই ইহাকেই সকল দিক দিয়া আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে এই দাঁড়াইল যে, সে-যুগে সামাজিক নাটক রচনার সূত্রপাত হইল সত্য, কিন্তু রামনারায়ণ যে অসম্পূর্ণ ও স্থানে স্থানে অসঙ্গত দৃষ্টি লইয়া সমাজকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, পরবর্তী নাট্যকারগণ তাহাই নির্বিচারে অনুসরণ করিতে লাগিলেন। সেইজন্য সেই যুগের বিধবা-বিবাহ বিষয়ক নাটকগুলি একাধারে কুরুচি ও সামাজিক দুর্নীতির পরিচায়ক হইয়া উঠিল। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্র—ইহারাও যে এই বিষয়ে নিরঙ্কুশ হইয়া উঠিয়াছিলেন, ইহা যে বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম সামাজিক নাটকখানিরই প্রভাবের ফল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং সেই যুগে সামাজিক নাটক হইলেই তাহা সমাজ-সংস্কার-মূলক নাটক হইত, এবং সমাজ-সংস্কারের প্রেরণার মধ্যে যে একটি গুরুতর দৃষ্টিভঙ্গি থাকা একান্ত আবশ্যক, তাহা তাহাদের মধ্যে প্রকাশ না পাইয়া বরং তাহা লঘু-কৌতুকের বিষয় হইয়া উঠিত। বাংলা নাট্যসাহিত্যের সমগ্র আদিযুগ ব্যাপিয়া ইহার আর ব্যতিক্রম দেখা দিল না, তার পর মধ্যযুগে ইহার কিছু কিছু ব্যতিক্রম দেখা দিতে লাগিল ; কিন্তু তাহাও কেবল মাত্র গিরিশচন্দ্র ঘোষের মত জীবন সম্পর্কে যাঁহাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, তাঁহাদেরই মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইল, নতুবা অমৃতলাল বসু প্রমুখ প্রহসন-লেখকেরা রামনারায়ণের আদর্শই অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এমন কি, আধুনিক যুগেও দ্বিজেন্দ্রলাল, এমন কি রবীন্দ্রনাথও সামাজিক জীবন ভিত্তি করিয়া প্রহসনই প্রধানত রচনা করিয়াছেন। সমাজ-জীবনাশ্রিত মানুষ যে কেবলমাত্র বহির্মুখী সমস্যা দ্বারাই জর্জরিত কিংবা লঘু কৌতুক মাত্রেরই বিষয় নহে, তাহা নাটকের মধ্যে তিনিও সর্বত্র বুঝিতে পারেন নাই। কেবল মাত্র আধুনিকতম যুগ অর্থাৎ বিভাগোত্তর যুগে সমাজ-জীবন অবলম্বন করিয়া এই শ্রেণীর কৌতুককর নাটক রচনার প্রবণতা হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া অনুভূত হইবে। সুতরাং রামনারায়ণ বাংলা সামাজিক নাটক রচনার যে ধারা প্রথম প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহা

প্রায় এক শতাব্দী কাল পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল। বিংশ শতাব্দীতে রচিত রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা'র মধ্যেও আমরা রামনারায়ণের 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটকের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই।[১]

'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটকের ভিতর দিয়া সত্যভাষণের যে দুঃসাহসিক পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার জন্য রামনারায়ণকে এমন একটি সমাজের অপ্রীতিভাজন হইতে হইয়াছিল, যাহার মধ্যেই তাঁহাকে প্রত্যহ বাস করিতে হইত। এই বলিষ্ঠ সত্যভাষণের ভিতর দিয়া তাঁহার চরিত্রের একটি বিশেষ শক্তি প্রকাশ পাইয়াছিল। চব্বিশ পরগণা জিলার যে হরিনাভি গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা ব্রাহ্মণ-সমাজ-প্রধান, ইহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে কুলীন এবং বৈদিক ব্রাহ্মণ-সমাজের দীর্ঘকাল ধরিয়াই বাস। তাঁহার এই একান্ত প্রতিবেশী সমাজের চিত্র অঙ্কিত করিবার সময় তিনি কাহারও মুখরক্ষা করিতে যান নাই; যাহা তাঁহার অনুভূতিশীল হৃদয়কে আঘাত করিয়াছে, তিনি তাহাকেই আঘাত করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যের বিশেষ শক্তিশালী পরবর্তী নাট্যকার দীনবন্ধুর চরিত্রের মধ্যেও এই গুণটির আমরা সন্ধান পাইয়াছি। আমাদের সামাজিক জীবনের জড়তার শৃঙ্খল হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য সেইদিন যে শক্তির প্রয়োজন ছিল, রামনারায়ণ এবং দীনবন্ধু উভয়েই সেই শক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁহাদের এই শক্তি ও সাহস সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের কার্যে নিয়োজিত হইয়াছিল বলিয়া সামাজিক কুসংস্কারের নাগপাশ হইতে আমরা সেদিন অতি সহজেই নিষ্কৃতি পাইয়াছিলাম। সুতরাং এই শুভকার্যের যাঁহারা অগ্রদূত, যাঁহারা সেদিন প্রতিবেশীর মুখের দিকে তাকাইয়া অপ্রিয় সত্যকথা প্রকাশ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই, তাঁহারা সর্বদাই জাতির প্রণম্য হইয়া থাকিবেন। এ-কথা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আজ যে কথা বলা আমাদের পক্ষে নিতান্ত সহজ হইয়াছে, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সে-কথা বলা তত সহজ ছিল না; সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে ব্যক্তিস্বার্থ সে-দিন এমন ভাবে জড়িত ছিল যে, তাহার উপর আঘাত কেহই সহজে সহ্য করিতে পারিত না। স্বর্গত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথা বাদ দিলে সে-যুগে এদেশের রক্ষণশীল সমাজকে যাঁহারা আঘাত কিংবা ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাভিমানী ব্যক্তি ছিলেন, পাশ্চাত্ত্য জীবনের আদর্শেই তাঁহাদের জীবনের মূল্য নিরূপিত হইত। কিন্তু রামনারায়ণ এই বহির্মুখী শিক্ষার প্রভাববশত নহে, কেবলমাত্র অন্তর্মুখী সহানুভূতির পরবশ হইয়া সেদিন নিজে যে

সমাজে বাস করিয়াছিলেন, সেই সমাজকেই আঘাত করিবার শক্তির অধিকারী ছিলেন। ইহা তাঁহার চিন্তার বিলাস ছিল না, জীবনের বিশ্বাস ছিল। সেইজন্যই তাঁহার রচনা যেমন দুঃসাহস-প্রণোদিত, তেমনই আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ, এবং এই গুণেই ইহা যথার্থ শক্তিশালী হইতে পারিয়াছে।)

রামনারায়ণের দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক 'নব-নাটক'ও তাঁহার পারিতোষিক-প্রাপ্ত রচনা। জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ীর গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাল্যকাল হইতেই নাট্যাভিনয়ের দিকে গভীর অনুরাগ ছিল। তাঁহারা স্বগৃহেই একটি নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করেন, ইহাই জোড়াসাঁকো নাট্যশালা নামে পরিচিত। এই নাট্যশালায় অভিনয় করিবার জন্য উপযুক্ত নাটকের অভাব অনুভূত হইলে, ইহার প্রতিষ্ঠাতৃগণ বহুবিবাহ-বিষয়ক একখানি উৎকৃষ্ট নাটকের জন্য দুইশত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়া ইংরেজি সংবাদপত্র 'ইণ্ডিয়ান্ ডেলি নিউজ' পত্রিকায় এক বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। তারপর রামনারায়ণ তর্করত্নের উপর এই ভার দিয়া বিজ্ঞাপন প্রত্যাহার করিয়া লন। রামনারায়ণ 'নব-নাটক' রচনা করিয়া দুই শত টাকা পুরস্কার লাভ করেন। কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ রামনারায়ণ নাটকখানি গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নামে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গপত্রে এইভাবে তিনি গুণেন্দ্রনাথের উল্লেখ ও তাঁহার নাটকের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন,

> মহাশয়! আপনকার এই অল্প বয়সে অনল্প দেশহিতৈষিতা, বদান্যতা এবং রসজ্ঞতাদি গুণগ্রাম সন্দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সন্তোষ প্রকাশার্থ এই নব-নাটক স্বরূপ কুসুমমালা মহাশয়কে প্রদান করিলাম। ইহা বহুবিবাহ প্রভৃতি বিবিধ কুপ্রথা নিবারণের নিমিত্ত সদুপদেশসূত্রে নিবদ্ধ।...

নাট্যোল্লিখিত কাহিনী সংক্ষেপে এইরূপ :

প্রথমত নান্দী ও অতঃপর নটী এবং সূত্রধার প্রবেশ করিয়া যথারীতি বিষয়-বস্তুটির ইঙ্গিত দিয়া গেল, তারপর মূল কাহিনী আরম্ভ হইল। গবেশ বাবু গ্রাম্য জমিদার, তাঁহার পত্নীর নাম সাবিত্রী—তাঁহাদের দুই পুত্র সুবোধ ও সুশীল। গবেশবাবুর বয়স পঞ্চাশ অতিক্রম করিয়াছে, তিনি তাঁহার প্রথমা স্ত্রী বর্তমানেই বৃদ্ধ বয়সে পুনরায় দার-পরিগ্রহ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার কয়েকজন স্তাবক এই বিষয়ে তাঁহাকে উৎসাহ দিতে লাগিল। দুই একজন সমাজ-সংস্কারক ইহার বিরোধিতা করিয়া ব্যর্থকাম হইলেন। গবেশবাবু চন্দ্রলেখা নাম্নী এক বালিকাকে বিবাহ করিয়া আনিয়া গৃহে তুলিলেন। সাবিত্রী অতি সুশীলা, তিনি স্বামীর দ্বিতীয় বার বিবাহ করাতে

কোন প্রকার অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন না। কিন্তু চন্দ্রলেখা তাঁহার ও তাঁহার দুইটি পুত্রের উপর অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। গবেশবাবুকে অল্প দিনেই সে সম্পূর্ণ বশ করিয়া লইল। স্বামীর সম্পত্তি নিজের নামে লিখাইয়া লইয়া প্রথম পক্ষের স্ত্রী ও তাঁহার পুত্রদিগকে ইহা হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করিল। সাবিত্রীকে অন্তঃপুর হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়া তাঁহার নিমিত্ত বাহির আঙ্গিনায় এক গোলপাতার ঘর বাঁধিয়া দিল। সাবিত্রী তাহাতেই আসিয়া আশ্রয় লইলেন। মাতার এই দুঃখ ও অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া জ্যেষ্ঠপুত্র সুবোধ দেশান্তরী হইল। সাবিত্রীর উপর চন্দ্রলেখার অত্যাচার ক্রমশই বাড়িতে লাগিল। তাঁহার কেবল চক্ষুজল সার হইল। এক দিকে নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের জন্য দুর্ভাবনা ও অন্যদিকে চন্দ্রলেখার অত্যাচার—এই উভয়ের মধ্যে পড়িয়া সাবিত্রী আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলেন না। কোনদিন কোন দুঃখভোগে তাঁহার অভ্যাস ছিল না। ক্রমে তাঁহার সকল অসহ্য হইয়া উঠিল। একদিন তিনি উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিলেন। নানা সাংসারিক দুশ্চিন্তায় গবেশবাবুর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল, অল্প দিনের মধ্যে তিনিও প্রাণত্যাগ করিলেন। মাতার সম্পর্কে এক দুঃস্বপ্ন দেখিয়া সুবোধ বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিল। আসিয়া মাতাপিতা উভয়েরই মৃত্যু সংবাদ পাইল। মাতার জন্য তাহার আক্ষেপের আর সীমা রহিল না। তারপর যখন শুনিতে পাইল, মাতা আত্মঘাতিনী হইয়াছেন, তখন সে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল, তাহার এই মূর্ছা আর ভাঙ্গিল না।

রামনারায়ণের 'নব-নাটক' রচনার পূর্বে দীনবন্ধুর প্রথম দুইখানি নাটক অর্থাৎ 'নীল-দর্পণ' ও 'নবীন তপস্বিনী' এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তের সব কয়খানি নাটকই প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। 'নব-নাটকে'র একস্থলে রামনারায়ণ দীনবন্ধুর 'নীল-দর্পণে'র কথা উল্লেখও করিয়াছেন (তৃতীয়াঙ্ক)। অতএব 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটক রচনার যে একটি ঐতিহাসিক মূল্য ছিল, 'নব-নাটকে'র তাহা নাই। বিশেষতঃ 'নব-নাটক' রচনাকালীন রামনারায়ণের সম্মুখে তৎকালীন বাংলা নাট্যসাহিত্য রচনার একটি আদর্শ বর্তমান ছিল—'নব-নাটকে' যে তাহাই কতক অনুসরণ করা হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহাদের মধ্যে প্রধান—নাট্যকাহিনীর পরিণতি। 'নব-নাটক' পূর্ণাঙ্গ বিষাদাত্মক নাটক, কিন্তু ট্র্যাজিডি নহে। ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক ও দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার

'নীল-দর্পণ' নাটক বিষাদান্তক করিয়াই রচনা করিয়াছিলেন এবং এই নাটক দুইখানি তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে সমাদর লাভ করিয়াছিল। অতএব যদি বলা যায় যে, রামনারায়ণ তাঁহাদেরই আদর্শে তাঁহার 'নব-নাটকে'র কাহিনী সুস্পষ্ট ভাবে বিষাদান্তক করিয়া রচনা করিয়াছেন, তাহা হইলে ভুল হইবে না। এমন কি, একথাও বলা যাইতে পারে যে, ইহার সঙ্গে 'নীল-দর্পণে'র বিয়োগাত্মক পরিণতির কাহিনীগত অনেক সাদৃশ্য আছে। 'নব-নাটকে'র ভাষা 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটকের ভাষা অপেক্ষা অনেক উন্নত। ইহার শিক্ষিত চরিত্রের ব্যবহৃত সাধু ভাষা অনেকটা প্রাঞ্জল হইয়া আসিয়াছে এবং স্ত্রী ও অন্যান্য অশিক্ষিত চরিত্রের ভাষাও গ্রাম্যতামুক্ত হইয়া সাহিত্যিক পরিচ্ছন্নতা লাভ করিয়াছে। এই ভাষা মাইকেল কিংবা দীনবন্ধুর ভাষা নহে; ভাষা বিষয়ে রামনারায়ণের একটি বিশিষ্ট স্বকীয়তা ছিল—তাহার পরিচয় তাঁহার 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটকের ভিতর দিয়া যেমন প্রকাশ পাইয়াছে, তাঁহার আরও পরিণত রচনা 'নব-নাটকে'র ভিতর দিয়াও তেমনই প্রকাশ পাইয়াছে। 'কুলীন কুল-সর্বস্বে'র ভাষা ক্রমপরিণতির ধারায় অগ্রসর হইয়া 'নব-নাটকে'র মধ্যে স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করিয়াছে—এই ধারাটি রামনারায়ণের নিজস্ব সৃষ্টি—তাঁহার বিবিধ নাট্য ও গল্প রচনার ভিতর দিয়াই এই ধারাটি অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। একথা সত্য যে, ইতিমধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র ও অক্ষয়কুমারের রচনাসমূহ প্রচারিত হওয়ার ফলে বাংলা গদ্যের একটা বিশিষ্ট রূপ স্থির হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও একথা স্বীকার করিতে হয় যে, রামনারায়ণের ক্ষেত্র ছিল স্বতন্ত্র এবং সেই স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে তাঁহার নিজস্ব বিষয়ের উপযোগী করিয়া রামনারায়ণ নিজেই তাঁহার ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই জন্যই এই বিষয়ে তাঁহার সমসাময়িক কোন গদ্য-লেখকের প্রভাব তাঁহার উপর অনুভব করা যায় না।

'নব-নাটকে'র আর একটি প্রধান গুণ—ইহার মধ্যে কোথাও 'কুলীন কুল-সর্বস্বে'র মত পয়ার-ত্রিপদী ছন্দে রচিত দীর্ঘ পদ্য ব্যবহৃত হয় নাই। মাত্র এক স্থলে সংক্ষিপ্ত একটি পদ্যের ব্যবহার করা হইয়াছে, কিন্তু তাহা নগণ্য। এই বিষয়ে যে তিনি দীনবন্ধুর নিকট ঋণী, তাহা বলিতে পারা যায় না। কারণ, দীনবন্ধুর 'নীল-দর্পণ' ও 'নবীন-তপস্বিনী'র মধ্যে সুদীর্ঘ পদ্য রচনার ব্যবহার আছে। এই বিষয়ে দীনবন্ধু যে রামনারায়ণের 'কুলীন কুল-সর্বস্বে'রই অনুকরণ করিয়াছেন, সে কথা পূর্বে বলিয়াছি। ইহা 'নব-নাটকে'র একটি

প্রধান গুণ। কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব রামনারায়ণেরই প্রাপ্য কি না, তাহা বিবেচনার বিষয়। কারণ, ইতিপূর্বে প্রকাশিত মাইকেল মধুসূদনের কোন নাট্য রচনার মধ্যেই মিত্রাক্ষরে রচিত কোন পদ্য ব্যবহৃত হয় নাই। রামনারায়ণের 'নব-নাটক' রচনায় তাহার প্রভাব কার্যকর হইয়া থাকিবে, কিংবা রামনারায়ণ তাঁহার নাট্যভাষার ক্রমবিকাশের ধারার মধ্যে ইহার অনাবশ্যকতা নিজেই উপলব্ধি করিয়া থাকিবেন। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়, নাটকের মধ্যে মাইকেল কর্তৃক মিত্রাক্ষর রচনা পরিত্যক্ত হইলেও, তাঁহার প্রভাব দীনবন্ধুর প্রথম দিককার রচনাগুলির উপর কার্যকর হইতে পারে নাই। অতএব মাইকেলের নাট্যভাষার প্রভাব সমসাময়িক নাট্যকারদিগের মধ্যে কার্যকর হইয়াছিল বলিয়া মনে হইতে পারে না। এমন কি, মাইকেল ও দীনবন্ধুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া রামনারায়ণ তখন পর্যন্ত নান্দী ও প্রস্তাবনার অংশ তাঁহার 'নব-নাটক' হইতেও পরিত্যাগ করেন নাই। 'নব-নাটকে'র মধ্যে কোন কোন স্থলে দীনবন্ধুর 'নীল-দর্পণে'র প্রভাব থাকিলেও ইহাতে মাইকেলের কোন নাট্য-রচনার প্রভাব অনুভূত হয় না। অতএব 'নব-নাটক' রচনার ভাষাগত সার্থকতার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব রামনারায়ণেরই প্রাপ্য বলিয়া মনে হয়।

'নব-নাটকে'র মধ্যে রামনারায়ণ ইংরেজি নাটকের অনুকরণে অঙ্কের অন্তর্গত করিয়া গর্ভাঙ্কের (scene) ব্যবহার করিয়াছেন, 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটকে তাহা করেন নাই। এই বিষয়ে যে রামনারায়ণ মাইকেল ও দীনবন্ধুকে অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 'কুলীন কুল-সর্বস্ব'কে একটি সমাজ-চিত্র বা সামাজিক নক্সা বলা হইলেও 'নব-নাটক' নাটকের মর্যাদা লাভের অধিকারী। ইহার মধ্যে কোন কোন চরিত্র-সৃষ্টি সার্থক হইয়াছে; দুই একটি এখানে আলোচনা করিয়া দেখান যাইতে পারে।

প্রথমত গ্রাম্য জমিদার গবেশবাবুর চরিত্র। ইহাকে নাটকের নায়ক বলা যাইতে পারে। তাঁহার মধ্যে বিলাসিতা-প্রিয় ও নিষ্কর্মা গ্রাম্য জমিদার-দিগের একটি সুন্দর চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। তোষামোদকারি-পরিবৃত হইয়া তিনি 'মূর্খের স্বর্গে' বাস করেন। নিতান্ত খেয়াল বশতই তিনি দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করিলেন। তাঁহার চরিত্রের মধ্যে দৃঢ়তা নাই, নিজে গভীরভাবে চিন্তা করিয়া কিছু করিতে পারেন না, সেইজন্য পরিণাম চিন্তা না করিয়াই

তিনি এই কাজ করিয়া ফেলিলেন। অতএব এই কার্য নিতান্ত তাঁহার চরিত্রানুযায়ীই হইয়াছে। তারপর বিবাহ করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই যখন ইহার বিষময় ফল বুঝিতে পারিলেন, তখন এই কার্যের জন্য তাঁহার আর অনুতাপের সীমা রহিল না। তাঁহার প্রথম পরিণীতা পত্নীর জন্য তাঁহার সহানুভূতি কোনদিন তিনি গোপন করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়া স্ত্রীকে তিনি ভয় করেন—তাঁহার মত ব্যক্তিত্বহীন পুরুষের পক্ষে তাহাও নিতান্তই স্বাভাবিক। তিনি মনে মনে একথা বুঝেন, 'স্ত্রৈণ হওয়া কাপুরুষের কর্ম' (৫ম অঙ্ক); তিনি স্ত্রৈণ নহেন, তবে অবস্থাবিপাকে পড়িয়া দ্বিতীয়া স্ত্রীকে তিনি ভয় করিয়া চলেন। এই ভয় হইতেই তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি কিছু করিয়া উঠিতে পারেন না। তাঁহার মধ্যে একটি রক্তমাংসের মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। বাড়ীর ভিতর হইতে কান্নার শব্দ শুনিয়া প্রথমা স্ত্রীর বিপদ আশঙ্কা করিয়া তিনি অধীর হইয়া উঠেন। তিনি বলেন,—'চন্দ্রলেখা আমায় মাত্যে পান্‌নি বল্যে সাবিত্রীকেই কি গে মারলেন না কি! আহা! তা হলে মাগী আর বাঁচ্‌বে না, একে পুত্রশোকে কাতর, অতি শীর্ণ হয়েছে' (৫ম অঙ্ক)। এই বলিয়া তিনি অধোমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন। সাবিত্রীর মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া তাঁহার আচরণও তাঁহার চরিত্রানুযায়ী হইয়াছে। এই নাটকের মধ্যে গবেশবাবুর আদ্যোপান্ত একটি সুস্পষ্ট মানবিক পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে।

তারপরই গবেশবাবুর দ্বিতীয়া স্ত্রী চন্দ্রলেখার কথা উল্লেখ করিতে হয়। চন্দ্রলেখা বৃদ্ধ স্বামীর তরুণী ভার্যা। শুধু তাহাই নহে, চন্দ্রলেখার এক বর্ষীয়সী সতীন ও তাহার দুই বালক পুত্র আছে। যে সংসারের মেয়েরা বালিকা বয়সেই বারব্রতের ভিতর দিয়া 'সতীন কাটিয়া আল্‌তা পরিতে' শিখে চন্দ্রলেখা সেই সংসারেরই সন্তান। অতএব তাহার নিকট তাহার হতভাগিনী সতীন ও তাহার দুই পুত্রের উপর যে ব্যবহার করা সঙ্গত, সেই রকম ব্যবহারই পাইয়া থাকি। স্বামীর নিকট সে স্বাভাবিক প্রেম ও প্রীতি পাইতে পারে না—কারণ, তাহাদের মধ্যে বয়সের অনেক ব্যবধান। অতএব স্বামীর প্রতি তাহার কোন কর্তব্যবোধও নাই। বরং তাঁহার প্রতি তাহার আক্রোশ থাকিবার কথা। কারণ, সে বুদ্ধিমতী; সেই জন্যই সে বুঝিতে পারে যে, তাহার নারীজন্ম ব্যর্থ করিবার জন্য তাহার বৃদ্ধ স্বামীই দায়ী। তাহার কোন শিক্ষা কিংবা সংস্কার নাই। অতএব এই অবস্থায় সে

স্বামীর প্রতি কি ব্যবহার করিতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। রামনারায়ণ তাঁহার নাটকের মধ্যে চন্দ্রলেখার চরিত্রগত এই বৈশিষ্ট্যগুলি আনুপূর্বিক রক্ষা করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, ইহার অতিরিক্তও চন্দ্রলেখার যে একটি পরিচয় আছে,তাহাও তিনি প্রকাশ করিয়াছেন—তাহা সখীগণের সঙ্গে তাহার ব্যবহার। চপলা ও চন্দ্রকলা চন্দ্রলেখার সখী। ইহাদের সঙ্গে আচরণে চন্দ্রলেখা একেবারে নূতন মানুষ—সে এখানে চঞ্চলা ও হাস্যময়ী আনন্দ-প্রতিমা। তাহার এই পরিচয়টি প্রকাশ করিয়া নাট্যকার নিজেও তাহার প্রতি তাহার অবস্থার জন্য পাঠকের সহানুভূতি সৃষ্টি করিয়াছেন। যখন তাহাকে চপলা ও চন্দ্রকলার সঙ্গে দেখিতে পাই, তখন যথার্থই এই বলিয়া তাহার জন্য দুঃখ হয় যে, গবেশবাবু তাহার পক্ষে কতই না অনুপযুক্ত। চন্দ্রলেখার নারীজীবনের সকল কামনা-বাসনাই জাগ্রত আছে, কিন্তু গবেশবাবুর নিকট হইতে তাহার কিছুই পূর্ণ হইবার নহে। অতএব গবেশবাবুর প্রতি এইজন্য পাঠকেরও আক্রোশের অন্ত নাই। এই ভাবটি যে নাট্যকার সার্থকভাবে সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন, তাহাতেই নাট্যকারের একটি বিশিষ্ট কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। এই বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেই, চন্দ্রলেখা যে বৃদ্ধ স্বামীকে প্রহার করিবার জন্য ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকে, তাহার স্বাভাবিকতা হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে।

গবেশবাবুর প্রথমা পত্নী সাবিত্রীর চরিত্রটিও সুন্দর পরিকল্পিত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি একথা কিছুতেই অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ইহার উপর দীনবন্ধু-রচিত 'নীল-দর্পণে'র সাবিত্রী চরিত্রের সুস্পষ্ট প্রভাব রহিয়াছে। রামনারায়ণের 'নব-নাটকে'র প্রভাব তাঁহার পরবর্তী কোন কোন নাট্যকারের মধ্যে অনুভব করা যায়। দীনবন্ধু তাঁহার একটি পরবর্তী নাটকের একটি পূর্ণ দৃশ্যের জন্য রামনারায়ণের 'নব-নাটকে'র নিকট ঋণী; তাহা তাঁহার 'জামাই বারিকে'র একটি সুপরিচিত দৃশ্য। 'জামাই বারিকে' পদ্মলোচনের দুই স্ত্রী যে দৃশ্যে একটি চোরকে ধরিয়া তাহাকেই নিজেদের স্বামী বিবেচনা করিয়া প্রহার করিতেছে, সেই দৃশ্যটি 'নব-নাটক' তৃতীয় অঙ্কের চোরের কাহিনীর উপর ভিত্তি করিয়া আনুপূর্বিক রচিত। শুধু ভিত্তি করিয়াই নহে, দীনবন্ধুর ভাষার মধ্যেও অনেক স্থলে রামনারায়ণের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের 'গোড়ায় গলদে'র এই সুপরিচিত হাস্যরসাত্মক উক্তিটি রামনারায়ণের 'নব-নাটক' হইতে গৃহীত, যেমন, 'একে বাপ তায় বয়সে বড়' ('গোড়ায় গলদ')। 'নব-নাটকে'র তৃতীয় অঙ্কে সুধীর বলিতেছেন,......'একে বাপ, তায় বয়সের

বড়ো—ঠাকুরদাদা হন পরিহাস করিতে পারি।' এখানে একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রামনারায়ণের 'নব-নাটক' জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর নাট্যশালায় বহুবার অভিনীত হইয়াছিল।

রুচির দিক দিয়া সমসাময়িক সামাজিক নাটকগুলি হইতে 'নব-নাটকে'র সুস্পষ্ট পার্থক্য অনুভব করা যায়। এই বিষয়ে 'নব-নাটক' 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' হইতেও উন্নত। ভাষায় ও ইঙ্গিতে অটুট সংযম 'নব-নাটকে'র একটি বিশিষ্ট গুণ, অথচ ইহা সত্ত্বেও ইহা নাট্যকারের উদ্দেশ্য সাধনেও সার্থক হইয়াছে। এই একই উদ্দেশ্য লইয়া পরবর্তী যে সকল সামাজিক নাটক রচিত হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশের মধ্যেই রুচির এই সংযম রক্ষিত হইতে পারে নাই।

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রুক্মিণীহরণের সুপরিচিত বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া রামনারায়ণ 'রুক্মিণী-হরণ' নামক একখানি ক্ষুদ্র পঞ্চাঙ্ক নাটক রচনা করেন। অঙ্কগুলির মধ্যে দুইটির অধিক দৃশ্য কোনটিতেই নাই, কোন কোন অঙ্ক একটি দৃশ্যেই সম্পূর্ণ হইয়াছে।

'রুক্মিণী-হরণে'র বিষয়বস্তুর মধ্যে যথার্থ নাট্যিক উপাদান ছিল, রামনারায়ণ তাঁহার ক্ষুদ্র রচনাটির মধ্যে তাহার সদ্ব্যবহারও করিয়াছেন। ভক্তিচন্দনের পবিত্র সুরভি আনুপূর্বিক নাট্যকাহিনীটিকে স্নিগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে; সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ইহার ভাষা। গ্রাম্য কিংবা ইতর চরিত্র ইহাতে নাই এবং ইহার প্রায় সকল চরিত্রই সমমর্যাদাসম্পন্ন; এই দিক দিয়া ইহাতে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ভাষার সমতা রক্ষা করা সম্ভব হইয়াছে। এই ভাষা সাধু গদ্যও নহে, অথচ গ্রাম্য ইতর চরিত্রের ভাষাও নহে। ইহা আদ্যোপান্ত সহজ ও স্বচ্ছ, কোথাও আড়ষ্ট নহে। নাটক রচনার পক্ষে ইহা আদর্শ না হইলেও, বহুলাংশে উপযোগী হইয়া আসিয়াছে। রামনারায়ণের ইহা একখানি নান্দী-সূত্রধারবর্জিত মৌলিক মিলনান্তক নাটক।

পৌরাণিক বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া রামনারায়ণ 'ধর্মবিজয় নাটক' ও 'কংসবধ নাটক' নামক আরও দুইখানি প্রায় অনুরূপ নাটক রচনা করিয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্র রাজার সুপরিচিত আখ্যায়িকাই প্রথমোক্ত নাটকখানির উপজীব্য। ভাষা, কাহিনী-বিন্যাস এবং অন্যান্য দিক দিয়া এই দুইখানি নাটক তাঁহার পূর্ববর্তী নাটক 'রুক্মিণী-হরণে'রই প্রায় সমতুল্য। তিনি 'স্বপ্নধন' নামক একখানি রোমান্টিক নাটক রচনা করেন। দুই বিভিন্ন দেশের রাজপুত্র ও রাজপুত্রী পরস্পরকে স্বপ্নে দর্শন করিয়া কি ভাবে যে

পরস্পরের প্রতি প্রণয়াসক্ত হইয়া অবশেষে মিলিত হয়, এই নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। কাহিনীর কিংবা নাট্যসৃষ্টিকৌশলের দিক দিয়া ইহাতে বৈশিষ্ট্য কিছুই নাই। ইতিপূর্বে প্রকাশিত দীনবন্ধুর রোমান্টিক নাটক কয়খানির প্রভাব ইহার উপর সুস্পষ্ট অনুভব করা যায়। বিশেষত বাংলার প্রচলিত একটি রূপকথার কাহিনীই যে ইহার ভিত্তি, তাহাও সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

রামনারায়ণ কয়েকখানি ক্ষুদ্রাকৃতি প্রহসনও রচনা করিয়াছিলেন, যথা 'যেমন কর্ম তেমনি ফল', 'উভয়-সঙ্কট' ও 'চক্ষুদান'। ইহাদের মধ্যে সমসাময়িক সামাজিক জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতি যে ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে, দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার নাটকের মধ্য দিয়া ইতিপূর্বেই তাহার পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন; রামনারায়ণের ক্ষুদ্র প্রহসন কয়খানি যে দীনবন্ধুর প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত, তাহা বলিতে পারা যায় না।

পঞ্চম অধ্যায়

উমেশচন্দ্র মিত্র

১৮৫৬

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যে সামাজিক আন্দোলন বাংলাদেশে সর্বাপেক্ষা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা বিধবা-বিবাহ আন্দোলন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁহার সকল শক্তি এই আন্দোলনের উপর নিয়োগ করিবার ফলে ইহার সমর্থনকারিগণের মধ্যে যেমন এক বিশেষ শক্তি প্রকাশ পাইয়াছিল, তেমনই রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ইহার বিরোধিতা করিবার জন্য এই আন্দোলনের মধ্যে যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাও অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়া সেকালের বাঙ্গালী সমাজ যে ভাবে দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছিল, এমন আর কোন সামাজিক আন্দোলনের মধ্য দিয়াই সমাজ তাহা হয় নাই। সেই জন্য এই সম্পর্কে বাদানুবাদমূলক যে সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ, তেমনই শক্তিশালী।

কতকগুলি কারণে বিধবা-বিবাহ সমস্যা এ দেশের সমাজে বিশেষ জটিল হইয়া উঠিয়াছিল। বাল্যবিবাহ ইহার একটি প্রধান কারণ। প্রকৃতপক্ষে এক বালবিধবার জীবনের করুণ রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের সূচনা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়ত অসম বিবাহ এবং বহু বিবাহও তাহার অন্যান্য কারণ। অর্থ কিংবা বংশের মর্যাদা দিয়া বৃদ্ধের তরুণী ভার্যা গ্রহণ করিবার ফলেও সমাজে বিধবা-বিবাহ বিশেষ একটি সামাজিক সমস্যারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। সর্বোপরি কুলীনের বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকিবার ফলে এবং কুলীন স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বয়স্কা বহু-সংখ্যক পত্নীর বৈধব্যদশাও এই সমস্যা জটিলতর করিয়া তুলিয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় শাস্ত্রের যুক্তি দেখাইয়া প্রবন্ধাকারে বিধবা-বিবাহ বিষয়ক গ্রন্থাদি রচনা করিয়া বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষে মত প্রচার করিতে লাগিলেন, প্রতিপক্ষ তাঁহার মতবাদ আক্রমণ করিয়া নূতন নূতন প্রবন্ধ গ্রন্থ রচনা করিতে লাগিল। তাহারই সূত্র ধরিয়া এই বিষয়ে নাটক রচনার ধারাও প্রবর্তিত হইল। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত বিধবা-বিবাহ বিধিবদ্ধ হয় নাই, ততদিন পর্যন্ত এই বিষয়ে একখানি

নাটকও রচিত হয় নাই। কারণ, তখন পর্যন্ত সমাজ বিশ্বাস করিতে পারে নাই যে, এমন যুগান্তকারী কোন আইন সমাজে প্রবর্তিত হইতে পারে। (বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রাণান্তকর চেষ্টার ফলে যখন ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বিধবা-বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হইল, তখন হইতেই এই সম্পর্কে নাটক রচিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই বিষয়ে সর্বপ্রথম যে নাটকখানি রচিত হইল, তাহার বিষয় একটু বিস্তৃতভাবে উল্লেখযোগ্য, তাহা উমেশচন্দ্র মিত্র রচিত 'বিধবাবিবাহ' নাটক। নাটকখানি আজ দুষ্প্রাপ্য, এমন কি অপ্রাপ্য বলিলেও হয়; সেইজন্য এই গ্রন্থে তাহার বিস্তৃত অংশ উদ্ধৃত করা হইল।

'বিধবা-বিবাহ' নাটক, ১৮৫৬ সনে প্রকাশিত হয়। এই নাটকের একটি চরিত্র অবলম্বন করিয়া তাহার রক্তমাংসের দেহের কামনা-বাসনার অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া বিধবার জীবনের যে সুগভীর বেদনাটির নাট্যকার সন্ধান দিয়াছেন, তাহার মধ্য দিয়া কেবলমাত্র ইহা এই আন্দোলনের কার্যেই সহায়ক হইয়াছিল, তাহা নহে—সমাজের বাস্তব রূপটি তাহার মধ্য দিয়া ভাষা পাইয়াছিল। ইহার সংলাপের ভাষায়, সমাজ এবং জীবন দর্শনের গভীরতায় ইহা যেমন বাংলা নাটকের ক্রমবিকাশের ধারায় একটি বিশেষ স্থান লাভ করিয়াছে, তেমনই এই দেশের সামাজিক জীবনের ইতিহাসেও একটি বিশেষ স্থানের অধিকারী হইয়াছে। সেইজন্য ইহা একটু বিস্তৃতভাবে লক্ষ্য করিবার যোগ্য।)

এই নাটকের নায়িকার নাম সুলোচনা, সে যুবতী এবং বিধবা। বিধবা হইয়া অবধি পিতৃগৃহেই বাস করিতেছে। পিতার নাম কীর্তিরাম ঘোষ, তাহার স্ত্রীর নাম পদ্মাবতী। পদ্মাবতী একদিন সুলোচনার নামে স্বামীর নিকট অভিযোগ করিলেন, 'কথায় কথায় বিধবা বিয়ের কথা বলেছিলুম, তা' একেবারে নেচে উট্‌লো। বয়েস কালে কেবল কি রঙ্গ নিয়েই থাকতে হয়।' সুলোচনা রঙ্গিণী, সুহাসিনী যুবতী, কিন্তু বিধবা। কীর্তিরাম রক্ষণশীল ব্যক্তি, সেইজন্য মেয়েদের নিকট বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে কোন আলোচনা করা অসঙ্গত বলিয়া মনে করেন। তিনি বিধবা-বিবাহের ঘোর বিরোধী। কিন্তু নানা সূত্র হইতে সুলোচনা বিধবা-বিবাহের সংবাদ পায়। একদিন গ্রামের নাপিতানী কামাইবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। নাপিতানীর নাম রসবতী।

(কীর্তিরাম ঘোষের অন্তঃপুর রসবতী নাপতেনীর প্রবেশ)

রসবতী। ওগো বেলা যে আর নাই, কতক্ষণ বসে রয়েছি, তোমাদের কি

কামাবার বেলা হয় না, আমার কি আর কম্ম নেই, তোমাদের কম্মেই বসে থাক্‌বো ?

স্থলোচনা। কি লো রসবতী এসেছিস্! তোরে দেকতে পেলুম তবু ভাল। কবে এসেছিলি তা বল্‌তেছিস আমাদের কম্মেই বসে থাকবি। যে নোক হয়েছে, নোকের ভয়ে আর চলতে পারিনে। সেদিন হোঁচট খেয়ে পাটা একেবারে গেছে। আয় ছাতের উপর তলায়, কাম্‌য়ে দিবি।

রসবতী। এসময়কার মেয়েদের পারা ভার। নোক কি গা এতই ভারি, চলতে পার না। চল ছাতের উপরে চল। (উভয়ের ছাতের উপর উত্থান)

স্থলোচনা। (কামাইতে কামাইতে) হেঁলো রসবতী, তুই কি রেতে ঘুমুসনে, কামাতে কামাতে ঢুলতেছিস, কেন, বুড়ো বয়সে বুঝি নতুন কেড়েছিস ? সেকেলে মানষের ধ্যান বোঝাই ভার।

রসবতী। সে কি গো, তোমাকে যে কামানই দায়। বুড়ো মানুষ, তিন কাল গেছে, এককালে ঠেকেছে, আমি আবার রেতে ঘুমুইনে। দিনের বেলা আপনার দুঃখে ঘুরে বেড়াই, রেতে কি আর জ্ঞান থাকে ? যেমন শুই, অম্‌নি মরে থাকি।

স্থলোচনা। তাই বলতেছিলুম, রেতের বেলায় তোর আর জ্ঞান থাকে না।

রসবতী। না, তোমাকে বেনে কথায় পারা দায়। এখন স্থির হয়ে কামাও, আর কথায় কাজ নাই।

স্থলোচনা। (ক্ষণেক বিলম্বে) হেঁ লো রসবতী, ঐ বোসেদের বাড়ীর বারাণ্ডায় উটি কাদের ছেলে বসে আছে দেখ দেখি, আমাদের দিগে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে। আহা! রূপ তো নয় যেন সোনার থালখানি। ওকে চিনিস, ঐখানে রোজ বসে থাকে দেখতে পাই।

রসবতী। (বারান্দাভিমুখে) হেঁ গো ওঁকে চিনি, ওখানে আমি কাময়ে থাকি। উটি রামকান্ত বোসের ছেলে। ওগো ছেলেটির কথাগুলি যে মিষ্টি, বসে শুনতে হয়, এমন কথা কখনও শুনি নাই।

স্থলোচনা। ঐ দেখ, আমাদের দেখে হাসতেছে।

রসবতী। (ঐদিগে চাহিয়া) আহা! কি দাঁতগুলি, যেন মুক্তো সাজয়ে রেখেছে। ধন্তি ওর মা, এমন ছেলে গর্ভে ধারণ করেছে। হাসতেছে বটে তো—তা আমাদের দেখে হাসতেছে বল কেন, তোমাকে দেখেই হাসতেছে—আমার আর কি দেখে হাসবে।

সুলোচনা। তুই কত নেক্‌রাই জানিস। আমার সঙ্গে কি ওর আলাপ আছে, না পরুচে আছে—তা আমায় দেখে হাসবে। তুই ওদের বাড়ী আসিস্ যাস, তোর সঙ্গে বরং আলাপ থাকতে পারে। সে যা হোক এমন রূপ তো কখনও দেখি নাই, যেন চাঁদ উঠছে।

রসবতী। ওর কি এম্‌নি রূপ গা, তুমি যে একেবারে গলে পড়লে? তোমার চোক্ যে আর কোন দিগে নাই।

সুলোচনা। তুই কি চোকের মাথা খেয়েছিস লো, রূপের কথা আবার জিজ্ঞেস করতেছিস্, একবার ভাল করে দেখ দেখি।

রসবতী। (স্বাগত) আহা! ছেলেবেলা রাঁড় হয়েছে, কখন তো অন্য পুরুষের মুখ দেখে নাই, অমন রূপ দেখে মন চঞ্চল হবে তো তার আশ্চর্য কি। আমরা, বুড়ো হয়েছি, আমাদেরি মন কেমন করে, ওতো কালকের মেয়ে, ওর দোষ কি। (প্রকাশ) তাইতো গা, তোমার কি এতই মনে লেগেছে।

তারপর রসবতীর মধ্যস্থতায় সুলোচনা মন্মথর সঙ্গে পরিচিত হইল, তাহাদের গোপন মিলন চলিতে লাগিল, ফলে সুলোচনা অন্তঃসত্ত্বা হইল।

তারপর একদিন কীর্তিরাম ঘোষের বহির্বাটীতে গ্রহাচার্য পঞ্জিকা হস্তে প্রবেশ করিলে কীর্তিরামবাবু তাঁহাকে স্বাগত জানাইলেন। গ্রহাচার্য তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন। কীর্তিরামবাবু গ্রহাচার্যকে তাঁহার স্ত্রীর পেটের পীড়ার জন্য গ্রহশান্তি করিতে অনুরোধ করিলেন। কীর্তিরাম বাবুর স্ত্রী সদ্যপ্রসূতা। গ্রহাচার্য কীর্তিরামবাবুকে আশ্বাস দিয়া জানাইলেন যে, তিনি যে কেবল কুগ্রহের শান্তি করেন, তাহা নহে—গর্ভ-পরীক্ষাতেও তিনি দক্ষ। কীর্তিরামবাবু ইহা শুনিয়া গ্রহাচার্যকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া স্ত্রীকে দেখাইলেন। গ্রহাচার্য সন্তান পরীক্ষা করিতে গিয়া খনার বচন আওড়াইলেন—'বানের পৃষ্ঠে দিয়া বান, পেটের ছেলে টেনে আন্।' কীর্তিরামবাবুর স্ত্রী পদ্মাবতী ইহাতে প্রমাদ গণিলেন। এমন সময় সুলোচনা ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া আসিয়া গ্রহাচার্যকে তাহার হাত বাড়াইয়া দিয়া করকোষ্ঠী বিচার করিতে বলিল। গ্রহাচার্য গণিয়া বলিলেন, 'মেয়েটির সব সুলক্ষণ দেখতেছি, কেবল একটা কুলক্ষণ আছে। কুলক্ষণের মধ্যে মেয়েটির সন্তানের স্থানটা ভাল নয়। একটি মাত্র সন্তান লিখতেছে, কিন্তু তাহাও শেষ রক্ষা হবে না।' পদ্মাবতী ভয় পাইয়া বলিলেন, 'সে কি গো ঠাকুর, কি বল্লেন্ সন্তান কি? গ্রহাচার্য সুলোচনার ফাঁড়া আছে বলিয়াও জানাইলেন। পদ্মাবতী বলিলেন, 'পোড়া কপাল আর কি! যেমন

কাল পড়েছে তেমনি গণকও হয়েছে।' ইহার পর গ্রহাচার্য প্রস্থান করিল। পরবর্তী দৃশ্যে দেখা গেল রসবতী রামকান্তবাবুর বাটীতে প্রবেশ করিল। মন্মথ রসবতীকে সুলোচনা সম্বন্ধে বহু কথা জিজ্ঞাসাবাদ করিল। এদিকে সুলোচনা নিজের শয়ন মন্দিরে গিয়া ভাবিতে লাগিল।

পরের একটি দৃশ্য। গ্রামে অদ্বৈত দত্তের বিধবা কন্যার বিবাহ স্থির হইয়াছে। বিবাহের বিষয় লইয়া গ্রাম্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে নানা প্রকার আলোচনা হইতে লাগিল; একদল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অর্থলোভে অদ্বৈত দত্তের বিধবা কন্যার বিবাহে পৌরোহিত্য করিতে সম্মত হইল। দারিদ্র্য বশত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজ মেরুদণ্ডহীন; সুতরাং বিবাহের অনুষ্ঠানে কোন বাধা হইল না। সুলোচনা মাতাপিতার অজ্ঞাতে বিবাহ দেখিতে আসিল।

[(অদ্বৈত দত্তের অন্তঃপুর) স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সুলোচনা, সুখময়ী ও রসবতীর প্রবেশ]

সুলোচনা। কৈ গো, কনের মা কোথা গো? বে ফুরুয়ে যাবে বলে শীগগি্র শীগ্‌গির এলেম, কৈ বর কোথা?

মোহিনী। এসো মা এসো। বর এখনও বাড়ীর ভিতর আসেন নাই, আমরা এই স্ত্রী আচারের উয্‌যুগ সুয্‌যুগ করতেছি।

সুলোচনা। কৈ গো পাড়ার আর সব কোথা? (চতুর্দিগে দৃষ্টি করিয়া) এই যে সব এসেছেন। তবে থাক ভাল আছিস্, হর ভাল আছিস্, মেনকা ভাল আছিস্, কতদিনের পর, ভাই, তোদের সঙ্গে দেখা হলো।

থাক। আর, ভাই, ভাগ্‌গিস্ বে'টা হলো, তাই তোর সঙ্গে দেখাটাই হলো। সুলোচনা, তোর মা যে তোকে আসতে দিলে? তোকে একদণ্ডের জন্যে চোকের আড় হতে দেয় না, এই রাত্রে বিয়ে দেখতে কেমন করে বেরুয়ে এলি?

সুলোচনা। (হাসিয়া) রেতে বেরুয়ে এলেম তাই আশ্চর্য হলি, কত লোক যে দিনে বেরয়ে আসে, তার কি বল দেখি? আজকাল আবার বেরোবার ভাবনা।

মোহিনী। আমার, মা, এখনও কোন কর্ম হয় নাই, আমি যাই, বর এলে তোমাদের ডেকে নিয়ে যাব।

(মোহিনীর প্রস্থান)

সুলোচনা। প্রসন্নের বর কত কথা জানে আজ দেখ্‌বো। ভাগ্‌গিশ্‌ এই বে দেখতে এসেছি বোন। তাই দুটো কথা কয়ে বাঁচবো।

থাক। সে দিগে ফাঁকি তা জানিস্? একি সেই বে পেলি? কনে এক দিগে পড়ে থাকবে, বর নিয়ে সমস্ত রাত আমোদ কর্‌বি? এ-বের বাসর ঘরে তিষ্ঠান ভার হবে, পালাবার পথ পাবি না।

সুলোচনা। তা তখন বুঝবো। বর তো প্রসন্নের চিরকালের লো, আমাদের আজ বৈ তো নয়। একবার এলে হয়, তখন দেখিস্। এখন, ভাই, চল, বাহিরে বর বসে আছে, ঐ দিগ্‌ দিয়ে দেখে আসি।

(স্ত্রীলোকদিগের বর দেখিতে গমন)

সুলোচনা। (স্বগত) আহা দিব্বি বরটি যে গা। ছেলেটি দেখে দুঃখ হচ্ছে, এমন ছেলের কপালে এই বে ছিল। তা বে-টা যেমন হোক, বরের অদৃষ্টটা ভাল, একেবারে রাঁধা ভাত পেলে। প্রসন্নের অদৃষ্টটাও ভাল বলতে হবে, আমাদের মত চিরকালটা জ্বলে পুড়ে মর্‌তো—সর্বনাশী একাদশীর ভার বইতো, সে সব দায় এড়ালো। আমাদের মত আলোচাল খেতে হবে না—চড়ুকির হাসির মত কেবল মুখে ধর্ম ধর্ম করে মরতে হবে না।

রসবতী। কি গো কেমন বর দেখলে?

সুলোচনা। এই যে নাপ্‌তেনী, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্যে তোকে খুঁজতে ছিলুম। ঐ দেখ দেখি বরের পাশে উটি কে বসে রয়েছে, ওঁকে দেখে মনটা কেমন কচ্চে, যেমন কোথায় দেখেছি বোধ হচ্চে।

রসবতী। কি গো, তুমি ওকে একেবারে চিনতে পারলে না। আমরা তো ভাল, খেলুম না ছুঁলুম না তবু ভুলতে পাল্লুম না, তুমি একেবারে সব ভুলে গেলে? এই ভাই ভালবাসা ভালবাসা কর, ভালবাসা থাম্ন না পরে। আমরা তো বয়েস কালে ভাল ছিলুম গা, যাকে একবার ভালবাসতুম তাকে কি আর ভুল্‌তুম। লোকে বলে মেয়ে মানুষের ভালবাসা আর পাখির বাসা, আছে তো আছে নেই তো নেই; ভাই, সেকথা তো মিল্লো, একবার ভাল করে দেখ দেখি।

সুলোচনা। মর্ মাগী, তোর মন জানবার জন্তে জিজ্ঞাসা করলুম। দিন রাত যাকে মনে মনে দেখ্‌তেছি, তাকে কি আবার চিনতে হয়। এখন বল্ দেখি, রসবতী, উনি কতক্ষণ থাক্‌বেন?

রসবতী। তুমি যেমন ভুলেও রসবতীকে একবার ভাব না, রসবতী তোমার জন্যে দিনরাত ভেবে মরে। তুমি কেমন করে জান্‌বে, এ বাড়ী যে মন্মথর মামাবাড়ী, এখনি জল খেতে এলে তোমরে সঙ্গে নির্জনে দেখা হবে। ভাই, এখন বুঝে দেখ দেখি, তোমাকে এত লুকয়ে চুরয়ে এখানে কেন আনলুম। বে কি কেউ কখন দেখি নাই, তাই তোমাকে বে দেখাতে আন্‌লুম? ভেবে দেখ দেখি, ভাই, সে দিন কেমন হবে, যে দিন ঐ বর আর এই কনে, মনের সুখে এই রকমে বে দেবো? তখন ভয় থাকবে না —ভাবনা থাকবে না, মনের মত মন্মথকে নিয়ে স্বচ্ছন্দে ঘর কন্না করবে।

সুলোচনা। রসবতী, তুই আশায় আকাশের চাঁদ হাতে দিস্, তোর কথায় এতদিন বেঁচে আছি। বের কথা বল্‌তেছিলি, পোড়া দেশে কতকগুলীন লোক না মলে আর কতকগুলীন না হোলে, রাঁড়ের বে কি সর্বত্রে চলবে? এই একটা বে হচ্চে, দেখিস্ দেখি এর কত গোল হবে। এক কর্ত্তা বল্‌বেন, ওর বাড়ীতে ভাত খাওয়া হবে না, আর এক কর্ত্তা বল্‌বেন, এ বের পুরুত, বর যাত্রদের এক ঘরে করা উচিত। ভাই, এই সব বুড়ো বুড়ো কর্ত্তারা এক বার ভুলেও ভাবেন না যে, বিধবা হয়ে কত লোক কত কি কচ্চে। যারা কিছু না করে ধর্ম পথে আছে, তাদের ক্লেশটাও তো ভাব্‌তে হয়, তাদের বাঁচবার সাধ কি থাকে বল দেখি?

রসবতী। ভাই, রাঁড়ের বে এখন গণ্ডা গণ্ডা হবে, যদি বেঁচে থাক আর থাকি তবে কত বে দেখাব।

সুলোচনা। সে যা হবার তা হবে, এখন বল দেখি উনি কখন বাড়ীর ভিতর আসবেন?

রসবতী। তুমি এখন স্ত্রী আচার দেখতে যাও, আমি সব ঠিক করে তোমাকে ডেকে আন্‌বো এখন।

সুলোচনা। সেই কথাই ভাল, আমাকে ভাই ডাকিস্। ঐ বর বাড়ীর ভিতর যাচ্ছে, আমরা স্ত্রী আচার দেখিগে।

[কামিনীগণের স্ত্রী আচার দেখিতে গমন]

হর। ঐ লো বর আস্‌ছে, থাক শাঁকটা বাজা, ওলো ভাবিনী তোরা সব উলু দে।

ভাবিনী। আগে এই পিঁড়িখানা পেতে দেই। তুই ভাই হাই আমলা ঝাল্ ঝাড়া বাটা নে আয়, অমনি বরণ ডালা আর শ্রীটে আনিস্। (চতুর্দিগে

নিরীক্ষণ করিয়া) কৈ কনের মা কোথা, বর এলো গিন্নীর খবর নেই, এ কেমন গো ?

হর। তুই যেমন চোকের মাথা খেয়েছিস্, ঐ যে মোহিনী এসেছে, আয় সব আয় বরণ কর্‌বার উয্‌যুগ করি। (বরকে মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান করাইয়া) (স্বগত) আহা দিব্বি ছেলেটি, মুখখানি যেন ছাঁচে তুলেছে, প্রসন্নের কপালটা ভাল বল্‌তে হবে। (প্রকাশ) আয় গো মোহিনী আয়, তোর জামাই বরণ কর্‌সে। (অন্যান্য কামিনীগণের প্রতি) তোরা ভাই ধুতরোর পিদ্দীম-গুলো জাল, চিতের কাটি একুশটা গুণে দিছিস্ ?

ভাবিনী। তোর আর গিন্নেপানা দেখে বাঁচিনে, আমরা কি কখন বে দেখিনে তা এ দিছিস্, ও এনেছিস, জিজ্ঞাসা কর্‌তেছিস্ ? এই সব এনে রেখেছি। তুই আগে তুক তাক্‌গুলো কর, এই কুলুপ নে, (কর্ণে কর্ণে) এই মাকুটা নিয়ে বরকে একবার ভ্যা করা দিগি দেখি।

হর। (বরকে সম্বোধন করিয়া) ভাই, আজ ওজর কল্লে চলবে না। (মাকু দিয়া) এই হাতে দিলুম মাকু, ভ্যা করতো বাপু।

ইহার পর বাসর ঘরের এক জীবন্ত চিত্র প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে দেখা গেল, স্থলোচনাও সমবয়স্কা সখীদিগের সঙ্গে হাস্যপরিহাসে মত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

স্থলোচনা। এখন ক্রমে রাত শেষ হলো, তোমার একটি গান শোনবার জন্যে আমরা সব ব'সে র'য়েছি, আমাদের একটি গান শোনাও।

বর। তাই এতক্ষণ বলতে নাই ? কি গান গাব বল দেখি, বল্ মা তার গোছ, একটা রামপ্রসাদী গাব ?

স্থলোচনা। ওমা ! আমরা কি তোমার রামপ্রসাদী শোনবার জন্যে ব'সে রয়েছি ? রামপ্রসাদী গেয়ে ভিক্ষা করে, আমরা ঢের শুনেছি।

বর। তবে একটি সখী সম্বাদ গাই ?

স্থলোচনা। কেন আমরা কি কখন কবী শুনি নাই ? তা তোমার কাছে সখী সম্বাদ শুন্‌বো ?

বর। তবে একটি রামমোহন রায়ের গীত গাই।

স্থলোচনা। একি ধান ভানতে শিবের গীত ? বাসর ঘরে রামমোহন রায়ের গান ?

বর। তবে সব গোল ঘুচ্‌য়ে একটু হরি সংকীর্তন করি ?

সুলোচনা। কেন, আমাদের তো অন্তিম কাল উপস্থিত হয় নাই, তা তুমি হরি সঙ্কীর্তন করবে? হরি সঙ্কীর্তন শোনবার অনেক সময় আছে। যদি ভাই গাও তবে আর নেক্‌রায় কায নাই।

বর। তবে কি গান গাব, তোমরাই বল। একটি নিধু বাবুর টপ্‌পা গাই?

সুলোচনা। দেখলো হর দেখ্, তবে নাকি বর রসিক নয়? আমি তো বলেছিলেম, ধুকড়ির ভেতর খাসা চাল আছে। (বরের প্রতি) যাই, রাত শেষ হয়েছে। আমাদের সব এখনি বাড়ী যেতে হবে, একটি টপ্‌পা গাও শুনে যাই।

বর। (গীত) 'এখন রজনী আছে, বল কোথা যাবে রে প্রাণ। কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর হোক নিশি অবসান। অরুণ উদয় হবে, সুকমল প্রকাশিবে, কুমুদ মুদিত হবে, শশী যাবে নিজস্থান।' এই তো গান গাইলেম, এখন তোমার, ভাই, একবার নাচ্‌তে হবে, না বল্লে শুনবো না।

হর। এইবার দেখা যাবে সুলোচনা, বড় বরের সঙ্গে লেগেছিলে, এখন নাচ দেখি, কেমন মেয়ে দেখি।

সুলোচনা। ওলো বুঝ্‌তে পাল্লিনে; সমস্ত রাত জেগে বরের বাতিক বৃদ্ধি হয়েছে, তা না হলে ভাল মানুষের মেয়েদের নাচতে বলে? এখন সকাল হলো, বাড়ী যাই।

বর। তোম্‌রাই দেখগো হার কার হলো, আমাকে বল্‌তেছিলেন, এখন পালায় কে দেখ।

সুলোচনা। (গমনোদ্যোগে গাত্রোত্থান করিয়া) ওলো হর, তোদের বরের জিত হয়েছে, ওঁর মাথায় জয়পত্র বেঁধে দিস্, আমরা এখন চল্লুম, আয় লো রসবতী আয়, সুখময়ী আয়, বাড়ী যাই।

রসবতী। চল গো চল, পাল্‌কি বসে রয়েছে, আর দেরি করে কায নাই। আমি আর তোমাদের সঙ্গে যাব না, কাল দেখা হবে।

(সুলোচনা ও সুখময়ীর প্রস্থান)

এই বিধবা-বিবাহের ঘটনা লইয়া গ্রাম্য সমাজে নানা প্রকার কথাবার্তা চলিতে লাগিল। তারপর সমাজের যাঁহারা কর্তৃস্থানীয়, তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন যে, যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্ত আর কিছু করিবার উপায় নাই; কিন্তু যাহাতে ভবিষ্যতে আর গ্রামে বিধবা-বিবাহ হইতে না পারে, সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

এদিকে সুলোচনা মন্মথর সঙ্গে অবৈধ মেলামেশার ফলে অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছে। প্রসবের সময় আসন্ন হইয়া আসিল দেখিয়া একদিন সুলোচনা আত্মহত্যা করিবার জন্য বিষপান করিল। কীর্তিবাস ঘোষ মুমূর্ষু কন্যার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তিনি পূর্বেই সকল বিষয় জানিতে পারিয়াছিলেন।

সুলোচনা। (অতি মৃদুস্বরে) মা, আমার কথা বন্ধ হয়ে আসছে, আর চোকে দেখতে পাচ্চিনে। (হাত বিস্তার করিয়া) কৈ তুই কোথা, মা? আমার বুকের ভেতর কেমন কচ্চে—বুকে হাত দে।

পদ্মাবতী। এই যে আমি মা। (ক্রন্দন করিতে করিতে) ও মা আর কেন অভাগিনীকে মা বলে ডাক্‌তেছিস? ও মা বিষ খেয়ে কি এখনও তোর মায়া আছে? ও মা তুই সকলকে কেমন করে ফাঁকি দিয়ে চল্লি? ও মা তোর চাঁদ মুখ আর না দেখে কেমন করে বেঁচে থাকবো? ওমা তুই কোথায় যাবি, আমায় সঙ্গে করে নে যা। (চতুর্দিগস্থ আর আর সকলকে সম্বোধন করিয়া) ওগো এর কি আর উপায় নাই? তোরা কাকেও ডাক না, না, এর কি চিকিৎসা নাই?

সুলোচনা। ওমা আর চিকিৎসায় কাজ নাই, আমি আর অল্পক্ষণ বেঁচে থাকবো, আমার মত অভাগিনীর জন্যে কেন তুমি এত বিলাপ করতেছো? মা আমি মরে গেলে আমাকে ভুলে যেও। মা তোমার সব রইলো, স্বচ্ছন্দে সংসার ধর্ম কর। মা আমি কি সুখে বেঁচে ছিলুম বল দেখি, তা আমার জন্যে তুমি দুঃখ করতেছ? আমার মরণ হলো, এখন হাড় যুড়ুলো। ও মা বাবা এসেছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা হোল না।

পদ্মাবতী। এ যে তিনি এসেছেন, হায় হায়! তিনি যদি মানুষ হতেন তবে তোর মা এমন দশা কেন হবে? বিধবার বে হলো, সর্বনাশ হলো বলে দলাদলি করে বেড়য়েছেন, এমন করে সর্বনাশ হয়ে গেল।

কীর্তিরাম। অধর্মে পতিতা কন্যার মৃত্যুশয্যায় কৃতঘ্ন ভার্যা আপন স্বামীকে মিথ্যা নিন্দা করিতেছ? যে সম্পূর্ণ অপরাধী, তাহার পরিবর্তে আমাকে অপরাধী করিতেছ?

পদ্মাবতী। এখন তোমার মেয়ে মত্তে যাচ্ছে, আমাকে তুমি মুখ করে বসলে।

কীর্তিরাম। কন্যার মৃত্যু আপন কর্মদোষে উপস্থিত হইয়াছে। এমন কন্যার মৃত্যুতে দুঃখিত হওয়া নিতান্ত মূঢ়ের কর্ম।

সুলোচনা। পিতা আমার কর্মদোষেই আমি মর্‌তেছি তার সন্দেহ নাই, কিন্তু এই অন্তিমকালে আমার অপরাধ ক্ষমা কর।

কীর্তিরাম। পরদার পাপের ক্ষমা নাই।

সুলোচনা। পিতা ক্ষমা কর।

কীর্তিরাম। আত্মঘাতীর ক্ষমা নাই।

সুলোচনা। পিতা আর সকলেই আমাকে ক্ষমা করেছেন, তুমি আমার প্রতি নির্দয় হয়ো না।

কীর্তিরাম। দুর্ভাগা সন্তান! যখন আমার নির্মলকুলে কলঙ্কার্পণ করিয়াছিলে তখন আমার প্রতি তোমার দয়া হইয়াছিল? যখন পরদারিক আমোদে উন্মত্তা ছিলে, তখন আমার ভবিষ্যৎ লজ্জা ও কলঙ্ক ভ্রমেও বিবেচনা করিয়াছিলে? এখন ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছ?

সুলোচনা। পিতা তন্নিমিত্ত বিস্তর শাস্তি পেয়েছি—বিস্তর অনুতাপ করেছি।

কীর্তিরাম। হা দুশ্চারিণী! এক্ষণে তোমার পরকালের আশঙ্কা হইয়াছে, ইহাই তোমার অনুতাপ। তুমি একদিনের জন্য পূর্ব পাপের আক্ষেপ করিতেছ, আমি যতদিন জীবিত থাকিব, তোমার জন্য কাহারও সহিত সাহসপূর্বক আলাপ করিতে পারিব না। হা! তোমার এক দিবসের আক্ষেপে এই সমুদয় পাপ বিমোচন হইবে? হা অভাগিনী! তোমার ইহকালে ক্ষমা নাই; তোমার পরকালে ক্ষমা নাই।

সুলোচনা। হা পরমেশ্বর! তুমি আমাকে একেবারে পরিত্যাগ করিলে? আমার পিতা আমাকে ক্ষমা করলেন না? পিতা এক্ষণে আক্ষেপ ও অনুতাপ ভিন্ন আমার আর কি উপায় আছে? হা! যাদের নিষ্কলঙ্ককুলে কলঙ্ক অর্পণ করলেম, যাদের অপরিসীম মনঃপীড়া দিলেম, মৃত্যুকালে তাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করণ ভিন্ন আর কি উপায় আছে? বিবেচনা কর দেখি, বাল্যকালাবধি আমি কোন দিবস সুখী হয়েছি? পিতা আমার মত অভাগিনী এই ত্রিজগতে আর কে আছে?

কীর্তিরাম। পাপীয়সী, এ দেশে কি আর বিধবা নাই? তুমিই সারা জীবন ক্লেশ পাইয়াছ, আর কেহ কি ক্লেশ পায় নাই? সকলেই কি তোমার মত পাপ পঙ্কে নিমগ্না হইয়াছে।

সুলোচনা। পিতা, সকলের কি সমান প্রবৃত্তি? সকলের কি সমান সহ্য-গুণ? যাদের স্বাভাবিক সু-প্রকৃতি তারা ধর্ম পথে আছে, যাদের মন

আমার মত চঞ্চল তাদের এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটেছে। হায়! আমার যদি পতি আশ্রয় থাকতো, তাহলে কি আমি এরূপ কুকর্মে রত হতেম? তা হলে কি আমাকে আত্মঘাতিনী হতে হতো, তাহলে তোমাকে কি কলঙ্ক—লোকলজ্জা ভোগ করতে হতো? (অত্যন্ত ক্লান্তা হইয়া) আঃ, আর কথা কইতে পারি না, বুঝি বাক্‌রোধ হলো। পিতা আমার অপরাধ মার্জনা কর।

পদ্মাবতী। তুমি পাষাণ দে মন বেঁধেছ? মেয়ের এত খেদেও কি তোমার দয়া হয় না?

কীর্তিরাম। (স্বগত) হা! শেষাবস্থায় শাস্তির শেষ হইল! হা! এখন চাক্ষুষ দৃষ্টান্ত দ্বারা বিধবা বিবাহের কর্তব্যতা প্রমাণ হইল। হা! সুলোচনার যদি বিবাহ দিতাম, তাহা হইলে এ বিপদ কদাচ ঘটিত না, কিন্তু "নির্বাণদীপে কিমু তৈল দানং" এক্ষণে আর কি উপায় আছে। হা! আমি বিধবা বিবাহের কত বিপক্ষতাচরণ করিয়াছি। এক্ষণে আমাকে এই স্ত্রী হত্যা পাতকের অংশী হইতে হইল। হায় হায়! এখন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। (প্রকাশ) হা দুর্ভাগা সন্তান! তোর বিলাপে আমার ক্রোধ দূরে থাকুক, হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। তোকে ক্ষমা করা দূরে থাকুক, আমি তোর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। হা! আমি যদি ভ্রমান্ধ না হইয়া তোর বিবাহ দিতাম, তাহা হইলে তোর এরূপ মৃত্যু কদাচ হইত না। হা! তোর মত কত দুর্ভাগা রমণী এইরূপে জীবন পরিত্যাগ করিয়াছে। হা! স্বামী আশ্রয় পাইলে তোর মত কত অভাগিনী এইরূপ বিপদে পতিত না হইয়া স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতে পারিত। (সুলোচনার শয্যায় বসিয়া) হে করুণানিধান সর্বান্তর্যামী পরমেশ্বর! এই দুর্ভাগা রমণীকে আমি যেমন আর ঘৃণা করিতে না পারিয়া ক্ষমা করিলাম, তুমি সেইরূপ ক্ষমা কর। তাহার পাপের সমোচিত শাস্তি দিয়াছ।

সুলোচনা। পিতা, এখন মৃত্যুকেও কিঞ্চিৎ স্বচ্ছন্দ বোধ হবে। হে পরমেশ্বর! তুমি এখন আমাকে আর পরিত্যাগ করবে না, কারণ আমার জন্মদাতা পিতা আমাকে ক্ষমা করিলেন। (স্বগত) হে জগদীশ্বর! যিনি আমার এই দুর্দশার কারণ, যাহারা এই কুকর্মে আমাকে কোনরূপে সাহায্য করিয়াছে, মৃত্যু শয্যায় সরলান্তঃকরণে তাহাদিগকে ক্ষমা করিতেছি। আমার দুর্ভাগ্যের কারণ আমি ভিন্ন আর কেহ নহে, হা! আমি যদি ইচ্ছা

করিতাম তবে অনায়াসেই তোমার নিয়ম প্রতিপালন করিতাম। তাহারা যদি আমার দুর্ভাগ্যের কারণ হয়, আমিও তাহাদের পাপের কারণ হইয়াছি। (প্রকাশ) মা আর যে কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি না! কৈ, তোমার হাত দেও, বাবা তোমার হাত দেও, দিদিরা তোমরা কোথা, তোমাদের হাত দেও। (সকলের হস্ত ধরিয়া) আমাকে শেষ বিদায় দেও, আমার অপরাধ মার্জনা কর, মধ্যে মধ্যে স্মরণ করো, এক অভাগিনী তোমাদের সংসারে জন্মেছিল, পরে আপনার কর্ম দোষে অধর্মে পতিত হয়ে আত্ম-ঘাতিনী হয়েছে।

[সুলোচনার মৃত্যু ও সমস্ত পরিবারের আক্ষেপ]

এই ঘটনায় মন্মথ উন্মাদ হইয়া উন্মাদাগারে স্থান লাভ করিল। বাংলা নাটকে প্রথম উন্মাদ চরিত্রের পরিকল্পনা রূপে নাটকের এই শেষাংশটুকও উল্লেখযোগ্য—

[(বাতুলাগার) চিকিৎসক উপস্থিত, শ্যামাচরণ মিত্রের প্রবেশ]

চিকিৎসক। আসুন মহাশয়, এখানে আপনার কি প্রয়োজন হইয়াছে?

শ্যামাচরণ। আমার একটী আত্মীয় এই স্থানে আছে, তাহাকে দেখিতে আসিয়াছি।

চিকিৎসক। (গাত্রোত্থান করিয়া) আসুন মহাশয়, এই দিগ্‌ দিয়া আসুন।

শ্যামাচরণ। (যাইতে যাইতে) মহাশয়, এই ঘরের দ্বার রুদ্ধ দেখিতেছি, অথচ ঘরের মধ্যে অত্যন্ত চিৎকার শব্দ হইতেছে, কারণ কি?

চিকিৎসক। মহাশয়, যে সকল রোগীদিগের আরোগ্য হওনের সম্ভাবনা নাই, তাহাদিগকে এই ঘরে রাখিয়াছি। এই সকল বাতুলদিগের বদ্ধ করিয়া না রাখিলে অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করে। বায়ুরোগের কি রূপ আশ্চর্য গতি, আপনি চাক্ষুষ দেখুন। (দ্বার মোচন করিয়া) ইহার মধ্যে একজন বড় আশ্চর্য বাতুল আছে, সে সর্বদা একটি স্ত্রীলোকের নাম করে।

বাতুল। (উচ্চৈঃস্বরে) উ! উ! উ! উ! উ! উ! আমি চাঁদ ধরেছি! এই দেখ্‌ এই দেখ্‌!

বাতুল। হা! হা! হা! হা! হা! হা! আমার হাতে তারা আছে! তোরা কে কটা নিবি আয়!

বাতুল। ও! ও! ও! ও! ও! আগুন লেগে সব পুড়ে গেল, ধর ধর ধর! গেলুম গেলুম!

বাতুল। তোরা সব কেন এখানে এলি, জানিস্‌নে আমি একবার খুন্‌ করেছি? সব খুন্‌ করবো। সুলোচনা! সুলোচনা! সুলোচনা! সুলোচনা! (হাস্য) হি! হি! হি! হি!

শ্যামারণ। (আশ্চর্য হইয়া) মহাশয়, এ পাগলটী কে? কত দিবস এখানে আছে?

চিকিৎসক। ঐ পাগলের কথা মহাশয়কে বলিতেছিলাম, সর্বাদা ঐ স্ত্রীলোকের নাম করে। প্রায় এক বৎসর আমার নিকট আছে, শুনিয়াছি কাহাকে খুন্‌ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহাতে রাজাজ্ঞায় এই বাতুলাগারে বদ্ধ আছে। আপনি ওকে যদি ভাল রূপে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে এই দিগে আসুন।

শ্যামাচরণ। (উত্তম রূপে নিরীক্ষণ করিয়া) (স্বগত) কি আশ্চর্য! এ যে রামকান্ত বসুর পুত্র মন্মথ দেখিতেছি। হা! এই খেদ জনক ঘটনায় কত লোকের সর্বনাশ হইল। ইস্‌! আমার শরীর কম্পান্বিত হইতেছে, এস্থানে আর অধিক কাল অবস্থান করিতে পারি না। অদ্য আমার রোগী দেখা হইল না, এক্ষণে বাটী গমন করা কর্তব্য। (প্রকাশ) মহাশয় দ্বার রুদ্ধ করুন, আমার দেখা হইয়াছে।

চিকিৎসক। (দ্বার রুদ্ধ করিয়া) আপনি আর কোন রোগী দেখিবেন? আসুন।

শ্যামাচরণ। না মহাশয়, আজ বাটী যাই, আর এক দিবস আসিব। (স্বগত) হে সর্ব সৃষ্টি-কর্তা সর্ব শাসন কর্তা পরমেশ্বর। তুমি সময়ে সময়ে এই পৃথিবীতেই পাপীদিগের প্রতি তোমার অপরিসীম ক্রোধ প্রকাশ কর, তাহাদিগের পাপের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান কর। (শ্যামাচরণ মিত্রের প্রস্থান)

কোন সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বমূলক ধারা অনুসরণ করিয়া যে মন্মথর উন্মাদ পরিচয় এখানে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা নহে—সে যুগের সামাজিক নাটকে পাপীর শাস্তি নির্দেশ করা বিষয়ে যে দায়িত্ব ছিল, এই দৃশ্যে তাহাই নির্দেশ করা হইয়াছে মাত্র। সেই জন্য নাটকের এই শেষাংশ নিতান্ত বক্তৃতাধর্মী হইয়া উঠিয়াছে।

বিধবা-বিবাহ নাটকে ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর কাব্য' এবং রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকের প্রভাব অনুভব করিতে পারা গেলেও এ কথা অবিসংবাদিত রূপে সত্য যে ইহার মধ্যেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যে

পূর্ণাঙ্গ চরিত্রসৃষ্টি সার্থকতা লাভ করিয়াছে। এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তখন পর্যন্ত নাটক ব্যতীত সাহিত্যের আর কোনও রূপ পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লাভ করিতে পারে নাই। নাটকের মধ্যে ইতি-পূর্বে কেবলমাত্র তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' এবং রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকে চরিত্র সৃষ্টির যে প্রথম প্রয়াস দেখা দিয়াছিল, তাহাতে এই প্রয়াস সবে মাত্র উন্মেষ লাভ করিলেও কোন দিক দিয়া পূর্ণাঙ্গ বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু 'বিধবা-বিবাহে'র নায়িকা সুলোচনা চরিত্র পূর্ণাঙ্গ নাটকীয় চরিত্র রূপে বিকাশ লাভ করিয়াছে। এই সম্পর্কে আরও একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে 'বিধবা-বিবাহ'ই বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম মৌলিক বিয়োগান্তক নাটক। ইতিপূর্বে যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' নাটকে যে বিয়োগান্তক কাহিনী নিতান্ত শিথিল ভাবে অনুসরণ করিয়া নাটক রচিত হইয়াছে, তাহার কাহিনী যেমন মৌলিক নহে —জনশ্রুতি জাত মাত্র, তেমনই তাহাতে দৃঢ়বদ্ধ কোন নাটকীয় কাহিনীও নাই। ইতিপূর্বে রচিত রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকের যে পরিণতিই নির্দেশ করা হউক না কেন, তাহাকেও বিয়োগান্তক নাটক বলিয়া উল্লেখ করিতে পারা যায় না। যে প্রকারেরই হউক, একটি বিবাহ বা মিলন দ্বারাই তাহার কাহিনীর পরিসমাপ্তি হইয়াছে; কিন্তু 'বিধবা-বিবাহ' নাটক তেমন নহে। ইহার প্রথম হইতেই অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে একটি বিয়োগান্তক পরিণতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই কাহিনী রচিত হইয়াছে। বরং ইহার পরিণামে এমন একটি দুরতিক্রম্য অবস্থার সৃষ্টি করা হইয়াছে, যাহাতে ইহা কেবলমাত্র বিয়োগান্তক নাটক বলিয়াই গৃহীত হইবার যোগ্য নহে, ইহাকে বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম ট্র্যাজিডি বলিয়াও উল্লেখ করা যাইতে পারে। সে যুগের বাংলার পারিবারিক এবং গার্হস্থ্য রূপ ইহার মধ্য দিয়া যত জীবন্ত ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা আর কোন নাটকের মধ্য দিয়া প্রকাশ পায় নাই। ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাব স্বীকার করিয়াই ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে নাটক রচনার সূত্রপাত হইলেও, প্রত্যক্ষভাবে সেক্সপীয়রের নাটকের কোন চিত্র কিংবা চরিত্র অবলম্বন করিয়া ইহাই বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম নাটক। ইহার মধ্যে যে একটি উন্মাদ চরিত্র আছে, তাহা সেক্সপীয়রের উন্মাদ চরিত্রের প্রত্যক্ষ প্রভাবজাত সৃষ্টি। ইতিপূর্বে সেক্সপীয়রের নাটকের অনুবাদ হইলেও সেক্সপীয়রের চরিত্র অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালীর জীবন হইতে নাটকীয় উপকরণ

সন্ধান করিবার প্রয়াস দেখা যায় নাই, ইহাতেই তাহার প্রথম সার্থক প্রয়াস দেখা যায়।

'বিধবা-বিবাহ' নাটকের নায়িকা স্থলোচনা, খল চরিত্র রসবতী; ইহার নায়ক চরিত্র প্রাধান্য লাভ করিতে না পারিলেও মন্মথকেই নায়ক বলিয়া অভিহিত করিতে হয়। ইহার পদ্মাবতী চরিত্রটিও বাস্তব; সুখময়ী, কীর্তিরাম এমন কি ক্ষুদ্র পাঠশালার চিত্রটিও জীবন্ত বলিয়া অনুভূত হইবে। বাংলা নাট্যসাহিত্যের আদি যুগে অর্থাৎ প্রধানত দীনবন্ধু পর্যন্ত এই নাটকখানি যে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের উপর কি সুগভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা সে যুগের নাটকগুলি যাঁহারা গভীরভাবে অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন।

চরিত্রের বিষয়ে আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই সুলোচনার কথা উল্লেখ করিতে হয়। সুলোচনাই আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রচিত সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবন্ত চরিত্র, ইহার পূর্বে কাব্যেই হউক, কথাসাহিত্যেই হউক, কিংবা নাটকেই হউক, এমন পূর্ণাঙ্গ চরিত্রের সৃষ্টি হয় নাই। সুলোচনা বাংলা সাহিত্যে রোহিণী, কুন্দনন্দিনী, বিনোদিনী কিরণময়ীর অগ্রজা। আমরা যদি তাহাকে ভুলিয়া যাই, তবে কোন পথ ধরিয়া বাংলা-সাহিত্যে যে ইহাদের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারি না। সেইজন্য তাহার বিষয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনা করি।

সুলোচনা বালবিধবা, সে বিধবা হইয়া অবধিই পিতৃগৃহে বাস করিতেছে, বিবাহিত জীবনের কোন স্মৃতি কিংবা সংস্কার তাহার মধ্যে অবশিষ্ট নাই। যৌবনের উচ্ছলতায় তাহার প্রাণ ভরিয়া জোয়ার আসিয়াছে, এমন সময় বিধবা বিবাহ বিধিবদ্ধ হইল। জননী পদ্মাবতী একদিন সুলোচনার নামে স্বামী কীর্তিরামের নিকট অভিযোগ করিয়া বলিলেন, 'কথায় কথায় বিধবা বিয়ের কথা বলেছিলুম, তা একেবারে নেচে উট্‌লো। বয়েস কালে কেবল কি রঙ্গ নিয়েই থাকতে হয়।' ভরা যৌবনে সুলোচনা কেবল রঙ্গ লইয়া আছে। কীর্তিরাম বিধবা-বিবাহের ঘোর বিরোধী, ইহার বিষয় কানে শোনাও পাপ বলিয়া বিবেচনা করেন, মাতা পদ্মাবতী সম্মানিত পরিবারের গৃহিণী, তিনিও কুলের মান-মর্যাদা রক্ষার জন্য যত সজাগ, কন্যার হৃদয়ের সুখ দুঃখের অনুভূতি সম্পর্কে তত সজাগ নহেন; সুতরাং বিধবা বিবাহ বিধিবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এই পরিবারের জীবনে এই বিষয়ে কোন চিন্তা প্রবেশ করিল না। কিন্তু বিধবা

বিবাহ বিধিবদ্ধ হইয়াছে এ কথা শুনিয়া সুলোচনার মন যে একেবারে নাচিয়া উঠিল, ইহার সুগভীর অর্থ তাহার জনক-জননী বুঝিতে না পারিলেও সুলোচনার জীবনে ইহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া অনিবার্য হইয়া উঠিল। পদ্মাবতীর কথাতেই সুলোচনার চরিত্রটি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, বয়স কালে সে রঙ্গ লইয়া আছে, মায়ের মুখের এই পরিচয়ই তাহার চরিত্রের স্বরূপটি উদ্‌ঘাটন করিয়া দিয়াছে; এই অবস্থায় বিধবা বিবাহ বিধিবদ্ধ হইয়াছে শুনিয়াছে, অর্থাৎ তাহার অবাঞ্ছিত বৈধব্য জীবন হইতে পরিত্রাণের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে বুঝিতে পারিয়া সেই রঙ্গ আরও শতগুণ হইয়া তাহার সমস্ত দেহে ও মনে উল্লাসের বান ডাকিয়া আনিল। তাহার বৈধব্য জীবনের করুণ ছায়াতল দিয়া তাহার প্রাণপূর্ণ উল্লসিত জীবনের যৌবন রথ সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া উদ্দাম বেগে ছুটিয়া গিয়াছে। তারপর গতির বেগে পিচ্ছল কর্দমাক্ত পথ হইতে সজোরে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পথিপার্শ্বের কণ্টকশয্যা আশ্রয় করিয়াছে। সদা প্রফুল্ল প্রাণপূর্ণ একটি জীবন নিয়তির নির্মম বিধানে, সমাজের হৃদয়হীন আচরণে যে কি ভাবে শুকাইয়া গেল, সুগভীর সহানুভূতির ভিতর দিয়া নাট্যকার তাহা এখানে প্রকাশ করিয়াছেন।

সুলোচনার মৃত্যুদৃশ্য এই নাটকের একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে মৃত্যুদৃশ্যের বর্ণনা এত বাস্তব এবং করুণ করিয়া কেহই চিত্রিত করিতে পারেন নাই। এমন কি, কোন মৃত্যু দৃশ্যই ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে রচিত হয় নাই। দীনবন্ধু তাঁহার 'নীলদর্পণ' নাটকে মৃত্যু দৃশ্যের পরিকল্পনার প্রেরণা যে কোথায় লাভ করিয়াছিলেন, ইহা পাঠ করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। এখানে পদ্মাবতী মুমূর্ষু কন্যাসন্তানের মৃত্যু শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া এ কথা স্বীকার করিয়াছেন যে ইহা অপেক্ষা বিধবা কন্যার বিবাহ দিলে ভাল হইত; দীনবন্ধুর রেবতী ক্ষেত্রমণির মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া তেমনই বলিয়াছিল, ইহা অপেক্ষা তাহার কন্যার সাহেবের সঙ্গে থাকাই ভাল ছিল। ইহাতে যেন তাহারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

(১৮৫৮—১৮৭৪)

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মাইকেল মধুসূদন দত্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক বলিয়াই পরিচিত, কিন্তু তিনি যে বাংলা নাটকের প্রথম প্রাণ-দাতা, তাহা কেহ গভীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখেন নাই। মধুসূদনের পূর্বে একমাত্র রামনারায়ণের নাটকের মধ্যে কোন কোন স্থানে জীবনের স্পন্দন বিচ্ছিন্নভাবে অনুভূত হইলেও, তাঁহার নাটকেই সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। অবশ্য এই পরিচয় যে সর্বত্র সার্থক হইয়াছে, তাহা বলিতেছি না; তথাপি প্রথম প্রয়াস হিসাবে তাহার যে মূল্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার কৃতিত্বের ভাগ অবশ্যই তাঁহাকে দিতে হইবে। যে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের উপর ভিত্তি করিয়া বাংলা দেশে উনবিংশ শতাব্দীতে নাট্যসাহিত্য সৃষ্টি লাভ করিয়াছিল, সেই পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে মধুসূদনের মত অধিকার ইতিপূর্বে আর কোন নাট্যকারের ছিল না; তাঁহাদের কেহ কেহ ইংরেজি নাট্যসাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই, সেই প্রতিভাও তাঁহাদের ছিল না। (সেইজন্য মধুসূদনের পূর্বে যে কয়খানি বাংলা নাটক রচিত হইয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশ, হয় সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ, নতুবা ইংরেজি নাটকের বিশেষতঃ সেক্সপীয়রের অনুবাদ।) অনুবাদের অর্থই হইতেছে যে, সেখানে স্বাঙ্গীকরণের অভাব—যেখানে সংস্কৃত কিংবা ইংরেজির ভাব নিজের ভাষায় গ্রহণ করিয়া নিজের পারিপার্শ্বিক জীবনের মধ্য দিয়া তাহার রূপ দেওয়া সম্ভব হয় না, সেখানেই অনুবাদের আশ্রয় লইতে হয়। কিন্তু মধুসূদনের মধ্যে স্বাঙ্গীকরণের প্রতিভা ছিল; সংস্কৃতই হউক, ইংরেজিই হউক, তিনি তাহার ভাবরাশি নিজের মানস-পাত্রে ঢালিয়া লইয়া তাহাকে নূতন রূপ দিতে পারিতেন, তাঁহার 'মেঘনাদবধ কাব্য'ই ইহার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। নাটকের ক্ষেত্রেও তিনি তাহাই প্রমাণিত করিলেন এবং এই বিষয়ে তিনি যে দিঙ্‌নির্দেশ করিলেন, তাহাই তাঁহার পরবর্তী নাট্যকারগণও অনুসরণ করিয়া চলিলেন।

ইহার ফলেই মধুসূদনের পরবর্তী কাল হইতেই বাংলা নাটকে অনুবাদের পথ এক প্রকার রুদ্ধ হইয়া গেল। ইহা মধুসূদনের প্রতিভার বিশিষ্ট কীর্তি বলিতে হইবে, নতুবা কে বলিবে আরও কতকাল সংস্কৃত ও ইংরেজি নাটকের এই প্রাণহীন অনুবাদ-আবর্জনায় বাংলা নাট্যসাহিত্যের সেই আদি যুগ আচ্ছন্ন হইয়া থাকিত!

(মধুসূদনের চরিত্রে আত্মপ্রত্যয় একটি প্রধান গুণ ছিল। এক অপরিসীম আত্মপ্রত্যয় লইয়া তিনি বাংলা নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন, পূর্ববর্তী কোন বাংলা নাট্যকারের অনুসরণ করিয়া নহে। সেইজন্য তাঁহার রচিত নাটকগুলির সঙ্গে ইতিপূর্বে যে কয়খানি নাটক বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহাদের বিশেষ কোন যোগ নাই।) তাঁহার নাট্যপ্রতিভা বিকাশের আর একটি দুর্লভ সুযোগ তিনি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা স্থায়িভাবে বেলগাছিয়া নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা। স্থায়িভাবে নাট্যশালা স্থাপন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহার প্রতিষ্ঠাতৃগণ নূতন বাংলা নাটকের অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ তাঁহাদের সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদের উপরই নির্ভর করিতে হইল; কিন্তু তাহাতেও মধুসূদনের একটি সুযোগ জুটিয়া গেল, তাহা হইতেই সর্বপ্রথম তিনি বাংলায় নাটক রচনার প্রেরণা লাভ করিলেন। বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে বিষয়টি বিশেষ স্মরণীয় বলিয়া তাহা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি।

রামনারায়ণ তর্করত্ন ইতিপূর্বেই কয়েকখানি বাংলা নাটক রচনা করিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, সেইজন্য বেলগাছিয়া নাট্যশালার প্রতিষ্ঠাতৃগণ নূতন বাংলা নাটকের অভাব অনুভব করিয়া তাঁহাকেই সেই অভাব পূরণ করিবার ভার দিলেন। রামনারায়ণ সংস্কৃত সাহিত্য-বিষয়ে পরম পণ্ডিত হইলেও, ইংরেজি নাট্যসাহিত্য বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন; অতএব তিনি সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদ দিয়াই সেই অভাব পূরণ করিতে অগ্রসর হইলেন— এই সম্পর্কে সর্বপ্রথম তিনি শ্রীহর্ষদেব প্রণীত সংস্কৃত নাটক 'রত্নাবলী'র বাংলা অনুবাদ করিলেন। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের একজন শিষ্য বাংলা সঙ্গীত রচনা করিয়া ইহাতে যোজনা করিলেন। বেলগাছিয়া নাট্যশালার প্রতিষ্ঠাতৃগণ নাটকখানিকে সকল দিক দিয়া অভিনয়োপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য প্রভূত অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন। অভিনয়োপলক্ষে তাঁহারা তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষক ইউরোপীয় ও অন্যান্য অবাঙ্গালী দর্শকদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে সঙ্কল্প করিলেন

এবং নাটকের বিষয় তাঁহাদের বোধগম্য করাইবার জন্য নাটকখানির একখানি আদ্যোপান্ত ইংরেজি অনুবাদ মুদ্রিত করিয়া তাঁহাদের মধ্যে প্রচার করিতে মনস্থ করিলেন। মধুসূদনের আজীবন বন্ধু গৌরদাসবাবু বেলগাছিয়া নাট্যশালার একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। মধুসূদন তখন মাদ্রাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতায় পুলিশ কোর্টে অনুবাদকের কাজ করিতেছিলেন, তিনি কলিকাতার শিক্ষিত সমাজে তখনও সম্পূর্ণ অপরিচিত—একমাত্র কয়েকজন তাঁহার হিন্দু কলেজের বন্ধু ব্যতীত কেহ তাঁহাকে চিনিত না। (গৌরদাসবাবুর মধ্যস্থতায় মধুসূদনের উপরই 'রত্নাবলী' নাটকের ইংরেজি অনুবাদের কার্য অর্পিত হইল। অত্যন্ত দক্ষতার সহিত অল্প সময়ের মধ্যে মধুসূদন এই কার্য সম্পন্ন করিয়া দিলেন এবং ইহার জন্য পাঁচ শত টাকা পারিশ্রমিক লাভ করিলেন।) ইহা হইতেই তিনি উক্ত নাট্যশালার পৃষ্ঠপোষক বিদ্যোৎসাহী রাজা প্রতাপচন্দ্র, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ও মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে পরিচিত হইলেন। (কলিকাতার বিদ্বজ্জন-সমাজে ইহাই মধুসূদনের প্রথম প্রবেশ। প্রভূত অর্থব্যয়ে এবং কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিকদিগের সম্মুখে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই বেলগাছিয়া নাট্যশালায় 'রত্নাবলী'র বাংলা অনুবাদের প্রথম অভিনয় হইয়া গেল। এই অভিনয় এত সাফল্য লাভ করিয়াছিল যে, ইহার পরও একাদিক্রমে আরও ছয়-সাত বার এই একই নাটকের অভিনয় করিবার প্রয়োজন হয়।)

('রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় ব্যাপারে রাজাদিগকে উৎসাহ ও শিক্ষিত সমাজের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া দেখিতে পাইয়া মধুসূদন নিজের দিকে ফিরিয়া তাকাইলেন।) একখানি গতানুগতিক ধারায় রচিত সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদের নাটক হিসাবে যে কতখানি মূল্য, তাহা ইংরেজি নাট্যসাহিত্যে পারঙ্গম মধুসূদন অতি সহজেই বুঝিতে পারিলেন। (ইংরেজি নাট্যসাহিত্যের রসস্নাত তাঁহার মন লইয়া তিনি অতি সহজেই বুঝিতে পারিলেন যে, গতানুগতিক সংস্কৃত নাটকের অনুবাদের নীরস পথ পরিত্যাগ করিয়া যদি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের রস ও প্রাণ দ্বারা বাংলা নাট্যসাহিত্যকে সঞ্জীবিত করা যাইতে পারে, তাহা হইলে প্রকৃতই সুফল পাওয়া যাইবে।) ইহার পূর্বে কয়েক-খানি ইংরেজি নাটকের বাংলায় অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু কেবলমাত্র আক্ষরিক অনুবাদ দ্বারা যে ইংরেজি সাহিত্যের রস-সাগরতীরে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব হয় না, তাহা মধুসূদনের মত ব্যক্তি অতি সহজেই বুঝিতে

পারিয়াছিলেন; সেইজন্য তিনি এই পথে অগ্রসর হইবার চেষ্টামাত্র করেন নাই। মধুসূদনের পূর্বে এই কথা আর কোন বাঙ্গালী নাট্যকার বুঝেন নাই এবং মধুসূদনের পরও রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কেহ এমন ভাবে তাহা বুঝিতে পারেন নাই এইভাবে মধুসূদনের সঙ্গে তাঁহার নিজস্ব প্রতিভার পরিচয় স্থাপিত হইল। অতএব বেলগাছিয়া নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা ও 'রত্নাবলী'র অভিনয় বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে দুইটি বিশিষ্ট উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শুধু নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসেই বলি কেন,—এই ঘটনার দ্বারা মধুসূদন তাঁহার সমগ্র প্রতিভার সন্ধান লাভ করিলেন, তাহার ফলেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের নাটক ও কাব্যধারার যথার্থই সূত্রপাত হইল; কারণ, মধুসূদনই প্রকৃতপক্ষে বাংলা সাহিত্যের পাশ্চাত্ত্য আদর্শে এই দুইটি ধারারই স্রষ্টা,—তিনিই বাংলা নাটক ও বাংলা কাব্যে আধুনিক যুগের প্রবর্তক।

মধুসূদনের আত্মপ্রত্যয়ের কথা পূর্বে বলিয়াছি। যে যুগে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই যুগে বাস করিয়া যদি তাঁহার এই বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় না থাকিত, তবে নিজের হাতে নূতন কোন বস্তু তিনি সৃষ্টি করিতে পারিতেন না। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে সুগভীর জ্ঞানের ফলেই মধুসূদনের মধ্যে এই আত্মপ্রত্যয় জন্মলাভ করিয়াছিল, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে জ্ঞানলাভের সঙ্গে সেই জ্ঞানকে তিনি নিজের উপলব্ধি দ্বারা স্বীকৃত করিয়া লইয়াছিলেন, তারপর প্রথম শ্রেণীর সৃজনী-প্রতিভা তাহার সহিত আসিয়া যুক্ত হইয়াছিল। ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে এমন যোগাযোগ দেখিতে পাওয়া যায় নাই; এমন কি, পরবর্তী কালেও সমগ্র বাংলা সাহিত্যে একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত এই প্রকার যোগাযোগ সম্ভব হয় নাই।

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে সুগভীর জ্ঞান, তাহার প্রতি অপরিসীম বিশ্বাস, নিজের মৌলিক সৃজনী-প্রতিভা এবং অপরিমেয় আত্মপ্রত্যয় লইয়া মধুসূদন নাট্যরচনার ভিতর দিয়াই বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম প্রবেশ করিলেন। 'রত্নাবলী' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করিতে গিয়া তিনি সংস্কৃত নাটকের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন এবং অনুরূপ রচনার ভিতর দিয়া যে উচ্চাঙ্গ নাট্যরস পরিবেশন সম্ভব হইতে পারে না, তাহাও অনুভব করিয়াছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী-লেখক এই বিষয়টি বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

নাট্যরচনার সর্বপ্রথম প্রয়াসরূপে মধুসূদন মহাভারতের একটি ঘটনা অবলম্বন করিয়া 'শর্মিষ্ঠা' নাটক রচনা করিলেন। কিন্তু মধুসূদন ইংরেজি নাটকের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইলেও অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তাঁহার এই নাটকের মধ্যে বৈদেশিক আদর্শকে ব্যবহার করিলেন; এমন কি, বৈদেশিক আঙ্গিক কিংবা আদর্শ কাহারও প্রভাব অন্তত তাঁহার প্রথম রচনাটির মধ্যে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই,—অথচ একথাও সত্য যে, ইহা পুরাপুরি সংস্কৃত নাটকের আদর্শেও রচিত হয় নাই। পরিবর্তনকে বিশ্বাস করিলেও মধুসূদন চরমপন্থী ছিলেন না। নাটক কিংবা কাব্য এই উভয়ের মধ্যেই তিনি দেশীয় উপাদান ও পরিচিত পরিবেশকেই ভিত্তি করিয়া লইয়াছেন—ইহা তাঁহার প্রতিভার বিশিষ্ট গুণ ছিল, তাহা না হইলে মধুসূদনের সমগ্র সাহিত্য-সাধনা বাঙ্গালীর রস চৈতন্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িত। তাহা হয় নাই বলিয়াই বৈদেশিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াও মধুসূদন বাঙ্গালীরই কবি—উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর প্রাণের কথাই তিনি নূতন সুরে বাঁধিয়া দিয়াছেন মাত্র।

মধুসূদনের সর্বপ্রথম রচনার ভিতর দিয়াই তাঁহার প্রতিভার এই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে। তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা' নাটক দৃশ্যত সংস্কৃত নাটকের অনুকরণে রচিত বলিয়া মনে হইলেও, রক্ষণশীল পণ্ডিত সম্প্রদায় ইহার মধ্যে যে ত্রুটির সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহা তদানীন্তন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের এই পত্রটি হইতে জানিতে পারা যাইবে। বেলগাছিয়া নাট্যশালার উদ্যোক্তাগণ তাঁহার নিকট 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের পাণ্ডুলিপিটি দেখিতে দিলে তিনি লিখিয়া পাঠাইলেন যে, 'সংস্কৃত রীতি অনুসারে ইহা নাটকই হয় নাই; কাটকুট করিলে রচনাটি সমুদয়ই নষ্ট হইবে, আমার ইহা সংশোধন করিতে ইচ্ছা নাই। বোধ হয়, ইহা কোন ইংরেজি-শিক্ষিত, নব্যবাবুর রচনা হইবে' (মা-ম-জী, ২২৯)। অথচ সাধারণ পাঠকমাত্রই ইহাকে সংস্কৃত নাটকেরই অনুকরণে রচিত বলিয়া ভুল করিতে পারেন।

মধুসূদনের এই প্রকার সংস্কৃতের আনুগত্যের আরও কারণ ছিল। তিনি তখনকার জনসাধারণের রুচির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন; কারণ, যে দর্শক-গোষ্ঠী 'রত্নাবলী'র মত একখানি অকিঞ্চিৎকর নাটকের একাদিক্রমে ছয়-সাত রাত্রি অভিনয় দেখিয়াও ক্লান্তিবোধ করে নাই, তাহাদের সম্বন্ধে যে বেশি কিছু আশা করিতে পারা যায় না, মধুসূদনও ইহা বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার নাটকও এই

একই দর্শকগোষ্ঠী ও পৃষ্ঠপোষকবৃন্দের মনস্তুষ্টির উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল। তখনকার দিনে মধুসূদনের পক্ষে তাঁহার নিজস্ব আদর্শের অনুগামী স্বাধীন কোন রচনা প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। একটি বিশিষ্ট রুচিসম্পন্ন নির্দিষ্ট দর্শকগোষ্ঠীর জন্যই মধুসূদনকে তাঁহার নাটক রচনা করিতে হইয়াছিল, সেইজন্য যাহাতে কোন অভিনবত্ব ইহাকে আঘাত করিতে না পারে, সেইদিকে তাঁহাকে লক্ষ্য রাখিতে হইয়াছিল। এক কথায় বলিতে গেলে, 'শর্মিষ্ঠা' নাটক তাঁহার পরমুখাপেক্ষী রচনা, সম্পূর্ণ স্বাধীন রচনা নহে। পরমুখাপেক্ষী রচনা বলিয়াই, ইহার মধ্যে মধুসূদনের স্বকীয় প্রতিভার স্বাধীন বিকাশ অপেক্ষা অনেকটা প্রচলিত প্রথার অনুবর্তন দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহার প্রাণবস্তুতে যে নূতনত্বের স্পর্শ তিনি দিয়াছিলেন, তাহা রক্ষণশীল মনোভাব কর্তৃক যেমন স্বীকৃত হয় নাই, তেমনই প্রকৃত উদার রসিক-সমাজ কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়াছিল। উক্ত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের মন্তব্যের পরও বেলগাছিয়া নাট্যশালার পৃষ্ঠপোষকগণ এই নাটকের পাণ্ডুলিপিখানি পাঠ করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং মধুসূদনকে ইহার জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়া ইহা তাঁহাদের নাট্যশালায় অভিনয় করিবার জন্য প্রভূত অর্থব্যয় করিতে উদ্যোগী হইলেন।

বাংলা নাটকে ক্রমে ক্রমে ইংরেজি আদর্শ গ্রহণ করা সম্পর্কে মধুসূদনের কি মনোভাব ছিল, তাহা গৌরদাসবাবুর নিকট লিখিত তাঁহার একটি পত্রে সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। এই সম্পর্কে তাঁহার যুক্তি যে তাঁহার কোন চরম মনোভাবের পরিচায়ক নহে, ইহা হইতে তাহাই বুঝিতে পারা যাইবে বলিয়া পত্রের এই অংশ এখানে একটু বিস্তৃতভাবেই উল্লেখ করিতেছি; ইহা হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাঁহার এই বিশ্বাস পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের সকল বিভাগেই জয়লাভ করিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন,

'I am aware, my dear fellow, that there will, in all likelihood, be something of a foreign air about my Drama; but if the language be not ungrammatical, if the thoughts be just and glowing, the plot interesting, the characters well maintained, what care you if there be a foreign air about the thing? Do you dislike Moore's poetry because it is full of orientalism? Byron's poetry for its Asiatic air, Carlyle's prose for its Germanism? Besides, remember that I am writing for that portion of my

countrymen who think as I think, whose minds have been more or less imbued with Western ideas and *modes of thinking*; and that it is my intention to throw off the fetters forged for us by a servile admiration of everything Sanskrit.' (ঐ ২৩১)

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সঙ্গে যাঁহার সামান্য পরিচয়ও হইয়াছে, তিনি মধুসূদনের এই যুক্তি সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইবেন। তথাপি মধুসূদন বাংলা নাটকের ভিতর দিয়া এই বিষয়ে অতি সন্তর্পণে পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া 'পদ্মাবতী' নাটকের মধ্যে একটি আনুপূর্বিক পাশ্চাত্ত্য বিষয়বস্তুকেই নূতন রূপ দিয়া লইলেন, তারপর 'কৃষ্ণকুমারী' নাটককে পূর্ণাঙ্গ পাশ্চাত্ত্য আদর্শে প্রাণবান্ করিয়া তুলিলেন। তাহার পর হইতে বাংলা নাটকে সংস্কৃতের আদর্শ একেবারেই পরিত্যক্ত হইয়া গিয়া, তাহার পরিবর্তে পাশ্চাত্ত্য আদর্শকেই সর্বান্তঃকরণে অভিনন্দিত করিয়া লওয়া হইল। চারিদিকের সংশয় ও অবিশ্বাসের ভিতর দিয়া একমাত্র আত্মপ্রত্যয়ের বলে মধুসূদন যে পথে সর্বপ্রথম পদক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহার জীবৎ কালেই সেই পথই সকলের অনুসরণীয় হইয়া উঠিল।

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মধুসূদনের নাটকগুলির সঙ্গে রামনারায়ণ-রচিত 'রত্নাবলী' নাটকের কিছু কিছু বাহ্যিক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ মধুসূদনের সংস্কৃতানুরক্তি নহে। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হইবার উদ্দেশ্যেই মধুসূদন তাঁহার প্রত্যেকখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন, কোন স্বাধীন নাট্যরচনার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহা করেন নাই। সেইজন্য উক্ত নাট্যশালার মঞ্চব্যবস্থা ও অভিনেতৃ-গোষ্ঠীর উপর লক্ষ্য রাখিয়াই তাঁহার নাটকের বহিরঙ্গ গঠন করিতে হইয়াছিল। ইতিপূর্বে এই নাট্যশালায় 'রত্নাবলী' নাটক বার বার অভিনীত হইবার ফলে, ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই ইহার মঞ্চব্যবস্থা সম্পর্কিত একটি আদর্শ নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছিল; মধুসূদন তাহার উপর লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহার কয়খানি নাটকই রচনা করিবার ফলে, তাঁহার প্রত্যেকখানি নাটকেই 'রত্নাবলী' নাটকের বহিরঙ্গগত প্রভাব কিছু কিছু আসিয়া পড়িয়াছে। মধুসূদন নিজের নাটকগুলি রচনা করিবার কালে 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনেতৃ-গোষ্ঠী ও ইহার অভিনয়-কৌশলের উপর লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার নাটকের কোন কোন চরিত্র 'রত্নাবলী' নাটকের আদর্শে গঠিত হইয়াছে। ইহা তাঁহার অনুকরণপ্রিয়তা কিংবা মৌলিক

প্রতিভার অভাবের জন্য নহে। একটি বিষয় এখানে স্পষ্ট অনুভব করিতে পারা যায় যে, 'রত্নাবলী' নাটকের সাগরিকা চরিত্রটি যে ব্যক্তি অভিনয় করিত, তাহার তদুপযোগী অভিনয়-গুণের প্রতি মধুসূদনের শ্রদ্ধাবোধ জন্মিয়াছিল, অতএব তাহা দ্বারা স্বতন্ত্র প্রকৃতির স্ত্রী-চরিত্র অভিনীত করাইয়া দেখিবার পরিবর্তে মধুসূদন স্বভাবতঃই তাহাকে অনুরূপ চরিত্রের অভিনয় করিবার সুযোগ দিয়াছিলেন, তাহার ফলে তাঁহার নাটকের কোন কোন স্ত্রী-চরিত্রে সাগরিকা চরিত্রের প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছে। তাহা ছাড়া অন্যান্য আরও কয়েকটি পুরুষ-চরিত্র সম্পর্কেও একই কথা বলিতে পারা যায়। মধুসূদনকে যে কতখানি পরমুখাপেক্ষী হইয়া নাটক রচনা করিতে হইত, তাহা পরে তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক সম্পর্কে আলোচনার সময় বিস্তৃত ভাবে উল্লেখ করিব। অতএব যে অপরিসর মঞ্চ-ব্যবস্থা ও নির্দিষ্ট অভিনেতৃ-গোষ্ঠী তাঁহার নাট্যরচনা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, তাহাদের কথা বিস্মৃত হইয়া তাঁহার রচনার দোষগুণ বিচার করা সঙ্গত হয় না। সেক্সপীয়রকেও বিশিষ্ট মঞ্চব্যবস্থা ও নির্দিষ্ট অভিনেতৃ-গোষ্ঠীর উপর লক্ষ্য রাখিয়াই তাঁহার নাটক রচনা করিতে হইয়াছিল, কিন্তু সেক্সপীয়রের মত অলোক-সামান্য প্রতিভা কয়জনের আছে? অতএব মধুসূদনের প্রতিভা যত উচ্চাঙ্গেরই হউক, সেক্সপীয়রের সঙ্গে তাহার কোন দিক দিয়া তুলনা করা যাইতে পারে না।

এক অপরিসর মঞ্চ-ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মধুসূদনকে নাট্যরচনা করিতে হইয়াছে বলিয়া অনেক স্থলে তাঁহাকে দীর্ঘ সংলাপ ও স্বগতোক্তির ব্যবহার করিতে হইয়াছে। এই কথাটিই বুঝিতে না পারিয়া কেহ কেহ মধুসূদনকে ইহার জন্য দোষারোপ করিয়াছেন। কিন্তু মধুসূদনের প্রতিভার ইহা একটি ত্রুটি বলিয়া স্বীকার করা যায় না; যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে তাঁহার সকল নাট্যরচনার মধ্যেই এই ত্রুটি প্রকাশ পাইত, কিন্তু প্রায় একই সময়ে রচিত তাঁহার প্রহসনগুলি পাঠ করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, কত সংক্ষিপ্ত সংলাপ তিনি ব্যবহার করিতে জানিতেন; প্রহসনগুলির মধ্যে কোন বিশেষ মঞ্চোপকরণের প্রয়োজন হইত না বলিয়া ইহাদের মধ্যে তিনি তাঁহার প্রতিভার কতকটা স্বাধীন বিকাশ দেখাইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহার কোন প্রহসনই বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হয় নাই,—দীর্ঘ সংলাপ ও দীর্ঘতর স্বগতোক্তি-ভারাক্রান্ত নাটকগুলিই প্রশংসার সহিত অভিনীত হইয়াছে। সহজ এবং

সংক্ষিপ্ত সংলাপ সে যুগে কেহ চাহিত না; কারণ, যে রামনারায়ণ সেই যুগে শিক্ষিত রসিক সমাজের নাট্যিক রুচি গঠন করিবার জন্য দায়ী, তাঁহার মধ্যেই দীর্ঘ সংলাপ ও স্বগতোক্তির ব্যবহার পাওয়া যাইবে। সেইজন্য সেই অনুসারেই তখনকার দিনের নাট্যিক রুচি গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। নাটকীয় আঙ্গিকের দিক হইতে দীর্ঘ সংলাপ ও স্বগতোক্তি মাত্রই যে ত্রুটিজনক, তাহা স্বীকার করা যায় না; কারণ, তাহা হইলে সেক্সপীয়রের বহু রচনাই অপাঠ্য হইত। মধুসূদন কেন যে দীর্ঘ সংলাপ ও স্বগতোক্তি ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহা একটু গভীর ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলেই তাহা তাঁহার প্রতিভার ত্রুটি বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। অনেক সময় সংলাপ ও স্বগতোক্তির ভিতর দিয়া কতকগুলি ঘটনার বর্ণনা করা হইয়াছে, এই ঘটনাগুলির প্রত্যেকটির নাট্যিক রূপ দেওয়ার অর্থ পূর্ববর্তী মঞ্চ-ব্যবস্থার আদ্যোপান্ত পরিবর্তন,—ইহা ব্যয় ও শ্রমসাধ্য। বিশেষতঃ আধুনিক কালের মত তখনকার দিনে মঞ্চ-ব্যবস্থা অতি সহজে পরিবর্তিত করিয়া দিবার উপযুক্ত শিল্পীরও অভাব ছিল। বহুদিনের পরিশ্রমে ও যত্নে 'রত্নাবলী'র জন্য বিশিষ্ট মঞ্চোপকরণ নির্মিত হইয়াছিল, মধুসূদনের মত নূতন লেখক নিজের রচনার উৎকর্ষ দ্বারা নাট্যশালার উদ্যোক্তাদিগকে মুগ্ধ করিয়া সেই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করিবেন এবং তাঁহার নাটকের জন্য নূতন মঞ্চোপকরণ নির্মিত হইবে, তাহা স্বভাবতঃই তিনি কল্পনা করিতে পারেন নাই। অতএব তাঁহাকে 'রত্নাবলী'র মঞ্চোপকরণের মধ্য দিয়াই নিজের প্রতিভার বিকাশ করিতে হইয়াছে। মঞ্চ নাট্যকারের অধীন না হইয়া, নাট্যকারকেই যদি মঞ্চের অধীন হইতে হয়, তাহা হইলে নাট্যরচনার যে সকল দোষ প্রকাশ পায়, মধুসূদনের নাটকগুলির বহিরঙ্গে সেই সকল ত্রুটিই প্রকাশ পাইয়াছে।

মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটক সম্পর্কে কেহ কেহ অত্যন্ত লঘুভাবে মন্তব্য করিয়াছেন যে, তাঁহার 'নাটক পড়িতে পড়িতে অনেক সময় মনে হয় যে, আমরা বুঝি কোন সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ পাঠ করিতেছি।' ইহার প্রধান কারণ এই যে, সংস্কৃত নাটকের অনুবাদের ভিতর দিয়াই সেদিনকার বাঙ্গালীর নাট্যরুচি গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং সেই পরিবেশের ভিতর দিয়াই মধুসূদনকেও তাঁহার নাট্যরসও পরিবেশন করিতে হইয়াছে। অভিনীত হইবার উদ্দেশ্যেই মধুসূদন নাট্যরচনা করিয়াছিলেন—এই বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে তাঁহার পূর্ববর্তী নাট্যকারদিগের পার্থক্য ছিল। তারাচরণ কিংবা

হরচন্দ্রের নাটক প্রত্যক্ষভাবে অভিনয়ের উদ্দেশ্যে রচিত হয় নাই। কিন্তু অভিনীত হইবার উদ্দেশ্যেই মধুসূদন নাটক রচনা করিয়াছিলেন; এমন কি, প্রত্যেকটি নাটকের প্রতি অংশ রচনা করিয়া তাহা অভিনয়োপযোগী হইয়াছে কি না, তাহা জানিয়া লইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিষয়ে তিনি তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও নাট্যশালার অভিনয়াধ্যক্ষের পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। 'রত্নাবলী' নাটক ইহার অভিনয়-সাফল্যের গুণে যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছিল, মধুসূদনের পক্ষে সেই আদর্শের পরিবর্তন করা অসাধ্য ছিল। অতএব তাঁহাকে প্রথম অবস্থায় 'রত্নাবলী' নাটকের বাংলা অনুবাদের প্রায় সমুদয় বহিরঙ্গকে স্বীকার করিয়া লইয়াই নাট্য রচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। সেইজন্য তাঁহার নাটকের ভিতর দিয়া সংস্কৃত নাটকের অনুবাদের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।

মধুসূদন যেখানে স্বাধীন প্রতিভা-বিকাশের সুযোগ পাইয়াছেন, সেইখানেই তাঁহার প্রকৃত প্রতিভার বিকাশ হইয়াছে। এই বিষয়ে তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক এবং প্রহসন দুইখানিই উল্লেখযোগ্য। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকেরও বহিরঙ্গ অপেক্ষা অন্তরগত পরিচয়ের মধ্য দিয়াই মধুসূদনের প্রকৃত প্রতিভার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে এবং প্রহসন দুইখানির অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ উভয় ক্ষেত্রেই মধুসূদনের মৌলিক প্রতিভার পরিচয় মূর্ত হইয়া রহিয়াছে—সেইজন্য প্রহসন দুইখানিই তাঁহার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রচনা। ইহার অন্যতম প্রধান কারণ, প্রহসনের বিষয়বস্তু তিনি তাঁহার প্রত্যক্ষদৃষ্ট জগৎ হইতে স্বয়ং সংগ্রহ করিয়াছিলেন; এমন কি, ইহাদের ভাষা যে রকম কানে শুনিয়াছেন, তাঁহার রচনাতেও তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু নাটকগুলির বিষয়বস্তু অপ্রত্যক্ষ ক্ষেত্র হইতে সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। নাটকগুলি রচনাকালে তাঁহাকে মঞ্চব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইয়াছিল, কিন্তু প্রহসনগুলির বিষয়ে তিনি এই সম্পর্কে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। অতএব মধুসূদনের নাট্যপ্রতিভার বিচারকালে তাঁহার প্রহসন দুইখানির প্রতিই প্রধানতঃ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

'কৃষ্ণকুমারী' নাটক একখানি ট্র্যাজিডি, ইহাই বাংলা নাট্যসাহিত্যের সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য ট্র্যাজিডি। বাংলা বিয়োগান্তক নাটক ইহার পূর্বে ও পরে অনেক রচিত হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত ট্র্যাজিডি ইহার পূর্বেও উল্লেখযোগ্যভাবে রচিত হয় নাই, পরেও খুব বেশি রচিত হয় নাই। দুই বিপরীতধর্মী আদর্শের

পরস্পর সংঘর্ষের দ্বারা সুকঠিন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিয়া নাট্যকাহিনীর এক করুণ পরিণতি যখন অনিবার্য হইয়া উঠে, তখনই যথার্থ ট্র্যাজিডির সৃষ্টি হয়। ট্র্যাজিডির নামে যে সকল নাটক বাংলা সাহিত্যে পরবর্তী কালেও রচিত হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই কেবলমাত্র কতকগুলি করুণ ঘটনার তালিকা মাত্র—এই সকল ঘটনাও নাট্যকাহিনীর অনিবার্য পরিণতি রূপেই যে ঘটিয়াছে, তাহাও নহে। এমন কি, বিংশ শতাব্দীর বহু আধুনিক নাট্যকার ট্র্যাজিডির মূল সূত্রটি ধরিতে না পারিয়া, কতকগুলি করুণ কাহিনীর সমাবেশ করিয়া তাঁহাদের তথাকথিত ট্র্যাজিডি-সমূহ রচনা করিয়াছেন। সেইজন্যই আমি ট্র্যাজিডি কথাটিকে বিয়োগান্ত নাটক শব্দ দ্বারা অনুবাদ না করিয়া, মূল ইংরেজি শব্দটিই এই অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে প্রকৃত ট্র্যাজিডির কেবল মাত্র যে সর্বপ্রথম স্রষ্টা, তাহাই নহে—তিনি একজন সার্থক স্রষ্টা; সুদীর্ঘ প্রায় একশত বৎসরের মধ্যে মুষ্টিমেয় যে কয়খানি ট্র্যাজিডি বাংলা সাহিত্যে সৃষ্টি হইয়াছে, 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক তাহাদের অন্যতম। ইহা মধুসূদনের কম গৌরবের কথা নহে; কারণ, বাংলা নাট্যসাহিত্যের জন্মলগ্নেই তিনি ইহার একটি বিশিষ্ট রূপ-সম্পর্কিত পরিণত পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াও দীর্ঘকাল পর পর্যন্তও অনুরূপ রচনা আর কেহ প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

'কৃষ্ণকুমারী' নাটক রচনার সঙ্গেই সংস্কৃত নাট্যরচনার আদর্শের উপর যবনিকাপাত হইয়া যায়। ইহার সাফল্যে পাশ্চাত্ত্য নাট্যরচনার আদর্শের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এমন কি, সংস্কৃত-পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন পর্যন্ত তাঁহার পরবর্তী মৌলিক সামাজিক নাটক 'নব-নাটক' এই পাশ্চাত্ত্য নাটকের আদর্শে রচনা করিবার প্রয়াস পান। প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে তাঁহার কোন পরিচয় না থাকিলেও, তিনি মধুসূদনের 'কৃষ্ণ-কুমারী' ও তৎপরবর্তী দীনবন্ধুর 'নীল-দর্পণ'কেই যে এই বিষয়ে তাঁহার আদর্শ করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

সর্বশেষে মধুসূদনের ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করিতে হয়। মধুসূদন যখন 'শর্মিষ্ঠা' নাটক রচনায় হস্তক্ষেপ করেন, তখন বাংলা ভাষাসম্পর্কে তাঁহার কি জ্ঞান ছিল, তাহা মধুসূদনের জীবন-চরিত-লেখক স্পষ্ট ভাষায়ই বলিয়া গিয়াছেন। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। তিনি লিখিয়াছেন,

'একদিন রত্নাবলীর অভিনয়াভ্যাস (rehearsal) দেখিতে দেখিতে মধুসূদন গৌরদাসবাবুকে বলিলেন, "দেখ, কি দুঃখের বিষয় যে, এই একখানা অকিঞ্চিৎকর নাটকের জন্য, রাজারা এত অর্থব্যয় করিতেছেন।" গৌরদাসবাবু শুনিয়া বলিলেন, "নাটকখানা যে অকিঞ্চিৎকর তাহা আমরাও জানি; কিন্তু উপায় কি? বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় নাটক আমরা অভিনয় করি, ইহা অবশ্যই তোমার ইচ্ছা নয়। ভাল নাটক পাইলে আমরা রত্নাবলীর অভিনয় করিতাম না, কিন্তু ভাল নাটক বাঙ্গালা ভাষায় কোথায়?" মধুসূদন বলিলেন, "ভাল নাটক? আচ্ছা আমি রচনা করিব।" গৌরদাসবাবু শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বাঙ্গালা ভাষায় মধুসূদনের যত দূর জ্ঞান, তাহা তাঁহার অগোচর ছিল না। বাঙ্গালা ভাষায় একখানা পত্র লিখিতে হইলেও যে মধুসূদনের শিরঃপীড়া হইত, তাহা তিনি জানিতেন। কিন্তু তিনি, তখন ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, "ভালই! ইচ্ছা হইলে চেষ্টা করিয়া দেখিতে পার।" মধুসূদন বুঝিতে পারিলেন, গৌরদাসবাবু মুখে তাঁহাকে যাহাই বলুন, অন্তরে তাঁহার কথায় আস্থা স্থাপন করিলেন না। কিন্তু তিনি সে সময় আর কোন কথা বলিলেন না। উপেক্ষায় নিরস্ত থাকা মধুসূদনের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল। গৌরদাসবাবুর সহিত এইরূপ কথোপকথনের পরদিনই তিনি আসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকালয় হইতে সে সময়কার প্রচলিত কতকগুলি বাঙ্গালা ও সংস্কৃত নাটক সংগৃহীত করিয়া আনিলেন এবং মনোযোগের সহিত তাহা পাঠ করিলেন। ইহার কয়েক দিন পরেই তিনি শর্মিষ্ঠার পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ গৌরদাস বাবুকে দেখিবার জন্য দিলেন। যে মধুসূদন ইহার কিছু দিন পূর্বে বাঙ্গালা রচনায় পৃথিবী লিখিতে "প্র-থি-বী" লিখিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহার গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রাপ্ত হইয়া গৌরদাসবাবু বিস্মিত হইলেন। রাজা প্রতাপচন্দ্র, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র এবং মহারাজা যতীন্দ্রমোহনও গৌরদাস বাবুর মুখে মধুসূদনের নাটক রচনার সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিলেন। ইংরেজি-নবীস, মান্দ্রাজী সাহেব মধুসূদন বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতেছেন, ইহা সকলেরই পক্ষে যেন বিস্ময়ের বিষয় হইয়াছিল; পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া সকলেই চমৎকৃত হইলেন।'

মধুসূদনের নাটকের ভাষা সম্পর্কে যাঁহারা বিচার করিয়া থাকেন, তাঁহারা সাধারণত উপরোক্ত বিষয়টি বিস্মৃত হইয়া যান বলিয়া ইহা এখানে বিস্তৃতভাবে

উদ্ধৃত করিলাম। 'সে সময়কার (১৮৫৮) প্রচলিত কয়েকটি বাঙ্গালা পুস্তক ও সংস্কৃত নাটক' অধ্যয়নের ভিতর দিয়া যাঁহার বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলন সর্বপ্রথম আরম্ভ হইয়াছিল, তাঁহার প্রথম দুই-তিনখানি রচনার ভাষা বিচার করিতে গিয়া তাহাদের মধ্যে বাঙ্গালা রচনার তৎকাল-প্রচলিত আদর্শ আশা করা যে কতদূর সমীচীন হয়, তাহা সহজেই বিবেচ্য। একথা সত্য যে, নাটকগুলিতে ব্যবহৃত ভাষার মধ্যে তিনি তাঁহার নিজস্ব প্রতিভার বিকাশ করিবার সুযোগ পান নাই, ইহাতে তিনি বাধ্য হইয়াই সংস্কৃত ও তৎকাল-রচিত কয়েকখানি বাঙ্গালা পুস্তকের আদর্শকেই অনুসরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রহসনগুলির মধ্যে তাঁহার অনুসরণ করিবার মত বিষয়বস্তুর দিক দিয়া, কিংবা ভাষার দিক দিয়া অংশত একমাত্র রামনারায়ণ ব্যতীত অন্য কোন বিশিষ্ট আদর্শ তাঁহার সম্মুখে ছিল না, সেইজন্য বহুলাংশে প্রত্যক্ষ আদর্শকেই তিনি সেখানে অবলম্বন করিয়াছিলেন। অতএব এখানেই বিষয়-বস্তুর মত ভাষার দিক দিয়াও তাঁহার কতকটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে। সেইজন্য পরবর্তী নাট্যসাহিত্যে তাঁহার অন্যান্য নাটকের তুলনায় এই প্রহসন দুইখানির ভাব ও ভাষাগত প্রভাব অধিকতর কার্যকর হইয়াছিল।

এখন মধুসূদনের রুচি সম্পর্কে কিছু বলিব। একথা সত্য যে, অন্যত্র মধুসূদনের উন্নত রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া গেলেও প্রহসন দুইখানির মধ্যে তাহার ব্যতিক্রম আছে। কিন্তু প্রহসনের মধ্যে তিনি যে বিষয়গুলির রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সমগ্রভাবে জীবন্ত করিয়া তুলিবার জন্য এখানে যে এক স্বতন্ত্র রুচিবোধ কতখানি প্রয়োজনীয় ছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সামাজিক রুচিবোধ এক জিনিস, আর প্রকৃত সামাজিক অবস্থা আর এক জিনিস; অতএব আদর্শ সামাজিক রুচিবোধ দ্বারা চরিত্র ও চিত্র পরিকল্পনা নিয়ন্ত্রিত করিতে গেলে ইহাদের বিশিষ্ট বাস্তব রূপ প্রকাশে বাধা হয়। তথাপি একথা স্বীকার করিতে হয় যে, তৎকালীন বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবন-সম্বন্ধে মধুসূদনের জ্ঞান খুব প্রত্যক্ষ না থাকিবার ফলে কতকগুলি বিষয়ে একটু অবাস্তবতাও আসিয়া পড়িয়াছে। সম্ভ্রান্ত পরিবার-ভুক্ত ননদ-ভাজের পরিহাস-সম্পর্ক (joking relationship) বিষয়ে হয়ত তাঁহার ধারণা খুব স্পষ্ট ছিল না, সেইজন্যই এই বিষয়ে তিনি একটু মাত্রা অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন। মধুসূদনের অশ্লীলতার আর একটি কারণ এই

ছিল যে, তাঁহার রুচিবোধ তদানীন্তন বাঙ্গালী সমাজের রুচির উপর ভিত্তি করিয়া গঠিত না হইয়া, প্রত্যক্ষভাবে (directly) সংস্কৃত সাহিত্যের উপর ভিত্তি করিয়াও গঠিত হইয়াছিল। তাঁহার কাব্যসমূহেরও কোন কোন অংশের বর্ণনায়, তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে সংস্কৃত কাব্য ও নাটক হইতে রস আহরণ করিবার ফলে তাহাতে অশ্লীলতা প্রবেশ করিয়াছে। ইহাও পরোক্ষভাবে তাঁহার প্রহসনগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

সংস্কৃত নাটক 'রত্নাবলী'র ইংরেজি অনুবাদের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া মধুসূদন মৌলিক বাংলা নাটক রচনায় কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তখন পর্যন্তও তিনি বাংলা ভাষার অনুশীলন আরম্ভ করেন নাই। অতএব তাঁহার এই সঙ্কল্পের উপর বন্ধুবান্ধবেরা কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করিলেন না। সঙ্কল্পের দৃঢ়তা মধুসূদনের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল ; তিনি অল্প দিনের মধ্যেই যযাতি-শর্মিষ্ঠার কাহিনী অবলম্বন করিয়া 'শর্মিষ্ঠা' নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। 'শর্মিষ্ঠা' নাটক রচনাই মধুসূদনের বাংলা রচনার সর্বপ্রথম প্রয়াস। তথাপি তিনি তাঁহার সংস্কৃত শিক্ষক ও অন্যান্যের সহায়তায় বহু যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া রচনার ভাষাগত ত্রুটি দূর করিতে সচেষ্ট হইলেন। 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের কতক অংশ রচনা করিয়া তিনি তাহার পাণ্ডুলিপি তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবদিগকে দেখাইলেন, তাঁহাদের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া তিনি ইহার অবশিষ্টাংশ সম্পূর্ণ করিলেন।

যযাতি-শর্মিষ্ঠার কাহিনী সর্বজন-পরিচিত। তাহা হইলেও মধুসূদন তাঁহার নাটকে ইহার যে অংশটুকু ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

দৈত্যরাজের কন্যা শর্মিষ্ঠা একদিন দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানির সঙ্গে কলহ করিয়া তাঁহাকে এক কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। চন্দ্রবংশের রাজা যযাতি তাঁহাকে সেখান হইতে উদ্ধার করিলেন। শুক্রাচার্য তাঁহার একমাত্র কন্যা দেবযানীকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। দেবযানীর প্রতি শর্মিষ্ঠার আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি দৈত্যরাজ্য পরিত্যাগ করিতে চাহিলেন। অবশেষে দৈত্যরাজের অনেক অনুনয়-বিনয়ে এই সর্তে তিনি তাঁহার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন যে, রাজকন্যা শর্মিষ্ঠা দেবযানীর পরিচারিকা হইয়া থাকিবেন। শর্মিষ্ঠা রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া শুক্রাচার্যের আশ্রমে গিয়া দেবযানীর পরিচারিকার কার্যে নিযুক্ত হইলেন। প্রথম দর্শনের পর হইতেই যযাতি ও দেবযানী পরস্পরের প্রতি

আকৃষ্ট হইলেন। শুক্রাচার্য কন্যার মনোভাব জানিতে পারিয়া যযাতির হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন। পরিচারিকা শর্মিষ্ঠাকে সঙ্গে লইয়া দেবযানী স্বামি-গৃহে গেলেন। দেবযানীর দুই পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। কিছুদিনের মধ্যেই যযাতি ও শর্মিষ্ঠা উভয়েই উভয়ের প্রণয়াসক্ত হইলেন। গোপনে গান্ধর্ব প্রথায় তাঁহাদের বিবাহ হইল। ক্রমে শর্মিষ্ঠার গর্ভে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। অবশেষে একদিন দেবযানি শর্মিষ্ঠা ও যযাতির বিবাহের কথা জানিতে পারিয়া উভয়কে কঠোর তিরস্কার করিলেন এবং ক্রোধবশত স্বামিগৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়া পিতার নিকট স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতার কথা ব্যক্ত করিলেন। শুক্রাচার্যের অভিশাপে যযাতি জরাগ্রস্ত হইলেন। অতঃপর তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শর্মিষ্ঠার সন্তান পুরুর যৌবনের সঙ্গে নিজের জরার বিনিময় করিয়া লইলেন। পুরুর অপূর্ব আত্মত্যাগে মুগ্ধ হইয়া শুক্রাচার্য তাঁহার মাতা শর্মিষ্ঠাকে দেবযানীর দাসীত্ব হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন। দুই সপত্নীতে বিরোধের অবসান হইল। যযাতি দুই রাজ্ঞীকে লইয়া দীর্ঘকাল সুখভোগে জীবন অতিবাহিত করিলেন।

এই কাহিনীর মধ্যে প্রকৃত নাট্যিক ঘটনার সমাবেশের প্রচুর অবকাশ ছিল। অথচ নাট্যকার তাহাদের একটিরও সদ্ব্যবহার করেন নাই। ইহাই এই নাটকের সর্বাপেক্ষা গুরুতর ত্রুটি। নাট্যিক ঘটনাসমূহ চরিত্রগুলির বিরক্তিকর দীর্ঘ স্বগতোক্তি অথবা অনাবশ্যক কথোপকথনের ভিতর দিয়াই প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইয়াছে ; রঙ্গমঞ্চের উপর ঘটনাগুলির সক্রিয় সংঘটনের প্রয়াস দেখা যায় নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্ক, দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্ক, তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্ক, চতুর্থ অঙ্কের প্রথম ও তৃতীয় গর্ভাঙ্ক, পঞ্চম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্ক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সকল দৃশ্যে শুধু পূর্ববর্তী ঘটনাসমূহের বর্ণনা দিয়া কাহিনীর অগ্রগতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অথচ প্রত্যেকটি স্থলই অপূর্ব নাট্যিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। মধুসূদনের জীবনচরিতকার ইহাদের প্রথমটির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, 'দৈত্য-সভামধ্যে শর্মিষ্ঠার প্রতি দৈত্যরাজের নির্বাসনদণ্ডাজ্ঞা, শর্মিষ্ঠা উপাখ্যানের একটি উৎকৃষ্ট নাটকোচিত অংশ। সহিষ্ণুতায় এবং ধৈর্যে মহাভারতকার শর্মিষ্ঠাকে তথায় প্রকৃত দেবীরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। পিতার কঠোর আদেশ, এমন কি গর্বিতা দেবযানির ব্যঙ্গেও তাহার ধৈর্যচ্যুতি হয় নাই।

শর্মিষ্ঠা নাটকে এই অংশ পরিত্যাগ করাতে, শর্মিষ্ঠার চরিত্র পরিস্ফুটনের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে'। ইহা ছাড়াও দেবযানী কর্তৃক যযাতি-শর্মিষ্ঠার প্রণয় ব্যাপারের উদ্‌ঘাটন, শুক্রাচার্যের অভিশাপ, পুত্রের যৌবন ভিক্ষা ইত্যাদির মত উৎকৃষ্ট নাটকীয় অংশও ইহাতে পরিত্যক্ত হইয়াছে। তৎ-পরিবর্তে এই সকল বিষয়ে কতকগুলি পরোক্ষ উক্তি শুনিয়াই দর্শকদিগকে তৃপ্ত থাকিতে হইয়াছে।

এই ত্রুটির মূল কারণ, সংস্কৃত নাটকের অনুকরণ। ইহার পূর্বে যে কয়েকখানি বাংলা নাটক বিদ্বৎ-সমাজে একটু প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, যেমন 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' ও 'রত্নাবলী', তাহাদের প্রত্যেকটিই সংস্কৃত রীতি ও আদর্শেই লিখিত হইয়াছিল এবং ইহাতে সাধারণের মধ্যে এই বিশ্বাসই সুদৃঢ় হইয়া উঠিয়াছিল যে, বাংলা নাটক রচনায় সংস্কৃত রীতি একেবারেই অপরিহার্য। মধুসূদন যখন বাংলা নাটক রচনায় হস্তক্ষেপ করিলেন, তখন তিনি অন্তরে অন্তরে সংস্কৃত রীতির অনুকরণের অযৌক্তিকতা স্বীকার করিলেও, বাহ্যত এই বিশ্বাস তাঁহার এই প্রথম রচনার মধ্যে কার্যকর করিয়া তুলিতে পারিলেন না। তিনি বাংলা নাটকে পাশ্চাত্ত্য রীতি প্রবর্তনের পক্ষপাতী থাকিলেও, বাংলা নাট্যরচনার সমসাময়িক প্রভাবকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। ইহার আরও একটি কারণ ছিল—'শর্মিষ্ঠা'ই তাঁহার সর্বপ্রথম রচনা; ইহার সার্থকতার উপর তাঁহার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছিল; সেইজন্য যাহাতে ইহা তদানীন্তন বাংলা-নাটক-দর্শকদিগের নিকট একেবারেই অনাদৃত না হয়, সেই বিষয়েও তাঁহাকে লক্ষ্য রাখিতে হইয়াছিল। সেইজন্য পাশ্চাত্ত্য আদর্শের প্রেরণা সমগ্র অন্তর দিয়া অনুভব করিয়াও, তিনি তাহা তাঁহার ভবিষ্যৎ নাটক রচনার জন্যই রাখিয়া দিলেন, 'শর্মিষ্ঠা' নাটক রচনায় পরিচিত প্রথাই অবলম্বন করিলেন।

কেহ কেহ মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকেও পাশ্চাত্ত্য প্রভাব অনুভব করিয়াছেন; কিন্তু ইহা সত্য নহে। ইহার রচনায় পাশ্চাত্ত্য আদর্শের কোন প্রত্যক্ষ ও কার্যকর প্রভাব অনুভব করা যায় না। সংস্কৃত নাটকই ইহার একমাত্র আদর্শ ছিল। গ্রন্থের সূচনায় কাহিনীর অবান্তর অংশ নান্দী এবং নটী-সূত্রধরের কথোপকথন পরিত্যক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইহাকে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের নিদর্শন বলা যায় না। কারণ, অনেক পাশ্চাত্ত্য নাটকেও অনুরূপ অংশের সহিত যেমন পরিচয় লাভ করা যায় (সেক্সপীয়র প্রণীত 'রোমিও

জুলিয়েট' ও গেটে প্রণীত 'ফাউস্টে'র prologue তুলনীয়), তেমনই কোন কোন সংস্কৃত নাটকেও ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় না (ভাসের সংস্কৃত নাটকে নান্দীর ব্যবহার নাই)। সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুযায়ীই 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের কাহিনী মিলনান্তক ও শৃঙ্গার-রসাত্মক হইয়াছে। যদিও ইতিপূর্বেই এদেশে ইউরোপীয় ধরণের মঞ্চ-সজ্জা প্রবর্তিত হইয়াছিল, তথাপি মঞ্চোপকরণের অভাব পূরণার্থে সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ রহিয়াছে, ইহাতেও তাহাদের প্রায় কোনটিরই ব্যতিক্রম হয় নাই। এইজন্যই প্রথম অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কে যোদ্ধবেশী দৈত্যের দীর্ঘ স্বগতোক্তির অবতারণা করা হইয়াছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে অভিনয়-কালে দূরাহ্বান, বধ, যুদ্ধ, প্রমুখ যে সব ক্রিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে, 'শর্মিষ্ঠা' নাটকেও তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইংরেজি আদর্শে উৎকৃষ্ট নাট্যিক উপাদান থাকা সত্ত্বেও সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুযায়ী অপ্রিয় দণ্ডাদেশ বা কোন অভিশাপ ইহার অভিনয়-কালে উচ্চারিত হয় নাই। সংস্কৃত নাটকের নিপুণিকা-চতুরিকাই এখানে পূর্ণিকা-দেবিকার অংশ গ্রহণ করিয়াছে। এখানেও রাজ-বয়স্য লড্ডুক-প্রিয় মাধব্য নামক বিদূষক। এমন কি, নিম্নলিখিত অংশগুলি কালিদাস কৃত সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটক 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা'র অনুবাদ বলিয়া ধরিয়া লইতে কাহারও বেগ পাইতে হয় না ;—

রাজা।...এ কি, আমার দক্ষিণ বাহু স্পন্দন হতে লাগল কেন। এ'স্থলে সাদৃশ জনের কি ফললাভ হতে পারে ? বলাও যায় না, ভবিতব্যের দ্বার সর্বত্রই মুক্ত রয়েছে। (৩।৩)

(নেপথ্যে)—রাজনন্দিনী কোথায় গেলেন গো ? এমন দুরন্ত ছেলেদের শান্ত করা কি আমাদের সাধ্য ? (৪।৩)

তারপর ইহার মধ্যেও সর্বত্রই সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী প্রবেশী চরিত্র সম্বন্ধে দৃশ্যস্থ চরিত্র কর্তৃক পূর্বেই পরিচয় প্রদানেরও ব্যবস্থা রহিয়াছে। 'শর্মিষ্ঠা' নাটক সম্বন্ধে সহজে এক কথায় বলা যাইতে পারে যে, ইহাতে সংস্কৃত নাট্যরীতির কোনই ব্যতিক্রম দৃষ্টিগোচর হয় না ; অতএব ইহা মধুসূদনের রচনাবলীর মধ্যে স্থান পাইলেও, ইহা হইতে তাঁহার মৌলিক প্রতিভার কোন নিদর্শন উদ্ধার করা সম্ভব নহে। 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের যে সকল ত্রুটির কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা ইংরেজি আদর্শ অনুযায়ী ত্রুটি বলিয়া স্বীকৃত হইলেও, মধুসূদনের তদানীন্তন আদর্শ, অর্থাৎ সংস্কৃত নাট্যরচনার আদর্শ অনুযায়ী সর্বত্রই ত্রুটি বলিয়া স্বীকার্য নহে। শেষ যুগের শৃঙ্গার-

রসাত্মক সংস্কৃত নাটকগুলির মধ্যে যে কৃত্রিম গতানুগতিকতা ও বৈচিত্র্যহীনতা দেখা দিয়াছিল, 'শর্মিষ্ঠা' নাটকেরও তাহাই একমাত্র ত্রুটি বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে, মধুসূদন তাঁহার সর্বপ্রথম নাটকখানির রচনায় উপযুক্ত আদর্শের সন্ধান করিয়া লইতে পারেন নাই।

শেষ যুগের শৃঙ্গার-রসাত্মক সংস্কৃত নাটকের মধ্যে বিশেষ একখানি নাটককেই মধুসূদন তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা' নাটক রচনার আদর্শরূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন—তাহা শ্রীহর্ষ-রচিত 'রত্নাবলী'। তখনকার দিনে রামনারায়ণ-কৃত সংস্কৃত নাটকের এই অনুবাদখানি সুধীসমাজে যথেষ্ট লোক-প্রীতি অর্জন করিয়াছিল। অতএব একই দর্শক সমাজের মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য লিখিত 'শর্মিষ্ঠা' নাটকেও তাহার প্রভাব অত্যন্ত স্বাভাবিকই হইয়াছে। মধুসূদনের জীবন-চরিতকার লিখিয়াছেন, 'নিজের উদ্ভাবনী শক্তির উপর মধুসূদন তখনও সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। সুতরাং নিজের গ্রন্থের প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহাকে কিয়ৎ পরিমাণে "রত্নাবলী"কেই আদর্শ নির্বাচন করিতে হইয়াছিল। উভয়গ্রন্থে সেই জন্য ভাবগত এবং কোন কোন স্থলে ভাষাগত সাদৃশ্যও লক্ষিত হইবে।'

'শর্মিষ্ঠা' নাটকের মধ্যে কোন চরিত্রই সুপরিস্ফুট হইতে পারে নাই। কারণ, ইহাদের সৃষ্টি স্বতঃস্ফূর্ত নহে। পদে পদে বাহ্যিক আদর্শের বাধা ইহার স্বাধীন সৃষ্টি ব্যাহত করিয়াছে। তথাপি ইহাতে যে দুইটি চরিত্রে নাট্যকার একটু বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা ইহার নায়িকা ও প্রতিনায়িকার চরিত্র। তাহাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

শর্মিষ্ঠা 'রত্নাবলী' নাটকের সাগরিকা চরিত্রের অনুরূপ সৃষ্টি। উভয়েই রাজকুমারী, কিন্তু ভাগ্যদোষে তাহাদের মর্যাদা হইতে বঞ্চিতা। তবে শর্মিষ্ঠার এই বঞ্চনার জন্য সে নিজেই দায়ী, সাগরিকার জন্য দায়ী তাহার ভাগ্য-বিধাতা। এই উভয় চরিত্রের মধ্যে এই পার্থক্যটুকু বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার মত। সাগরিকার অনুকরণের মোহে মধুসূদন শর্মিষ্ঠার এই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যটুকু কোথাও যে বিসর্জন দেন নাই, তাহাই বিশেষ প্রশংসার বিষয়। আত্মকৃত অপরাধের গুরুত্ব স্মরণ করিয়া পিতৃপ্রদত্ত দণ্ডের বিরুদ্ধে শর্মিষ্ঠা সম্পূর্ণ নীরব রহিয়াছেন। রাজমর্যাদা-সম্ভব আভিজাত্য-বুদ্ধিই তাঁহার হৃদয়-

দৌর্বল্যের পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে এবং এই সমুচ্চ আত্মমর্যাদা-বোধই তাঁহার বিপুল দুঃখের জীবনে তাঁহার আত্মার অম্লান জ্যোতি অনির্বাণ রাখিয়া চলিয়াছে। দুঃখের ভিতর দিয়া শর্মিষ্ঠার চরিত্র অপূর্ব মহিমময় করিয়া নাট্যকার কল্পনা করিয়াছেন; তাঁহার জীবনের দুঃসংবাদ লইয়াই এই কাহিনীর আরম্ভ এবং তাঁহার সমগ্র দুঃখভোগের পরিসমাপ্তিতেই কাহিনীর উপসংহার। অতএব তাহার সঙ্গে পাঠকমাত্রেরই সহানুভূতি একান্ত স্বাভাবিক। পূর্বাপর এই সহানুভূতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে নাট্যকার প্রশংসনীয় সাফল্য লাভ করিয়াছেন।

কাহিনীর প্রতিনায়িকা দেবযানীর চরিত্রের সঙ্গে ইহার নায়িকা-চরিত্র শর্মিষ্ঠার সুস্পষ্ট পার্থক্য সর্বত্রই অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। দেবযানী পরাক্রান্ত তপস্বী শুক্রাচার্যের আদরিণী কন্যা। তিনি জানেন যে, দৈত্যরাজ তাঁহারই পিতার অনুগ্রহ-পুষ্ট। অতএব রাজকুমারী শর্মিষ্ঠার দর্পচূর্ণ করিয়া তাঁহার নীচ প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ হয়। শুক্রাচার্য কন্যাকে স্নেহ দিয়া পালন করিয়াছেন, শিক্ষা দিয়া বর্ধিত করেন নাই; তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফল-স্বরূপ দেবযানীর ভবিষ্যৎ চরিত্র যে ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা শর্মিষ্ঠা চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। উভয় চরিত্রের এই বৈপরীত্য দ্বারাই কাহিনীর নাট্যিক গুণ সৃষ্ট হইয়াছে। শর্মিষ্ঠার পুত্র পুরু যখন তাহার যৌবন দান করিয়া যযাতিকে জরামুক্ত করিল এবং শুক্রাচার্য স্বহস্তে শর্মিষ্ঠার কর যযাতির হস্তে অর্পণ করিলেন, তখনও রাজা দেবযানীর অনুমতির অপেক্ষা করিয়া বলিলেন,—

রাজা। ভগবান্ মহর্ষির আজ্ঞা শিরোধার্য। (দেবযানীর প্রতি) কেমন প্রিয়ে! তুমি কি বল?

দেবযানী শর্মিষ্ঠার প্রতি রাজার পূর্ব ব্যবহারের ইঙ্গিত করিয়া তখনও বলিলেন,—

রাজ্ঞী। (সহাস্য মুখে) নাথ! এতদিনে কি আমার অনুমতির সাপেক্ষা হলো?—৫।২

এইখানে দেবযানীর চরিত্রটি একটু বাস্তবধর্মী হইয়া উঠিয়াছে। যযাতির চরিত্রে কোন বৈশিষ্ট্যই নাই; ইহা সংস্কৃত শৃঙ্গার-রসাত্মক নাটকের নায়ক চরিত্রের আদর্শে রচিত। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য চরিত্রও বৈশিষ্ট্য-বর্জিত।

'শর্মিষ্ঠা' নাটক যখন রচিত হয়, তখনও বাংলা নাট্যসাহিত্যে পণ্ডিতি বাংলার অপ্রতিহত প্রভাব। 'আলালের ঘরের দুলাল' মাত্র প্রকাশিত

হইয়াছে সত্য, কিন্তু 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের বিষয়বস্তু আলালী ভাষায় প্রকাশের অনুকূল নহে। সেইজন্য 'শর্মিষ্ঠা'র ভাষায় মধুসূদন নূতন কোন পথের সন্ধান পাইলেন না, প্রচলিত পুরাতন রীতিরই অনুসরণ করিলেন মাত্র। বাংলায় নাট্যোপযোগী ভাষার তখনও জন্ম হয় নাই, অথচ মধুসূদনও সবে-মাত্র সংস্কৃত ভাষার মধ্য দিয়া বাংলা ভাষার অনুশীলন আরম্ভ করিয়াছেন—তখন পর্যন্তও সংস্কৃত ও বাংলায় সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া লইতে পারেন নাই। সেইজন্য প্রচলিত নাট্যিক ভাষা অপেক্ষাও তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা'র ভাষা কোন কোন স্থানে দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে।

এই সকল অপরিহার্য ত্রুটি সত্ত্বেও 'শর্মিষ্ঠা' নাটক তদানীন্তন সুধীসমাজে আদৃত হইয়াছিল এবং ইহার মধ্য দিয়াই মধুসূদনের সাহিত্য-সাধনার সূত্রপাত হইল।

'শর্মিষ্ঠা' নাটকের দুই বৎসর পর মধুসূদনের 'পদ্মাবতী' নাটক রচিত হয়; গ্রীক্ পুরাণের একটি কাহিনী এই নাটকের ভিত্তি। ইতিমধ্যে তাঁহার প্রহসন দুইখানি রচিত হইয়াছিল, তাহাদের বিষয় পরে আলোচিত হইবে। 'পদ্মাবতী' 'শর্মিষ্ঠা' হইতে নিকৃষ্ট। শুধু তাহাই নহে, 'পদ্মাবতী' নাটক মধুসূদনের নিকৃষ্টতম নাট্যরচনা। কাহিনীগত বৈচিত্র্যের অভাবের জন্য যে ইহাকে নিকৃষ্ট বলা হইয়াছে তাহা নহে, বরং কাহিনীর নাট্যিক বৈচিত্র্য তাঁহার অন্যান্য নাটকের তুলনায় ইহার মধ্যে অনেক বেশিই পরিলক্ষিত হইবে; তথাপি একমাত্র চরিত্রসৃষ্টির প্রয়াস ইহাতে সার্থক হয় নাই বলিয়াই, কাহিনীর দিক দিয়া গৌরবান্বিত হইয়াও নাটক হিসাবে ইহা নিকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে।

যে গ্রীক্ উপাখ্যান হইতে মধুসূদন তাঁহার নাটকের প্রেরণা লাভ করিয়া-ছিলেন, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া 'পদ্মাবতী' নাটকের কাহিনী বর্ণনা করা যাইতেছে। তাহা দ্বারাই এই বিষয়ে মধুসূদনের কৃতিত্বের পরিমাপ করা যাইবে।

কলহপ্রিয়া গ্রীক্ দেবী ডিস্‌কর্ডিয়া একবার সোনার আতা তৈয়ারী করিলেন। জুনো, প্যালাস ও ভেনাস এই তিনজন গ্রীক্‌দেবীর মধ্যে কে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী, তাহা লইয়া কলহ সৃষ্টি করিবার জন্য ডিস্‌কর্ডিয়া এই সোনার আতাটি তাঁহাদের মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। আতাটির গায়ে লিখিয়া দিলেন,—'সর্বাপেক্ষা সুন্দরীর জন্য।' তিনজন দেবীই আতাটি পাইবার

জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অতঃপর তাঁহারা ট্রয়ের রাজপুত্র প্যারিসকে গিয়া এই বিষয়ে মধ্যস্থ মানিয়া বলিলেন, 'আপনার বিবেচনায় আমাদের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা সুন্দরী, তাঁহাকে এই আতাটি দান করুন।' প্যারিস মহা বিব্রত হইয়া পড়িলেন। জুনো প্রবল পরাক্রান্ত দেবতা জুপিটরের পত্নী, প্যালাস বিশ্ব-জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, আর ভেনাস বিশ্ব-সৌন্দর্য ও প্রেমের মূর্ত প্রতীক্। জুনো রাজপুত্রকে আশ্বাস দিলেন, তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিলে তিনি তাঁহাকে সাম্রাজ্যের অধীশ্বর করিবেন; প্যালাস আশ্বাস দিলেন, তাঁহাকে সংগ্রামে বিজয়ী করিবেন; আর ভেনাস প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তাঁহাকে এই ব্যাপারে পরিতুষ্ট করিলে, তিনি তাঁহাকে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সুন্দরী রমণী উপহার দিবেন। প্যারিস ভেনাসকেই সোনার আতা দান করিলেন। ইহাতে জুনো ও প্যালাস ক্রুদ্ধ হইয়া প্যারিসের সর্বনাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ইহারই ফলে ট্রয়নগর ধ্বংস হইল।

এই কাহিনীটিকে যে কি সুনিপুণ কৌশলে মধুসূদন ভারতীয় পৌরাণিক পরিবেশের মধ্যে আনিয়া স্থাপন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার 'পদ্মাবতী' নাটকের নিম্নলিখিত কাহিনী-ভাগ হইতেই দৃষ্ট হইবে—

বিদর্ভাধিপতি ইন্দ্রনীল একদিন মৃগয়া করিতে আসিয়া বিন্ধ্যারণ্যের সন্নিকটবর্তী এক রম্য বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অকস্মাৎ নেপথ্যে স্বর্গীয় বাদ্য শুনিয়া মোহাবিষ্ট হইয়া তিনি একস্থানে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এমন সময় শচীদেবী, রতিদেবী ও মুরজা দেবী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মুরজা দেবী যক্ষরাজ কুবেরের পত্নী। দেবর্ষি নারদ দূর হইতে তাঁহাদিগকে দেখিলেন—কলহ-প্রিয় মুনির মনে এক ক্রূর কৌতুক জাগিয়া উঠিল। তিনি স্থির করিলেন, এই তিনজনের মধ্যে কলহের সৃষ্টি করিতে হইবে। এই বলিয়া একটি স্বর্ণপদ্ম লইয়া তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'আপনাদের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা সুন্দরী, তিনিই ইহা গ্রহণ করুন', বলিয়া পদ্মটি গিরিশৃঙ্গে স্থাপন করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। প্রত্যেকেই নিজেকে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী বলিয়া দাবী করিয়া পদ্মটি পাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। এই লইয়া তিনজনের মধ্যে তুমুল কলহের সৃষ্টি হইল। অতঃপর তাঁহারা রাজা ইন্দ্রনীলকে মধ্যস্থ মানিলেন। ইন্দ্রনীল অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িলেন। প্রত্যেক দেবীই ইন্দ্রনীলকে উৎকোচের প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন। তন্মধ্যে রতিদেবী বলিলেন, তাঁহাকে

পরিতুষ্ট করিলে, তিনি পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সুন্দরী রমণী তাঁহাকে প্রদান করিবেন। ইন্দ্রনীল রতিদেবীকেই সর্বাপেক্ষা সুন্দরী বিবেচনা করিয়া স্বর্ণপদ্মটি তাঁহাকেই প্রদান করিলেন। ইহাতে শচীদেবী ও মুরজা দেবী ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রনীলের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন বলিয়া শাসাইয়া গেলেন। রতিদেবী তাঁহার প্রতিশ্রুতি মত পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সুন্দরী রমণী মাহিষ্মতীপুরীর রাজকুমারী পদ্মাবতীকে ইন্দ্রনীলের সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দিলেন।

প্রতিহিংসা-পরায়ণা শচীর আদেশে কলি পদ্মাবতীকে হরণ করিয়া এক নির্জন অরণ্যে রাখিয়া আসিলেন। ইন্দ্রনীলের প্রতিবেশী রাজাদিগকেও কলিদেব ইতিপূর্বেই ইন্দ্রনীলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে উত্তেজিত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া ইন্দ্রনীল রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন, কিন্তু পদ্মাবতীর বিরহে কাতর হইয়া কিছুদিনের মধ্যেই তীর্থ পর্যটনে বহির্গত হইয়া পড়িলেন।

গভীর বনমধ্যে পরিত্যক্তা হইয়া পদ্মাবতী যখন বিপন্ন হইয়া পড়িলেন, তখন রতিদেবী তাঁহাকে লইয়া গিয়া অঙ্গিরার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। অঙ্গিরা মুনি তাঁহাকে সাদরে আশ্রয় দান করিলেন। এদিকে মুরজাদেবী জানিতে পারিলেন যে, পার্বতীকর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া তাঁহার কন্যা বিজয়া মর্ত্যলোকে পদ্মাবতী নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তিনিও তাঁহার দুঃখের কারণ হইয়াছেন জানিয়া অনুতপ্ত হইলেন এবং যাহাতে স্বামীর সহিত তাঁহার পুনর্মিলন সাধিত হয়, শচীদেবীর সাহায্যে তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়া রাজা ইন্দ্রনীল অঙ্গিরার আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে থাকিয়া তিনি পদ্মাবতীর সহিত মিলিত হইলেন। ভগবতীর উপদেশে দেবীদিগের মধ্য হইতে কলহের অবসান হইল।

গ্রীক্ পৌরাণিক আখ্যানের সঙ্গে 'পদ্মাবতী'র আখ্যানের মূল পার্থক্য এই যে, গ্রীক্ পৌরাণিক কাহিনী বিয়োগান্তক, কিন্তু সংস্কৃত নাটকের আদর্শে মধুসূদন 'পদ্মাবতী' নাটকের আখ্যানকে মিলনান্তক করিয়া রচনা করিয়াছেন। ভারতীয় পৌরাণিক সাহিত্যে আনুপূর্বিক 'পদ্মাবতী'র অনুরূপ কোন আখ্যায়িকা না থাকিলেও, সুপরিচিত নল-দময়ন্তীর কাহিনী ও শ্রীবৎস-চিন্তার কাহিনী হইতে নাট্যকার কোন কোন স্থানে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। একটি বৈদেশিক কাহিনীর সঙ্গে দেশীয় পৌরাণিক কাহিনীর কতকগুলি বিচ্ছিন্ন চিত্রের

এমন নিবিড় যোগ-সাধন করা হইয়াছে যে, ইহাতে কাহিনীর বৈদেশিক রূপ একেবারে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। জুনোর স্থলে শচীর, ভেনাসের স্থলে রতিদেবীর ও ডিস্‌কর্ডিয়ার স্থলে নারদমুনির পরিকল্পনা যথার্থ হইয়াছে। পুরাণ-বহির্ভূত একমাত্র মুরজা চরিত্রটিকে কুবেরের পত্নী বলিয়া তাঁহাকে কল্পনা করিয়া লইতে হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সমগ্র কাহিনীই গ্রীক্ পুরাণের ক্ষেত্র হইতে ভারতীয় পুরাণের ক্ষেত্রে অপরূপ কৌশলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। দেশীয় ও বৈদেশিক উপাদানের সামঞ্জস্য বিধানে মধুস্‌দনের যে কৃতিত্বের পরিচয় অন্যত্রও পাওয়া যায়, 'পদ্মাবতী' নাটকেও তাহার কোনও ব্যতিক্রম হয় নাই।

সংস্কৃত নাট্যাদর্শের প্রতি আন্তরিক অনুরক্তি না থাকিলেও, একমাত্র প্রচলিত রীতির মর্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া, তিনি তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে যে ভাবে সংস্কৃতের বিধিনিয়মগুলি অনুসরণ করিয়াছেন, 'পদ্মাবতী' নাটকেও তাহার কোনই ব্যতিক্রম দেখা যায় না। কাহিনীর বাহিরের দিক দিয়া ইহার উপর পাশ্চাত্ত্য প্রভাব থাকিলেও, ইহার অন্তরের আদর্শ দেশীয়; শেষ যুগের বৈচিত্র্যহীন শৃঙ্গার-রসাত্মক সংস্কৃত নাটকের আদর্শে ইহাও রচিত হইয়াছে। এমন কি কাহিনীর মধ্যে বিচিত্র নাট্যিক ঘটনা-সমাবেশের যে সুযোগ ছিল, তাহারও তিনি সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন নাই। ঘটনার দিক দিয়া ইহা তাঁহার যে কোন নাটক হইতেই সমৃদ্ধ; কিন্তু তথাপি পদে পদে সংস্কৃত আদর্শের নিকট মস্তক অবনত করিতে গিয়া ইহার ঘটনার প্রবাহকে নাট্যকার অনেকাংশে সংযত করিয়াছেন। ইহাতেই দৃশ্যগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া ইহাদের মধ্যস্থিত ঐক্যসূত্রটি হারাইয়া ফেলিয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি, সংস্কৃত নাটকের আদর্শেই ইহাকে মিলনান্তক করিয়া রচনা করা হইয়াছে, নহিলে মূল গ্রীক্ পুরাণের এই কাহিনীর পরিণতি অত্যন্ত করুণ। ইহার রাজা ইন্দ্রনীলের চরিত্র অনেকটা কালিদাস-রচিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নাটকের দুষ্মন্ত-চরিত্রের অনুরূপ। কিন্তু তাহা হইলেও ইহা দুষ্মন্ত-চরিত্রের এক অক্ষম অনুকরণ মাত্র নহে। ইহাতেও সেই বিদূষক ব্যক্তিত্বহীন সরল ও লোভী রাজবয়স্য, ইহাতেও সংস্কৃত 'প্রতিমা-নাটক' ও 'উত্তররাম-চরিতে'র অনুরূপ চিত্র দর্শন ও এই প্রকার বিবিধ সংস্কৃত নাটকেরই অন্যান্য আরও অনেক বিচ্ছিন্ন অংশ আনিয়া সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। অঙ্গিরার আশ্রমে ইন্দ্রনীল ও পদ্মাবতীর মিলন-চিত্র মারীচের আশ্রমে দুষ্মন্ত-শকুন্তলা

মিলনের অনুরূপ। অতএব দেখা যাইতেছে, যদিও অন্তরের সহিত নাট্যকার বাংলা নাটক রচনায় সংস্কৃত নাটকের বিধিনিষেধের গণ্ডী স্বীকার করেন না, তথাপি 'পদ্মাবতী' রচনার কাল পর্যন্তও তাহা একেবারে উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইতে সাহসী হন নাই। বৈদেশিক পুরাণ হইতে কাহিনী গ্রহণ করিয়াও দেশীয় ভঙ্গিতেই নাট্যকার 'পদ্মাবতী' নাটক রচনা করিয়াছেন।

'পদ্মাবতী'তে বিশেষ কোন চরিত্রসৃষ্টিই সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। ইহা স্ত্রীচরিত্র-সর্বস্ব নাটক; পুরুষ-চরিত্রের মধ্যে একমাত্র রাজা ইন্দ্রনীল —বিদূষক ইন্দ্রনীল-চরিত্রের ছায়ামাত্র; তাঁহার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। এই শ্রেণীর আর একটি পুরুষ-চরিত্রও ইহাতে আছে, তাহা কলিদেব। কলিদেবও শচীদেবীর হাতের ক্রীড়নক মাত্র, তাঁহারই প্ররোচনায় কলিদেবের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, অতএব তাঁহারও ব্যক্তিত্ব নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, একমাত্র পুরুষ-চরিত্র ইন্দ্রনীলকে লইয়াই এই নাটক লিখিত হইয়াছে। ইহাও এই নাটকের একটি গুরুতর ত্রুটি। ইহাকে এক-চরিত্র-সর্বস্ব করিয়া রচনা করিবার ফলে কাহিনীর গতি অগ্রসর হইতে কোন বাধা না পাইলেও, তাহা হইতে নাট্যিক বিক্ষোভ সৃষ্টি হইতে পারে নাই। বিশেষত এই একমাত্র পুরুষ-চরিত্রটিকেও প্রকৃত পৌরুষের ক্ষেত্র হইতে দূরে সরাইয়া রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। রাজা ইন্দ্রনীল অত্যন্ত চপল-স্বভাব পুরুষ, গুরু-বিষয়ক কোন গুণ তাঁহার চরিত্রে পরিলক্ষিত হয় না। গ্রন্থের নায়ক-চরিত্রকে এই প্রকার মেরুদণ্ডহীন করিবার একমাত্র কারণ পূর্বেই বলিয়াছি যে মধুসূদনের এই নাটক রচনার আদর্শ ছিল শেষ যুগের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যহীন শৃঙ্গার-রসাত্মক সংস্কৃত নাটক। অতএব প্রকৃত আদর্শের সন্ধান না পাওয়াতেই মধুসূদনকে এই প্রকার ভ্রমে পতিত হইতে হইয়াছে।

'পদ্মাবতী' নাটকের স্ত্রী-চরিত্রের মধ্যে মুরজা-চরিত্রের পরিকল্পনায় কবি কতকটা মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। এই চরিত্রটি গ্রীক্ উপাখ্যানের প্যালাস চরিত্রের উপর ভিত্তি করিয়া পরিকল্পিত হইলেও, ইহাকে কবি তাঁহার নিজস্ব কল্পনাদ্বারাও সমৃদ্ধ করিয়াছেন; বিশেষত তাঁহার চরিত্রের সঙ্গে আর একটি মৌলিক কাহিনী আনিয়া সংযুক্ত করাতে মূল কাহিনীটিও উপভোগ্য হইয়াছে। মুরজা শচীর মত এত ঈর্ষ্যাকাতরা নহেন; কারণ, মর্ত্যলোকে আবির্ভূত হওয়ার মূলে তাঁহার কেবল রূপের গর্ব করিয়া বেড়াইবারই অভিলাষ ছিল না, বরং তাঁহার অভিশপ্তা কন্যার সন্ধান করাই তাঁহার উদ্দেশ্য

ছিল। মাতৃহৃদয়ের এই সজাগ স্নেহশীলতাই রতিদেবী কিংবা পদ্মাবতীর প্রতি তাঁহার ঈর্ষ্যাবুদ্ধি জাগ্রত করিয়া তুলিতে দেয় নাই। সেইজন্য ইন্দ্রনীলের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা-গ্রহণে মুরজাদেবী শচীদেবীর মত সক্রিয় নহেন। পদ্মাবতী যে তাঁহারই অভিশপ্তা কন্যা, তাহা তিনি জানিতেন না—জানিবার কথাও ছিল না। অথচ তাহার প্রতি তাঁহার স্নেহ অজ্ঞাতে ধাবিত হইয়া যাইত। চিত্রকূট পর্বতের উপর পদ্মাবতীর সহিত প্রথম সাক্ষাৎকারে মুরজার 'স্তনদ্বয় দুগ্ধে পরিপূর্ণ' হইয়াছিল। তথাপি তিনি তাহাকে চিনিতে পারেন নাই বলিয়া পরে অনুতাপ করিয়াছিলেন। বাহ্যিক ঈর্ধ্যার আবরণে মাতৃস্নেহের যে একটি প্রচ্ছন্ন ধারা মুরজার হৃদয়তলে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছিল, তাহা নাট্যকার কাহিনীর শেষ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন রাখিয়াছিলেন। ইহাই মুরজা-চরিত্রের পূর্বাপর সৌন্দর্যরক্ষা করিয়াছে। এই চরিত্রটি এই ভাবে বাস্তবধর্মী হইয়াছে বলিয়াই পাঠকবর্গের দৃষ্টি-আকর্ষণের যোগ্য। ইহার অন্যতম প্রধান স্ত্রী-চরিত্র শচী। শচীই নাটকের মধ্যে একমাত্র সক্রিয় চরিত্র বলিয়া মনে হয়। প্রথম দৃশ্যের পর হইতে কাহিনী তাহারই বুদ্ধিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। শচী ঈর্ধ্যাকাতরা, ক্রুর-স্বভাবা ও প্রতিহিংসা-পরায়ণা। তাহার প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি নিরপরাধা পদ্মাবতীকে চরম দুঃখের সম্মুখীন করিতেও পশ্চাৎপদ নহেন—নাটকের খল-চরিত্ররূপে শচীর চরিত্রটি সুপরিস্ফুট হইয়াছে।

ইহার নায়িকা চরিত্র পদ্মাবতী এই নাটকের মধ্যে বিশেষ প্রধান অংশ গ্রহণ করিতে পারে নাই। শৃঙ্গার-রসাত্মক নাটকের নায়িকা-চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য, তাহা ইহার মধ্যে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে; 'রত্নাবলী'র সাগরিকা চরিত্রের কিছু কিছু প্রভাবও ইহাতে অনুভব করা যায়।

ভাষার দিক দিয়া 'পদ্মাবতী' নাটক 'শর্মিষ্ঠা' নাটক হইতে উন্নত। ইহার ভাষা সম্পূর্ণ নাট্যোপযোগী না হইলেও, ইহার মধ্য হইতে 'শর্মিষ্ঠা'র আড়ষ্টতা দূর হইয়া ইহা প্রাঞ্জলতার পথে অগ্রসর হইতেছে বলিয়া অনুভব করা যায়। মধুসূদনের নাট্যিক ভাষার ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে 'পদ্মাবতী'র একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।

'পদ্মাবতী'র মধ্যেই কোন কোন স্থলে মধুসূদন সর্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার করেন; তাহা রচনা-গুণে তাঁহার পরবর্তী অমিত্রাক্ষর ছন্দের আদর্শ হইতে অনেক নিকৃষ্ট হইলেও, বাংলা ভাষায় এই ছন্দের ইহাই সর্ব-

প্রথম প্রয়োগ বলিয়া ইহার একটু ঐতিহাসিক মূল্য আছে। মধুসূদনের সর্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের নিদর্শনরূপে নিম্নে কতক অংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

বিধির এ বিধি কিন্তু কে পারে লঙ্ঘিতে?—
ছায়ায় কি ফল কবে দরশে তরুর?
সরোবরে ফুটিলে কমল, লোকে তারে
তুলে লয়ে যায় সুখে। মলয়-মারুত,
কুসুম কানন-ধন সুরভিরে হরি
দেশ-দেশান্তরে চলি যান কুতূহলে।—'পদ্মাবতী', ২।২

পয়ারের অনুরূপ বহিরঙ্গ দান করিয়া অমিত্রাক্ষর রচনা ব্যতীতও তিনি অন্য এক রীতির অমিত্রাক্ষর ইহাতে রচনা করিয়াছিলেন; তাহার বিশেষত্ব এই যে, তাহাতে যতি-স্থানে চরণ-ছেদ হইত; পরবর্তী কালে গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রায় ইহারই অনুরূপ ছন্দ তাঁহার নাটকে ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং তাহাই 'গৈরিশ ছন্দ' নামে পরিচিত হইয়াছে। মধুসূদনের 'পদ্মাবতী' নাটক হইতে এই শ্রেণীর ছন্দের নিদর্শন উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

আমি কলি,—
এ বিপুল বিশ্বে কে না কাঁপে
শুনিয়া আমার নাম?
সতত কুপথে গতি মোর।
নলিনীরে সৃজেন বিধাতা—
জলতলে বসি আমি মৃণাল তাহার
হাসিয়া কণ্টকময় করি নিজ বলে।—'পদ্মাবতী', ৪।১

ইহারও প্রকৃতি অমিত্রাক্ষরেরই, তবে প্রচলিত পয়ারের সহিত একটা আকৃতিগত সাদৃশ্য রক্ষার জন্যই মধুসূদন তাঁহার পরবর্তী অমিত্রাক্ষর রচনায় এই শ্রেণীর চরণ-সজ্জা পরিত্যাগ করিয়া বাহ্যত পয়ারাকৃতির চরণ-সজ্জাই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আর কোন রচনায় এই উদ্ধৃত রূপ অমিত্রাক্ষরের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় না।

'পদ্মাবতী' রচনার পর মধুসূদন মহাভারতীয় উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া 'সুভদ্রা' নামে একখানি নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন। 'পদ্মাবতী' নাটক রচনার ভিতর দিয়াই তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের সর্বপ্রথম প্রবর্তন করিলেও,

ইহাতে যে সামান্য অংশে মাত্র এই ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা সাধারণত পাঠকের দৃষ্টির বহির্ভূতই থাকিয়া যায়। সেইজন্য আদ্যোপান্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে একখানি নাটক রচনার জন্য তিনি বিশেষ মনোযোগী হন। তাহারই ফলে 'সুভদ্রা' নাটকের রচনা আরম্ভ হয়। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত ইহাই মধুসূদনের সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ একখানি রচনার প্রয়াস। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হইবার জন্যই তাঁহার নাটকগুলি লিখিত হইত; সেইজন্য তাঁহার নাট্যরচনা বহুলাংশে উক্ত নাট্য-সম্প্রদায়ের অভিনেতা ও পৃষ্ঠপোষকবর্গের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিত। তদানীন্তন বেলগাছিয়া নাট্যশালার একজন প্রতিভাবান অভিনেতা মধুসূদনের নাটক রচনা যে কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন, তাহা নিম্নলিখিত আলোচনা হইতে জানিতে পারা যাইবে।

উক্ত অভিনেতার নাম কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। মধুসূদনের নাটকগুলি অভিনয়যোগ্য বলিয়া যদি তিনি প্রধানত অনুমোদন করিয়া দিতেন, তবেই মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ তাহাদের মুদ্রণ ও অভিনয়ের ব্যবস্থা করিতেন। কেশবচন্দ্রের অভিনয়-গুণের উপর তাঁহাদের অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। সেইজন্য মধুসূদন যাহাতে তাঁহার রচনা শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত ও তদানীন্তন কলিকাতার একমাত্র সুধীজন-পৃষ্ঠপোষিত নাট্যশালায় অভিনীত হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে গিয়া পূর্ব হইতেই তাঁহার রচনা-সম্বন্ধে উক্ত কেশববাবুর মতামত জানিতে চাহিতেন। কোন কোন সময় রচনার পরিকল্পনা পূর্বেই তাঁহার নিকট পাঠাইতেন, কখনও বা কোন নাটকের প্রথম অংশ রচনা করিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইয়া সে বিষয়ে তাঁহার মতামত জানিয়া লইতেন এবং যথাসম্ভব তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। পূর্বেই বলিয়াছি, কেশববাবুর অভিনয়-নৈপুণ্যের প্রতি মধুসূদনেরও অগাধ বিশ্বাস ছিল; সেইজন্য তাঁহার মতামত জানিবার জন্য তিনিও আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'সুভদ্রা' নাটকের প্রথম অঙ্ক সম্পূর্ণ করিয়া মধুসূদন তাহার পাণ্ডুলিপি কেশববাবুর নিকট প্রেরণ করেন। কয়েক সপ্তাহ পর ইহার দ্বিতীয় অঙ্ক রচনা সম্পূর্ণ হইলে তাহাও তিনি কেশববাবুর নিকট পাঠাইয়া দেন। ইহার রচনার সূচনা হইতেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ইহা রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের উপযোগী হইবে না। ইহাকে সেইজন্য তিনি নিজেও নাট্যকাব্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। কেশববাবুও নাটকখানি সম্বন্ধে অনুরূপ অভিমতই ব্যক্ত করিয়া বলেন যে, ইহার অভিনয় ব্যর্থ হইবে।

অতএব এই রচনা দ্বারা আশু আর কোন উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না বুঝিতে পারিয়া, মধুস্থদনও ইহাকে অসম্পূর্ণ রাখিয়াই অগত্যা ইহার রচনা পরিত্যাগ করিলেন। ইহার অসম্পূর্ণ অংশও কোনদিন মুদ্রিত হয় নাই। তিনি যে কতদূর সাফল্যের আশা করিয়া অমিত্রাক্ষর ছন্দে এই 'স্থভদ্রা' নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অ-পূর্বপ্রকাশিত কবিতাবলীর অন্তর্গত এই নাটকেরই প্রারম্ভিক বাণী-বন্দনার এই অংশ হইতে কতক অনুমান করা যাইবে—

> কেমনে ফাল্গুনি স্বগুণে লভিলা
> (পদ্মাভবি যদুবৃন্দে) চারু-চন্দ্রাননা
> ভদ্রায়, নবীন ছন্দে সে মহাকাহিনী
> কহিবে নবীন কবি বঙ্গবাসী জনে
> বাগ্দেবি, দাসেরে যদি কৃপা কর তুমি।

কিন্তু অনুকূল উৎসাহের অভাবে ইহাকে অসম্পূর্ণ রাখিয়াই ইহার রচনা-কার্য পরিত্যাগ করিতে হওয়াতে মধুস্থদন কতখানি ভগ্নোদ্যম হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার রচিত 'স্থভদ্রা-হরণ' নামক একটি চতুর্দশপদী কবিতা হইতে বুঝিতে পারা যায়।

ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ব্যক্তিগত রুচির অনুগামী ছিল না বলিয়া ও উপস্থিত প্রয়োজনীয়তা সাধনে ব্যর্থ হইবে আশঙ্কা করিয়া মধুস্থদন আদ্যোপান্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত একখানি নাটক রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াও তাহা কিভাবে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। নাটকের ক্ষেত্রে অমিত্রাক্ষর রচনায় নিরুৎসাহ হইয়া তিনি বাধ্য হইয়া কাব্যের ক্ষেত্রে তাহা নিয়োজিত করিলেন। নাটক রচনা করিয়া কেবল মুদ্রিত করিবার উদ্দেশ্যেই মধুস্থদন সেই সময় কোন নাটকই রচনা করেন নাই। তাঁহার রচিত নাটকগুলি অভিনীত দেখিবার জন্যই তিনি তখন নাট্য-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 'স্থভদ্রা' নাটক অভিনীত হইবার কোন আশা নাই দেখিয়াই, তিনি ইহার রচনা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অতএব রঙ্গমঞ্চও যে নাট্যসাহিত্যসৃষ্টি কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, এখানেই তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন দেখা যাইতেছে।

ব্যক্তিবিশেষের রুচি ও সমসাময়িক মঞ্চ-ব্যবস্থার অনুকূল নহে বলিয়া 'স্থভদ্রা-হরণ' নাটক যেমন অসম্পূর্ণ রহিল, তেমনই একই কারণে আর একটি

নাটককেও মধুস্থদনের পরিকল্পনাতেই বিসর্জন দিতে হইল—তাহার নাম 'রিজিয়া' নাটক। ভারতীয় মুসলমান চরিত্র অবলম্বন করিয়া নাটক রচনা করিবার জন্য মধুস্থদনের আন্তরিক আগ্রহ ছিল। এই বিষয়ে তিনি এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, 'We ought to take up Indo-Mussulman subject. The Mahomedans are a *fiercer* race than ourselves and would afford splendid opportunity for the display of passion. Their women are more cut out for intrigue than ours.'

সম্রাট্ আল্‌তামাসের কন্যা স্থলতানা রিজিয়ার চরিত্র অবলম্বনে এই নাটকখানি রচনা করিবার জন্য একখানি পরিকল্পনা বা সংক্ষিপ্ত আদর্শের খসড়া করিয়া তিনি কেশববাবুকে দেখিতে দেন। মুসলমান চরিত্র অবলম্বন করিয়া বাংলা ভাষায় ইহাই সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনার প্রয়াস বলিয়া এই পরিকল্পনাটির ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব রহিয়াছে। কিন্তু এই পরিকল্পনাটিকে কার্যকরী করিয়া তুলিতেও সেই ব্যক্তিবিশেষের রুচি ও তদানীন্তন অভিনয়-ব্যবস্থা প্রতিকূল হইয়া উঠিল। কেশববাবুর বিরুদ্ধ মত পাইয়া মধুস্থদন নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন এবং 'রিজিয়া' নাটকের রচনাও পরিত্যক্ত হইল। এইভাবে বাংলা সাহিত্যে মুসলমান চরিত্র অবলম্বন করিয়া নাটক রচনার প্রথম প্রয়াস ব্যর্থ হইয়া গেল। অতএব ইহার মূলেও দেখিতেছি, ব্যক্তিবিশেষের রুচি ও অভিনয়-ব্যবস্থার সাময়িক একটা ত্রুটিই দায়ী হইয়াছে। তথাপি এই নাটকের জন্য মধুস্থদন যে সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনাখানি রচনা করিয়াছিলেন, তাহা বাংলা ভাষায় অভিনব এক বিষয়বস্তু লইয়া নাট্যরচনার প্রথম প্রয়াস বলিয়া বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। বলা বাহুল্য, বাংলার নাট্য-শিল্প যখন ব্যক্তি-রুচির এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডী উত্তীর্ণ হইয়া গণ-রুচির অনুগামী হইল, কিংবা নাট্য-প্রতিভাও যখন ব্যক্তিরুচির মুখাপেক্ষী না হইয়া স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া প্রকাশ পাইবার স্থযোগ পাইল, তখন প্রায় এই পরিকল্পনা অনুযায়ীই বাংলা ভাষায় একাধিক নাটক রচিত ও সার্থকতার সঙ্গে অভিনীত হইয়াছে; কিন্তু এই বিষয়ে যে মধুস্থদনই সর্বপ্রথম হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা আজ সকলেই বিস্মৃত হইয়াছেন। 'শর্মিষ্ঠা' ও 'পদ্মাবতী' নাট্যরচনার মধ্যে মধুস্থদন যে গতানুগতিক ও পর্যুষিত রীতির অনুবর্তন করিয়াছেন, রিজিয়া-নাট্যরচনায় তাহা হইতে মুক্ত হইয়া স্বকীয় প্রতিভা-বিকাশের উপযুক্ত পরিসরও তিনি

কয়েকখানি শ্রেষ্ঠ প্রহসন রচনা করেন—তাহাদের মধ্যে দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' অন্যতম। প্রহসনখানি বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হইবার উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছিল; কিন্তু জানিতে পারা যায়, ইহা কোন কারণে অভিনীত হয় নাই। ইহার কাহিনীভাগ সংক্ষেপে এই—

কর্তা মহাশয় পরম বৈষ্ণব, তিনি অধিকাংশ সময় বৃন্দাবনেই বাস করেন। পুত্র নববাবু কলিকাতায় থাকিয়া পড়াশোনা করিয়া থাকেন। নববাবু বিবাহিত, তাঁহার স্ত্রীর নাম হরকামিনী। নববাবু তাঁহার কয়েকজন ইয়ার বন্ধু লইয়া 'জ্ঞানতরঙ্গিণী' নামক এক সভা স্থাপন করিয়াছেন, সভার উদ্দেশ্য মদ্যপান ও বারবনিতা সঙ্গ। একবার কর্তা মহাশয় বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতায় বাস করিতে লাগিলেন। নববাবুকে সর্বদা চোখে চোখে রাখেন, সেজন্য তাঁহার পক্ষে সভায় যাতায়াত করা কষ্টকর হইয়া উঠিল। কালীবাবু নববাবুর ইয়ার বন্ধু, তুল্য মদ্যপ। তিনি কর্তা মহাশয়কে বলিয়া নববাবুকে একদিন 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'য় লইয়া গেলেন। কর্তাবাবুর একটু সন্দেহ হইল, তিনি তাঁহার একজন অনুচর বৈরাগীকে 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'য় নববাবুর সন্ধান লইতে পাঠাইলেন। বৈরাগী গিয়া দেখিল, সেখানে গণিকাদিগের বাস। নববাবু উৎকোচ দিয়া বৈরাগীর মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন। অধিক রাত্রে মদ্যপান করিয়া নেশার ঝোঁকে আবোল-তাবোল বকিতে বকিতে নববাবু গৃহে ফিরিলেন। কর্তা মহাশয় দেখিয়া সমস্তই বুঝিলেন এবং পরদিনই কলিকাতার বাস উঠাইয়া দিয়া সকলকে লইয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যাইবার সঙ্কল্প করিলেন।

প্রায় অনুরূপ বিষয় লইয়া ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন লেখক কর্তৃক 'নববাবুবিলাস', 'নববিবিবিলাস', 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রভৃতি গদ্য রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু এই বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া প্রহসন রচনা বাংলা সাহিত্যে এই সর্বপ্রথম। অবশ্য একথা স্বীকার করিতেই হয় যে, উক্ত গদ্য রচনাগুলির মধ্যেও প্রহসনের অনেক গুণ বর্তমান ছিল এবং তাহাদের কোনটিই পূর্ণাঙ্গ প্রহসন না হইলেও অনুরূপ বিষয়বস্তু লইয়া বাংলা সাহিত্যে প্রহসন রচনা করিবার পথ ইহারাই প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল।

প্রত্যক্ষদৃষ্ট তদানীন্তন কলিকাতার নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়কে অবলম্বন করিয়াই মধুসূদন তাঁহার 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসন রচনা করিয়াছেন। মধুসূদনের মধ্যে বাস্তব রসানুভূতি যে কত প্রবল ছিল, তাহা তাঁহার দুই-

খানি প্রহসন হইতেই জানিতে পারা যাইবে। এই বিষয়টি বিশ্লেষণ করিবার জন্য ইহাদের একটু বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন বলিয়া মনে করি।

নববাবুকে অবলম্বন করিয়াই এই প্রহসন। নববাবু ইয়ং বেঙ্গলের যোগ্য প্রতিনিধি। তিনি 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'র প্রতিষ্ঠাতা। এই সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁহার বন্ধু কালীবাবু বলেন, 'আমাদের কলেজ থেকে কেবল ইংরেজি চর্চা হয়েছিল, তা' আমাদের জাতীয় ভাষা ত কিঞ্চিৎ জানা চাই, তাই এই সভাটি সংস্কৃতবিদ্যা আলোচনার জন্য স্থাপন করেছি। আমরা প্রতি শনিবার এই সভায় একত্র হয়ে ধর্মশাস্ত্রের আন্দোলন করি।' তদানীন্তন কোন অনুরূপ প্রতিষ্ঠানকে ব্যঙ্গ করিয়াই মধুসূদন 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'র উদ্দেশ্য এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই সভার এক অধিবেশনে নববাবু যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহার ভিতর দিয়াই 'ইয়ং বেঙ্গলে'র মনোভাব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে—

'জেণ্টেলম্যান, আমাদের সকলের হিন্দুকুলে জন্ম, কিন্তু আমরা বিদ্যাবলে সুপারষ্টিসনের শিকলি কেটে ফ্রি হয়েছি, আমরা পুত্তলিকা দেখে হাঁটু নোয়াতে আর স্বীকার করি নে; জ্ঞানের বাতির দ্বারা আমাদের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর হয়েছে। এখন আমার প্রার্থনা এই যে, তোমা সকলে মাথা, মন এক করে এ দেশের সোসিয়াল রিফরমেশন যাতে হয়, তার চেষ্টা কর।

জেণ্টেলম্যান, তোমাদের মেয়েদের এডুকেট কর,—তাদের স্বাধীনতা দাও—জাতিভেদ তফাৎ কর—আর বিধবাদের বিবাহ দাও—তা হ'লে এবং কেবল তা হ'লেই আমাদের প্রিয় ভারতভূমি ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্য দেশের সঙ্গে টক্কর দিতে পারবে,—নচেৎ নয়।'

যাই হউক, বক্তৃতা শেষে নববাবু 'লেট আস্ এঞ্জয় আওয়ারসেল্ভ্স্' বলিয়া মদ্যপান ও বারবনিতাসঙ্গদ্বারা সভার কার্য শেষ করিলেন।

তারপর নববাবুর আর এক দৃশ্য। তিনি মদ্যপান করিয়া রাত্রে গৃহে ফিরিলেন, ইহার পূর্বে একদিন তিনি এই অবস্থায় গৃহে ফিরিয়া বয়স্থা ভগিনীকে চুম্বন করিয়া বলিয়াছিলেন, 'এতে দোষ কি? সাহেবরা যে বোনের গালে চুমো খায়, আর আমরা কল্লেই কি দোষ হয়?' ইহার পর হইতে বাড়ীর মেয়েরা তাহার সম্মুখে বাহির হয় না। স্ত্রী পর্যন্ত তাহার সম্মুখ হইতে পলাইয়া যায়। মত্ত অবস্থায় স্ত্রীর সঙ্গে সে সেদিনও বারবনিতার মত ব্যবহার করিল, পিতাকে 'মদ ল্যাও' বলিয়া ডাকিল। সকল দিক দিয়া নববাবুর চরিত্রটি নাট্যকার বাস্তব করিয়া তুলিয়াছেন, এই চরিত্রটিই পরবর্তী

নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রকে একটি শিক্ষিত মাতাল চরিত্রসৃষ্টির প্রেরণা দিয়াছিল, তাহা 'সধবার একাদশী'র নিমচাঁদ। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও স্বীকার করিতেই হইবে যে, নববাবু সে যুগের নব্য শিক্ষিত সমাজের একজন প্রতিনিধি মাত্র, তাহার ভিতর দিয়া বিশিষ্ট কোন পরিচয় রূপলাভ করিতে পারে নাই; মধুসূদনের এই নির্বিশেষ চরিত্রটিকে অবলম্বন করিয়াই দীনবন্ধু তাঁহার নিমচাঁদের বিশিষ্ট রূপ দিয়াছেন। প্রহসন রচনায় মধুসূদনের একটি প্রধান গুণ—তিনি তাঁহার চিত্রগুলিকে অতিরঞ্জিত করেন নাই। 'একেই কি বলে সভ্যতা'র কোন চিত্রই অতিরঞ্জিত নহে; এ সম্পর্কে ডক্টর রাজেন্দ্র-লাল মিত্র বলিয়াছেন, 'ইহাতে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, প্রায় তদসমুদায়ই আমাদের জানিত কোন না কোন নববাবুদ্বারা আচরিত হইয়াছে।' মধুসূদন জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই নববাবুর চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। দীনবন্ধুর যে অতিরঞ্জনের প্রবণতা ছিল, মধুসূদনের তাহা ছিল না; সেইজন্য নব্য বাংলার একটি যথাযথ পরিচয় ইহার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের প্রথম অবস্থায় এদেশের নব্য শিক্ষিত সমাজ যে কিরূপ বিপর্যস্ত হইয়াছিল, মধুসূদন নিজেও তাহার প্রমাণ; অতএব তাঁহার হাত হইতে নব্য বাংলার এই যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার বাস্তব মূল্য অনস্বীকার্য।

নববাবুর মধ্য দিয়া নব্য বাংলার পরিচয় যে রকম প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনই কর্তা মহাশয়ের চরিত্রের ভিতর দিয়া সেকালের সমাজের আর একটি দিকের সঙ্গে পরিচয় লাভ করা যায়। তিনি ধর্মভীরু ও পরম বৈষ্ণব, কিন্তু সেইজন্য সাংসারিক বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ নহেন। তিনি বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি। পুত্রের চরিত্রে তাঁহার প্রথম হইতেই সন্দেহ হইতেছিল; কারণ, তিনি বৃন্দাবনবাসী হইলেও জানেন, 'এই কলিকাতা সহর বিষম ঠাঁই।' এই জন্য শেষ পর্যন্ত তিনি সকলকে লইয়া বৃন্দাবন চলিয়া যাওয়াই স্থির করিলেন। পিতা ও পুত্রের চরিত্রের মধ্যে যে একটি সুন্দর বৈপরীত্য সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা দ্বারা এই ক্ষুদ্র প্রহসনখানির নাট্যিক গুণ বর্ধিত হইয়াছে। কর্তা মহাশয়ের চরিত্র-পরিকল্পনাও মধুসূদনের কোন বাস্তব অভিজ্ঞতার ফল বলিতে হইবে; কারণ, তাঁহার মধ্য দিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের এই দেশীয় একটি বিশিষ্ট সামাজিক চরিত্রের রূপ প্রকাশ পাইয়াছে—ইহাই বাঙ্গালীর নিজস্ব জাতীয় চরিত্রের সর্বশেষ পরিচয়, ইহার পরই নববাবুর

যুগ আরম্ভ হইয়াছে, তাহাকে বাধা দিবার জন্য আর কেহ তখন অবশিষ্ট ছিল না।

অন্যান্য পুরুষ-চরিত্রের মধ্যে পুলিশ সার্জেন্টের চরিত্রটি বড় জীবন্ত হইয়াছে। চোর সন্দেহে বৈরাগীকে ধরিয়া তাহার ঝুলি হইতে সে চারিটি টাকা পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে অব্যাহতি দিল। তাহার কথাবার্তা ও আচরণের মধ্য দিয়া লেখকের যে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। দুইটি মুসলমান মুটিয়ার ভাষায় আলালী ভাষার প্রভাব অনুভব করা যায়।

'একেই কি বলে সভ্যতা'র স্ত্রী-চরিত্রগুলির কথাও বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য। ইহাদের মধ্যে নববাবুর স্ত্রী হরকামিনী ও তাহার বিবাহিত ভগিনী প্রসন্নময়ীই প্রধানা। একটি দৃশ্যে চারিটি যুবতীর তাস খেলার চিত্রটি বড়ই বাস্তব হইয়াছে। তাস খেলায় অভিজ্ঞতার দিক দিয়া নাট্যকার চারিটি চরিত্রকেই একাকার করিয়া ফেলেন নাই, ইহাতে প্রত্যেকের নিজস্ব এক একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাদের মধ্যে নৃত্যকালি পাকা খেলোয়াড়, কমল একেবারে কিছুই নয়, প্রসন্ন ও হরকামিনী মাঝামাঝি; কথাবার্তার ভিতর দিয়া ইহাদের মুখভঙ্গিটি পর্যন্ত যেন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, ইহাদের কাহাকেও চিনিতে ভুল হয় না। এই পরিবারটির কর্তা মহাশয় পরম বৈষ্ণব, পুত্র পাঁড় মাতাল, যুবতী বধূ ও কন্যাগণ তাস খেলিয়া আলস্যে সময় অতিবাহিত করে—অপরিসর রচনার ভিতর দিয়াও মধুসূদন ক্ষুদ্র পরিবারটির এই বৈচিত্র্যগুলি সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। মধুসূদনের একটি প্রধান গুণ এই যে, তাঁহার প্রহসনের মধ্যে নীতিকথাটি অত্যন্ত গৌণ হইয়া পড়িয়া ইহার বাস্তব রসটিই উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে, নতুবা তাঁহার পূর্ববর্তী নাট্যকার রামনারায়ণ কৌলীন্যের দোষ কীর্তন করিয়া নাটক রচনা করিতে গিয়া নাটকের মধ্যে বারবার বল্লালের নাম করিয়া অভিসম্পাত দিয়াছেন; মধুসূদন প্রত্যক্ষভাবে তাহা কিছু করেন নাই। যদিও মদ্যপানের কুফল প্রদর্শনই 'একেই কি বলে সভ্যতা'র বিশিষ্ট উদ্দেশ্য, তথাপি এই প্রহসনের কোথাও এই বিষয়ক কোন বক্তৃতা নাই, কেবল মাত্র নাট্যিক ক্রিয়ার ভিতর দিয়াই ইহার অপকার দেখান হইয়াছে। এই বিষয়ে রামনারায়ণ হইতে মধুসূদন নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠতর শিল্পী। মধুসূদন যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই বাঙ্গালীর সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেইজন্য ইহার

পারিবারিক জীবন-সম্পর্কে তাঁহার পরিণত অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব হয় নাই। ইহারই ফলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি ননদ-ভাজ প্রসন্নময়ী ও হরকামিনীর কথাবার্তার ভিতর দিয়া স্বাভাবিক শালীনতা রক্ষা করিতে পারেন নাই, ইহাদের ব্যবহার এবং কথাবার্তা কোন কোন স্থলে অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত হইয়াছে। পরবর্তী নাট্যকার দীনবন্ধু মধুসূদনের এই দোষটি অনুকরণ করিয়াছিলেন, তাহার ফলেই তাঁহার প্রহসনগুলির মধ্যেও ননদ-ভাজের অনুরূপ কথোপকথনের ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার প্রহসনগুলির নৈতিক আবহাওয়া অনেকটা দূষিত হইয়াছে, কিন্তু মধুসূদনের চিত্রগুলি সংক্ষিপ্ত বলিয়া তাহা সমগ্রভাবে তাঁহার প্রহসনের নৈতিক আবহাওয়া বিনষ্ট করিতে পারে নাই।

হরকামিনীর চরিত্রটিও দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী'র নায়িকা কুমুদিনী চরিত্রের অগ্রদূত। হরকামিনী মাতাল স্বামীকে গৃহমধ্যে মূর্ছিত দেখিয়া যে বলিয়াছিল, 'এই কল্‌কাতায় যে আজকাল কত অভাগা স্ত্রী আমার মতন এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করে, তার সীমা নাই'—ইহাই দীনবন্ধুকে 'সধবার একাদশী'র প্রেরণা যোগাইয়াছে।

'একেই কি বলে সভ্যতা'র একটি প্রধান গুণ এই যে, উদ্দেশ্যমূলক রচনা হইয়াও ইহার মধ্যে মতবাদ প্রাধান্য লাভ করে নাই—কাহিনীটিই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। অবশ্য নিতান্ত অপরিসর রচনা বলিয়া চরিত্রগুলি সম্যক্‌ বিকাশলাভ করিতে না পারায় ইহার রসস্ফূর্তি সম্ভব হয় নাই। তথাপি নূতন একটি বিষয় অবলম্বন করিয়া ইহা সর্বপ্রথম প্রহসন রচনা বলিয়া ইহার স্থান বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছে।

ইহার পর মধুসূদনের অন্যতম প্রহসন 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রকাশিত হয়। তাঁহার পূর্ববর্তী প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা'র মধ্যে কোনও নীতি-প্রচারমূলক উদ্দেশ্য থাকিলেও, ইহার মধ্যে দৃশ্যত তেমন কিছু নাই; তবে তৎকালীন সমাজের এক শ্রেণীর বকধার্মিককে উপলক্ষ্য করিয়া যে ইহা রচিত হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অবশ্য এই শ্রেণীর বকধার্মিক সেই যুগেই যে শুধু বর্তমান ছিল, এই যুগে নাই—তাহা বলিতে পারা যায় না; ইহা একদিন ছিল এবং চিরদিনই থাকিবে। সেইজন্য তাঁহার এই প্রহসনখানির নিত্যকালীন মূল্য আছে। মানব-প্রকৃতি চিরদিনই এক, বাহির হইতে সামাজিক নীতি ও ধর্ম সর্বদাই তাহাকে চোখ রাঙ্গাইতে

থাকিলেও, সে অন্তরের ভিতর তাহাদের শাসন কোনদিনই স্থায়ী ভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। এই প্রহসনখানির ভিতর দিয়া মানব-প্রকৃতির এমন একটি চিরন্তন দুর্বলতার কথাই ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া ইহার মূল্য তাঁহার পূর্ববর্তী প্রহসনখানি অপেক্ষা অধিক। কিন্তু একথা মধুসূদনের অনেক সমালোচকই স্বীকার করেন নাই। এখানে প্রহসনের কাহিনীটি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া ইহার সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে—

ভক্তপ্রসাদবাবু একজন প্রাচীন ব্যক্তি; তাঁহার ধনের অভাব নাই; কিন্তু তিনি কৃপণ ও পরপীড়ক। হানিফ গাজি তাঁহার একজন মুসলমান রায়ৎ, অজন্মায় তাহার ক্ষেতের ফসল নষ্ট হইয়াছে বলিয়া সে বৎসরের পূরা খাজনা শোধ করিতে পারিতেছে না, সামান্য কিছু শোধ করিয়া অবশিষ্ট অংশের জন্য তাঁহার নিকট মাফ চাহিতেছে, তিনি মাফ করিতে চাহিতেছেন না। এমন সময় গদাধর নামক তাঁহার একটি অনুচর তাঁহাকে কানে কানে জানাইল যে, হানিফের গৃহে যুবতী ও সুন্দরী স্ত্রী আছে, সে চেষ্টা করিলে তাহাকে তাঁহার নিকট লইয়া আসিতে পারে। শুনিয়া ভক্তপ্রসাদ হানিফের খাজানার অবশিষ্ট অংশ মাফ করিয়া দিলেন।

গদাধর ভক্তপ্রসাদের পুঁটি নাম্নী এক কুট্টিনীকে হানিফের স্ত্রীর নিকট পাঠাইল। হানিফের স্ত্রীর নাম ফতেমা। পুঁটি ফতেমার নিকট ভক্তপ্রসাদের প্রস্তাবের কথা জানাইল। ফতেমা তাহার স্বামীকে ইহা জানাইয়া দিল। শুনিয়া হানিফ ক্রোধে জ্বলিতে লাগিল। বাচস্পতি গ্রামের একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ, তিনি স্ত্রীর শ্রাদ্ধের জন্য ভক্তপ্রসাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, ভক্ত তাঁহাকে মাত্র পাঁচটি টাকা দিয়া বিদায় দিয়াছিলেন। বাচস্পতি হানিফের নিকট হইতে ভক্তপ্রসাদের কুমতলবের কথা জানিতে পারিলেন; শুনিয়া তাহাকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য হানিফের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন। এই পরামর্শক্রমে একদিন রাত্রিকালে ফতেমা পুঁটির সঙ্গে এক নির্জন শিবমন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইল, হানিফ ও বাচস্পতি প্রচ্ছন্নভাবে তাহাদের অনুসরণ করিলেন। ভক্তপ্রসাদের সেই স্থলে ফতেমার সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইবার কথা। যথাসময়ে নাগর সাজিয়া ভক্তপ্রসাদ আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন—ফতেমার প্রতি তিনি তাঁহার প্রণয়-নিবেদন করিলেন, এমন সময় হানিফ গোপন স্থান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ভক্তপ্রসাদকে কিছু উত্তম-মধ্যম দিল—বাচস্পতি আসিয়া সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন। ভক্তপ্রসাদের

লজ্জার আর সীমা রহিল না। তিনি হানিফ ও বাচস্পতিকে টাকা দিয়া মুখ বন্ধ করিবার প্রয়াস পাইলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন, এমন কুকাজ প্রাণ থাকিতে আর কোনদিন করিবেন না।

এই কাহিনীটি সম্বন্ধে মধুসূদনের জীবনী-লেখক স্বগত যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন, "মধুসূদন 'একেই কি বলে সভ্যতা'র ন্যায় 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া'ও তাঁহার কোন কোন পরিচিত ব্যক্তির চরিত্র অবলম্বনে রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার এক নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয় ভক্তপ্রসাদরূপে কল্পিত হইয়াছেন, এবং হানিফ গাজি, পাঁচী তেলিনী প্রভৃতি নামগুলিও তাঁহার স্বগ্রামের কোন কোন স্ত্রীপুরুষের নাম হইতে অবলম্বিত হইয়াছিল।"

প্রহসনখানির মধ্যে ভক্তপ্রসাদের চরিত্রটিই প্রধান। ভক্তপ্রসাদ প্রজা-পীড়ক জমিদার, বিগত শতাব্দীর বাংলার পল্লীগ্রামস্থ ভূস্বামীদিগের একটি ক্ষুদ্র আদর্শ। দরিদ্র প্রজা হানিফ গাজি দেশে অজন্মার জন্য তাহার দেয় এগার সিকে খাজনার পরিবর্তে তিন সিকে দিতে চায়। সেইজন্য তাহাকে তিনি জমাদারের জিম্মায় পাঠাইয়া দিতেছেন। কিন্তু ভক্তপ্রসাদের একটি দুর্বলতা ছিল, এই দুর্বলতার কথা তাঁহার অন্তরঙ্গ অনুচর গদাধর জানিত। হানিফ যখন নিষ্কৃতির জন্য গদাধরের শরণাপন্ন হইল, গদাধর তখন ভক্তপ্রসাদের দুর্বলতাটুকুর সুযোগ লইতে মনস্থ করিল। সে গিয়া ভক্তপ্রসাদকে বলিল, হানিফ গাজি এইবার এক সুন্দরী যুবতীকে নিকা করিয়া ঘরে আনিয়াছে। তাহার 'বয়স বছর উনিশ, এখনও ছেলেপিলে হয়নি, আর রং যেন কাঁচা সোনা।' ভক্তপ্রসাদ বাহিরে মালা জপিয়া চলিলেন, মনে মনে একটি কুৎসিত সঙ্কল্প জাগিয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ হানিফকে ডাকিয়া তাহার বকেয়া খাজনা মাফ করিয়া দিলেন, তাঁহার কু-অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়া দিবার ভার গদাধরের উপর অর্পণ করিলেন। স্বর্গীয় পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় ভক্তপ্রসাদ-সম্পর্কিত উক্ত পরিকল্পনাকে অসম্ভব বলিয়া মধুসূদনের নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহার প্রধান আপত্তি হইয়াছে, 'গোঁড়া হিন্দুরা অপরাপর অপকর্মে রত হইলেও জাতিভ্রংশকর যবনী-সংযোগে কখনই ওরূপ ব্যগ্র হন না।' কিন্তু ইহা সত্য নহে। লম্পটের নিকট 'জাতিভ্রংশকর' বলিয়া কিছু নাই। ভক্তপ্রসাদের মত ভণ্ডের একটি চরম পরিচয় প্রকাশ করিবার জন্যই মধুসূদন এখানে তাঁহার সম্পর্কে মুসলমান কৃষক-রমণীর কথা আনিয়াছেন; ইন্দ্রিয়পরবশ

ব্যক্তির কোন প্রকার ধর্মাধর্মজ্ঞান থাকে না, অতএব এই চরিত্রটির স্বাভাবিকতায় সন্দিগ্ধ হইবার কোন কারণ নাই। বিগত শতাব্দীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ মুসলমানের নাম শুনিবামাত্র শিহরিয়া উঠিতেন; মধুসূদনের শিক্ষা ও সংস্কার এই মনোভাবের বিরোধী ছিল বলিয়াই, তিনি এখানে নির্বিচারে এই মুসলমান কৃষকনারীর চরিত্রটি আনিয়া যোগ করিয়াছেন। ভক্তপ্রসাদের লাম্পট্যের চরম অবস্থা বর্ণনা করিবার পক্ষে এখানে এই চরিত্রটি নিঃসন্দেহে পরম সহায়ক হইয়াছে বলিতে হইবে।

ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে হানিফ গাজির চরিত্রটি সুন্দর পরিস্ফুট হইয়াছে। তাহার মুখের ভাষার ভিতর দিয়া, তাহার রূপটি যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। সে দরিদ্র কৃষক, খাজনা অনাদায়ের জন্য জমিদারের নিকট সে হাত যোড় করিতে পারে, কিন্তু স্ত্রীর সম্মান রক্ষা করিবার জন্য সেই অন্যায়কারী জমিদারের গায়েও হাত তুলিতে তাহার বাধে নাই। তাহার মধ্যে রক্তমাংসের একটি মানুষের পরিচয় জীবন্ত হইয়া আছে। রক্ত তাহার ধমনীতে টগবগ করিয়া ফুটিতেছে। ফতেমার মুখ হইতে জমিদারের দুরভিপ্রায়ের কথা শুনিবামাত্র যেন তড়াক্ করিয়া তাহার মাথায় রক্ত উঠিয়া গেল, কী ভাষায় তাহার এই ক্রোধ প্রকাশ পাইয়াছে, দেখুন,—'এমন গরুখোর হারামজাদা কি হিঁদুদের বিচে আর দুজন আছে? শালা রাইওৎ বেচারিগো জানে মাল্লে, তাগোর সব লুটে নিয়ে, তার পর এই করে। আচ্ছা দেখি, এ কুম্পানির মুলুকে এনছাপ আছে কি না। বেটা কাফেরকে আমি গরু খাওয়ায়ে তবে ছাড়্‌বো। বেটার এত বড় মকদুর।' কিন্তু অপূর্ব শক্তিশালী ভাষা! এই ভাষার ভিতর দিয়া ক্রুদ্ধ হানিফের মুখের ভঙ্গিটি পর্যন্ত যেন দেখা যাইতেছে, ধমনীতে তাহার উত্তপ্ত রক্তের প্রবাহ যেন প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। হানিফ চরিত্রটি পরবর্তী নাট্যকার দীনবন্ধুর উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাঁহার 'নীল-দর্পণ' নাটকের তোরাপ নামক মুসলমান কৃষকের চরিত্রটি ইহার উপরই ভিত্তি করিয়া যে রচিত হইয়াছিল, তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তোরাপের ভাষায়ও হানিফেরই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। কুট্টিনী পুঁটি হানিফকে বলে, 'মিনষে যেন যমের দূত।' নাট্যকার তাহার ভাষা ও আচরণের ভিতর দিয়া তাহার এই পরিচয় সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন। ইহার মধ্য দিয়া মধুসূদনের যে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহা সত্যই বিস্ময়কর।

ভক্তপ্রসাদকে শিক্ষা দিবার জন্যই বাচস্পতির পরামর্শে সে তাহার স্ত্রীকে দিয়া এক ফাঁদ পাতিল, কিন্তু ইহাতেও তাহার অন্তর সায় দিতে পারিল না,—স্ত্রীকে দিয়া ফাঁদ পাতার ব্যাপারটা যেন তাহার কাছে কেমন ঠেকিতেছে। সেইজন্য সে বাচস্পতিকে বলিল, 'লেকিন আমার সাম্‌নে যদি আমার বিবির গায়ে হাত দেয়, কি কোন রকম বেইজ্জৎ কত্তি যায়, তা হলি তো আমি তখন সে হারামজাদা বেটার মাথাটা টান্যে ছিঁড়ে ফেল্‌বো।' বাচস্পতিও তাহা বুঝিলেন; মনে মনে বলিলেন, 'বেটা একে সাক্ষাৎ যমদূত, তাতে আবার রেগেছে, না জানি আজ একটা কি বিভ্রাটই বা ঘটায়।' হানিফের চরিত্রটি নাট্যকার এইভাবে সকল দিক হইতেই জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। এমন বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া রচিত সজীব চরিত্র ইতিপূর্বে বাংলা নাটকে আর দেখা যায় নাই।

ফতেমার চরিত্রটি সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। কুট্টিনী আসিয়া যখন তাহার নিকট ভক্তপ্রসাদের প্রস্তাবের কথা বলিয়াছে, তখনই সে স্বামীর নিকট তাহা বলিয়া দিয়াছে, ইহা হইতেই এই বিষয় সম্পর্কে তাহার মনোভাব বুঝিতে পারা যাইবে। সে দরিদ্র হইয়াও সম্মান ও ধর্মরক্ষার জন্য অর্থের লোভ সংবরণ করিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বাচস্পতি ও তাহার স্বামীর ফাঁদ পাতিবার কার্যে সহায়তার জন্য রাত চারিটার সময় ভাঙ্গা শিব-মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইতেও সে স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা তাহার পক্ষে কিছুই অসঙ্গত হয় নাই; কারণ, সে তাহার স্বামীর অজ্ঞাতে কিছুই করিতেছে না, এমন কি রাত্রি চারিটার সময়ও ভাঙ্গা শিবমন্দিরের নিকট প্রচ্ছন্নভাবে তাহার স্বামীও তাহাকে অনুসরণ করিয়াছে। সে যাহা করিতেছে, তাহা সে তাহার স্বামীর আদেশ মতই স্বামীর সম্মুখেই করিতেছে। তথাপি নাট্যকার এ বিষয়ে যে তাহার একটি অস্বস্তিবোধ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা বড়ই সুন্দর হইয়াছে। গভীর রাত্রে ভগ্ন শিব-মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়া সে বলিতেছে, 'ও পুঁটি দিদি! মোরে এ কোথায় আনে ফ্যালালি? না ভাই, মোরে বড় ডর লাগে, এ বোনের মদ্দি সাপেই খাবে না কি হবে, কিছু কত্তি পারি নে।' তারপর ভক্তপ্রসাদের সম্মুখে তাহার আচরণও বড় সুন্দর হইয়াছে—একদিক দিয়া তাহার স্বামীর নির্দেশ, অপর দিক দিয়া তাহার নিজস্ব ধর্মবোধ, এই উভয়ের মধ্য দিয়া তাহার যে আচরণ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বাস্তব

বলিয়াই এতখানি চিত্তাকর্ষক। গভীর রাত্রে নির্জন বনমধ্যে এক ভগ্ন দেউলের সম্মুখে এক লম্পটের নিকট হইতে নিজের সম্ভ্রম রক্ষা করিবার জন্য সে যে সংগ্রাম করিতেছে, তাহার চিত্রখানি নাট্যকার যেন জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। কুট্টিনীর চরিত্র হিসাবে পুঁটির চরিত্রটিও সুন্দর ও স্বাভাবিক হইয়াছে। ইহা হইতে বাংলার পল্লীর জনসাধারণের বিচিত্র জীবন সম্পর্কেও যে মধুসূদনের কত সুগভীর পরিচয় ছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। দীনবন্ধুর প্রসিদ্ধ নাটক 'নীল-দর্পণে'র কুট্টিনী পদী ময়রাণীর চরিত্রটি ইহার উপরই ভিত্তি করিয়া রচিত। এমন কি পদী ময়রাণীর মুখে পুঁটিরই ভাষা পর্যন্ত শুনিতে পাওয়া যায়।

কেবল প্রহসনখানির মধ্যে অস্বাভাবিক যদি কিছু হইয়া থাকে, তবে তাহা হানিফের ভক্তপ্রসাদকে কেবলমাত্র 'মুষ্ট্যাঘাত' করিয়াই নিষ্কৃতি দান— এখানে তাহাকে প্রায় হত্যা করিবার মত উত্তেজনার কারণ তাহার ছিল, হয়ত অন্য কেহ এই দৃশ্যে উপস্থিত না থাকিলে সে তাহাই করিত; কিন্তু গদাধর ও পুঁটি এখানেই ছিল, অবশ্য তাহা হইলে প্রহসনের লঘু পরিবেশটিও আবিল হইয়া উঠিত। ভক্তপ্রসাদের সঙ্গে হানিফের ইহার পরবর্তী আচরণটুকু যে অস্বাভাবিক হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; কারণ, তখন তাহার আর 'হাস্যমুখে' ভক্তপ্রসাদের সঙ্গে কপটতা করিবার মত মনোভাব থাকিবার কথা নহে। বিশেষতঃ তাহার চরিত্রের মধ্যেও সেইরূপ কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না।

'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'র প্রধান গুণ এই যে, সেই যুগের অন্যান্য প্রহসনের মত ইহার মধ্যে কোন মতবাদ প্রাধান্য লাভ করে নাই, সমাজ-সংস্কারের কোন সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য লইয়াও ইহা রচিত বলিয়া অনুভূত হয় না। ভক্তপ্রসাদের যে পরিণতি ইহাতে দেখান হইয়াছে, তাহা অনুরূপ অবস্থায় সকল চরিত্রের মধ্যে সকল সময়েই সম্ভব। ভক্তপ্রসাদের প্রবৃত্তির মধ্যে একটি চিরন্তন মানবিক দুর্বলতাই প্রকাশ পাইয়াছে; ইহা সেকালে যেমন ছিল, একালেও তেমনই আছে।

এই প্রহসনখানির মধ্যে পীতাম্বর তেলীর স্ত্রী ভগী ও তাহার মেয়ে পাচীর একটি প্রসঙ্গ আছে—এই পাচীর কাহিনীটি অবলম্বন করিয়া পরবর্তী নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার 'নীল-দর্পণ' নাটকের ক্ষেত্রমণির কাহিনীর একাংশের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন।

'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'র ভাষা সম্পর্কেও কিছু বলা আবশ্যক। ইহার মধ্যেই বাংলা প্রহসনে সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে গ্রাম্যভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। ইতিপূর্বে রামনারায়ণ 'কুলীন-কুলসর্বস্ব' নাটকে সামান্য একটি চরিত্রের মধ্যে মাত্র এই ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন। অবশ্য 'আলালের ঘরের দুলালে'ও এই ভাষাই ব্যবহৃত হইয়াছে, তথাপি এই ভাষার যে একটি নাটকীয় মূল্য আছে, তাহা মধুসূদনই সর্বপ্রথম অনুভব করিলেন। তিনি তাঁহার 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনের মধ্যে এই গ্রাম্যভাষা এত বিস্তৃত ভাবে ব্যবহার করিবার সুযোগ পান নাই; কারণ, তাহা নাগরিক জীবনের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত; কিন্তু 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' পল্লীজীবনের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত বলিয়া ইহাতেই গ্রাম্য ইতরভাষা ব্যবহার করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। এই ধারাটিরই অনুসরণ করিয়া পরবর্তী নাট্যকার দীনবন্ধু তাঁহার 'নীল-দর্পণ' নাটকে এই গ্রাম্যভাষা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার পরিকল্পিত গ্রাম্য চরিত্রগুলির ভাষার মধ্যে মধুসূদনের এই প্রহসনখানিরই অনুরূপ প্রকৃতির চরিত্রসমূহের ভাষার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। এই প্রহসনখানিই দীনবন্ধু মিত্রকে তাঁহার 'বিয়েপাগলা বুড়ো' নামক প্রহসন রচনার প্রেরণা দান করিয়াছিল বলিয়া অনুভূত হয়। উভয়ের নামকরণের মধ্যেও বিশেষ বৈসাদৃশ্য নাই।

'কৃষ্ণকুমারী' নাটক রচনার সঙ্গে সঙ্গেই মধুসূদনের প্রকৃত নাট্যকার জীবনের অবসান হয়। নিতান্ত অর্থের প্রয়োজনে ইহার তের বৎসর পর তিনি 'মায়াকানন' নামক আর একখানি নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা অসম্পূর্ণ রাখিয়াই তিনি পরলোক গমন করেন, ইহার সঙ্গে তাঁহার প্রথম জীবনের নাট্য-সাধনার কোন যোগ নাই।

সপ্তম অধ্যায়

দীনবন্ধু মিত্র

(১৮৬০—১৮৭৩)

বাংলা সাহিত্যে দীনবন্ধু মিত্র একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, এমন কি, কতকগুলি বিষয়ে তাঁহাকে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এই সম্পর্কে প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁহার নাট্যরচনার শ্রেষ্ঠ গুণসমূহ নির্দিষ্ট এবং কতকগুলি অপরিসর বিষয় অবলম্বন করিয়াই প্রকাশ পাইয়াছে। সমগ্রভাবে নাটক রচনায় তাঁহার ত্রুটি অনেক। কিন্তু একটি নাটক লইয়া সমগ্র ভাবে বিচার করিবার পরিবর্তে যদি তাঁহার কোন কোন রচনার অংশ-বিশেষ বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, তাঁহার মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের সম্ভাবনা বর্তমান ছিল; বাংলা নাটক রচনার যথোপযুক্ত আদর্শ সম্মুখে না থাকার জন্যই, তিনি তাঁহার সেই সম্ভাবনাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে পারেন নাই। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার প্রতিভার আর একটি প্রধান ত্রুটি এই ছিল যে, তিনি প্রত্যক্ষদৃষ্ট কোন বস্তুকে অতিক্রম করিয়া যখন অপ্রত্যক্ষ লোকে কল্পনার চক্ষু বিস্তার করিতেন, তখন তাঁহার দৃষ্টি অস্পষ্ট হইয়া আসিত। অথচ নাটকের জগৎ কেবলমাত্র নাট্যকারের প্রত্যক্ষ পরিচয়ের জগৎ নহে, বিচিত্র লোক-চরিত্রের সমাবেশে ইহা পরিপূর্ণ, জীবনের বহুমুখী ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া ইহার রসস্ফূর্তি। এই বিচিত্র ও বহুমুখী সামাজিক জ্ঞান একজন নাট্যকার তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দ্বারা অর্জন করিতে পারেন না। পূর্বেই বলিয়াছি, নাট্যরচনা বস্তুধর্মী; কিন্তু বস্তুধর্মী হইলেই যে এই সম্বন্ধে জ্ঞান একজনের অভিজ্ঞতা দ্বারা আয়ত্ত হইতে পারে, তাহা নহে। কারণ, যে বিচিত্র লোকচরিত্র ও বিস্তৃত সামাজিক পটভূমিকা ইহার ভিত্তিরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা নাট্যকারের কতকটা অভিজ্ঞতা-লব্ধ ও কতকটা কল্পনা-সাপেক্ষ। জীবনকে যতটুকু দেখিলাম ও তাহা হইতে যতটুকু বুঝিলাম, তাহা লইয়াই নাটক—জীবনের প্রত্যক্ষ অংশের উপর ভিত্তি করিয়াই পরোক্ষ অংশের জ্ঞান লাভ করিতে হয়, এই জ্ঞান লাভ করিতে গিয়া

যে পরিমাণ ভুল হয়, নাট্যরচনাও সেই পরিমাণেই ব্যর্থ হয়। দীনবন্ধু এই জীবনকে যতটুকু দেখিয়াছিলেন, ততটুকুরই যথার্থ নাট্যরূপ দিয়াছেন, কিন্তু যতটুকু বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ততটুকুতেই ভুল করিয়াছেন। দীনবন্ধু প্রত্যক্ষদ্রষ্টা ছিলেন, দূরদ্রষ্টা কিংবা অন্তর্দ্রষ্টা ছিলেন না; কিন্তু নাটীক চরিত্রসৃষ্টিতে প্রত্যক্ষদৃষ্টি অপেক্ষা দূরদৃষ্টি বা অন্তর্দৃষ্টি কম প্রয়োজনীয় নহে, সেইজন্য তাঁহার সাফল্যকে আংশিক বলিতে হইবে। কিন্তু এ কথা সত্য যে, দীনবন্ধু যতটুকু প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করিয়াছেন, ততটুকু তাহার মত আর কোন নাট্যকারই করিতে পারেন নাই। এই পরিচয় তাহার শুধুই যে নিবিড় তাহা নহে, আন্তরিকও বটে। তাহারই ফলে তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত নাট্যিক চরিত্রগুলি প্রাণরসে সজীব—এই গুণ বাংলা সাহিত্যের আর কোন নাট্যকারই দেখাইতে পারেন নাই, এইখানেই দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠত্ব।

দীনবন্ধুর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁহার প্রিয়সুহৃদ্ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সম্বন্ধে যে একটি আলোচনা প্রকাশিত করেন, তাহাই আজ পর্যন্ত দীনবন্ধুর সাহিত্য-বিচারের প্রধান অবলম্বন হইয়া রহিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র তাহাতে দীনবন্ধুর দোষগুণ লইয়া সকল দিক দিয়াই এমন নিখুঁত আলোচনা করিয়াছেন যে, তাহার অতিরিক্ত তাঁহার সম্বন্ধে আর কিছুই বলিবার নাই। অতএব তাঁহার আলোচ্য বিষয়গুলিই এখানে সর্বপ্রথম উল্লেখ করা যাইতেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, 'দীনবন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাব্যশিষ্য। ঈশ্বরচন্দ্রের কাব্যশিষ্যদিগের মধ্যে দীনবন্ধু গুরুর যতটা কবি-স্বভাবের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, এত আর কেহ নহে। দীনবন্ধুর হাস্যরসে যে অধিকার, তাহা গুরুর অনুকারী। বাঙ্গালীর প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে দীনবন্ধুর কবিতার যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহাও গুরুর অনুকারী। যে রুচির জন্য দীনবন্ধুকে অনেকে দূষিয়া থাকেন, সে রুচিও গুরুর।' কবি ঈশ্বরচন্দ্রের এই বিশিষ্ট গুণগুলি দীনবন্ধু শিষ্যতা-সূত্রে তাঁহার নিকট হইতে লাভ করিয়া নিজের নাট্য-রচনার ভিতর দিয়াও প্রকাশ করিয়াছেন, কেবলমাত্র তাঁহার কাব্যরচনার মধ্যেই তাহা সীমাবদ্ধ রাখেন নাই। এ কথা সত্য যে, ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতার মধ্যে একটি নাটকীয় গুণ ছিল; তাহার কারণ, প্রধানত ঈশ্বরচন্দ্র নিষ্ঠাবান্ বস্তুতান্ত্রিক। দীনবন্ধুর মধ্যে যে নাট্য-প্রতিভার

পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা একান্তভাবে ঈশ্বরচন্দ্রের এই বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিরই অনুগামী। তবে ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে দীনবন্ধুর পার্থক্য এই যে, ঈশ্বরচন্দ্র যেখানে বর্ণনা দিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, দীনবন্ধু সেখানে একটি পূর্ণাঙ্গ চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, 'কবির প্রধান গুণ সৃষ্টি-কৌশল। ঈশ্বর গুপ্তের এ ক্ষমতা ছিল না। দীনবন্ধুর এ ক্ষমতা প্রচুর পরিমাণে ছিল।' নিজস্ব প্রতিভার অনুকূল পূর্ণাঙ্গ চরিত্রসৃষ্টিতে দীনবন্ধু যে পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন, তাহা ঈশ্বরচন্দ্রে দেখা যায় নাই—এইখানেই শিষ্য গুরুকে অতিক্রম করিয়া কাব্যের ক্ষেত্র হইতে নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। 'বাঙ্গালা সমাজ সম্বন্ধে দীনবন্ধুর বহুদর্শিতা' সম্বন্ধেও বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখ করিয়াছেন। এই বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র হইতেও তাঁহার অভিজ্ঞতা ব্যাপক ছিল—বস্তুতান্ত্রিক দীনবন্ধুর এই বহুমুখী অভিজ্ঞতাই তাঁহার নাট্য-সাহিত্যের বৈচিত্র্যসৃষ্টির মূল। বঙ্কিমচন্দ্র ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, 'দীনবন্ধু অনেক সময়ই শিক্ষিত ভাস্কর বা চিত্রকরের ন্যায় জীবিত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চরিত্রগুলি গড়িতেন; সামাজিক বৃক্ষে সামাজিক বানব সমারূঢ় দেখিলেই অমনি তুলি ধরিয়া তাহার লেজশুদ্ধ আঁকিয়া লইতেন। এটুকু গেল তাঁহার realism, তাহার উপর idealize করিবারও বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল। সম্মুখে জীবন্ত আদর্শ রাখিয়া আপনার স্মৃতির ভাণ্ডার খুলিয়া উহার ঘাড়ের উপর অন্যের দোষগুণ চাপাইয়া দিতেন; যেখানে যেটি সাজে, তাহা বসাইতে জানিতেন। গাছের বানরকে এইরূপ সাজাইতে সাজাইতে সে একটা হনুমান্ বা জাম্বুবানে পরিণত হইত।' কিন্তু এ কথা সত্য যে, জীবিত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তিনি চরিত্রগুলির যে অংশ গঠন করিতেন, তাহা যেমন উজ্জ্বল হইত, তাঁহার 'স্মৃতির ভাণ্ডার খুলিয়া' রচিত সেই চরিত্র-গুলির অবশিষ্ট অংশ তেমন উজ্জ্বল হইত না—ইহা একান্ত বস্তুনিষ্ঠ স্রষ্টার একটি সাধারণ ত্রুটি বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর আর একটি প্রধান গুণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার 'সর্বব্যাপী সহানুভূতি'। তিনি লিখিয়াছেন, '……দীনবন্ধুকে আমি বিশেষ জানিতাম; তাঁহার হৃদয়ের সকল ভাগই আমার জানা ছিল। আমার এই বিশ্বাস, এইরূপ পরদুঃখকাতর মনুষ্য সংসারে আর আমি দেখিয়াছি কিনা সন্দেহ। তাঁহার গ্রন্থেও সেই পরিচয় আছে।' তারপর 'এক শ্রেণীর লোক যখন মনে করেন, তখনই সহানুভূতি আসিয়া উপস্থিত হয়, নহিলে সে

আসিতে পারে না। সহানুভূতি তাঁহাদের দাসী। অপর শ্রেণীর লোকেরা নিজেই সহানুভূতির দাস, তাঁহারা তাকে চান বা না চান, সে আসিয়া ঘাড়ে চাপিয়াই আছে, হৃদয় ব্যাপিয়া আসন পাতিয়া বিরাজ করিতেছে। প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকের কল্পনা-শক্তি বড় প্রবল; দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের প্রীতি-দয়াদি বৃত্তি সকল প্রবল। দীনবন্ধু এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক ছিলেন।' তাহার ফলেই দীনবন্ধুর চরিত্রসৃষ্টিতে একটি প্রধান ত্রুটি প্রকাশ পাইয়াছে। কারণ, সহানুভূতিই হউক, বিরক্তিই হউক, লেখকের ব্যক্তিগত মনোভাবকে সংযত করিতে না পারিলে কোন নাট্যিক চরিত্রসৃষ্টিই সার্থক হইতে পারে না। বর্ণিত বিষয়-বস্তুর উপর সহানুভূতির ফলে বস্তুতান্ত্রিক রচনায় কতকগুলি বিশিষ্ট গুণ প্রকাশ পাইতে পারে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই মনোভাবকে যথাযথভাবে সংযত করিয়া না লইতে পারিলে সমগ্র নাট্যিক পরিবেশের মধ্যে এক একটি চরিত্র অন্যায়রূপে প্রাধান্য লাভ করিয়া যাইতে পারে। কারণ, একটি বিশেষ চরিত্র যতই সহানুভূতির পাত্র হউক না কেন, সমগ্র নাট্যিক পরিবেশের মধ্যে তাহার একটি নির্দিষ্ট গণ্ডিবদ্ধ স্থান আছে, কোন দিক দিয়া অতিক্রম করিয়া গেলে সমগ্রভাবে ইহা নাটকের পক্ষে ক্ষতিকর হয়। এই প্রকার অসংযত সহানুভূতি প্রকাশের ফলে দীনবন্ধুর অনেক চরিত্রই যে তাঁহার নাটকের মধ্যে অসঙ্গত প্রাধান্য লাভ করিয়া গিয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাও উল্লেখ করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র সর্বশেষে বলিয়াছেন যে, 'দীনবন্ধুর এই দুইটি গুণ, (১) তাঁহার সামাজিক অভিজ্ঞতা, (২) তাঁহার প্রবল এবং স্বাভাবিক সর্বব্যাপী সহানুভূতি, তাঁহার কাব্যের গুণদোষের কারণ।......যেখানে এই দুইটির মধ্যে একটির অভাব হইয়াছে, সেইখানেই তাঁহার কবিত্ব নিষ্ফল হইয়াছে।' অর্থাৎ অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতি যেখানে কার্যকরী না হইয়াছে, সেইখানেই দীনবন্ধুর ব্যর্থতা দেখা দিয়াছে। সেইজন্য দীনবন্ধুর ছয় সাতখানি নাটকের মধ্যে মাত্র কয়েকখানিই সাফল্য লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হইবে; কারণ, দীনবন্ধুর অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতির ক্ষেত্র যতই বিস্তৃত হউক, তথাপি তাহাদের একটা নির্দিষ্ট সীমা ছিল, বিশেষত ইহাদের উভয়ের একযোগে কার্যকারিতার ক্ষেত্র আরও সীমাবদ্ধ। এই সকল সীমার মধ্যেই দীনবন্ধুর নাট্য-প্রতিভার বিকাশ করিতে হইয়াছে। অতএব এতগুলি দিক বিবেচনা করিয়া দীনবন্ধুর কৃতিত্ব বিচার করিতে হইবে।

ব্যাপক অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও, এ কথা স্বীকার করিতেই হয় যে, বিষয়ের দিক দিয়া দীনবন্ধুর মধ্যে বিশেষ বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার রচিত প্রহসনগুলির উপর রামনারায়ণ ও মাইকেল মধুসূদনের প্রহসনগুলির বিষয়গত প্রভাব সুস্পষ্ট; নাটকগুলির মধ্যে তাঁহার সর্বপ্রথম নাটক 'নীল-দর্পণে'র বিষয়-বস্তু ইতিপূর্বেই প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলালে'র উপজীব্য হইয়াছিল, তদ্ব্যতীত অন্যান্য নাটকে তিনি যে মৌলিক বিষয়-বস্তু ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাও তাঁহার অধিকাংশ নাটকেই প্রায় অভিন্ন—এই বিষয়ে তাহার বৈচিত্র্যসৃষ্টির ক্ষমতা ছিল না। তাঁহার অধিকাংশ নাটকই একটি নিরুদ্দিষ্ট চরিত্র ও তাহার পুনর্মিলনের কাহিনী লইয়া রচিত। এমন কি, এমনও দেখিতে পাওয়া যায়, নাট্যোল্লিখিত চরিত্রের নামগুলির মধ্যে পর্যন্ত তিনি অনেক সময় অভিন্নতা রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার 'নবীন তপস্বিনী' নামক নাটকের নায়িকার নাম কামিনী, তাঁহার 'জামাই বারিক' প্রহসনের নায়িকার নাম কামিনী, তাঁহার 'কমলে কামিনী' নাটকের নামের মধ্যেও এই কামিনী—এই প্রকার বিষয় ও চরিত্রগত বৈচিত্র্য-হীনতা তাঁহার নাটকগুলির একটি বিশেষ ত্রুটি। ইহা দীনবন্ধুর প্রতিভারই একটি মৌলিক ত্রুটি বলিতে হয়—কারণ, দীনবন্ধুর প্রতিভার যে বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট অভিজ্ঞতা আশ্রয় করিয়াই তাঁহার প্রতিভার বিকাশ হইয়াছে—নাট্যোল্লিখিত বিষয়-বস্তুর জগৎ যত বিস্তৃত, দীনবন্ধুর অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র স্বভাবতই তত বিস্তৃত হইতে পারে নাই, সেইজন্য ইহার যে অংশ রচনার জন্য তাঁহাকে কল্পনার আশ্রয় লইতে হইয়াছে, সেই অংশের রচনাই বৈচিত্র্য-হীন হইতে বাধ্য হইয়াছে।

এইবার দীনবন্ধুর রুচির কথা কিছু বলিব। দীনবন্ধুর রুচিবোধ দ্বারাই প্রধানত তাঁহার নাটকের দোষগুণ বিচার করা হইয়া থাকে। কারণ, তাহা এমনই প্রত্যক্ষ ও প্রখর যে তাহা যে কোন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারে না। তথাপি ইহা কতদূর সঙ্গত তাহা বিবেচ্য। ভারতচন্দ্রের কথা বাদ দিলে কেবলমাত্র রুচির জন্য বাংলা সাহিত্যের আর কোন লেখককে এমন সমালোচনার পাত্র হইতে হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁহার এই রুচি-বোধের কথা উল্লেখ না করিয়া পারেন নাই। এখানে প্রধান কথা হইতেছে যে, বাংলার গ্রাম্যজীবন ও কলিকাতার তদানীন্তন 'ইয়ং বেঙ্গলে'র জীবন

সম্পর্কে তাঁহার প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল—তাঁহার এই প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ফল তিনি তাঁহার কোন কোন নাটকের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। পূর্বেই বলিয়াছি, দীনবন্ধু real-কে ideal করিয়া লইতে পারিতেন না, ইহা তাঁহার বিশিষ্ট প্রতিভার বিরোধী ছিল। যাহা তিনি যেমন দেখিয়াছেন, তাহা তিনি অবিকল পাঠকের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন—এখানে তাঁহার ব্যক্তিগত রুচিবোধের কথা আসে না। কারণ, তিনি যদি রোমান্টিক লেখক হইতেন, আত্মমনোভাব দ্বারা রচনাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার ধর্ম যদি তাঁহার থাকিত, তাহা হইলে ইহাকে তাঁহার ব্যক্তিগত রুচিবোধ বলা যাইতে পারিত, কিন্তু তাঁহার সাহিত্য-ধর্ম পূর্বেই আলোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তিনি বস্তুনিষ্ঠ। এই একান্ত বস্তুনিষ্ঠাই একটি বিশেষ রুচিকে তাঁহার রচনার মধ্যে আশ্রয় দিবার কারণ হইয়াছে—ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত কোন রুচিবোধের পরিচায়ক নহে। এই সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য,—'তিনি নিজে সুশিক্ষিত এবং নির্মলচরিত্র, তথাপি তাঁহার গ্রন্থে যে রুচির দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার প্রবলা দুর্দমনীয়া সহানুভূতিই তাহার কারণ। যাহার সঙ্গে তাঁহার সহানুভূতি, যাহার চরিত্র আঁকিতে বসিয়াছেন, তাহার সমুদয় অংশই তাঁহার কলমের আগায় আসিয়া পড়িত। কিছু বাদ-সাদ দিবার তাঁহার শক্তি ছিল না; কেন না তিনি সহানুভূতির অধীন, সহানুভূতি তাঁহার অধীন নহে।' এই সহানুভূতি বুঝিতে বর্ণিত চিত্রের খুঁটিনাটির প্রতি নিষ্ঠাই বুঝিতে হইবে, ইহা কোন রোমান্টিক মনোভাবজাত নহে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, একান্ত বস্তুনিষ্ঠা হইতেই দীনবন্ধুর রচনায় রুচিদোষ ঘটিয়াছে, ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত রুচিবোধের ফল হইতে আসে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, 'তোরাপের সৃষ্টিকালে তোরাপ যে ভাষায় রাগ প্রকাশ করে, তাহা বাদ দিতে পারিতেন না। আতুরীর সৃষ্টিকালে, আতুরী যে ভাষায় রহস্য প্রকাশ করে, তাহা বাদ দিতে পারিতেন না; নিমচাঁদ গড়িবার সময়ে, নিমচাঁদ যে ভাষায় মাতলামী করে, তাহা ছাড়িতে পারিতেন না।' অতএব ইহাও সেই একান্ত বস্তুনিষ্ঠার ফল—এই বস্তুনিষ্ঠার সূত্র ধরিয়াই রুচিদোষ তাঁহার নাটকে প্রবেশ করিয়াছে, অতএব ইহা নিয়ন্ত্রিত হইলে দীনবন্ধুর বিশিষ্ট সৃষ্টিধর্মে আঘাত লাগিত। দোষই হউক, গুণই হউক—ইহা দীনবন্ধুর সৃষ্টিধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

দীনবন্ধু যে সমাজের উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহার প্রহসন ও কোন কোন নাটক রচনা করিয়াছেন, তাহার নৈতিক মান অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, তাহাতে যে-কোন প্রকৃত বস্তুনিষ্ঠ লেখকেরই এই রুচির পরিচয় দেওয়া অপরিহার্য হইত। দীনবন্ধুর রচনায় অশ্লীলতা নাই, গ্রাম্যতা আছে। অশ্লীলতা ও গ্রাম্যতা এক জিনিস নহে। বিদ্যাসুন্দরে অশ্লীলতা আছে, গ্রাম্যতা নাই; দীনবন্ধুতে গ্রাম্যতা আছে, অশ্লীলতা নাই। দীনবন্ধুর দোষ যদি কিছু থাকিয়া থাকে, তবে তাহা ছিল তাঁহার একান্ত গ্রাম্যতায় বা বাস্তবানুসরণে—বিশেষ কোন রুচিবোধে নহে। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে, অন্ধ বস্তুনিষ্ঠা দ্বারা উচ্চাঙ্গের নাট্যসৃষ্টি সম্ভব হইতে পারে না; এই সম্পর্কে একজন সমালোচক বলিয়াছেন—

'Drama is much more than a merely faithful representation of real life or real events. 'The illusion of a higher reality," which according to Aristotle, is the real purpose of drama, cannot be achieved by either strict logic or bare presentation of literal truth. It can only be attained by a certain kind of imaginative verisimilitude.'

এইখানেই নাটাকার হিসাবে বস্তুনিষ্ঠ দীনবন্ধুর প্রকৃত ত্রুটি প্রকাশ পাইয়াছে।

দীনবন্ধু অবিসংবাদিতরূপে বাংলা সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক। রামনারায়ণ ইতিপূর্বেই তাঁহার নাট্য-রচনার ভিতর দিয়া বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের পরিবেশন করিয়াছেন, মাইকেল মধুসূদনও তাঁহার প্রহসনগুলির ভিতর দিয়া সেই পথে অগ্রসর হইয়াছেন—দীনবন্ধু তাঁহাদেরই পথ অনুসরণ করিলেও, এই গুণে তিনি তাঁহার পূর্ববর্তীদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিতে পারেন। পূর্বেই বলিয়াছি, দীনবন্ধু ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য-শিষ্য। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, 'দীনবন্ধুর হাস্যরসে যে অধিকার তাহা গুরুর অনুকারী।' ইহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া তিনি নিজেই বলিয়াছেন, 'দীনবন্ধু ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে এক জাতীয় ব্যঙ্গ প্রণেতা ছিলেন। আগেকার দেশীয় ব্যঙ্গ প্রণালী এক জাতীয় ছিল—এখন আর এক জাতীয় ব্যঙ্গে আমাদিগের ভালবাসা জন্মিতেছে। আগেকার লোক কিছু মোটা কাজ ভালবাসিত; এখন সরুর উপরে লোকের অনুরাগ। আগেকার রসিক লাঠিয়ালের ন্যায় মোটা লাঠি লইয়া সজোরে শত্রুর মাথায় মারিতেন, মাথার খুলি ফাটিয়া যাইত; এখনকার

রসিকেরা ডাক্তারের মত সরু লানসেটখানি বাহির করিয়া, কখন কুচ করিয়া বাথার স্থানে বসাইয়া দেন, কিছু জানিতে পারা যায় না। কিন্তু হৃদয়ের শোণিত ক্ষতমুখে বাহির হইয়া যায়।' দীনবন্ধু প্রথমোক্ত শ্রেণীর হাস্যরসিক এবং বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর হাস্যরসিক। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেই বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম শুভ্র ও নির্মল হাস্যরসের সন্ধান পাওয়া যায়। ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবের ফলেই যে বাংলা সাহিত্যে এই শুভ্র নির্মল হাস্যরসের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, হাস্যরসের সৃষ্টির দিক দিয়া দীনবন্ধু বাংলা সাহিত্যে বাংলার নিজস্ব প্রাচীন ধারার সর্বশেষ শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কালে এই প্রাচীনতর ধারাটি যে একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তাহা নহে—তবে একথা সত্য যে, তাহার কোন কার্যকর প্রভাব সাহিত্যের ভিতর দিয়া অনুভব করা যাইত না। দীনবন্ধুর সঙ্গে তাঁহার গুরু ঈশ্বরচন্দ্রের একটু পার্থক্য অনুভব করা যায়—ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যে একটু ব্যঙ্গ (satire)-প্রিয়তা ছিল, দীনবন্ধুর মধ্যে তাহা একেবারেই ছিল না; দীনবন্ধু ছিলেন যথার্থ হাস্যরসিক বা humorist। জীবনের ছোটখাট অসঙ্গতির উপর তিনি তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ হাস্যরস বর্ষণ করিয়া তাহাকে ধুইয়া মুছিয়া নির্মল করিয়া দিতেন, কিন্তু তাহার উপর কশাঘাত করিতেন না। বাংলা সাহিত্যে এই শ্রেণীর আর একজন সাহিত্যিক আধুনিক কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইঁহাদের উভয়েরই এই বিষয়ে পার্থক্য আছে।

দীনবন্ধুর বহু দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে তিনিই সর্বপ্রথম কতকগুলি সামাজিক চরিত্রসৃষ্টিতে পূর্ণাঙ্গ সাফল্য লাভ করিয়াছেন। এ কথা সত্য যে, দীনবন্ধুর দৃষ্টি সাধারণত প্রত্যক্ষ খণ্ডবস্তুকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশ পাইয়াছে—সমগ্রভাবে প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ অংশকে মিলাইয়া এক একটি পূর্ণাঙ্গ চরিত্রসৃষ্টি তাঁহার ক্ষমতার অতীত ছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যে সকল সামাজিক চরিত্র সমগ্রভাবেই তাঁহার অভিজ্ঞতার অন্তর্ভূত ছিল, তাহাদের রূপায়ণে তিনি তাহাদের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় যথাযথ প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহার সৃষ্ট এই প্রকার চরিত্রের সংখ্যা অল্প, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহা দ্বারাই তাঁহার প্রতিভার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। মাইকেল মধুসূদনের মধ্যে এই প্রকার চরিত্র-বিকাশ দেখিতে পাওয়া

গিয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহার পরিকল্পিত বাংলার সামাজিক চরিত্রগুলি অসম্পূর্ণ, কেবলমাত্র দুইখানি প্রহসন অবলম্বন করিয়াই তাহা রূপায়িত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালীর জীবনেও যে নাট্যসাহিত্যের পরম মূল্যবান উপাদান বর্তমান ছিল, তাহা দীনবন্ধুর পূর্বে এমন পূর্ণাঙ্গরূপে চোখে আঙ্গুল দিয়া আর কেহ দেখাইয়া দিতে পারেন নাই। তাঁহার নিমচাঁদ, অভয়-কুমার, কামিনী ইহারা আমাদের ঘরের লোক হইয়াও যে ভাবে নাট্যমঞ্চের উপর দিয়া নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করিয়াছে, তাহা হইতেই সেদিন বুঝিতে পারা গিয়াছিল যে, বাঙ্গালীর জীবনেও মূল্যবান নাটকীয় উপাদান বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে।

দীনবন্ধু সহানুভূতি দ্বারা প্রত্যেক চরিত্রই প্রত্যক্ষ করিতেন বলিয়া উহারা যেমন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, তেমনই জীবনের কতকগুলি গূঢ় সত্যও ইহাদের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার অধিকাংশ হাস্যরসের পাত্রই প্রচ্ছন্ন করুণরসের আধার। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, কমেডির তার অল্পে অল্পে চড়াইতে চড়াইতে গিয়াই ট্র্যাজিডিতে উপনীত হইতে হয়—সেইজন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, দীনবন্ধুর অধিকাংশ সামাজিক নাটকই উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজিডি হইতে পারিত, কিন্তু তাঁহার সাহিত্য-ধর্ম ট্র্যাজিডি সৃষ্টির বিরোধী ছিল বলিয়া তাঁহার কমেডির তার ট্র্যাজিডির মাত্রায় চড়িতে পারে নাই। বৃদ্ধের বিবাহ-সাধের মধ্য দিয়া হাস্যরসের পরিবর্তে মানব-জীবনের যে এক করুণ সত্য প্রকাশ পায়, তাহা তাঁহার 'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো' প্রহসনের ভিতর দিয়া গোপন থাকিতে পারে নাই; উচ্চশিক্ষিত নব্যযুবক নিমচাঁদের মাতলামীর ভিতর দিয়া যে তাহার ব্যর্থ দাম্পত্য জীবনের করুণ বিলাপই প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাও নাট্যকার গোপন করিতে পারেন নাই; অভয়কুমারের প্রতি কামিনীর আক্রোশের ভিতর দিয়াও যে অসঙ্গত সমাজ-ব্যবস্থার ফলে তাহার ব্যক্তি-জীবনের নিষ্ফলতাজনিত আক্রোশই প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাও ত 'জামাই বারিক' নাটকের মধ্যে গোপন নাই। বাঙ্গালী জীবনের মধ্যে এত বিচিত্র নাটকীয় উপাদান সংগ্রহের সর্বপ্রথম কৃতিত্ব দীনবন্ধুরই প্রাপ্য।

সর্বশেষে আলোচনা করিতে হয় দীনবন্ধুর ভাষা। দীনবন্ধুর পূর্বে নাটক রচিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু নাটকীয় ভাষার কোন আদর্শ স্থির হইতে পারে নাই—যে যাঁহার প্রতিভা ও প্রেরণা অনুযায়ী ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, দীনবন্ধু ছিলেন খাঁটি বস্তুনিষ্ঠ লেখক, অতএব যেখানে তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতার অন্তর্ভূত কোন চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, সেখানে তিনি ভাষা সম্পর্কেও তাঁহার অভিজ্ঞতাকে নাটকে ব্যবহার করিয়াছেন। অর্থাৎ যাহার যে রকম ভাষা তিনি নিজের কানে শুনিয়াছেন, তাহার জন্য সেই ভাষাই তাঁহার নাটকে ব্যবহার করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই সম্পর্কে বলিয়াছেন, 'সহানুভূতি তাঁহাকে (দীনবন্ধুকে) বলিত, "আমার হুকুম, সবটুকু লইতে হইবে—মায় ভাষা। দেখিতেছ না যে, তোরাপের ভাষা ছাড়িলে, তোরাপের রাগ আর তোরাপের রাগের মত থাকে না; আদুরীর ভাষা ছাড়িলে, আদুরীর তামাসা আর আদুরীর তামাসার মত থাকে না; নিমচাঁদের ভাষা ছাড়িলে, নিমচাঁদের মাতলামী আর নিমচাঁদের মাতলামীর মত থাকে না?—সবটুকু দিতে হবে।" দীনবন্ধুর সাধ্য ছিল না যে বলেন—"না, তা হবে না।" একান্ত বস্তুনিষ্ঠার জন্যই দীনবন্ধুর ভাষাও এতখানি বাস্তব।'

কিন্তু একথা তাঁহার নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত চরিত্রের ব্যবহৃত ভাষা সম্পর্কে প্রযোজ্য হইলেও উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত চরিত্রের ব্যবহৃত ভাষা সম্পর্কে প্রযোজ্য নহে। সংস্কৃত নাটক তথা রামনারায়ণ ও মধুসূদনের পথ অনুসরণ করিয়া দীনবন্ধু উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত চরিত্র সম্পর্কে 'সাধুভাষা' ব্যবহার করিয়াছেন। যেখানে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাব ও পরানুকরণ, সেখানেই দীনবন্ধুর ব্যর্থতা; সাধুভাষা কৃত্রিম ভাষা, সেইজন্য ইহা দীনবন্ধুর স্বাধীন প্রতিভা বিকাশের অন্তরায় হইয়াছে এবং তাহার ফলে তাঁহার নাট্যরচনার স্বাভাবিক শক্তি ব্যাহত হইয়াছে।

একটি সমসাময়িক ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া দীনবন্ধুর প্রথম নাটক 'নীল-দর্পণ' রচিত হয়। নাটকখানি প্রকাশিত হইবার পূর্বেই ইহার বিষয়টি সমসাময়িক সাহিত্যের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁহার সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (২য় কল্প, পৃঃ ১১৫-১২০)-য় 'নীল-দর্পণ' রচনার বহু পূর্বেই এই বিষয়ক সর্বপ্রথম এই আলোচনাটি প্রকাশ করেন—

** ভূস্বামীদিগের বিষম অত্যাচারের বিবরণ পাঠ করিলে বিস্ময়াপন্ন ও ব্যাকুলচিত্ত হইতে হয়; কিন্তু এক্ষণে চতুর্দিক হইতে এই কথাই শ্রুত হওয়া যাইতেছে যে, নীলকরদিগের অত্যাচার তদপেক্ষায় ভয়ানক, তাঁহাদের দৌরাত্ম্যে

প্রজাকুল নির্মূল হইবার উপক্রম হইয়াছে। বাস্তবিক যেমন কোন স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া, দুই ভিন্ন ভিন্ন সমুদ্র দৃষ্টি করিলে, সহসা তাহাদের পরিমাণ-নিরূপণ ও পরস্পর তারতম্য নিশ্চয় করা যায় না,—কারণ তাহাদের উভয়কেই অসীমপ্রায় বোধ হয়;—সেইরূপ ভূস্বামী ও নীলকরদিগের অশেষপ্রকার উপদ্রবের বিষয় পর্যালোচনা করিয়া, পরস্পর তারতম্য করা দুষ্কর। কারণ, উভয়েরই অত্যাচার-জনিত দুঃসহ দুঃখরাশির সীমা দৃষ্টিপথের বহির্ভূত ও বাক্যপথের অতীত। নীলকরদিগের কার্যের আদ্যোপান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে, স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, কেবল প্রজা-পীড়ন করিয়া স্বকার্য উদ্ধার করাই তাঁহাদের সঙ্কল্প। দেখ, প্রজারা আপন অধিকারস্থ না হইলে, তাহাদের উপর সম্পূর্ণ বলপ্রকাশ ও স্বেচ্ছানুরূপ অত্যাচার করা সম্ভাবিত হয় না; অতএব তাঁহারা স্বীয় স্বীয় কুটীর সন্নিহিত গ্রাম সকল ইজারা লইয়া থাকেন, এবং তদ্দ্বারা তাহাদিগকে স্বীয় লোভ-খর্পরে পাতিত করিয়া, মনস্কামনা সিদ্ধ করেন। বিবেচনা করিলে, তাঁহারা এই কৌশল দ্বারা ভূ-স্বামীদিগের সদৃশ প্রবল প্রতাপ ও প্রভূত পরাক্রম প্রাপ্ত হয়েন এবং বাস্তবিকও আপনাদিগকে স্বাধিকারের সম্রাট্‌-স্বরূপ জ্ঞান করিয়া, প্রজাপীড়নে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করেন।

নীলকরদিগের কার্যের বিবরণ করিতে হইলে, কেবল প্রজা-পীড়নেরই বৃত্তান্ত লিখিতে হয়। তাঁহারা দুই প্রকারে নীল প্রাপ্ত হয়েন। প্রজাদিগকে অগ্রিম মূল্য দিয়া, তাহাদের নীল ক্রয় করেন এবং আপনারা ভূমি-কর্ষণ করিয়া, নীল প্রস্তুত করেন। সরল-স্বভাব সাধু ব্যক্তিরা মনে করিতে পারেন, ইহাতে দোষ কি? কিন্তু লোকের কত ক্লেশ, কত আশা-ভঙ্গ, কতদিন অনশন, কত যন্ত্রণা যে, এই উভয়ের অন্তর্ভূত রহিয়াছে, তাহা ক্রমে ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে। এই উভয়ই প্রজা-নাশের দুই অমোঘ উপায়। নীল প্রস্তুত করা প্রজাদিগের মানস নহে; নীলকর তাহাদিগকে বলদ্বারা তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত করেন ও নীল-বীজ বপনার্থে তাহাদের উত্তমোত্তম ভূমি নির্দিষ্ট করিয়া দেন। দ্রব্যের উচিত পণপ্রদান করা তাঁহার রীতি নহে **। নীলকর সাহেব স্বাধিকারের একাধিপতি স্বরূপ; তিনি মনে করিলেই, প্রজাদিগের সর্বস্ব হরণ করিতে পারেন; তবে অনুগ্রহ ভাবিয়া দাদন-স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ যাহা প্রদান করিতে অনুমতি করেন, গোমস্তা ও অন্যান্য আমলাদের দস্তুরি ও

হিসাবানাদি-উপলক্ষে তাহার কোন্ না অর্ধাংশ কর্তন যায় ? এ কারণ প্রজারা যে ভূমিতে ধান্য ও অন্যান্য শস্য বপন করিলে, অনায়াসে সংবৎসর পরিবার প্রতিপালন করিতে পারে, তাহাতে নীলকর সাহেবের নীল বপন করিলে, লাভ দূরে থাকুক, তাহাদিগকে দুশ্ছেদ্য ঋণজালে বদ্ধ হইতে হয়। অতএব, তাহারা কোনক্রমেই এ বিষয়ে স্বেচ্ছানুসারে প্রবৃত্ত হয় না।

* * *

* * যদি নীলকর সাহেব কোন কৃষকের অনভিমতে তাহার ভূমি চিহ্নিত করিয়া যান, আর সেই দীন-দশাপন্ন কৃষাণ তদীয় মায়া-পরিত্যাগে অসমর্থ হইয়া আমিন, তাগাদিদার প্রভৃতি ক্ষুদ্র আমলাদিগকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উৎকোচ প্রদান দ্বারা সন্তুষ্ট রাখিয়া, সেই ভূমিতে তিল, ধান্যাদি শস্য বপন করে এবং তাহা সাহেবের শ্রুতিগোচর হয়, তবে তিনি তথায় স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, সেই শস্যপূর্ণ ভূমিতে পুনর্বার হল-চালনা করিয়া নীলের বীজ বপন করেন। তখন সেই কৃষাণের বোধ হয়, যেন ঐ হল-যন্ত্র তাহার হৃদয়-ক্ষেত্রেই চালিত হইল।

* * *

ভূমি কর্ষণপূর্বক নীল প্রস্তুত করা, নীলকরের দ্বিতীয় কার্য। তিনি যেমন প্রথম কার্য সম্পাদনার্থে প্রজাদিগকে যথার্থ মূল্যদানে অস্বীকার পান, সেইরূপ দ্বিতীয় কার্য-সাধনার্থে তাহাদিগকে সমুচিত বেতনে বঞ্চিত করেন। তিনি এই অপরিবর্তনীয় নিয়ম করিয়া রাখিয়াছেন যে, কাহাকেও উচিত বেতন প্রদান করিবেন না ;—সুতরাং তাহারা পার্যমানে কোনক্রমেই তাঁহার কর্ম স্বীকার করিতে চাহে না। কিন্তু তাহারা কি করিবে ? নীলকর সাহেবের প্রবল প্রতাপ, ভয়ঙ্কর উপদ্রব ও করাল-মূর্তি স্মরণ করিয়া, কম্পান্বিত কলেবরে তদীয় আজ্ঞা প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হয়।

* * *

দুর্ভাগ্য কৃষকদিগকে এইরূপে পুনঃ পুনঃ নিগৃহীত ও অত্যাচারিত হইয়া সর্বপ্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়াও সাহেবের নীল প্রস্তুত করিয়া দিতে হয়। যৎকালে তাহারা নীলকর্তন করিয়া কুঠিতে উপস্থিত করে, সেকাল তাহাদের বিষম বিপত্তির কাল। হিংস্র জন্তুবৎ নৃশংস-স্বভাব আমলারা দাদন প্রদানকালে কৃষাণদিগের ধন গ্রহণ করে, তৎপরেও মধ্যে মধ্যে নানা উপলক্ষ্য করিয়া তাহাদের অর্থাপহরণ করে এবং অবশেষে নীল পরিমাপের সময়েও তাহারদিগকে যৎপরোনাস্তি নিপীড়ন করে। পরিমাপে ন্যূন করিব বলিয়া তাহারদিগকে ভয় প্রদর্শন করে—

২৫ মণ পরিমাণোপযোগী নীল দেখিয়া পাঁচ মণ মাত্র লিখিতে চাহে। তখন প্রজারা সর্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল ও ভয়ে কম্পমান হয় এবং নিতান্ত অপার্যমানে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রণামী লইয়া তাঁহারদের পদে সমর্পণ করে। তাঁহারা প্রণামি প্রাপ্ত হইলে নীল পরিমাপে প্রবৃত্ত হয়েন; তাহাতেও সাহেবের পক্ষাবলম্বন ও আত্মলাভ সঙ্কল্প করিয়া তাহাদের মুণ্ডে দণ্ডাঘাত করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয়েন না।

* * *

হায়! যাহারা কেবল দণ্ড ভয়ে আপনার অনভিমত কার্যে এইরূপে নিয়োজিত থাকে,—গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড রৌদ্র ও বর্ষা ঋতুর অজস্র বারিবর্ষণ সহ্য করে, তাহারদিগের কি বিজাতীয় যন্ত্রণা। তাহারা দণ্ডায়মান হইয়া হল-চালনা করুক, হস্তদ্বারা নীলভূমির তৃণ উৎপাটন করুক, তৎপূর্ণ নৌকাই বা বাহন করুক, তাহারদের অন্তঃকরণ কদাপি সেস্থানেও সেকার্যে নিবিষ্ট থাকে না। যখন কৃষকেরা নীলকরের নীলক্ষেত্র কর্ষণ করে, তখন তাহারা আপনার ভূমি ও আপনার শস্য স্মরণ করিয়া উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হয়।—স্বসন্তানবৎ স্নেহাস্পদ শস্যবৃক্ষগুলি স্বচক্ষে দর্শন করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হয়। যে সময়ে তাহারদের স্বীয় ভূমি কর্ষণপূর্বক সম্বৎসরের অন্ন সংস্থান করা আবশ্যক, যে সময়ে তাহারা স্বকীয় কার্য সমাধা করিতেই স্বাবকাশ পায় না, সেই সময় তাহারদিগকে অযথোচিত বেতন স্বীকার পূর্বক অন্যের কর্মে নিযুক্ত থাকিয়া শরীর ক্ষয় করিতে হয়।

* * *

* * নীলকরের কর্মচারীদিগের চরিত্রের বিষয় কি বলিব? তাহা সাধারণের অবিদিত নাই। তাঁহারা ভদ্রলোক বলিয়া বিখ্যাত বটেন, কিন্তু ব্যবহারাকারে ভদ্রাভদ্র বিবেচনা করিতে হইলে, তাঁহাদিগকে এ আখ্যা প্রদান করা, কোনক্রমেই উচিত নহে। যৎকিঞ্চিৎ অঙ্ক-শিক্ষা-মাত্র তাঁহাদের বিদ্যার সীমা; তাঁহারা বিদ্যারম্ভের স্বাদ গ্রহণও করেন না, নীতিশাস্ত্রেও শিক্ষিত হয়েন না। বিদ্যা ও ধর্ম-বিহীন লোকের যেরূপ আচরণ হওয়া সম্ভব, তাহা কাহার অগোচর আছে?

* * *

এ দেশীয় লোকের মফস্বলস্থ ম্যাজিস্ট্রেটদিগের নিকটে নীলকরদিগের নামে অভিযোগ করিবার অধিকার নাই, কিন্তু তাঁহাদের এ দেশীয় লোকের নামে

অভিযোগ করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে। ইহাতে বিচার স্থলেও, নীলকরদিগেরই প্রভুত্ব ও পরাক্রম প্রকাশ হয়।

যাহারা এই সমস্ত অভাবনীয় অত্যাচার ক্রমাগত সহ্য করিতেছে, তাহাদের আর কি ক্ষমতা থাকিতে পারে? তাহারা ধন-বিষয়ে দরিদ্র, জ্ঞান-বিষয়ে দরিদ্র, ধর্ম-বিষয়ে দরিদ্র এবং বল ও বীর্য বিষয়েও দরিদ্র হইয়াছে। তাহাদের এই দারুন দুরবস্থা-নিবারণেরই বা উপায় কি? আমাদের দেশীয় লোকের পরস্পর ঐক্য নাই, এবং জন-সমাজের অধস্তন শ্রেণীর সহিত উপরিতম শ্রেণীর মিলন নাই। যাহাদের স্বদেশের দুরবস্থা-মোচনের ইচ্ছা আছে, তাহাদের তদুপযোগী সামর্থ্য নাই; যাহাদের সামর্থ্য আছে, তাহাদের ইচ্ছা নাই। কোন পর্বতোপরি আরোহণ করিতে গেলে, যতদূর উত্থিত হওয়া যায়, ততই গ্রীষ্ম-হ্রাস ও শীতাধিক্য বোধ হয়, সেইরূপ এ দেশীয় জন-সমাজ-রূপ গিরি-শিখরের যত ঊর্ধ্বভাগ প্রত্যক্ষ করা যায়, ততই অনুৎসাহ, অননুরাগ, অযত্ন ও ঔদাস্যেরই নিদর্শন সকল দৃষ্ট হইতে থাকে। কি প্রকারে যে এই সকল দুর্নিবার প্রতিবন্ধক মোচন হইয়া, এ দেশের পরিত্রাণ সাধন হইবে, তাহা জগদীশ্বরই জানেন।

বাংলার প্রথম উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর ভিতর দিয়া ইহার উল্লেখযোগ্য প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিষয়ে দীনবন্ধুর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যাহাই থাকুক না কেন, 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ ইহার উল্লেখ হইতেই যে তিনি তাঁহার 'নীল-দর্পণ' রচনার মুখ্য প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন তাহা উক্ত উপন্যাসের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে। নীল-বিদ্রোহ 'নীল-দর্পণে'র উপজীব্য, এই বিদ্রোহকে 'নব্যবঙ্গে বাঙ্গালীর আত্মবোধের প্রথম পরিচয়' বলিয়া উল্লেখ করা হয়। 'নীল-দর্পণ' রচনার প্রায় দুই বৎসর পূর্বেই 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ ইহার যে বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে 'নীল-দর্পণে'র কাহিনী তুলনা করিয়া দেখিবার যোগ্য। সেইজন্য প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করা যাইতেছে; কেবলমাত্র বিষয়বস্তু নহে, ইহার সঙ্গে 'নীল-দর্পণে'র কোন কোন অংশের ভাষা পর্যন্ত তুলনা করা যাইবে—

"যশোহরে নীলকরের জুলুম অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রজারা নীল বুনিতে ইচ্ছুক নহে; কারণ, ধান্যাদি বোনাতে অধিক লাভ, আর যিনি নীলকরের কুঠীতে যাইয়া একবার দাদন লইয়াছেন, তাহার দফা একেবারে রফা হয়।

প্রজারা প্রাণপণে নীল আবদ্ধ করিয়া দাদনের টাকা পরিশোধ করে বটে, কিন্তু হিসাবের লাঙ্গুল বৎসর বৎসর বৃদ্ধি হয় ও কুঠেলের গোমস্তা ও অন্যান্য কারপরদাজের পেট অল্পে পূরে না। এইজন্য যে প্রজা একবার নীলকরের দাদনের সুধামৃত পান করিয়াছে, সে আর প্রাণান্তে কুঠীর মুখো হইতে চায় না, কিন্তু নীলকরের নীল না তৈয়ার হইলে ভারি বিপত্তি। সম্বৎসর কলিকাতার কোন না কোন সৌদাগরের কুঠী হইতে টাকা কর্জ লওয়া হইয়াছে, এক্ষণে যদ্যপি নীল তৈয়ার না হয় তবে কর্জ বৃদ্ধি হইবে ও পরে কুঠি উঠিয়া গেলেও যাইতে পারিবে। অপর যে সকল ইংরাজ কুঠির কর্মকাজ দেখে তাহারা বিলাতে অতি সামান্য লোক, কিন্তু কুঠিতে সাজাদার চেলে চলে—কুঠীর কর্মের ব্যাঘাত হইলে তাহাদিগের এই ভয় যে পাছে তাহাদিগের আবার ইঁদুর হইতে হয়! এই কারণে নীল তৈয়ার করণার্থ তাহারা সর্বপ্রকারে, সর্বতোভাবে, সর্বসময়ে যত্নবান্ হয়।

মতিলাল সঙ্গীগণকে লইয়া হো হো করিতেছেন—নায়েব নাকে চশমা দিয়া দপ্তর খুলিয়া লিখিতেছে ও চুনো বুলাইতেছে এমত সময়ে কয়েকজন প্রজা দৌড়ে আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিল,—মোশাই গো! কুঠেল বেটা মোদের সর্বনাশ করলে?—বেটা সরে জমিতে আপনি এসে মোদের বুননি জমির উপর লাঙ্গল দিতেছে ও হাল গোরু সব ছিনিয়ে নিয়েছে—মোশাই গো! বেটা কি বুননি নষ্ট করলে। শালা মোদের পাকা ধানে মই দিলে। নায়েব অমনি শতাবধি পাকসিক জড় করিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া দেখে কুঠেল এক শোলার টুপি মাথায় —মুখে চুরুট—হাতে বন্দুক—খাড়া হইয়া হাঁকাহাঁকি করিতেছে। নায়েব নিকটে যাইয়া মেঁও মেঁও করিয়া দুই একটি কথা বলিল, কুঠেল হাঁকায় দেও হাঁকায় দেও মার মার হুকুম দিল। অমনি দুই পক্ষের লোক লাঠি চালাইতে লাগিল—কুঠেল আপনি তেড়ে এসে গুলি ছুঁড়িবার উপক্রম করিল—নায়েব সরে গিয়ে একটা রংচিত্রের বেড়ার পার্শ্বে লুকাইল। ক্ষণেককাল মারামারি লাঠালাঠি হইলে পর জমিদারের লোক ভেগে গেল ও কয়েকজন ঘায়েল হইল। কুঠেল আপন বল প্রকাশ করিয়া ডেং ডেং করিয়া কুঠিতে চলে গেল ও দাদখায়ি প্রজারা বাটীতে আসিয়া 'কি সর্বনাশ কি সর্বনাশ' বলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

নীলকর সাহেব দাঙ্গা করিয়া কুঠীতে যাইয়া বিলাতি পানি ফটাস্ করিয়া ব্রাণ্ডি দিয়া খাইয়া শিশ দিতে দিতে 'তাজা বতাজা' গান করিতে লাগিলেন— কুকুরটা সম্মুখে দৌড়ে দৌড়ে খেলা করিতেছে। তিনি মনে জানেন তাঁহাকে কাবু করা বড় কঠিন, ম্যাজিষ্ট্রেট ও জজ তাঁহার ঘরে সর্বদা আসিয়া খানা খান

ও তাঁহাদিগের সহিত সহবাস করাতে পুলিশের ও আদালতের লোক তাঁহাকে যম দেখে আর যদিও তদারক হয়, তবু খুন মকদ্দমায় বাহির জেলায় তাঁহার বিচার হইতে পারিবেক না। কালা লোক খুন অথবা অন্যপ্রকার গুরুতর দোষ করিলে মফঃস্বল আদালতে তাহাদিগের সদ্য বিচার হইয়া সাজা হয়—গোরা লোক ঐ সকল দোষ করিলে সুপ্রিম কোর্টে চালান হয়, তাহাতে সাক্ষী অথবা ফৈরাদিরা ব্যয়, ক্লেশ ও কর্মক্ষতি জন্য নাচার হইয়া অস্পষ্ট হয়; সুতরাং বড় আদালতে উক্ত ব্যক্তিদের মকদ্দমা বিচার হইলেও ফেসে যায়।

"নীলকর যা মনে করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। পরদিন প্রাতে দারগা আসিয়া জমিদারের কাছারি ঘিরিয়া ফেলিল। দুর্বল হওয়া বড় আপদ্—সবল ব্যক্তির নিকটে কেহই এগুতে পারে না। মতিলাল এই ব্যাপার দেখিয়া ঘরের ভিতর যাইয়া দ্বার বন্ধ করিল। নায়েব সম্মুখে আসিয়া মোট্‌মাট্ চুক্তি করিয়া অনেকের বাঁধন খুলিয়া দেওয়াইল। দারগা বড়ই সোর সরাবত করিতেছিল —টাকা পাইবা মাত্র যেন আগুনে জল পড়িল। পরে তদারক করিয়া দারগা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দু'দিক বাঁচাইয়া রিপোর্ট করিল—এদিকে লোভ ওদিকে ভয়। নীলকর অমনি নানা প্রকার জোগাড়ে ব্যস্ত হইল ও ম্যাজিষ্ট্রেটের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইতে লাগিল যে, নীলকর ইংরাজ, খ্রীষ্টিয়ান— মন্দ কর্ম কখনই করিবেন না—কেবল কালা লোকে যাবতীয় দুষ্কর্ম করে। এই অবকাশে সেরেস্তাদার ও পেস্‌কার নীলকরের নিকট হইতে জেয়েদা ঘুস লইয়া তাহার বিপক্ষীয় জমানবন্দি চাপিয়া সপক্ষীয় কথা সকল পড়িতে আরম্ভ করিল ও ক্রমশঃ ছুঁচ চালাইতে চালাইতে বেটে চালাইতে লাগিল। এই অবকাশে নীলকর বক্তৃতা করিল,—আমি এস্থানে আসিয়া বাঙ্গালিদিগের নানা প্রকার উপকার করিতেছি—আমি তাহাদিগের লেখাপড়ার ও ঔষধপত্রের জন্য বিশেষ ব্যয় করিতেছি—আবার আমার উপর এই তহমত? বাঙ্গালিরা বড় বেইমান ও দাঙ্গাবাজ! ম্যাজিষ্ট্রেট এই সকল কথা শুনিয়া টিফিন করিতে গেলেন। টিফিনের পর খুব চুরচুরে মধুপান করিয়া চুরুট খাইতে খাইতে আদালতে আইলেন—মকদ্দমা পেশ হইলে সাহেব কাগজপত্রকে বাঘ দেখিয়া সেরেস্তাদারকে একেবারে বলিলেন,—'এ মামেলা ডিস্‌মিস্ কর'। এই হুকুমে নীলকরের মুখটা একেবারে ফুলে উঠিল, নায়েবের প্রতি তিনি কট্‌মট্ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। নায়েব অধোবদনে টিকুতে টিকুতে—ভুঁড়ি নাড়িতে নাড়িতে বলিতে বলিতে চলিলেন—বাঙ্গালিদের জমিদারি মাথার ভার হইল—নীলকর বেটাদের জুলুমে

মুলুক খাক হইয়া গেল—প্রজারা ভয়ে ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে। হাকিমরা স্বজাতির অনুরোধে তাহাদিগের বশ্য হইয়া পড়ে, আর আইনের যেরূপ গতিক তাহাতে নীলকরদিগের পালাইবার পথও বিলক্ষণ আছে। লোকে বলে জমিদারের দৌরাত্ম্যে প্রজার প্রাণ গেল—এটি বড় ভুল! জমিদারেরা জুলুম করে বটে, কিন্তু প্রজাকে ওতনে বজায় রেখে করে, প্রজা জমিদারের বেগুন ক্ষেত। নীলকর সে রকমে চলে না—প্রজা মরুক বা বাঁচুক তাহাতে তাহার বড় এসে যায় না—নীলের চাষ বেড়ে গেলেই সব হইল—প্রজা নীলকরের প্রকৃত মূলার ক্ষেত।

'আলালের ঘরের দুলালে'র মূল কাহিনীর সঙ্গে উদ্ধৃত অংশের যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। গ্রন্থকার তাঁহার বর্ণনীয় প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া দেশের সমসাময়িক একটি অবস্থার বর্ণনা করিবার জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন এবং ইহার ভিতর যে নির্ভীক স্পষ্টবাদিতার দুঃসাহস দেখাইয়াছেন, তাহাই ইহার অনতিকাল ব্যবধানে রচিত 'নীল-দর্পণে'র ভিত্তিস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। নীলকরের অত্যাচার বাংলার তদানীন্তন সামাজিক জীবনে এক আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল, অতএব ইহার প্রতি দেশহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। প্যারীচাঁদ মিত্রের রচনাতে তাহারই আভাস পাওয়া যায়। দীনবন্ধু মিত্র 'আলালের ঘরের দুলালে'র এই ইঙ্গিতটি গ্রহণ করিয়া ইহার সহিত নিজের স্বাভাবিক সহানুভূতির সংমিশ্রণে 'নীল-দর্পণ' নাটক রচনা করিয়াছেন। ইহার আখ্যানভাগ সংক্ষেপে এইরূপ :

গোলোকচন্দ্র বসু স্বরপুর গ্রামের একজন সম্পন্ন গৃহস্থ। তিনি বয়সে প্রবীণ। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নবীনমাধব বাড়ীতে থাকিয়াই বিষয়কর্মের দেখাশোনা করেন ও কনিষ্ঠ পুত্র বিন্দুমাধব কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে লেখাপড়া করেন। স্বরপুর গ্রামের নীলকরের ব্যাপক দৌরাত্ম্য আরম্ভ হইয়াছে। যাহারা স্বেচ্ছায় নীলকরদিগের নির্দেশমত দাদন লইতেছে না তাহাদিগকে ইতর-ভদ্র নির্বিশেষে কুঠিতে ধরিয়া লইয়া গিয়া নীলকরের যথেচ্ছ মারপিট করিতেছে; তারপর দাদন লওয়াইয়া ছাড়িতেছে। কেহ আদালতে নালিশ করিতে গেলে নীলকরেরা ম্যাজিস্ট্রেটের সহযোগিতায় মামলা ডিস্‌মিস্‌ করাইয়া দেয়। গোলোক বসু গত বৎসর নিজের পঞ্চাশ

বিঘা ক্ষেতে নীল চাষ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরের বৎসর পর্যন্তও তাঁহার প্রাপ্য টাকা বুঝিয়া পান নাই। অথচ নীলকর সাহেব সে-বারও তাঁহাকে তাঁহার ষাট বিঘা জমিতে নীল চাষ করিতে বলিতেছে। এই ষাট বিঘায় নীল চাষ করিতে গেলে গোলোক বসুর সংবৎসরের খোরাকির ধানে টান পড়ে। সাহেব তাহাদের কোন অনুনয় বিনয়ই শুনিতে প্রস্তুত নহে। সাধুচরণ ও রাইচরণ দুই ভাই। তাহারাও গৃহস্থ। তাহারা গোলোক বসুর প্রতিবেশী। সাধুচরণের কন্যা ক্ষেত্রমণি প্রথম অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় স্বামিগৃহ হইতে পিত্রালয়ে আসিয়াছে। একদিন বেগুন বেড়ের কুঠির নীলকর রোগ সাহেবের আমিন সাধুচরণ ও রাইচরণকে কুঠিতে ধরিয়া লইয়া যাইতে আসিয়া ক্ষেত্রমণিকে দেখিল। দেখিয়া স্থির করিল, ইহাকে একদিন রোগ সাহেবের কাছে ধরিয়া লইয়া গিয়া সাহেবের নিকট হইতে পারিতোষিক লইবে। নবীনমাধব পরম পরোপকারী ও দয়াশীল ব্যক্তি; দরিদ্র প্রজাকে নীলকরের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার সাধ্যমত যত্ন করিয়া থাকেন। সেইজন্য নীলকরেরা তাঁহার উপর অত্যন্ত অপ্রসন্ন; কিন্তু ইহাতে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই। নিজেকে সম্পূর্ণ বিপন্ন করিয়া তিনি অসহায় প্রজাবৃন্দের সহায়তায় সর্বদাই যত্নবান্। নবীনমাধবের পত্নীর নাম সৈরিন্ধ্রী ও বিন্দুমাধবের পত্নীর নাম সরলতা। সৈরিন্ধ্রী ছোট জা'কে অত্যন্ত স্নেহ করেন। সরলতাও সরলতারই প্রতীক্। গোলোক বসুর পত্নীর নাম সাবিত্রী। সেবা-পরায়ণা দুইটি বধূর যত্নে সংসারে তাঁহারও কোন দুঃখ নাই। এদিকে রোগ সাহেবের আমিন পদী ময়রাণী নামক এক ভ্রষ্টা নারীকে সাধুচরণের বাড়ী পাঠাইতে লাগিল। ক্ষেত্রমণিকে রোগ সাহেবের কাছে লইয়া যাইবার জন্য সে সাধুর পত্নীকে নানা রকম প্রলোভন দেখাইল। তাহাতে অসম্মত হওয়ায় সে ভয় দেখাইয়া গেল, একদিন ক্ষেত্রকে লাঠিয়াল দিয়া জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইবে। নবীনমাধবের উপর আক্রোশ বশতঃ নীলকরেরা তাঁহার পিতা গোলোকচন্দ্রের নামে এক মিথ্যা ফৌজদারী মোকদ্দমার সৃষ্টি করিল। তাহাদের অভিযোগ, তিনি নীল চাষে বাধা দিতেছেন। গোলোকচন্দ্র অত্যন্ত ধর্মভীরু নিরীহ লোক; নিজের গ্রাম ত্যাগ করিয়া এ পর্যন্ত অন্য কোথাও যান নাই। নীলকরের চক্রান্তে ফৌজদারীতে তাহার তলব হইল। শুনিয়া গোলোক বসুর পরিবারে সকলের আহার-নিদ্রা দূর হইল। সৈরিন্ধ্রী তাঁহার সমস্ত অলঙ্কার নবীনমাধবের হাতে দিয়া

শ্বশুরকে বিপদের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য বলিলেন। সরলতাও স্বেচ্ছায় শ্বশুরের বিপদে নিজের সমস্ত অলঙ্কার বন্ধক দিয়া টাকা সংগ্রহ করিতে দিলেন। এদিকে একদিন বৈকালে ক্ষেত্রমণি দীঘি হইতে জল লইয়া ফিরিতেছিল। নীলকর রোগ সাহেবের চারিজন লাঠিয়াল তাহাকে ধরিয়া কুঠিতে লইয়া গেল।[১] ক্ষেত্রমণির মাতা তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়া দিবার জন্য নবীনমাধবকে গিয়া ধরিয়া পড়িল। পদী ময়রাণী ক্ষেত্রমণিকে রোগ সাহেবের কক্ষে জোর করিয়া পূরিয়া দিয়া চলিয়া গেল। সাহেব তাহার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করিল; ক্ষেত্র প্রাণপণ বাধা দিলে সে তাহার পেটে ঘুষি মারিল। এমন সময় জানালার খড়খড়ি ভাঙ্গিয়া নবীনমাধব ও তাঁহার অনুগত একজন মুসলমান প্রজা তোরাপ আসিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা ক্ষেত্রকে রোগ সাহেবের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া গেলেন। গৃহে ফিরিয়া ক্ষেত্রমণির শয্যাকণ্টকী দেখা দিল। অল্পদিনের মধ্যেই সে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। বিচারাসনে বসিয়া ইংরেজ জিলা-ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহার স্বদেশীয় নীলকরের সহিত প্রকাশ্যভাবে সহযোগিতা করিয়া মোকদ্দমা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হওয়া সাপেক্ষে গোলোক বসুর হাজতবাসের আদেশ দিলেন। গোলোক বসু অতিশয় আচার-নিষ্ঠ ভদ্র কায়স্থ। তিনদিন অনাহারে থাকিয়া হাজতে তিনি উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিলেন। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া নীলকরেরা নবীনমাধবের পুষ্করিণীর পাড়ে নীল চাষ করিয়া তাঁহার অন্তঃপুরের মেয়েদের ঘাটে যাওয়া বন্ধ করিবার আয়োজন করিল। নবীনমাধব সাহেবকে হাতে পায়ে ধরিয়া পিতৃশ্রাদ্ধের দিন পর্যন্ত নীল বুনন স্থগিত রাখিতে বলিলেন। ইহাতে কর্ণপাত করা দূরে থাকুক, সাহেব তাঁহাকে তাঁহার সদ্য মৃত পিতা বিষয়ে অত্যন্ত অপমানজনক উক্তি করিল। শুনিয়া নবীনমাধব আর সহ্য করিতে পারিলেন না, সাহেবের বক্ষে সজোরে এক পদাঘাত করিলেন। কি

১। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "Hindu Patriot" পত্রিকায় নীলকরের অত্যাচার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়; আর্চিবল্ড হিল্‌স্ নামক একজন ইংরেজ কুঠিয়াল এক কৃষক-কন্যার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হন। ঐ কৃষক-কন্যার নাম হরমণি। বালিকা যখন একদিন দীঘি হইতে জল আনিবার জন্য বাড়ীর বাহির হয়, তখন আর্চিবল্ডের লোক হরমণিকে জোর করিয়া ধরিয়া তাহার কুঠিতে লইয়া যায় এবং দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্যন্ত আটক রাখে।

এই কাহিনীর উপর ভিত্তি করিয়াই দীনবন্ধু 'নীল-দর্পণে' ক্ষেত্রমণির কাহিনীটি করিয়াছেন; অতএব দীনবন্ধুর অন্যান্য চিত্রের মত ইহাও প্রকৃত ঘটনার উপরই করিয়াই রচিত।

পরক্ষণেই সাহেব ও তাহার আদেশে তাহার লাঠিয়ালেরা তাঁহাকে আক্রমণ করিল এবং মৃতপ্রায় করিয়া ছাড়িয়া দিল। মুমূর্ষু নবীনমাধবকে গৃহে লইয়া আসা হইল। দেখিয়া তাঁহার মাতা সাবিত্রীর উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। নবীনমাধবের আর জ্ঞান হইল না; সেই অবস্থাতেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। পতিপুত্রশোকে উন্মাদিনী সাবিত্রী আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিলেন। এই উন্মাদ অবস্থাতেই একদিন তিনি ছোট বধূ সরলতার গলার উপর দাঁড়াইয়া শ্বাসরোধ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিলেন। সরলতাকে হত্যা করিয়াই সহসা তাঁহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। পতিপুত্র-শোকে কাতরা, তদুপরি নিজে প্রাণাধিকা পুত্রবধূর মৃত্যুর কারণ বুঝিতে পারিয়া অনুতাপে সহসা নিজেও মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

'নীল-দর্পণ' উদ্দেশ্যমূলক নাটক। ইহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লেখক ভূমিকায় নিজেই যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি:

"নীলকর-নিকর-করে নীলদর্পণ অর্পণ করিলাম। এক্ষণে তাঁহারা নিজ নিজ মুখ সন্দর্শন পূর্বক তাঁহাদিগের ললাটে বিরাজমান স্বার্থপরতা কলঙ্কতিলক বিমোচন করিয়া তৎপরিবর্তে পরোপকার-শ্বেত-চন্দন ধারণ করুন, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রমের সাফল্য, নিরাশ্রয় প্রজাব্রজের মঙ্গল এবং বিলাতের মুখ রক্ষা হয়। হে নীলকরগণ! তোমাদের নৃশংস ব্যবহারে প্রাতঃস্মরণীয় সিড্‌নি, হাউয়ার্ড, হল প্রভৃতি মহানুভব দ্বারা অকলঙ্ক ইংরাজকুলে কলঙ্ক রটিয়াছে। তোমাদিগের ধনলিপ্সা কি এতই বলবতী যে, তোমরা অকিঞ্চিৎকর ধনানুরোধে ইংরাজ জাতির বহুকালার্জিত বিমল যশস্তামরসে কীটস্বরূপে ছিদ্র করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে? এক্ষণে তোমরা যে সাতিশয় অত্যাচার দ্বারা বিপুল অর্থলাভ করিতেছ, তাহা পরিহার কর; তাহা হইলে অনাথ প্রজারা সপরিবারে অনায়াসে কালাতিপাত করিতে পারিবে। তোমরা এক্ষণে দশমুদ্রা ব্যয়ে শতমুদ্রার দ্রব্য গ্রহণ করিতেছ, তাহাতে প্রজাপুঞ্জের যে ক্লেশ হইতেছে, তাহা তোমরা বিশেষ জ্ঞাত আছ; কেবল ধনলোভ-পরতন্ত্র হইয়া প্রকাশ করণে অনিচ্ছুক। তোমরা কহিয়া থাক যে, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ বিদ্যাদানে অর্থ বিতরণ করিয়া থাকেন এবং সুযোগ ক্রমে ঔষধ দেন; একথা যদিও সত্য হয়, কিন্তু তাহাদের বিদ্যাদান পয়স্বিনী-ধেনু-বধে পাদুকাদানাপেক্ষাও ঘৃণিত এবং ঔষধ বিতরণ কালকূটকুম্ভে ক্ষীরব্যবধান মাত্র। শ্যামচাঁদ আঘাত-উপরে কিঞ্চিৎ টার্পিণ তৈল দিলেই যদি ডিস্পেন্সারি করা হয়, তবে

তোমাদের প্রত্যেক কুঠিতে ঔষাধালয় আছে, বলিতে হইবে। দৈনিক সংবাদপত্র সম্পাদকদ্বয় তোমাদের প্রশংসায় তাহাদের পত্র পরিপূর্ণ করিতেছে, তাহাতে অপর লোক যেমত বিবেচনা করুক, তোমাদের মনে কখনই ত আনন্দ জন্মিতে পারে না, যেহেতু, তোমরা তাহাদের এরূপ করণের বিলক্ষণ অবগত আছ। রজতের কি আশ্চর্য আকর্ষণ-শক্তি! ত্রিংশতমুদ্রালোভে অবজ্ঞাস্পদ জুডাস খৃষ্টধর্ম-প্রচারক মহাত্মা যীজস্‌কে করাল পাইলেট করে অর্পণ করিয়াছি, সম্পাদক যুগল সহস্রমুদ্রালোভপরবশ হইয়া উপায়হীন দীন প্রজাকে তোমাদের করাল কবলে নিক্ষেপ করিবে, আশ্চর্য কি! কিন্তু 'চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুখানি চ সুখানি চ'! প্রজাবৃন্দের সুখসূর্যোদয়ের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। দাসী দ্বারা সন্তানকে স্তনদুগ্ধ দেওয়া অবৈধ বিবেচনায় দয়াশীলা প্রজাজননী মহারাণী ভিক্টোরিয়া প্রজাদিগকে স্বক্রোড়ে লইয়া স্তনপান করাইতেছেন। সুধীর সুবিজ্ঞ সাহসী উদার-চরিত্র ক্যানিং মহোদয় গভর্ণর-জেনারেল হইয়াছেন, প্রজার দুঃখে দুঃখী, প্রজার সুখে সুখী, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, ন্যায়পর গ্রাণ্ট মহামতী লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর হইয়াছেন এবং ক্রমশঃ সত্যপরায়ণ, নিরপেক্ষ ইডেন, হার্সেল প্রভৃতি রাজকার্য-পরিচালকগণ শতদলরূপে সিভিল সার্ভিস সরোবররূপে বিকসিত হইতেছেন। অতএব ইহাদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, নীলকর দুষ্টরাহুগ্রস্ত প্রজাবৃন্দের অসহ্য কষ্ট নিবারণার্থক উক্ত মহানুভবগণ যে অচিরাৎ সদ্বিচাররূপ সুদর্শন-চক্র হস্তে গ্রহণ করিবেন, তাহার সূচনা হইয়াছে।"

সিপাহী যুদ্ধের পর ভারত শাসনের ভার যখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত হইতে পার্লামেণ্টের হস্তে স্থানান্তরিত হয়, তখন এই পুস্তক রচিত হয়। এই ভূমিকাতে তাহারও উল্লেখ করা হইয়াছে।

'নীল-দর্পণ' প্রকাশিত হইবার সময় ইহাতে গ্রন্থকারের কোন নাম ছিল না। ইহার কারণও অত্যন্ত সুস্পষ্ট। দীনবন্ধু নিজে শুধু যে সরকারী কর্মচারী ছিলেন, তাহাই নহে—ডাকবিভাগের পরিদর্শকরূপে কার্য করিতে গিয়া তাঁহাকে অনেক সময় ইংরেজ নীলকরদিগের সংস্পর্শে আসিতে হইত। সেইজন্য প্রত্যক্ষভাবে যাহাতে তাহাদের অপ্রীতিভাজন না হইয়া পড়েন, সেইজন্যই তাঁহাকে এই পথ অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। পুস্তকের পরিচয়-পত্র এই প্রকার ছিল—

নীলদর্পণম্

নাটকম্

নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর-প্রজানিকর-ক্ষেমঙ্করেণ

কেনচিৎ পথিকেনাভিপ্রণীতম্

'নীল-দর্পণ' প্রকাশিত হইবার এক বৎসরের মধ্যেই ইহা ইংরেজিতে অনূদিত হয়। কথিত আছে যে, মাইকেল মধুসূদন দত্ত অত্যন্ত দক্ষতার সহিত ইহার অনুবাদের কার্য সম্পন্ন করেন। 'নীল-দর্পণে'র ইংরেজি অনুবাদের মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন রেভারেণ্ড জেমস্ লঙ্ সাহেব। রেভারেণ্ড লঙ্ ইতিপূর্বেই এতদ্দেশীয় বহু জনহিতকর অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। নীলকর-অত্যাচারের প্রকৃত স্বরূপ এই গ্রন্থের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া, তিনি ইহা এতদ্দেশে ও ইংলণ্ডের শাসন-কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করিবার মানসে এই গ্রন্থ প্রকাশের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করেন। নীলকরদিগের ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল 'ব্রিটিশ ভারতীয় জমিদার ও ব্যবসায় সমিতি' (Landholders and Commercial Association of British India)। নীলদর্পণের ইংরেজি অনুবাদ এই দেশে ও বিলাতের শাসন-কর্তৃপক্ষের নিকট অচিরেই উপস্থাপিত করা হইল এবং সঙ্গে সঙ্গেই উক্ত জমিদার ও ব্যবসায় সমিতির পক্ষ হইতে কলিকাতার প্রধানতম বিচারালয়ে (Supreme Court) ইহার ইংরেজি অনুবাদের মুদ্রাকর ও প্রকাশকের বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দমা দায়ের করা হইল। বিচারপতি স্যার এম, এল, ওয়েলস্ এক বিশেষ জুরির সহায়তায় এই মোকদ্দমার বিচার করিয়া রেভারেণ্ড্ লঙ্‌কে মানহানির অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করিলেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জুলাই তারিখে এই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইল। আসামী রেভারেণ্ড লঙ্ সাহেবের প্রতি এক মাসের জন্য কারাবাস ও এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ হইল। পরম বিদ্যোৎসাহী ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ বিচারালয়ে উপস্থিত ছিলেন। এক সহস্র টাকা তিনি তৎক্ষণাৎ লঙ্ সাহেবের হস্তে অর্পণ করিলেন। লঙ্ সাহেব তাঁহার প্রদত্ত অর্থে অর্থদণ্ড পরিশোধ করিয়া একমাসের জন্য কারাবরণ করিলেন।

এই অভাবনীয় ঘটনায় 'নীল-দর্পণে'র নাম অল্পকালমধ্যেই অপ্রত্যাশিতরূপে প্রচার লাভ করিল। বিশেষতঃ ইহার পূর্ব হইতেই এদেশে নীলকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাধারণ জনমত অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল। একদিকে এই সমসাময়িক বিষয়-বস্তুকে অবলম্বন করিয়া নাটকখানি রচিত হওয়ার ফলে ইহার দিকে প্রত্যেকেরই দৃষ্টি যেমন আকৃষ্ট হইয়াছিল, তেমনিই সুপ্রীম কোর্টে ইহার সম্বন্ধীয় এই মানহানি মোকদ্দমার উত্তেজনামূলক পরিণতিতে

ইহার বিষয়ে দেশের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনসাধারণ বিশেষ কৌতূহলী হইয়া উঠিল। এমন কি, এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া কবি ও পাঁচালীর দলে গান রচিত হইয়া লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হইতে লাগিল। সমসাময়িক বিষয়বস্তু ও গ্রন্থ প্রকাশের অব্যবহিত পরেই কতকগুলি বিশেষ ঘটনার সংঘটনই যে এই নাটকখানির ব্যাপক লোকপ্রচারের সহায়ক হইয়াছিল, তাহা নহে—এই সকল ঘটনার কিছুদিন পর বঙ্গদেশে নাট্যসাহিত্য প্রচারের সহায়ক আর একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটিল। তাহা কলিকাতায় ন্যাশানেল থিয়েটার নামক সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা। অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী প্রমুখ প্রতিভাবান্ কয়েকজন নাট্যশিল্পী এই কার্যে ব্রতী হইয়া ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ন্যাশানেল থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চে সাধারণ্যে টিকিট বিক্রয় করিয়া সর্বপ্রথম যে নাটকের অভিনয় করেন, তাহা দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত এই 'নীল-দর্পণ' নাটক। ইহার পূর্বে কলিকাতা ও কদাচিৎ মফঃস্বলে যে সকল নাটকের অভিনয় হইত, তাহাতে সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না, একমাত্র ধনাঢ্য ব্যক্তি ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারিগণই নিয়ন্ত্রিত হইয়া যোগদান করিতে পারিতেন। কিন্তু 'নীল-দর্পণে'র অভিনয়ে প্রথম হইতেই জনসাধারণের প্রবেশাধিকার জন্মিয়াছিল, অতএব সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের সাহায্যেও ইহার প্রচারের সহায়তা হইয়াছিল। সমসাময়িক একটি অত্যন্ত উত্তেজনামূলক বিষয়বস্তুকে অতিনাটকীয় কাহিনীর মধ্য দিয়া প্রকাশ করিবার ফলে রঙ্গমঞ্চের সাধারণ দর্শকদিগের মধ্যে অচিরেই ইহা অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল।

এই সকল অনুকূল অবস্থার সহায়তায় অল্পদিনের মধ্যেই 'নীল-দর্পণে'র ব্যাপক প্রচার সম্ভব হইয়াছিল স্বীকার করিয়া লইলেও, ইহাতে যে শিল্প-সম্মত নাট্যগুণ কিছুই ছিল না, তাহা বলিবার উপায় নাই। এই নাটকের সাফল্য সম্বন্ধে মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষ-ভাবেই প্রণিধানযোগ্য :—

("নীলদর্পণে গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতা এবং সহানুভূতি পূর্ণমাত্রায় যোগ দিয়াছিল বলিয়া, নীলদর্পণ তাঁহার প্রণীত সকল নাটকের অপেক্ষা শক্তিশালী। অন্য নাটকের অন্য গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু নীলদর্পণের মত শক্তি আর কিছুতেই নাই। তাঁর আর কোন নাটকেই পাঠককে বা দর্শককে তাদৃশ বশীভূত করিতে পারে না। বাঙ্গালা ভাষায় এমন অনেকগুলি নাটক, নবেল বা অন্যবিধ কাব্য

প্রণীত হইয়াছে, যাহার উদ্দেশ্য সামাজিক অনিষ্টের সংশোধন। প্রায় সেগুলি কাব্যাংশে নিকৃষ্ট, তাহার কারণ, কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য-সৃষ্টি। তাহা ছাড়িয়া, সমাজ-সংস্কারকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিলে কাজেই কবিত্ব নিষ্ফল হয়। কিন্তু নীলদর্পণের উদ্দেশ্য এবংবিধ হইলেও কাব্যাংশে তাহা উৎকৃষ্ট। তাহার কারণ এই যে, গ্রন্থকারের মোহময়ী সহানুভূতি সকলই মাধুর্যময় করিয়া তুলিয়াছে।"

বঙ্কিমচন্দ্রের কথার অর্থ এই যে, রচনা উদ্দেশ্যমূলক হইলেই যে তাহা কাব্যের দিক দিয়া ব্যর্থ হইবে তাহা নহে; বর্ণিত বিষয়বস্তুর সহিত যদি লেখকের আন্তরিক সহানুভূতির যোগ থাকে, তাহা হইলে তাহা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম। অবশ্য সূক্ষ্মভাবে কাব্যের আদর্শ বিচারে তাহার কি মূল্য হইবে তাহা বলা হইতেছে না, তবে এই পর্যন্ত বলা হইয়াছে যে, তাহা 'মাধুর্যময়' হইয়া পাঠকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইবে। এই সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র 'নীল-দর্পণ'কে মার্কিন উপন্যাস *Uncle Tom's Cabin*-এর[১] সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। এই তুলনা সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। *Uncle Tom's Cabin*-এর আলোচনা প্রসঙ্গে একজন সমালোচক বলিয়াছেন, It is sensational, and the plot structure is especially open to criticism. It is, however, a sympathetic presentation of life by an alert, kindly and

১। *Uncle Tom's Cabin*-এর রচয়িত্রী হেরিয়েট্ বীচার স্টো (খ্রীঃ ১৮১১-১৮৯৬) আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত লিচ্ফিল্ড নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন একজন ধর্মপ্রচারক। স্টো নামক একজন অধ্যাপককে তিনি বিবাহ্ করেন। দাস-প্রথার দুর্নীতির দিকে সভ্যজগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য ১৮৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি *Uncle Tom's Cabin* নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি যখন তাঁহার স্বামীর সঙ্গে সিন্‌সিনাটি অঞ্চলে বাস করিতেন, তখন নিগ্রো ক্রীতদাসদিগের অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিবার তাঁহার সুযোগ হইয়াছিল। দাস-প্রথাকে তিনি নিতান্ত কুপ্রথা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার গ্রন্থে তিনি এক অতি হৃদয়হীন প্রভু ও প্রভুপত্নীর চরিত্র অঙ্কিত করিয়া এক অসহায় নিগ্রো ক্রীতদাসের উপর তাহাদের নির্মম অত্যাচারের করুণ কাহিনীর জ্বলন্ত বর্ণনা দিয়াছেন। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই বিষয়ে আমেরিকা ও ইউরোপে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হয়। কেহ কেহ আবার গ্রন্থকর্ত্রীর উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া তাঁহার রচনা বহুল পরিমাণে অতিরঞ্জিত বলিয়া মত প্রকাশ করেন। ইঁহাদের উত্তরে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে হেরিয়েট *'A Key to Uncle Tom's Cabin'* নামক আর একখানি পুস্তক রচনা করেন।

intensely human woman……It has some amount of literary greatness if not artistic skill.' (*History of American Literature*, **W. B. Cairns, New York, 1912, p. 351**). 'নীল-দর্পণে'র নাট্যকার সম্বন্ধে এই কথাগুলি সর্বথা প্রযোজ্য। দীনবন্ধু মিত্রও নারীহৃদয়ের মতই এক পরদুঃখকাতর ও ভাবপ্রবণ হৃদয় লইয়াই এই নাটক রচনা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে এই নাটকের সার্থকতা অন্ততঃ এইখানেই।)

বিশেষ দেশে ও কালে সীমাবদ্ধ ও বিশেষ অবস্থার সম্মুখীন এক জনসমাজের প্রতি সত্যকার সহানুভূতি লইয়া 'নীল-দর্পণ' রচিত হইলেও, ইহার মধ্যে যে শিল্পগুণেরও পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বর্ণিতব্য বিষয়বস্তুর প্রতি লেখকের আন্তরিক সহানুভূতি থাকিলে বস্তুতান্ত্রিক (realistic) সাহিত্য সার্থকতা লাভ করে। দীনবন্ধু বিশেষ করিয়া বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যিক। পূর্বেই বলিয়াছি, যে সকল ক্ষেত্রে তিনি প্রত্যক্ষদৃষ্ট সত্যকে অবহেলা করিয়া আদর্শ সৃষ্টি করিতে গিয়াছেন সেখানেই তাঁহার ব্যর্থতা আসিয়াছে। 'নীল-দর্পণে'র যে সকল চিত্রে দীনবন্ধু বস্তুতান্ত্রিকতার মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন, সে সকল চিত্রেই তাঁহার শিল্পগুণের পরিচয় পাওয়া যাইবে। সমগ্রভাবে 'নীল-দর্পণে'র কাহিনী বিচার করিয়া দেখিলে ইহাতে অনেক দোষ পরিলক্ষিত হইবে সত্য, কিন্তু ইহার মধ্য হইতে কোন কোন চিত্রকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিলে তাহাদের সৃষ্টিসৌন্দর্যে মুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না। ইহার মধ্যে এমন কতকগুলি চরিত্রের সহিত পরিচয় লাভ করা যায়, যাহা সর্বতোভাবে বাঙ্গালী জীবনের নিজস্ব ক্ষেত্র হইতেই পরিকল্পিত ও সম্পূর্ণ বাস্তবতার উপাদানেই সৃষ্ট হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যে এই শ্রেণীর চরিত্রসৃষ্টির প্রয়াস ইহার পূর্বে আর দেখা যায় নাই। বাঙ্গালী জীবনের মধ্যেও যে একটা গুরুতর সুখদুঃখবোধের চৈতন্য সুপ্ত ছিল, দীনবন্ধু তাঁহার 'নীল-দর্পণে'র ভিতর দিয়া তাহাই প্রথম বিস্তৃতভাবে উদ্ধার করিলেন। সাহিত্যের ভিতর দিয়া গভীর-ভাবে বাঙ্গালীর বাস্তব জীবনের বিষয় চিন্তা করিবার প্রেরণা দীনবন্ধুই সর্বপ্রথম দিয়া গেলেন।

কিন্তু নাটক হিসাবে 'নীল-দর্পণে'র ত্রুটি অনেক। উদ্দেশ্যমূলক রচনা মাত্রই চিত্রের দিক দিয়া একটু অতিরঞ্জিত হইয়া থাকে। প্রকৃত যাহা সত্য, তাহা আরও একটু বাড়াইয়া বলিতে পারিলে, সাধারণের দৃষ্টি তাহাতে

সহজেই আকৃষ্ট হইতে পারে। *Uncle Tom's Cabin*-এর মতই 'নীল-দর্পণ' আদ্যোপান্ত '**Sensational**' বা রোমাঞ্চকর ঘটনায় পূর্ণ। রসসৃষ্টির পরিবর্তে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যদি লেখকের আন্তরিকতা থাকে, তবে এই শ্রেণীর রচনার এই ত্রুটি এক প্রকার অপরিহার্য হইয়া উঠে। দর্শক ও পাঠকের দৃষ্টি সকল দিক হইতে একমাত্র উদ্দিষ্ট বিষয়ের লক্ষ্যমুখীন করিবার জন্য লেখককে উত্তেজনা হইতে নূতন উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্যের পরিকল্পনা করিতে হয়। স্তূপীকৃত অতিনাটকীয় ঘটনাসমূহের পরিসমাপ্তিতে লেখক অভিভূত দর্শক বা পাঠকদিগের সম্মুখে তাঁহার বক্তব্য বিষয় পরিস্ফুট করিবার সুযোগ পান। তখন দর্শকের বিচারশক্তি বিমূঢ় হইয়া যায়, বিষয়বস্তুর সত্যাসত্য প্রশ্ন করিবার প্রবৃত্তি লুপ্ত হইয়া আসে—তাহার ফলে বিষয়বস্তু সত্যরূপেই প্রতিভাত হয়। *Uncle Tom's Cabin*-এর মধ্যে যে অতিরঞ্জন ও অতিশয়োক্তির দোষ নাই, তাহা নহে; তথাপি বর্ণনার গুণে তাহার প্রত্যেকটি ঘটনা সত্য বলিয়া মনে হয়। উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্যের মূল্য সাময়িক। সেইজন্য ইহাদের সাহিত্যিক মূল্যও যাহাই থাকুক না কেন, বিশেষ স্থান-কালের পরিধি উত্তীর্ণ হইয়া অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে না। উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্যের যদি কোন মূল্য থাকে, তবে 'নীল-দর্পণে'র নাম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরদিন স্মরণীয় হইয়া থাকিবে; ইহাকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই শ্রেণীর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

তবে সত্যের বিকৃতি ও অতিশয়োক্তিতে যে অনেক সময় পাঠক ও দর্শকের মন পীড়িত হয়, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রত্যক্ষদৃষ্ট সত্যকে যেখানে বাস্তব অনুভূতির ভিতর দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে, 'নীল-দর্পণে'র সেই অংশই হৃদয়গ্রাহী ও রচনার দিক দিয়াও শক্তিশালী হইয়াছে। সত্যের প্রতি নিষ্ঠা থাকিবার ফলেই সে সব ক্ষেত্রে অতিশয়োক্তিও আসিয়া আসর জমাইতে পারে নাই। কিন্তু যেখানে লেখককে কল্পনার আশ্রয় লইতে হইয়াছে, সেখানেই তাঁহার রচনা বন্ধনহীন হইয়া উঠিয়াছে। তাহাতে সাহিত্যরসের লেশমাত্র নাই; বরং তাহাতে লেখকের ক্রোধই প্রকাশ পাইয়াছে। নির্যাতিত কৃষকদের প্রতি সহানুভূতি তাঁহার যেমন গভীর, তেমনই তাহাদের উপর অত্যাচারকারী নীলকরদিগের উপর তাঁহার ক্রোধও তেমনই তীব্র। 'নীল-দর্পণে'র ভিতর দিয়া সেইজন্য একদিকে যেমন

লেখকের সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনই অন্যদিকে সম্প্রদায়-বিশেষের উপর তাঁহার অপরিসীম ক্রোধেরও পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে।

কৃষকদিগের প্রতি সহানুভূতি এবং নীলকরদিগের প্রতি ক্রোধে আত্মহারা হইয়া লেখক তাঁহার নাটকের মধ্যে এমন কতকগুলি দৃশ্যের পরিকল্পনা করিয়াছেন, যাহা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। শুধু রুচি ও নীতির দিক দিয়াই যে এই দৃশ্যগুলি গর্হিত তাহা নহে, ইহাদের অভিনয়-কার্যও ব্যবহারতঃ অসম্ভব। ইহাদের মধ্যে তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্ক, চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্ক, পঞ্চম অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্ক বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে যথাক্রমে রোগ সাহেব কর্তৃক ক্ষেত্রমণির শ্লীলতাহানির চেষ্টা, জেলখানায় উড়ানী-পাকান দড়িতে দোদুল্যমান গোলোকের মৃতদেহ উন্মাদিনী সাবিত্রী কর্তৃক সরলতার গলায় পা দিয়া দাঁড়াইয়া হত্যা ইত্যাদি দৃশ্যের অবতারণা করা হইয়াছে। এই দৃশ্যগুলি নাটক হইতে পরিত্যাগ করিয়াও ইহাদের বক্তব্য বিষয় অক্ষুণ্ণ রাখা যায়। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, দীনবন্ধু অত্যন্ত প্রত্যক্ষবাদী ও বাস্তব প্রকৃতির লোক। তিনি যাহা কিছু অনুভব করেন, তাহা সূক্ষ্ম আভাসে ইঙ্গিতে প্রকাশ করিবার গৌণ পথ পরিত্যাগ করিয়া সহজ ও প্রত্যক্ষ ভাবেই প্রকাশ করিতে চাহেন। **Suggestiveness** বা গৌণ ইঙ্গিত নাটকের একটি বিশিষ্ট গুণ। কিন্তু দীনবন্ধুর নাট্যরচনার প্রকৃতি ইহার সম্পূর্ণ বিরোধী। সেজন্য যখন তিনি অনুভব করিয়াছেন যে, নীলকরেরা এই বিশেষ দোষে দোষী, তখনই অন্য কোনদিক বিবেচনা মাত্র না করিয়া তাহাদের দোষের সম্পূর্ণ স্বরূপটি রঙ্গমঞ্চে উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছেন। অতএব বলা যায় যে, তাঁহার লক্ষ্য নাটকের সৌন্দর্যসৃষ্টি অপেক্ষা বরং বাস্তব সত্যের স্বরূপ উদ্ঘাটনের উপরই নিবদ্ধ ছিল বেশী। সেইজন্য 'নীল-দর্পণে' কোন কোন দৃশ্যে রূঢ় বাস্তবতার নগ্ন রূপ দেখিতে পাই।

কয়েকটি দৃশ্যের পরিকল্পনায় গুরুতর নাট্যিক ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও, কোন কোন দৃশ্যে আবার লেখকের উচ্চশ্রেণীর সৃষ্টি-নৈপুণ্যেরও পরিচয় পাওয়া যায়। এমন কি, বাহ্যতঃ বিচার করিয়া দেখিলে দীনবন্ধুর যে কয়েকটি বিশিষ্ট শক্তির অভাব আছে বলিয়া বোধ হইবে, 'নীল-দর্পণে'র কোন কোন স্থান একটু সূক্ষ্ম ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে তাহাতে তাঁহার এই সকল গুণের অস্তিত্বের পরিচয়ও পাওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কটি এই সম্পর্কে

উল্লেখ করা যাইতেছে। দৃশ্যটি স্বরপুর—তেমাথার পথ। পদী ময়রাণীর প্রবেশ। পদী ময়রাণী কুৎসিতচরিত্রা বিগতযৌবনা এক গ্রাম্য রমণী। রোগ সাহেবের কামনার ইন্ধন যোগাইতে সে বহু কুলবালার ধর্মনাশ করিয়াছে। সে দৃশ্যে আবির্ভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘৃণায় দর্শকের মন সঙ্কুচিত হইয়া আসিয়াছে। স্বগতোক্তিতে সে ক্ষেত্রমণি সম্পর্কে রোগ সাহেবের মন্দ অভিপ্রায়ের কথা ব্যক্ত করিল। সদ্য-পতিগৃহ-প্রত্যাগতা অন্তঃসত্ত্বা ক্ষেত্রমণির যে লাজমধুর চিত্রটি আমরা পূর্বেই দেখিতে পাইয়াছি, তাহাতে তাহার এই আসন্ন অকল্যাণের আশঙ্কায় দর্শকমাত্রেরই হৃদয় অধীর হইবে। এমন সময় এক কৃষকের কণ্ঠে নেপথ্য হইতে সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া গেল—

যখন ক্ষ্যাতে ক্ষ্যাতে বসে ধান কাটি।
মোর মনে জাগে ও তার লয়ান দুটি।

মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে কর্মরত কৃষক তাহার সুমধুর দাম্পত্য জীবনের সুখস্মৃতির আবেশে আচ্ছন্ন। তখনও সর্বনাশী পদী ময়রাণী তাহার অভিশপ্ত সঙ্কল্প লইয়া দর্শকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া। ইহাদের মধ্যে একটি নাট্যিক বৈপরীত্য বা পরস্পর-বিরোধী ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে—একটি ভাব নেপথ্যাগত সঙ্গীতের মধ্য দিয়া আসিয়া দর্শকের সম্মুখস্থ ঘৃণিতচরিত্রা পদী ময়রাণীর পাপ-সঙ্কল্পের দ্বিতীয় ভাবটির সঙ্গে সংঘাতের সৃষ্টি করিয়াছে—ইহাতে একটি অপূর্ব নাট্যিক গুণের উদ্ভব হইয়াছে। হয়ত কেহ বলিবেন, দাম্পত্য-প্রণয়-তৃপ্ত যে কৃষকের নেপথ্য-সঙ্গীত আমরা শুনিতে পাইলাম, তাহা হতভাগিনী ক্ষেত্রমণির পতিকণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীতের রূপক হিসাবেই নাট্যকার এখানে ব্যবহার করিয়াছেন।

চরিত্র-সৃষ্টির দিক দিয়া এইবার 'নীল-দর্পণে'র বিচার করিতে হইবে। স্থূলভাবে ভাগ করিলে ইহার মধ্যে দুই শ্রেণীর চরিত্র পাওয়া যায়। প্রথমতঃ উচ্চশ্রেণী ও দ্বিতীয়তঃ নিম্নশ্রেণী। উচ্চশ্রেণীর প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে গোলোক বসু, নবীনমাধব, বিন্দুমাধব, সাধুচরণ, সাবিত্রী, সৈরিন্ধ্রী, সরলতা প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। নিম্নশ্রেণীর চরিত্রের মধ্যে রাইচরণ, তোরাপ, চারিজন রাইত, আদুরী উল্লেখযোগ্য। এই দুই শ্রেণীর চরিত্র সৃষ্টিতেই যে লেখক সমান কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, প্রথমোক্ত চরিত্রগুলি অপেক্ষা শেষোক্ত শ্রেণীর চরিত্র সৃষ্টিতেই তিনি অধিকতর কৃতিত্ব

দেখাইয়াছেন। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে প্রথমেই দেখা যায় যে, ভদ্রশ্রেণীর চরিত্রগুলি সম্পর্কে তাঁহার যে অভিজ্ঞতার অভাব ছিল, তাহা নহে; কারণ, তিনি নিজে যে সমাজ হইতে আসিয়াছিলেন, তাহা সেই শ্রেণীরই সমাজ। তবে তিনি এই সমাজটিকে যথাযথ চিত্রিত করেন নাই। ইহার সম্পর্কে তাঁহার মনের মধ্যে একটি আদর্শবোধ গড়িয়া উঠিয়াছিল। বিশেষতঃ এই সমাজের উপর নীলকরের অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া দেখাইবার আগ্রহ প্রকাশ করিতে গিয়া আত্মনির্লিপ্ত হইয়া ইহার বাস্তব পরিচয়টি তিনি রূপায়িত করিতে যান নাই; কারণ, মনে হয়, তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন, এই ভাবে অত্যাচারিত সমাজটির উপর তিনি পাঠক বা দর্শকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিবেন। কিন্তু চরিত্র বাস্তব না হইলে যত সদ্‌গুণেরই অধিকারী হউক, তাহা যে সকলেরই সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা তিনি অনুমান করিতে পারেন নাই। সেইজন্য তাঁহার ভদ্রশ্রেণীর চরিত্রগুলি রক্তমাংসের দেহ অনাশ্রিত—কেবলমাত্র কতকগুলি সদ্‌গুণের সমষ্টিমাত্র হইয়া রহিয়াছে। দোষে গুণে যে মানুষের চরিত্রের বিকাশ হইয়া থাকে, দীনবন্ধুর 'নীল-দর্পণ' নাটকের ভদ্রশ্রেণীর চরিত্রগুলির মধ্যে তাহার পরিচয় প্রকাশ পায় নাই। তাহারা কেবলই ভালো, দোষের স্পর্শমাত্র তাহাদের কাহারও মধ্যে নাই; যেখানে জীবনদৃষ্টি এই প্রকার একদেশ-দর্শী সেখানে চরিত্রসৃষ্টি যে ব্যর্থ হইবে, তাহা নিতান্ত স্বাভাবিক। 'নীল-দর্পণ' নাটকের ভদ্রশ্রেণীর চরিত্রগুলির তাহাই হইয়াছে।

তারপর উচ্চশ্রেণীর চরিত্রগুলির সংলাপে দীনবন্ধু যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা বাস্তব জীবনের কথাভাষা নহে, বরং বিদ্যাসাগর-অক্ষয় দত্তের পণ্ডিতি বাংলা। তাহার ফলেও চরিত্রগুলির কৃত্রিমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বিষয়ে দীনবন্ধু নিজস্ব রসচেতনা হইতে যে কিছু করিয়াছেন, তাহা নহে—তিনি সমসাময়িক গদ্যরচনার ধারা অনুসরণ করিয়াছেন। এমন কি, রামনারায়ণ তর্করত্ন তাঁহার 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটকেও উচ্চশ্রেণীর চরিত্র সম্পর্কে পণ্ডিতি বাংলা এবং নিম্নশ্রেণীর চরিত্র সম্পর্কে প্রাদেশিক কথ্যভাষা ব্যবহার করিয়াছেন; দীনবন্ধুও তাঁহারই অনুকরণ করিয়াছেন, সেই জন্য তাঁহার উচ্চশ্রেণীর চরিত্রগুলি যথার্থ শক্তিশালী হইতে পারে নাই।

উচ্চশ্রেণীর চরিত্রগুলির আর একটি প্রধান ত্রুটি এই যে তাহাদের সদ্‌গুণ কেবলমাত্র বক্তৃতার ভিতর দিয়াই প্রকাশ পাইয়াছে, জীবনাচরণের ভিতর দিয়া

বিকাশ লাভ করে নাই। নবীনমাধবের পিতৃভক্তি, বিন্দুমাধবের ভ্রাতৃভক্তি, সৈরিন্ধ্রী ও সরলতার পাতিব্রত্য এই নাটকে কেবলমাত্র বক্তৃতার বিষয়, প্রত্যক্ষ নাট্যিক ক্রিয়ার ভিতর দিয়া তাহা প্রত্যক্ষ নহে। সেইজন্য চরিত্রগুলির রসস্ফূর্তি সম্ভব হয় নাই।

উচ্চশ্রেণীর চরিত্রগুলির মধ্য গোলোক বসুর চরিত্রটি সামান্য হইলেও সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে। তিনি অত্যন্ত নিরীহ ও ধর্মপরায়ণ সৎকায়স্থ-সন্তান। নীলকরদিগের সঙ্গে বিবাদ করিবার তাঁহার প্রবৃত্তি নাই, তাহাদের সমস্ত অত্যাচার নিজে স্বীকার করিয়া লইতেও প্রস্তুত। এ বিষয়ে যে সামান্য এক আধটু প্রতিবাদ তিনি করেন, তাহাও তাঁহার নিজস্ব অন্তরঙ্গ ও সুখদুঃখের ভাগী লোকদিগের নিকট ছাড়া আর কাহারও নিকট গিয়া পৌছায় না। এমন ব্যক্তি যখন মিথ্যা মোকদ্দমায় ফৌজদারীতে অভিযুক্ত হইয়া কারারুদ্ধ হইলেন, তখন স্বভাবতঃই ইহার চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে মন বিরূপ হইয়া উঠে। দীনবন্ধুর নাটকের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই চরিত্রটির পরিকল্পনা সুন্দর হইয়াছে। তবে তাহার আত্মহত্যার ব্যাপারটি একটু আকস্মিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

গোলোক বসুর জ্যেষ্ঠপুত্র নবীনমাধবের চরিত্রের মধ্যে দিয়া লেখক একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ইহার সঙ্গে বাস্তবতার সম্পর্ক নাই; ইহাকে অনেক সময় রক্তমাংসে গঠিত চরিত্র বলিয়া মনে হয় না। নবীনমাধব পরোপকারী, ন্যায়বান্, পিতৃভক্ত, দরিদ্র কৃষককুলের রক্ষায় তাঁহার জীবন উৎসর্গীকৃত। এই সকল সদ্গুণের একত্র সমাবেশ তাহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। মাত্র এক জায়গায় তাঁহার চরিত্র প্রতিহিংসাপরায়ণ ও কঠোর বাস্তবধর্মী হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সেই দৃশ্যটি আমরা দেখিতে পাই না, সাধুচরণের উক্তিতে তাহার বিষয় জানিতে পারি মাত্র। সদ্যপিতৃশোকাতুর নবীনমাধব যখন তাঁহার পুকুর-পাড়ে নীল চাষ রহিত করিবার জন্য সাহেবের নিকট অনুনয় বিনয় করিতেছিলেন, তখন সাহেবের মুখ হইতে অত্যন্ত নীচ অপমানকর প্রত্যুত্তর শুনিতে পাইয়াই তিনি প্রতিহিংসায় জ্বলিয়া উঠিলেন। পরিণাম চিন্তা মাত্র না করিয়াই ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন এবং ইহাই তাঁহার কাল হইল। নাটকের মধ্যে এই দৃশ্যটির অবতারণা করিলে ইহা যেমন ফলপ্রসূ হইত, একজনের উক্তি হইতে তাহার বিষয় দর্শকদিগকে অবগত করাইয়া সেই ফললাভ করা যায় নাই সত্য, তথাপি নবীনমাধবের চরিত্রের এই

দিকটা যে লেখক একেবারে গোপন করিয়া রাখেন নাই, তাহাই প্রশংসার বিষয়। নবীনমাধবকেই এই নাটকাখ্যানের নায়ক বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। সংস্কৃত নাটকের নায়কোচিত সমস্ত গুণই তাঁহার মধ্যে কল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু ইংরেজি ট্র্যাজিডির নায়কোচিত ব্যক্তিত্ব তাঁহার চরিত্রে বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই।

বিন্দুমাধব এই নাটকের অতি সামান্য অংশ মাত্র অধিকার করিয়া আছেন, তাঁহার চরিত্রে উল্লেখযোগ্যও তেমন কিছু নাই।

সাধুচরণ কৃষিজীবী হইলেও সামান্য কিছু শিক্ষালাভ করিয়াছে। সে গোলোক বসুর একান্ত অনুগত লোক। তাহার চরিত্রের মধ্যে তেমন কোন বৈশিষ্ট্য নাই। তাহাকে একটু ব্যক্তিত্বহীন বলিয়া অনুমিত হয়।

গোলোক বসুর পত্নী সাবিত্রীর চরিত্র স্ত্রী-চরিত্রগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান চরিত্র। কাহিনীর শেষাংশে তাঁহার যে শোচনীয় উন্মাদিনী মূর্তি আমরা দেখিতে পাই, তাহারই বৈপরীত্যকল্পে কাহিনীর প্রথমাংশে তাঁহার গৃহস্থ জীবনের পরম সুন্দর চিত্রটি পরিকল্পনা করা হইয়াছে। নাটকীয় আদর্শ বিচারে ইহার অপূর্ব সার্থকতাও স্বীকার করিতে হয়। সাবিত্রী এই শোচনীয় বিয়োগান্তক নাটকের সর্বাপেক্ষা অভিশপ্ত চরিত্র। এই কাহিনীর করুণ রসের পরিবেশনে তাঁহার দান সর্বাপেক্ষা বেশী। তাঁহাদের উন্মাদ-জীবনের অংশটুকু লেখক অপূর্ব কৌশলে রচনা করিয়াছেন।

এই কাহিনীর প্রকৃত নায়িকা যে কে, তাহা সুস্পষ্টভাবে অনুভব করা যায় না। তবে নবীনমাধবের স্ত্রী সৈরিন্ধ্রীকে নায়িকা বলিয়া অভিহিত করা যায়। সৈরিন্ধ্রী নবীনমাধবেরই উপযুক্তা সহধর্মিণী। এই বিয়োগান্তক নাটকে তাঁহার ভাগেও দুঃখের অংশ বড় কম পড়ে নাই। কিন্তু তিনি বিপদে পরম ধৈর্যশীলা ও সকল বিষয়েই অত্যন্ত সংযতস্বভাবা। কাহিনীর প্রথমাংশে যখন গোলোক বসুর পরিবারের অন্তঃপুরের নিরুদ্বেগ জীবনের আসন্ন দুঃখ ছায়াপাত করে নাই, তখন সৈরিন্ধ্রী চরিত্রের যে দিক্‌টি লেখক নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা গৃহস্থ-জীবনের এক অতি পরম রমণীয় সম্পদ্। শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি শ্রদ্ধায়, স্বামীর প্রতি প্রেমে, জা'র প্রতি স্নেহে তাঁহার অন্তঃকরণ এক অপূর্ব মহিমায় মণ্ডিত। এই নাটকের আখ্যানে দ্বন্দ্ব আসিয়াছে বাহির হইতে। সেইজন্য ইহার ভিতরের সৌন্দর্য অক্ষুণ্ন রাখা হইয়াছে। গোলোক বসুর পরিবারের আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য অব্যাহতই আছে—এই

পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের উপর বাহিরের আকাশ হইতে অদৃশ্য শ্যেনপক্ষীর বজ্রনখর আসিয়া যেন অকস্মাৎ বিদ্ধ হইয়া এক শোচনীয় পরিণতির সৃষ্টি করিয়াছে। সৈরিন্ধ্রী গোলোক বসুর পরিবারের অখণ্ড সৌন্দর্যের অন্যতম উপাদান। সৈরিন্ধ্রীর ছোট জা' সরলতা সরলতারই প্রতীক। তাঁহার চরিত্রটি ক্ষুদ্র হইলেও কুন্দপুষ্পের মত সৌরভাকুল। উড এবং রোগ সাহেবকে দুইজন অত্যাচারী রূপে নাটকের মধ্যে উপস্থিত করিতে গিয়াও লেখক তাহাদের চরিত্র কোনরূপ ছাঁচে ঢালাই না করিয়া তাহাদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছেন। উড সাহেবের চরিত্রে নৈতিক শৈথিল্যের কোন পরিচয় নাই; তাহার বৈষয়িক বুদ্ধি প্রবল, এই বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধির জন্যই তিনি অন্যের উপর অত্যাচার করিয়া থাকেন; কিন্তু রোগ সাহেবের চরিত্রে বিষয়-বুদ্ধির পরিচয় নাই, তিনি নৈতিক দিক দিয়া অধঃপতিত, অতএব তাঁহার অত্যাচারের প্রণালী স্বতন্ত্র।

পূর্বেই বলিয়াছি, উচ্চশ্রেণীর সামাজিক চরিত্র সৃষ্টি অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর সামাজিক চরিত্রসৃষ্টিতে দীনবন্ধুর অধিকতর কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। ইংরেজি সভ্যতার প্রচণ্ড প্লাবনে সমাজের উপরি স্তরে চিন্তার ও ভাবের জগতে যে এক পরিবর্তন আসিয়াছিল, তাহা তখনও কোনও স্থির রূপ লাভ করিতে পারে নাই। ইহা দ্বারা সমাজের নিম্নতর স্তরে তখন পর্যন্তও কোন পরিবর্তনের সূচনা দেখা দেয় নাই; ইহার জৈব ও মানসিক জীবন আগেও যেমন ছিল, তখনও তেমনই ছিল। কিন্তু উচ্চস্তরের এই পরিবর্তনশীল অবস্থায় দীনবন্ধু কোনও নির্দিষ্ট মান পান নাই। কলিকাতার ভদ্রসমাজ ও পল্লীর ভদ্রসমাজে ত পার্থক্য ছিলই, পরন্তু কলিকাতাতেও বিভিন্ন ধরণের দলের পাড়ার গোষ্ঠীর অনেক কৃত্রিম মান তখন তৈয়ারী হইতেছিল; ইহারা একবার গড়িয়াছে, আবার ভাঙ্গিয়াছে। সেইজন্য দীনবন্ধুকে উচ্চস্তরের চরিত্রগুলি বহুলাংশে কেবলমাত্র তাঁহার নিজস্ব কল্পনা আশ্রয় করিয়া গড়িতে হইয়াছে। সুতরাং ইহারা কৃত্রিম এবং নিম্নশ্রেণীর চরিত্রগুলি বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে। 'নীল-দর্পণে'র মধ্যেও নিম্নশ্রেণীর চরিত্রই অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তোরাপ ও রাইচরণের চরিত্র। তোরাপ একজন অশিক্ষিত মুসলমান কৃষক, রাইচরণ সাধুচরণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, সেও একজন অশিক্ষিত কৃষক। যে দৃষ্টিভঙ্গি হইতে এই দুইটি চরিত্রের পরিকল্পনা করা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ বাস্তব। তোরাপের চরিত্রে এক

আধটুকু আদর্শের ছোঁয়াচ লাগিয়াছে বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু আদ্যোপান্ত চরিত্রটির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিলে ইহার এই ত্রুটি অতি সামান্যই বলিয়া মনে হইবে।

তোরাপ ন্যায়নিষ্ঠ, কর্তব্যপরায়ণ ও সাহসী। তাহার নিম্নলিখিত উক্তি হইতেই তাহার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের কতকটা পরিচয় পাওয়া যাইবে—

তোরাপ। ম্যারে ক্যান ফ্যালায় না, মুই নেমোখ্যারামি কত্তি পারবো না;—যে বড়বাবুর জন্মি জাত বাঁচেচে, ঝার হিল্লের বসতি কত্তে নেগেছি, ঝে বড়বাবু কাল-গোরু বাঁচিয়ে নে ব্যাড়াচে, মিত্যে সাক্ষী দিযে সেই বড়বাবুর বাপকে কয়েদ ক'রে দেব? মুই তো কখনুই পারবো না, জান কবুল। (২য় অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক)

কোন ভাবমূলক আদর্শের অনুপ্রেরণায় এই সকল উক্তি যে আন্তরিকতাহীন করিয়া রচিত হইয়াছে, তাহা নহে—তোরাপের চরিত্রেরই এমন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করা হইয়াছে যে, তাহার পক্ষে এই সকল কথা একান্তই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। তোরাপের সহযোগিতায় নবীনমাধব যে দৃশ্যে নীলকরের কবল হইতে ক্ষেত্রমণিকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই দৃশ্যটি একটু অবাস্তব হইয়া উঠিলেও এই নাটকের পক্ষে ইহা একান্তই প্রয়োজনীয় হইয়াছে। সৃষ্টির নৈপুণ্যে তোরাপের চরিত্র গ্রন্থের সর্বত্রই জীবন্ত বলিয়া মনে হয়।

এই শ্রেণীর চরিত্রের মধ্যে রাইচরণের চরিত্রই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহার মধ্যে অবাস্তব আদর্শের কোনই ছোঁয়াচ লাগে নাই। অতি সাধারণ সরল প্রকৃতির গ্রাম্য কৃষক যুবকের চরিত্র ইহা হইতে বাস্তব করিয়া কেহ অঙ্কিত করিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। রাইচরণ অত্যন্ত একগুঁয়ে প্রকৃতির লোক। তাহার সাহস অপরিমেয়, কিন্তু তাহা দুঃসাহসের পর্যায়ভুক্ত নহে। তোরাপ দুঃসাহসী, কিন্তু রাইচরণের তেজ অপরিমিত হইলেও তাহা একটু বাহ্যিক ভীরুতা দ্বারা প্রচ্ছন্ন। তাহার চক্ষুর সম্মুখে নীলকরের আমিন যখন তাহার সাঁপোলতলার জমিতে দাগ মারিয়া গেল, তখন সে অন্তরের ক্রোধ অন্তরের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়াছে। মাত্র আইনের আশ্রয় লইবে বলিয়া আমিনকে শাসাইয়াছে। তারপর বাড়ীতে আসিয়া সাধুচরণের কাছে তাহা সক্রোধে ব্যক্ত করিয়াছে। কিন্তু তোরাপ হইলে হয়ত সেই আইন নিজের হাতেই তুলিয়া লইত। তবু রাইচরণের চরিত্রই সাধারণ কৃষকের পক্ষে অধিকতর স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে যে চারিজন রাইয়তের চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য লেখক ক্ষুদ্র পরিধিটুকুর

মধ্যে যে ভাবে বাঁচাইয়া লইয়া চলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অপূর্ব কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাতে বিচিত্র লোক-চরিত্রে লেখকের গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

নিম্নশ্রেণীর স্ত্রী-চরিত্রের মধ্যে আদুরী অন্যতম প্রধান চরিত্র। আদুরী গোলোক বসুর গৃহের পরিচারিকা। দীনবন্ধুর স্বাভাবিক হাস্যরস এই চরিত্রটির মধ্য দিয়া অনাবিল স্রোতে প্রবাহিত হইয়াছে। 'নীল-দর্পণে'র নিরবচ্ছিন্ন কারুণ্যের নীরস মরুভূমির মধ্যে আদুরীর পরিহাস-রসিকতাই একমাত্র 'ওয়েসিসে'র কাজ করিয়াছে। এই বিষয়ে এই চরিত্রটির সার্থকতা অপরিমেয়। অবশ্য প্রশ্ন উঠিতে পারে, যে-নাটকের প্রথম হইতেই করুণ রসের অবতারণা করা হইয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত ক্রমে তাহাই মাত্রা চড়াইতে চড়াইতে গিয়া চরমে পৌঁছিয়াছে, তাহাতে হাস্যরসের অবতারণার আদৌ কোন প্রয়োজন ছিল কি না। তবে ইহাও স্পষ্টই অনুমান করিতে পারা যায় যে, আদুরীর চরিত্র মূল কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত নহে; বিশেষত কাহিনীর যে অংশে তাহার হাস্য-রসিকতা স্থান পাইয়াছে, তাহাতে আসন্ন বিষাদের আভাস থাকিলেও সেই বিষাদ একান্তভাবে নিশ্চিত হইয়া উঠে নাই। তারপর গোলোক বসুর পরিবার যখন বিষাদের ছায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল, তখন আর একবার মাত্র আদুরীর সাক্ষাৎ পাই (৫ম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক)। তখন সে আদুরী আর নাই, সে মরিয়াছে। কারণ, তাহার পরিহাস-রসিকতা লইয়াই সে বাঁচিয়া ছিল, তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়া লেখক একান্ত প্রয়োজনের জন্যই মাত্র একটি পরবর্তী দৃশ্যে তাহার অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু সে পূর্ব আদুরীর ছায়া মাত্র; পরিহাস যাহার স্বভাব-সিদ্ধ, তাহাকে অশ্রুমুখী করিয়া রঙ্গমঞ্চে আর অবতীর্ণ না করাইলেই ভাল হইত। এই শোচনীয় বিয়োগান্তক কাহিনীর শেষ দিকে লেখক তাহার কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়া আর্টের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন।

'নীল-দর্পণ' নাটকের অন্যতম স্ত্রীচরিত্র পদী ময়রাণী দীনবন্ধুর একটি সার্থক সৃষ্টি। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য কিংবা লোক-সাহিত্য ইত্যাদির মধ্যেও এই শ্রেণীর চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহারা যোগিনী, মালিনী, কুট্টিনী ইত্যাদি নামে পরিচিত, কিন্তু বিশিষ্ট চরিত্ররূপে ইহাদের কোন সার্থকতা প্রকাশ পায় নাই, ইহাদের নির্বিশেষ বা ছাঁচে ঢালাই আদর্শে এক একটি রূপই তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু দীনবন্ধু বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম

এই শ্রেণীর চরিত্রকে রক্তমাংসের একটি জীবন্ত রূপ দিয়াছেন। ইহার এই জীবন্ত রূপ দিবার পক্ষে তাঁহার নিজস্ব দুইটি গুণই অবলম্বন ছিল—তাহা সহানুভূতি ও অভিজ্ঞতা। দীনবন্ধুর এই দুইটি গুণ এই চরিত্রকে আশ্রয় করিয়া সার্থক ভাবে রূপায়িত হইয়াছে। পদী ময়রাণী এক অতিক্রান্তযৌবনা গ্রাম্য ভ্রষ্টা নারী। সে রোগ সাহেবের উপপত্নী এবং তাহার কামনার ইন্ধন যোগাইবার জন্য বহু কুলবালার সর্বনাশ করিয়াছে। ইহা তাহার বাহিরের পরিচয়; কিন্তু সে নারী, তাহার অন্তর বলিয়া একটি জিনিস আছে, সে তাহা বিসর্জন দেয় নাই। এইখানেই তাহার জীবনের দ্বন্দ্ব। সে যদি সহজভাবে তাহার বহির্মুখী জীবনাচরণকে গ্রহণ করিতে পারিত, তবে তাহার দুষ্কার্য তাহার জীবনে কোন অসন্তোষ সৃষ্টি করিতে পারিত না। কিন্তু সে তাহার স্বাভাবিক নারীহৃদয় লইয়া সমাজের আর দশজনের মত বাঁচিয়া থাকিতে চায়, তাহার ঘৃণিত জীবনকেই জীবনের একমাত্র পথ বলিয়া সে মানিয়া লইতে পারে নাই। সেইজন্য সাহেবের মুখে কচি কচি মেয়েগুলিকে আনিয়া ধরিয়া দিতে সে বেদনাবোধ করে, ক্ষেত্রমণির কাতর অনুনয় শুনিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবার জন্য করুণ মিনতি জানায়, সাহেবের লাঠিয়াল যখন গ্রাম লুঠ করিতে যায়, তখন তাহাদিগকে ধিক্কার দেয়, সন্তানতুল্য শিশুরা যখন তাহাকে পথে পাইয়া অপমানিত করে, তখন তাহাদিগের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্কের কথা তুলিয়া এ কার্য হইতে নিবৃত্ত হইতে করুণ ভাষায় অনুরোধ করে। তাহার নিঃসন্তান নারীহৃদয় কাহারও পিসি, কাহারও দিদি হইয়া সমাজের দশজনের মত বাঁচিয়া থাকিবার জন্য হাহাকার করিয়া উঠে। সে কুলটা, কিন্তু সে নারীর সুকুমার গুণ লজ্জাকে জলাঞ্জলি দেয় নাই, নবীনমাধব সহসা পথের মাঝখানে তাহার সম্মুখে আসিয়া পড়িলে সে লজ্জায় জিভ কাটিয়া মুখের উপর দীর্ঘ ঘোমটা টানিয়া পলাইয়া যায়। একটি পতিতার হৃদয়ের দীনতম মানবিক অভিলাষ যে কি হইতে পারে, দীনবন্ধু সুগভীর মানব-প্রেমের ভিতর দিয়া এখানে তাহাই উপলব্ধি করিয়াছেন। সেক্সপীয়রের রচনার গুণে কুসীদজীবী নরমাংস-লোলুপ ইহুদি শাইলকও সর্বজনীন সহানুভূতির পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল, দীনবন্ধুরও রচনার গুণে এই নিতান্ত ঘৃণিত চরিত্র পদী ময়রাণীও সর্বজনীন সহানুভূতির পাত্রী হইয়া উঠিয়াছে। বহির্মুখী জীবনাচরণের আবর্জনার অন্তরালেও যে নারীর

অন্তর্মুখী নারীত্ব সর্বদা সজাগ ও সক্রিয় থাকে, দীনবন্ধুর এই চরিত্রটি তাহার উপলব্ধিতে সার্থক হইয়া উঠিয়াছে।

কৃষক-বালিকা ক্ষেত্রমণির চরিত্রটিও স্বাভাবিকতার গুণে অপূর্ব সার্থকতা লাভ করিয়াছে। মাত্র কয়েকটি দৃশ্যে তাহার আবির্ভাব হইলেও এই নাটকের যথার্থ ট্রাজিক রস ইহাকে আশ্রয় করিয়াই বিকাশ লাভ করিয়াছে। সে পরিবারের একমাত্র সন্তান, বিশেষত কন্যাসন্তান; সেইজন্য মাতাপিতা ও পিতৃব্যের স্নেহ-মমতার আধার। শৈশব হইতেই সে জীবনের একটি রূপ সম্পর্কেই পরিচিতা—তাহা স্নেহ। তাহার সদ্য বিবাহ হইয়াছে, বিবাহিত জীবনে সে আর একটি রসের আস্বাদ পাইয়াছে, তাহা স্বামিপ্রেম। তাহার স্বামিপ্রেম যে কত সত্য ছিল, তাহা তাহার নারীধর্ম রক্ষা করিবার শক্তির মধ্য দিয়াই প্রকাশ পাইয়াছে। মাতাপিতা ও পিতৃব্যের স্নেহ এবং স্বামীর প্রেম দ্বারা তাহার বালিকা-জীবন ধন্য হইয়াছে। তারপর রোগ সাহেবের কক্ষে একদিন জীবনের এক অতি নির্মম ও ভয়ঙ্কর রূপ যখন তাহার সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিল, তখন তাহা তাহার অভ্যস্ত জীবনের সঙ্গে বিরাট এক ব্যবধান সৃষ্টি করিল, সে তখন তাহার সহজাত বৃত্তিগুলি বিকাশ করিয়া নারীধর্ম রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই দুইটি পরস্পর বিপরীতধর্মী অবস্থার মধ্যে যে একটি বৈপরীত্য সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা উচ্চাঙ্গের নাটকীয় গুণসমৃদ্ধ, সেইজন্যই এই দৃশ্যটির আকর্ষণ এত অধিক। এই দৃশ্যটির ভিতর দিয়া ক্ষেত্রমণির চরিত্র অনুসরণ করিলে বুঝা যায় যে, অভ্যাসায়ত্ত গুণ ও স্বভাবসিদ্ধ গুণের মধ্যে যে শেষোক্ত গুণেরই শক্তি বেশি, দীনবন্ধু মানব-চরিত্র সম্পর্কে এই আধুনিক সমাজ ও মনোবিজ্ঞান সম্মত বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। নারী কি দ্বারা তাহার নারীধর্ম রক্ষা করে? সমাজের রক্তচক্ষু দেখিয়া, না অন্তরের শাশ্বতী নারীবৃত্তি দ্বারা? দীনবন্ধু এই দৃশ্যে তাহার জবাব দিয়াছেন।

ক্ষেত্রমণির জননী রেবতীর চরিত্রটি দীনবন্ধুর আর একটি সার্থক সৃষ্টি। এক সুগভীর দুর্যোগের মধ্যে নিজের একমাত্র সন্তানের প্রাণ ও ধর্মরক্ষায় অক্ষমা এই কৃষকজননীর মর্মবেদনার এক অতি করুণ ও বাস্তব পরিচয় এই চরিত্রটির মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। রেবতী সন্তানের জননী, ইহাই এই কৃষক রমণীর একমাত্র পরিচয়, সমাজ ও ধর্মের নৈতিক শাসন দ্বারা তাহার স্বাভাবিক জননী-হৃদয় কৃত্রিম হইয়া উঠিতে পারে নাই। নিরক্ষরা

কৃষক রমণীর ইহা একটি সার্থক পরিচয়; সে তাহার এই পরিচয়, শেষ পর্যন্ত রক্ষা করিয়াছে। সেইজন্য ক্ষেত্রমণির মৃত্যুর মুহূর্তেও সে একথা বলিতে পারিয়াছে,—'সাহেবের সঙ্গে থাকা যে মোর ছিল ভাল মা রে, মুই মুখ দেখে জুড়াতাম মা রে······' হিন্দুরমণীর নীতিবোধ তাহার নাই, সর্বসংস্কার-মুক্ত শাশ্বতী জননীর স্নেহবোধই তাহার মধ্যে সক্রিয় ছিল।

নিম্নশ্রেণীর পুরুষ-চরিত্রের মধ্যে রাইচরণের চরিত্রের আরও একটু বিশেষত্ব আছে। সে কৃষক, নিজের হাতে মাঠে লাঙ্গল ঠেলে, স্বভাবতই মাঠের সঙ্গে জমির সঙ্গে তাহার একটি বিশেষ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে; এই সম্পর্ক এই নাটকের আর কোন চরিত্রেরই নাই, ইহাতে অন্যান্য কৃষক-চরিত্র থাকিলেও যথার্থ লাঙ্গল কাঁধে কিংবা মাঠের জমিতে হাল ঠেলিতে আর কাহাকেও দেখা যায় নাই। সেইজন্য জমির স্বার্থে আঘাত লাগিলে সে ক্রোধে আত্মহারা হইয়া যায়, তাহার মুখের সহজাত ভাষায় সেই ক্রোধ প্রকাশ পায়; কিন্তু ক্রোধ তাহার যত প্রবল হউক, আত্মরক্ষার জৈবধর্মও সে স্বাভাবিক ভাবেই পালন করিতে সম্পূর্ণ অভ্যস্ত। সেই সূত্রেই তাহার অন্তরে একটু ভীরুতার স্পর্শ লাগিয়াছে। সে গায়ের শক্তিতে 'বুনো মোষ', অন্তরে শিশুর মত ভীরু। সেইজন্যই নীলকরের উদ্যত শ্যামচাঁদের সম্মুখে দাদাকে পরামর্শ দেয়, 'ঝা ন্যাকে নিতি চাচ্চে ন্যাকে দে।'

'নীল-দর্পণে'র মধ্যেই সর্বপ্রথম বাংলা নাটকে বিস্তৃত চরিত্র সমালোচনার অবকাশ পাওয়া গেল। কর্মের পরিধি যতই সঙ্কীর্ণ হউক, প্রত্যেকটি চরিত্রই তাহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে; আর বিশেষতঃ ইহাদের সমগ্র অংশই বাঙ্গালী জীবনের প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র হইতে আবিষ্কৃত।

দীনবন্ধুর 'নীল-দর্পণ' যখন প্রকাশিত হয়, তখন পর্যন্তও বাংলা গদ্য ভাষার আদর্শ স্থির হয় নাই। মাত্র দুই বৎসর পূর্বে বাংলা গদ্য সাহিত্যের যুগান্তকারী পুস্তক 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ভাষা তখন পর্যন্তও বাংলা গদ্যে ব্যবহার্য ভাষা বলিয়া গৃহীত হয় নাই। ইহা প্রকাশিত হওয়ায় পণ্ডিতি বাংলা বা বিদ্যাসাগর-অক্ষয় প্রবর্তিত ভাষার প্রভাব যে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, তাহাও নহে—পণ্ডিতি বাংলার প্রভাব তখনও অপ্রতিহতই ছিল। বিশেষত নাটকে ব্যবহার্য আদর্শ ভাষা তখনও পর্যন্ত স্থির হয় নাই। অতএব দীনবন্ধু এবিষয়ে নির্দিষ্ট কোন আদর্শের অনুসরণ করিবার সুযোগ পান

নাই। সেইজন্য তিনি তৎকাল-প্রচলিত গদ্য-রচনার দুইটি রীতিই তাঁহার গ্রন্থমধ্যে গ্রহণ করিলেন। উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত চরিত্রগুলির জন্য তিনি পণ্ডিতি বাংলা ও নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত চরিত্রগুলির জন্য আলালী ভাষা ব্যবহার করিলেন। অবশ্য আলালী ভাষা বাংলার বিশেষ এক অঞ্চলের কথ্য ভাষা, 'নীল-দর্পণে' ব্যবহৃত আলালী রীতির ভাষা স্বতন্ত্র এক অঞ্চলের কথ্য ভাষা। 'আলালে'র নায়ক-নায়িকা ও 'নীল-দর্পণে'র নিম্নশ্রেণীর নায়ক-নায়িকাদের সম্পর্কগত প্রাদেশিক পার্থক্যের জন্য তাহাদের ভাষায় বাহ্যত কিছু তারতম্য লক্ষিত হয়, কিন্তু আভ্যন্তরিক প্রেরণা উভয়তই অভিন্ন। এই ভাবে 'নীল-দর্পণে'র ভাষায় অংশত 'আলালে'র প্রভাব স্বীকার করিতেই হয়।

চরিত্র-সৃষ্টিতে 'নীল-দর্পণে'র এই দ্বিবিধ ভাষা কি প্রকার সহায়ক হইয়াছে, তাহা এখন বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। কথ্যভাষাগত বৈচিত্র্য থাকিলেই যে নাটকীয় সংহতি নষ্ট হইবে, তাহা নহে। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যই তাহার প্রমাণ। অতএব চরিত্রানুযায়ী ভাষা নির্বাচন করায় তাঁহার নাটকে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হইতে পারে না। তবে যে ভাষা তিনি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা ব্যবহার্য কি না, তাহাই বিচার করিতে হইবে।

উচ্চশ্রেণীর চরিত্রে তিনি যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা বহুলাংশেই পণ্ডিতি বাংলা। নবীনমাধবের উক্তি হইতে কতক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতেছে,

নবীন। আজ্ঞে, জননীর পরিতাপ বিবেচনা ক'রে কি কালসর্প ক্রোড়স্থ শিশুকে দংশন করিতে সঙ্কুচিত হয়? আমি অনেক স্তুতিবাদ করিলাম, তা তিনি কিছুই বুঝিলেন না। সাহেবের সেই কথা, তিনি বলেন, পঞ্চাশ টাকা লইয়া ষাট বিঘা নীলের লেখাপড়া করিয়া দাও, পরে একেবারে দুই সনের হিসাব চুকাইয়া দেওয়া যাইবে।—১ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক।

কথোপকথনের ভাষা হিসাবে এই ভাষার ত্রুটি অবশ্যই স্বীকার্য। ইহার গতি আড়ষ্ট ও রচনা কষ্টকল্পিত। কিন্তু নাট্যিক সংলাপের ভাষা আরও অনেক জোরালো ও স্বচ্ছন্দ-গতি হওয়া প্রয়োজন। এই পণ্ডিতি বাংলাকে আদর্শ করিয়াও দীনবন্ধু নাটকীয় সংলাপে কথ্যভাষার ব্যবহারিক উপযোগিতা যে বিশেষভাবেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার দুরূহ পণ্ডিতি বাংলার সঙ্গে স্থানে স্থানে কথ্য ভাষার মিশ্রণের দৃষ্টান্ত হইতেও অনুমান করা যাইবে। নিম্নে তাহার একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

নবীন। হা বিধাতঃ! এ বংশে কখন যা না হইয়াছিল, তাই ঘটিল। পিতা আমার অতি নিরীহ, অতি সরল, অকপট-চিত্ত, বিবাদ-বিসংবাদ কারে বলে, জানেন না, কখন গ্রামের বাহির হন না, ফৌজদারীর নামে কম্পিত হ'ন, লিপি পাঠ ক'রে চক্ষের জল ফেলিয়াছেন। ইন্দ্রাবাদে যাইতে হইলে ক্ষিপ্ত হইবেন, কয়েদ হ'লে জলে ঝাঁপ দিবেন। হা! আমি জীবিত থাকিতে আমার পিতার এই দুর্গতি হবে? মাতা আমার পিতার ন্যায় ভীতা ন'ন, তাঁহার সাহস আছে, তিনি একেবারে হতাশ হন না, তিনি একাগ্রচিত্তে ভগবতীকে ডাকিতেছেন। কুরঙ্গনয়না আমার দাবাগ্নির কুরঙ্গিণী হয়েছেন, ভয়ে ভাবনায় পাগলিনীপ্রায়; কুটীর গুদামে তাঁহার পিতার পঞ্চত্ব হয়, তাঁর সতত চিন্তা, পাছে পতির সেই গতি ঘটে। আমি কতদিকে সান্ত্বনা করিব? সপরিবারে পলায়ন করা কি বিধি?—না, পরোপকার পরম ধর্ম, সহসা পরাঙ্মুখ হ'ব না।—২য় অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক।

উদ্ধৃত অংশের মধ্যে একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্র যে-ভাবে তাঁহার রচনায় পণ্ডিতি বাংলা ও 'আলালী' ভাষার মধ্য পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, ইহার মধ্যেও তাহার প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়; কথ্যভাষার প্রতি অনুরাগের লক্ষণ ইহার মধ্য দিয়াও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

'নীল-দর্পণে'র নিম্নশ্রেণীর চরিত্রগুলির কথোপকথনে দীনবন্ধু যে ভাষার ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার যোগ্য। পূর্বেই বলিয়াছি, 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর মত ভাষায় সাহিত্য রচনার একটা দুঃসাহসিক প্রয়াস ইতিপূর্বেই বাংলা সাহিত্যে দেখা দিয়াছিল। অতএব দীনবন্ধু তাঁহার চরিত্রগুলির মুখে একেবারে স্থানীয় কথ্যভাষা ব্যবহার করাইয়া এই নূতন প্রচেষ্টাকেই তাঁহার সাহিত্যে পরোক্ষে স্বীকার করিয়া লইবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। দীনবন্ধুর পরবর্তী কোন কোন রচনায় আলালী ভাষার প্রতি তাঁহার আকর্ষণের আরও পরিচয় পাওয়া যাইবে। আলালী ভাষার আদর্শ যদি দীনবন্ধুর সম্মুখে না থাকিত, তাহা হইলে তিনি এই সকল ক্ষেত্রে কি করিতেন, তাহা বলা যায় না। কিন্তু একটা প্রচেষ্টা যখন পূর্ব হইতেই সাহিত্যে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার অনুসরণ করিয়া দীনবন্ধু যে নূতন কিছুই করেন নাই, তাহা সত্য।

এই ভাষা নাট্যিক চরিত্র-বিকাশের পক্ষে কতদূর সহায়ক হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিতে গিয়া, এই সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তিটি বিশেষভাবে স্মরণ করিতে হয়। তিনি বলিতেছেন, 'তোরাপের ভাষা ছাড়িলে তোরাপের রাগ আর তোরাপের রাগের মত থাকে না; আদুরীর ভাষা ছাড়িলে, আদুরীর তামাসা আর আদুরীর তামাসার মত থাকে না; নিমচাঁদের ভাষা ছাড়িলে,

নিমচাঁদের মাতলামি আর নিমচাঁদের মাতলামির মত থাকে না।—সবটুক্ দিতে হ'বে। দীনবন্ধুর সাধ্য ছিল না বলেন—যে, "না, তা হবে না।" তাই আমরা একটা আস্ত তোরাপ, আস্ত নিমচাঁদ, আস্ত আদুরী দেখিতে পাই। রুচির মুখ রক্ষা করতে গেলে, ছেঁড়া তোরাপ, কাটা আদুরী, ভাঙ্গা নিমচাঁদ আমরা পাইতাম।' সমগ্রভাবে প্রত্যেকটি চরিত্র বাস্তব করিয়া তুলিবার পক্ষে 'নীল-দর্পণে'র নিম্নশ্রেণীর চরিত্রগুলির ব্যবহৃত ভাষাই যে একমাত্র ভাষা, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে। চরিত্রগত স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টিরও ইহা অপরিসীম সহায়ক। অতএব বস্তুতান্ত্রিক দীনবন্ধুর এই শ্রেণীর চরিত্রগুলির সার্থকতায় তাঁহার এই ভাষার কৃতিত্ব নিতান্ত অল্প নহে।

'নীল-দর্পণ' করুণ-রসাত্মক নাটক হইলেও ইংরেজি সাহিত্যে যাহাকে ট্রাজিডি বলা হয়, ইহা সেই শ্রেণীর রচনা নহে। সংগ্রামশীল মানবের পরাজয়ের পরিচয়ই ট্রাজিডির পরিচয়—ইহা নরনারীর দ্বিধাদীর্ণ অন্তরের তিলে তিলে অবক্ষয়ের অভিব্যক্তি। সেইজন্য মৃত্যু মাত্রই ট্রাজিডি নয়, প্রাপ্তি মাত্রই কমেডি হয় না। ট্রাজিডিতে পরাজয়ই একমাত্র সত্য নয়, অনেক বড় সত্য, আত্মরক্ষার জন্য তাহার সুকঠিন সংগ্রাম। 'নীল-দর্পণে'র মধ্যে আত্মরক্ষায় এই সংগ্রামের পরিচয় প্রকাশ পাইতে পারে নাই। সংগ্রামহীন জীবন এখানে কেবলমাত্র ঘটনার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া শেষ পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। ক্ষেত্রমণির মধ্যে আত্মরক্ষার সংগ্রামের যে পরিচয় আছে, তাহাতে ট্রাজিডির বীজ থাকিলেও পূর্ণাঙ্গ ট্রাজিডির পরিচয় নাই; কারণ, ক্ষেত্রমণি নায়ক কিংবা নায়িকা চরিত্র নহে, সামগ্রিক ভাবে মূল কাহিনীর ধারা সে কোন দিক দিয়াই নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে নাই। সাধারণত নায়ক নায়িকার পতনের মধ্য দিয়া ট্রাজিডির করুণ রস নিবিড়তা লাভ করে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিয়াও পরিণামে এক অদৃশ্য কারণে পরাজয়ের সম্মুখীন হইতে বাধ্য হইতেছে, নিজের শক্তি দিয়া কিছুতেই তাহা রোধ করিতে পারিতেছে না, সেখানেই বুঝিতে পারা যায়, দৈবের হস্তে মানুষ ক্রীড়নক মাত্র, দৈবের সম্মুখে মানুষের এই অসহায়তা ট্রাজিডির করুণ রস সৃষ্টির কারণ। 'নীল-দর্পণ' নাটকের মধ্যে এই শ্রেণীর কোন নায়ক চরিত্র নাই, কিংবা ইহার এক বা একাধিক যে চরিত্র নায়ক বলিয়া ভুল হইতে পারে, তাহাদের জীবনের পরিণতিমূলে দৈবের অনুরূপ কোনও প্রভাবের কথা কাহারও মনে হইতে পারে না। দৈবের পরিবর্তে মানুষের নিকট হইতে প্রত্যক্ষ আঘাতের ফলেই ইহা বিষাদাত্মক হইয়াছে।

তথাপি বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট সমালোচক অনুভব করিয়াছেন যে, 'প্রাচীন গ্রীক্ নাটকের অন্তর্গত যে ট্রাজিডি পরিকল্পনা, তাহার সহিত নীল-দর্পণের করুণভাবের সাদৃশ্য আছে।' এই কথাটি একটু বিচার করিয়া দেখিতে হয়। করুণভাবের উদ্রেক ট্রাজিডির উদ্দেশ্য, উক্ত সমালোচকের মতে 'নীল-দর্পণ' নাটকের মধ্য দিয়াও করুণ রসের অভিব্যক্তি হইয়াছে এবং সেই করুণ রস গ্রীক ট্রাজিডির করুণ রসের সমতুল্য। এখানে সমালোচক করুণ রস বিষয়টির উপর জোর দিয়াছেন, ট্রাজিডির আঙ্গিকের দিক দিয়া যে 'নীল-দর্পণে'র সঙ্গে গ্রীক ট্রাজিডির সম্পর্ক আছে, সে কথা বলিতে চাহেন নাই। কিন্তু ট্রাজিডির রস এবং বিয়োগান্তক নাটক মাত্রেরই রস এক নহে। 'নীল-দর্পণে' ট্রাজিডির বহিরঙ্গগত পরিচয় যদি সার্থক না হইয়া থাকে, তবে ইহার মধ্য দিয়া যে করুণ রসের অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহাও ট্রাজিডির করুণ রসের তুল্য নহে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সেইজন্য উক্ত সমালোচককে শেষ পর্যন্ত এ কথা স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, 'ট্রাজিডি হউক না হউক, "নীল-দর্পণে"র করুণ রস অলীক বা অসত্য হয় নাই'। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে, উক্ত সমালোচকের মতেও 'নীল-দর্পণে'র করুণ রস 'অলীক কিংবা অসত্য' না হইলেও তাহা ট্রাজিডির করুণ রস নহে। অর্থাৎ তাঁহার মতেও 'নীল-দর্পণ' ট্রাজিডি নহে। করুণ রসের পরিবেশন সাহিত্যে নানা উপায়ে সার্থক করিয়া তুলিতে পারা যায়, কিন্তু ট্রাজিডিতে করুণ রস সৃষ্টির একটি বিশিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করা হয়, 'নীল-দর্পণে' তাহা করা হয় নাই।

উক্ত সমালোচক 'নীল-দর্পণে'র করুণ রসের মধ্যে গ্রীক্ ট্রাজিডির করুণ রসেরই সাদৃশ্য অনুভব করিয়াছিলেন, কাহিনী পরিকল্পনার দিক দিয়া কোন সাদৃশ্য অনুভব করেন নাই। সুতরাং যে কাহিনীর সূত্রে ট্রাজিডির করুণ রসের উদ্ভব হইয়া থাকে, 'নীল-দর্পণে'র কাহিনী যদি তাহার ব্যতিক্রম হয়, তবে তাহার করুণ রসও তাহার তুল্য হইতে পারে না। কারণ, 'নীল-দর্পণে' নিয়তিবাদের কোন কথা নাই। সুতরাং কাহিনী পরিকল্পনাই হউক, কিংবা করুণ রসই হউক, 'নীল-দর্পণে' ইহাদের কিছুই গ্রীক্ ট্রাজিডির সঙ্গে সাদৃশ্য স্থাপন করিতে পারে নাই।

সেক্সপীরীয় ট্রাজিডির আদর্শের কথা আলোচনা করিলেও দেখা যায়, 'নীল-দর্পণে' তাহারও অনুসরণ সার্থক হয় নাই। কারণ, যে মানবিক দুর্বলতার ছিদ্র-

পথে ইহাতে নায়কের পতনের বীজ প্রবেশ করিয়া তাহার বিনাশ অনিবার্য করিয়া তুলে, ইহাতে তাহারও কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, ইহাতে বলিষ্ঠ কোন নায়ক চরিত্রই নাই ; এমন কি, যদি নবীন-মাধবকেও নায়ক বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন, তথাপি দেখা যায় যে, নবীনমাধব আদর্শ চরিত্র, তাহার মধ্যে মানবিক অনুভূতির কোন স্পর্শ নাই। তাহাকে সকল বিষয়ে আদর্শ করিতে গিয়া নাট্যকার তাহাকে প্রায় রক্তমাংসের সম্পর্কশূন্য করিয়া ফেলিয়াছেন ; সেইজন্য সেক্সপীরীয় আদর্শে নবীনমাধবও নায়ক চরিত্ররূপে সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই। নায়ক বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, এমন আর কোন চরিত্র এই নাটকে নাই, সুতরাং সেক্সপীরীয় আদর্শে 'নীল-দর্পণ' ট্রাজিডি বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য নহে। বিশেষত সংগ্রামশীল মানুষের পতনের ভিতর দিয়াই ট্রাজিডির করুণ রসের সার্থকতম অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। 'নীল-দর্পণ' নাটকের চরিত্রগুলি অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নাই, ঘটনার স্রোতে কেবলমাত্র গা ভাসাইয়া দিয়া গিয়াছে। সুতরাং এই প্রকার সংগ্রামহীন জীবনের নিষ্ক্রিয় চরিত্রের পতনের মধ্যে ট্রাজিডির রস সৃষ্টি অসম্ভব। বহির্দ্বন্দ্বের কথা বাদ দিলেও নবীনমাধবের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বেরও কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। শুধু নবীনমাধব কেন, এই নাটকের কোন চরিত্রের মধ্যেই কোনও অন্তর্দ্বন্দ্ব নাই। অন্তর্মুখী সংগ্রামে যে পরাজয়ের কথা ট্রাজিডির মধ্যে নির্দেশ করা হইয়া থাকে, তাহার একান্ত অভাবে 'নীল-দর্পণ' নাটকে ট্রাজিডির রস কিংবা শক্তি কিছুই সঞ্চারিত হইতে পারে নাই।

এই নাটকের পরিণতিতে মৃত্যুর যে ঘনঘটা দেখা যায়, তাহা দ্বারাও ইহার ট্রাজিডি 'তরল' ও 'অবাস্তব' হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। কিন্তু কাহিনীতে মৃত্যুর বাহুল্য থাকিলেই ট্রাজিডি ব্যর্থ হয়, এমন কথা বলিতে পারা যায় না ! যেমন বিনা মৃত্যুতেও ট্রাজিডি সম্ভব, তেমনই মৃত্যুর বাহুল্য দ্বারা ট্রাজিডি অবাস্তব হইয়া উঠিবে, এমন কথা কখনও সত্য নহে ; মৃত্যু কিংবা বিচ্ছেদের প্রণালীর উপরই ট্রাজিডির সার্থকতা কিংবা ব্যর্থতা নির্ভর করে। 'নীল-দর্পণে' মৃত্যুর আধিক্য নহে, মৃত্যুর প্রণালীর মধ্যে এমন কতকগুলি ত্রুটি প্রকাশ পাইয়াছে, যাহার ফলে ইহা ট্রাজিডি রূপে গৃহীত হইবার পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে। কাহিনীর অনিবার্য পরিণতি রূপে যে মৃত্যু কিংবা বিচ্ছেদ নাটকের মধ্যে দেখা যায়, কেবলমাত্র তাহা দ্বারাই ট্রাজিডি সম্ভব হয়, কাহিনীর ধারার মধ্যেই ট্রাজিডির বীজ লুক্কায়িত থাকে, ক্রমে ইহার সমস্ত আবরণ দূর

হইয়া গিয়া নিতান্ত স্বাভাবিক সূত্রেই পরিণামে তাহা আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু 'নীল-দর্পণে' কোনও মৃত্যুই কাহিনীর সুদীর্ঘ ধারার অনিবার্য পরিণতিরূপে সংঘটিত হয় নাই, আকস্মিকতা ইহাদের প্রত্যেকটিরই এক একটি গুরুতর ত্রুটি। এমন কি, যে ক্ষেত্রমণির মৃত্যু স্বাভাবিকতার গুণে সার্থক করুণ রস সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহাও 'নীল-দর্পণ' নাটককে ট্রাজিডির গৌরব দিতে পারে নাই। সুতরাং 'নীল-দর্পণ' নাটকের যে গৌরবই প্রকাশ পাক, ইহার মধ্যে ট্রাজিডি সৃষ্টির প্রয়াস যে সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই, তাহা অস্বীকার করা যায় না। ইহা সাধারণ বিয়োগান্তক নাটক মাত্র।

একথা সত্য যে, 'নীল-দর্পণে'র বিষয়বস্তু যথাযথভাবে ব্যবহার করিতে পারিলে ইহা দ্বারাই ট্রাজিডি সৃষ্টি সম্ভব হইত; কারণ, ইহার মধ্যে যথার্থ ট্রাজিডির বীজ ছিল। কাহিনীর ভিতর দিয়া যে সমস্যাটিকে উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহার বাহিরের দিকটির একটি সাময়িক মূল্য থাকিলেও ইহার ভিতরেরও একটি দিক আছে, সেই দিক দিয়া ইহার একটি চিরন্তন মূল্যও প্রকাশ পাইয়াছে—তাহা প্রবল এবং দুর্বলের সম্পর্ক। কেবলমাত্র কাহিনীর দিক দিয়া ইহাকেই ভিত্তি করিয়া ট্রাজিডি রচিত হইতে পারে। কারণ, এক দুর্ধর্ষ প্রবল পশুশক্তির সম্মুখে অসহায় দুর্বল মানবের এক অতি করুণ পরাজয়ের কাহিনীই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। নাট্যকাহিনীর মধ্যে অর্থ নৈতিক কিংবা ইতিহাসের যে অবলম্বনই থাকুক না কেন, তাহা অতিক্রম করিয়া এই ভাবটি নাটকের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই ইহা ট্রাজিডিরূপে সার্থকতা লাভ করিতে পারিত। কিন্তু এই বিষয়টি নাটকের মধ্যে ট্রাজিডির কাহিনীগত বিস্তার কিংবা ভাবগত গভীরতা রক্ষা করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। ইহার প্রধান কারণ, কহিনীটি একলক্ষ্যমুখী না হইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াই দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার ফলে অত্যাচারিত কৃষককুলের প্রতিনিধি নবীনমাধবই হউক, কিংবা লাঞ্ছিতা নারীকুলের প্রতিনিধি ক্ষেত্রমণিই হউক, কাহারও ভিতর দিয়াই ইহা সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লাভ করিতে পারে নাই। নাট্যকারের লক্ষ্য এই নাটকে একের উপর ছিল না, বহুর উপরে ছিল, সেইজন্য এই ভাবটি নিবিড়তা লাভ করিবার পরিবর্তে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

নবীনমাধবকেই এই নাটকের নায়ক বলিয়া গ্রহণ করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, ট্রাজিডির নায়কোচিত গুণ তাহার মধ্যে ছিল, কিন্তু নাট্যকার তাহার

যথার্থ বিকাশ করিতে পারেন নাই। নায়ক হিসাবে নবীনমাধবের চরিত্রের প্রধান ত্রুটি এই যে, ইহার কোনও আচরণই নাটীক ক্রিয়ার (dramatic action) ভিতর দিয়া প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে নাই—কেবলমাত্র মৌখিক বক্তৃতা কিংবা পরোক্ষ ভাষণের ভিতর দিয়াই প্রকাশ পাইয়াছে। যে সাহসিকতা নায়ক চরিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য গুণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, নবীন-মাধবের মধ্যে তাহা ছিল, কিন্তু ইহা কেবলমাত্র পরের মুখের কথার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। একবার সাধুচরণ গোলোক বসুর নিকট বলিয়াছে, 'বড়বাবুর কিন্তু ভ্যালা সাহস।' তারপর সাহেবের সঙ্গে যে তাহার কি আলাপ হইয়াছিল, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছে। ইহার ভিতর দিয়া নবীনমাধবের বিপদকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া সত্যভাষণের দুঃসাহসের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু ইহা নাটকীয় আচরণের ভিতর দিয়া প্রকাশ না করিয়া কেবলমাত্র পরের মুখের কথা রূপে ব্যবহার করিবার ফলে নবীনমাধবের চরিত্রের ভিতর তাহার এই নায়কোচিত গুণটি কার্যকর হইয়া উঠিতে পারে নাই, সেইজন্য ইহার ফলও সুদূরপ্রসারী হইয়া উঠে নাই।

নবীনমাধবকে ট্রাজিডির নায়কোচিত গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিবার আরও একটি সুযোগ যে নাট্যকার কি ভাবে বিনষ্ট করিয়াছেন, তাহাও এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে সাধুচরণ সাহেবের আক্রমণে মৃতপ্রায় নবীনমাধবকে গৃহে আনিয়া সাহেবের কুঠিতে সংঘটিত সুদীর্ঘ ঘটনার একটি মৌখিক বিবরণ দিয়াছে। বিবরণটি নাটকীয় ঘটনায় পরিপূর্ণ। এই ঘটনাটি একটি নাটকীয় দৃশ্যের ভিতর দিয়া প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিলে নবীনমাধবের নায়-কোচিত গুণ যে ভাবে প্রকাশ পাইত, কেবলমাত্র পরোক্ষ বর্ণনার ভিতর দিয়া তাহা সেইভাবে প্রকাশ পাইতে পারে নাই। সাধুচরণ বলিতেছে, 'বড়বাবুর চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, অঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, দন্ত দিয়া ঠোঁট কামড়াইতে লাগিলেন এবং ক্ষণেক কাল নিস্তব্ধ হয়ো থেকে সজোরে সাহেবের বক্ষঃস্থলে এমন একটি পদাঘাত করিলেন, বেটা বেনার বোঝার ন্যায় ধপাৎ করিয়া চিৎ হইয়া পড়িল।' এই বিষয়টি দৃশ্য, শ্রব্য নহে; কিন্তু দীনবন্ধু ইহার দৃশ্যগুণ পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র শ্রব্য করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাহার ফলে একটি উচ্চাঙ্গের নাটকীয় ঘটনা দৃশ্যের ভিতর দিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিবার সুযোগ যেমন বিনষ্ট হইয়াছে, তেমনই ইহার আচরণের ভিতর দিয়া নায়ক-চরিত্রের যে গৌরব প্রকাশ পাইত, তাহাও বিকাশ করিয়া তুলিবার

সুযোগ পরিত্যাগ করা হইয়াছে। আরও যে সকল গুণ থাকিলে নায়কচরিত্র যথার্থ ট্রাজিডির নায়কের মর্যাদা লাভ করিতে পারে, নবীনমাধবের মধ্যে তাহাদেরও অধিকাংশেরই অস্তিত্ব ছিল। যেমন সে অত্যাচারীর শত্রু, অত্যাচারিতের রক্ষায় দীক্ষিত, পরোপকারী ইত্যাদি। সুতরাং দেখা যায়, নবীনমাধবের চরিত্রের মধ্যে নায়কোচিত গুণ ছিল, তাহা নাট্যকার যথাযথ বিকাশ করিয়া তুলিতে পারেন নাই। এই সকল গুণের মধ্যেও যে মানবিক দুর্বলতা ট্রাজিডির নায়ককে সর্বনাশের পথে ঠেলিয়া দেয়, তাহারও অস্তিত্ব তাহার মধ্যে যে ছিল, আকস্মিক উত্তেজনায় হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া সাহেবকে আক্রমণ করিয়া তাহার মৃত্যুবরণের মধ্যে তাহাও প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু নাটকের মধ্যে তাহার চরিত্রের এই দিকটির যথাযথ বিকাশ হয় নাই বলিয়া ট্রাজিডি হিসাবে 'নীল-দর্পণ' নাটক কিংবা ট্রাজিডির নায়ক রূপে নবীন-মাধবের চরিত্র সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। নাট্যকাহিনীর শেষাংশে যে সকল মর্মান্তিক এবং শোচনীয় ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, তাহাও ট্রাজিডির অনুপযোগী নহে ; কিন্তু ঘটনাগুলি কাহিনীর অনিবার্য পরিণতি রূপে সংঘটিত না হইবার জন্য ইহারা যথার্থ করুণ না হইয়া বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে। সেইজন্য ইহাদের মধ্যে ট্রাজিডির বহিরঙ্গগত লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও ইহার অন্তমুখী পরিচয় স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। ট্রাজিডির করুণ রসের মধ্য দিয়া যে আবেদন প্রকাশ পাক, ইহার নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া গেলে ইহা বীভৎস রসের সৃষ্টি করে। 'নীল-দর্পণে' তাহাই হইয়াছে। সুতরাং দেখা যায়, চরিত্রের দিক দিয়াই হউক, কিংবা ঘটনাবিন্যাসের দিক দিয়াই হউক, 'নীল-দর্পণে' ট্রাজিডির যে যথার্থ উপকরণ ছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না ; কিন্তু যে সূক্ষ্ম শিল্পবোধ থাকিলে আনুপূর্বিক একটি নাট্যকাহিনী ট্রাজিডির গৌরব লাভ করিবার অধিকারী হয়, নাট্যকার দীনবন্ধুর মধ্যে তাহার অভাব ছিল বলিয়া 'নীল-দর্পণ' ট্রাজিডিরূপে রসোত্তীর্ণ হইতে পারে নাই।

'নীল-দর্পণ' নাটকে নায়ক কিংবা নায়িকা রূপে কোন চরিত্রই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই। যে নাট্যকাহিনীর মধ্যে সামগ্রিক ভাবে একটি সমাজের সাধারণ একটি বিপর্যস্ত অবস্থা বর্ণনা লক্ষ্য থাকে, তাহার মধ্যে একক চরিত্র অনেক সময়ই বিশেষত্ব লাভ করিয়া নায়ক কিংবা নায়িকার প্রাধান্য লাভ করিয়া উঠিতে পারে না। চরিত্র-সৃষ্টিতে দীনবন্ধু যে সার্থকতাই লাভ করুন না কেন, কোন একক চরিত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহার সেই সার্থকতা 'নীল-

দর্পণে' প্রকাশ করিতে পারেন নাই, একথা সত্য। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে সমাজই লক্ষ্য ছিল বলিয়া যে একাজ নাটকে অসম্ভব, তাহাও স্বীকার করা যায় না। কারণ, *Uncle Tom's Cabin*-এ একটি ক্রীতদাসের চরিত্র সমগ্র কাহিনীটির মধ্যে নায়কোচিত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। তাহাতে 'নীল-দপণ' নাটকের মত বহু বিচিত্র প্রকৃতির চরিত্রের কলরব শুনিতে পাওয়া যায় না, সেখানে অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের পরিচয়টি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়া যথাক্রমে নায়ক এবং প্রতিনায়কের স্থান গ্রহণ করিয়াছে। অথচ একথাও সত্য, ইহার ভিতর দিয়াই সমগ্র নিগ্রো ক্রীতদাসের প্রতি শ্বেতাঙ্গ মার্কিন প্রভুদিগের ব্যাপক অত্যাচারের স্বরূপটি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কারণ, তাহাতে অত্যাচারিত ক্রীতদাস মার্কিন দেশের সমগ্র ক্রীতদাস-দাসীর প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার হৃদয়হীন প্রভু এবং প্রভুপত্নীও শ্বেতাঙ্গ মার্কিন জাতির প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হইয়াছে। তাহাতে একাধিক ক্রীতদাস-দাসীর উপর বিভিন্ন প্রকৃতির অত্যাচারের কথা নাই বলিয়া লেখিকার বক্তব্য বিষয় কোন দিক দিয়া অনুক্ত কিংবা অস্পষ্ট থাকিয়া যায় নাই। সুতরাং সামগ্রিকভাবে সামাজিক কোন অবস্থা বর্ণনা করিতে হইলেই যে বিভিন্ন চরিত্রের সমাবেশ করিয়া তাহাদের সকলের মধ্য দিয়াই সেই অবস্থাটি প্রকাশ করিতে হইবে, এমন কিছু কথা নাই। সবিশেষ মানুষই নির্বিশেষ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করিয়া থাকে, নায়ক-নায়িকার বিশিষ্ট চরিত্রের মধ্য দিয়াই নির্বিশেষ নরনারীর জীবনবাণী প্রচারিত হয়। সেইজন্য যে অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই নাটক রচিত হউক না কেন, নায়ক কিংবা নায়িকার চরিত্র-সৃষ্টির দাবী তাহাদের মধ্যে কোন দিক দিয়াই লাঘব করা যায় না। কিন্তু 'নীল-দর্পণ' নাটকে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। ইহার চরিত্রগুলির কেবল মাত্র দুইটি শ্রেণী—অত্যাচারী ও অত্যাচারিত। বাহিরের দিক দিয়া চরিত্রগুলির এক একটি সাধারণ পরিচয় আছে। অত্যাচারের প্রণালীর মধ্যেই কেবল মাত্র ইহাদের পার্থক্য, কিন্তু ইহাদের পরিচয়ের মধ্যে আর কোন পার্থক্য নাই। নায়ক-নায়িকার জীবন-সংগ্রামের মধ্য দিয়া দর্শকের দৃষ্টি একই চরিত্রের আচরণের উপর কেন্দ্রিত (centred) হইয়া থাকিবার যে সুযোগ পায়, বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে তাহা প্রকাশ করিলে দর্শকের পক্ষে সে সুযোগ লাভ সম্ভব হয় না। সেইজন্য নায়ক-নায়িকার পতনের মধ্য দিয়াই করুণ রস নিবিড়তম হইয়া প্রকাশ পায়। 'নীল-দর্পণ'-এর দর্শকগণ সেই সুযোগ লাভ করিতে পারেন নাই। বিভিন্ন চরিত্রের

মৃত্যু ও করুণ পরিণতির মধ্য দিয়া সেই করুণ রস বিক্ষিপ্ত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে, নিবিড় হইয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই। যেখানে একটি মৃত্যুই করুণ রস কিংবা ট্রাজিডি রচনার পক্ষে যথেষ্ট, এমন কি, মৃত্যু ব্যতীতও করুণ রস—এমন কি, ট্রাজিডিও সৃষ্টি হইতে পারে, সেখানে 'নীল-দর্পণে' নাট্যকার তাঁহার বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করিবার জন্য প্রথমত গোলোক বসুর উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা, তারপর ক্রমে ক্ষেত্রমণি, নবীনমাধব, সরলতা, সাবিত্রী ইত্যাদির অপমৃত্যু বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহাদের সকলের মাধ্যমে নাট্যকার তাঁহার বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। কৃষকের উপর নীলকরের অত্যাচার দেখাইবার উদ্দেশ্যেই নাট্যকার তাঁহার এই নাটক রচনা করিয়াছেন, সুতরাং ইহাতে যদি *Uncle Tom's Cabin*-এর ক্রীতদাস চরিত্রের মত কোন প্রকৃত কৃষক চরিত্র নায়কের স্থান লাভ করিতে পারিত, তবে তাহার মৃত্যুর মধ্য দিয়া নাট্যকারের বক্তব্য বিষয় স্পষ্টতর হইতে পারিত। কিন্তু এখানে কোন কৃষক চরিত্র মুখ্যভাবে অত্যাচারের লক্ষ্য হয় নাই, কোন কৃষক চরিত্রের মৃত্যুও সংঘটিত হয় নাই; সুতরাং কোন কৃষকের চরিত্র ইহাতে কোন দিক দিয়া প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। বরং তাহার পরিবর্তে নিরীহ কায়স্থ সন্তান গোলোক বসু, নবীনমাধব ও তাহাদেরই পরিবারের জননী এবং বধূর মৃত্যু হইয়াছে। এমন কি, কৃষক-কন্যা ক্ষেত্রমণিরও যে ভাবে মৃত্যু বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতেও তাহার সঙ্গে কৃষিকর্মের কোন সম্পর্ক নাই। সুতরাং এই নাটক কেবলমাত্র যেমন একজনের অন্তর্বেদনায় করুণ হইয়া উঠিতে পারে নাই, তেমনই কৃষক কিংবা কৃষিক্ষেত্র আশ্রয় করিয়াও ইহার করুণ পরিণতি রূপ লাভ করিতে পারে নাই। বিভিন্নধর্মী চরিত্র আশ্রয় করিয়া নাটকের বক্তব্য বিষয় যথাসম্ভব প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু বিভিন্নধর্মী চরিত্রও কেবল মাত্র দুইটি পরিবারেরই অন্তর্ভুক্ত। তবে পাঁচজন রাইয়তের উপর কিংবা অদৃশ্যচারী কুঠিতে বন্দী মজুমদারের উপর যে অত্যাচারের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার ভিতর দিয়াই নাটকের বক্তব্য বিষয় কতকটা সার্থকতার সঙ্গে প্রকাশ পাইয়াছে। গোলোক বসু ও সাধুচরণের পরিবারের কয়টি চরিত্র এবং এই পাঁচ ছয় জন রাইয়তে মিলিয়া সামগ্রিক ভাবে এই নাটকের করুণ রস প্রকাশের সহায়ক হইয়াছে, কোনও ব্যক্তিচরিত্রের দ্বারা বিচ্ছিন্নভাবে তাহা সম্ভব হয় নাই।

'নীল-দর্পণ' নাটকে ব্যষ্টির জীবন অপেক্ষা সমষ্টির জীবনই যে নাট্যকারের লক্ষ্য ছিল, সে কথা আলোচিত হইয়াছে। এই সমষ্টির জীবনের মধ্য দিয়াই

নাট্যকার কি রস ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন এবং তাহাই বা কতদূর সার্থকতা লাভ করিয়াছে, তাহা বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে।

ব্যষ্টি কিংবা ব্যক্তিচরিত্রই নাটকের নায়ক হইয়া থাকে, সমষ্টিগতভাবে একাধিক চরিত্র তাহার নায়কের স্থান গ্রহণ করিবার পক্ষে বাধা আছে। কারণ, চরিত্র সৃষ্টির যাহা প্রধানতম গুণ, অর্থাৎ সবিশেষত্ব বা individuality, তাহা সমষ্টির চরিত্রের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতে পারে না। সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত মানুষ যখন একই প্রকার আচরণ করে, তখন তাহা সাধারণতঃ জনতার আচরণ বলিয়া গণ্য হয়। নাট্যকাহিনীতে জনতারও আবশ্যক হয়, কিন্তু সেই জনতা যত প্রাধান্যই লাভ করুক, তাহা নাটকের নায়ক চরিত্রের স্থান গ্রহণ করিতে পারে না। কিন্তু 'নীল-দর্পণ' নাটকের কাহিনীতে কতকটা এই প্রকার ব্যাপারই সংঘটিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে যে অত্যাচারী ও অত্যাচারিত বলিয়া পরিচিত দুই শ্রেণীর চরিত্র আছে, তাহাদের আচরণ একমুখীন, বৈচিত্র্যধর্মী নহে,—অত্যাচারী শ্রেণী একমুখীন আচরণ করিয়াছে, সুতরাং ইহাতে অত্যাচারী একটি গোষ্ঠী, অত্যাচারিত আর একটি গোষ্ঠী বলিয়া অভিহিত করা যায়। যে গোষ্ঠী অত্যাচারিত তাহার ভিতর দিয়া অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া কি দেখা দিয়াছে, তাহাই এই নাটকের মধ্যে লক্ষ্য করিবার বিষয়। দেখা যায় যে, অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া অত্যাচারিতের উপর প্রায় সর্বত্রই এক ও অভিন্ন। অত্যাচারের ফলে কাহারও মৃত্যু হইয়াছে ; যাহাদের মৃত্যু হয়ও নাই, তাহারাও যে অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে, তাহাও মৃত্যু অপেক্ষা কম ভয়াবহ নহে, তাহাও মৃত্যুরই তুল্য। এক ক্ষেত্রে মাতৃ-পিতৃ-ভ্রাতৃ-পত্নীহীন পরিবারে বিন্দুমাধব একক বাঁচিয়া রহিল, আর এক ক্ষেত্রে একমাত্র স্নেহপুত্তলী কন্যা সন্তানের মর্মান্তিক মৃত্যুর করুণ স্মৃতি বুকে লইয়া সাধুচরণ ও রেবতী বাঁচিয়া রহিল। সুতরাং ইহাদের উভয় ক্ষেত্রেই পরিণতি অভিন্ন হইয়াছে। কেবল মাত্র যে কৃষকদিগকে লক্ষ্য করিয়া এই নাটক রচনার সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কাহারও পরিণতি সুস্পষ্ট পরিচয় লাভ করিল না, তাহারা একই সঙ্গে পটভূমিকার মধ্যে গৌণ হইয়া পড়িয়া শেষ পর্যন্ত আত্মগোপন করিল। তবে ইহাদেরও প্রত্যেকেরই পরিণতি অভিন্ন হইল।

'নীল-দর্পণ' নাটকের অত্যাচারিত শ্রেণীর চরিত্রের জীবনের পরিণতি করুণ কিংবা বিয়োগান্তক হইল বলিয়াই এই নাটক যে ট্রাজিডি হইল, তাহা নহে, সেকথা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। ব্যক্তির জীবনের পরিণতি করুণ

হইলেই যেমন নাটক ট্রাজিডি হয় না, তেমনই সমষ্টির জীবনের পরিণতিও যদি করুণ হয়, তবেও তাহা ট্রাজিডি হয় না। এই নাটকে বিভিন্ন চরিত্রের পরিণতি করুণ হওয়া সত্ত্বেও ইহা যে গোষ্ঠীর ট্রাজিডি রূপেও কোন দিক দিয়া সার্থকতা লাভ করিয়াছে, তাহাও নহে, তবে দুইটি পরিবারকে আশ্রয় করিয়া একটি করুণ পরিণতি লাভ করিয়াছে মাত্র। এমন কি, এই করুণ রসও যে নিবিড়তা লাভ করিতে পারে নাই, তাহাও সহজেই অনুমান করা যায়। বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়া বিক্ষিপ্তভাবে করুণ রসের অভিব্যক্তি হইলে তাহা যে নিবিড় হইতে পারে না, তাহা নহে—তবে তাহার লক্ষ্য এক হওয়া আবশ্যক। নাট্যকাহিনীর উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য স্থির থাকিলে করুণ রসের প্রবাহের মধ্য দিয়াও যে রসগত নিবিড়তা রক্ষা পায়, সেক্সপীয়রের ট্রাজিডিগুলি তাহার প্রমাণ। তাহাতে এক একটি নাট্যকাহিনীর মধ্যে বহু চরিত্রেরই মৃত্যু হইয়াছে, অথচ তাহাদের কোনটিকেই যেমন গোষ্ঠীর ট্রাজিডি বলিয়া নির্দেশ করিতে পারা যায় না, তেমনই করুণ রসেরও যে নিবিড়তার কোথাও কোন অভাব ঘটিয়াছে, তাহাও কেহ মনে করিতে পারিবেন না। অথচ 'নীল-দর্পণ' ব্যষ্টি কিংবা সমষ্টির কাহারও ট্রাজিডি না হইলেও ইহার বিয়োগান্তক পরিণতিজাত করুণ রসও যে নিবিড়তা লাভ করিয়াছে, এমন কথাও বলিবার উপায় নাই। কাহিনীর যেখানে লক্ষ্যচ্যুতি ঘটে, সেখানে এই বিষয় আশাও করা যাইতে পারে না। 'নীল-দর্পণে'র কাহিনীতে এই ত্রুটি প্রবেশ করিয়াছে বলিয়াই ইহার পরিণতিতে রসগত অখণ্ডতা প্রকাশ পাইতে পারে নাই। এই নাটকের প্রত্যেকটি মৃত্যুই আকস্মিক ঘটনা-জাত, অথবা অতি-নাট্যিক (melodramtic)—আত্মহত্যা, আকস্মিক মানসিক উত্তেজনাজাত হত্যা এই নাটকের করুণ পরিণতির কারণ, ইহাদের ক্রিয়া অতি-নাট্যিক, যথার্থ নাটকীয় নহে, এই সকল অপঘাত মৃত্যুর লক্ষ্য বা মূল উদ্দেশ্যটি যে স্থির ছিল, তাহাও নহে; কারণ বিভিন্ন চরিত্র একই উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া মৃত্যু বরণ করে নাই, ব্যক্তি বিশেষ কিংবা অবস্থা বিশেষ একই আচরণ দ্বারা মৃত্যু সংঘটন করে নাই, সুতরাং ইহাদের ক্রিয়া কিংবা মনের উপর তাহার প্রভাব একই প্রকৃতির কিছুতেই হইতে পারে নাই। সেইজন্য গোষ্ঠীর ট্রাজিডি রূপেও যদি বিচার করা যায়, তথাপি 'নীল-দর্পণ'-কে বাহিরের দিক হইতে তাহা মনে করা গেলেও অন্তরের দিক দিয়া যে উহা স্বতন্ত্র প্রকৃতির, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

গোষ্ঠীর আচরণের (action) মধ্যে যে ঐক্য বা unity থাকে, 'নীল-দর্পণ' নাটকে তাহা নাই। এখানে বিভিন্ন প্রকৃতির চরিত্র গোষ্ঠীজীবন গঠ

করিয়াছে বলিয়া গোষ্ঠীর পরিচয়টিও নিবিড়তা লাভ করিতে পারে নাই। জনতা বলিতেও যাহা বুঝায় 'নীল-দর্পণে' অত্যাচারিত শ্রেণীর চরিত্রগুলি তাহাও নহে। ইহাতে প্রবীণ বয়স্ক ধীর স্থির প্রাজ্ঞ গোলোকচন্দ্র বসু যেমন আছেন, তেমনই ক্রোধে আত্মবিস্মৃত তাঁহার পুত্র নবীনমাধবও আছে; ইহাতে বালিকা কৃষককন্যা ক্ষেত্রমণি যেমন আছে, তেমনই প্রবীণা অভিজাতবংশীয়া সাবিত্রীও আছেন; সুতরাং ঐক্যবদ্ধ গোষ্ঠী বলিতে যাহা বুঝায়, 'নীল-দর্পণে'র অত্যাচারিত সমাজ তাহা নহে। সুতরাং সুনিবিড় গোষ্ঠীজীবনই প্রকৃত যেখানে রচিত হইতে পারে নাই সেখানে গোষ্ঠীর ট্রাজিডি সৃষ্টি হইবার কোন কথাই আসিতে পারে না। অতএব 'নীল-দর্পণ' নাটক সম্পর্কে একথা মনে হইলেও ইহাকে গোষ্ঠীর ট্রাজিডি বলিয়াও উল্লেখ করা যায় না। ইহা ট্রাজিডিই নহে, ব্যক্তিরও যেমন নহে, গোষ্ঠীরও তেমনই নহে; এমন কি সুনিবিড় করুণ রসাত্মকও নহে। ব্যষ্টিরই হউক কিংবা সমষ্টিরই হউক, ইহার করুণ রসও শেষ প্রান্তে আসিয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

'নীল-দর্পণ' নাটকের দুইটি উল্লেখযোগ্য মৃত্যুদৃশ্যের তুলনা করিয়া দেখিলেই দীনবন্ধুর প্রতিভার বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে—একটি ক্ষেত্রমণির মৃত্যুদৃশ্য, অপরটি সরলতার মৃত্যুদৃশ্য। ভদ্রেতর চরিত্র অবলম্বন করিয়া প্রথমটি রচিত এবং ভদ্রচরিত্র অবলম্বন করিয়া দ্বিতীয়টি রচিত হইয়াছে। এই দুইটি দৃশ্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেই কোন শ্রেণীর চরিত্র-সৃষ্টিতে দীনবন্ধু কি জন্য সাফল্য লাভ করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। পঞ্চম অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে ক্ষেত্রমণির মৃত্যুদৃশ্যটির অবতারণা করা হইয়াছে। ইহাতে দেখা যাইতেছে, ক্ষেত্রমণির শয্যাকণ্টকী দেখা দিয়াছে, তাহার বাঁচিবার আর আশা নাই। পিতা সাধুচরণ ইহা বুঝিতে পারিয়াছে, কিন্তু সন্তান-স্নেহে অন্ধ জননী তাহা বুঝিতে পারিলেও বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। মুমূর্ষু কন্যার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া নানাভাবে তাহার পরিচর্যা করিয়া তাহার অন্তিম-মুহূর্তে একটু শান্তি ও সান্ত্বনা দিবার প্রয়াস পাইতেছে। সন্তানের প্রতি স্নেহ থাকিলেই সন্তানের মৃত্যু রোধ করিতে পারা যায় না; জননীর এই অসহায় অবস্থার করুণতম পরিচয়টুকু এখানে রেবতীর আচরণের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। চিত্রটি একান্ত বাস্তবানুগ বলিয়াই এতখানি শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া অনুভূত হইবে। এই দৃশ্যের মধ্যে ক্ষেত্রমণি সংজ্ঞাহীনা, তাহার মধ্যে মৃত্যুপথ-যাত্রিণীর অন্তিম মুহূর্তের আচরণকে নাট্যকার একান্ত স্বাভাবিক করিয়া

তুলিয়াছেন। শয্যাকণ্টকীর জ্বালায় ক্ষেত্রমণি বিছানায় শুইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। রেবতী কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবে বুঝিতেছে না; সে তাহার একমাত্র সন্তান, তাহার উপর স্নেহ-মমতার আধার কন্যাসন্তান। সে অসহায় ভাবে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া কেবলমাত্র মুখের দুইটি সুস্নিগ্ধ কথায় তাহার এই জ্বালা জুড়াইয়া দিবার প্রয়াস পাইতেছে,—'যাদু মোর, সোনার চাঁদ মোর, ওমন ধারা কেন কচ্চো মা। বিছানা ঝেড়্যে দিয়েচি মা, বিছানায় ত কিছু নেই রে মা,'...এই সহজ সরল মাতৃ-হৃদয় হইতে স্বভাব-উৎসারিত ভাষার ভিতর দিয়া জননী রেবতীর চরিত্রটি এখানে বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে। নাটকীয় চরিত্রকে স্বাভাবিক করিয়া তুলিবার পক্ষে ভাষা যে কত বড় সহায়ক, তাহা এখান হইতেও বুঝা যাইবে। রেবতী ও ক্ষেত্রমণির চরিত্র রূপায়ণে দীনবন্ধুর এই একান্ত চাষী-সমাজের ভাষা যে শক্তিসঞ্চার করিয়াছে, তাঁহার পরিকল্পিত দ্বিতীয় মৃত্যুদৃশ্যটির মধ্যে তাহা পাওয়া যাইবে না। স্বাভাবিক ভাষা নাটকের কাহিনীকে স্বাভাবিক স্রোতে প্রবাহিত করিয়া লইয়া যাইতে পারে; যেখানে ভাষা কৃত্রিম, সেখানে ঘটনার প্রবাহ কৃত্রিম ও গতিশক্তিহীন হইয়া পড়ে।

সাধুচরণের ভাষা পুরাপুরি চাষার ভাষা নহে, সে কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছে বলিয়া দীনবন্ধু তাহার ভাষাকে অন্যত্র কিছু কিছু কৃত্রিম করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু এখানে একমাত্র কন্যার মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া সে যদি কোন কৃত্রিম ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিত, তাহা হইলে সমগ্র চিত্রটিই এখানে কৃত্রিম হইয়া উঠিত, কিন্তু এখানে তাহা হয় নাই। সে পিতা, তাহার দায়িত্ব এখানে বড় কঠিন, তাহাকে স্থির থাকিয়া সমগ্র দুর্ভাগ্য মাথায় পাতিয়া লইবার শক্তি রক্ষা করিতে হইবে, তাহার ভাঙ্গিয়া পড়িলে চলিবে না। দীনবন্ধু তাহার আচরণের মধ্যে পিতার সুকঠিন দায়িত্ব পালনের ভিতর দিয়া সুগভীর সংযম রক্ষা করিয়াছেন। ইহাতে একদিক দিয়া তাহার চরিত্রটি যেমন বাস্তব, তেমনই অন্যদিক দিয়া দৃশ্যটি ততই করুণ হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি ইহা একটি সুদৃঢ় অবলম্বনের উপর নির্ভর করিতে পারিয়াছে।

ক্রমেই ক্ষেত্রমণির অবস্থা অবনতির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। রেবতী সবই বুঝে, তথাপি তাহার মাতৃ-হৃদয় সন্তান সম্পর্কে কোন অশুভ-কথা বিশ্বাস করিতে চাহিল না। জননীর কাতরোক্তিতে ক্ষেত্রর অবস্থা বুঝিতে পারা গেল,—'দেখ দেখ, মার চকির মণি কনে গ্যাল।' এ যাবৎকাল বাংলা

সাহিত্যে কথ্য ভাষা দ্বারা হাস্যরস সৃষ্টিরই প্রয়াস দেখা গিয়াছে, রামনারায়ণ হইতে প্যারীচাঁদ পর্যন্ত যাঁহারাই গ্রাম্য ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহারা তাহা দ্বারা কেবলমাত্র লঘু পরিবেশ সৃষ্টি করিবারই প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু ইহা দ্বারা যে সুগভীর করুণ রস সৃষ্টিও সার্থক হইতে পারে, পূর্বে কিংবা পরেও তাহা কেহই দেখাইতে পারেন নাই। চাষার ভাষা যদি ইহার বাস্তব রূপ রক্ষা করিয়া প্রকাশ পাইতে পারে, তবে তাহা দ্বারাও যে সাহিত্যের উচ্চ একটি রস-সৃষ্টি সম্ভব হয়, দীনবন্ধুর এই দৃশ্যটি তাহার প্রমাণ।

ক্ষেত্রমণির আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় রেবতীর মনে আরও একটি আশঙ্কা দেখা দিল। নিজের একমাত্র দুহিতাকে বিবাহ দিয়া সেই সূত্রে পুত্রসন্তানহীনা রেবতী তাহার জামাতা হারাণকে দিয়া তাহার পুত্রের স্থান পূর্ণ করিয়া লইয়াছিল। অল্পদিনের আত্মীয়তার মধ্য দিয়াই জামাতার সঙ্গে এই স্নেহময়ী নারীর এমন একটি সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল, যাহাও পরিত্যাগ করিবার নহে। সুতরাং কন্যার মৃত্যুর আশঙ্কার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে হারাইবার আশঙ্কাও তাহার নারীহৃদয়কে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। রেবতী বলিল, 'হারাণ যে মোর মউর চড়া কাত্তিক, মুই হারাণের রূপ ভোল্‌বো ক্যামন করো'। বাঙ্গালীর পরিবার এমনই, যে দুইদিন আগেও সম্পূর্ণ অপরিচিত থাকে, সে একদিনেই আত্মীয় হইয়া উঠিয়া পরিবারের সকলের হৃদয় অধিকার করিয়া লয়। দুইদিন আগেও হারাণ যাহার কেহই ছিল না, আজ সে রেবতীর কতখানি আপনার হইয়া উঠিয়াছে, তাহা রেবতীর এই উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায়। বাংলার গৃহ ও পরিবার সম্পর্কে দীনবন্ধুর জ্ঞান যে কত গভীর ও বাস্তব ছিল, তাহা এখান হইতেও বুঝিতে পারা যাইবে। দীনবন্ধুর রচনার গুণে কৃষকের একটি পরিবার ও তাহার জীবনটি এখানে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, রেবতীর প্রাণস্পন্দনটুকু যেন এখানে পাঠকগণ শুনিতে পাইতেছেন।

মুমূর্ষু কন্যার মুখের দিকে তাকাইয়া রেবতী মর্মভেদী দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে বলিয়া উঠিল, 'নমীর আং বুঝি পোয়ালো, মোর সোনার পিত্তিমে জলে যায়, মোর উপায় হবে কি! মোরে মা বল্যে ডাক্‌বে কেডা, ই কত্তি নিয়ে এইলে (সাধুর গলা ধরিয়া ক্রন্দন)।' নবমীর রাত্রি প্রভাত হইবার যে কি বেদনা, তাহা যে বাঙ্গালী মাত্রই জানে। দীনবন্ধু রেবতীর অন্তরের গভীরতম বেদনার কথা প্রকাশ করিতে গিয়া যে নবমী রাত্রি প্রভাত হইবার কথাটি আনিয়াছিলেন, তাহাতে কন্যার আসন্ন বিচ্ছেদকাতরা এই কৃষক রমণীর ভিতর দিয়া

বাঙ্গালীর সার্বভৌম একটি বেদনাকে মূর্ত করিয়া তুলিয়াছেন। বিজয়া বাঙ্গালীর পরিবারের কন্যাকে শ্বশুর বাড়ীতে পাঠাইবার করুণ অনুষ্ঠান। সেইজন্য কন্যার আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় রেবতীর মনে বিজয়ার বেদনার কথাই স্মরণ হইয়াছে। করুণ রসের অভিব্যক্তিতে রেবতীর এই উক্তিটির তুলনা নাই।

তারপর সর্বশেষে ক্ষেত্রমণির যখন মৃত্যু হইল এবং তাহার দেহ বাহিরে লইয়া আসা হইল, তখন রেবতীর হৃদয় হইতে সর্বসংস্কারমুক্ত এক আদিম জননীর হাহাকার ধ্বনিত হইয়া উঠিল। রেবতী বলিল, 'মুই সোনার নক্কি ভেসয়ে দিতে পার্‌বো না মা রে, মুই কনে যাব রে—সাহেবের সঙ্গি থাকা যে মোর ছিল ভাল মা রে, মুই মুখ দেখে জুড়োতাম মা রে···'। সমাজ, নীতি, ধর্ম নিয়ম ইত্যাদি মানুষ নিজের সুখ সুবিধার জন্য গড়িয়াছে, সেইজন্য এক দেশের সমাজের যাহা নীতি, অন্য দেশের সমাজের হয়ত তাহা দুর্নীতি, এক সমাজের যাহা ধর্ম, অন্য সমাজের তাহা অধর্ম। কিন্তু সব কিছুর অন্তরালে একটি শাশ্বত মানুষের মন আছে, বহিরায়ত্ত অভ্যাস ও আচরণ দ্বারা তাহা প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেও জীবনের এক একটি পরম মুহূর্তে তাহাই সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। সন্তান জননীর আত্মজা, সন্তানের মধ্যে জনক-জননী অমরত্ব লাভ করে, সুতরাং সন্তান যে ভাবেই হউক বাঁচিয়া থাকুক, ইহা তাহাদের একটি জৈব কামনা। সেইজন্য সন্তানের মৃত্যুশোক মানুষ সহ্য করিতে পারে না। এখানে রেবতী সেই আদিম জননীর জৈব বৃত্তির বশীভূত হইয়া একটি অতি অশাস্ত্রীয় কথা উচ্চারণ করিয়াছে, সে বলিতেছে যে, ক্ষেত্রমণির এই ভাবে মৃত্যুবরণ করা অপেক্ষা সাহেবের সঙ্গে বাস করাই ভাল ছিল। এখানে রেবতী যে বলে নাই, নারীধর্ম রক্ষা করিয়া আমার কন্যা অক্ষয় স্বর্গে গিয়াছে, বরং তাহার পরিবর্তে নিতান্ত অসামাজিক একটি বিষয়ের কল্পনা করিয়াও সন্তানকে জীবিত দেখিতে চাহিয়াছে, তাহাতে এক সরলা কৃষক রমণীর ভিতর দিয়া জীবনের এক সুমহান্ সত্য প্রকাশ পাইয়াছে। দীনবন্ধুর দৃষ্টি যে জীবনের কোন্ স্তরে বিচরণ করিত, ইহা হইতে তাহাই দেখা যাইবে।

এইবার সরলতার মৃত্যুদৃশ্যটি আলোচনা করিয়া দেখা যাক্। পঞ্চম অঙ্ক চতুর্থ গর্ভাঙ্কে সরলতার মৃত্যু বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে দেখা যাইতেছে, আকস্মিক পুত্রশোকের আঘাতে সাবিত্রী উন্মাদিনী হইয়া গিয়া মৃত নবীনমাধবকে নিজের সদ্য প্রসূত শিশুসন্তান এবং সরলতাকে বিবি বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। সাবিত্রী আকস্মিক শোকের আঘাতে উন্মাদিনী হইয়াছেন, ইহা কিছুই

অস্বাভাবিক নহে এবং উন্মাদের আচরণ সাহিত্যিক বিশ্লেষণ সাপেক্ষও নহে; কিন্তু এই দৃশ্যে সরলতার আচরণই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার যোগ্য। ইহার অস্বাভাবিকতা নাটকের একটি অঙ্কে এই উল্লেখযোগ্য দৃশ্যটিকেও যে কি ভাবে কৃত্রিম করিয়া তুলিয়াছে, তাহাই এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই দৃশ্যে সরলতা নবীনমাধবের মৃতদেহের নিকট গিয়া বলিতেছে, 'আহা, এমন দেশবিজয়ী জীবনাধিক সহোদর-বিচ্ছেদে প্রাণনাথের প্রাণ থাকিবে না (ক্রন্দন)।' এই ভাষার কৃত্রিমতা ও আড়ষ্টতার কথা বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন হয় না। শোক যেখানে সহজাত, সেখানে ভাষা এত কৃত্রিম হইতে পারে না, তাহা হইলে শোকই কৃত্রিম বলিয়া বোধ হয়। নবীনমাধবের মৃত্যুতে এই পরিবারের মধ্যে যে শোকের উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হইবার কথা, তাহা এই পরিবারের উচ্চশ্রেণীর চরিত্রগুলির কৃত্রিম আচরণে সম্পূর্ণ ব্যাহত হইয়াছে। তারপর সরলতার ক্রন্দনের বিষয়ই যদি বিচার করা যায়, তাহা হইলেও দেখা যায় যে বন্ধনীর মধ্যে ক্রন্দনের কথা লিখিয়া দিলেই নাটকীয় চরিত্রের ক্রন্দন প্রকাশ পায় না, ক্রন্দনের নিজস্ব ভাষা আছে, সেই ভাষা যথাযথ ব্যবহার করিতে পারিলে বন্ধনীর মধ্যে অভিনয় ক্রিয়ার কোন নির্দেশ না দিলেও চলিতে পারে। দীনবন্ধু এখানে সে পথ অনুসরণ করেন নাই। সেইজন্য সরলতার ক্রন্দনও এখানে কৃত্রিম হইয়া উঠিয়াছে। তারপর সরলতা আরও বলিতেছে, 'আহা! আমার শ্বশুর শাশুড়ীর এমন স্বর্ণ ষড়ানন জলের মধ্যে গেল।' প্রত্যেক ভাষার মত বাংলা ভাষায়ও কতকগুলি বিশেষার্থক শব্দগুচ্ছ (idiom) আছে, ইহারা যে রূপে প্রচলিত, তাহা পরিবর্তিত করিয়া অন্য রূপের ভিতর দিয়া ইহাদিগকে গ্রহণ করিলে তাহাদের অর্থই যে যথাযথ প্রকাশ পায় না, তাহাই নহে—ইহাদের প্রয়োগের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। সোনার কার্তিক, কিংবা ময়ুর চড়া কার্তিক কথাই বাংলা ভাষায় বিশেষার্থক শব্দগুচ্ছ (idiom); ইহাকে স্বর্ণ ষড়ানন রূপে পরিবর্তিত করিলে ইহাদ্বারা কোন অর্থই প্রকাশ পায় না। দীনবন্ধু সরলতা ক্ষেত্রে এই ভুলটি করিয়া তাহার চরিত্রটিকেই কৃত্রিম করিয়া তুলিয়াছেন। তারপর সর্বশেষে কি ভাবে সরলতার মৃত্যু হইল, সে কথাও বলিতে হয়। দেখা যাইতেছে, উন্মাদিনী সাবিত্রী 'তুই হস্তে সরলতার গলা টিপে ধরিয়া ভূমিতে ফেলিয়া দিল', তারপর 'গলায় পা দিয়া দণ্ডায়মান' হইল। তারপর 'গলার উপর নৃত্য' করিয়া সরলতার মৃত্যু ঘটাইল। সন্তানের মৃত্যুকালে রেবতীর মর্মভেদী আর্তনাদের ভিতর দিয়া যেমন আদি জননীর সর্বসংস্কারমুক্ত একটি শাশ্বত জৈব বৃত্তির অভিব্যক্তি

হইয়াছিল, এখানে তাহাই অস্বীকৃত হইয়াছে। কারণ, আত্মরক্ষা মানুষের প্রাথমিক জৈব বৃত্তি, ইহার শক্তি মানুষ ও পশুপক্ষীর জীবনে সর্বাপেক্ষা প্রবল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এখানে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে-ভাবে এখানে সরলতা মৃত্যু বরণ করিয়াছে, তাহার মধ্যে তাহার আত্মরক্ষার কোন প্রয়াস দেখা যায় নাই। সে উন্মাদিনী শাশুড়ীর পায়ের কাছে গলাটি স্থির করিয়া পাতিয়া রাখিয়াছে, দুই পায় শাশুড়ী যখন তাহার উপর নৃত্য করিতেছে, তখনও সে কেবলমাত্র 'গ্যা, আ, আ, আ'—রুদ্ধ কণ্ঠে এই মাত্র উচ্চারণ করিয়া অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে, দুইখানি হাত বাড়াইয়া তাহাতে বিন্দুমাত্র বাধা দিয়াও আত্মরক্ষা করে নাই; সুতরাং ইহা তাহারও আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। দীনবন্ধু যদি মনে করিয়া থাকেন, যে সরলতাকে বসুপরিবারের আদর্শ বধূরূপে চিত্রিত করিয়াছেন, সে কি কখনো শাশুড়ীর ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে? এমন কি, শাশুড়ী তাহাকে হত্যা করিতে চাহিলেও সে স্বহস্তে নিজের মৃত্যুর উপায় করিয়া দিবে, তাহা হইলে দীনবন্ধু যে কত বড় ভুল করিয়াছেন, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। বিশেষতঃ শাশুড়ী যে এখানে উন্মাদিনী, তাহাও তাহার পক্ষে বুঝিয়া না দেখিবার কি কারণ ছিল? সুতরাং সরলতার মৃত্যু দৃশ্যটি যে নানাভাবে কৃত্রিম হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে।

ইংরেজি **melo-drama** অর্থে রবীন্দ্রনাথ 'অতি-নাটক' কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন, বর্তমান আলোচনাতেও শব্দটি এই অর্থেই ব্যবহার করা যাইতে পারে। সহজ কথায় যে নাটকের মধ্যে বাহ্য ঘটনা প্রাধান্য লাভ করে, তাহাকেই অতি-নাটক বলা হইয়া থাকে। রোমাঞ্চকর ঘটনার বাহুল্য থাকিলেই যে তাহা অতি-নাটক হয়, তাহা নহে—ঘটনারাশি যদি কাহিনীর অনিবার্য পরিণতি রূপে সংঘটিত হয়, তবে সেই ঘটনা যতই রোমাঞ্চকর হউক না কেন, তাহা দ্বারা অতি-নাটক সৃষ্টি না হইয়া যথার্থ নাটকই সৃষ্টি হইবে। সেক্সপীয়রের নাটকগুলি রোমাঞ্চকর ঘটনায় পরিপূর্ণ হইয়াও উচ্চাঙ্গ নাটক রূপেই রসোত্তীর্ণ হইয়াছে, একখানিও অতি-নাটকের নিম্নস্তরে নামিয়া আসে নাই। ইংরেজী সমালোচক বলিয়াছেন, '**while the author frankly allows action to predominate over dialogue**' সেখানেই অতিনাটকের সৃষ্টি হয়। কেহ কেহ আবার মনে করিয়াছেন, ট্রাজিডি রচনা ব্যর্থ হইলেই মেলো-ড্রামা সৃষ্টি হইয়া থাকে; কিন্তু এ কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না; কারণ, বাহ্য

ঘটনার বাহুল্য অতি-নাটকের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ; ট্রাজিডি যে একান্ত বাহ্য ঘটনা-নির্ভর তাহা নহে, কেবলমাত্র মানসিক দ্বন্দ্ব সংঘাতের উপরও আধুনিক কালে সার্থক ট্রাজিডি রচিত হইয়া থাকে, কিন্তু একান্ত মানসিক দ্বন্দ্বভিত্তিক ট্রাজিডির ব্যর্থতা হইতে অতি-নাটকের সৃষ্টি হয় না। কারণ, অতি-নাটকের মধ্যে বহির্মুখী ঘটনারাশি প্রধান স্থান গ্রহণ করিয়া থাকে।

'নীল-দর্পণে'র কাহিনী বিশ্লেষণ করিলে ইহার মধ্যে বাহ্য ঘটনা যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। এই ঘটনারাশি কাহিনীর ধারা অনুসরণ করিয়া ইহার অনিবার্য পরিণতিরূপে সংঘটিত হইয়াছে কি না, তাহা বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে। যদি তাহা না হইয়া ঘটনাগুলি আকস্মিক এবং পূর্বাপর ঘটনার সম্পর্কহীন বলিয়া মনে হয়, তবেই ইহা অতি-নাটক বলিয়া গণ্য হইবে।

'নীল-দর্পণ' কাহিনীর একটি প্রধান ত্রুটি এই যে, ইহার একটি মাত্র কাহিনী এক অখণ্ড ঐক্য রক্ষা করিয়া পরিণতির পথে অগ্রসর হইতে পারে নাই। ইহার প্রত্যেকটি ঘটনা পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে সংযুক্ত হইয়া ক্রমবিকাশ লাভ করে নাই। সেইজন্য ঘটনাগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে। কেবলমাত্র এই কারণেই 'নীল-দর্পণ'কে কোন কোন সমালোচক নাটক না বলিয়া 'নাট্যচিত্র' মাত্র বলিবার পক্ষপাতী। ঘটনার একটি অখণ্ড প্রবাহ এই নাটকের মধ্যে নাই। যেখানে কাহিনীর একটি অখণ্ড প্রবাহের অভাব, সেখানেই ঘটনা আকস্মিক ও পূর্বাপর সম্পর্কহীন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। এই নাটকের মধ্যে তাহাই হইয়াছে।

এই শ্রেণীর প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা জেল হাজতে উদ্বন্ধনে গোলোকচন্দ্র বসুর আত্মহত্যা। গোলোক বসুর আত্মহত্যা কাহিনীর সুদীর্ঘ ধারা অনুসরণ করিয়া ইহার অনিবার্য-পরিণতি রূপে সংঘটিত হয় নাই; সেইজন্য ইহার আকস্মিকতা দর্শকদিগকে আঘাত করে। সেক্সপীয়রের নাটকেও একাধিক আত্মহত্যার চিত্র আছে, কিন্তু সেই সকল আত্মহত্যার ঘটনা এক দিকে যেমন নাটকীয় চরিত্রের স্বাভাবিক আচরণ বলিয়া বোধ হয়, তেমনই কাহিনীর ধারা অনুসরণ করিয়া সংঘটিত হইয়াছে বলিয়াও মনে হয়; কিন্তু গোলোকচন্দ্র সম্পর্কে এই কথা বলিতে পারা যায় না। সেক্সপীয়রের যে সকল নাটকীয় চরিত্র আত্মহত্যা করিয়াছে, তাহাদের আচরণের মধ্যেই প্রথম হইতে সেই সম্পর্কিত প্রবণতার নির্দেশ করা হইয়াছে। সেইজন্য গোলোকচন্দ্রের মত ধীর স্থির ও

ধর্মভীরু ব্যক্তি যখন এই আচরণ প্রকাশ করেন, তখন তাহা আকস্মিক বলিয়া বোধ হওয়া স্বাভাবিক। তাঁহার চরিত্র সম্পর্কে পাঠকের মনে যে বিশ্বাস ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে, ইহা দ্বারা তাহাতে নির্মম আঘাত লাগে। দীনবন্ধু নীলকরদিগের প্রতি একান্ত আক্রোশ বশতঃ তাহাদের অত্যাচারের ভয়াবহ স্বরূপ দেখাইতে গিয়া এই চিত্রের আশ্রয় লইয়াছেন। ইহা তাঁহার সুগভীর জীবনবোধ হইতে সৃষ্টি হয় নাই, সেইজন্য গোলোক বসু তাঁহার এই অস্বাভাবিক আচরণ দ্বারা যেমন দর্শকের সহানুভূতি-বঞ্চিত হন, নাটকও সেই পরিমাণে রসসৃষ্টি করিতে ব্যর্থ হয়।

তারপর নবীনমাধবের মৃত্যুর বিষয় আলোচনা করিলেও দেখা যায়, ইহাতে তাঁহারও একটি আকস্মিক উত্তেজনা-জাত কর্মের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম প্রকাশ পাইয়াছে—এই আচরণের মধ্যেও নবীনমাধবের চরিত্রের পূর্বাপর সম্পর্ক নাই। নবীনমাধবও ধীর ও স্থিরপ্রজ্ঞ ব্যক্তি, সাহেবের বহু অন্যায় তিনি সহ্য করিয়াছেন, কেবলমাত্র আইনের আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে তিনি তাহাদের প্রতিকারে বিশ্বাসী নহেন। তিনি 'কাঁদিতে কাঁদিতে' ৫০ টাকা সেলামি দিয়া 'গোরিব পিতৃহীন প্রজার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া শ্রাদ্ধের নিয়মভঙ্গ দিন পর্যন্ত বুনন রহিত' করিতে সাহেবের নিকট 'ভিক্ষা' প্রার্থনা করেন। এই অবস্থায় সহসা সাহেবের মুখ হইতে একটি অপমানকর কথা শুনিয়া তিনি ক্রোধে আত্মহারা হইয়া গিয়া পরিণাম চিন্তা না করিয়াই শূন্য হস্তে সাহেবকে আক্রমণ করিলেন—ইহার ফলেই তাহার মৃত্যু হইল। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুও আত্মহত্যারই মত আকস্মিক মানসিক বুদ্ধিভ্রংশেরই ফল। ইহাও কাহিনীর অনিবার্য পরিণতি ক্রমে সম্ভব হয় নাই। সুতরাং এই ঘটনাও অতি-নাট্যিক লক্ষণাক্রান্ত।

ক্ষেত্রমণির মৃত্যু বর্ণনার স্বাভাবিকতার গুণে সার্থক করুণ রস সৃষ্টি করিয়াছে সত্য, কিন্তু কাহিনীর মধ্যে ইহার যথার্থ স্থান বিচার করিলে দেখা যায়, ইহাও মূল নাটকের মধ্যে বিস্তৃত অংশ অধিকার করিতে না পারিয়া একটি মাত্র বিচ্ছিন্ন ঘটনা হইয়া রহিয়াছে, মূল নাট্যকাহিনীর ধারায় ইহা অন্তর্নিবিষ্ট হইতে পারে নাই। গোলোকচন্দ্রের পরিবারকে লইয়াই নাট্যকাহিনীর মূল ধারা সৃষ্টি হইয়াছে, ক্ষেত্রমণিকে অপহরণ এবং তাহার মৃত্যু সেই মূল কাহিনীর অপরিহার্য অঙ্গ রূপে নাটকের মধ্যে সংঘটিত হয় নাই, একটি স্বাধীন ঘটনা হিসাবেই সংঘটিত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু ক্ষেত্রমণির কাহিনী একটি পূর্ণাঙ্গ বিয়োগান্তক

নাটকের বিষয়, এই নাটকের মধ্যে তাহা সেই স্থান অধিকার না করিয়া মূল কাহিনীর পার্শ্বকাহিনী রূপে ইহা প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র। তাহার ফলে ইহার বিয়োগান্তক পরিণতির অতি-নাট্যিক ত্রুটি কিছুতেই দূর হইতে পারে নাই।

ইহার পর সরলতার মৃত্যু ; ইহা যেমন আকস্মিক তেমনই অস্বাভাবিক—ইহার জন্যই কাহিনীর করুণ রসের প্রবাহ সর্বাপেক্ষা ব্যাহত হইয়াছে। সরলতার মৃত্যু অনুসরণ করিয়াই সাবিত্রীরও মৃত্যু সংঘটিত হইল, ইহারও আকস্মিকতা পাঠককে সহজেই আঘাত করে। পুনঃ পুনঃ সংঘটিত এই সকল মৃত্যুর ঘটনা কাহিনীর মধ্যে একটি ভয়াবহ পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে এবং ইহার বিয়োগান্তক পরিণতির মধ্যে করুণ রস নিবিড় করিয়া তুলিবার অবকাশ দেয় নাই। সুতরাং ইহার মধ্যে অতি-নাট্যিক লক্ষণই প্রকট হইয়া রহিয়াছে।

'নীল-দর্পণ' নাটকের মধ্যে নীলকরের অত্যাচার ও তাহার প্রতিক্রিয়ার চিত্রগুলি পর পর যে ভাবে পরিবেশন করা হইয়াছে, তাহাতে এই নাটককে কতকগুলি পরস্পর শিথিলবদ্ধ চিত্র হিসাবে গণ্য করা যায় কি না, তাহাও বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে। প্রধানতঃ দুইটি পারিবারিক জীবন অবলম্বন করিয়া নাটকের কাহিনী রূপলাভ করিয়াছে সত্য, কিন্তু এই কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, এই দুইটি পরিবারের উপর কেবল মাত্র নীলকরের অত্যাচারের দিকটি এই কাহিনীতে প্রকাশ পাইয়াছে। নীলকরের সঙ্গে সম্পর্ক নিরপেক্ষ পরিবার জীবনের কোন পরিচয় ইহাতে নাই। অর্থাৎ দুইটি পরিবারের শোচনীয় পরিণামের কথা এই নাটকে প্রকাশ পাইলেও ইহাদিগকে পারিবারিক নাটক বলা যায় না। কারণ, বহির্মুখী ঘটনার সংঘাতের ফলেই দুইটি পরিবার এখানে বিধ্বস্ত হইয়াছে, অন্তর্মুখী কোন সমস্যার জন্য নহে। দুইটি কাহিনীর মধ্যে অত্যাচারের ধারা স্বতন্ত্র পরিচয় লাভ করিয়াছে—গোলোক চন্দ্রের পরিবারে অত্যাচার এক রূপ লাভ করিয়াছে, সাধুচরণের পরিবারে তাহা অন্য রূপ লাভ করিয়াছে—ইহারা উভয়ে পরস্পর স্বতন্ত্র। গোলোকচন্দ্রের পরিবারেও এই অত্যাচার একটি অখণ্ড রূপ লাভ করে নাই ; বিগত বৎসরের টাকা পরিশোধ না করা, বর্তমান বৎসরের অধিক জমির জোর করিয়া দাদন দেওয়া, নবীনমাধবকে কটূক্তি করা, পুকুর পাড়ে নীল চাষ করা, মিথ্যা মোকদ্দমায় গোলোকচন্দ্রকে জড়িত করা, নবীন বসুকে অস্ত্রাঘাত করিয়া হত্যা করা প্রভৃতি ঘটনার মধ্যে যে কোন অখণ্ড যোগসূত্র আছে, তাহা

বলা যায় না। ইহারা নীলকরের অত্যাচারের বিভিন্ন রূপ মাত্র। অত্যাচারের বিভিন্ন পরিচয়গুলি প্রকাশ করিতে যে সকল চিত্র রচিত হইয়াছে, তাহা একটি অখণ্ড যোগসূত্রে গ্রথিত হইতে পারিলে নাটকরূপে ইহা রসোত্তীর্ণ হইতে পারিত; কিন্তু এখানে যে তাহা হয় নাই, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ক্ষেত্রমণির উপর নীলকরের অত্যাচারের বৃত্তান্ত যেমন কাহিনীর মূল ধারার সঙ্গে যুক্ত না হইয়া স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে, তেমনই গোলোক বসুর পরিবারের উপর নীলকরের অত্যাচারের চিত্রগুলিও পরস্পরের সঙ্গে কেবল মাত্র ক্ষীণতম যোগসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে—প্রত্যেকটিই এক একটি স্বাধীন চিত্র বলিয়া মনে হইতে পারে। এই শিথিলবদ্ধ চিত্রগুলির সমবায়ে এই নাটক রচিত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে নাট্যচিত্র বলাও অসমীচীন হয় না।

নাট্যকাহিনীর মধ্যে নায়ক ও নায়িকা চরিত্রের বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে। ইহারা কাহিনীর কেন্দ্র স্বরূপ এবং ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই কাহিনী বিকাশ লাভ করিয়া থাকে। যে নাটক ট্রাজিডি হয়, নায়কের জীবনের পরিণতির মধ্যে তাহার ট্রাজিক ভাব সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। নাট্যকার নায়ককে সহানুভূতি দিয়া সৃষ্টি করেন, সেই জন্য তাহার পতন বা জীবনের করুণ পরিণতি দর্শকের মনে স্বভাবতঃই করুণ রসের সৃষ্টি করে। নায়কের সঙ্গে নায়িকাও তাহার তুল্য প্রাধান্য লাভ করে এবং উভয়ের জীবনের পরিণতির মধ্যে নাটকের উদ্দিষ্ট রস ফুটিয়া উঠিবার অবকাশ পায়। এই প্রকার নায়ক বিবর্জিত নাটকের পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে যদিও একেবারে অভাব নাই, তথাপি এ কথা সত্য তাহাদের মধ্যে প্রায় একখানিও উচ্চাঙ্গের রচনা বলিয়া পরিচয় লাভ করিতে পারে নাই। 'নীল-দর্পণ' নাটকের নায়ক ও নায়িকার অংশ যাহারা গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা যথার্থ নায়ক কিংবা নায়িকার মর্যাদা লাভের অধিকারী কি না পাঠকবর্গের মনে এই প্রশ্নের উদয় হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক।

এই বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, নাট্যকার নবীনমাধবকেই যে নায়ক বলিয়া সুনির্দিষ্ট ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু কাহিনী বিন্যাসের ত্রুটির জন্য এই নাটকে কোন এক-নায়কত্বের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় নাই। 'নীল-দর্পণ' নাটকের চরিত্রগুলির দুইটি প্রধান ভাগ—প্রথমতঃ অত্যাচারী ও অত্যাচারিত। কিন্তু কোনও অত্যাচারীর চরিত্র কাহিনীর আদ্যোপান্ত অংশ অধিকার করিয়া নাই। অত্যাচারিতের মধ্যে একজনকেই কেন্দ্র করিয়া যে অত্যাচারের ধারা শেষ

পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, তাহা নহে। গোলোক বসুর একটি সমগ্র পরিবার এবং সাধুচরণেরও একটি সমগ্র পরিবার এখানে অত্যাচারিতের পরিচয় লাভ করিয়াছে। এমন কি, তুইটি পরিবারের উপর অত্যাচারের ধারা পরস্পর স্বাধীনভাবে কিছু দূর সমান্তরাল ভাবে অগ্রসর হইয়াছে। এই তুইটি ধারার মধ্যেই বিশেষ ব্যক্তি অপেক্ষা সামগ্রিক ভাবে তুইটি পরিবারই অত্যাচারিত বলিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে ; সেইজন্য ইহাদের মধ্যে এক-নায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত না হইয়া সামগ্রিক ভাবে এক একটি পরিবারই নায়কের স্থান অধিকার করিয়াছে বলিয়া মনে হইবে।

একমাত্র নবীনমাধব এই নাটকের নায়করূপে গণ্য হইবার আরও কয়েকটি বাধা আছে। নবীনমাধবের চরিত্র বাক্‌সর্বস্ব মাত্র, নাটকীয় আচরণের মধ্য দিয়া তাহার বিশেষ কোন গুণ প্রকাশ পাইতে পারে নাই ; সেইজন্য তাহার একটি সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্ব এই নাটকে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। নায়ক চরিত্রের যে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন, তাহা তাহার মধ্যে নাই ; বরং সেই ব্যক্তিত্ব অন্যান্য কোন কোন চরিত্রের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে, অথচ কাহিনীর মধ্যে তাহাদের সেই অনুযায়ী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সুতরাং তাহারাও নায়ক হইতে পারে না। নবীনমাধব অবস্থার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছে, অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নাই, সুতরাং নায়কচরিত্রের আরও একটি প্রধান গুণ তাহার নাই।

নায়ক সম্পর্কে যদিও নবীনমাধবের বিষয়ে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে, তথাপি এই নাটকে নায়িকা যে কেহ নাই, তাহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নবীনমাধবের স্ত্রী নায়িকা নহে, নাট্যকাহিনীর মধ্যে তাহার কোন সক্রিয় অংশ নাই ; গোলোক বসুর পরিবারের কোনও স্ত্রী-চরিত্র নায়িকার প্রাধান্য পায় নাই। সাধুচরণের পরিবারভুক্ত রেবতী ও ক্ষেত্রমণি চরিত্র নাটকে প্রাধান্য পাইয়াছে সত্য, কিন্তু ইহারা একটি শাখা কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত চরিত্র মাত্র, মূল কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত নহে। ক্ষেত্রমণির প্রসঙ্গ এই নাটকের একটি ঘটনামাত্র ; এমন কি, এই ঘটনা মূল কাহিনীর অন্তর্নিবিষ্টও নহে, কাহিনীর এক অংশ হইতে স্বাধীনভাবেই ইহার আবির্ভাব এবং নিজস্ব পথে ইহা স্বাধীনভাবেই পরিণতি লাভ করিয়াছে। রেবতীই হউক কিংবা ক্ষেত্রমণিই হউক, সমগ্র কাহিনী ব্যাপিয়া কেহই স্থান লাভ করে নাই। পদী ময়রাণী কাহিনীর একটি মাত্র অংশের করুণ পরিণতির জন্য দায়ী ; ইহাদের কেহই নায়িকা নহে।

স্ত্রী-চরিত্রগুলি প্রত্যেকেই নীলকরের অত্যাচারের জন্য দুঃখ ভোগ করিয়াছে, তবে সেই দুঃখের মাত্রা কাহারও উপর কিছু বেশী, কাহারও কিছু কম। চারিত্রিক বলিষ্ঠতায় এবং কাহিনীর প্রয়োজনীয়তার দিক হইতে যথার্থ নায়িকার প্রাধান্য ইহাতে কেহই লাভ করিতে পারে নাই। একটি গোষ্ঠীকে অবলম্বন করিয়াই এই নাটকে নীলকরের অত্যাচারের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা হইয়াছে, একান্তভাবে কোন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া তাহা করা হয় নাই। সেইজন্য ইহাতে যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা সামগ্রিক ঐকতান, ব্যক্তিবিশেষের একান্ত আত্মকেন্দ্রিক বেদনার অনুভূতি নহে।)

('নীল-দর্পণ' নাটকের কাহিনীর একটি প্রধান ত্রুটি এই যে, ইহা শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যচ্যুত হইয়াছে। একটি বৃহত্তর সামাজিক সমস্যা লইয়া কাহিনীটির সূত্রপাত হইয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইহা একটি পারিবারিক সমস্যার মধ্যে সীমায়িত হইয়া পড়িয়াছে;)বৃহত্তর সামাজিক কিংবা অর্থনৈতিক সমস্যাটি ইহার মধ্যে নিতান্ত গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। বাংলার কৃষকদিগের উপর নীলকরের অত্যাচারের বৃহত্তর একটি সমস্যা আলোচনা করিতে গিয়া নাট্যকার এখানে এক দিক দিয়া কৃষক-কন্যা ক্ষেত্রমণি ও অন্য দিক দিয়া গোলোক বসুর পরিবারস্থ কয়েকজনের জীবন-নাট্যের শোচনীয় পরিণামের কথা বর্ণনা করিয়াছেন।) এমন কি, এই বর্ণনার ধারার মধ্যেও নাট্যকার সঙ্গতি এবং স্বাভাবিকতা রক্ষা করিতে পারেন নাই। নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের মধ্যে গোলোকচন্দ্র এবং সাধুচরণের কথোপকথনের ভিতর দিয়া নাট্যকার যে ভাবে বিষয়টি উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহাতে ইহা যে কোনদিন এই দুইজনের পরিবারের অন্তঃপুর জীবনকে এমন বিষাক্ত করিয়া তুলিবে, তাহার কোন ইঙ্গিত প্রকাশ পায় নাই।) তাহাদের আলোচনার ভিতর দিয়া সমগ্র পল্লীর কৃষককুলের একটি সমসাময়িক সমস্যা লইয়াই আলোচনা হইয়াছিল, ইহা কোনদিন কাহারও, বিশেষতঃ কোন অন্তঃপুরচারিণীর একান্ত ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সমস্যা হইয়া উঠিবে, তাহা কদাচ মনে হয় নাই। (তারপর ক্রমে ক্রমে কাহিনীর পথে অগ্রসর হইতে দেখা যাইতে লাগিল যে, ইহা বৃহত্তর সমাজের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরের কয়েকটি নারীচরিত্রকে ব্যক্তিগতভাবে আশ্রয় করিয়াছে, ইহার সম্মুখ হইতে সমগ্র কৃষককুলের সেই বৃহত্তর সামাজিক সমস্যা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। ক্ষেত্রমণির ধর্ষণ দৃশ্যে উড সাহেবের যে স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা কেবল মাত্র নীলকরের সঙ্গে কৃষক কন্যার পরিচয় অপেক্ষা প্রবল

অত্যাচারীর সম্মুখে এক অসহায় দুর্বল মানবতার সম্পর্কিত পরিচয়টিই সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। তারপর সাবিত্রীর উন্মাদিনীর দৃশ্যে, কিংবা সরলতার মৃত্যু দৃশ্যে যে কৃষক জীবনকে সম্মুখে লইয়া দীনবন্ধু তাঁহার 'নীল-দর্পণ' রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। পুরুষের বহির্মুখী কর্মক্ষেত্রের একটি সমস্যা অসঙ্গত রূপে অন্তঃপুরচারিণী নারীর জীবন অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পাইল। কাহিনীর শেষাংশে অত্যাচারিত বৃহত্তর কৃষক সমাজ নাট্যকারের দৃষ্টি হইতে লুপ্ত হইয়া গেল এবং দুইটি পরিবারের কেবলমাত্র অন্তঃপুর হইতে মর্মভেদী হাহাকার শুনা যাইতে লাগিল।

বাংলার সমসাময়িক কৃষক সমাজের উপর নীলকরের অত্যাচারের স্বরূপ নির্দেশ করাই যে নাটকের উদ্দেশ্য ছিল, তাহা নাট্যকার ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন এবং নাটকের কাহিনী সেইভাবেই আরম্ভও হইয়াছে। কিছুদূর গিয়াই কাহিনী দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গিয়াছে—ক্ষেত্রমণির বিষয় অবলম্বন করিয়া ইহার একটি ধারা ও গোলোকচন্দ্রের পরিবার অবলম্বন করিয়া আর একটি ধারা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। ক্ষেত্রমণির মৃত্যু যদিও নীলকর রোগ সাহেবের অত্যাচারের প্রত্যক্ষ ফল, তথাপি রোগের সঙ্গে ক্ষেত্রমণির যে দৃশ্যটি নাট্যকার এই নাটকে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা রচনার গুণে সমসাময়িকতার পরিবেশ-মুক্ত হইয়া এক চিরন্তন জীবন-সত্যের প্রকাশক হইয়াছে। অর্থাৎ সেই দৃশ্যের মধ্যে রোগ কেবলমাত্র 'নীলকর' নহে, সমাজের মধ্যে চিরকাল ধরিয়া যে প্রবল দুর্বলের উপর অত্যাচার করিয়া আসিতেছে, তাহারই প্রতীক্ মাত্র। তাহার নীলকরের স্বরূপটি অপেক্ষা চিরকালের এক লালসামত্ত পুরুষের চরিত্রই এখানে সার্থকভাবে রূপায়িত হইয়াছে। অত্যাচারী পুরুষের এই বীভৎস লালসার ইন্ধন যোগাইতে গিয়া যুগে যুগে যত নারীর সর্বনাশ হইয়াছে, ক্ষেত্রমণি তাহাদেরই অন্যতমা। এখানে রোগ যেমন নীলকর মাত্রই নহে, ক্ষেত্রমণিও তেমনই স্বরপুর গ্রামের কৃষক সাধুচরণের কন্যা মাত্রই নহে। তারপর ক্ষেত্রমণির প্রসঙ্গটি অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গে এখানে চিত্রিত হইবার ফলে গোলোকচন্দ্রের পরিবার অবলম্বন করিয়া কাহিনীর যে মূল ধারা অগ্রসর হইতেছিল, তাহা এইখানেই আসিয়া নিতান্ত অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। রেবতী-ক্ষেত্রমণি-রাইচরণ এই সকল চরিত্রের রূপায়ণে দীনবন্ধুর যে একটি স্বাভাবিক প্রতিভার বিকাশ হইয়াছে; তাহাই অবলম্বন করিয়া ক্ষেত্রমণির কাহিনীটি রচিত হইবার ফলে ইহা গোলোকচন্দ্রের পারিবারিক কাহিনীর ধারা অপেক্ষা অধিকতর জীবন্ত

হইয়া উঠিয়াছে। গোলোকচন্দ্রের পরিবার নাট্যকারের মূল লক্ষ্য থাকিলেও দীনবন্ধুর বিশিষ্ট প্রতিভার গুণে এই নাটকের একটি অপ্রধান কাহিনী প্রাধান্য লাভ করিয়া গিয়াছে, সুতরাং কাহিনীর কেন্দ্রচ্যুতি এখানে অতি সহজেই অনুভব করা যায়।

তারপর নবীনমাধব নীলকর উড্ সাহেব কর্তৃক আহত হইবার পর হইতে এই কাহিনী কৃষকের সমাজ, কৃষিক্ষেত্র, নীলকরের গুদাম প্রভৃতি বহির্মুখী ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া দুইটি পরিবারের অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং কেবলমাত্র অন্তঃপুরচারিণী নারী চরিত্রকে আশ্রয় করিয়াই শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। —সেখানে কোন নীলকরও ছিল না, কিংবা নীল চাষীও ছিল না। সুতরাং যে পরিবেশের মধ্যে কাহিনীর সূত্রপাত, সেই পরিবেশের মধ্যে ইহার অবসান হয় নাই। নীলকর ও চাষীর সংঘর্ষের বিষয় সমাজ-জীবনের এক বহির্মুখী বিষয়, পুরুষে পুরুষে এই সংঘর্ষ; কিন্তু 'নীল-দর্পণে'র কাহিনীর বেশীর ভাগই অন্তঃপুরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, শেষ পর্যন্ত নারীই ইহার মধ্যে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছে, নাট্যকারের লক্ষ্য পুরুষের উপর হইতে গিয়া ক্রমে স্ত্রীচরিত্রের উপরই ন্যস্ত হইয়াছে, ইহাতে দুইটি পুরুষ ও তিনটি স্ত্রীচরিত্রের মৃত্যু হইয়াছে। কাহিনী নাট্যকারের লক্ষ্যচ্যুত হইয়াছে বলিয়াই পুরুষের বহির্মুখী জীবন হইতে নাট্যকার অন্তঃপুরের নারী সমাজের মধ্যে ইহা লইয়া গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। নারীর হাহাকারেই 'নীল-দর্পণ' নাটক শেষ পর্যন্ত পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

যে গোলোকচন্দ্রকে লইয়া কাহিনীর সূত্রপাত হইয়াছিল, দেখা যায়, সেই গোলোকচন্দ্রের উদ্বন্ধনে আকস্মিক মৃত্যুর পর ইহা যদৃচ্ছা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে; এক একটি দৃশ্যে এক একটি চরিত্র প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, মৃত্যুর ভিতর দিয়াই প্রত্যেকটির প্রাধান্য প্রকাশ পাইয়াছে। সেইজন্য শেষ দৃশ্যে প্রধান চরিত্রগুলির মৃত্যুর পর বিন্দুমাধবের বক্তৃতা ও কবিতা আবৃত্তির ভিতর দিয়া যখন এই নাটকের যবনিকাপাত হইল, তখন দেখা গেল, তাহার বহু পূর্বেই নাট্যকাহিনীর গতিশক্তি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

দীনবন্ধুর 'নীল-দর্পণ' নাটকে যে বিষয়-বস্তু অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহা একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকের পক্ষে কতদূর উপযোগী তাহাও বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, পূর্ণাঙ্গ নাটকের মূল কাহিনী সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে গিয়া নানা জটিল আবর্তের সৃষ্টি করে, নিতান্ত সহজ ও

সরল পথে পরিণতি পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে না। তাহার ফলে কাহিনী সম্পর্কে দর্শকের কৌতূহল এবং ঔৎসুক্য বৃদ্ধি পায়। 'নীল-দর্পণ' নাট্যকাহিনীর মধ্যে কোন জটিল আবর্ত সৃষ্টি করিবার প্রয়াস দেখা যায় না; নীলকরের অত্যাচার বর্ণনাই এই নাটকের উদ্দেশ্য, এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে গিয়া নাট্যকার কতকগুলি অত্যাচারের চিত্র পরিবেশন করিয়াছেন, এই চিত্রগুলির মধ্য দিয়া যে একটি সুদৃঢ় যোগসূত্রও স্থাপিত হইতে পারে নাই, তাহাও এই নাটকে অনুভূত হয়। ক্ষেত্রমণির প্রসঙ্গ দ্বারা মূল নাট্যকাহিনীর কোন জটিলতা সৃষ্টি হয় নাই, ইহা স্বাধীন ভাবেই সংঘটিত হইয়াছে; এমন কি, ইহার মধ্যেও কোন জটিলতা নাই। একটি মিথ্যা ফৌজদারী মোকদ্দমা ভিত্তি করিয়া একটি পরিবারের এবং একটি নারীর শ্লীলতা হানির চেষ্টা লইয়া আর একটি পরিবারের সর্বনাশ হইল, ইহাই এই নাটকের বক্তব্য বিষয়।

মানুষের জীবন ও তাহার চরিত্র যেমন জটিল, বিচিত্র অবস্থার সম্মুখীন হইয়া মানুষের মনে যে নব নব শক্তির বিকাশ হইয়া থাকে, জীবনের সুকঠিন সংগ্রাম-রত মানুষ জীবনের পথে পদে পদে অগ্রসর হইতে গিয়া যে ভাবে আত্মরক্ষার প্রয়াস পায়, এই নাটকে তাহাদের কিছু মাত্র পরিচয় নাই। নাটকের বস্তু যে কেবলমাত্র বহির্মুখীই হইয়া থাকে, তাহা নহে—অন্তর্মুখীও হয়। কিন্তু 'নীল-দর্পণ' নাটকের বস্তু বা উপকরণ কেবলমাত্র বহির্মুখী, তাহার কোনও অন্তর্মুখী পরিচয় প্রকাশ পায় নাই। নাট্যকাহিনীর যদি একটি অন্তর্মুখী পরিচয় থাকে, অর্থাৎ মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের উপর যদি নাট্যকাহিনীর ভিত্তি রচিত হয়, তবে ইহার বহির্মুখী বস্তু বা উপকরণ অল্প হইলেও চলে, কিন্তু যেখানে বহির্মুখী বিষয়ই একমাত্র অবলম্বন, সেখানে বস্তুর স্বল্পতা নাটকের ত্রুটিরই কারণ হয়। 'নীল-দর্পণ' নাটকেও এই ত্রুটি প্রকাশ পাইয়াছে। তবে নীলকরের অত্যাচারকে প্রত্যক্ষ করিয়া তোলা ছাড়া এই নাটকে নাট্যকারের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। ইহার রচনায় লেখকের পূর্ব রচিত কোন পরিকল্পনা ছিল না, কতকগুলি সত্য ঘটনা সামান্য কল্পনার স্পর্শে পল্লবিত করিয়া ইহাতে প্রকাশ করা হইয়াছে মাত্র। মানব জীবনের মর্মমূলে সুগভীর সত্যসন্ধানী দৃষ্টি বিস্তার করিয়া নাট্যকার এখানে শাশ্বত জীবন রস আহরণ করিতে যান নাই, কেবলমাত্র সাময়িক একটি বিপর্যয়ের উপরই তাঁহার দৃষ্টি এখানে সীমাবদ্ধ হইয়াছিল, তবে নাট্যকারের সৃজনী প্রতিভার গুণে দুই একটি চরিত্র ইহাতে আকস্মিক জীবন-

দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিলেও, তাহাদের সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ পরিচয় এই নাটকে নাই।

দীনবন্ধুর পরলোক গমনের অল্পদিনের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সম্বন্ধে যে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা এখনও তাঁহার সম্পর্কিত সকল আলোচনার ভিত্তিরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সম্পর্কে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা প্রধানত এই—

প্রথমত তিনি বলিয়াছেন, 'ঈশ্বর গুপ্ত খাঁটি বাঙ্গালী, মধুসূদন ডাহা ইংরাজ। দীনবন্ধু ইঁহাদের সন্ধিস্থল।' এই উক্তিটি একটু আলোচনা সাপেক্ষ। খাঁটি বাঙ্গালী বলিতে যদি আমরা মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্রকে বুঝি, তবে ঈশ্বর গুপ্ত যে সেই স্তরের নহেন, সকলেই তাহা জানেন। 'খাঁটি বাঙ্গালী' হওয়া সত্ত্বেও ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে উনবিংশতি শতাব্দীর বাঙ্গালীর সাহিত্য সাধনার নবযুগের প্রেরণা সক্রিয় ছিল, সেইজন্য বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও তাঁহাকে অন্যত্র 'যুগসন্ধিক্ষণের কবি' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে দীনবন্ধুকে যে বঙ্কিমচন্দ্র নূতন ও পুরাতন যুগের 'সন্ধিস্থল' বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য কি? যদি 'নীল-দর্পণে'র কথাই বিচার করি, তাহা হইলেও দেখিতে পাই, তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে নাটকের ভিতর দিয়া যে রস পরিবেশন করিয়াছেন, তাহার বহির্মুখী কোনও দেশীয় অবলম্বন নাই—ইহা বিয়োগান্তক নাটক, ইহা ইংরেজি-সাহিত্যের অনুকরণজাত। তবে ইহার জীবন-দৃষ্টির মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা বাহিরের দিক হইতে পাশ্চাত্ত্য প্রেরণা-জাত বলিয়া মনে হইলেও একান্তভাবে বাঙ্গালীর নিজস্ব। তিনি ইহার রচনায় সংস্কৃত নাটক, কিংবা বাংলাদেশের যাত্রার কোন প্রভাব অনুভব করেন নাই সত্য, তথাপি 'নীল-দর্পণে' তদানীন্তন বাঙ্গালীর জীবন উপজীব্য হইয়াছে এবং ইহার বহিরঙ্গগতই হউক, কিংবা অন্তর্মুখীই হউক, কোন পরিচয়ের মধ্যেই একান্ত বাঙ্গালীত্ব ব্যতীত আর কিছুই নাই। তবে কেবলমাত্র 'নীল-দর্পণ' নাটক বিচার করিয়া দীনবন্ধুকে যুগ-সন্ধিস্থলের লেখক বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে না। হিন্দু কলেজের শিক্ষা, পাশ্চাত্ত্য নাটকের প্রভাব ও পাশ্চাত্ত্য জীবন-বোধের প্রেরণা-জাত দৃষ্টিভঙ্গি হইতেই তিনি তাঁহার 'নীল-দর্পণ' রচনা করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে বাঙ্গালীর জীবন-কথা যে এতখানি বাস্তব পরিচয় লাভ করিয়াছে, তাহার কারণ, তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একান্ত পাশ্চাত্ত্য জীবনদর্শনই সক্রিয় ছিল না, ইহা বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না—ইহা যে মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্রের পথ অনুসরণ করিয়া উনবিংশ

শতাব্দীতে বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহা অত্যন্ত স্পষ্ট। এই অর্থে দীনবন্ধুকে ষোলআনি খাঁটি বাঙ্গালী বলিয়া নির্দেশ করা যায়, যুগ-সন্ধির লেখক বলা তত সার্থক হয় না।

দ্বিতীয়ত বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, 'যাহা সূক্ষ্ম, কোমল, মধুর, অকৃত্রিম, করুণ, প্রশান্ত—সে সকলে দীনবন্ধুর তেমন অধিকার ছিল না। কিন্তু যাহা স্থূল, অসঙ্গত, অসংলগ্ন, বিপর্যস্ত তাহা তাঁহার ইঙ্গিত মাত্রেরও অধীন। ওঝার ডাকে ভূতের দলের মত স্মরণ মাত্র সারি দিয়া আসিয়া দাঁড়ায়।' কিন্তু 'নীল-দর্পণ' নাটক গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে মনে হইতে পারে যে, যদিও তিনি জীবনের বহির্মুখী বিক্ষোভকে আশ্রয় করিয়া ইহা রচনা করিয়াছেন, তথাপি কয়েকটি দৃশ্যে করুণ রসের যেমন সার্থক অভিব্যক্তি হইয়াছে, তেমনই সূক্ষ্ম শিল্প-চেতনতারও পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। ক্ষেত্রমণির মৃত্যুতে জননী রেবতীর আর্তির মধ্যে যে সহজ করুণ রসের অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহা কি অস্বীকার করা যায়? 'নমীর আৎ বুঝি পোয়ালো, আমার সোনার পিত্তিমে জলে যায়, আমার উপায় হবে কি!' এই উক্তির মধ্য দিয়া সন্তান-শোকাতুরা জননীর যে বেদনা স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সুনিবিড় করুণ রসে আর্দ্র। ইহা 'স্থূল' 'অসঙ্গত' কিংবা 'বিপর্যস্ত' নহে। তারপর 'নীল-দর্পণ' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কটির একটি সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনার কথা অন্যত্র যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা এখানেও উদ্ধৃত করিতে পারি। 'দৃশ্যটি স্বরপুর—তেমাথার পথ। পদী ময়রাণীর প্রবেশ। পদী ময়রাণী কুৎসিত চরিত্রা বিগত যৌবনা এক গ্রাম্য রমণী। রোগ সাহেবের কামনার ইন্ধন যোগাইতে সে বহু কুলবালার সর্বনাশ করিয়াছে। সে দৃশ্যে আবির্ভূত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঘৃণায় দর্শকের মন সঙ্কুচিত হইয়া আসিয়াছে। স্বগতোক্তিতে সে ক্ষেত্রমণি সম্পর্কে রোগ সাহেবের মন্দ অভিপ্রায়ের কথা ব্যক্ত করিল। সদ্য-পতিগৃহ-প্রত্যাগতা অন্তঃসত্বা ক্ষেত্রমণির যে লাজমধুর চিত্রটি আমরা পূর্বে দেখিতে পাইয়াছি, তাহাতে তাহার এই আসন্ন অকল্যাণের আশঙ্কায় দর্শক মাত্রেরই হৃদয় অধীর হইবে। এমন সময় এক কৃষকের কণ্ঠে নেপথ্য হইতে সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া গেল,

যখন ক্ষ্যাতে ক্ষ্যাতে বসে ধান কাটি।
মোর মনে জাগে ও তার নয়ান দুটি॥

মধ্যাহ্ন রৌদ্রে কর্মরত কৃষক তাহার সুমধুর দাম্পত্য জীবনের সুখস্মৃতিতে আচ্ছন্ন। তখনও সর্বনাশী পদী ময়রাণী তাহার অভিশপ্ত সঙ্কল্প লইয়া দর্শকের

সম্মুখে দাঁড়াইয়া। ইহাদের মধ্যে একটি নাট্যিক বৈপরীত্য বা পরস্পর-বিরোধী ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে—একটি ভাব নেপথ্যাগত সঙ্গীতের মধ্যে দিয়া আসিয়া দর্শকের সম্মুখস্থ ঘৃণিত চরিত্র ময়রাণীর পাপ-সঙ্কল্পের দ্বিতীয় ভাবটির সঙ্গে সংঘাতের সৃষ্টি করিয়াছে। হয়ত কেহ বলিবেন, দাম্পত্য-প্রণয়-তৃপ্ত যে কৃষকের নেপথ্য সঙ্গীত আমরা শুনিতে পাইলাম, তাহা হতভাগিনী ক্ষেত্রমণির পতিকণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীতের রূপক হিসাবেই নাট্যকার এখানে ব্যবহার করিয়াছেন'। ('বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ২২৫)। সুতরাং যাহা সূক্ষ্ম তাহাতে দীনবন্ধুর অধিকার ছিল না, তাহা বলিতে পারা যায় না। 'নীল-দর্পণ' নাটক হইতেই এই প্রকার আরও দৃষ্টান্তের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। বাংলা সাহিত্যের আরও একজন সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের উপরি-উদ্ধৃত মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন,—

'অঙ্ক শ্রেণীর দৃশ্যকাব্যে করুণ রস স্থায়ী হইলেই কাব্য সার্থক হয়। সমগ্র নাটকখানি পড়িয়া উঠিবার পর যে, সেই ভাব পাঠকের মনে স্থায়ী হয়, এ কথা সাহস করিয়া বলিতে পারি।…সমষ্টিভাবে সমগ্র গ্রন্থে যে রস স্থায়ী, তাহা যে নাটকের প্রযুক্ত পাত্রে ফুটিয়া উঠে নাই, তাহা কিরূপে স্বীকার করিব? অত্যাচারীর নিষ্পেষণে নিরীহ গ্রামবাসীরা যেভাবে ধনে প্রাণে মারা যাইতেছে, বঙ্কিমবাবু তাহাও অতি প্রাকৃত চিত্র বলেন নাই; তবে কি কারণে বলিব যে, ঐ চিত্রগুলি করুণ রস রঞ্জিত তুলিকায় অঙ্কিত নহে?

সাবিত্রী ও সৈরিন্ধ্রীর নীরব আত্মত্যাগ ও পতিপুত্র সেবার যে ছবি পাই, তাহা কোমল মধুর অকৃত্রিম বলিয়াই বুঝি। গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সাবিত্রীর দুর্দশা ও সুকোমলা গৃহবধূ সরলতার দুঃখে যদি অতি কোমল অকৃত্রিম করুণ ভাব না থাকে, তবে বঙ্গসাহিত্যে উহা কোথায় আছে, জানিতে চাই।… চাষার মেয়ে ক্ষেত্রমণির সতীত্ব-মাহাত্ম্য যে "স্থূল" কথায় প্রকাশিত, তাহার মধ্যে কি অতি "সূক্ষ্ম" সৌন্দর্য নাই? গরীবের মেয়ের অতি কোমল মধুর, অকৃত্রিম ও প্রশান্ত পতিভক্তি যেখানে পদদলিত হইতেছে, সেখানকার করুণ রসে সিঞ্চিত হইলে, অত্যাচার-সংহারের জন্য মনে যে তেজ সংক্রামিত হয়, তাহাকে কোন রসের অভিব্যক্তি বলিব?' (বিজয়চন্দ্র মজুমদার)

'বাঙ্গালা সমাজ সম্পর্কে দীনবন্ধুর বহুদর্শিতা'র ফলে দীনবন্ধুর রচনায় একটি বিশেষ শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এ বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন, 'ক্ষেত্রমণির মত গ্রাম্য প্রদেশের ইতর লোকের কন্যা, আদুরীর মত গ্রাম্য

বর্ষীয়সী, তোরাপের মত গ্রাম্য প্রজা, নীলকুঠির দেওয়ান, আমীন, তাগাদ্‌গীরের মত লোকের নাড়ী নক্ষত্র তিনি জানিতেন। তাহারা কি করে, কি বলে, তাহা ঠিক জানিতেন। কলমের মুখে তাহা ঠিক বাহির করিতে পারিতেন—আর কোন বাঙ্গালী লেখক তেমন পারে নাই। তাঁহার আদুরীর মত অনেক আদুরী আমি দেখিয়াছি—তাহারা ঠিক আদুরী।' এই প্রকার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিতর হইতে দীনবন্ধু যে সকল চিত্র ও চরিত্র রূপায়িত করিয়াছেন, তাহা যেমন সার্থক হইয়াছে, একান্ত কল্পনা আশ্রয় করিয়া যে সকল চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা তেমন সার্থক হইতে পারে নাই। কারণ. বাস্তব জীবনানুভূতির মত তাঁহার কল্পনাশক্তি তত প্রবল ছিল না।

বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস (humor) সৃষ্টিতে দীনবন্ধু অপ্রতিদ্বন্দ্বী এই কথা বলিলে কিছুতেই অত্যুক্তি হয় না। একজন সমালোচক বলিয়াছেন, 'হাস্যরসই দীনবন্ধুর প্রতিভার মূল প্রেরণা।' আরও একজন সমালোচকের মতে, 'বাঙ্গালীর প্রকৃতি যেমন একদিকে ছিল গীতিপ্রাণ ও কল্পনাপ্রবণ, তেমনি অন্যদিকে ছিল দৈনন্দিন জীবন রসের রসিক। বাঙ্গালীর এই উৎকৃষ্ট রস-সন্ধানী মানস-ধর্মের মধ্যেই নিহিত ছিল তাঁহার খাঁটি বাঙ্গালীত্ব, যাহা তাঁহার নিজস্ব সংস্কার ও সংস্কৃতির যুগলব্ধ ফল। এই সহজ রসিকতাকেই দীনবন্ধু সাহিত্য-সৃষ্টিতে সার্থক করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাঁহার সহজাত রসদৃষ্টি ও নাট্যপ্রতিভার নূতন সামর্থ্যে।'

দীনবন্ধুর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস বলিতে যাহা ছিল, ইংরেজি সংজ্ঞা অনুযায়ী তাহাকে **humour** বলা যায় না, ইংরেজিতে তাহাকে **satire** এবং বাংলায় তাহাকে শ্লেষাত্মক রচনা বলা হয়। কিন্তু প্রকৃত হাস্যরস বা **humour**-এর উদ্দেশ্য তাহা নহে। কাহাকেও আঘাত না করিয়া যাহা দ্বারা নির্মল হাস্য উপভোগ করা যায়, তাহাই প্রকৃত **humour** বা হাস্যরস। বাংলা সাহিত্যে দীনবন্ধু এই শ্রেণীর হাস্যরসের যে কেবল প্রথম স্রষ্টা তাহা নহে, তিনি এখন পর্যন্তও এই বিষয়ে প্রধান স্রষ্টা। 'নীল-দর্পণ' সমাজ-জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং করুণ বিয়োগান্তক বিষয় লইয়া রচিত; সুতরাং ইহাতে হাস্যরসের প্রচুর অবকাশ ছিল না। কিন্তু দীনবন্ধু তাঁহার প্রতিভার এই একটি মৌলিক প্রেরণা ইহার মধ্যেও কিছুতেই গোপন রাখিতে পারেন নাই, তবে তাহা যে কোথাও অযৌক্তিক হইয়া উঠিয়াছে, তাহাও নহে। 'নীল-দর্পণ' নাট্যকাহিনীর নিরবচ্ছিন্ন ধারার মধ্যেও তিনি হাস্যরসের বিচিত্র অবকাশ রচনা করিয়াছেন। বর্ষীয়সী পরিচারিকা

আদুরীর অতৃপ্ত জীবন-তৃষ্ণার মধ্যে, নিরক্ষর প্রজাদিগের সরলতার মধ্যে, গ্রাম্য জীবনের সহজ ও স্বচ্ছন্দ নির্বুদ্ধিতার মধ্যে, ইংরেজ নীলকরের বাংলা ভাষা-জ্ঞানের মধ্যে তিনি এই নাটকে হাস্যরসের সন্ধান পাইয়াছেন।

দীনবন্ধুর হাস্যরসের একটি বিশিষ্ট প্রকৃতি ছিল। ইহা কাহাকেও প্রত্যক্ষভাবে আঘাত করিত না সত্য, তথাপি ইহার ভিতরে কোন কোন সময় এক একটি সুগভীর সত্য প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকিত। ক্ষেত্রমণি সম্পর্কে রোগ সাহেবের সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া আদুরী যখন বলে, 'থু, থু, থু! গোন্দো! প্যাজির গোন্দো!—সাহেবের কাছে কি মোরা যাতি পারি, গোন্দো থু থু—মুই তো আর একা বেরোব না, মুই সব সইতি পারি প্যাজির গোন্দো সইতি পারিনে—থু, থু, গোন্দো! প্যাজির গোন্দো!' তখন বাহির হইতে ইহার মধ্যে একটি অতি স্থূল গ্রাম্য হাস্যরসের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া বোধ হইলেও ইহার অন্তস্তলে আদুরীর জীবনের একটি সুগভীর বেদনা যে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে তাহা কিছুতেই গোপন থাকে না। সে যৌবনেই স্বামি-সৌভাগ্য-বঞ্চিত হইয়াছে, সে তাহার সেই বহুদিনের পূর্ববর্তী দাম্পত্য জীবনের স্মৃতি বিসর্জন দিয়া যে কোন আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যে জীবনের শান্তি লাভ করিয়াছে, তাহা নহে। সরলতার সঙ্গে কথোপকথনে এখনও সে স্মরণ করিয়াছে যে, 'মিন্সের মুখখানা মনে পড়্লি আজো মোর পরাণডা ডুকরে কাঁদে ওটে। মোরে বড্ডি ভাল বাস্তো। মোরে বাউ দিতি চেয়েলো।···মোরে ঘুমুতি দিত না, ঝিকিনি বল্তো, ও পরাণ ঘুমুলে।' ইহার মধ্যে এই বয়সে তাহার সেই অতৃপ্ত জীবন-তৃষ্ণা একটি নূতন পরিচয় প্রকাশ করিয়াছে। 'প্যাজির গোন্দো' সে জানে, এই 'গোন্দো' কোথায় থাকা সম্ভব সেই সম্পর্কেও তাহার জ্ঞানে কোন ভুল হয় নাই। এখনও সে আশঙ্কা করে যে, একা পাইলে তাহাকে সাহেবের লোক ধরিয়া লইয়া গিয়া দুঃসহ 'প্যাজির গোন্দো'র সম্মুখীন করিতে পারে এবং সেই আশঙ্কা তাহার দিক হইতে প্রকৃত বলিয়াই মনে করিয়া সে মনের মধ্যে এক অভিনব তৃপ্তি অনুভব করে। প্রৌঢ়ার জীবন-তৃষ্ণার এমন সার্থক রূপায়ণ বাংলা সাহিত্যে খুব সুলভ নহে।

দীনবন্ধুর হাস্যরসে প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জীবনের নিগূঢ়তম মর্মকথা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা কেবলমাত্র জীবনের উপরি স্তরে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে নাই। তাঁহার 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' প্রহসনেরও মূল ভাব ইহাই; তাহার বহিরঙ্গে যে হাস্যতরল পরিবেশটি আছে, তাহা বিদীর্ণ করিয়া একটি অতৃপ্ত

আত্মার ক্রন্দন এমনি ভাবে ভাসিয়া আসিয়াছে। কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার বলিয়াছেন, 'উৎকৃষ্ট হাস্যরসের মূলে একটা অতি উচ্চ রস-কল্পনা আছে। এই রূপ-রস-কল্পনায় মানুষের প্রতি বা সৃষ্টির প্রতি নির্মম ব্যঙ্গের ভাব নাই; কারণ, অতি ব্যাপক সহানুভূতিই এই হাস্যরসের নিদান। এই ভাব-দৃষ্টির দ্বারা মানুষকে দেখিতে পারিলে তাহার সর্ব অভিমান নিরর্থক বলিয়াই যেমন হাস্যকর হইয়া উঠে, তেমনই সেই হাসির অন্তরালে একটি সুগভীর সহানুভূতি প্রচ্ছন্ন থাকে—ঐ সহানুভূতি আছে বলিয়াই পরিহাসও রস হইয়া উঠে, হাস্যরস কবি-কল্পনায় অভিষিক্ত হয়।' দীনবন্ধুর হাস্যরস এই শ্রেণীর হাস্যরস, বাংলা সাহিত্যে এই বিষয়ে তিনি অদ্বিতীয়।

দীনবন্ধুর 'নীল-দর্পণ' নাটকে হাস্যরস সৃষ্টির প্রচুর অবকাশ ছিল না, তাঁহার এই বিষয়ক স্বাভাবিক প্রতিভাকে এই নাটকের রচনাকার্যে পদে পদে সংযত রাখিতে হইয়াছে। কিন্তু সংযমের মধ্য দিয়াই ইহার সৌন্দর্যও বিকাশ লাভ করিয়াছে। সহানুভূতির বিষয়ে অসংযম প্রকাশ করিবার ফলে দীনবন্ধুর নাটকের কোন কোন অংশ ত্রুটিপূর্ণ হইয়াছে, এই কথা সত্য; কিন্তু 'নীল-দর্পণ' নাটকে তাঁহার সহানুভূতিগুণ কোন কোন চরিত্রের মধ্যে অসংযত ভাবে প্রকাশ পাইলেও হাস্যরস কোন ক্ষেত্রেই অসংযত হইয়া কাহিনীর কোন অংশ কিংবা কোন চরিত্র-সৃষ্টিকে আঘাত করিতে পারে নাই। এই নাটকে বর্ষীয়সী পরিচারিকা আদুরীর অতৃপ্ত জীবন-তৃষ্ণার মধ্যে, গ্রাম্য রাইয়তদিগের সরলতা ও নিবুদ্ধিতার মধ্যে তিনি যে উৎকৃষ্ট হাস্যরসের সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা কাহিনী ও চরিত্রগুলির স্বাভাবিক ধারা, কিংবা জীবনসূত্র হইতেই সঙ্গতভাবে আসিয়াছে, কোন অসঙ্গত প্রাধান্য লাভ করে নাই। গ্রাম্য সরল বাঙ্গালী জীবনের সঙ্গে তাঁহার সুনিবিড় পরিচয়েরই ইহা প্রত্যক্ষ ফল, ইহা তাঁহার কল্পনাশ্রিত নহে। সেইজন্য ইহা এমন শক্তিশালী রচনা। 'নীল-দর্পণ' নাটকের শেষাংশে যেখানে কাহিনী দুর্বার গতিতে করুণ পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতেছে, সেখানে দীনবন্ধুর হাস্যরসধারাও স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। যাঁহার প্রতিভার মৌলিক প্রেরণা হাস্যরস সৃষ্টি হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে এই প্রয়াস যে কত দুঃসাধ্য, তাহা সহজেই অনুমেয়; তথাপি দীনবন্ধু এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন, তাহাতে বিফলমনোরথ হন নাই।

কাহিনীর বহির্মুখী কোন প্রয়োজনে অর্থাৎ নিছক স্থূল হাস্যরস সৃষ্টি করিবার জন্য ভাঁড় বা clown-এর মত চরিত্র আশ্রয় করিয়া দীনবন্ধু তাঁহার কোন

নাটকেই কোন চরিত্র সৃষ্টি করেন নাই, এমন কি তাঁহার প্রহসনগুলির মধ্যেও ইহা দেখা যায় না, বিশিষ্ট চরিত্রের স্বাভাবিক জীবনাচরণ সূত্রেই তাঁহার হাস্যরস সৃষ্টি হইয়াছে, তাঁহার সৃষ্ট হাস্যরস তাঁহার পরিকল্পিত চরিত্রগুলির জীবনরসেরই অন্তর্ভুক্ত, ইহা জীবনের অঙ্গীভূত। আদুরীর হাস্যরস তাহার জীবনরসের অন্তর্ভুক্ত, ইহা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আদুরীর কোন ব্যক্তিপরিচয় প্রকাশ পাইতে পারে না, পাঁচজন রাইয়ত সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। ইহাই দীনবন্ধুর হাস্যরসের প্রধান বিশেষত্ব।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, 'ব্যাপক সামাজিক অভিজ্ঞতা এবং সর্বব্যাপিনী সহানুভূতি দীনবন্ধুর কাব্যের দোষগুণের কারণ।' এই বিষয়টি একটু বিস্তৃত-ভাবে বুঝিবার প্রয়োজন আছে।

'নীল-দর্পণ' নাটকের মধ্য দিয়া দীনবন্ধু যে কাহিনী এবং চরিত্রগুলি উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাদের প্রায় প্রত্যেকটিই যে দীনবন্ধুর অভিজ্ঞতা-প্রসূত তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; অথচ এ কথাও সত্য, তাঁহার পরিকল্পিত সকল চরিত্রই সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই। বাঙ্গালীর একটি মধ্যবিত্ত এবং একটি কৃষক পরিবারের জীবনকে মূলত ভিত্তি করিয়াই নাটকের কাহিনী রচিত হইয়াছে। দীনবন্ধু নিজে যে পরিবারে মানুষ হইয়াছিলেন, তাহা বাংলা দেশের মধ্যবিত্ত পরিবার এবং কৃষক পরিবারের যে জীবন ইহাতে রূপায়িত করিয়াছেন, তাহাও তাঁহারই প্রতিবেশী। কেহ কেহ অনুমান করেন, নদীয়া জেলার বিশেষ একটি পরিবারের প্রকৃত বিবরণ ভিত্তি করিয়া দীনবন্ধু গোলোকচন্দ্র বসুর পরিবারটি চিত্রিত করিয়াছেন এবং হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' কাগজে প্রকাশিত একটি সত্য ঘটনাকে ভিত্তি করিয়া তিনি ক্ষেত্রমণির কাহিনীটি ইহাতে সংযোগ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এ কথাও বলিয়াছেন, দীন-বন্ধুর সম্মুখে সর্বদাই এক একটি জীবন্ত আদর্শ থাকিত। দেখা যায়, তিনি তাহা অবলম্বন করিয়া যাহা রচনা করিয়াছেন, তাহা বিশেষ শক্তিশালী হইয়াছে। দীনবন্ধু ব্যক্তিগত জীবনে দেশ বিদেশে ঘুরিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিয়া যে বিচিত্র সামাজিক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার 'নীল-দর্পণ' নাটক রচনায় যতদূর কার্যকরী না হউক, তাহার অন্যান্য নাটক রচনায় বিশেষ কার্যকরী হইয়াছে বলিয়া অনুভূত হয়।

দীনবন্ধু তাঁহার প্রতিবেশীদিগের মধ্য হইতেই 'নীল-দর্পণ' নাটকের বিষয় কিংবা চরিত্রের সন্ধান পাইয়াছেন। তিনি নিজে নদীয়া জেলার অধিবাসী

ছিলেন, নদীয়া যশোহরের কৃষকদিগের ভাষা ইহাতে ব্যবহার করিয়াছেন, তিনি নিজে গ্রামাঞ্চলে যে ভাষা শুনিয়াছেন, সে ভাষা তাঁহার নাটকে ব্যবহৃত ভাষা হইতে বিশেষ স্বতন্ত্র নহে। সুতরাং 'নীল-দর্পণে'র বিষয়, ইহার চরিত্র ও ইহার ভাষা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে দীনবন্ধুকে কোনও দূরবর্তী অঞ্চল ভ্রমণ করিবার প্রয়োজন হয় নাই। স্বদেশেই নিজের গ্রামের চারিপার্শ্বে আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীদিগের মধ্যে নাটকের ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'অভিজ্ঞতা'র কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহা 'নীল-দর্পণ' অপেক্ষা অন্যান্য নাটকের পক্ষেই অধিকতর প্রযোজ্য। আমি ইতিপূর্বেই বলিয়াছি, 'নীল-দর্পণে'র অনুরূপ ঘটনার বিবরণ সংবাদ ও সাহিত্য পত্রে পূর্ব হইতেই প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, দীনবন্ধু সেই সকল ঘটনার সঙ্গে এ বিষয়ে নিজে যাহা নিজের গৃহের চারিপাশেই ঘটিতে দেখিয়াছেন, তাহাই যোগ করিয়া ইহাদের একটি সামগ্রিক নাট্যরূপ দিয়াছেন মাত্র। তাঁহার জীবনের বহুদর্শিতা কিংবা বিচিত্র অভিজ্ঞতার পরিচয় এখানে খুব সার্থক নহে।

'নীল-দর্পণ' নাটকের বিষয়টি দীনবন্ধুর প্রত্যক্ষ পরিচয় ও সহজ অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এই নাটকে তাঁহার সকল শ্রেণীর চরিত্র সৃষ্টির প্রয়াসই যে সার্থক হইয়াছে, তাহা নহে। দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি দুইটি সুস্পষ্ট সীমারেখায় বিভক্ত—একটি ভদ্র শ্রেণীর, অপরটি ভদ্রেতর শ্রেণীর। এই দুই শ্রেণীর চরিত্রই তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত, তাহা সত্ত্বেও এক শ্রেণীর চরিত্র-সৃষ্টি সার্থক, অপর শ্রেণীর চরিত্র-সৃষ্টি ব্যর্থ হইয়াছে—এই কথা পরে আরও বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছি। যদি অভিজ্ঞতার জন্যই তাঁহার নাটক সার্থক হইত, তবে তাঁহার দুই শ্রেণীর চরিত্র সৃষ্টিই সার্থকতা লাভ করিতে পারিত; কারণ উক্ত দুই শ্রেণীর চরিত্রই তাঁহার অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেহ কেহ আবার মনে করিয়াছেন, দীনবন্ধু 'অভিজ্ঞতার প্রয়োগে অসংযত ছিলেন।' বঙ্কিমচন্দ্রও বলিয়াছেন, দীনবন্ধু 'সামাজিক বৃক্ষে সামাজিক বানর সমারূঢ় দেখিলেই অমনি তুলি ধরিয়া তাহার লেজ শুদ্ধ আঁকিয়া লইতেন।' সেইজন্য অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত চরিত্রগুলিও তাঁহার অনেক সময় সার্থক হয় নাই। এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে সে কথা পরে বলিয়াছি।

এইবার দীনবন্ধুর 'সহানুভূতি'র কথা কিছু বলিতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর সহানুভূতিগুণের ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন, 'এ সহানুভূতি কেবল দুঃখের সঙ্গে

নহে ; সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ সকলেরই সঙ্গে তুল্য সহানুভূতি। আদুরীর বাউটি-পৈঁছার সুখের সঙ্গে সহানুভূতি, তোরাপের রাগের সঙ্গে সহানুভূতি......।' বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, সহানুভূতিগুণ দীনবন্ধুর 'স্বতঃসিদ্ধ' গুণ ছিল, ইহার মধ্যে তাঁহার কোন প্রকার কল্পনা-বিলাসিতার স্পর্শ ছিল না। 'তাঁহার সর্বব্যাপী সহানুভূতি তাঁহাকে যখন যে পথে লইয়া যাইত, তখন তাহাই করিতে বাধ্য হইতেন। তাঁহার গ্রন্থে যে রুচির দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, বোধ হয় এখন তাহা আমরা বুঝিতে পারিব। তিনি নিজে সুশিক্ষিত এবং নির্মল চরিত্র, তথাপি তাঁহার গ্রন্থে যে রুচির দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার প্রবলা দুর্দমনীয়া সহানুভূতিই তাহার কারণ।' সুতরাং দেখিতে পাওয়া যায়, চরিত্রকে জীবন্ত করিয়া তুলিবার পক্ষে সহানুভূতির যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনই ইহার সম্পর্কে শিল্পোচিত সংযম রক্ষা করিবার একটি দায়িত্বও আছে। অভিজ্ঞতা প্রয়োগে দীনবন্ধু যেমন অসংযত ছিলেন, সহানুভূতি প্রয়োগেও তিনি তেমনি অসংযত। সুতরাং অভিজ্ঞতাই হউক আর সহানুভূতিই হউক, সাহিত্য সৃষ্টির মূলে তাহা যে শক্তিই সঞ্চারিত করুক, ইহাদের প্রয়োগে শিল্পোচিত সংযম রক্ষা করিতে না পারিলে কোন সৃষ্টিই সর্বাঙ্গীণ সার্থক হইতে পারে না। দীনবন্ধুর সেই সংযম ছিল না, সেইজন্য তাঁহার রচনায় দোষ এবং গুণ উভয়ই সমান ভাবে আশ্রয় করিয়াছে।

দীনবন্ধু বাঙ্গালী জীবনের রস-সংস্কারের ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করিয়া তাঁহার 'নীল-দর্পণ' নাটকখানি রচনা করিয়াছিলেন বলিয়াও ইহার মধ্যে বিশেষ শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল। ইংরাজি সাহিত্যের প্রভাবের ফলে বাঙ্গালী নিজের জাতীয় সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়া যে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস পাইয়াছিল, তাহাতেই ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর জাতীয় নবজাগরণ সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। একজন সমালোচক বলিয়াছেন, সেই দিন 'জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে যে নব বিস্ময় ও শ্রদ্ধাবোধ প্রবুদ্ধ হইয়াছিল, তাহারই প্রেরণায় চালিত হইয়া জাতীয় ভাব রূপ ও রসের ভিতরই এই আধার খুঁজিয়া পাইলেন সে-যুগের সাহিত্যস্রষ্টারা। বাহিরের আক্রমণ অন্তরের প্রেরণাকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই, তাই বিদেশী আদর্শ গ্রহণ করিলেও দেশের আলো-জল-বায়ু ও জাতির নিজস্ব চেতনা হইতেই তাঁহারা সাহিত্য সৃষ্টির রস সংগ্রহ করিলেন। এ বিষয়ে দীনবন্ধুর কৃতিত্ব কিছু কম ছিল না ; কারণ, নবযুগের যে-প্রেরণা মধুসূদনের স্বচ্ছন্দ ছন্দকাব্যে ও বঙ্কিমের শিল্পকুশল গদ্যকাব্যে সার্থক হইয়াছিল,

তাহাই অন্য দিক দিয়া দীনবন্ধুর বাস্তব-ধর্মী নাটক-প্রহসনের রস সৃষ্টি করিয়াছিল। মধুসূদন আনিলেন সর্বসংস্কার বন্ধন হইতে কবিকল্পনার জড়তা-মুক্তি, ভাব ভাষা ও ছন্দের আবেগ ও অবারিত প্রবাহ। তখন একদিকে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালী জীবনের ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখকে লোকোত্তর কল্পনার উচ্চক্ষেত্রে তুলিয়া ধরিয়া রোমান্সের সৃষ্টি করিয়া বাঙ্গালীর ভাব-চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করিলেন। অন্যদিকে দীনবন্ধু বাঙ্গালীর যে সহজ ভাবভঙ্গী ও তীক্ষ্ণ রস-বুদ্ধি তাহাকেই নিত্যপ্রবহমাণ জীবনধারার মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়া বাঙ্গালীর বাঙ্গালিয়ানাকে নানা সরস ভঙ্গিমায় রূপায়িত করিলেন।'

এই বিষয়ে মধুসূদন কিংবা বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, দীনবন্ধুর রচনার ভিতর দিয়া একটু বিশেষত্বও প্রকাশ পাইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রই হোন কিংবা মধুসূদনই হোন, তাঁহাদের সৃষ্টিচেতনা ছিল রোমান্টিক, কিন্তু দীনবন্ধুর সৃষ্টিচেতনা ছিল সম্পূর্ণ বাস্তব। এই কথা সত্য যে, রোমান্টিক চেতনা বাঙ্গালীর রস-সংস্কারের ঐতিহ্য-বিরোধী নহে, তথাপি রোমান্টিক চেতনার মধ্যে একান্ত আত্মভাব (subjectivity) প্রকাশের সুযোগ রহিয়াছে, বাস্তব চেতনায় তাহা নাই। আত্মভাবপরায়ণতার মধ্যে ঐতিহ্যের অনুসরণ করিতে গিয়াও অলক্ষিতে ঐতিহ্যবিচ্যুতি ঘটিবার অবকাশ সৃষ্টি হইতে পারে; কিন্তু বাস্তবানুগত্যের মধ্যে তাহার সম্ভাবনা থাকে না। প্রকৃত পক্ষে মধুসূদনই হোন, কিংবা বঙ্কিমচন্দ্রই হোন, তাঁহাদের মধ্য দিয়া যে শিল্প-চেতনা যে ভাব-চেতনা বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহা সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ কোন্ ঐতিহ্যের ধারা একান্তভাবে অনুসরণ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে না, অথচ দীনবন্ধু যে ভঙ্গী দ্বারা জীবনকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন কিংবা যে জীবনকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে যে ঐতিহ্য-বিরোধী কিছু নাই, তাহা প্রত্যক্ষভাবেই বুঝিতে পারা যায়। বাঙ্গালীর চিত্তে বাঙ্গালার যে জীবনবোধ শাশ্বত, দীনবন্ধু তাহাই প্রত্যক্ষভাবে অনুসরণ করিয়া তাঁহার 'নীল-দর্পণ' রচনা করিয়াছেন। এই জাতির মধ্যে চিরকালই এই জীবনবোধের অস্তিত্ব রহিয়াছে, তবে তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা ও ভঙ্গী এতদিন ইহার আয়ত্ত ছিল না। ইংরেজি সাহিত্যের সংস্পর্শে আসিবার পর এই জীবনবোধ প্রকাশ করিবার প্রেরণা তীব্রতর হইয়া উঠিল সত্য, কিন্তু তাহার ভাষা ও ভঙ্গী সকলে আয়ত্ত করিতে পারিলেন না; মধুসূদন কিংবা বঙ্কিমচন্দ্র রোমান্টিক ধারা অনুসরণ করিয়া

নিজস্ব চেতনার রসে জারিত করিয়া লইয়া তাহা প্রকাশ করিলেন, দীনবন্ধু কেবলমাত্র নিজের সহানুভূতিটুকু লইয়া অগ্রসর হইয়া গিয়া তাহার বাস্তব রূপায়ণ সার্থক করিয়া তুলিলেন।

'নীল-দর্পণ' নাটকের মধ্যে যে জীবনের পরিচয় পাই, তাহা বাঙ্গালীর শাশ্বত জীবন, নাট্যকার সেই জীবন আত্মনির্লিপ্ত হইয়া কেবলমাত্র নিখুঁতভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং প্রত্যক্ষ করিয়া সার্থকভাবে রূপায়িত করিয়াছেন। রোমাণ্টিক কবি-শিল্পিগণ দূর হইতে জীবনকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, কিন্তু দীনবন্ধুর বাস্তবধর্মী নাটকসমূহ জীবনের অত্যন্ত সন্নিকটবর্তী হইয়া রচিত হইয়াছে বলিয়া ইহাদের চিত্র ও চরিত্রগুলি স্পষ্ট হইয়াছে। সেইজন্য মধুসূদনের রাম-লক্ষ্মণ রাবণকে আমাদের যতখানি অপরিচিত মনে হয়, দীনবন্ধুর গোলোক বসু, আদুরী, পদী ময়রাণীকে ততখানি অপরিচিত মনে হয় না, ইহারা আমাদের পরিচিত জীবন-ধারার আরও নিকটবর্তী।

দীনবন্ধুর মধ্যে এই বিষয়ে যে গুণ প্রকাশ পাইয়াছে, দীনবন্ধুর পরবর্তী অনেক নাট্যকারের মধ্যেই সেই গুণ প্রকাশ পায় নাই। কারণ, ইহাদের প্রায় সকলের রচনাই রোমাণ্টিক চেতনা-জাত, দীনবন্ধুর মত বাস্তব প্রেরণা-জাত নহে। সুতরাং উপরোক্ত সমালোচক যে বলিয়াছেন, এ বিষয়ে দীনবন্ধুর কৃতিত্ব কিছু কম ছিল না, এই কথার পরিবর্তে ইহাই বলা যায় যে, এই বিষয়ে দীনবন্ধুর কৃতিত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল। সাহিত্যে বাঙ্গালীর রস-সংস্কার ও জীবন-চেতনার ঐতিহ্যের অনুসরণ করিবার দিক দিয়া দীনবন্ধু যতখানি সজ্ঞান ছিলেন, সে যুগের আর কোন সাহিত্যিকই ততখানি সজ্ঞান ছিলেন না, এ কথা কেবল-মাত্র বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে—বাংলা সাহিত্যের সকল বিভাগের উপরই প্রযোজ্য।

তবে এ কথা সত্য, তাঁহার 'নীল-দর্পণে'র চরিত্র রূপায়ণে সর্বত্রই তিনি ঐতিহ্যকে অনুসরণ করিতে পারেন নাই; যেখানে তাহা পারিয়াছেন, সেখানে তাঁহার সৃষ্টি সার্থক হইলেও, যেখানে তিনি তাহা পারেন নাই, সেখানে তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। তাঁহার 'নীল-দর্পণে'র গোলোক বসু, তোরাপ, আদুরী, পদী ময়রাণী, রেবতী, ক্ষেত্রমণি কিংবা রাইচরণ যেমন বাঙ্গালীর জীবনের ঐতিহ্য অনুসরণকারিণী রচনা বলিয়া শক্তিশালী, আবার তেমনই নবীনমাধব, বিন্দুমাধব, সরলতা, সৈরিন্ধ্রী প্রভৃতি চরিত্র-পরিকল্পনার ভিতর দিয়া তিনি ঐতিহ্যকে অনুসরণ করেন নাই বলিয়া ইহাদের রচনা শক্তিহীন।

দীনবন্ধুর একটি প্রধান গুণ এই যে, তিনি উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াও ধ্যান-ধারণায় খাঁটি বাঙ্গালীত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাহা দ্বারাই তাঁহার সকল সাহিত্যকর্ম নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুকে কবি ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য বলিয়া উল্লেখ করিলেও আবার এ কথাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, 'ঈশ্বর গুপ্ত খাঁটি বাঙ্গালী, মধুসূদন ডাহা ইংরেজ—দীনবন্ধু ইঁহাদের সন্ধিস্থল'। দীনবন্ধু সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের এই দাবী কতদূর যুক্তিযুক্ত, তাহা বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে।

সাধারণভাবে এ কথা আমরা সকলেই জানি যে, দীনবন্ধু ঈশ্বর গুপ্তেরই শিষ্য; বঙ্কিমচন্দ্রই এই মতের প্রবর্তক, তিনিই নানাভাবে বিষয়টি আলোচনা করিয়া ইহা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। দীনবন্ধু উনবিংশ শতাব্দীর নব জাগরণের যুগসন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হইয়াছিলেন সত্য, তথাপি তিনি সাহিত্য সৃষ্টির যে আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার ভিতর দিয়া যে মনে প্রাণে বাঙ্গালীত্বই রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন—বাঙ্গালীর জীবন, বাঙ্গালীর ঐতিহ্য, বাঙ্গালীর রস-সংস্কার সর্বতোভাবে অনুসরণ করিয়াই তাঁহার সাহিত্য-সাধনা সার্থক করিয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই বিষয়ে তিনি গুরু ঈশ্বর গুপ্ত হইতে বিশেষ স্বতন্ত্র এই কথা বলিতে পারা যায় না। একজন বিশিষ্ট সমালোচকও এই সম্পর্কে বলিয়াছেন, 'এ কথা আমরা আজকাল ভুলিয়া যাই যে, মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের মত দীনবন্ধু সেকালের হইলেও চিরকালের বাঙ্গালী। তাঁহারা যুগসন্ধির সময় যে অভিনব সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার প্রেরণা ও আদর্শ ইংরেজি সাহিত্য হইতে আসিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাঁহার প্রাণশক্তির মূলে ছিল বাঙ্গালীর নবজাগ্রত জাতীয় চেতনা। বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব সুস্থ ও প্রাণবন্ত ছিল বলিয়া নূতন ভাব-প্লাবনের স্রোতে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াও বাঙ্গালী তাহার সাহিত্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার দৃঢ়ভিত্তি লাভ করিয়াছিল। বিদেশী ভাব-কল্পনাকে প্রথমে আত্মসাৎ ও পরে আত্মস্থ করিয়া, যাঁহারা প্রাণের স্বাধীন স্ফূর্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই ছিলেন সে যুগের সাহিত্যস্রষ্টা। কিন্তু পরবর্তী কালে বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ হইতেই, এই প্রাণধারা ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে এবং বাঙ্গালীর সাহিত্য বাঙ্গালীর সত্যকার জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।··· তাই এ যুগের বাঙ্গালী চিনিতে পারে না দীনবন্ধুকে, যিনি ছিলেন মনে প্রাণে খাঁটি বাঙ্গালী।' (সুশীলকুমার দে, 'দীনবন্ধু মিত্র', ১৩৫৮, পৃঃ ২-৩)।

এক দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিতে গেলে, খাঁটি বাঙ্গালীত্বের দিক দিয়া দীনবন্ধুর সঙ্গে মধুসূদন-বঙ্কিমের পার্থক্য ছিল। মধুসূদন এবং বঙ্কিম উভয়ের রচনাই রোমান্টিক শ্রেণীভুক্ত; দীনবন্ধুর রচনা তাহা নহে, তাহা বাস্তবধর্মী। অবশ্য রোমান্টিক চেতনা বাঙ্গালীর স্বভাবের কিছু মাত্র ব্যতিক্রম নহে, কিংবা তাহা দ্বারা বাঙ্গালীত্বের পক্ষে কোন অন্তরায়ও সৃষ্টি হয় না। তথাপি এ কথা সত্য যে, বাঙ্গালীত্বের পরিচয় স্থাপনে বস্তুধর্মী রচনা যতখানি স্পষ্ট, রোমান্টিক শ্রেণীর রচনা তত স্পষ্ট নহে। অর্থাৎ দীনবন্ধুর নাটক ও প্রহসন রচনার ভিতর দিয়া বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন ও চরিত্রের প্রত্যক্ষ রূপ যত স্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে, মধুসূদন কিংবা বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্টিক শ্রেণীর রচনার ভিতর দিয়া তাহা তত স্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইতে পারে নাই। এই দিক দিয়া গুরু ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে শিষ্য দীনবন্ধুর যে বিশেষ কিছু পার্থক্য আছে, তাহা সহজে মনে হয় না। সুতরাং ঈশ্বর গুপ্তকে যদি খাঁটি বাঙ্গালী বলিয়া উল্লেখ করা যায়, তবে দীনবন্ধুকেও তাহাই বলিতে হয়। ঈশ্বর গুপ্ত অপেক্ষা দীনবন্ধুর জীবন-দৃষ্টি গভীরতর ছিল, এ কথা সত্য; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না—একজনের দৃষ্টি খণ্ড বস্তু আশ্রিত এবং আর একজনের দৃষ্টি অখণ্ড জীবনাশ্রিত। ইঁহাদের মধ্যে আর কোন পার্থক্য নাই; সুতরাং ঈশ্বর গুপ্ত যে অর্থে খাঁটি বাঙ্গালী, দীনবন্ধুও সেই অর্থেই খাঁটি বাঙ্গালী। দীনবন্ধুর 'নীল-দর্পণ' নাটক হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

চিরন্তন মানুষের সুখ-দুঃখ-বেদনা লইয়াই সাহিত্যের সৃষ্টি হয়; কিন্তু বিশেষ একটি মানুষের ভিতর সুখ-দুঃখ-বেদনার অনুভূতির ভিতর দিয়াই সেই চিরন্তন মানুষের রাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়, বিশেষকে বাদ দিয়া নির্বিশেষে পৌঁছাইতে পারা যায় না; গীতিকবিতার ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব হইলেও নাটকের ক্ষেত্রে তাহা সম্পূর্ণ ই অসম্ভব। বিশেষকে আশ্রয় করিয়াই নির্বিশেষ মানবাত্মার ক্রন্দন সাহিত্যে ধ্বনিত হয়। দীনবন্ধু একান্তভাবে বাঙ্গালীর জীবন ও চরিত্রের মধ্য দিয়াই 'চিরন্তন জীবনের বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন'। সমালোচক বলিয়াছেন, 'মানুষ হইলেও বাঙ্গালী বাঙ্গালী—এই বিশিষ্ট বাঙ্গালীত্বের মধ্যেই দীনবন্ধু সনাতন মনুষ্যত্বের সন্ধান পাইয়াছিলেন। এ সন্ধান না জানিলে যেমন প্রকৃত বাংলা নাটক লেখা যায় না, তেমনই প্রকৃত বাংলা নাটকের রসও গ্রহণ করা যায় না। দীনবন্ধু নিজে প্রাণে মনে খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন, তাই দোষ-ভরা, গুণভরা, হাসিভরা, কান্নাভরা বাঙ্গালীকে তিনি বুঝিতেন, এবং তাহার

জীবনের সঙ্গে তাঁহার জীবনের সংযোগ ছিল আন্তরিক। খাঁটি বাঙ্গালী অর্থে এই বুঝায়, বিদেশী প্রভাব সত্ত্বেও তাঁহার মানস-প্রকৃতি ছিল বাঙ্গালীর নিজস্ব সংস্কার ও সংস্কৃতি দিয়া গঠিত; প্রকাশ-ভঙ্গী ছিল বাঙ্গালীর নিজস্ব পদ্ধতি; ভাষাটিও ছিল বাঙ্গালীর দৈনন্দিন সহজ ভাষা, যাহা কেবল অভিজাত সমাজে নয়, মাঠে ঘাটে হাটে-বাজারে অন্তঃপুরেও বোধগম্য।' বঙ্কিমচন্দ্রও লিখিয়াছেন, 'বিস্ময়ের বিষয়, বাঙ্গালা সমাজ সম্বন্ধে দীনবন্ধুর বহুদর্শিতা। সকল শ্রেণীর বাঙ্গালীর দৈনিক জীবনের সকল খবর রাখে, এমন বাঙ্গালী লেখক আর নাই।' সকল শ্রেণীর বাঙ্গালীর দৈনিক জীবনের সকল খবর রাখার কৌতূহলের মধ্যেই তাঁহার প্রতিভার বিশেষত্বটি ধরা পড়ে। এই কৌতূহলের রসাভিব্যক্তিতেই দীনবন্ধুর বাঙ্গালী জীবনের ছোটখাট চরিত্রগুলির রূপায়ণও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

বাঙ্গালীর পল্লী-জীবনাশ্রিত যে সকল চরিত্রের রূপায়ণে দীনবন্ধুর 'নীল-দর্পণ' নাটক সার্থকতা লাভ করিয়াছে, তাহারা কেবল মাত্র তাঁহার স্বভাব-সুলভ বাঙ্গালীত্ব দ্বারাই সৃষ্টি হইয়াছে, কোন কবি-কল্পনা কিংবা ভাব-স্বপ্নের রাজ্য হইতে তাহাদিগকে অনুসন্ধান করিয়া আনিবার প্রয়োজন হয় নাই। তোরাপ, রাইচরণ, রেবতী, ক্ষেত্রমণি, আদুরী, পদী ময়রাণী ইহারা প্রত্যেকেই যেন বাংলার পল্লীজীবনের পরিচিত ক্ষেত্র হইতে আপনি আসিয়া নাট্যকাহিনীর মধ্যে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে; তাহারা যেন আপনি আসিয়াছে, আপনিই নিজ নিজ আচরণ নিষ্পন্ন করিয়া কাহিনী হইতে বিদায় লইয়াছে। সহজাত বাঙ্গালীত্ব দ্বারাই দীনন্ধু ইহাদিগকে অনায়াসে উপলব্ধি করিয়া নাটকের মধ্যে নিতান্ত সহজভাবে প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন।

সমসাময়িক বিষয়-বস্তু অবলম্বন করিয়া 'নীল-দর্পণ' নাটক রচিত হইলেও ইহার কোন কোন ক্ষেত্রে যে চিরন্তন জীবন-সত্যের সার্থক বিকাশ হইয়াছে, ইহাই এই নাটক সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কথা। **Criticism of life**-কেই যদি কাব্য বা সাহিত্যের সংজ্ঞারূপে গ্রহণ করি, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, দীনবন্ধুর 'নীল-দর্পণ' নাটক রচনায় ইহা স্থানে স্থানে সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। দীনবন্ধু সচেতন ভাবে সাহিত্যের এই সংজ্ঞা সম্মুখে রাখিয়াই যে এই সকল ক্ষেত্রে সার্থকতা লাভ করিয়াছেন, তাহা নহে—দীনবন্ধুর সহজাত জীবনদৃষ্টির গভীরতার ফলেই তাঁহার রচনায় এই গুণ আপনা হইতেই প্রকাশ পাইয়াছে। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিয়া বিষয়টি স্পষ্টতর করা যাইতে পারে।

এই সম্পর্কে 'নীল-দর্পণে'র তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কটির কথা প্রথমেই স্মরণ হইতে পারে। ইহাতে রোগ সাহেব কর্তৃক ক্ষেত্রমণির শ্লীলতাহানির কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে দৃশ্যটি অশ্লীল, ইহার মধ্যে যদি সুগভীর জীবন-বোধের প্রেরণা না থাকিত, তবে ইহা দীনবন্ধু রচনা করিলেও পাঠকগণ কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারিত না। জীবনের একটি সুগভীর সত্য ইহার আশ্রয় বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে ইহা অশ্লীল বলিয়া মনে হইলেও পাঠকগণ ইহা পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। সেই বিষয়টিই এখানে একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায়।

এই দৃশ্যটির মধ্যে দুইটি শক্তির সংঘর্ষ উপস্থিত করা হইয়াছে। একটি প্রবলের অত্যাচার করিবার শক্তি, আর একটি দুর্বলের আত্মরক্ষা করিবার শক্তি। এখানে নীলকর ইংরেজ বিশেষ কোন ব্যক্তি নহে, কিংবা কৃষক-বালিকা ক্ষেত্রমণিও কেহ নহে। সমাজের মধ্যে চিরদিনই সবল দুর্বলের উপর যে অত্যাচার করিয়া আসিতেছে, তাহার ধারা যুগে যুগে নূতন নূতন রূপ নেয়। সবলের অত্যাচার করিবার প্রবৃত্তি এবং তাহার সম্মুখে দুর্বলের আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি জীবনের একটি চিরন্তন সত্য। বাংলার সমাজ-জীবনের সম্মুখে এই অত্যাচারী মধ্য যুগে মুসলমান রাষ্ট্রশক্তির প্রতিনিধি কাজির রূপ ধারণ করিয়াছে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাহাই নীলকরের রূপ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছে, আবার বিংশ শতাব্দীতে তাহাই জীবানন্দ চৌধুরী জমিদারের রূপ ধারণ করিয়া ষোড়শীর উপর অত্যাচার করিয়াছে। বিশেষ একটি যুগে সমাজের বিশেষ একটি অবস্থায় যে ইংরেজ নীলকরের রূপ গ্রহণ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিল, সে-ই বিভিন্ন যুগে কেবলমাত্র তাহার বাহিরের রূপটি পরিবর্তন করিয়া নূতন নূতন রূপে আবির্ভূত হইতেছে। সুতরাং এই চিত্রটি একটি সমসাময়িক সামাজিক অবস্থা অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পাইলেও একটি চিরন্তন সত্যের সন্ধান দেয়। এখানে প্রবল ও দুর্বলের যে সংঘাতটি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার স্বাভাবিকতার মধ্যেই এই চিত্রটির সার্থকতা।

এই কথা স্বীকার করিতেই হয়, রোগ সাহেবের কক্ষে আবদ্ধা অসহায়া বালিকার চিত্রটি নাট্যকারের বর্ণনার গুণে এমন স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহার ফলেই ইহার সম্পর্কিত অশ্লীলতা বোধ দূর হইয়া গিয়াছে। ক্ষেত্রমণির নারীধর্ম রক্ষা করিবার সহজাত বৃত্তিগুলি নাট্যকার এখানে একে একে বিকাশ করিয়া দেখাইয়াছেন। আসন্ন মাতৃত্বের সম্ভাবনায় তাহার

মধ্যে আত্মরক্ষার যে দায়িত্ব বোধ ও ধর্মরক্ষার যে শক্তির বিকাশ একান্ত স্বাভাবিক, তাহার উপর নাট্যকার এখানে সঙ্গত আলোকপাত করিয়াছেন, তাহার ফলে একটি বীভৎস দৃশ্যও অনুসরণযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। জীবনের যথাযথ রূপ নিখুঁত ভাবে যেখানে প্রতিফলিত হয়, সেখানে শ্লীলতা কিংবা অশ্লীলতার প্রশ্ন আসে না। যেখানে জীবনের রূপ কৃত্রিম হইয়া উঠে, সেখানে চিত্রের মধ্যে যত সরসতাই থাকুক না কেন, তাহা আবেদন সৃষ্টি করিতে ব্যর্থ হয়। 'নীল-দর্পণ' নাটকটির একান্ত স্বাভাবিক পরিচয় ইহার আপাত অশ্লীল ভাব হইতে ইহাকে দূরে রাখিয়াছে। ক্ষেত্রমণির আত্মরক্ষার প্রয়াসের মধ্যে একটি চিরন্তন জৈব প্রবৃত্তির বিকাশ দেখা যায়—ইহা যে কেবল মাত্র মানুষের জীবনে সত্য তাহা নহে, ইহা জীব-জগতের একটি মৌলিক সত্য। বজ্রনখর শ্যেন পক্ষী যখন বৃক্ষকোটরে তাহার বজ্রনখরগুলি প্রবেশ করাইয়া দিয়া অসহায় পক্ষিশাবকগুলিকে অধিকার করিতে চায়, তখন পক্ষিশিশুরা নিষ্ক্রিয় থাকিয়া প্রত্যক্ষ মৃত্যুর নিকটি আত্মসমর্পণ করে না—বরং তাহার পরিবর্তে তাহারা তাহাদের কুসুমপল্লবতুল্য ক্ষুদ্র নখর তুলিয়া তাহাকে প্রত্যাঘাত করে। এই প্রত্যাঘাতের কোনই ফল হয় না সত্য, তথাপি জীবমাত্রই যে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তির অধিকারী, তাহারই পরিচয় দিয়া তাহারা জীবনেরই পরিচয় দেয়। ইহা জীব-জগতের চিরন্তন এক সত্য। ক্ষেত্রমণির আত্মরক্ষার প্রয়াসের মধ্যে সেই সত্যেরই বিকাশ দেখা গিয়াছে। রুদ্ধ কক্ষে প্রবল শত্রুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার স্বভাবায়ত্ত শক্তির অস্ত্রগুলি সে ক্রমে ক্রমে এক একটি করিয়া প্রয়োগ করিয়া আত্মরক্ষার প্রয়াস পাইয়াছে, সেই প্রয়াস তাহার শেষ পর্যন্ত সার্থক হয় নাই,—এই প্রকার ক্ষেত্রে তাহা হইতেও পারে না—তথাপি আত্মরক্ষার বৃত্তি জীবের যে কত প্রবল, ইহার মধ্য দিয়া তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে।

'ক্ষেত্রমণির মৃত্যুতে রেবতীর কাতরোক্তির মধ্যে দেশকালনিরপেক্ষ একটি সুগভীর সত্য বাণী উচ্চারিত হইয়াছে, ইহা শাশ্বত জননীর তাঁহার সন্তান সম্পর্কে একটি মৌলিক অনুভূতি। ইহাকে বহির্মুখী দেশাচার ও সমাজনীতি দ্বারা আমরা নানা রূপ দিয়াছি। কিন্তু সন্তানের সঙ্গে জননীর বিচ্ছেদের অন্তিম মুহূর্তে রেবতীর মুখে সর্বসংস্কারমুক্ত এক আদিম জননী যেন কথা কহিয়া উঠিয়াছে। রেবতী শাস্ত্র, নীতি, ধর্ম বিসর্জন দিয়া বলিয়া উঠিয়াছে—'সাহেবের সঙ্গে থাকা যে মোর ছিল ভাল, মা রে! মুই মুখ দেখে জুড়োতাম, মা রে⋯।'

ক্ষেত্রমণির মৃত্যুতে জননী রেবতী এই কথা বলিয়া অলীক সান্ত্বনা লাভ করিতে যায় নাই যে, সতীত্ব রক্ষা করিতে প্রাণ বিসর্জন দিয়া তাহার কন্যা স্বর্গে গিয়াছে! সমাজ-নীতি কিংবা ধর্ম মানুষ তাহার সুবিধার জন্য দেশে দেশে এক এক প্রকার করিয়া গড়িয়াছে, তাহাদের সব কিছুর ভিতরে চাপা আছে একটি সুগভীর সত্য, তাহা জননীর সঙ্গে তাহার আত্মজার সম্পর্ক। সেই সম্পর্কের নীতি স্বতন্ত্র, তাহারই প্রেরণায় রেবতী এই কথা বলিয়াছে, সে এখানে হিন্দু রমণী নহে, সে শাশ্বতী জননী। সমাজ তাহার এই কথা শুনিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইবে, কিন্তু শাশ্বতী জননী এই কথার শক্তি অনুভব করিতে পারিবে।

'নীল-দর্পণ' নাটকের চরিত্রগুলি অনুসরণ করিলে দেখা যায়, ইহাদের মধ্যে প্রধানত দুই শ্রেণীর চরিত্র আছে—ভদ্র ও ভদ্রেতর শ্রেণী। গোলোক বসুর পরিবারস্থ চরিত্রগুলি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত, তাঁহার পরিচারিকা ও প্রতিবেশীদিগের চরিত্র প্রধানত দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। এই দুই শ্রেণীর চরিত্র-সৃষ্টিতেই দীনবন্ধু যে সমান দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। অথচ এ কথা সত্য যে, ইহাদের মধ্যে কোন চরিত্রই তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বহির্ভূত ছিল না। দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই নাটকে ভদ্রশ্রেণীর চরিত্র-সৃষ্টি ব্যর্থ এবং ভদ্রেতর শ্রেণীর চরিত্র-সৃষ্টি সার্থক হইয়াছে। ইহার কারণ কি?

প্রথমত দেখা যায় যে, ভদ্রশ্রেণীর চরিত্রগুলি সম্পর্কে দীনবন্ধুর অভিজ্ঞতার অভাব না থাকিলেও, ইহাদিগকে তিনি যথাযথ চিত্রিত করেন নাই। ইহাদের সম্পর্কে একটি আদর্শবোধ তাঁহার অন্তর অধিকার করিয়াছিল। অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে তিনি কেবল মাত্র আদর্শ গুণেরই সন্ধান করিয়াছেন, রক্তমাংসের দেহাশ্রিত মানুষের ভুল-ভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতি যাহা নিতান্ত স্বাভাবিক তাহার স্পর্শ হইতে সর্বদাই ইহাদিগকে দূরে রাখিয়াছেন। তাহারা ভালো, ভালো, কেবলই ভালো। পুত্রের প্রতি স্নেহে পিতা, পিতার প্রতি কর্তব্যবোধে পুত্র, ভ্রাতার প্রতি ভ্রাতার ভক্তিতে ও স্নেহে, সন্তানের প্রতি বাৎসল্যে শাশুড়ীর প্রতি শ্রদ্ধায় বধূ, জায়ের প্রতি জায়ের ভক্তি ও স্নেহে একই পরিবারের প্রত্যেকটি চরিত্রই আদর্শ। তাহার ফলে চরিত্রগুলি যথার্থ প্রাণহীন হইয়া উঠিয়াছে। দোষে গুণে যে মানুষের জীবন নিত্য নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, ক্ষুদ্র ঈর্ষা এবং স্বার্থবোধ দ্বারা যে জীবন নিত্য পীড়িত, গোলোক

বন্ধুর পরিবারের মধ্যে তাহার লীলা-চঞ্চল বিকাশ দেখা যায় না। মানুষ যত শক্তিশালীই হউক, সে মানুষ; তাহার জীবনের লক্ষ্য যত উচ্চই হউক, তাহার প্রাত্যহিক জীবনাচরণের মধ্যে তাহার মানবিক পরিচয়টিও গোপন থাকিতে পারে না। একদেশদর্শী দৃষ্টি দ্বারা চরিত্র সৃষ্টি সার্থক হইতে পারে না। উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়া এক কথা, চরিত্র সৃষ্টির সার্থকতা অন্য কথা—সুতরাং অত্যাচারিত গোলোকচন্দ্রের পরিবারস্থ চরিত্রগুলির উপর পাঠকের সকল প্রকার সহানুভূতি আকর্ষণ সৃষ্টি করিবার জন্য নাট্যকার চরিত্রগুলিকে প্রাণহীন আদর্শ পুত্তলিকায় মাত্র পরিণত করিয়াছেন, ইহাদের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করিতে পারেন নাই।

দ্বিতীয়ত উচ্চশ্রেণীর চরিত্রগুলি সম্পর্কে তিনি যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাও নিতান্ত কৃত্রিম। সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা তখন সাহিত্যে দুই-ই প্রচলিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু এই দুইয়ের সামঞ্জস্য বিধানের মধ্য দিয়াই যে বাংলা গদ্য ভাষার যথার্থ শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে, বাংলা সাহিত্যে তখনও কেহই তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রই ইহার প্রথম সন্ধান পাইয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্কিমের উপন্যাসগুলির একখানিও তখনও প্রকাশিত হয় নাই, বাংলা সাহিত্য তখনও একবার সাধু ভাষার দ্বারে আর একবার চল্‌তি ভাষার দ্বারে মাথা খুঁড়িতেছে। এ অবস্থায় বাংলা নাটকের গদ্য সংলাপের আদর্শ ভাষা যে কি হইবে, তাহা দীনবন্ধু নিজেও স্থির করিতে না পারিয়া পূর্ব-প্রচলিত ধারা অনুসরণ করিয়া শিক্ষিত চরিত্রগুলির মুখে কৃত্রিম সাধু ভাষা ও অশিক্ষিত চরিত্রগুলির মুখে সহজ কথ্য ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। স্বাভাবিকতার গুণ নাটকের একটি প্রধান গুণ। সুতরাং যাহাদের ভাষা কৃত্রিম, তাহাদের চরিত্রগুলি কৃত্রিম হইয়া উঠিবে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই।

তৃতীয়ত ভদ্রশ্রেণীর চরিত্রগুলি কৃত্রিম হইয়া উঠিবার আর একটি প্রধান কারণ এই যে, ইহাদের কোনটিকেই নাট্যকার যথার্থ নাট্যক্রিয়া (action)-র মধ্য দিয়া বিকাশ করিয়া তুলিবার সুযোগ গ্রহণ করেন নাই। ইহাদের অধিকাংশই বাক্-সর্বস্ব মাত্র, কেবলমাত্র বক্তৃতার ভিতর দিয়াই তাহাদের গুণের প্রচার হইয়াছে, কর্মের ভিতর দিয়া তাহা প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু নাট্যিক ক্রিয়া (action)-র মধ্য দিয়াই চরিত্রগুলির গুণাবলীর যথার্থ প্রতিষ্ঠা হয়, বক্তৃতার ভিতর দিয়া নহে। ক্ষেত্রমণির উদ্ধার দৃশ্যে

কেবলমাত্র নবীনমাধব ও তোরাপের একটি আচরণ যথার্থ নাট্যক্রিয়ার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর চরিত্রগুলি প্রত্যক্ষ নাট্যক্রিয়ার ভিতর দিয়া তাহাদিগকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ক্ষেত্রমণি নাটকের সামান্য অংশ অধিকার করিয়া থাকিলেও একটি পূর্ণাঙ্গ দৃশ্যের ভিতর দিয়া তাহার আত্ম-রক্ষার যে শক্তি সক্রিয় ও প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিয়াছে, তাহার ফলেই সে পাঠকের হৃদয়ের অনেকখানি অংশ অধিকার করিতে পারিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর চরিত্রগুলি যেখানে কেবল বক্তৃতা দ্বারা তাহাদের মহত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছে, নিম্নশ্রেণীর চরিত্রগুলি সেখানে অত্যাচারীর হাতে শ্যামচাঁদের প্রহার, বুটের গুঁতো খাইয়া নীলকর-অত্যাচারের ভয়াবহ স্বরূপটি প্রত্যক্ষ করাইয়াছে; উচ্চশ্রেণীর চরিত্রগুলি সর্বত্রই কেবল বক্তৃতা দিয়াই তাহাদের দায়িত্ব পালন করিয়াছে।

তাহার উপর আরও একটি কথা এই যে, ইংরেজি সভ্যতার প্রচণ্ড আঘাতে সমাজের উপরিস্তরে চিন্তার ও ভাবের জগতে যে একটা বিরাট পরিবর্তন আসিয়াছিল, তাহা তখনও স্থির রূপ লইতে পারে নাই; এই প্লাবন তখনও পর্যন্ত সমাজের নিম্নতম স্তর পর্যন্ত গিয়া পৌঁছাইতে পারে নাই। সমাজের নিম্নতম স্তরের জৈব ও মানসিক জীবন আগেও যেমন ছিল, তখনও তেমনি ছিল। কিন্তু উচ্চস্তরের এই পরিবর্তনশীল অবস্থায় দীনবন্ধু একটা কোন নির্দিষ্ট মান খুঁজিয়া পান নাই। কলিকাতার ভদ্রসমাজ এবং পল্লীর ভদ্রসমাজে ত পার্থক্য ছিলই, পরন্তু কলিকাতাতেও বিভিন্ন ধরণের দলের পাড়ার গোষ্ঠীর অনেক কৃত্রিম মান তখন সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহারা একবার ভাঙ্গিতেছে, আবার বদলাইতেছে, আবার গড়িতেছে। সেইজন্য দীনবন্ধু উচ্চশ্রেণীর চরিত্রগুলি কল্পনা হইতে আঁকিয়াছেন। সুতরাং ইহারা কৃত্রিম হইয়া পড়িয়াছে এবং এক একটি আদর্শের প্রতিরূপ হইয়াছে মাত্র।

দেশে তখন সবে মাত্র দুই একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে ঘেরাটোপ দেওয়া ঘোড়ার গাড়ীর অন্ধকারের মধ্যে বসিয়া দুই একটি দুঃসাহসী পরিবারের ছোট ছোট মেয়ে পড়িতে যাইতেছে মাত্র। শিক্ষিত কন্যা ও বধূর যথার্থ স্বরূপ তখনও সমাজ দেখিতে পায় নাই, দীনবন্ধুও দেখিতে পান নাই। সেইজন্য দীনবন্ধুর পরিকল্পনায় এই শ্রেণীর চরিত্র কৃত্রিম হইয়া উঠিবে, ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু রেবতী, ক্ষেত্রমণি, আদুরী, পদী ময়রাণী প্রত্যক্ষ সমাজে বর্তমান ছিল, সেইজন্য ইহাদের পরিচয়ে দীনবন্ধু ভুল করেন নাই।

ইতিপূর্বে দীনবন্ধুর কোন্ শ্রেণীর চরিত্র-পরিকল্পনা সার্থক এবং কোন্ শ্রেণীর চরিত্র-পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়াছে, সে কথা আলোচনা করিয়াছি। এই দুই শ্রেণী হইতেই এইবার কয়েকটি চরিত্র স্বতন্ত্রভাবে বিচার করিয়া এই কথা কতদূর সত্য, তাহা প্রমাণিত করা যাইতে পারে।

প্রথমত উচ্চশ্রেণী হইতে গোলোক বসুর চরিত্রটিই ধরা যাক। গোলোক বসু উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন না, তথাপি উচ্চশ্রেণীর সমাজে যে ভাষা সাধারণত প্রচলিত থাকিবার কথা, দীনবন্ধু তাঁহার মুখে সেই ভাষাই দিয়াছেন। সেইহাতে ভাষার দিক দিয়া তাহার চরিত্রটি কৃত্রিম হইয়া উঠিতে পারে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসগুলির ভিতর দিয়া পরবর্তী কালে যে গদ্যভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, গোলোকচন্দ্রের ভাষার মধ্যে তাহারই পূর্ব সূচনা দেখা যায়। এই চরিত্রটি হইতে বুঝা যায়, দীনবন্ধু শিক্ষা অনুযায়ী ভাষার তারতম্য করিয়াছেন, কেবলমাত্র উচ্চ-নীচ শ্রেণী অনুযায়ীই তাহার মধ্যে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করেন নাই। সেইজন্য এক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও গোলোকচন্দ্র ও নবীনমাধবের ভাষা এক নহে, দুই জা' হওয়া সত্ত্বেও সৈরিন্ধ্রী ও সরলতার ভাষা এক হয় নাই। গোলোকচন্দ্রের ভাষারও একটি স্বকীয়তা প্রকাশ পাইয়াছে। দীনবন্ধু এই কথা বুঝিয়াছিলেন যে ভাষা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অন্তর্নিবিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেরই একটি বিশিষ্ট গুণ। মানুষে মানুষে যেমন আকৃতি ও প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে, তেমনই প্রত্যেকেরই এক একটি স্বকীয় ভাষাও আছে, ইহাতে একজনের সঙ্গে আর একজনের ঐক্য নাই। গোলোকচন্দ্রের চরিত্রটির যেমন একটি বিশিষ্ট গৌরব আছে, তেমনই তাহার ভাষাও একটি স্বতন্ত্র পরিচয় লাভ করিয়াছে। এই ভাষা সহজ ও সরল, সুতরাং কৃত্রিম নহে। স্কুল কলেজের শিক্ষালাভ না করিয়াও আমাদের দেশের সম্ভ্রান্ত পরিবারের পুরুষগণ কৌলিক ধারায় যে বিশিষ্ট শিক্ষালাভ করিতেন, তাহা দ্বারাই তাহাদের ভাষা একটি বিশিষ্ট রূপ লাভ করিত। দীনবন্ধু তাহার সন্ধান পাইয়াছিলেন এবং গোলোকচন্দ্রের মুখে সেই ভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন। তাহার ফলে চরিত্রটি সংক্ষিপ্ত হইলেও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর চরিত্রের মধ্যে এই চরিত্রটিই সর্বাপেক্ষা স্বাভাবিক হইয়াছে।

গোলোকচন্দ্র শান্তস্বভাব ও ধর্মভীরু লোক। তিনি নিজের গ্রামের সীমানার বাহিরে কোনদিন যান নাই। মোটা ভাত মোটা কাপড়ে তাঁহার সন্তুষ্টি, ইহার অভাবও তাঁহার নাই। জীবনে তাঁহার কোনদিন সংগ্রাম করিতে

হয় নাই ; সেইজন্য ইহার যে একটা কঠিন রূপ আছে, তাহার সঙ্গে তাঁহার পরিচয় স্থাপিত হইতে পারে নাই। তিনি বৈষয়িক লোকও নহেন, জোতজমি গাঁতি কিছুই তিনি নিজের বুদ্ধি ও পরিশ্রম দ্বারা করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, 'স্বর্গীয় কর্তারা যে জমাজমি করো গিয়াছেন, তাহাতে কখনও পরের চাকরি স্বীকার করতে হয় নি।' সেই জমিজমা হইতে সাংবৎসরিক তাঁহার যে আয় তাহা দ্বারা তিনি পরম তৃপ্তিতে দিন যাপন করেন, মামলা-মোকদ্দমায় নিজেকে জড়িত করিয়া পৈতৃক সম্পত্তি বৃদ্ধি করিবার পথে তিনি অগ্রসর হন নাই। তাঁহার জীবন-ধারা নিতান্ত সহজ ও সরল। সুতরাং এই ব্যক্তিকে যখন মিথ্যা ফৌজদারী মোকদ্দমায় জড়িত হইয়া সহরে গিয়া আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে হইল, তখন তাঁহার প্রতি সহানুভূতিতে এবং মিথ্যা মোকদ্দমাকারী নীলকরের প্রতি বিদ্বেষে দর্শকের হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য দীনবন্ধুর এই চরিত্রটির পরিকল্পনা অপূর্ব সার্থক হইয়াছে। কিন্তু এই ধীরস্থির চরিত্রটি যখন লোকচক্ষুর অন্তরালে হাজতের মধ্যে আত্মহত্যা করিলেন, তখন পাঠকদিগকে ইহার আকস্মিকতা নির্মমভাবে আঘাত করিল। আনুপূর্বিক ইহার আচরণ একান্ত স্বাভাবিক হইলেও, ইহার এই আচরণটির অস্বাভাবিকতা অস্বীকার করা যায় না।

নবীনমাধবের চরিত্রটি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত নিতান্ত কৃত্রিম হইয়া উঠিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ, তাহার ভাষা। নবীনমাধব যদি এই নাটকের একটি সাধারণ চরিত্র মাত্র হইত, তবে তাহার চরিত্র যত ব্যর্থ ই হউক, সামগ্রিক ভাবে নাট্যকাহিনীকে আঘাত করিতে পারিত না। কিন্তু দীনবন্ধু তাহাকেই নায়ক বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন, সুতরাং তাহার পরিকল্পনা সমগ্র নাটকেরই একটি প্রধান ত্রুটি হইয়া রহিয়াছে।

প্রথম প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে নবীনমাধবের মুখে এই ভাষা শুনিতে পাই, 'আজো জননীর পরিতাপ বিবেচনা করো কি কালসর্প ক্রোড়স্থ শিশুকে দংশন করিতে সঙ্কুচিত হয়?' নাটকীয় চরিত্রের মুখে এই ভাষা অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক। সেইজন্যই প্রধানত তাহার চরিত্রটি কৃত্রিম হইয়াছে। তাহার চরিত্রের আর একটি প্রধান ত্রুটি, চরিত্রটি বাক্-সর্বস্ব ; একমাত্র ক্ষেত্রমণিকে উদ্ধার করা ব্যতীত যথার্থ কর্ম বা নাটকীয় আচরণের ভিতর দিয়া তাহার চরিত্রের বিকাশ হয় নাই। সে আদর্শ পিতৃভক্ত। সাহেবের নিকট হইতে বারবার অপমান ও উপহাস পাইয়াও সর্বদাই সে নীরব রহিয়াছে, কিন্তু

পিতার মৃত্যুর পর ৫০৲ টাকা সেলামী লইয়া সাহেবের নিকট 'গোরিব পিতৃহীন প্রজার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া শ্রাদ্ধের নিয়ম-ভঙ্গের দিন পর্যন্ত বুনন রহিত' করিতে 'ভিক্ষা' প্রার্থনা করিতেছে। দীনবন্ধুর বিশ্বাস, ইহা দ্বারা নবীনমাধবের পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠাই প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা হয় নাই, ইহা দ্বারা তাহার চরম কাপুরুষতাই প্রমাণিত হইয়াছে। অত্যাচারী নীলকর সাহেবের ষড়যন্ত্রে অন্যায়ভাবে তাহাব পিতার মৃত্যু হইল, সেই সাহেবের এই অন্যায় কার্যের প্রতিহিংসা গ্রহণ করিবার দৃঢ়তার মধ্যেই নবীনমাধবের পিতৃভক্তির যথার্থ পরিচয় প্রকাশ পাইতে পারিত, সেই পিতৃঘাতী শত্রুর নিকট 'ভিক্ষা' প্রার্থনার মধ্য দিয়া তাহা কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না। তারপর সাহেবের মুখে অপমানকর কথা শুনিয়া সেই দৃশ্যেই যে তাহার মূর্তি একেবারে বদলাইয়া গেল, তাহাও তাহার চরিত্রের মধ্যে আনুপূর্বিক সঙ্গতি রক্ষা করিতে ব্যর্থ হইয়াছে। বিশেষত এই সমগ্র বিষয়টি কোনও দৃশ্যের ভিতর দিয়া উপস্থিত না করিয়া কেবলমাত্র যে পরোক্ষ ভাষণের ভিতর দিয়া নাট্যকার প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও ইহা ফলপ্রসূ হইতে পারে নাই।

দীনবন্ধুর স্ত্রীচরিত্রগুলি নানা দিক হইতেই বিশেষত্বপূর্ণ হইয়াছে; তবে এ কথা সত্য যে, ভদ্রশ্রেণীর স্ত্রীচরিত্রগুলির মধ্যে সেই বিশেষত্ব ফুটিবার অবকাশ পায় নাই। গোলোক বসুর স্ত্রী সাবিত্রীর চরিত্রটি গোলোক বসুর চরিত্রেরই পরিপূরক। গোলোক বসু ধীর প্রকৃতির বৃদ্ধ ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও, অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া জেল হাজতের মধ্যেই আত্মহত্যা করিলেন; সাবিত্রীও পুত্রশোকের আঘাতে এক মুহূর্তেই উন্মাদিনী হইয়া গেলেন, তারপর যে মুহূর্তে জ্ঞানসঞ্চার হইল, সেই মুহূর্তেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। এই নাটকে অনেকেই নানাভাবে আত্মহত্যা করিয়াছে—গোলোকচন্দ্র নিজের গলায় নিজেই ফাঁসি দিয়াছেন, নবীনমাধব সাক্ষাৎ মৃত্যু জানিয়াও সাহেবকে নিরস্ত্র অবস্থায় আক্রমণ করিয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছে, সরলতাও উন্মাদিনী শাশুড়ীর পায়ের নীচে গলা পাতিয়া ধরিয়া তাহার উপর তাহাকে নৃত্য করিতে দিয়া কাল-কবলিত হইয়াছে; একমাত্র সাবিত্রীই উন্মাদিনী হইয়াছিলেন, তারপর যে মুহূর্তে তাঁহার জ্ঞান সঞ্চার হইল সেই মুহূর্তেই তিনি মৃত্যুবরণ করিলেন, সুতরাং ইহা আত্মহত্যার মতই আকস্মিক এবং ভয়াবহ। শোকের আঘাতে উন্মাদিনী হওয়ার মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছুমাত্র নাই, বিশেষত তাঁহার উন্মাদ-আচরণের মধ্যেও দীনবন্ধু একটি সঙ্গতি রক্ষা করিয়াছেন, কেবলমাত্র উন্মাদিনী করিয়াই তাঁহাকে ছাড়িয়া

দেন নাই। তবে উন্মাদের আচরণ সাহিত্যিক চরিত্র-বিশ্লেষণের অঙ্গীভূত হইতে পারে না, তথাপি ইহার মধ্যেও নাটকের একটি আনুপূর্বিক শিল্পসম্মত সঙ্গতি রক্ষা পাইয়াছে। তিনি মৃত পুত্রকে দেখিয়া এই পুত্রকে যে দিন প্রথম প্রসব করিয়াছিলেন, সেই দিনের কথা স্মরণ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার স্মৃতি সেইখানেই সীমাবদ্ধ হইয়া রহিল, পুত্রের জীবনের পথ ধরিয়া আর অগ্রসর হইয়া আসিতে পারিল না। মৃত পুত্রকে সদ্যপ্রসূত শিশু বলিয়া মনে করিয়া তাহার সঙ্গে সেই প্রকার আচরণ করিলেন—ইহাই তাঁহার উন্মাদনা। সুতরাং তাঁহার উন্মাদনা কোন উচ্ছৃঙ্খল আচরণের স্বেচ্ছাচারিতার মধ্য দিয়া প্রকাশ না পাইয়া একটি বিশেষ প্রণালীবদ্ধ হইয়াছিল।

নবীনমাধবের স্ত্রী সৈরিন্ধ্রীর চরিত্র একটি আদর্শ পত্নী, বধূ ও জা'র চরিত্র, তাহার জননী পরিচয়টি এখানে স্পষ্ট হইয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই, কারণ, বিপিন বলিয়া তাহার একটি পুত্রের এই নাটকে উল্লেখ মাত্র আছে, তাহার কোন পরিচয় নাই। গোলোকচন্দ্রের পরিবারের উপর সকল দিক হইতে পাঠক ও দর্শকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার জন্য নাট্যকার এই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত চরিত্রগুলিকে একান্ত আদর্শমুখী করিয়া তুলিয়াছেন, তাহার ফলে ইহাদের মধ্যে যে রক্তমাংসের সম্পর্ক আছে, তাহা মনে হয় না; সৈরিন্ধ্রীর চরিত্রও তাহাই হইয়াছে। সৈরিন্ধ্রী আদর্শ পত্নী, কিন্তু তাহার গুণ স্বামিসেবার প্রত্যক্ষ আচরণের ভিতর দিয়া প্রকাশ না পাইয়া কেবল মাত্র স্বামীকে 'প্রাণনাথ', 'হৃদয়-বল্লভ', জীবনকান্ত', ইত্যাদি সম্বোধনের মধ্য দিয়াই প্রকাশ পাইয়াছে। সেইজন্য তাহার চরিত্রের রসস্ফূর্তি সম্ভব হয় নাই।

সৈরিন্ধ্রী তাঁহার ছোট জা সরলতার মত শিক্ষিতা ছিলেন না, কারণ, তিনি তাহার নিকট বিদ্যাসাগরের বেতাল শুনিতেন, নিজে পড়িতে পারিতেন না। অথচ তাঁহার মুখে নাট্যকার পণ্ডিতী বাংলা ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। দীনবন্ধু এই সম্পর্কে অন্যত্র যে নীতি অনুসরণ করিয়াছেন, সৈরিন্ধ্রী সম্পর্কে তাহা করেন নাই। সৈরিন্ধ্রীর এই সংলাপটি লক্ষ্য করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। স্বগতোক্তিতে তিনি বলিতেছেন, 'আহা! আহা! প্রাণনাথ! যে জননীর অনাহারে এত খেদ করিতেছিলে, যে জননীর ক্ষীণতা দেখিয়া রাত্রিদিন পদ-সেবায় নিযুক্ত ছিলে, যে জননী কয়েক দিবস তোমাকে ক্রোড়ে না করিয়া নিদ্রা যাইতে পারিতেন না, সেই জননী তোমার নিকটে মূর্ছিত হইয়া পতিত আছেন,

একবার দেখিলে না! আহা! হা! বৎসহারা হাম্বারবে ভ্রমণকারিণী গাভী সর্পাঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রান্তরে যেরূপ পতিত হইয়া থাকে, জীবনাধার পুত্রশোকে জননী সেইরূপ ধরাশায়িনী হইয়া আছেন।' বাংলার নারীর একটি নিজস্ব ভাষা আছে. দীনবন্ধু তাহা জানিতেন, কিন্তু এখানে সৈরিন্ধ্রীকে সকল বিষয়ে আদর্শ করিতে গিয়া তাহার নিজস্ব ভাষা হইতেও তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন, সেইজন্য তাঁহার চরিত্র আদ্যোপান্ত কৃত্রিম হইয়া উঠিয়াছে।

'নীল-দর্পণ' নাটকের স্ত্রীচরিত্র পদী ময়রাণী দীনবন্ধুর অতি উচ্চ জীবন-বোধের ফল। তাহার চরিত্র অতি ঘৃণিত, কিন্তু তথাপি তাহার মধ্যে যে একটি শাশ্বতী নারীর আত্মা সর্বদাই সক্রিয় হইয়াছিল, নাট্যকার তাহা গোপন করেন নাই। তাহার আচরণ যান্ত্রিক নিয়মে অনুষ্ঠিত হয় নাই, প্রত্যেকটি আচরণেরই মর্মমূলে একটি সহজাত নারী-প্রবৃত্তির প্রভাব অনুভব করা যায়। সে রোগ সাহেবের উপপত্নী, কিন্তু এই কার্যের নীচতা সম্পর্কে সে অচেতন নহে। যে কোন কারণেই হউক, তাহাকে এই পথে আসিতে হইয়াছে, কিন্তু তথাপি সে যে তাহার স্বাভাবিক নারীহৃদয় বিসর্জন দেয় নাই, দিতে পারে না, নাট্যকার তাহাও দেখাইয়াছেন। ক্ষেত্রমণির সম্পর্কে রোগ সাহেব যে পাপ অভিলাষ তাহার নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার জন্য সাহেবের প্রতি তাহার ক্রোধ এবং ক্ষেত্রের নিষ্পাপ জীবনের প্রতি তাহার আন্তরিক সহানুভূতির সঞ্চার হইয়াছে। এই কথা সে সত্যই প্রাণ দিয়া অনুভব করে, যে ক্ষেত্রমণি 'আমারে দেখে ময়রা পিসি, ময়রা পিসি ব'লে কাছে আসে, এমন সোনার হরিণ মা নাকি প্রাণ ধরে বাঘের মুখে দিতে পারে।' কিন্তু সে নিতান্ত অসহায়া, রোগ সাহেবের লালসা-দৃষ্টি হইতে সে ক্ষেত্রমণিকে রক্ষা করিতে পারে না। তাহার এই একান্ত অসহায় অবস্থার কথা বাহির হইতে কেহই বুঝিতে পারে না, সকলে তাহাকে ঘৃণা করে, লোকের ঘৃণা তাহার দুঃসহ বোধ হয়। সামান্য এক রাখাল বালক যখন তাহাকে ক্ষেপাইতে আসে, সে তাহার বিরুদ্ধে তাহার একমাত্র অস্ত্র যে ক্ষুরধার রসনা, তাহাই প্রয়োগ করে। কিন্তু যখন ভদ্রপরিবারের শিশুরা পাঠশালা হইতে ফিরিবার পথে তাহাকে পথে পাইয়া ঠাট্টা করিতে আসে, তখন তাহার সেই অপমান দুঃসহ বোধ হয়। সে মিনতি করিয়া শিশুদের স্নেহার্দ্র স্বরে বলে, 'ছি বাবা কেশব, পিসি হই, এমন কথা বলে না।…ছি দাদা অম্বিকে, দিদিকে ও কথা বল্‌তে নেই।' তাহার নারীমনে সমাজের দশজনের মত সে বাঁচিয়া থাকিতে চায়; কেশবের পিসি হইয়া, অম্বিকার দিদি হইয়া সে গ্রামের

দশজনের মত জীবন যাপন করিতে চায়। নিঃসন্তান জীবনে সন্তানতুল্য শিশুর নিকট হইতে অপমান সে সহ্য করিতে পারে না। যখন তাহার অন্তরের এই পরিচয়টি প্রকাশ পায়, তখন তাহাকে ঘৃণা করিব কি তাহার জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করিব, তাহা বুঝিতে পারি না।

সে ভ্রষ্টা, কিন্তু নারীর যে একটি স্নকুমার গুণ লজ্জা, তাহা তাহার মধ্য হইতে তিরোহিত হইয়া যায় নাই। নবীনমাধব যখন সহসা তাহার সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন, তখন সে ক্ষিপ্র হস্তে মুখের উপর সুদীর্ঘ ঘোমটা টানিয়া দিয়া মনে মনে এই বলিয়া পলাইয়া গিয়াছে, 'ও মা, কি লজ্জা! বড়বাবুকে মুখখানা দেখালাম।' এক শাশ্বতী নারী তাহার ভিতর হইতে উঁকি দিয়া উঠিয়াছে. তাহার বহির্মুখী ঘৃণ্য জীবনাচরণ তাহা কোনদিক হইতেই রোধ করিতে পারে নাই। একটি নিতান্ত ঘৃণ্য জীবনেরও গভীরতম তলদেশ পর্যন্ত দীনবন্ধুর দৃষ্টি যে কি ভাবে প্রসারিত হইয়া গিয়াছে, ইহা অপেক্ষা তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে? যেখানে তাহার সহায়তায় রোগ সাহেব ক্ষেত্রমণির শ্লীলতা হানি করিতে উদ্যত হইয়াছে, সেখানেও সে ক্ষেত্রমণির চোখের জল দেখিয়া অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে ছাড়িয়া দিবার জন্য সাহেবকে অনুরোধ করিয়াছে। কিন্তু সে অনুরোধ যখন রক্ষা পায় নাই, তখন সাহেবকে অভিসম্পাত দিয়া বিদায় হইয়াছে। দোষে গুণে পাপে পুণ্যে মানুষের জীবন. কেবল দোষই হউক, কিংবা কেবল গুণই হউক, একান্তভাবে মানুষকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে না। দীনবন্ধু পদী ময়রাণীর ভিতর দিয়া তাহাই অনুভব করিয়াছেন। পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে পতিতের প্রতি যে সহানুভূতির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছিল, পদী ময়রাণীর মধ্যেই তাহার সূচনা দেখা যায়। এই দিক দিয়া দীনবন্ধু আধুনিক বস্তুতান্ত্রিক কথাসাহিত্যিকদিগেরও অগ্রদূত বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়।

দীনবন্ধুর অন্যতম সার্থক স্ত্রী-চরিত্র আহুরী। আহুরীর পরিহাস-রসিকতার ভিতর দিয়াই প্রধানত দীনবন্ধুর প্রতিভার একটি বিশিষ্ট গুণ প্রকাশ পাইয়াছে-- তাহা তাঁহার হাস্যরস সৃষ্টির প্রতিভা। প্রকৃত হাস্যরসের উপকরণ যে কেবলমাত্র জীবনের উপরিস্তরেই লঘুভাবে বিচরণ করে, তাহা নহে—পূর্বেই বলিয়াছি, 'উৎকৃষ্ট হাস্যরসের মূলে একটা অতি উচ্চ রস-কল্পনা আছে।' আহুরীর হাস্যরসও এই উচ্চ রস-কল্পনার উপর ভিত্তি করিয়াই রচিত হইয়াছে। আহুরীর বঞ্চিত জীবনের প্রতি ব্যাপক সহানুভূতিই এই হাস্যরসের ভিত্তি। সুতরাং

দেখা যায়, তাহার পরিহাস-রসিকতা একটি বিশেষ প্রণালীবদ্ধ হইয়াই প্রকাশ পাইয়াছে। এখানে আহুরীর অতৃপ্ত জীবন-তৃষ্ণা পরিহাসের বিষয় হইয়াছে। সে তাহার বয়স স্বীকার করিতে চাহে না। সে কানে ভাল শুনিতে পায় না, ডান দিককে ডাইনী মনে করিয়া তাহাকে ডাইনী বলা হইয়াছে বলিয়া অভিমান করে, সে বলে 'মুই কি ডান হবার মত বুড়ো হইচি?' সে বৃদ্ধা, কিন্তু কোন পারমার্থিক বিষয়ে তাহার মন নিবিষ্ট হইতে পারে নাই, পার্থিব বিষয়ই এখনও তাহার মনে কৌতূহল সৃষ্টি করে। সে বাল-বিধবা, বিদ্যাসাগর 'নাড়ে'র (রাঁড়ের—বিধবার) বিয়ে দেয়, এই বিষয়েই তাহার কৌতূহল। তাহার মতামত কেহ জিজ্ঞাসা না করিলেও, সে এই বিষয়ে নীরব থাকিতে পারে না, গায়ে পড়িয়া নিজের মতামত ব্যক্ত করে,—'নাকি দুটো দল হয়েছে, মুই আজাদের দলে।' কিন্তু ইহা তাহার মুখের কথা হইতে পারে, মনে মনে যে সে বিদ্যাসাগরেরই দলে, তাহা বুঝিতে পারা যায়; কারণ, এখনও সে স্বপ্ন দেখে তাহারও বিবাহ হইলেও হইতে পারে, কারণ, আইনের বাধা উঠিয়া গিয়াছে। সে তাহার বহুকালাতিক্রান্ত দাম্পত্য জীবনের স্মৃতি পরম আগ্রহভরে স্মরণ করিয়া সুখ পায়,—'মিনসের মুখখান মনে পড়লে আজো আমার পরাণডা ডুকরে কাঁদে ওটে। মোরে বড্ডি ভাল বাসতো। মোরে বাউ দিতে চেয়েলো।··· মোরে ঘুমুতি দিত না, ঝিমুলি বল্‌তো, ও পরাণ ঘুমুলে।' ইহার ভিতর দিয়াই তাহার জীবন-তৃষ্ণা যে এখনও কত গভীর, তাহা বুঝিতে পারা যায়। যে বয়সে লোক পারমার্থিক চিন্তায় দিন কাটায়, সেই বয়সে সে এখনও বহুকাল-বিস্মৃত দাম্পত্য জীবনের সুখস্বপ্নে বিভোর। সুতরাং সে কেন বিধবাবিবাহের বিরোধী দলের সঙ্গে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে যাইবে? এমন কি, যখন সে রেবতীর মুখে ক্ষেত্রমণির প্রতি রোগ সাহেবের পাপ-লালসার কথা শুনিতে পাইল, তখন সে নিজেও নিজের সম্বন্ধে অনুরূপ আশঙ্কা করিয়া এক অজানিত আনন্দের স্পর্শ অনুভব করিল, 'সাহেবের কাছে কি মোরা যাতি পারি, গোন্দো থুথ্! প্যাজির গোন্দো!—মুই ত আর একা বেরোব না, মুই সব সইতে পারি, গোন্দো সইতি পারি নে···মাগো যে দাড়ি! কথা কয় যেন বোকা ছাগলে ক্যাবা মারে। দাড়ি প্যাজ না ছাড়লি মুই তো কখনই যাতি পারবো না।' তাহার মনটি এখানে দর্পণের মত যেমন স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তাহা হইতে এ কথা কিছুতেই মনে করা যাইতে পারে না যে, সে বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধাচারী রাজা রাধাকান্ত দেবের মতাবলম্বী। সে বর্ষীয়সী বিধবা হওয়া সত্ত্বেও যে

বিষয়ের আলোচনায় আনন্দ অনুভব করে, তাহা এই মতবাদ পোষণ করিবার অনুকূল নহে। তাহাকে কেহ জিজ্ঞাসা না করিলেও সে গায়ে পড়িয়া প্রচার করিয়া বেড়ায়, সে রাজাদের দলে; তাহার অর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট যে সে বিদ্যাসাগরেরই দলে। দীনবন্ধু পরবর্তী কালে তাঁহার 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' প্রহসনে এক বৃদ্ধের বিবাহ-সাধের মধ্য দিয়া যেমন তাহার অতৃপ্ত জীবন-তৃষ্ণারই পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন, ইহার মধ্যেও তাহাই করিতে চাহিয়াছেন। ইহাদের উভয়ের মধ্যেই এক উচ্চ রসকল্পনা সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

কৃষক-বালিকা ক্ষেত্রমণির চরিত্রটি স্বাভাবিকতার গুণে অপূর্ব শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। তিনটি মাত্র দৃশ্যে তাহার আবির্ভাব হইলেও এই নাটকের সমগ্র শক্তি যেন তাহার উপরই কেন্দ্রিত হইয়াছে। কারণ, পূর্বাপর সঙ্গতি ও স্বাভাবিকতার কথা বিচার করিতে গেলে ইহার তুল্য চরিত্র এই নাটকে অল্পই আছে। তাহার শক্তি কেবলমাত্র সহজাত বৃত্তির মধ্যেই বিধৃত। সহজাত বৃত্তির কার্যকারিতা অভ্যাসায়ত্ত গুণ অপেক্ষা সর্বদাই অধিকতর শক্তিশালী হইয়া থাকে। সেইজন্য এই নাটকের মধ্যে তাহার যে শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, অন্যান্য চরিত্রে তাহা সুলভ হইয়া উঠে নাই।

মাতাপিতার একমাত্র সন্তান ক্ষেত্রমণি জীবনের একটা রূপই মাত্র এতদিন প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাহা স্নেহ; তাহার সদ্য বিবাহ হইয়াছে, বিবাহের মধ্য দিয়া স্বামি-প্রেম যে তাহার কত সত্য ছিল, তাহা অত্যাচারীর হাত হইতে তাহার নারীধর্ম রক্ষা করিবার শক্তির মধ্যেই প্রকাশ পাইয়াছে। যে বালিকার জীবনে মাতাপিতার স্নেহ সত্য, স্বামিপ্রেম সত্য, তাহার জীবনে কিসের অভাব? ক্ষেত্রমণির জীবনে কিছুরই অভাব ছিল না। আসন্ন মাতৃত্বের সম্ভাবনায় তাহার ক্ষুদ্র নারীজীবনের সকল দিক পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবার সম্ভাবনাও দেখা দিয়াছিল। কিন্তু এমন সময় সেই কুসুম-পেলব গ্রাম্য বালিকার কমনীয় জীবনের উপর শ্যেন পক্ষীর বজ্র নখরের নিষ্ঠুর আঘাত আসিয়া বাজিল। জীবনের এই কলুষিত নিষ্ঠুর রূপ ইতিপূর্বে সে প্রত্যক্ষ করে নাই, ইহা হইতে আত্মরক্ষার অভ্যাস সে আয়ত্ত করে নাই। সেইজন্য আত্মরক্ষার সহজাত জৈব শক্তিই তাহার মধ্যে আপনা হইতে বিকাশ লাভ করিল। প্রবল অত্যাচারীর হাত হইতে সে জীবনের বিনিময়ে আপনার নারীধর্ম রক্ষা করিল। নারী—সে অসহায়া বালিকাই হউক, কিংবা শক্তিশালিনী যুবতীই হউক, সে যে তাহার সহজাত শক্তি দ্বারাই তাহার নারীধর্ম রক্ষা করে,

সমাজ ও শাস্ত্রের রক্তচক্ষু দেখিয়া তাহা কদাচ করে না, অত্যাচারী উড সাহেবের হাত হইতে ক্ষেত্রমণির আত্মরক্ষার এই শক্তি প্রয়োগের মধ্যেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। নারীর এই শক্তি সহজাত, সেইজন্য ইহা এত শক্তিশালী। দীনবন্ধু ক্ষেত্রমণির আচরণের ভিতর দিয়া এই সুগভীর জীবন-সত্যটি প্রকাশ করিয়াছেন।

কৃষক-পত্নী রেবতীর চরিত্রটিও স্বাভাবিকতার গুণে অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। স্নেহের একমাত্র কন্যা সম্পর্কে এক অশুভ আশঙ্কা লইয়া সে নাট্যকাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, সেই কন্যার শবদেহবাহীদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কপাল চাপড়াইতে চাপড়াইতে সে কাহিনী হইতে বিদায় লইয়া গিয়াছে—মুহূর্তের জন্যও স্বস্তির মধ্যে তাহাকে আমরা দেখিতে পাই নাই। যাহাকে বিবাহ দিয়া সে পরের হাতে তুলিয়া দিয়াছিল, তাহাকে লইয়াই তাহার অশান্তিতে প্রতিটি মুহূর্ত কাটিয়াছে, তারপর একদিন চরম দুর্ভাগ্যের মধ্যে তাহা তাহার জীবনে শ্মশানের অনির্বাণ চিতাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিয়া গিয়াছে। তাহার প্রকৃতি সরল, শিশুর মত নির্বোধ ও অসহায়। জীবনে চরম বিপদের দিন যখন আসিয়াছে, তখন নিজের অসহায়তা করুণভাবে উপলব্ধি করিয়া নবীনমাধবের কাছে সাহায্যের জন্য ছুটিয়া গিয়াছে, মৃত্যুপথযাত্রিণী কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া অসহায়ভাবে স্বামীর গলা ধরিয়া কাঁদিয়াছে। সে পুত্রসন্তানহীনা এবং একমাত্র কন্যা-সন্তানের জননী। জামাতাকে অল্পদিনের মধ্যেই পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া পুত্রের অভাব পূর্ণ করিয়াছিল, কিন্তু কন্যার বিচ্ছেদের আশঙ্কায় সেই জামাতার সঙ্গে বিচ্ছেদের ভাবনায় তাহার হৃদয় অধীর হইয়া উঠিল। জননীর স্নেহ ও তাহার মধ্যে যে অকৃত্রিম পরিচয় লাভ করিয়াছে, তাহাই ইহা হইতে প্রমাণিত হয়। রেবতীর ভাষা কৃষক অন্তঃপুরের অকৃত্রিম ভাষা, রেবতীর আচরণ সর্বসংস্কারমুক্ত আদিম জননীর অকৃত্রিম স্নেহ-সুলভ আচরণ, রেবতীর বেদনা শাশ্বতী জননীর চিরন্তন অন্তর্বেদনা—এই নাটকের মধ্যে ইহা সার্থক রূপ লাভ করিয়াছে। দীনবন্ধু এই ক্ষুদ্র চরিত্রটির রূপায়ণে ইহার প্রতি যে সুগভীর সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাহা সুলভ নহে।

গ্রাম্য কৃষকের চরিত্রের মধ্যে রাইচরণের চরিত্রটি একদিক দিয়া যেমন দীনবন্ধুর বাংলার কৃষক-জীবন সম্পর্কিত সুগভীর অভিজ্ঞতার ফল, তেমনই অত্যাচারী মানবতার প্রতি তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতির পরিচায়ক। রাইচরণ কৃষক, সে নিজ হাতে লাঙ্গল ঠেলিয়া মাঠে চাষ করে। মাটির সঙ্গে ক্ষেতের

সঙ্গে তাহার যে সম্পর্ক, সেই সম্পর্ক এই নাটকে আর কোনও কৃষকের ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া সে মাঠের জমি চাষ করে বলিয়া জমির সঙ্গে তাহার যে প্রত্যক্ষ পরিচয়, ইহার গুণাগুণ সম্পর্কে তাহার যে জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহা আর কাহারও মধ্যে পাওয়া যায় না। সেইজন্যই সাঁপোলতলার জমি সম্পর্কে সে বলিতে পারে, 'আহা জমি তো না, য্যান সোঁনার চাঁপা। এক কোন কেটে মহাজন কাৎ কত্তাম'। তাহার মনপ্রাণ এই জমির মধ্যে বাঁধা পড়িয়া আছে। সুতরাং তাহারই চোখের সম্মুখে যখন তাহার সংবৎসরেব আহারের সম্বল এই জমির বুকে নীলকরের আমিন দাগ মারিতে লাগিল, তখন তাহার মনে হইল, 'মুই বুঝব কি, জমিতি দাগ মার্‌তি নাগলো, মোর বুকি য্যান বিদে কাটি পুড়য়ে দিতি নাগ্‌লো'। রাইচরণের সমস্ত আচরণের মধ্যে তাহার জমির প্রতি এই একান্ত আসক্তির কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। কাঁধে লাঙ্গল, সর্বাঙ্গে কাদা মাখা, বলিষ্ঠ পেশল বাহু, বাহিরে দুর্জয় ক্রোধ, অন্তরে প্রচ্ছন্ন ভীরুতা—এই তাহার পরিচয়। কুঠিতে ধরিয়া লইয়া গিয়া তাহার সম্মুখেই সাধুচরণকে উড্‌ সাহেব যখন শ্যামচাঁদ প্রহার করিতে উদ্যত হইল, তখন রাইচরণ অন্তরের ক্রোধ অন্তরেই চাপিয়া রাখিয়া দাদাকে পরামর্শ দিল, 'ও দাদা, তুই চুপ দে, ঝা হ্যাকে নিতি চাচ্চে হ্যাকে দে, ক্ষিদের চোটে নাড়ী ছিঁড়ে পড়্‌লো, সারা দিনটে গ্যাল, নাতিও পালাম না, খাতিও পালাম না।' রেবতী বলিয়াছে, সে ডব্‌কা ছেলে, এক বেলায় সে কতবার খায়। সেইজন্য নীলকুঠিতে এই দুরন্ত অপমানের সম্মুখে দাঁড়াইয়াও তাহার ক্ষুধার কথাই স্মরণ হইল। তাহার ভাষা ও আচরণের মধ্যে এমন একটি বলিষ্ঠতা প্রকাশ পাইয়াছে যে, তাহার গুণেই তাহার চিত্রটি চোখের সম্মুখে যেন রক্তমাংসে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। চাষার ভাষা ও চাষার আচরণ ইহার মধ্যে নিখুঁত ও সজীব হইয়া উঠিয়াছে।

তোরাপ একজন মুসলমান কৃষক। রাইচরণের মত তাহাকে লাঙ্গল কাঁধে কিংবা মাঠের কাদা মাখা শরীরে দেখিতে পাই না সত্য, কিন্তু তথাপি সহজ মানুষের একটি বলিষ্ঠ আচরণ তাহার মধ্য দিয়াও প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার চরিত্রে একটু ধর্মবোধ আছে, রাইচরণে তাহা নাই। কিন্তু এই ধর্মবোধ তোরাপ কোন শাস্ত্র পাঠ করিয়া লাভ করে নাই, ইহা তাহার সহজাত বৃত্তির অন্তর্নিবিষ্ট গুণ মাত্র। তাহাকে গোলোকচন্দ্রের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার জন্য নীলকুঠিতে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া আসা হইয়াছে। সে আসিতে

বাধ্য হইয়াছে, কিন্তু সাক্ষ্য দিবার কথাটা কিছুতেই মনের মধ্যে স্বীকার করিয়া লইতে পারিতেছে না। তাহার সহজাত ধর্মবোধই ইহার কারণ। সে পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত অন্তরে অন্তরে গর্জন করিতে থাকে ;—সে প্রাণ দিতে পারে, কিন্তু মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে পারে না। এই বিষয়ে সে যাহা অনুভব করে, তাহা স্পষ্ট ভাষায় তাহার সমদুর্ভাগ্যভাগীদিগের নিকট প্রকাশ করে—'মারে কান ফ্যালায় না, মুই নেমোখ্যারামি কত্তি পারবো না।' নিমকহারামি যে পাপ, তাহা সে কোন শাস্ত্র-গ্রন্থ পাঠ করিয়া শিখে নাই ; তাহা হইলে এই চেতনায় তাহার মধ্যে এত শক্তি সঞ্চারিত হইতে পারিত না ; ক্ষুধা-তৃষ্ণা যেমন মানুষের সহজাত জৈব বৃত্তি, এই নিরক্ষর মুসলমান কৃষকের মধ্যে এই ধর্মবোধ তাহার সেই প্রকার সহজাত জৈব বৃত্তির মতই বিকাশ লাভ করিয়াছে। সুতরাং ইহার মধ্যে আদর্শবাদের কিছুমাত্র স্পর্শ আছে বলিয়া মনে করা ভুল হবে। কিন্তু আত্মরক্ষার বৃত্তি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী জৈব বৃত্তি, নৈতিক ধর্মের শক্তি তাহা অপেক্ষা অনেক কম। সেইজন্য রোগ সাহেবের উদ্যত শ্যামচাঁদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে আত্মরক্ষার পথই সন্ধান করিয়া স্বগত বলে, 'বাবারে! যে নাদনা, অ্যাকন তো নাজি হই, ত্যাকন ঝা জানি তা করব।' বলিয়া প্রকাশ্যে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে সাহেবের নিকট রাজি হইয়া গেল। তাহার মধ্যেও একটু প্রচ্ছন্ন ভীরুতার ভাব আছে, তাহার ভিতর দিয়া তাহার মানবিক গুণের সার্থক বিকাশ হইয়াছে।

নিরক্ষর মুসলমান কৃষক তাহার অন্তরের ক্রোধ প্রকাশ করিতে যে ভাষা প্রয়োগ করে, তোরাপ সেই ভাষাই ব্যবহার করিয়াছে, দীনবন্ধু তাহা কোন দিক দিয়া মার্জিত করিয়া তাহাকে সৃষ্টি করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, 'তোরাপের ভাষা ছাড়িলে তোরাপের রাগ আর তোরাপের রাগের মত থাকে না।' এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

দীনবন্ধু তাঁহার 'নীল-দর্পণ' নাটকের সংলাপ রচনায় যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা লইয়া কিছু আলোচনার অবকাশ আছে। এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই বিষয়ে দীনবন্ধু যে পূর্ববর্তী ধারা পরিত্যাগ করিয়া নিজে একটি স্বাধীন ধারা অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটক 'নীল-দর্পণ' রচনার ছয় বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হয়। তাহার মধ্যে বাংলা সামাজিক নাটকে সংলাপ রচনার ভাষার যে আদর্শ গ্রহণ করা হইয়াছিল, দীনবন্ধু মূলত তাহাই অনুসরণ করিয়াছেন,

এই বিষয়ে কোন নূতন আদর্শ গ্রহণ করেন নাই। এমন কি, দেখা যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্তও তাঁহার সামাজিক প্রহসনগুলি রচনায় একই আদর্শ অনুসরণ করিয়াছিলেন। সুতরাং সেই যুগে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে বাংলা নাটকে সংলাপ রচনা করিবার একটি নিজস্ব ভাষা গড়িয়া উঠিয়াছিল, দীনবন্ধু তাহাই অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দীনবন্ধুর অভিজ্ঞতা এবং সহানুভূতির গুণে সেই ভাষাই আরও জীবন্ত ও শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে।

দীনবন্ধু যখন তাঁহার 'নীল-দর্পণ' নাটক রচনা করেন, তখন বাংলা গদ্যভাষার একটি মাত্র আদর্শ স্থির হইতে পারে নাই। বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রায় জন্ম-মুহূর্ত হইতেই সাধুভাষা ও চলিত ভাষার একটি দ্বন্দ্ব চলিয়া আসিতেছে। প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হইবার পর বুঝিতে পারা গেল, চলিত ভাষার অধিকার আর অস্বীকার করা সহজ নহে। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার আরও কয়েক বৎসর পর 'নীল-দর্পণ' রচিত হয়, সুতরাং একদিকে রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত নাটকের ভাষার প্রভাব, অন্য দিকে 'আলালের ঘরের দুলালে'র ভাষার প্রেরণা দীনবন্ধুকে 'নীল-দর্পণ' নাটকের চলিত ভাষায় সংলাপ রচনার প্রেরণা দান করিয়াছিল। বিশেষতঃ দীনবন্ধুর প্রতিভার মধ্যে যাহা বাস্তব, যাহা প্রত্যক্ষ, যাহা স্থূল তাহাই জীবন্ত করিয়া তুলিবার একটি বিশেষ ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে; সেইজন্য তিনি কৃত্রিম সাধুভাষা অপেক্ষা প্রত্যক্ষ চলিত ভাষার মধ্যে নিজের প্রতিভা বিকাশের অধিকতর সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন; অতএব সাধুভাষার রচনা অপেক্ষা চলিত ভাষার রচনাই তাঁহার অধিকতর শক্তিশালী হইয়াছে।

বাঙ্গালীর জীবনের সঙ্গে দীনবন্ধুর যোগ খুব নিবিড় ছিল বলিয়া তাঁহার রচনায় বাঙ্গালীর নিজস্ব প্রবাদ-প্রবচন ও বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ (idiom) ব্যবহারের যে প্রবণতা দেখা যায়, বাংলা সাহিত্যের অন্যত্র তাহা অত্যন্ত দুর্লভ। দীনবন্ধুর ভাষা এত শক্তিশালিনী হইবার ইহাই একটি বিশিষ্ট কারণ। 'নীল-দর্পণে'র ভিতর দিয়া পল্লীর যে জীবন তিনি রূপায়িত করিয়াছেন, প্রবাদ-প্রবচন-'ইডিয়ম' তাহার নিত্য সহচর; সুতরাং ইহা পরিত্যাগ করিয়া যদি সেই জীবন রূপায়িত করিতে যাইতেন, তবে তাহা নিতান্ত খণ্ডিত হইয়া পড়িত, তাহার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় প্রকাশ পাইত না। চরিত্রগুলি জীবন্ত করিয়া তুলিতে

তাহাদের ভাষাই প্রধান সহায়ক হইয়াছে। যেখানে ভাষা কৃত্রিম হইয়াছে, সেখানে চরিত্র-সৃষ্টিও ব্যর্থ হইয়াছে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, 'নীল-দর্পণ' রচনায় সংস্কৃত নাটকের দ্বারা দীনবন্ধু আদৌ প্রভাবান্বিত হন নাই। কিন্তু নবীনমাধব ও সৈরিন্ধ্রীর সংলাপে যেখানে 'প্রাণনাথ', 'হৃদয়-বল্লভ', 'প্রেয়সী', 'বিধুমুখী' ইত্যাদি পরস্পর সম্বোধন শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা যে বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা' ও 'সীতার বনবাসে'র অনুবাদ হইতে আসিয়াছে, তাহা অনুমান করিতে বেগ পাইতে হয় না। তবে তাহা প্রত্যক্ষভাবে সংস্কৃত নাটকের নিকট ঋণ অপেক্ষা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কৃত নাটকের অনুবাদের প্রভাবের স্বীকৃতি বলিয়া মনে করাই সঙ্গত।

'নীল-দর্পণে' নদীয়া-যশোহরের কৃষকের যে ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা দীনবন্ধুর বাস্তব অভিজ্ঞতা-প্রসূত। সেইজন্য ইহা শক্তিশালী। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, 'আদুরীর ভাষা ছাড়িলে, আদুরীর তামাসা আর আদুরীর তামাসার মত থাকে না, তোরাপের ভাষা ছাড়িলে তোরাপের রাগ আর তোরাপের রাগের মত থাকে না।' সুতরাং এই ভাষার গুণেই চরিত্রগুলি পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করিতে পারিয়াছে।

দীনবন্ধুর 'নীল-দর্পণ' নাটকের ভাষাগত যে ত্রুটিই প্রকাশ পা'ক না কেন, তাহার পরবর্তী সামাজিক নাটকে ব্যবহৃত ভাষা ইহা অপেক্ষা অনেক ত্রুটিহীন। ইহার কারণ, 'নীল-দর্পণ' তাঁহার সর্বপ্রথম গদ্যরচনা, ইতিপূর্বে তিনি প্রধানত কাব্যই রচনা করিয়াছেন। কাব্যের ভাষা কৃত্রিম ও অলঙ্কার-সমৃদ্ধ হইয়া থাকে, সেইজন্য 'নীল-দর্পণে'র সাধুভাষা রচনায় দীনবন্ধুর মধ্যে কৃত্রিমতা প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু পরবর্তী নাটকগুলি রচনার ভিতর দিয়া তিনি যে ভাষার সন্ধান পাইলেন, তাহা অনেকখানি কৃত্রিমতা মুক্ত হইয়া সহজ ও স্বচ্ছন্দ হইয়া উঠিল। সুতরাং কেবলমাত্র 'নীল-দর্পণ' নাটকের ভিত্তিতে দীনবন্ধুর ভাষা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সম্ভব নহে। তবে 'নীল-দর্পণ' নাটকের ভাষার একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহা বঙ্কিম-প্রভাবিত যুগের পূর্ববর্তী ভাষা। ইহার পর বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য রচনার আদর্শ বাংলা সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রেই নিজের প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। দীনবন্ধু যে তাহা দ্বারা প্রভাবিত হন নাই, তাহা বলিবার উপায় নাই।

দীনবন্ধুর দ্বিতীয় নাটক 'নবীন-তপস্বিনী'। নাটকখানি প্রিয় সুহৃদ্ বঙ্কিম-চন্দ্রকে উৎসর্গ করা হইয়াছে। 'নীল-দর্পণ' দীনবন্ধুর প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ও সুদূর-

প্রসারী করিয়াছিল। নিজের শক্তির উপর তখন নাট্যকারের কিঞ্চিৎ আস্থা জন্মিয়াছে। সেইজন্য সসঙ্কোচে উৎসর্গপত্রে তিনি লিখিয়াছেন, 'আমার "নবীন-তপস্বিনী" প্রকৃত তপস্বিনী—বসনভূষণবিহীন—স্থতরাং জনসমাজে যদি "নবীন-তপস্বিনী"র সমাদর হয়, তাহা সাহিত্যানুরাগী মহোদয়গণের সহৃদয়তার গুণেই হইবে।" বস্তুত, এই নাটকখানি দীনবন্ধু সাহিত্যিক বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়াই লিখিয়াছেন; প্রথম নাটকের মত ইহা উত্তেজনামূলক আবেগপ্রধান সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে রচনা করেন নাই। হাস্যরসিক কাব্যপ্রিয় দীনবন্ধু এখানে কিছু সাহিত্যিক রস পরিবেশন করিতে চাহিয়াছেন। দীনবন্ধু যে সেক্সপীয়র ও সংস্কৃত সাহিত্যের রোমাণ্টিক কাব্যাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন, এই নাটকে তাহার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। দীনবন্ধু প্রধানত হাস্যরসিক। হাস্যরসসৃষ্টিতেই তাঁহার প্রতিভার সম্যক্ বিকাশ হইয়াছে। হাস্যরস এই নাটকের মূল উপজীব্য না হইলেও তাহা ইহার একটি প্রধান অংশ জুড়িয়া আছে এবং দর্শকসাধারণের প্রধান আকর্ষণরূপে নাটকের সার্থকতা বিধান করিয়াছে। বস্তুত হাস্যরসিক দীনবন্ধু এবং রোমান্সসুলভ কল্পনাবিলাসী দীনবন্ধু এখানে একত্র অবস্থান করিতেছেন।)

এই নাটকের কাহিনীভাগ এইরূপ :—নিঃসন্তান রাজা রমণীমোহনের জ্যেষ্ঠ মহিষী নিরুদ্দিষ্টা এবং কনিষ্ঠা মহিষী বিগতা হওয়ায় তাঁহার জন্য পাত্রী অন্বেষণ চলিতেছিল। সভাপণ্ডিত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের একমাত্র কন্যা সর্বগুণসম্পন্না পরমাসুন্দরী কামিনীই যে রাজমহিষী হইবার উপযুক্তা সে বিষয়ে সভাসদের একমত। রাজা কিন্তু সর্বদাই ম্রিয়মাণ থাকেন। বহু দিন পরে বড় রাণীর জন্য তাঁহার শোক উথলিয়া উঠিল। রাজমাতা ও ছোট রাণীর অমানুষিক অত্যাচারে এবং রাজার অবিচারে মিথ্যাপবাদভীতা গর্ভবতী বড় রাণী যে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন—ইহাই সাধারণের বিশ্বাস ছিল। কিন্তু রাজসভায় বড় রাণীর লিখিত বহু পুরাতন একখানি পত্র পাঠে সকলে জানিতে পারে যে, বড় রাণী প্রাণত্যাগ করেন নাই। তিনি একটি পুত্র প্রসব করিয়াছেন। পত্রের শেষে প্রার্থনা ছিল এই যে, সেই পুত্র যদি কখনও রাজার সম্মুখে উপস্থিত হয়, তবে তিনি যেন তাহাকে কোলে স্থান দেন। রাজা বহু বৎসর অনুসন্ধানের পর তাহাদের পুনঃপ্রাপ্তির আশা ত্যাগ করিয়াছেন। নিজেকেই তাহাদের মৃত্যুর কারণ নির্ণয় করিয়া প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বনগমনের অভিপ্রায় রাজসভায় ব্যক্ত করিলেন। এমন

সময় বিদ্যাভূষণ মহাশয় বিজয় নামে এক যুবককে বন্দী করিয়া রাজদ্বারে বিচার-প্রার্থী হইলেন। বিজয় এ রাজ্যে নব আগন্তুক। এক তপস্বিনীর পুত্র বলিয়া তাহাকে কেহ কেহ জানিত। একদিন রাজোদ্যানে পুষ্পচয়নচ্ছলে বিজয় ও কামিনী উভয়ে উভয়ের রূপ-গুণ-মুগ্ধ হয়। তপস্বী বিজয়ের প্রতি অনুরাগবশত কামিনীর তপস্বিনী-বেশধারণে তাহার মাতা সুরমা কন্যার মনোভাব জানিতে পারিলেন। বিদ্যাভূষণ কন্যাকে রাজার সহিত বিবাহ দিতে উদ্যোগী হইলেও সুরমার প্রতিকূলতায় তাহা ঘটিয়া উঠিল না। কামিনী একদিন বিজয়ের সহিত তাহার মাতা তপস্বিনীকে দেখিতে তাহাদের গৃহে আসিলে বিদ্যাভূষণ কন্যাপহরণের অভিযোগে বিজয়কে অভিযুক্ত করিলেন। রাজাদেশে তপস্বিনী ও কামিনীকে আনয়ন করা হইল। বিজয়প্রদত্ত কামিনীর অঙ্গুরীয় দ্বারা রাজা বিজয়কে আপন পুত্র এবং তপস্বিনীকে নিরুদ্দিষ্টা জ্যেষ্ঠা মহিষী বলিয়া চিনিতে পারিলেন। রাজারাণী এবং বিজয়-কামিনীর মিলনে এবং সিংহাসনারোহণে নাটকের পরিসমাপ্তি হয়। আরও একটি ক্ষুদ্র মিলনে উপসংহারটি মধুরতর হইল। মাধব নামে রাজার এক প্রিয় বয়স্য ছিল। সে মহারাণীর পরিচারিকা শ্যামাকে ভালবাসিত। শ্যামা এতদিন মহারাণীর সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিয়াছে। মহারাজ শ্যামাকে মাধবের সহিত বিবাহ দিয়া তাহারও বিরহের অবসান ঘটাইলেন।

এই মূল কাহিনীর সহিত একটি হাস্যরসাত্মক কাহিনীও নাটকের অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই কাহিনীর কেন্দ্র-চরিত্র হইতেছে রাজমন্ত্রী জলধর। অত্যধিক দৈহিক স্থূলতায় যেমনি ইহার আকৃতি, পরস্ত্রীর প্রতি আসক্তির হৃদয়দৌর্বল্যে তেমনি ইহার প্রকৃতিও ছিল অতি কুৎসিত এবং হাস্যাস্পদ। মন্ত্রীর কর্ম প্রকৃতপক্ষে সব কিছু নির্বাহ করে তাহার সহকারী বিনায়ক। বিনায়কের স্ত্রী মল্লিকা ছিল যেমনি রসিকা তেমনি চতুরা। মল্লিকার সখী রাজসদাগর রতিকান্তের সুন্দরী স্ত্রী মালতী। দুই সখীতে মিলিয়া ঘাটে জল আনিতে যায়। ঘাটের পথে জলধর তাহাদিগকে নানাভাবে উত্ত্যক্ত করিত। মালতীর নিকট একদিন সে প্রেমও নিবেদন করিল। ইহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য মল্লিকা এক কৌশল অবলম্বন করিল। জলধরকে সে জানাইল যে মালতী তাহার রূপগুণমুগ্ধা। কেলিগৃহে উভয়ের সাক্ষাতের সময় নির্দিষ্ট হইল। জলধর কেলিগৃহে উপস্থিত হইয়া মালতীর প্রতি উচ্ছ্বসিত প্রেমনিবেদন করিল এবং আপন স্ত্রী জগদম্বারও বহুবিধ নিন্দা

করিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মল্লিকার কৌশলে মালতীর বেশে সেখানে উপস্থিত ছিল স্বয়ং জগদম্বা। আকৃতি ও প্রকৃতিতে জগদম্বা জলধরের যোগ্যা স্ত্রী। জগদম্বার হাতে জলধরকে বহুবিধ নিগ্রহ ভোগ করিতে হইল। কিন্তু ইহাতে জলধরের শিক্ষা হইল না। সে তাহার প্রেম-পথের কণ্টক রতিকান্তকে দূর করিবার জন্য তাহার প্রতি হোঁদলকুৎকুৎ নামক এক অশ্রুতপূর্ব জীববিশেষ আরবদেশ হইতে ধরিয়া আনিবার জন্য রাজাজ্ঞা জারী করিল। মল্লিকা রতিকান্তকে বলিল যে, সে ঘরে বসিয়াই হোঁদলকুৎকুৎ ধরিয়া দিতে পারিবে। মল্লিকার পরামর্শানুযায়ী জলধরকে এক প্রেমপত্রিকার দ্বারা মালতীর গৃহে আহ্বান করা হইল। রতিকান্ত বিদেশে গমন করিয়াছে নিশ্চয় জানিয়া জলধর মালতীর কাছে আসিল। কিন্তু নেপথ্যে রতিকান্তের তর্জনগর্জন শব্দে তাহার প্রেম-নিবেদনে বাধা পড়িল। জলধর হাতে হাতে ধরা পড়ে আর কি! তাহার কাতর অনুনয়ে মল্লিকা তাহাকে বিভিন্ন গুপ্তস্থানে আত্মরক্ষা করিতে পরামর্শ দিল। জলধর একটা মুখস পরিয়া একবার আলকাতরার মধ্যে অন্যবার তুলার মধ্যে লুকাইয়া রহিল। পরে মল্লিকা তাহাকে খিড়কীর দরজা দিয়া বাহির করিয়া দিবার ছলে এক লোহার খাঁচার মধ্যে পুরিয়া দিল। আলকাতরার উপরে তুলা, পাট, শন ও রং লাগিয়া জলধরের মূর্তি এক কিম্ভূতকিমাকার জীব বিশেষের ন্যায় দেখিতে হইয়াছিল। রতিকান্ত তাহাকেই হোঁদলকুৎকুৎ বলিয়া রাজার কাছে উপস্থিত করিল। রাজা ক্রমে সমস্তই জ্ঞাত হইলেন। জলধর কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হইল বটে, কিন্তু তাহার সহজ রসিকতায় নিবৃত্তি হইল না।

নাটকের আখ্যানভাগের পরিকল্পনায় মৌলিকতার পরিচয় বেশি নাই। কাহিনীটিকে দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। একভাগ রোমান্স কল্পনায় বিজয়-কামিনীর কাহিনী; অন্যভাগে হাস্যরসের কল্পনায় জলধর-জগদম্বা-মালতী-মল্লিকার কাহিনী। প্রথম কাহিনীটি মোটামুটিভাবে 'নবীন-তপস্বিনী' রচনার দশ বার বৎসর পূর্বে সংবাদ-প্রভাকরে 'দম্পতী-প্রণয়' নামে একটি ক্ষুদ্র কাহিনীকাব্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেখানে বিজয়কে শুধু কাঞ্চন-নগরাধিপের পুত্র বলা হইয়াছে। রাজা রমণীমোহনের কোন বৃত্তান্ত তাহাতে নাই। কামিনীর অন্য অংশ সেক্সপীয়রের ফল্‌স্টাফের কাহিনী আদর্শ করিয়া রচিত। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, 'প্রকৃত ঘটনা, জীবিত ব্যক্তি, প্রাচীন উপন্যাস ইংরাজী গ্রন্থ এবং প্রচলিত খোসগল্প হইতে সার সংগ্রহ করিয়া দীনবন্ধু তাঁহার

অপূর্ব চিত্তরঞ্জক নাটকের চরিত্র সকলের সৃষ্টি করিতেন।' 'নবীন-তপস্বিনী'তে ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রাজা রমণীমোহনের বৃত্তান্ত কতক প্রকৃত। হোঁদলকুৎকুতের ব্যাপার প্রাচীন উপন্যাসমূলক; ***Merry Wives of Windsor*** হইতে নীত। বঙ্কিমচন্দ্র অন্যত্রও বলিয়াছেন, 'নবীন তপস্বিনী'র ছোটরাণীর বৃত্তান্ত প্রকৃত।'

রাজা রমণীমোহন বা বড়রাণী ছোটরাণীর সম্বন্ধে লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকিলেও, ইহা দ্বারা কোন বাস্তব রসের সৃষ্টি হয় নাই। নাটকটি উনবিংশ শতাব্দীর কোন সামাজিক কথাবস্তু লইয়া রচিত হইলে আমরা বাস্তব রস কিছু পাইতে পারিতাম। কিন্তু বিজয়-কামিনীর রোমান্স নাটকের কাহিনী ও একশ্রেণীর পাত্রপাত্রীকে একটু অতীতের ভাবলোক বা ছায়ালোকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছে। তাহার ফলে লেখকের উনবিংশ শতাব্দীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বিশেষ কিছুই কার্যকরী হইতে পারে নাই। অর্থাৎ অতীতের দ্বারা বর্তমানকে দেখা বা বর্তমান দ্বারা অতীতকে দেখা,—কোনটিতেই নাট্যকার কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই। বিজয়-কামিনীর রোমান্টিক মিলনকেই নাট্যকার মুখ্য করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু দীনবন্ধু কোমল মধুর উন্নত বা শান্ত কিছু কল্পনা বাস্তবজীবন ও জগৎ হইতে আহরণ করিতে পারেন নাই বলিয়াই তাঁহাকে কল্পনায় এই মূর্তিগুলি আঁকিতে হইয়াছে—দেশ ও কালকে একটু পশ্চাদ্বর্তী করিতে হইয়াছে। এই রোমান্টিক আবহাওয়ায় নাট্যকারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কোন বাস্তব রস সৃষ্টির সুযোগ পায় নাই। বড়রাণী-ছোটরাণীর বৃত্তান্ত আমাদের রূপকথার সুয়োরাণী-দুয়োরাণীর কথার প্রতিরূপের অধিক কিছু মনে হয় না। রাণী হইয়াও বড়রাণী সতীন ও শাশুড়ীর জ্বালায় দাসীর ন্যায় ব্যবহার পাইতেন রূপকথার এই প্রতিচ্ছবি উনবিংশ শতাব্দীর অভিজ্ঞতা যে সামান্য বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছে তাহাও কোন একটা বৈশিষ্ট্য লাভ করিতে পারে নাই। বিজয়-কামিনীর রোমান্সের পটভূমি হিসাবেই যেন এক রাজবংশের সৃষ্টি হইয়াছে—ইহাতে নাট্যকারের সামাজিক অভিজ্ঞতা ও ঐতিহাসিক জ্ঞানের কিছুমাত্র পরিচয় নাই। সংস্কৃত নাটক হইতেই নাট্যকার আপনার আদর্শ লইয়াছেন। রাজা, রাণী, মন্ত্রী, বিদূষক, রাজসভা ইত্যাদি দ্বারা রাজার ঠাট বজায় রাখিবার চেষ্টা হইয়াছে মাত্র—রাজোচিত ঐশ্বর্যের আর কোন পরিচয়ই ফুটিয়া উঠে নাই। রাজধানীকে একটি গ্রাম এবং রাজা

রমণীমোহনকে একটি গ্রাম্য জমিদারের ঊর্ধ্বে দীনবন্ধু স্থাপন করিতে পারেন নাই। যে মনোভাব লইয়া কবি দীনবন্ধু বিজয়-কামিনীর কাহিনী দ্বারা দম্পতীপ্রণয়ের রূপক হিসাবে কাব্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন—নাট্যরচনার মধ্যেও তাঁহার সেই মনোভাব কার্যকর হইয়াছে। কাব্যসৃষ্টিতে যাহা কোন দোষের কারণ হয় নাই, নাটকসৃষ্টিতে তাহা নানাবিধ ত্রুটির কারণ হইয়াছে। বিজয়-কামিনীর হঠাৎ দর্শন, রূপানুরাগ, দ্রুত প্রেমসঞ্চার, অঙ্গুরীয় বিনিময় ও কাব্যের সুরে প্রেমের প্রবল উচ্ছ্বাস প্রভৃতি সবই দীনবন্ধুর রোমান্স-প্রিয়তার ফল। কিন্তু এখানে রোমান্স সৃষ্টি সার্থক হয় নাই বলিয়া প্রেমের অতিদ্রুত অলক্ষিত সঞ্চরণ এবং সুদীর্ঘ কৃত্রিম উচ্ছ্বাসকে নাটকের ত্রুটি বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। সেক্সপীয়র বা কালিদাসের নায়ক-নায়িকার আদর্শ নাট্যকারকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। কামিনী যেন সর্বগুণসম্পন্না প্রাচীন নায়িকারই প্রতিনিধি। সে মাতাপিতার একমাত্র আদরের দুলালী। হৃদয়ের মাধুর্য, কোমলতা ও স্বাভাবিক লজ্জাশীলতায় তাহার চিত্রখানি নাট্যকার মনোরম করিতে চাহিয়াছেন। এদিক হইতে সে 'নীল-দর্পণে'র সরলতারই স্ফুটতর বিকাশ। কিন্তু ইহারও অধিক পরিচয় তাহার আছে। সে বিদুষী, বিবাহ-বিষয়ে তাহার নিজস্ব মতামতের একটা মূল্য আছে। সাধারণ সংসারে যে আপনার অকৃত্রিম সরলতা ও লজ্জাশীলতায় সকলের অন্তরালে মূক হইয়া ছিল, প্রেমের প্রবল আবেগ তাহাকে মুখর করিল। বিজয়ও কাব্যোচিত এক আদর্শ নায়ক। সতের বৎসরের যুবক হইলেও উন্নত চিত্তবৃত্তিতে সে চব্বিশ বৎসরের নায়কের তুল্য। সে ছিল জিতেন্দ্রিয় তপস্বী, কিন্তু প্রেমের আবেগে কামিনীর মতই সেও আপনাকে প্রকাশ করিল। রোমান্সের আবহাওয়ায় সুরমা চরিত্রটিও আদর্শায়িত হইয়াছে। দীনবন্ধুর নাটকে আত্মভোলা, শান্ত, নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন প্রকৃতির যে এক শ্রেণীর পুরুষ-চরিত্র আছে, রাজা রমণীমোহন যেন তাহারই প্রতিনিধি। তাঁহার ব্যক্তিত্বের কোনই দৃঢ়তা নাই, তিনি সর্বদাই অন্যের হাতের ক্রীড়নক।

যে হাস্যরসাত্মক কাহিনীটি মূল কাহিনীর সহিত সামান্য যোগসূত্র রক্ষা করিয়া বিকশিত হইয়াছে, তাহার নায়ক জলধর 'মেরী ওয়াইভস্ অব উইণ্ডসর'এর ফল্স্টাফ্ চরিত্রের আদর্শে চিত্রিত হইয়াছে। উইণ্ডসরের রসিক রমণীদের ফল্স্টাফ্‌কে লইয়া কৌতুক করা, ইহাই ছিল সেক্সপীয়রের মূল

বর্ণনীয় বিষয়—কিন্তু ইহার সহিত যুক্ত প্রেমের কাহিনীটিতেও পরিশেষে যেরূপ রসিকতার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা দ্বারা সেক্সপীয়রের নাটকটির ভাবসাম্য সুন্দরভাবে রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু 'নবীন-তপস্বিনী' নাটকের দুইটি ভাগ যেন দুই সুরে বাঁধা। উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করার চেষ্টা থাকিলেও সে চেষ্টা সার্থক হয় নাই।

এই হাস্যরসাত্মক কাহিনীটি রচনা করিতে দীনবন্ধু যে সর্বাংশেই সেক্সপীয়রকে অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা নহে—তাঁহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয়ও ইহাতে আছে। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার সাহিত্যিকদের নিকট ফলস্টাফের খুব আদর ছিল। ফলস্টাফ্ নিত্যকালের সামাজিক চরিত্র। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সমাজ-সংস্কারকদেরও এই চরিত্র বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁহার ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'মদ খাওয়া দায়, জাত থাকার কি উপায়' নামক সামাজিক চিত্রপল্লীতে অনুরূপ চরিত্র সর্বপ্রথম রূপায়িত করেন। এই পুস্তকের একটি চিত্রে প্যারীচাঁদ ফলস্টাফের অনুকরণে আগরভম সেন নামক এক চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন। দীনবন্ধু হোঁদলকুৎকুতের পরিকল্পনার জন্য প্যারীচাঁদের এই চরিত্রটির কাছেই ঋণী। প্যারীচাঁদ সেক্সপীয়ারকেই অনেকাংশে অনুকরণ করিয়াছেন। যেটুকুতে তিনি বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়াছিলেন, দীনবন্ধু তাহাই আত্মসাৎ করিয়া তাঁহার নাটকীয় কল্পনায় তাহার রূপ দিয়াছেন। আগরভম তাহার প্রণয়িনীর জন্য সঙ্কেতস্থানে অপেক্ষা করিতে গিয়া আলকাতরা, কলিচুন, তুলা প্রভৃতি দ্বারা অপূর্ব বেশে সজ্জিত হইয়াছিল। দীনবন্ধু ইহা হইতেই হোঁদলকুৎকুতের প্রেরণা পাইয়াছেন। ফলস্টাফ্ যেমন নাইট, জলধর তেমনি মন্ত্রী। শুধু মূল কাহিনীর সহিত যোগসূত্র রক্ষা করা ছাড়া তাহাকে মন্ত্রিত্বের মর্যাদা দিবার প্রয়োজন কিছুই ছিল না। ফলস্টাফের মত সেও নিজের রূপ-গুণ ও রসিকতায় নিজেই বিভোর। ফলস্টাফ রসিকতাসৃষ্টির সুসঙ্গত মাত্রাকে অতিক্রম করে নাই, কিন্তু নাট্যকারের উচ্ছ্বাসপ্রবণতায় জলধর সেই মাত্রা অনেকদূর অতিক্রম করিয়া গিয়াছে; ফলে অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর পরিহাস-রসিকতার সৃষ্টি হইয়াছে। নিছক কৌতুক সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই জলধরের 'চরম দুর্গতি' নির্দেশ করা হইয়াছে। কৌতুকরসের স্নিগ্ধকিরণচ্ছটায় নাটকের শান্তমধুর রসকে উজ্জ্বলতর করাই হয়ত নাট্যকারের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ইহাতে কৌতুকরসই দর্শকের মনে স্থায়ী হইয়াছে। অন্য কোন রস প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই।

মালতী ও রতিকান্তের মধ্যে মিস্টার ও মিসেস ফোর্ডের একটু ছায়া আছে, সেইজন্য ইহারা তত জীবন্ত হয় নাই। মল্লিকা দীনবন্ধুর একটি মৌলিক এবং সার্থক সৃষ্টি। সে দীনবন্ধুর বিদগ্ধা বাক্‌চতুরা নায়িকাদের অগ্রবর্তিনী। সহজ পরিহাস-রসিকতায় ও বাক্‌চাতুর্যে তাহাকে যেন মালতী ও কামিনীর বিপরীত সৃষ্টি হিসাবে অঙ্কিত করিয়া নাট্যকার চরিত্রের অপর এক দিকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। হাস্যরসিক দীনবন্ধু জলধর, জগদম্বা ও মল্লিকা প্রভৃতিকে তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে অতি সহজেই সুন্দররূপে চিত্রিত করিতে পারিয়াছেন। বিনায়ক-মল্লিকা যেন আধুনিক কালেরই এক সুখী দম্পতি। ইহাদের প্রত্যেকেরই পরিহাস-রসিকতায় দীনবন্ধু জাতীয় প্রকৃতিকেই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই নাটকে অভিনয়ের ব্যবহারিক দিকটির প্রতি নাট্যকার অধিকতর সতর্ক হইয়াছেন।

'লীলাবতী' দীনবন্ধুর তৃতীয় নাটক, ইহা মিলনাত্মক। এই নাটকখানি রচনার পূর্বে দীনবন্ধুর দুইখানি প্রসিদ্ধ প্রহসন প্রকাশিত হইয়াছে—'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো' ও 'সধবার একাদশী'। অতএব দীনবন্ধু তখন তাঁহার প্রতিভার মধ্য-গগনে বিরাজিত। তথাপি একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, 'লীলাবতী' তাঁহার এই মধ্যাহ্ন-প্রতিভার পরিচয় বহন করিতে পারে নাই—ইহার দোষত্রুটি অনেক, তাহা ক্রমে বিচার করা যাইবে।

'লীলাবতী' নাটকের মূল উদ্দেশ্যরূপে দীনবন্ধু কালিদাসের 'রঘুবংশ' হইতে নিম্নোল্লিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

> পরস্পরেণ স্পৃহণীয়শোভং
> নচোদদং দ্বন্দ্বমযোজয়িষ্যৎ।
> অস্মিন্ দ্বয়ে রূপবিধান যত্নঃ
> পত্যুঃ প্রজানাং বিতথোঽভবিষ্যৎ॥

উৎসর্গপত্রে দীনবন্ধু উল্লেখ করিয়াছেন, 'অপরিমিত-আয়াস-সহকারে লীলাবতী নাটক প্রকটন করিয়াছি।' এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে যে, স্বভাব-কবির মত স্বভাব-নাট্যকার বলিয়া কোন কথা যদি ব্যবহার করা যায়, তবে তাহা দীনবন্ধুর উপর প্রযোজ্য। দীনবন্ধু স্বভাব-নাট্যকার এবং নাটকের বিশেষ একটা দিকই তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভার অনায়াস-সৃষ্টি বলিয়া মনে হইবে। তাঁহার প্রতিভা আয়াস-লব্ধ নহে, সহজ-লব্ধ; অতএব যে নাটক তিনি 'অপরিমিত আয়াস-সহকারে' রচনা করিয়াছেন বলিয়া

নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন, সেই নাটক যে তাঁহার প্রতিভার অনুগামী নহে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। প্রহসনগুলিই দীনবন্ধুর অনায়াস-সৃষ্টি, গুরু-বিষয়ক নাটকগুলি তাঁহার সকলই 'অপরিমিত-আয়াস-সহকারে' রচিত; সেইজন্যই দীনবন্ধুর প্রহসনগুলি সহজ ও নাটকগুলি কৃত্রিম বলিয়া মনে হইবে। তবে 'আয়াস-সহকারে' যে সত্যকার উচ্চাঙ্গের নাটক রচিত হয় না, তাহা নহে—যাঁহারা সতর্ক ও সজাগ শিল্পী তাঁহাদের আয়াস-সৃষ্টি উচ্চতম মর্যাদা লাভের অধিকারী হইতে পারে। কিন্তু দীনবন্ধুর প্রতিভা সেই স্তরের ছিল না; দীনবন্ধুর শিল্প ও রসবোধ তাঁহার স্বভাবেরই অঙ্গ ছিল, ইহার সঙ্গে তিনি তাঁহার বহিরায়ত্ত শিক্ষা, সংস্কার ও সাধনার সার্থক সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া লইতে পারেন নাই। এখানে 'লীলাবতী'র কাহিনীটি সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইবে—

জমিদার হরবিলাসের এক পুত্র ও দুই কন্যা; পুত্রের নাম অরবিন্দ ও কন্যাদিগের নাম তারা ও লীলাবতী। হরবিলাস বিপত্নীক। প্রথম বয়সে কাশীতে বাস করিতেন। তারা যখন নিতান্ত বালিকা, তখন এক দাসী তাহাকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়া এক ধনী হিন্দুস্থানীর নিকট বিক্রয় করিয়া দেয়, তদবধি তাহার আর কোন সন্ধান নাই। অরবিন্দের স্ত্রীর নাম ক্ষীরোদবাসিনী। একদিন অরবিন্দ তাহার স্ত্রী-ভ্রমে চাঁপা নাম্নী তাহার পিতার ঔরসজাত এক দাসী-কন্যাকে আলিঙ্গন করে, দশজনের মুখে এই ঘটনা রাষ্ট্র হইয়া কুৎসিত আকার লাভ করে, লজ্জা এবং অনুতাপে অরবিন্দ গৃহত্যাগ করিয়া যায়। তাহারও কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না, চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়াছে যে, অরবিন্দ জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। লীলাবতী শিক্ষিতা ও সুন্দরী, গৃহে সে-ই তাহার পিতার একমাত্র অবলম্বন। হরবিলাস তাহার গৃহে ললিতমোহন নামক একটি বালককে শিশুকাল হইতেই পুত্রস্নেহে প্রতিপালন করিতেছিলেন, সে এখন উচ্চশিক্ষিত ও উদারমতাবলম্বী যুবক। বার বৎসর কাল অরবিন্দের জন্য অপেক্ষা করিয়া হরবিলাস ললিতকে পোষ্য-পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া নিজের বংশধারা রক্ষা করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এদিকে বার বৎসর প্রায় পূর্ণ হইতে চলিল দেখিয়া হরবিলাস ললিত সম্পর্কে তাঁহার এই সঙ্কল্প সকলের নিকট ব্যক্ত করিলেন। লীলাবতীও বিবাহযোগ্যা হইয়াছে, তিনি নদের চাঁদ নামক এক মূর্খ ও চরিত্রহীন কুলীনসন্তানের সঙ্গে লীলাবতীর বিবাহ স্থির করিয়াছেন। লীলাবতী ললিতমোহনকে

ভালবাসিত, ললিতও লীলাবতীকে বাল্যকাল হইতে ভালবাসিয়া আসিয়াছে; সকলে ললিতের সঙ্গে লীলাবতীর বিবাহ দিবার জন্য হরবিলাসকে বার বার অনুরোধ করিতে লাগিল, কিন্তু তিনি কুলীন নদের চাঁদের নিকট কন্যাদান করিতেই দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়া রহিলেন, ললিতকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করা স্থির করিলেন। নদের চাঁদ ধনী জমিদার ভোলানাথ চৌধুরীর ভাগিনেয়, ভোলানাথ এই বিবাহের প্রস্তাবে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। হরবিলাস তাঁহার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের কথা উপেক্ষা করিয়াই নদের চাঁদের সঙ্গেই লীলাবতীর বিবাহের প্রস্তাব এক রকম স্থির করিলেন। ইতিমধ্যে একদিন ললিতমোহন গৃহ হইতে নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। কিছুদিনের মধ্যেই এক ব্রহ্মচারী আসিয়া হরবিলাসকে সংবাদ দিল যে, অরবিন্দ জীবিত আছে, শীঘ্রই সে গৃহে ফিরিবে, এই অবস্থায় পোষ্যপুত্র গ্রহণ করা যেন তিনি অন্তত এক মাসের জন্য স্থগিত রাখেন। ললিতের গৃহত্যাগের পর হইতেই হরবিলাস কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। যোগজীবন নামক এক সন্ন্যাসী আসিয়া একদিন পরিচয় দিল যে, সে-ই অরবিন্দ, কয়েকটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অরবিন্দ বলিয়া সে গৃহীতও হইল, ক্ষীরোদবাসিনীও তাহাকে স্বামী বলিয়া নিজের কক্ষে গ্রহণ করিল। হরবিলাস পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। ইতিমধ্যে নদের চাঁদ আসিয়া প্রচার করিয়া দিল যে, যোগজীবন প্রকৃত অরবিন্দ নয়, পোষ্যপুত্র গ্রহণ স্থগিত করিবার জন্য ক্ষীরোদবাসিনীর সহযোগিতায় ললিতমোহন এই জাল অরবিন্দকে আনিয়া সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে। হরবিলাস ললিতের উপর সন্দিগ্ধ হইলেন। ইতিমধ্যে ললিতের সঙ্গে প্রকৃত অরবিন্দের কাশীতে সাক্ষাৎ হইল, অরবিন্দ বার বৎসর গৃহে ফিরিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়া কাশীতে এক কলেজে শিক্ষকতা করিতেছিল; বার বৎসর পূর্ণ হইয়াছে দেখিয়া ললিতকে সঙ্গে লইয়া সে গৃহে ফিরিয়া আসিল, ফিরিয়া দেখিতে পাইল, এক জাল অরবিন্দ তাহার গৃহে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। কে জাল ও কে প্রকৃত ইহার মীমাংসা হওয়া কঠিন হইয়া উঠিল, উভয়েই প্রকৃত অরবিন্দ বলিয়া দাবি করিতে লাগিল। অবশেষে জাল অরবিন্দ তাহার পরিচয় দিয়া বলিল যে, সে প্রকৃতপক্ষে যোগজীবন নামক সন্ন্যাসী—অরবিন্দকে সে পূর্বে তীর্থস্থানে দেখিয়াছে এবং তাহার সঙ্গে পরিচিত হইয়া সে তাহার দুইবার প্রাণ রক্ষা করিয়াছে। অরবিন্দ তাহাকে চিনিল, কিন্তু এখন সমস্যা দাঁড়াইল

ক্ষীরোদবাসিনীকে লইয়া ;—সে তিন চার দিন যোগজীবনকে স্বামিজ্ঞানে তাহার সঙ্গে বাস করিয়াছে, অতএব সে ধর্মে পতিত হইয়াছে। এতক্ষণে যোগজীবন তাহার প্রকৃত রূপ ধারণ করিয়া দেখাইল যে, সে স্ত্রীলোক ; সকলে চিনিল, সে-ই চাঁপা—হরবিলাসের ঔরসজাত এক দাসীর কন্যা। ক্ষীরোদবাসিনীর সতীত্বে আর কাহারও কোন সংশয় রহিল না। এদিকে দেখা গেল, বিপত্নীক জমিদার ভোলানাথ চৌধুরী অপহৃতা তারাকে অহল্যা নামে পরিচয় দিয়া বিবাহ করিয়া গৃহে আনিয়া তুলিয়াছেন—যোগজীবনরূপিণী চাঁপার চেষ্টাতেই তাহাও সম্ভব হইয়াছে। সকলের মিলন হইল, শুভলগ্নে ললিতের সহিত লীলাবতীর বিবাহ হইয়া গেল।

কাহিনীটি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহা অত্যন্ত জটিল ; কতকগুলি নিরুদ্দিষ্ট ও অদৃশ্য চরিত্রের উপর কেন্দ্র করিয়া কাহিনীর ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে—এই অদৃশ্য চরিত্রগুলিই দৃশ্য চরিত্রগুলির ভাগ্য ও নাটকীয় পরিণতি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে ; ইহার মধ্যে কতকগুলি অস্বাভাবিক পরিকল্পনাও আছে, তাহাদের মধ্যে চাঁপার চরিত্রটিই প্রধান। দেখা যাইতেছে, সে যুবতী হইয়া সন্ন্যাসী পুরুষের ছদ্মবেশে উড়িষ্যা হইতে কানপুর পর্যন্ত সকল তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছে, লোকের অশেষ হিতসাধন করিয়াছে, অবশেষে ঠিক সময়মত পুরুষের ছদ্মবেশেই গৃহে প্রত্যাগত হইয়া কাহিনীর শুভ পরিণতির মূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার পরিচয়টিও একটু অসাধারণ, সে জমিদারের ঔরসজাত বলিয়া স্বীকৃত এক দাসীর গর্ভজাত কন্যা ; প্রকৃতপক্ষে তাহা দ্বারাই সমগ্র কাহিনী নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, অথচ নাট্যকাহিনীর একমাত্র শেষাঙ্ক ব্যতীত তাহাকে আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

এই নাটকের মধ্যে ললিত ও লীলাবতীর একটি প্রণয়ের বৃত্তান্ত আছে। তাহার সার্থকতা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, তাহা এখানে বিস্তৃতভাবেই উল্লেখযোগ্য—

'হিন্দুর ঘরে ধেড়ে মেয়ে, কোর্টশিপের পাত্রী হইয়া, যিনি কোর্ট করিতেছেন, তাঁহাকে প্রাণমন সমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে, এমন মেয়ে বাঙ্গালী সমাজে ছিল না—কেবল আজকাল নাকি দুই একটা হইতেছে শুনিতেছি (ইহা ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত)। ইংরাজের ঘরে তেমন মেয়ে আছে ; ইংরাজকন্যার জীবনই তাই। আমাদিগের দেশের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেও তেমনি আছে। দীনবন্ধু ইংরাজী ও সংস্কৃত নাটক নভেল ইত্যাদি পড়িয়া এই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন যে,

বাঙ্গালা কাব্যে বাঙ্গালার সমাজস্থিত নায়ক-নায়িকাকেও সেই ছাঁচে ঢালা চাই। কাজেই যাহা নাই, যাহার আদর্শ সমাজে নাই, তিনি তাই গড়িতে বসিয়াছিলেন। এখন আমি ইহাও বুঝিয়াছি যে, তাঁহার চরিত্র-প্রণয়ন-প্রথা এই ছিল যে, জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চিত্রকরের ন্যায় চিত্র আঁকিতেন। এখানে জীবন্ত আদর্শ নাই, কাজেই ইংরাজী ও সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যগত মৃতপুত্তলগুলি দেখিয়া, সে চরিত্র গঠন করিতে হইত। জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে নাই, কাজেই সেই সর্ব্বব্যাপিনী সহানুভূতিও সেখানে নাই। কেন না, সর্ব্বব্যাপিনী সহানুভূতিও জীবন্ত আদর্শ ভিন্ন জীবনহীনকে ব্যাপ্ত করিতে পারে না—জীবনহীনের সঙ্গে সহানুভূতির কোন সম্বন্ধ নাই। এখানে পাঠক দেখিলেন যে, দীনবন্ধুর সামাজিক অভিজ্ঞতাও নাই—স্বাভাবিক সহানুভূতিও নাই। এই দুইটি লইয়াই দীনবন্ধুর কবিত্ব। কাজেই এখানে কবিত্ব নিষ্ফল!'

নাটকের মধ্যে কতকগুলি প্রসঙ্গ ও চরিত্র নিতান্তই অনাবশ্যক—যেমন, অহল্যা বা তারার চরিত্র এবং তাহার অপহরণ ও পুনরুদ্ধারের প্রসঙ্গ; ইহাদের সহিত মূল নাট্যকাহিনীর কোন যোগ অনুভব করা যায় না।

এই নাট্যকাহিনীর আর একটি প্রধান ত্রুটি এই যে, অরবিন্দের গৃহত্যাগের ঘটনা দ্বারা ইহা প্রধানত নিয়ন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও, যে কারণের উপর ভিত্তি করিয়া অরবিন্দ গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং যাহার ফলে তাহার সংসার শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। গৃহে সুন্দরী ও শিক্ষিতা স্ত্রী এবং পিতার ঐশ্বর্য ফেলিয়া রাখিয়া জমিদার পিতার একমাত্র পুত্র মিথ্যা লোকাপবাদের জন্য পিতৃসংসার হইতে নিরুদ্দেশ হইয়া গেল, তারপর পিতার পোষ্যপুত্র গ্রহণের মুহূর্তে পুনরায় উপস্থিত হইয়া সংসারে প্রতিষ্ঠিত হইল, ইত্যাদি ঘটনার মধ্যে অতিনাটকীয়তা অত্যন্ত প্রকট। চাঁপার গৃহত্যাগের কোন কারণ উল্লেখ করা হয় নাই, অথচ অরবিন্দ ও চাঁপা উভয়েরই একই সময়ে নিরুদ্দেশ হওয়ার ফলে যে অরবিন্দের দোষক্ষালনের আর কোন উপায়ই থাকে না, নাট্যকার সেই দিকটা একেবারেই ভাবিয়া দেখেন নাই। অথচ অরবিন্দের দোষ সম্বন্ধে সকলে সম্পূর্ণ নিঃসন্দিগ্ধ হইতে না পারিলে এই নাটকের শুভ পরিণতি ব্যর্থ হয়। অরবিন্দ বার বৎসর নিরুদ্দেশ থাকিয়া যে প্রায়শ্চিত্ত করিল, তাহা কেবলমাত্র প্রত্যাবৃত্ত অরবিন্দের ও যাহাকে লইয়া কলঙ্ক যোগজীবনবেশিনী সেই চাঁপার মৌখিক কথাতেই প্রকাশ পাইল; চাঁপা পুরুষ সাজিয়া দীর্ঘ বার

বৎসর সন্ন্যাসী অরবিন্দকে নানা বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছে, অথচ অরবিন্দ তাহাকে চিনিতেও পারে নাই—এই পরিকল্পনাও অতিরিক্ত রোমান্টিক ও পীড়াদায়ক। যেখানে দীনবন্ধু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাবে কেবলমাত্র কল্পনাকে আশ্রয় করিয়াছেন, সেখানেই নাট্যকার হিসাবে তিনি ব্যর্থকাম হইয়াছেন। 'লীলাবতী' নাটকের ভিত্তি প্রধানত দীনবন্ধুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বহির্ভূত অঞ্চলে স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া নাটক হিসাবে ইহা ব্যর্থ হইয়াছে। তবে দুই একটি চরিত্র যে দীনবন্ধুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত ছিল না, তাহাও নহে—তাহাদের মধ্যে একটি নদের চাঁদ ও অপরটি হেমচাঁদ, ইহারা দুইটি কুলীন ও মাসতুতো ভাই। জমিদারের শ্যালক শ্রীনাথের চরিত্রটিও এই শ্রেণীর চরিত্রের অন্তর্গত। কিন্তু একথা স্বীকার করিতেই হয় যে, এই চরিত্র কয়টি সমগ্র নাটকের মধ্যে কেমন যেন খাপছাড়া হইয়া আছে, ইহাদিগকে যেন 'সধবার একাদশী'র বাস্তব জগৎ হইতে ধরিয়া আনিয়া 'লীলাবতী'র স্বপ্নরাজ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

এইবার 'লীলাবতী' নাটকের কয়েকটি প্রধান চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করিয়া তাহাদের সার্থকতা বিচার করা যাইবে। প্রথমেই জমিদার হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়ের কথা উল্লেখযোগ্য। হরবিলাস বিপত্নীক, তাঁহার এক পুত্র অরবিন্দ ও দুই কন্যা তারা ও লীলা। হরবিলাস এককালে কাশীতে বাস করিতেন, সেখানে শৈশবে তারা অপহৃতা হয়। চাঁপার জন্মবৃত্তান্ত হইতে হরবিলাসের চরিত্রের একটু আভাস পাওয়া যায়; তাহাতে মনে হয়, তৎকালীন আর দশজন জমিদারের মত তিনি যৌবনে একটু উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন; কিন্তু পরিণত বয়সে এই উচ্ছৃঙ্খলতার আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি কন্যা লীলাবতীকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, 'তাঁর স্নেহের পরিসীমা নাই, কিন্তু কুলীনের নাম শুনলে তিনি সব ভুলে যান।' নাট্যকার এই স্থানেই হরবিলাসের চরিত্র একটু অস্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি নদের চাঁদের মত পাত্রের সহস্র দোষ জানিয়াও একমাত্র কুলীন বলিয়া তাঁহার একমাত্র স্নেহের কন্যাকে তাহার হস্তে অর্পণ করিতে চান। নদের চাঁদের নামে ফৌজদারী মোকদ্দমা ঝুলিতেছে; সে মূর্খ, নেশাখোর, অভদ্র ইত্যাদি সমস্ত সম্পূর্ণ জানিয়া ও নিজের চোখে দেখিয়াও তিনি আত্মীয়-স্বজনের সকল পরামর্শ অবহেলা করিয়া তাহার সঙ্গেই লীলাবতীর বিবাহ স্থির করিয়াছেন—ইহা

অস্বাভাবিক। কারণ, লীলাবতীকে হরবিলাস যদি প্রকৃতই স্নেহ করেন, তাহা হইলে এই কাজ কদাচ করিতে পারেন না ; অথচ লীলাবতীর প্রতি তাঁহার প্রকৃতই যে স্নেহ ছিল, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। তারপর ললিতকে পোষ্যপুত্র হিসাবে গ্রহণ সম্পর্কেও তিনি একগুঁয়ে হইয়া উঠিলেন—এই বিষয়ে যতই সকলে নিষেধ করিতে লাগিল, ততই যেন তিনি ক্ষেপিয়া উঠিলেন, অথচ এই ব্যস্ততার তাঁহার কোন সঙ্গত কারণ ছিল না। এইভাবে হরবিলাসের চরিত্রটি নানা দিক দিয়া অসম্ভব ও অসঙ্গত হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীনাথ হরবিলাসের শ্যালক। সংস্কৃত নাটকের রাজশ্যালকের চরিত্রের অনুকরণে প্রধানত ইহা পরিকল্পিত হইলেও ইহার মধ্য দিয়াই দীনবন্ধুর মৌলিক প্রতিভারও বিকাশ হইয়াছে। কিন্তু একথাও সত্য যে, সমগ্রভাবে নাটকীয় পরিবেশটি শ্রীনাথের মত চরিত্রের অনুকূল ছিল না বলিয়াই তাহাকে যেন ইহার মধ্যে অনধিকার-প্রবেশকারী বলিয়া মনে হয়। নাটকীয় পটভূমিকার সঙ্গে তাহার কোন যোগ ছিল না ; সেইজন্য তাহার চরিত্রের একটি সুসঙ্গত ক্রমবিকাশও ইহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না ; সুতরাং এই চরিত্রটি দীনবন্ধুর বিশিষ্ট প্রতিভার অনুগামী হইয়াও পূর্ণাঙ্গ সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই।

হেমচাঁদের চরিত্রটি দুই নৌকায় পা দিয়া চলিয়াছে। সে শ্রীনাথের ভাগিনেয়, কুলীন, লেখাপড়া কিছুই জানা নাই, গুলীর আড্ডার সভ্য। কিন্তু সে বিবাহ করিয়াছে ব্রাহ্মসমাজ-ঘেঁসা এক শিক্ষিতা মহিলাকে। এমন বিবাহই যে কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে, নাট্যকার তাহার আভাস মাত্র দেন নাই, তথাপি বুঝিতে হইবে, যে-কোন উপায়ে তাহা সম্ভব হইয়াছে। স্ত্রীর প্রভাববশতই তাহার চরিত্রের মধ্যে ক্রমে পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে—এই পরিবর্তনের ধারাটি নাট্যকার অতি কৌশলে ও সতর্কতার সঙ্গে দেখাইয়াছেন। এইখানে নাট্যকারের কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে।

হেমচাঁদের মাস্‌তুতো ভাই নদের চাঁদ। এই চরিত্রটির মধ্যে দীনবন্ধুর পরবর্তী নাটক 'জামাই বারিকে'র পূর্বাভাস সূচিত হইয়াছে। সে কুলীন এবং জমিদার মাতুলের আশ্রিত, নাট্যকার তাহাকে সর্ববিষয়ে লীলাবতীর অযোগ্য প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাহাকে একটা ভাঁড় করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে রক্তমাংসের কোন পরিচয় অবশিষ্ট রাখেন নাই। ইহা লীলাবতীর চরিত্রের উপর নাট্যকারের অতিরিক্ত সহানুভূতিরই ফল বলিতে

হইবে—চরিত্রগত বৈপরীত্য সৃষ্টি করিতে গিয়া এখানে একটা কৃত্রিম অবস্থা সৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। লীলাবতীর সঙ্গে বিবাহের অসম্ভাব্যতা প্রতিপন্ন করিতে গিয়া মানুষের চরিত্রে যত রকম দুর্গুণ থাকা সম্ভব একধার হইতে সকলই তাহার উপর নাট্যকার আরোপ করিয়াছেন; তাহার ফলে এই চরিত্রটিও দীনবন্ধুর প্রতিভার অনুগামী না হইয়া এই নাটকের মধ্যে কৃত্রিম হইয়া পড়িয়াছে।

এইবার ললিতমোহনের চরিত্র-সম্পর্কে আলোচনা করিতে হয়। ললিত-মোহনই প্রকৃতপক্ষে এই মিলনাত্মক নাটকের নায়ক। মানুষের চরিত্রে যত সদ্‌গুণ থাকা সম্ভব, নাট্যকার তাহার উপর প্রায় সকলই আরোপ করিয়াছেন, তাহার ফলে চরিত্রটি বাস্তব ও জীবন্ত না হইয়া একটি আদর্শ চরিত্র হইয়া উঠিয়াছে। সে হরবিলাসের ভবনে প্রতিপালিত, শিক্ষিত, উদারমতাবলম্বী, সুদর্শন যুবক। তাহার পরিচয়ের মধ্যে একমাত্র এই যে, সে হরবিলাসের ভবনে প্রতিপালিত। পোষ্যপুত্র করিবেন বলিয়া হরবিলাস তাহাকে শিশুকালে আনাইয়াছিলেন, কিন্তু বধূমাতা বার বৎসর অপেক্ষা করিবার কথা বলিয়া কান্নাকাটি করায় তাহাকে এতকাল গৃহে রাখিয়া পালন করিতে হইয়াছে। তাহার আর কোন পিতৃমাতৃ-পরিচয় নাই, তবে কুল-পরিচয় আছে—সে কুলীন নহে, বংশজ; সেই জন্য তাহাকে পুত্রস্নেহে প্রতিপালন করা সত্ত্বেও হরবিলাস তাহার হস্তে তাঁহার গুণবতী কন্যা লীলাবতীকে অর্পণ করিতে অনিচ্ছুক, বরং তিনি লীলাবতীকে নেশাখোর কুলীন নদের চাঁদের করে অর্পণ করিতে উৎসুক। হরবিলাস ললিতকে পোষ্যপুত্র রাখিতে আগ্রহান্বিত। পিতৃমাতৃপরিচয়হীন পরিণতবয়স্ক যুবককে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবার কল্পনা একটু বিসদৃশ বিবেচিত হইতে পারে, ললিতও পোষ্যপুত্র হইয়া না থাকিয়া বরং লীলাবতীকে বিবাহ করিয়া হরবিলাসের জামাতা হইয়া থাকিতে চাহে এবং অরবিন্দের গৃহ প্রত্যাবর্তনের ফলে শেষ পর্যন্ত তাহার এই অভিলাষই পূর্ণ হয়। হরবিলাস তাহাকে পুত্রস্নেহে পালন করিলেও তাহাকে হরবিলাসের সঙ্গে এই নাটকের মধ্যে এমন কোন আচরণ করিতে দেখিতে পাওয়া যায় না যাহাতে মনে হইতে পারে যে, সেও এই স্নেহের মর্যাদা রক্ষা করিয়া হরবিলাসকে পিতার মতই শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে। বরং হরবিলাস যখন তাহাকেই পোষ্যপুত্র গ্রহণ করা স্থির করিয়া তদনুযায়ী আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন একদিন ললিত নিরুদ্দেশ হইয়া গেল—ইহাতে

স্বভাবতই হরবিলাস ব্যথিত হইলেন; অবশ্য সে কিছুদিন পরে ফিরিয়া আসিল; ইহাতে হরবিলাসের প্রতি তাহার কোন প্রকার কৃতজ্ঞতার পরিচয় প্রকাশ পায় না। তারপর জাল অরবিন্দের আবির্ভাবের ষড়যন্ত্রে হরবিলাস ললিতকেও লিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করিলেন। এই সকল ব্যাপার হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, হরবিলাসের সঙ্গে ললিতের সম্পর্কটি নাট্যকার তাঁহার পরিকল্পনা অনুযায়ী ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। ললিতকে যথার্থই হরবিলাসের গৃহে প্রতিপালিত ও তাঁহার প্রতি কোন প্রকার ভক্তিশ্রদ্ধান্বিত বলিয়া মনে হয় না ইহা ললিত-চরিত্রের প্রধান ত্রুটি বলিয়া বিবেচিত হইবে। শৈশবের খেলাধুলার ভিতর দিয়া যৌবনে উত্তীর্ণ হইবার পথে ললিত ও লীলাবতীর প্রণয়ের সঞ্চার হইয়াছে বলিয়া উভয়ের উক্তিতে প্রকাশ। এখন তাহারা পূর্ণ যুবক ও যুবতী এবং পরস্পর সুগভীর প্রণয়াসক্ত, কিন্তু এই আসক্তি প্রকাশ পাইয়াছে একমাত্র দীর্ঘ ও মামুলী বক্তৃতায়—আত্মত্যাগ, দুঃখভোগ, সেবা কিংবা অন্য কোন কার্যের ভিতর দিয়া নহে। সেইজন্য তাহাদের পরস্পর প্রণয়-সূচক মৌখিক বক্তৃতাগুলি যত দীর্ঘই হউক, তাহাতে বিষয়টি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে পারে নাই—তাহার উপর এই প্রণয়ের ক্রমবিকাশের ধারাটি কাহিনীর অন্তরালে রাখিয়া একেবারে তাহার পরিণত রূপটিই নাট্যকার পাঠকের চোখের সম্মুখে ধরিয়াছেন বলিয়া ইহার আকস্মিকতাও পাঠককে আঘাত করিতে পারে। ললিতমোহনের সদ্‌গুণাবলীও একমাত্র মৌখিক বক্তৃতার উপরই প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তাহাও তাহার চরিত্র সম্পর্কে কার্যকরী বলিয়া মনে হয় না। নাট্যকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী এই চরিত্রটি রূপ লাভ করিতে পারে নাই।

স্ত্রী-চরিত্রগুলির মধ্যে লীলাবতীই প্রধান। লীলাবতীই এই নাটকের নায়িকা। এই চরিত্রের স্বাভাবিকতা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র যে আপত্তি তুলিয়াছেন, তাহা অখণ্ডনীয়। সম্ভ্রান্ত পরিবারের শিক্ষিতা নারী সম্পর্কে দীনবন্ধুর ধারণা খুব স্পষ্ট ছিল না। তখনও স্ত্রী-শিক্ষা এই দেশের সমাজে ব্যাপক হইয়া উঠে নাই, শিক্ষিতা নারী সম্পর্কে দীনবন্ধুর ধারণা কল্পনার উপরই স্থাপিত হইয়াছে; আর যেখানে কল্পনার আশ্রয় লইতে হইয়াছে, সেখানেই দীনবন্ধু ব্যর্থকাম হইয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার লীলাবতীর চরিত্রটিও কোনদিক দিয়াই সার্থক হইয়া উঠিতে পারে নাই। তবে ইতিপূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্র লীলাবতী ও কামিনীকে এক সূত্রে

গাথিয়াছেন; বলা বাহুল্য, এই কামিনী 'নবীন তপস্বিনী'র কামিনী, 'জামাই-বারিকে'র কামিনী নহে। লীলাবতী ও 'জামাই-বারিকে'র কামিনীতে পার্থক্য আছে। লীলাবতী ধনীর শিক্ষিতা কন্যা; কিন্তু এই কামিনী ধনিকন্যা মাত্র, সে বুদ্ধিমতী কিন্তু শিক্ষিতা নহে; লীলাবতী ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্ম-মহিলাদিগের সম্পর্কে আসিয়া মার্জিত রুচি ও উন্নত সংস্কারের অধিকারিণী হইয়াছে, কিন্তু 'জামাই-বারিকে'র কামিনী তাহা হইতে পারে নাই, অতএব লীলাবতী ও এই কামিনী এক নহে। তবে 'নবীন তপস্বিনী'র কামিনী ও 'লীলাবতী'র লীলাবতীতে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। লীলাবতী নাট্যকারের ব্যর্থ সৃষ্টি হইলেও 'জামাই-বারিকে'র কামিনী যে সার্থক সৃষ্টি, তাহা 'জামাই-বারিকে'র চরিত্র সমালোচনা করিতে গিয়া বিস্তৃততর ভাবে আলোচনা করিয়াছি।

একথা সত্য যে, তৎকালীন সমাজের শিক্ষিতা স্ত্রী সম্পর্কে দীনবন্ধুর কোন অভিজ্ঞতা ছিল না বলিয়া লীলাবতীর চরিত্র এমন নির্জীব ও প্রাণহীন রূপে চিত্রিত হইয়াছে; অথচ লীলাবতীই কাহিনীর নায়িকা, সুতরাং তাহার পরিকল্পনার ব্যর্থতায় নাটকেরই ব্যর্থতা। সেক্সপীয়রের 'রোমিও জুলিয়েট' নাটকের অনুকরণে এই নাটকে দীনবন্ধু ললিত-লীলাবতীর একটি সুদীর্ঘ প্রণয়-দৃশ্যের (love scene) অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু মনের সুগভীর স্তরে সূক্ষ্ম অনুভূতির ক্ষেত্রে নরনারীর যে প্রণয়-বেদনা স্তম্ভিত হইয়া আছে, তাহা জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইলে যে সূক্ষ্ম রসবোধের প্রয়োজন, তাহা দীনবন্ধুর ছিল না। অতএব এই প্রণয়-দৃশ্য কেবলমাত্র নিষ্প্রাণ বাগাড়ম্বরে পর্যবসিত হইয়াছে। পাঠকের পক্ষে ইহা বিরক্তিকর, দর্শকের পক্ষেও ইহা দুঃসহ।

লীলাবতী চরিত্র বাদ দিলেও এই নাটকে আর কোন স্ত্রী-চরিত্রও সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই। দীনবন্ধু যে শ্রেণীর স্ত্রী-চরিত্রের পরিকল্পনায় সাধারণত সার্থকতা লাভ করিয়াছেন, এই নাটকের মধ্যে সেই শ্রেণীর স্ত্রী-চরিত্র একটিও নাই, ইহার স্ত্রী-চরিত্রগুলি সকলই দীনবন্ধুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বাহির হইতে পরিকল্পিত, ইহাই ইহাদের ব্যর্থতার কারণ।

এই নাটকের সর্বাপেক্ষা বড় ত্রুটি ইহার ভাষা ও সংলাপ। 'লীলাবতী'র সমাজ শিক্ষিত সমাজ, শিক্ষিত চরিত্র সম্পর্কে দীনবন্ধু অন্যান্য নাটকেও যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, 'লীলাবতী'তেও তাহাই করিয়াছেন। ইহা দীনবন্ধুর সাধু ভাষা। দীনবন্ধুর সাধু গদ্য সর্বত্র আড়ষ্ট ও সংস্কৃত সমাস-বহুল।

দীনবন্ধুর সাধু গদ্যের একটি প্রধান ত্রুটি এই যে, ইহার কোন ক্রমবিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না। রামনারায়ণের 'কুলীন কুল-সর্বস্বে'র ভাষা ও 'নব নাটকে'র ভাষা এক নহে, অথচ দুই-ই অভিন্ন সমাজ; কারণ, রামনারায়ণের গদ্য-ভাষার একটা ক্রম-বিকাশের ধারা অনুসরণ করা যায়, তাহা ক্রমে সহজ হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু ভাষার ক্ষেত্রে দীনবন্ধুর মধ্যে কোন ক্রমপরিণতি পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁহার সর্বপ্রথম রচনা 'নীল-দর্পণে'র সাধু ভাষাও যেমন, তাঁহার সর্বশেষ রচনা 'কমলে কামিনী'র সাধু ভাষাও তেমনই। ইহার কারণ সম্ভবত দীনবন্ধু ছিলেন প্রধানত কবি; সেইজন্য দীর্ঘ কবিতায় রচিত সংলাপ তিনি তাঁহার অধিকাংশ নাটকেই ব্যবহার করিয়াছেন, ইহাদের অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে কোথাও এতটুকু ভ্রূক্ষেপও করেন নাই। সুতরাং তাঁহার গদ্য রচনা একটা বিশেষ পথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়া বিশিষ্ট কোন রূপ লাভ করিতে পারে নাই, তাঁহার এই কবিত্বের অভিমানের জন্যই গদ্য রচনার মধ্যে তিনি তাঁহার প্রতিভা সতর্কভাবে কোন দিন নিয়োজিত করেন নাই। কিন্তু রামনারায়ণের তাহা ছিল না, তিনি তাঁহার সাধনার একমাত্র অবলম্বন গদ্য রচনার ভিতর দিয়াই তাঁহার সমগ্র প্রতিভা সতর্কভাবে নিয়োগ করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহার রচনায় একটি সুস্পষ্ট ক্রমবিকাশের ধারা চিহ্নিত হইয়া গিয়াছে। দীনবন্ধু কবি না হইয়া কেবল যদি গদ্য-লেখকই হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার নাটকগুলি অধিকতর সার্থক হইত, তাঁহার সংলাপের ভাষায়ও একটা সুস্পষ্ট ক্রমবিকাশের ধারা অনুভব করা যাইত।

কিন্তু দীনবন্ধু যাহা ছিলেন না, তাহার জন্য আক্ষেপ করিয়া লাভ নাই, যাহা ছিলেন তাহাই আমাদের বিচার্য। 'লীলাবতী'র সমাজ সমগ্রভাবে শিক্ষিত সমাজ বলিয়া ইহার মধ্যে ইতর জাতীয় লোকের কথ্যভাষার কোন স্থান হয় নাই, অথচ ঐ ভাষার মধ্যেই দীনবন্ধুর কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে অতএব সমগ্র 'লীলাবতী' নাটকের মধ্যে দীনবন্ধুর বিশিষ্ট প্রতিভা বিকাশের কোন সুযোগ ছিল না—ইহার সমাজ দীনবন্ধুর অপরিচিত, ইহার ভাষাও কৃত্রিম।

ভাষা যেমনই হউক, সুদীর্ঘ সংলাপ 'লীলাবতী' নাটকের একটি গুরুতর ত্রুটি। 'লীলাবতী' ঘটনাবহুল ও রহস্যঘন নাটক; কিন্তু ইহার ঘটনা ও রহস্যরাজি নাটকীয় কার্যাবলীর (dramatic action) ভিতর দিয়া প্রকাশ না পাইয়া অধিকাংশই বক্তৃতার (narration) ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে সেইজন্য সংলাপকে বহুস্থানে দীর্ঘ করিতে হইয়াছে। ইহা নাটকের পক্ষে যে

কত বড় ত্রুটি, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া না বলিলেও চলে। ললিত-লীলাবতীর প্রণয়-দৃশ্যের মধ্যে পয়ার ছন্দে রচিত দীর্ঘ সংলাপের ব্যবহার করা হইয়াছে, এতদ্ব্যতীত গদ্য-পদ্যমিশ্র সংলাপও বহু ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হইয়াছে, এই সকল সংলাপ অত্যন্ত দীর্ঘ এবং একঘেয়ে। অমিত্রাক্ষরের ধ্বনিবৈচিত্র্য-স্রষ্টা মাইকেল মধুসূদন পর্যন্ত তাঁহার নাটকে পদ্যে সংলাপ রচনা করিতে সাহস পান নাই, অথচ দীনবন্ধু একঘেয়ে পয়ার দ্বারাই সুদীর্ঘ সংলাপ রচনা করিয়াছেন, এই ত্রুটি 'লীলাবতী' নাটকে সর্বাধিক প্রকাশ পাইয়াছে, সেই জন্য এই নাটকই এই হিসাবে সর্বাধিক ব্যর্থ। কেবল মাত্র পয়ার নহে, কোন কোন স্থলে সংলাপের মধ্যে দীর্ঘ ত্রিপদীও ব্যবহৃত হইয়াছে—মোট কথা তাহার রচিত নাটকের মধ্য দিয়া দীনবন্ধু সর্বদাই তাহার কবিত্ব প্রকাশের সুযোগ সন্ধান করিয়াছেন এবং সামান্য অবকাশটুকু মাত্র পাইলেই তাহার সদ্ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার ফলে তাঁহার নাট্যকাহিনীর সহজ গতি পদে পদে বাধা পাইয়াছে—সুদীর্ঘ বর্ণনাসমূহ পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করিয়া কাহিনীর রসভঙ্গ করিয়াছে।

যে রুচিদোষের জন্য দীনবন্ধুর সাধারণত নিন্দা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা 'লীলাবতী'তে অনেকটা সংযত হইয়া আসিয়াছে। কেবলমাত্র কয়েকটি চরিত্রে তাহার সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়।

দীনবন্ধু মিত্রের সর্বশেষ রচনা 'কমলে কামিনী' নাটক। এই নাটকের উদ্দেশ্য (motto) রূপে নাট্যকার সেক্সপীয়রের 'ম্যাকবেথ' নাটক হইতে এই দুইটি ইংরেজি পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

Dun. Dismay'd not this our captains, Macbeth and Banquo ?

Sold. Yes, as sparrows eagles ; or the hare the lion.

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, নাটকের মধ্যে বীররসের পরিবর্তে অন্য বিষয় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে ; হয়ত নাট্যকার এক উদ্দেশ্য লইয়া 'কমলে কামিনী' নাটক রচনা আরম্ভ করেন, শেষ পর্যন্ত সেই উদ্দেশ্য আর রক্ষা পায় নাই। নাটকখানি 'বিদ্যা-দয়া-দাক্ষিণ্য-দেশানুরাগাদি বিবিধ-গুণরত্ন-মণ্ডিত পণ্ডিত-মণ্ডলি-সমাদর-তৎপর রাজশ্রী যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর'কে উৎসর্গীকৃত। উৎসর্গপত্রে নাট্যকার উল্লেখ করিয়াছেন, 'কমলে কামিনী অপরের যেমন হউক, আমার বিলক্ষণ আদরের পাত্রী।'

এই নাটকখানির আলোচনা সম্পর্কে নাট্যকারের এই উক্তিটির উপর বিশেষ লক্ষ্য করা প্রয়োজন। সর্বশেষ রচনা বলিয়াই হউক, কিংবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, দীনবন্ধুর ইহার প্রতি কোন বিশেষ মমত্ববোধ থাকিয়া থাকিবে।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে আসামে লুসাই অভিযান উপলক্ষে সামরিক ডাকবিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারিরূপে দীনবন্ধু দক্ষিণ-আসাম অঞ্চল ভ্রমণ করিবার সুযোগ পান, তাহার ফলে মণিপুর ও কাছাড় দেশ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করেন; মণিপুরীদিগের বিচিত্র জীবন তখন তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়া থাকিবে। কিছুদিন পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াই দীনবন্ধু এই নাটকখানি রচনা করেন। ইহার মধ্যে মণিপুরী রাসলীলার যে বর্ণনা আছে, তাহা তাঁহার এই বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল বলিয়া মনে হয়। 'কমলে কামিনী' নাটকের কাহিনীটি সংক্ষেপে এই :—

কাছাড়ের সিংহাসন শূন্য হইলে ব্রহ্মদেশের রাজা বীরভূষণ তাঁহার কনিষ্ঠা মহিষীর পরামর্শে তাঁহার শ্যালককে কাছাড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিলেন—ইহাতে মণিপুররাজ ও সমগ্র কাছাড়বাসী প্রবল আপত্তি তুলিল। মণিপুররাজ কাছাড়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ব্রহ্মরাজ তাঁহার শ্যালক কাছাড়-রাজকে সহায়তা করিবার জন্য সপরিবারে ব্রহ্মদেশ হইতে কাছাড়ে আসিলেন। তাঁহার এক সুন্দরী অনূঢ়া কন্যা ছিল, নাম রণকল্যাণী, সেও পিতার সঙ্গে কাছাড়ে আসিল। মণিপুররাজ তাঁহার বিশ্বস্ত সেনাপতিগণের সহায়তায় তাঁহার সৈন্য লইয়া কাছাড় আক্রমণ করিলেন। মণিপুররাজের একজন সহকারী সেনাপতি ছিলেন, তাঁহার নাম শিখণ্ডিবাহন—তাঁহাকেই মণিপুররাজ কাছাড়ের সিংহাসনে বসাইতে চাহিয়াছিলেন। শিখণ্ডিবাহনের পিতৃ-পরিচয় অজ্ঞাত ছিল, কিন্তু তাঁহার বীরত্বে আকৃষ্ট হইয়া সেনাপতি মকরকেতু তাঁহাকে অস্ত্রশিক্ষা দিয়া পুত্রস্নেহে পালন করিয়া আসিতেছিলেন। শিখণ্ডিবাহনও মণিপুর সৈন্যের সহকারী সেনাপতিরূপে কাছাড়ে আসিলেন। কাছাড়ে ব্রহ্মরাজকন্যা রণকল্যাণী একদিন পথিপার্শ্বস্থ রাজপ্রাসাদের উপরে বসিয়া যুদ্ধ দেখিতেছিলেন, এমন সময় শিখণ্ডিবাহনের সঙ্গে ব্রহ্মদেশের সেনাপতি যুদ্ধ করিতে করিতে আসিয়া দুর্গের পাদমূলে উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মরাজ-সেনাপতি শিখণ্ডিবাহনের বীরত্বে পরাজিত ও বন্দী হইলেন। প্রাসাদের উপর হইতে রণকল্যাণী শিখণ্ডিবাহনের বীরত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন,

তাহার হাত হইতে পদ্মমালা খসিয়া নিম্নে শিখণ্ডিবাহনের কণ্ঠে পতিত হইল, শিখণ্ডিবাহনও উপরের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিয়া রণকল্যাণীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। পদ্মমালা কণ্ঠে লইয়া বন্দী ও আহত ব্রহ্মসেনাপতিকে নিজের অশ্বের উপর স্থাপন করিয়া শিখণ্ডিবাহন নিজের শিবিরে চলিয়া আসিলেন, কিন্তু তদবধি রণকল্যাণীকে ভুলিতে পারিলেন না। ব্রহ্মরাজ সাত দিনের মত যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার জন্য মণিপুররাজের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। মণিপুর-রাজ স্বীকৃত হইলেন। ইতিমধ্যে মণিপুররাজের শিবিরে রাসলীলার আয়োজন করা হইল, তাহাতে ছদ্মবেশিনী রণকল্যাণী রাধিকার ও শিখণ্ডি-বাহন কৃষ্ণের অভিনয় করিলেন। পরস্পরের প্রতি তাঁহাদের আসক্তি ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। অবশেষে জানিতে পারা গেল যে, শিখণ্ডিবাহন মণিপুররাজেরই প্রথমা মহিষীর গর্ভজাত পুত্র, দ্বিতীয়া মহিষী গান্ধারী তাঁহাকে এক ধাত্রীর সহযোগিতায় সূতিকাগার হইতে হরণ করিয়া লইয়া গিয়া এক নির্জন স্থানে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেখান হইতে ত্রিপুরা ঠাকুরাণী নাম্নী এক বিধবা মহিলা তাহাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া গিয়া পুত্রস্নেহে পালন করিতে থাকেন। তদবধি শিখণ্ডিবাহন ত্রিপুরা ঠাকুরাণীর পুত্র বলিয়া পরিচিত হন, কিন্তু তাঁহার পিতৃপরিচয় অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। ব্রহ্মরাজ শিখণ্ডিবাহনের প্রতি তাঁহার কন্যা রণকল্যাণীর আসক্তির কথা জানিতে পারেন। তিনিও শিখণ্ডিবাহনের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কোন পিতৃপরিচয় নাই বলিয়া তিনি মণিপুররাজের প্রদত্ত সন্ধির সর্ত অনুসারে তাঁহাকে কাছাড়ের সিংহাসনে স্থাপন করিতে অস্বীকৃত হইতেছিলেন। কিন্তু এইবার তাঁহার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া তাঁহার সঙ্গে নিজের কন্যার বিবাহ দিয়া তাঁহাকে কাছাড়ের সিংহাসনে স্থাপন করিতে স্বীকৃত হইলেন। সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ায় উভয়পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হইল।

দীনবন্ধু যখন তাঁহার 'কমলে কামিনী' নাটক রচনা করেন, তখন তাঁহার প্রতিভা অস্তমিত হইয়াছে—ইহা কোন দিক দিয়াই তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারে নাই। প্রথমতঃ, কাহিনীর মধ্যে দীনবন্ধু তাঁহার অন্যান্য নাটকের কয়েকটি পুরাতন বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করিয়াছেন—যেমন একটি নিরুদ্দিষ্ট চরিত্রের সন্ধান দিয়া কাহিনী সমাপ্ত হইবে; ইহাতেও তাহাই আছে। বিপুল বাহ্য আড়ম্বরের মধ্যে একটি ক্ষীণ বৈচিত্র্যহীন প্রণয়-কাহিনী ইহার প্রধান উপজীব্য করা হইয়াছে। কতকগুলি অনাবশ্যক চরিত্র ইহাতে

আনিয়া যুক্ত করা হইয়াছে। রোমাণ্টিক নাটকের আবহাওয়ায় 'কমলে কামিনী'র রূপদান করা হইয়াছে, কিন্তু দীনবন্ধুর প্রতিভা রোমাণ্টিক নাট্যরচনার অনুকূল ছিল না বলিয়া ইহার পরিবেশ বহুস্থলেই ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। মণিপুরী সমাজ একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন সমাজ, বাঙ্গালী জীবনের সঙ্গে তাহার কোন যোগ নাই, অথচ দীনবন্ধু বাঙ্গালী জীবনের বহু চিত্র বা চিত্রাংশ তাহার উপর আরোপ করিয়াছেন। নাটকের নামকরণের কোন সার্থকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রাসনৃত্যচ্ছলে কমলমালা-পরিহিতা রণকল্যাণী কমলাসনে উপবেশন করিলে রাজা বলিলেন, 'আমার বোধ হয়, রাই "কমলে কামিনী" (৩।২)'। সকলে তাহার প্রতিধ্বনি করিল। ইহাই সমগ্র নাটকের মধ্যে 'কমলে কামিনী'র একমাত্র উল্লেখ, বিশেষত ইহার সঙ্গে কাহিনীর কোন অন্তর্গূঢ় যোগ নাই, ইহা একটি বিচ্ছিন্ন চিত্র মাত্র। বাংলা সাহিত্যে কমলে কামিনী কথাটির একটি বিশেষ অর্থ আছে—তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, কমলের উপর উপবিষ্টা যে কোন কামিনীর উপরই সংজ্ঞাটি প্রযোজ্য হইতে পারে না। 'কমলে কামিনী'র প্রকৃত অর্থ সমুদ্র-মরীচিকা বা sea-mirage; ইহা সত্য নহে, ইহা মায়া। এই বিশেষ অর্থেই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কথাটি সর্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে, আধুনিক বাংলায় ইহার নূতন কোন অর্থও হয় নাই। অতএব বাংলার একটি বিশিষ্টার্থক শব্দ এই ভাবে যথেচ্ছ প্রয়োগ করা সঙ্গত হয় না। এইজন্য 'কমলে কামিনী' নামকরণে কোন সার্থকতা ত খুঁজিয়া পাওয়া যায়ই না, বরং ইহার দ্বারা পাঠকের মনে কোন প্রকার ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইতে পারে। দীনবন্ধুর স্বাভাবিক হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষমতা ইহাতে আরও একটু সংযত করিয়া রাখিতে পারিলে নাটকের পক্ষে ভাল হইত। কারণ, উপযুক্ত পরিবেশ ব্যতীত হাস্যরস বিরক্তির কারণ হয়। বাঙ্গালী জীবনের পরিবেশ হইতে সৃষ্ট দীনবন্ধুর হাস্যরস একটি স্বতন্ত্র জাতীয় পরিবেশের মধ্যে যে কত বিরক্তিকর হইতে পারে, 'কমলে কামিনী' নাটকই তাহার প্রমাণ। দীনবন্ধুর অন্যান্য নাটকের তুলনায় কেবলমাত্র একটি বিষয় এই নাটকের মধ্যে প্রশংসনীয়—তাঁহার অন্যান্য নাটকে যে রুচিদুষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়, 'কমলে কামিনী' নাটকে তাহা নাই। রুচিবোধের দিক দিয়া দীনবন্ধুর মধ্যে একটি ক্রমবিকাশের ধারার সন্ধান পাওয়া যায়।

মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের উন্নত রুচিবোধের প্রভাবের ফলে দীনবন্ধু ক্রমে তাঁহার নাটকগুলি রুচির দিক দিয়া উন্নত করিয়া লইয়াছিলেন। কারণ, 'লীলাবতী' হইতে 'কমলে কামিনী' রুচির দিক দিয়া আরও একটু উন্নত বলিয়া বোধ হইবে। অবশ্য একথাও সত্য যে সামাজিক প্রহসনগুলির মধ্যে কুরুচির পরিচয় দেওয়া যত সহজ, রোমান্টিক নাটকগুলির মধ্যে তাহা তত সহজ নহে। প্রহসনগুলির মধ্যে দীনবন্ধুর বৈশিষ্ট রুচিবোধ শেষ পর্যন্ত প্রায় অব্যাহত ছিল।

'কমলে কামিনী'র নায়ক শিখণ্ডিবাহন। তিনি মণিপুরের সহকারী সেনাপতি। তিনি বীর ও সর্বগুণান্বিত আদর্শ পুরুষ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার বীরত্বের একটি মাত্র প্রত্যক্ষ চিত্র ব্যতীত আর সমস্ত কেবল তাঁহার নিজের ও অন্যের মুখের বক্তৃতাদ্বারা প্রকাশ হইয়াছে। নাটকের মধ্যে তাঁহার বীরত্ব ও অন্যান্য সদ্‌গুণ প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিবার প্রচুর অবকাশ ছিল, কিন্তু নাট্যকার তাহাদের সদ্ব্যবহার করেন নাই। বিশেষত, নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই তিনি রণকল্যাণীকে দেখিবার পর হইতেই তাঁহার প্রণয়মুগ্ধ হইয়া পড়ায় তাঁহার বীরত্বের দিকটি একেবারেই গৌণ হইয়া পড়িয়াছে—তখন তিনি প্রেমিক নায়ক মাত্র; এমন কি কৃষ্ণবেশ ধারণ করিয়া রাসলীলায় নৃত্য পর্যন্ত করিলেন। অবশ্য মণিপুরীদিগের জীবনে নৃত্য একটি অতি সাধারণ বিষয়, তথাপি সহকারী সেনাপতির দায়িত্ব লইয়া পরের রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিয়া আক্রান্ত রাজ্যের রাজকন্যার সঙ্গে রাসলীলায় নৃত্য করিবার কাহিনী পাঠকের মন পীড়িত করিতে পারে। শিখণ্ডিবাহনকে বীর ও প্রেমিক উভয় রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া নাট্যকার কোন দিকটাই সার্থক করিয়া তুলিতে পারেন নাই। প্রকৃত বীরচরিত্র সৃষ্টি করা দীনবন্ধুর প্রতিভার অতীত ছিল, সেইজন্য শিখণ্ডিবাহনের বীরত্বের পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়াছে। শিখণ্ডিবাহনের জীবনেতিহাসের উপর যে একটি রহস্যের আচ্ছাদন দেওয়া হইয়াছে, তাহা নাট্যকাহিনীর মধ্যে যে একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল, তাহাও বলিতে পারা যায় না; কারণ, ইহাদ্বারা নাট্যকাহিনীর স্বাভাবিক গতি কোথাও ব্যাহত হয় নাই, বিশেষত এই সমগ্র রহস্য-বৃত্তান্তটি যবনিকার অন্তরালে ঘটিয়াছে এবং মূল নাট্যকাহিনীর একপ্রকার উপসংহারের পর ভরতবাক্যের মত এক তৃতীয় ব্যক্তি কর্তৃক উচ্চারিত হইয়াছে। অতএব

ইহা নাট্যকাহিনীর কোন অবিচ্ছেদ্য অংশ নহে। ইহার নিবিড়ত্ব নাট্যকার শেষ পর্যন্ত রক্ষা করিতে পারেন নাই; কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে, ত্রিপুরা ঠাকুরাণী কর্তৃক সমস্ত রহস্য উদ্‌ঘাটনের বহু পূর্বেই সুরবালা মণিপুর শিবির হইতে শুনিয়া আসিয়াছেন যে, 'কেউ কেউ বলে শিখণ্ডিবাহন বড় রাণীর সেই সোনার চাঁদ (২।৪)।' ইহার পর তাঁহার প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে পাঠকের আর কোন ঔৎসুক্য (suspense) থাকিতে পারে না। পূর্বেই বলিয়াছি, 'কমলে কামিনী' রচনার সময় দীনবন্ধুর প্রতিভা সম্পূর্ণ অস্তমিত হইয়া গিয়াছে, সেইজন্য যে সকল বিষয়ে সাধারণত পূর্বে তাঁহার বিশিষ্ট গুণের পরিচয় পাওয়া যাইত, সেই সকল বিষয়েই তখন তাঁহার এই সকল ত্রুটি প্রকাশ পাইয়াছে।

'কমলে কামিনী'র নায়িকা রণকল্যাণী। রণকল্যাণী ব্রহ্মরাজের দুহিতা; ব্রহ্মরাজ-দুহিতাকে বাঙ্গালী নাট্যকার বাঙ্গালীর উপাদানে গড়িয়াছেন, তাঁহার মধ্যে ব্রহ্মদেশীয় নারীচরিত্রের বৈশিষ্ট্য বিন্দুমাত্রও প্রকাশ পায় নাই; অথচ নাটকের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিবার প্রচুর অবকাশ ছিল; সুতরাং ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, নাট্যকারেরই এই বিষয়ে দক্ষতা ছিল না। রণকল্যাণী যুদ্ধ ভালবাসেন—একথা ব্রহ্মরাজের মুখে শুনিয়াছি; তিনি নাকি ছেলেবেলায় তাঁহার পিতাকে বলিতেন, "বাবা, তোমার জন্যে নলাই করি"; তথাপি শিখণ্ডিবাহনের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ বশত তিনি পিতাকে যুদ্ধের পরিবর্তে সন্ধি করিতেই বলিলেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ধর্মমঙ্গল কাব্যের কথা মনে পড়িতেছে,—রাজকুমারী কাণড়া শত্রু-সেনাপতি লাউসেনকে ভালবাসিতেন, তথাপি আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য সন্ধির পরিবর্তে যুদ্ধই তিনি কামনা করিয়াছিলেন। আর ব্রহ্মরাজকুমারী রণকল্যাণী শিখণ্ডিবাহনের সঙ্গে তাঁহার পরিণয়ের পথে যাহাতে আর কোন বাধা না থাকে, সেইজন্য অপমান স্বীকার করিয়াও পিতাকে শত্রুর সঙ্গে সন্ধি করিতেই সম্মতি দিতেছেন। যাঁহাকে ইচ্ছা করিলে সার্থক বীররমণী করিয়া চিত্রিত করিতে পারিতেন, তাঁহাকে দীনবন্ধু এক নিতান্ত সহজ ব্যক্তিগত হৃদয়-বেদনার দাসীরূপে চিত্রিত করিয়াছেন—জীবনের কোন উচ্চ আদর্শ দীনবন্ধুকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই—তিনি নতমুখে বাংলার ধূলিমাটির উপরই চিরদিন বিচরণ করিয়াছেন, পায়ে চলার পথটিকেই তিনি চিনিয়াছিলেন, সেইজন্য যখন উপরের দিকে মুখ তুলিয়া অপরিচিত জগতের দিকে চাহিয়াছেন, তখনই তিনি ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

রণকল্যাণীর সঙ্গে শিখণ্ডিবাহনের যে অবস্থার ভিতর দিয়া প্রথম প্রণয়-সঞ্চার হইল, তাহা কেবলমাত্র যে আকস্মিক তাহা নহে, নিতান্ত অসঙ্গতও বটে। শিখণ্ডিবাহন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, 'বিশাল-নয়না' না হইলে তিনি কোন নারীকে বিবাহ করিবেন না, ছোট চোখ ছিল বলিয়া এক রাজকুমারীকে তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, ব্রহ্মরাজকুমারীকে তিনি প্রথম দৃষ্টিতেই দেখিলেন—

> ইন্দীবর বিনিন্দিত বিশাল-নয়ন
> মুখ সুখ-সরোবরে ভাসিছে কেমন।

ব্রহ্মরাজকুমারী বিশাল-লোচনা হওয়া যেমন অসম্ভব, এই প্রকার প্রতিজ্ঞাও তেমনই অভিনব বলিয়া মনে হয়। রণকল্যাণীও যেন শিখণ্ডি-বাহনের জন্য পূর্ব হইতেই সকল বিষয়ে প্রস্তুত হইয়াই বসিয়া ছিলেন; এমন কি প্রণয়োপহার স্বরূপ তাঁহার কণ্ঠে যে একটি মালা দেওয়া আবশ্যক, তাহাও সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়া পথিপার্শ্বস্থ প্রাসাদ-শিখরে তিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন; শিখণ্ডিবাহনকে দেখিবামাত্র তিনি বুঝিলেন, তাঁহাকেই তাঁহার চাই, এবং তাঁহাদের মিলনের মধ্যে কোন দিক হইতে কোন বাধা রহিল না। শিখণ্ডিবাহন ও রণকল্যাণীর মিলন হইবার পূর্বেই রাসলীলায় উভয়ে যথাক্রমে কৃষ্ণ ও রাধিকা সাজিয়া নৃত্য করিলেন। ব্রহ্মরাজকুমারীর মণিপুরী রাসনৃত্যের কথা বাদ দিলেও এই পরিকল্পনাটির অসঙ্গতি বড় পীড়াদায়ক।

এই নাটকের মধ্যে শৈবলিনীর প্রসঙ্গটি একেবারেই অনাবশ্যক। সে যবনিকার অন্তরালেই রহিয়াছে, সেইজন্যই তাহার অনাবশ্যকতা আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। সে রাজপুত্র মকরকেতনের রক্ষিতা ছিল, সহসা সে বুঝিতে পারিল, সে রাজবধূ সুশীলার প্রতি অবিচার করিতেছে, ইহা মনে হওয়া মাত্র সে রাজপুত্রের সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল, রাজপুত্রও যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। রাজপুত্রের এই প্রসঙ্গের সঙ্গে নাট্যকাহিনীর কিছুমাত্র যোগ নাই। দুই একটি স্ত্রী-চরিত্রের উপর বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র কোন কোন স্ত্রী-চরিত্রের প্রভাব আছে। তাহাদের মধ্যে সুরবালার চরিত্রটি যে 'দুর্গেশনন্দিনী'র বিমলা চরিত্রের অনুকরণে পরিকল্পিত তাহা বুঝিতে ভুল হয় না। নিজস্ব মৌলিক সৃজনীপ্রতিভা যখন লুপ্ত হয়, তখন স্বভাবতই পরানুকরণের উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইতে হয়, দীনবন্ধুর শেষ অবস্থায় কতকটা তাহাই হইয়াছিল। 'কমলে কামিনী'র ভাষা ও সংলাপ দীনবন্ধুর

অন্যান্য নাটকে ব্যবহৃত ভাষার ক্রমপরিণতির ফল বলিয়া অনুভূত হয় না; পূর্বেই বলিয়াই দীনবন্ধুর গদ্যে ভাষার ক্রমবিকাশের কোন ধারা লক্ষ্য করা যায় না, 'কমলে কামিনী'র ভাষা ও সংলাপের মধ্যে অনেক স্থলেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র ভাষার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। 'কমলে কামিনী' প্রকাশিত হইবার পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের তিনখানি উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছিল—তাহা 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫), 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬) ও 'মৃণালিনী' (১৮৬৯)। ইহাদের ভাষা ও চিত্রের প্রতি তিনি স্বভাবতই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। 'কমলে কামিনী'র মধ্যে তাহাদের কিছু কিছু প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। বক্কেশ্বরের বাক্যালাপ সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের সম্পূর্ণ অনুরূপ।

দীর্ঘ বর্ণনা, বক্তৃতা নাট্যকাহিনীর স্বচ্ছন্দ গতি যে কি ভাবে ব্যাহত করিয়া থাকে, 'কমলে কামিনী' নাটকই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বড়ই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রামনারায়ণ তাঁহার শেষ সামাজিক নাটক 'নব-নাটকে'র মধ্যে যেমন তাঁহার পূর্ববর্তী নাটকের কতকগুলি দোষ-ত্রুটি সংশোধন করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিলেন, দীনবন্ধু তাঁহার সর্বশেষ নাটক 'কমলে কামিনী'র মধ্যে তাহা পারেন নাই। 'লীলাবতী'র বর্ণনা ও বক্তৃতা দীর্ঘ, কিন্তু পরবর্তী নাটক 'কমলে কামিনী'তে তাহা দীর্ঘতর, অর্থাৎ এই বিষয়ে তাঁহার ত্রুটি ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছিল। ইহার কারণ পূর্বে একবার উল্লেখ করিয়াছি যে, সর্বশেষ নাটক রচনাকালে দীনবন্ধুর প্রতিভা অস্তমিত হইয়াছিল, রামানারায়ণের তাহা হয় নাই, রামনারায়ণ সচেতন শিল্পীরূপেই তাঁহার সর্বশেষ নাটক পর্যন্ত রচনা করিয়া গিয়াছেন—দীনবন্ধু নিজের দোষত্রুটি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। সেইজন্য তাঁহার সর্বশেষ রচনাতে পূর্ববর্তী ত্রুটিগুলি আরও সুস্পষ্ট হইয়াছে। 'কমলে কামিনী'তে কোন কোন স্থানে উচ্চাঙ্গের নাটকীয় সংলাপ থাকিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুদীর্ঘ বর্ণনাত্মক বক্তৃতা শুনিতে পাওয়া যায়। তাহাই নাটকীয় ঘটনাকে পদে পদে মন্থরগামী করিয়া দিয়াছে। ইহা কাব্যের বর্ণনা হইলেও নাটকের সংলাপ হইতে পারে না।

এই নাটকের আর কয়েকটি প্রধান ত্রুটির কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া এই অধ্যায়ের উপসংহার করিব। ইহার অন্যতম প্রধান ত্রুটি এই যে, ইহাতে কোন দ্বন্দ্ব নাই; আদর্শ লইয়াই হউক কিংবা ব্যবহারিক কোন স্বার্থ লইয়াই হউক, দ্বন্দ্ব ব্যতীত যে নাটক হইতে পারে না, তাহা পূর্বে উল্লেখ

করিয়াছি। ঘটনার ক্রমোন্নয়ন দ্বারা ইহাকে কোন মুহূর্তে কোন চরম সঙ্কটের সম্মুখে আনিয়াও উপস্থিত করা হয় নাই। ইহার মধ্যে কেবলমাত্র একটানা কাহিনীর অগ্রগতি আছে, এই অগ্রগতিতে কোথাও বাধা কিংবা সংকটের সৃষ্টি হয় নাই। রণকল্যাণী ও শিখণ্ডিবাহনের মিলনের পথে নাট্যকার কোন কার্যকরী বাধার সৃষ্টি করেন নাই। সহজ ভাবেই তাঁহাদের মিলন সম্ভব হইয়াছে। একবার অবশ্য ব্রহ্মরাজ শিখণ্ডী 'জারজ' বলিয়া একটা হুঙ্কার দিয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু পর মুহূর্তেই তিনি, এমন কি শিখণ্ডী জারজ নহেন ইহা প্রতিপন্ন হইবার পূর্বেই, তাঁহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া পড়িলেন। পরবর্তী রচনাগুলির কোন কোন স্থলে দীনবন্ধু সুন্দর নাটকীয় ঔৎসুক্য (suspense) সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছেন, কিন্তু এই নাটকে প্রায় সকল স্থানেই সেই ঔৎসুক্যসমূহ এমন নির্মমভাবে তিনি বিনষ্ট করিয়াছেন যে, এইজন্য অন্তত দীনবন্ধুকে তাঁহার সমালোচকগণ ক্ষমা করিতে পারেন না। নাটকটিকে একটি গতানুগতিক পঞ্চাঙ্করূপ দিতে হইবে এই মনে করিয়াই নাট্যকার ইহাতে গর্ভাঙ্কের পর গর্ভাঙ্ক যোজনা করিয়া গিয়াছেন। আধুনিক বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের কতকগুলি চিত্র নাট্যকার মণিপুরী সমাজের উপর আরোপ করিয়াছেন। নাতজামাই-দিদিশাশুড়ীর পরিহাস তাহাদের অন্যতম। ইহা বড়ই বিসদৃশ হইয়াছে।

কাছাড় অবস্থানকালীন দীনবন্ধু মণিপুরীদিগের প্রসিদ্ধ রাসনৃত্য প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন, সেইজন্য তাঁহার রাসলীলার বর্ণনাটি বড় সরস হইয়াছে। 'কি সুন্দর রাসমণ্ডপ প্রস্তুত ক'রেছে, যেন একটি রাজচ্ছত্র। চন্দ্রাতপটি সুগোল, লালবর্ণ, তার ঝালরে তবকে তবকে পদ্মমালা। খুঁটিগুলি কাঠের কি বাঁশের, তা বল্‌তে পারি না। খুঁটির গায় পদ্মের মালা এমন ঘন করে জড়িয়ে দিয়েছে, খুঁটির গা দেখা যাচ্ছে না। রাসমণ্ডপের মধ্যস্থলে পদ্মের সিংহাসন (২।৪)।' সুরবালার এই সুন্দর বর্ণনাটি দীনবন্ধুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল বলিয়াই মনে হয়।

'কমলে কামিনী' নাটক পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, বাংলা নাট্যসাহিত্যে দীনবন্ধুর আর কিছুই দিবার নাই ; প্রহসনের ক্ষেত্রেও দেখিতে পাওয়া যাইবে যে ইতিপূর্বেই তাঁহার বিষয়-বৈচিত্র্য নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে, পূর্ববর্তী বিষয়সমূহের জের টানিয়া তাঁহার নাট্যকার-জীবন আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে এই মাত্র।

'নবীন তপস্বিনী' রচনার তিন বৎসর পরে 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' প্রকাশিত হয়। নাটকটি দুই অঙ্কে পরিসমাপ্ত একখানি সামাজিক প্রহসন। সামাজিক কোন কৌতুককর ঘটনা, ব্যক্তিবিশেষের চরিত্র বা কোন রীতিনীতি লইয়া ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন করিবার প্রথা বাঙ্গালা গদ্যসৃষ্টির প্রথম যুগ হইতেই চলিয়া আসিতেছে। এইরূপ সামাজিক চিত্ররচনা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহের সাহিত্যসৃষ্টিতে রূপ লাভ করিয়াছে। কিন্তু সমাজ-সমালোচনামূলক এই সমস্ত ব্যঙ্গচিত্রে যে অপূর্ব নাটকীয় রসবস্তু আছে, মাইকেলের পূর্বে আর কাহারও দৃষ্টিতে তাহা পড়ে নাই। প্রকৃত প্রহসনসৃষ্টি হিসাবে মাইকেল অসামান্য সাফল্য লাভ করিলেও তিনি ইহাতে যে সংস্কারমূলক মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে ইহার সৃষ্টিসৌন্দর্য কিছুটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু দীনবন্ধুর সৃষ্টিতে এরূপ কোন মনোভাবের পরিচয় নাই। প্রহসন-সৃষ্টিতে দীনবন্ধুর সম্মুখে মাইকেলের আদর্শ থাকিলেও, দীনবন্ধুর সৃষ্টি-কল্পনা মাইকেল হইতে যে ভিন্ন তাহা আমরা দেখিব। প্রাচীন ও নব্যসম্প্রদায়ের প্রতি মাইকেলের ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও বিদ্বেষ নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে—এবং ইহার ফলে তাঁহার প্রহসনগুলি প্রথমে মঞ্চস্থ করিতে অনেক বাধার সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু দীনবন্ধু তাঁহার প্রহসনকে যথেষ্ট সাহিত্যিক মর্যাদা দিয়াছেন। তাঁহার অপূর্ব সহমর্মিতা কৌতুককে কৌতুক রূপে, ব্যথাকে ব্যথা রূপেই প্রকাশ করিতে পারিয়াছে। কোন প্রকার উচ্ছ্বাস বা নীতি-প্রবণতা আসিয়া রসসৃষ্টিতে ব্যাঘাত জন্মায় নাই কিংবা তাঁহার রচনাকে নিতান্ত লঘু পরিহাস-রসিকতায় পর্যবসিত হইতে দেয় নাই। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' ইহার প্রথম প্রমাণ।

প্রহসনটির আখ্যানভাগ এইরূপ:—গ্রাম্য সমাজের নেতা মহাকুলীন রাজীবলোচন বৃদ্ধবয়সে বিপত্নীক হইয়া পুনরায় বিবাহের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিলেন। সংসারে তাঁহার দুইটি বিধবা কন্যা—রাসমণি ও গৌরমণি। গৌরমণির বয়স অল্প। রতা, নসীরাম, গোপাল প্রভৃতি গ্রাম্যবালকেরা রাজীবলোচনকে তাঁহার কুপ্রকৃতির জন্য নানাভাবে ক্ষেপাইত। বৃদ্ধ রাজীব যুবকের বেশে যথাসম্ভব আপনার বার্ধক্য ঢাকিয়া রাখিতে নিষ্ফল চেষ্টা করিতেন। পেঁচোর মা এক বিধবা রমণী; রাজীবকে তাহার অপেক্ষা বয়সে বড় বলায় রাজীব পেঁচোর মার নাম শুনিলেই ক্ষেপিয়া উঠিতেন। গ্রা

বালকদের প্ররোচনায় কনকবাবু বৃদ্ধকে এক পাত্রী স্থির করিয়া দিবেন এই মিথ্যা আশ্বাস দিয়া তাঁহার নিকট কিছু অনুগ্রহ লাভ করিলেন। এক বিদেশী ভদ্রলোককে ঘটক সাজাইয়া বৃদ্ধের নিকট পাঠান হইল। ঘটক বিবাহের স্থানকাল ঠিক করিয়া আসিল। রাজীব শয়ন করিয়া কন্যার রূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় গ্রাম্যবালকেরা অলক্ষ্যে তাঁহার হাতে একটি কাঁটা ফুটাইয়া দিল ও একটি সোলার সাপ দেখাইল। সাপে কামড়াইয়াছে মনে করিয়া বৃদ্ধ প্রাণভয়ে কাতর হইয়া পড়িলেন, বিখ্যাত ওঝার পুত্র রতার ডাক পড়িল। রতা তাহার দলবল লইয়া বৃদ্ধকে নিদারুণ চপেটাঘাত ও ঝাঁটা প্রহার করিয়া, অখাদ্য খাওয়াইয়া একেবারে আধমরা করিয়া তবে তাহার বিষ ঝাড়া শেষ করিল। বিবাহের দিন রাজীব বরের বেশে নির্দিষ্ট স্থানে একাকী উপস্থিত হইলেন। সেখানে এক ছদ্ম বিবাহসভার আয়োজন হইল। গ্রাম্য বালকেরা স্ত্রীলোকের বেশে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করিল। বর বৃদ্ধ বলিয়া নানা কথা উঠিল—পরিশেষে "লক্ষ কথা" পূর্ণ হইয়া বিবাহ শেষ হইল। বাসর ঘরে বৃদ্ধকে লইয়া নানারূপ কৌতুক করা হইল। সুন্দরী গুণবতী স্ত্রী পাইয়া বৃদ্ধ আনন্দে আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলেন। বধূ লইয়া বাড়ী ফিরিলে কন্যারা কেহ তাহাকে বরণ করিতে আসিল না। স্ত্রীর মুখ দেখাইবার জন্য বৃদ্ধ নিজেই তাহার ঘোমটা তুলিলেন। কিন্তু তখন দেখা গেল বৃদ্ধ যাহার নাম শুনিলে ক্ষেপিয়া যাইতেন গ্রাম্যবালকদের চক্রান্তে সেই পেচোর মা-ই বধূ সাজিয়া আসিয়াছে।

প্রহসনের পরিসমাপ্তিতে, রাজীবলোচন 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'র ভক্তপ্রসাদের ন্যায় চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া সুবিবেচক ও নীতিজ্ঞ হইয়া উঠেন নাই। রাজীবলোচনের নিদারুণ আশাভঙ্গে, পেচোর মার অকপট কৌতুকাভিনয়ে নাটকটিতে শেষ পর্যন্ত একটি হাস্যকরুণ আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। এই নাটকের মূল আখ্যানবস্তু সর্বকালের প্রহসনসৃষ্টিরই উপকরণ বলিয়া গ্রহণীয় হইতে পারে। দীনবন্ধু ইহাকে তাঁহার প্রায় সমসাময়িক কালের পটভূমিকায় রূপ দিয়াছেন। ইহার প্রত্যেক চরিত্রেরই এক একটি বাস্তব অস্তিত্ব আছে। কিন্তু এই বাস্তব অস্তিত্ব তাহাদিগকে সমসাময়িক কালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়া সৃষ্টিহিসাবে মূল্যহীন করিয়া দেয় নাই। প্রহসনের নায়ক হিসাবে রাজীবলোচনের সৃষ্টি সার্থক হইয়াছে। তাঁহার যাহা প্রকৃত পরিচয় তাহার অধিক নাট্যকার কিছু আমাদের আর দিতে চাহেন নাই। 'পেচোর

মা'র সম্পর্কেও ইহা প্রযোজ্য। নাট্যকার এই সকল চরিত্র বাস্তব জগৎ হইতে আপনার সহানুভূতির বলে উদ্ধার করিয়া চিরন্তন সৃষ্টিরূপে প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছেন। রাজীবলোচনকে শুধু বিবাহপাগল বৃদ্ধ বর বা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগের গ্রাম্য বৃদ্ধ-চরিত্রের একটি Type বলিলে ঠিক হইবে না—তাঁহার মধ্যেও দীনবন্ধু আপনার সৃষ্টিপ্রতিভার কিছু পরিচয় দিয়াছেন। বার্ধক্যকে অস্বীকার করিয়া যুবক সাজিয়া থাকিবার চেষ্টা যে কিরূপ নিষ্ফল ও করুণ দীনবন্ধু অপূর্ব নাটকীয় কল্পনার ভিতর দিয়া তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা'র অনুকরণে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' নামক প্রহসন প্রকাশিত হয়। উদ্দেশ্যের দিক দিয়া এই দুইখানি প্রহসন অভিন্ন হইলেও বিষয়-বিন্যাসে দীনবন্ধু তাঁহার রচনায় কতকটা মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। 'সধবার একাদশী'র কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ :—

কলিকাতার এক ধনাঢ্য ব্যক্তি জীবনচন্দ্রের একমাত্র পুত্র অটলবিহারী অটলবিহারী ইংরেজি বিদ্যালয়ে সামান্য কিছুদিন অধ্যয়ন করিয়াই বিদ্যালয় ত্যাগ করিল এবং কয়েকজন ইয়ার জুটাইয়া তাহাদের সঙ্গে দিবারাত্র ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। উচ্চশিক্ষিত যুবক নিমচাঁদ তাহার ইয়ারদিগের মধ্যে সর্বপ্রধান। নিমচাঁদ ইতিপূর্বেই মদ্যপান অভ্যাস করিয়াছিল, ক্রমে অটলকেও সেই পথ ধরাইল, অল্পদিনের মধ্যে অটল একজন পাকা মদ্যপ হইয়া উঠিল। অটলের অর্থে নিমচাঁদ ও তাহার অন্যান্য ইয়ারগণ প্রচুর মদ্যপান করিয়া যেখানে সেখানে মাতলামি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অটলের খুড়শ্বশুর গোকুলচন্দ্রের সাহায্যে অটলের পিতা পুত্রের মতিগতি পরিবর্তন করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোনও ফলোদয় হইল না। অটলের স্ত্রীর নাম কুমুদিনী। স্বামীর সঙ্গে তাহার কোন দিন সাক্ষাৎ হয় না। অটল কাঞ্চন নামক এক বারবনিতাকে নিজের রক্ষিতারূপে রাখিয়া তাহার সংসর্গেই দিবারাত্র কাটাইতে লাগিল। কোন কোন দিন তাহাকে নিজের বৈঠক-খানায় লইয়া আসিয়া সেখানে বসিয়াই মদ্যাদি পান করিতে লাগিল। অটলের জননীর পুত্রস্নেহান্ধতার জন্য জীবনচন্দ্র পুত্রকে কোন প্রকারে শাসন করিতে পারিতেন না, এমন কি তিনিই গোপনে পুত্রের সকল প্রকার অন্যায় ব্যয়ের জন্য অর্থ যোগাইতেন। কাঞ্চনের নিকট হইতে একদিন অপমানিত হইয়া

অটল স্থির করিল তাহাকে শিক্ষা দিতে হইবে, সে ভদ্রঘরের মেয়ে বাহির করিয়া বাগানে লইয়া রাখিবে, কাঞ্চনের পথ আর মাড়াইবে না। সেদিন তাহার গৃহে মেয়েদের একটা উৎসব ছিল, সেই উপলক্ষে তাহার খুড়শাশুড়ী গোকুলবাবুর স্ত্রী তাহার গৃহে আসিয়াছিলেন, গোকুলবাবুর স্ত্রীকে বাহির করিয়া আনিবার জন্য অটল ষড়যন্ত্র করিল। এক হিজড়াকে বাড়ীর ভিতর পাঠাইয়া তাহাকে ভুলাইয়া বৈঠকখানায় তাহার সম্মুখে লইয়া আসিতে বলিল। নিমচাঁদ ইহাতে ঘোরতর আপত্তি করিল, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। অটল বৈঠকখানায় এক ছদ্মবেশ ধরিয়া বসিয়া রহিল। হিজড়া ভুল করিয়া কুমুদিনীকে লইয়া আসিল। অটলের পিতৃব্য আসিয়া নিমচাঁদ ও অটলকে এই কার্যের জন্য গুরুতর প্রহার করিলেন। অটলের ছদ্মবেশ খসিয়া পড়িল, কুমুদিনী চিনিল যাহার নিকট তাহাকে আনিয়াছে সে তাহার স্বামী। নিমচাঁদ এই কার্যে অনুতপ্ত হইয়া অটলের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল, অটলের মনেও একটু কেমন ভাবান্তর উপস্থিত হইল, কিন্তু সেই মুহূর্তেই পুনরায় উভয়ে 'ব্রাণ্ডী' পান করিবার জন্য বাগানে চলিয়া গেল।

'নীলদর্পণে'র মত 'সধবার একাদশী'ও উদ্দেশ্যমূলক নাটক। ইহার উদ্দেশ্যরূপে নাট্যকার প্রারম্ভেই কয়েকটি ইংরেজি বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে এলিবু বারেটের 'Touch not, taste not, smell not, drink not anything that intoxicates' উক্তিটি নাটকের উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছে। দীনবন্ধুর যে অনুভূতিশীল হৃদয় একদিন পল্লীর নীল-চাষীদিগের দুঃখদুর্দশা দেখিয়া কাতর হইয়াছিল, তাহাই সমসাময়িক নাগরিক সভ্যতার এক কদর্য রূপ দেখিয়া সেদিন ঘৃণায় ও বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। 'সধবার একাদশী'র মধ্য দিয়া তাহারই অভিব্যক্তি দেখা দিয়াছে। সাহিত্যের ভিতর দিয়া সমাজ-সংস্কারের প্রয়াস ইতিপূর্বেই এদেশে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। দীনবন্ধু তাহারই সূত্র ধরিয়া সেকালের শিক্ষিত নব্য বাংলার একটি জঘন্য দুর্নীতির ও তাহার শোচনীয় পরিণামের প্রতি সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য কতখানি সফল হইয়াছিল, তাহা আমাদের বিচার্য নহে; সাহিত্যিক রচনা হিসাবে তাহা কতদূর সার্থকতা লাভ করিয়াছে, তাহাই আমাদের বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজি শিক্ষিত নব্য যুবক-সম্প্রদায়ের মধ্যে মদ্যপান যে অত্যন্ত ব্যাপক আকার ধারণ করিয়া শিক্ষিত সমাজের নৈতিক ভিত্তি শিথিল করিয়া দিয়াছিল, সমসাময়িক সাহিত্য হইতেই তাহার পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে—সেই ইতিবৃত্তের এখানে আর পুনরাবৃত্তি করিতে চাহি না। প্রত্যেক সমাজহিতৈষী ব্যক্তিই ইহার প্রতিকারের নানাবিধ উপায় সন্ধান করিতেছিলেন, অল্পকাল মধ্যেই সমবেতভাবে এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি সাধারণ প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হইল। তাহাদের মধ্যে প্যারীচরণ সরকার প্রতিষ্ঠিত **Temperance Society** বা সুরাপান নিবারণী সমিতি অন্যতম। এই সমিতির কার্যাবলী ও উদ্দেশ্য তখন দেশের শিক্ষিত সমাজের আলোচনার বিষয় ছিল। দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' **Temperance Society** প্রতিষ্ঠিত হইবার অল্পকাল পরেই রচিত হয়। বলা বাহুল্য, এই সমিতির ও দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' নাটকের উদ্দেশ্য ছিল অভিন্ন।

'সধবার একাদশী'র মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য চরিত্র নিমচাঁদ। এই চরিত্রটির পরিকল্পনায় দীনবন্ধুর স্বকীয় প্রতিভার বৈশিষ্ট্য অনেকটা প্রকাশ পাইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, প্রত্যক্ষদৃষ্ট সমাজ-চরিত্রগুলি দীনবন্ধুর পরিকল্পনায় যত শক্তিশালী হয়, কল্পিত চরিত্রগুলি তেমন হয় না। নিমচাঁদও দীনবন্ধু কর্তৃক প্রত্যক্ষদৃষ্ট তদানীন্তন সমাজের একটি বিশিষ্ট বাস্তব চরিত্র, কিন্তু এই কথাটিই এখানে একটু বিস্তৃতভাবে বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন বোধ করি।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, 'সধবার একাদশী'র প্রায় সকল নায়ক-নায়িকাই জীবিত ব্যক্তির প্রতিকৃতি; নিমচাঁদও ইহার ব্যতিক্রম নহে। কিন্তু কেহ কেহ যে মনে করেন, নিমচাঁদ মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রতিকৃতি তাহা সত্য নহে। কারণ, যদিও নিমচাঁদের মুখে মধুসূদনের নিজস্ব দুই একটি উক্তির স্থান দেওয়া হইয়াছে, তথাপি সমগ্রভাবে মধুসূদনের ব্যক্তিগত চরিত্র বিচার করিয়া দেখিলে ইহার সঙ্গে নিমচাঁদের চরিত্রের কোন সামঞ্জস্য পাওয়া যায় না। মধুসূদনের সমস্ত কার্যাবলীর মধ্যেই যেমন সর্বদাই কেবলমাত্র উচ্চশিক্ষার নহে উচ্চতর প্রতিভারও একটা স্পর্শ থাকিত, নিমচাঁদের চরিত্রের মধ্যে তাহা নাই। নিমচাঁদের শিক্ষার ফল তাহার মজ্জায় গিয়া প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই, এক কথায় শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে স্বাঙ্গীকৃত হইয়া তাহার জীবনের

আদর্শ গঠনে সহায়তা করিতে পারে নাই, কিন্তু মধুসূদন সম্পর্কে একথা বলিতে পারা যায় না। একটা উচ্চতর জীবনাদর্শ সর্বদাই মধুসূদনের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিত, সেই আদর্শ বাস্তবের সম্পর্কশূন্য ছিল বলিয়া তাঁহার জীবন ট্র্যাজেডিতে পর্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু নিমচাঁদের জীবনে কোন উচ্চ আদর্শ ছিল না; তাহার মধ্যে আত্মসম্মানবোধ ছিল সত্য, কিন্তু তাহা সর্বদাই তাহার পরিবেশের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। তবে মধুসূদনের সঙ্গে নিমচাঁদের সম্পর্ক কল্পনা করিবার কারণ কি? মনে হয়, নিমচাঁদের মুখে মধুসূদনের দুই একটি নিজস্ব উক্তি শুনিতে পাওয়া যায় বলিয়াই মুখ্যত এই ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু সেই যুগের ডিরোজিও-রিচার্ডসনের ছাত্রদিগের মধ্যে এই ধরণের কথা সকলের পক্ষেই সমান স্বাভাবিক ছিল। অতএব এই উক্তিগুলির ভিতর দিয়া একমাত্র মধুসূদন নহে, তদানীন্তন সমগ্র শিক্ষিত নব্যযুবক-সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক মনোভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। অতএব দীনবন্ধু এই অভিযোগের উত্তরে বলিয়াছেন যে, 'মধু কি কখনও নিম হয়' তাহা কেবলমাত্র একটি সাধারণ লৌকিক যুক্তি হিসাবেই গ্রহণযোগ্য নহে, ইহার মধ্যেও তাহার একটি সার্থক ইঙ্গিত ছিল। তবে এ কথা সত্য যে, নিমচাঁদের চরিত্র মধুসূদনের চরিত্র অবলম্বনে লিখিত না হইলেও এই বিষয়ে কোনো জীবন্ত আদর্শ যে দীনবন্ধুর সম্মুখে ছিল এই বিষয়ে কোন ভুল নাই। তবে তাহা অন্য কাহারও হইতে পারে।

নিমচাঁদের চরিত্রের মধ্যে উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজেডির উপাদান ছিল, নাট্যকার সেভাবে তাহা যদি ব্যবহার করিতে পারিতেন তাহা হইলে 'সধবার একাদশী' বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক হইতে পারিত। কিন্তু এই উপাদান-গুলি এতই অস্পষ্ট আভাস মাত্র দিয়া যায় যে, তাহা দ্বারা ট্র্যাজেডির প্রকৃত কোন উদ্দেশ্যই সফল হয় না; সেইজন্যই 'সধবার একাদশী' ট্র্যাজেডি না হইয়া হইয়াছে প্রহসন।

নিমচাঁদের সমগ্র জীবনের ব্যর্থতার জন্য তাহার দাম্পত্য জীবনই যে দায়ী সমগ্র নাটকের মধ্যে তাহার অস্পষ্ট আভাসমাত্র আছে। অথচ ইহার উপরই তাহার সমগ্র চরিত্রের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। ইহা বুঝিতে না পারিলে নিমচাঁদের চরিত্রের কোন তাৎপর্যই বুঝিতে পারা যায় না—তাহার মাতলামি কেবলমাত্র মাতলামির জন্যই বলিয়া ভুল হয়। একদিন নিমচাঁদ অটলের

বাড়ীতে মদ খাইয়া পড়িয়া আছে, কেনারাম ডেপুটিও সেখানে ছিল—নিমচাঁদ কাঞ্চনের বাড়ী যাইবার প্রস্তাব করিল। অটল বলিল,

অটল। তুই ওঠ্, আর এক জায়গায় চল্।

নিম। প্রসন্নর বাড়ী? ডেপুটি বাবু, আমি তোমার পিনাল কোড্. এর সব ক্রাইম আছে, আমারে হাতে ধরে লও, নইলে বাবা পড়ে মরি। ২।২

এইখানেই সর্বপ্রথম নিমচাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থতার আভাসটুকু পাওয়া গেল। তারপর আর একবার মাত্র বিষয়টি আর একটু স্পষ্ট হইয়াছে। নিমচাঁদের নিকট অটল গোকুলবাবুর স্ত্রীকে বাহির করিয়া আনিবার প্রস্তাব করিল। নিমচাঁদ অটলের এই প্রস্তাব সমর্থন করিল না। ইহাতে অটল ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বলিল,

অটল। তুই তবে তোর মাগের কাছে যা।

নিম। **Thou sticketh a dagger in me.** অটল কি গালাগালিই তুই দিলি। ৩।২

সমগ্র প্রহসনের মধ্যে ইহার সর্বপ্রধান চরিত্র নিমচাঁদের দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে এই সামান্য আভাসটুকু মাত্র পাওয়া যায়। নিমচাঁদের সমস্ত আচরণের মধ্যেই তাহার জীবনের এই প্রচ্ছন্ন বেদনার অভিব্যক্তিই প্রকাশ পাইয়াছে এইটুকু বুঝিতে পারিলে তাহার চরিত্রের প্রতি ঘৃণা অপেক্ষা সমবেদনাই অধিক হয়। এই সম্পর্কে অনতিকাল ব্যবধানে রচিত বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বিষবৃক্ষ’ উপন্যাসের একটি চরিত্রের কথা উল্লেখ করিতে পারি। তাহা দেবেন্দ্রনাথের চরিত্র। ব্যর্থ দাম্পত্য জীবনই দেবেন্দ্রনাথের চারিত্রিক অধঃপতনের মূল। দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, ‘যদি কখনও স্ত্রীর মৃত্যু-সংবাদ কর্ণে শুনি তবে মদ ছাড়িব নচেৎ এখন মরি বাঁচি সমান কথা।’ নিমচাঁদের দাম্পত্য জীবনের যে আভাসটুকু আমরা পাইলাম, তাহাতে তাহার পক্ষেও বাঁচা-মরা সমান কথাই ছিল। দীনবন্ধু অপূর্ব কৌশলে তাহার আচরণের মধ্য দিয়া এই ভাবটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন এবং এই তথ্যটুকুর উপর ভিত্তি করিয়াই তাহার চরিত্রকে একটি মানবিক রূপ দিতে সক্ষম হইয়াছেন।

নিমচাঁদের মদ্যাসক্তির মূলে এই ইতিহাসটুকু ছিল বলিয়াই মাতাল হইয়াও সে নিজের বিবেক বিসর্জন দেয় নাই—সে মত্ততার মধ্যে কখনও আত্মলোপ করে নাই, মত্ততার মধ্যে সে তাহার ব্যর্থ দাম্পত্য জীবনের বিস্মৃতির সন্ধান করিয়াছে মাত্র, কিন্তু অন্য বিষয়ে তাহার আত্মসম্মান সজাগ

ছিল। অটল যখন গোকুলের স্ত্রীকে বাহির করিয়া আনিবার জন্য নিমচাঁদের নিকট প্রস্তাব করিল তখন নিমচাঁদ বলিল, 'এ কি ভদ্রলোকে পারে?' বলিয়া সে প্রস্তাব ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করিল। বিষবৃক্ষের দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গেও নিমচাঁদের এইখানেই পার্থক্য ছিল। দেবেন্দ্র রূপ-তৃষ্ণায় হিতাহিতজ্ঞানশূন্য ছিল। কিন্তু নিমচাঁদ নিজের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে আর কোন নিষ্পাপ জীবনকে জড়াইতে চাহে নাই, ইহা নিমচাঁদের চরিত্রের একটি বিশেষত্ব।)

নিমচাঁদের চরিত্রের এই গুরুত্বের দিকটা নাটকের মধ্যে প্রাধান্য পায় নাই, বরং আভাসে ও ইঙ্গিতে ব্যক্ত করা হইয়াছে বলিয়া নিমচাঁদ ট্র্যাজেডির নায়ক না হইয়া এক সাধারণ প্রহসনের পাত্র হইয়াছে; তাহার মাতলামি, তাহার রুচি- ও নীতি-বিরুদ্ধ উক্তি, তাহার অশ্লীল আচরণ ইত্যাদিই নাটকের মধ্যে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য নাট্যকারের উদ্দেশ্য সাধনের ইহাই একমাত্র উপায় ছিল। তিনি 'সধবার একাদশী'কে 'নীলদর্পণের' মত বিয়োগান্তক নাটকে পরিণত করিতে চাহেন নাই। কিন্তু বোধ হয় তাহা করিলেই ভাল হইত, দীনবন্ধুর হাতে একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক আমরা পাইতাম। এখানে দীনবন্ধু সেই পথ পরিত্যাগ করিয়া একটি সাময়িক সামাজিক দুর্নীতিকে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের কশাঘাতে জর্জরিত করিয়াছেন, সমাজের বিভিন্ন স্তরের কতকগুলি চরিত্র লইয়া বিভিন্ন দিক হইতে মদ্যপানের কুফল বর্ণনা করিয়াছেন; তাহাতে নাট্যকাহিনীর সংহতিও যে কতকটা নষ্ট হইয়াছে, সে কথা পরে আরও বিস্তৃতভাবে বলিতেছি।

নিমচাঁদ ব্যতীত এই নাটকে আর কোন চরিত্রই প্রকৃত স্ফূর্তি লাভ করিতে পারে নাই। নিমচাঁদের পরই অটলের চরিত্রের কথা আলোচনা করিতে হয়। অটল ধনী মাতাপিতার একমাত্র পুত্র, সামান্য বিদ্যালাভ করিয়াই কুসঙ্গে পড়িয়াছে, তারপর সময়গুণে যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে। সে মূর্খ; সে 'মেঘনাদবধ কাব্য' কিনিয়াছে শুনিয়া নিমচাঁদ তাহাকে বলিল, 'ওর ভালমন্দ তুমি বুঝবে কি? তুমি পড়েছ দাতাকর্ণ, তোমার বাপ পড়েছে দাশরথি, তোমার ঠাকুরদা পড়েছে কাশীদাস, তোমার হাতে মেঘনাদ, কাঠুরের হাতে মাণিক—মাইকেল দাদা বাংলার মিল্‌টন।' দুইজনে এক সঙ্গে বসিয়া মদ খাইলেও এই দুইজনের মধ্যে এই পার্থক্য।

অটলের গৃহে সুন্দরী ও গুণবতী স্ত্রী, তথাপি সে বারবনিতা-বিলাসী কারণ, রক্ষিতা রাখা সে বড়মানুষী বলিয়া মনে করে। কলিকাতা সহরের

সকল বড় লোকের উপর দিয়া বাহাদুরী লইবার জন্য সে সহরের খ্যাতনামা বারবনিতাকে নিজের রক্ষিতারূপে রাখিয়াছে। ইহা তাহার মূর্খতার সম্পূর্ণ উপযোগী কার্যই হইয়াছে। তারপর সেই বারবনিতা যখন তাহাকে অপমান করিয়াছে তখন সেই বারবনিতাকে অপমান করিবার জন্য নিজের এক কুলবধূকে ঘরের বাহির করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। নাট্যকার অপূর্ব কৌশলে তাহার চরিত্রগত এই আনুপূর্বিক সামঞ্জস্যগুলি দেখাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু যে শ্রেণীর নাটকই হউক, তাহাদের চরিত্রের একটা সুস্পষ্ট নির্দেশ করা সর্বদাই নাট্যকারের কর্তব্য। অটলের পরিণতি-নির্দেশ খুব স্পষ্ট নহে। গোকুলবাবুর স্ত্রীকে বাহির করিতে গিয়া ভুল করিয়া নিজের স্ত্রীকেই সে বাহির করিয়া আনিল, এই ঘটনাটির মধ্যে একটি উচ্চাঙ্গের কৌতুকরস ছিল, কিন্তু অটলের উপর এই ঘটনার কোন সুস্পষ্ট প্রতিক্রিয়া অনুভব করা যায় না। রামধনের প্রহারের প্রতিক্রিয়াও ক্ষণিকমাত্র। ঐ অবস্থায় স্ত্রীকে নিকটে পাইয়া ও তাহার কথা শুনিয়া অটল তাহাকে বলিল, 'তোমার আর লেকচার দিতে হবে না, তুমি আস্তে আস্তে বাড়ীর ভিতর যাও, গিন্নীপনা করে এ'লেন।' কুমুদিনী 'যমের বাড়ী যাই' বলিয়া সক্রোধে বাড়ীর ভিতর প্রস্থান করিল, অটলও ব্রাণ্ডী খাইয়া মারের জ্বালা ভুলিবার জন্য নিমচাঁদকে লইয়া বাগানে চলিয়া গেল—এই ভাবেই নাটকের যবনিকা পতন হইল। অর্থাৎ ঘটনার দিক দিয়া নাটক যেখানে আরম্ভ হইয়াছে, প্রায় সেইখানেই শেষ হইয়াছে। অবশ্য একথাও সত্য যে, প্রহসনের মধ্যে ঘটনার দিক দিয়া খুব বেশি কিছু দাবী করা চলে না। কিন্তু 'সধবার একাদশী' সেই জাতীয় প্রহসন নহে বলিয়াই ইহার বিষয়ে এই দাবী যেন কতকটা না তুলিয়া পারা যায় না। নীলকরের অত্যাচারে গোলোক বসুর পরিবার যে ভাবে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল, সেই তুলনায় পুত্রের মদ্যপানের জন্য জীবনচন্দ্রের বিপুল ধন-সম্পত্তি কিংবা তাহার পরিবারের যেন বিশেষ একটা কিছুই হয় নাই বলিয়াই অনুভূত হয়।

উপরোক্ত ত্রুটির অন্যতম কারণ, অটলের স্ত্রী কুমুদিনীর চরিত্র-পরিকল্পনার ব্যর্থতা। কুমুদিনীই এই নাটকের নায়িকা—মাতাল স্বামীর উপেক্ষিতা পত্নী। নাটকের নামকরণ দেখিয়া মনে হয়, তাহার নারীজীবনের ব্যর্থতা নির্দেশ করাই নাট্যকারের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই। ইহার কারণ, নাটকের মধ্যে তাহার স্থান বড়ই সঙ্কীর্ণ।

মাত্র দুই তিনটি দৃশ্যে তাহার আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, এমন কি তাহাদের ভিতর দিয়াও সে পাঠকের কোন সহানুভূতি উদ্রেক করিতে পারে না। ইহার প্রধান কারণ, তাহার চরিত্রের মধ্যে নাট্যকার এমন কোন গুণ আছে বলিয়া নির্দেশ করেন নাই, যে তাহা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। বরং ননদের সঙ্গে তাহার কুরুচিপূর্ণ বাক্যালাপে হাস্যরসের উদ্রেক হওয়ার পরিবর্তে তাহার বিরুদ্ধেই মন বিরূপ হইয়া উঠে। সৌদামিনীর সঙ্গে তাহার যে কথোপকথন শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা এতই কুরুচিপূর্ণ যে তাহা দ্বারা সে কাহারও সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারে না। অবশ্য ভ্রাতৃবধূ এবং ননদ উভয়েই এই বিষয়ে সমান পারদর্শী—ধনিগৃহের বয়স্থা কন্যা ও বধূ সম্পর্কে দীনবন্ধুর এই ধারণাই যে কি ভাবে সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারা যায় না—হয়ত এই সম্বন্ধে দীনবন্ধুর জ্ঞান সুস্পষ্ট বাস্তবতার উপর নির্ভরশীল ছিল না, এই বিষয়ে তাঁহাকে কতকটা মধুসূদনের প্রহসনের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয় এই চরিত্রগুলি তাঁহার এই নাটকের মধ্যে এমন শক্তিহীন হইয়াছে। কুমুদিনী দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে সর্বপ্রথম আবির্ভূত হইয়াই যে কথাটি প্রথম উচ্চারণ করিয়াছে, তাহা এই—'এর চেয়ে বিধবা হয়ে থাকা ভাল।' তারপর সেই দৃশ্যেই আবার বলিয়াছে, 'আজ দশ দিন বাপের বাড়ী থেকে এইচি, একদিন তাকে ঘরে দেখতে পেলাম না। এক মরে যায়—জানলুম আপদ গেল।' অতএব দেখা যাইতেছে, আদর্শ হিন্দু নারী করিয়া নাট্যকার কুমুদিনীকে চিত্রিত করেন নাই, স্বামীর নিকট হইতে প্রত্যক্ষ কোন আঘাত না পাইয়াই নিজের একাদশীর সে কামনা করিতেছে, নাট্যকার কেবলমাত্র ইহার উপরই তাঁহার নাটকের 'সধবার একাদশী' নামকরণ করিয়াছেন। নাটকে আরও একবার কুমুদিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। তখন সে নীলাম্বরী শাড়ী পরিয়া কাঁকালে মস্ত মসবাট চেন-এ বাঁধা ঘড়ি ঝুলাইয়া উৎসব-গৃহে 'হেসে হেসে মেয়েদের অভ্যর্থনা' করিতেছে। স্বামীর উপেক্ষিতা নারীর এই আচরণ কাহারও সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারে না—এই সহজ কথাটি নাট্যকার এখানে বিস্মৃত হইয়াছেন। অতএব মনে হয়, নাট্যকার 'সধবার একাদশী'কে যথার্থই প্রহসন করিতে চাহিয়াছেন—ইহা লইয়া তাঁহার অন্য কোন উচ্চাশা ছিল না। তবে নিমচাঁদের চরিত্রের মধ্যে হয়ত তাঁহার অলক্ষ্যেই কতকগুলি নাটকীয় গুণ আসিয়া গিয়াছিল। যথার্থ নাট্যিক উপাদান হাতে পাইয়াও কত বড়

একটা সম্ভাবনাকে নাট্যকার যে এখানে সামান্য একটা প্রহসনের কাছে বলি দিয়াছেন, এই নাটকখানি বিশেষ ভাবে অনুশীলন করিলে তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়।

কতকগুলি অনাবশ্যক চরিত্রের সমাবেশ এই নাটকের আর একটি গুরুতর ত্রুটি। মূল নাট্যকাহিনীর মধ্যে কেনারাম ডেপুটি, রামমাণিক্য ও ভোলার কোন স্থান নাই। তবে নানাদিক হইতে মাতলামির কুফল দেখাইবার জন্য নাট্যকার এখানে বিভিন্ন প্রকৃতির কতকগুলি চরিত্র আনিয়া একত্র সমাবেশ করিয়াছেন। স্থূল হাস্যরস সৃষ্টি ছাড়া ইহাদের দ্বারা আর কোন উদ্দেশ্য সাধিত হয় নাই।

'সধবার একাদশী' সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা গুরুতর যে অভিযোগ তাহা রুচির অভিযোগ। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন; কারণ, একথা সত্য যে, এই বিষয়ে মতের অনৈক্য চিরদিনই থাকিবে। কারণ, পাঠকের ব্যক্তিগত নীতি ও রুচি-বোধ দ্বারাই ইহার নৈতিক মূল্য বিচার করা হইবে। তথাপি স্বীকার করিতেই হয় যে, সমাজের এক পাপ দূর করিতে গিয়া আর এক পাপের প্রশ্রয় দিলে কোন লাভই হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র ইহার দূষিত রুচির জন্য নাটকখানিকে প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। দীনবন্ধু তাঁহার কথায় কিছুকাল ইহা অপ্রকাশিত রাখিয়াছিলেন। একমাত্র নিমচাঁদের চরিত্রের জন্য দীনবন্ধু কতকটা কৃতিত্বের অধিকারী হইলেও এই প্রহসন সর্বতোভাবে তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারে নাই।

দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাই-বারিক' ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। নাট্যকার ইহাকে একখানি প্রহসন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহার উদ্দেশ্য হিসাবে এই দুইটি ইংরেজি পদ প্রথমেই উদ্ধৃত করিয়াছেন,

> 'Of all the blessings on earth the best is a good wife,
> A bad one is the bitterest curse of human life.'

উদ্ধৃত পদ দুইটির মধ্যে প্রথমটির অর্থাৎ 'good wife'-এর blessings এর কোন বিবরণ এই প্রহসনের মধ্যে নাই, দ্বিতীয় পদটিরও আংশিক পরিচয় আছে, পূর্ণাঙ্গ পরিচয় নাই। দ্বিতীয় পদটি হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহা ট্র্যাজেডির বিষয় প্রহসনের নহে; কিন্তু নাট্যকার এই ট্র্যাজেডির বিষয়বস্তুটিকেই প্রহসনের কার্যে লাগাইয়াছেন। দীনবন্ধুর স্বাভাবিক হাস্যরসপ্রবণতার গুণে জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুতর বিষয় নিতান্ত

লঘু হাস্য-পরিহাসের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার ফলে ইহার কতকগুলি ত্রুটিও অপরিহার্য হইয়া রহিয়াছে। প্রথমে 'জামাই বারিকে'র কাহিনীটি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া ইহার অন্যান্য বিষয় আলোচনা করা যাইবে—

কেশবপুরের জমিদারের নাম বিজয়বল্লভ। তিনি তাঁহার কুলীন ঘরজামাইদিগের বাসের জন্য বাহির বাড়ীতে একটি ব্যারাকের মত বড় ঘর করিয়া রাখিয়াছেন, জামাইরা সেখানেই থাকে। জামাই, ভাইঝি-জামাই, ভাগ্নী-জামাই, নাত-জামাই, জামাইয়ের জামাই, সবাই একসঙ্গে সেখানে আছে। অন্তঃপুর হইতে যে রাত্রির জন্য যাহাদের নামে পাশ বাহির হয়, সে রাত্রির জন্য কেবল সেই সব জামাইই অন্তঃপুরে যাইতে পায়। এই ব্যারাকের মধ্যে তাহাদের খাওয়া-দাওয়ার ও থাকিবার ব্যবস্থা আছে। শ্বশুরান্নে পরিপুষ্ট জামাইগণ ব্যারাকে থাকিয়া কেহ সখীসংবাদ, কেহ পাচালীর ছড়া গাহিয়া, কেহ বা গাঁজা টিপিয়া সময় কাটাইয়া থাকে। ঝি-চাকর তাঁহাদের খাওয়া-দাওয়ার তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে—শ্বশুর কিংবা শালা-সম্বন্ধীরা তাঁহাদের দিকে ফিরিয়াও তাকান না। ইহাই জামাই-বারিক। অভয়কুমার বিজয়বল্লভের ঘর-জামাই এবং এই জামাই-বারিকের জামাইদিগের একজন। কিন্তু 'অভয় কিছু অভিমানী, একটু ত্রুটি হলেই বাড়ী যায়। অভয়ের পত্নীর নাম কামিনী —সে সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী। অভয়কে তাহার মনে ধরে নাই।' সে তাহাকে নিতান্ত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিয়া থাকে। একদিন কামিনী অভয়কে তাহার শয়নগৃহ হইতে বাহির করিয়া দিল। অভিমানে অভয় নিজের বাড়ী চলিয়া গেল। বিজয়বল্লভ একটু সদাশয় ব্যক্তি, তিনি অভয়কে ফিরিয়া আসিবার জন্য বার বার তাহার বাড়ীতে লোক পাঠাইতে লাগিলেন। বাড়ীতে অভয়ের কেহ নাই, তথাপি অভিমানবশত সে শ্বশুরগৃহে ফিরিয়া যাইতে চাহিল না।

অভয়ের এক প্রতিবেশী বন্ধু ছিল—তাহার নাম পদ্মলোচন। পদ্মলোচনের দুই স্ত্রী—বগলা ও বিন্দুবাসিনী। দুই সতীনে সর্বদা তুমুল কলহ বাধিয়া থাকিত। পদ্মলোচন ব্যক্তিত্বহীন পুরুষ, দুই স্ত্রীর নির্যাতনে তাহার জীবন দুঃসহ হইয়া উঠিল। কিছুদিন ইতস্ততঃ করার পর অভয় পুনরায় জামাই-বারিকে গেল। অন্তঃপুরে যাইবার অনুমতি পাইয়া সে কামিনীর শয়ন-গৃহে গেল, সেই দিনই কামিনী তাহাকে অপমানিত করিল, এমন কি পদাঘাত করিতে চাহিল। ইহাতে দারুণ অপমান বোধ করিয়া অভয় ক্রোধে ও ঘৃণায় শ্বশুরালয় পরিত্যাগ করিয়া গেল, তারপর দুই স্ত্রী কর্তৃক

নির্যাতিত প্রতিবেশী পদ্মলোচনকে সঙ্গে লইয়া উভয়েই বৈষ্ণব সাজিয়া একেবারে বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইল। কামিনী কৃতকর্মের জন্য সুগভীর অনুতপ্ত হইল এবং তাহার প্রতিবেশী এক বৃদ্ধ ময়রা-দম্পতীকে সঙ্গে করিয়া অভয়ের সন্ধান করিতে করিতে বৃন্দাবনে আসিয়া পৌছিল। সেখানে অভয় ও কামিনীর পুনর্মিলন হইল, অভয় কামিনীকে ক্ষমা করিল। বিজয়বল্লভ তাহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য স্বয়ং বৃন্দাবনে আসিলেন; পদ্মলোচন নিরুদ্দেশ হওয়ায় তাহার দুই স্ত্রী ঝগড়া-বিবাদ ত্যাগ করিল, সমদুঃখভাগিনী দুই সপত্নীর মধ্যে প্রীতি ও সহানুভূতির সঞ্চার হইল। বৃন্দাবনে থাকিয়া পদ্মলোচন এই সংবাদ পাইল। তারপর সকলে মিলিয়া দেশে আসিল।

হাস্যরস-সৃষ্টির দিক দিয়া দীনবন্ধুর এই রচনাখানি তাঁহার প্রহসনগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সার্থক হইয়াছে বলিতে হয়; কিন্তু তথাপি একথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ইহা কতকগুলি অতিরঞ্জিত সামাজিক চিত্রে ভারাক্রান্ত। দীনবন্ধু এখানে বহুবিবাহ ও কৌলীন্য এই দুইটি সামাজিক প্রথাকেই একসঙ্গে আক্রমণ করিয়াছেন; বহুবিবাহের দোষত্রুটি দেখাইতে গিয়া তিনি রামনারায়ণের 'নব-নাটকের' কাহিনীর উপরই আরও একটু রঙ্ চড়াইয়া লইয়াছেন, কৌলীন্যের দোষত্রুটি দেখাইতে গিয়া তাঁহার নিজস্ব মৌলিক পথ অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু দুইটি চিত্রই তাঁহার পরিকল্পনায় একটু অতিরঞ্জিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 'জামাই-বারিক' প্রহসন, 'নব-নাটকে'র মত বিয়োগান্তক সামাজিক নাটক নহে, সেইজন্য ইহার অতিরঞ্জন-দোষ তাঁহার রচনার মৌলিক ত্রুটি বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

'জামাই-বারিক' প্রহসন হইলেও দীনবন্ধুর অন্যান্য নাটকের মতই ইহাতে নাট্যিক ঘটনার ক্রমবিকাশ ও চরিত্র-সৃষ্টির সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়—ইহা কেবল মাত্র একটি সামাজিক চিত্র বা নক্সা নহে। কাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র বুঝিতে পারা যায় যে, ইহার একটি গতি আছে, এই গতিবেগ দ্বারাই পাঠক অনায়াসে ইহার শেষ পর্যন্ত উপনীত হইতে পারেন।

'জামাই-বারিক' প্রহসনের নায়ক অভয়কুমার। তাহাকে কুলীন জামাইয়ের একটি Type বা ছাঁচ করিয়াই সৃষ্টি করা হয় নাই, তাহার মধ্যে একটি বিশিষ্ট রক্তমাংসের দেহাশ্রিত প্রাণের সুস্পষ্ট স্পন্দন অনুভব করা যায়, তাহার এই প্রাণ-স্পন্দনের ভিতর দিয়াই তাহার স্বকীয় সত্তার নিজস্ব পরিচয়টি স্পষ্ট হইয়া

উঠিয়াছে। সে 'জামাই-বারিকে'র জামাতাদিগের সঙ্গে একাকার হইয়া যায় নাই। সে কুলীনের জামাতা এই পরিচয়ই তাহার সবস্ব নয়; সে অভয়কুমার, তাহার একটি বিশিষ্ট পবিচয় আছে, জামাই-বারিকের আর কোন জামাতার সে পরিচয় নাই; সেই পরিচয়টিই দীনবন্ধু সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়া অভয়কুমারকে এক অপূর্ব স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছেন। বিজয়বল্লভ নিজেও বুঝিয়াছেন, 'অভয় কিছু অভিমানী, একটু ক্রটি হলেই বাড়ী যায়।' সে দরিদ্র, গৃহে তাহার কেহ নাই; সেইজন্য দায়ে পড়িয়া ঘর-জামাই হইতে হইয়াছে, কিন্তু সেইজন্য সে আত্মবিক্রয় করিয়া বসে নাই, তাহার আত্মাভিমান অত্যন্ত সজাগ, সেখানে কেহ তাহাকে আঘাত করিলে দরিদ্র হইয়াও সে তাহা সহ্য করিতে পারে না। অভয়কুমারের এই বিশিষ্ট চারিত্রিক গুণটির উপরই নাট্যকার তাঁহার এই কাহিনী কেন্দ্রীভূত করিয়াছেন—ইহাই কাহিনীর মূল। ঘরজামাইয়ের আত্মাভিমান থাকিলে যাহা হয়, এই কাহিনীতে সহজ ভাবে তাহাই হইয়াছে।

শ্বশুর বিজয়বল্লভ যেমন জানেন অভয় অভিমানী, স্ত্রী কামিনীও তাহা তেমনই জানে। অভিমান থাকা সত্ত্বেও শ্বশুর তাহাকে স্নেহের চক্ষে দেখেন, কিন্তু স্ত্রী কামিনীর তাহা অসহ্য হয়—কারণ, অভয় অন্যদিক দিয়া অপদার্থ, বিদ্যা ধন সৌন্দর্য কিছুই নাই, থাকিবার মধ্যে এক অভিমানই আছে—ইহা অশিক্ষিতা ধনিদুহিতার পক্ষে স্বভাবতই অসহ্য। সেইজন্য সে তাহাকে তাহার এই অভিমানের উপরই বার বার আঘাত করিয়া তাহার উপর দিয়া এক নিষ্ঠুর আক্রোশ মিটাইয়া লয়। এই আক্রোশ না মিটাইয়াও যে তাহার অন্তরের জ্বালা জুড়ায় না, সেইজন্যই বার বার অভয়ের এই দুর্বলতার সুযোগটুকু লইতে ছাড়ে না। শীতের রাত্রি—অভয় ও কামিনী উভয়েই লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া আছে, ঘরের প্রদীপটা নিবু নিবু, এমন সময় সহসা কামিনী অভয়কে আদেশ করিল 'প্রদীপটেয় তেল দাও।' অভয় বলিল, 'তুমি দাও।' কামিনী উত্তর দিল, 'আমি আরাম করে শুইচি, তুমি গিয়ে তেল দিয়ে এসো।' অভয় বলিল, 'আমি বুঝি দৌড়ে বেড়াচ্চি? তুমি গিয়ে তেল দাও।' কামিনীর বড় রাগ হইল, বলিল, 'আমার বিছানা থেকে তাড়িয়ে দেব।' অভয় তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিল এবং গদিতে ধপ্ ধপ্ করিয়া কয়েকবার লাথি মারিয়া দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল। তারপর কামিনী পিছন পিছন গিয়া দরজায় খিল লাগাইয়া দিল। অভয় সারারাত্র বাহিরে কাটাইয়া পরদিন একেবারে

নিজের দেশে চলিয়া গেল। ধনী শ্বশুরের গৃহে দরিদ্র কুলীন জামাতার এই শোচনীয় দাম্পত্য জীবনের চিত্রটি দীনবন্ধুর বর্ণনার গুণে যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। অভিমানাহত অভয় যে দৃঢ় পদক্ষেপে গভীর রাত্রে কামিনীর কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল—এই বর্ণনার গুণেই সেই পদধ্বনিটি পর্যন্ত যেন শুনিতে পাওয়া গেল।

কামিনী বুদ্ধিমতী, সে অভয়কে চিনিয়াছে; অতএব ভুল করিয়া যে সে অভয়কে আঘাত করে তাহা নহে, তাহার নারীজীবনের ব্যর্থতার আক্রোশ মিটাইবার জন্যই সে ইচ্ছা করিয়াই অভয়কে আঘাত করে। আর দশজন ঘরজামাই যে রকম হয়, অভয় সেই রকম নহে বলিয়াও কামিনীর অভিযোগ। হাবার মা যখন বলিল যে, ঘর হইতে বাহির করিয়া দিবার পর অভয় 'দোর ধরে কাঁদতে লাগলে' তখন সে বলিল, 'দূর পোড়াকপাল, মিথ্যাবাদি, সে কাঁদবের ধন, আমাকে কত লাগ্‌ল। যদি কাঁদ্‌ত, আমি তখনই দোর খুলে দিতেম।' অতএব দেখা যাইতেছে, কামিনী অভয়ের কাছে যে খুব বেশি একটা কিছু চায়, তাহাও নয়; কারণ, আর দশজনের কুলীন স্বামী দেখিয়া তাহার এই সংস্কার হইয়াছে যে, ইহাদের কাছে আর বিশেষ কিই বা পাওয়া যাইতে পারে। তবে তাহার প্রতি স্বামীর একান্ত অনুরক্তিটুকু সে যথার্থই দাবী করিতে পারে; কারণ, দশজনের স্বামীর সে তাহা দেখে, কিন্তু অভয়ের চরিত্রের এমনই গুণ যে তাহার ভাগ্যে তাহাও জোটে না। কামিনীর দিক দিয়াও কি ইহা কম দুঃখের কথা? যাই হউক, সে কথা আরও বিস্তৃত ভাবে পরে বলিব, এখন অভয়ের কথাই বলি।

এই একান্ত আত্মাভিমানী অভয়ের আর একটি বড় পরিচয় আছে—সে যথার্থই কামিনীকে ভালবাসে; তবে তাহার ভালবাসা সে আর দশজন স্ত্রৈণ স্বামীর মত কথায় ও কাজে প্রকাশ করিয়া দেখাইতে পারে না, এই মাত্র পার্থক্য। কামিনীর নিকট হইতে অভয় আঘাত পায়, কিন্তু তথাপি তাহার প্রতি তাহার আকর্ষণ অস্বীকার করিতে পারে না। অপমানের পরও যে সে কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া তারপর শ্বশুরের অনুরোধ পালন করিয়া পুনরায় তাহার গৃহে যায় ইহা কি একান্তই তাহার গৃহে অন্নাভাবের জন্য? তাহা নহে। কারণ, এমন আত্মাভিমানী ব্যক্তি কেবল অন্নের অভাবের জন্য অভিমান বিসর্জন দিতে পারে না, সে অনাহারে মরিতে পারে তথাপি অভিমান ত্যাগ করিতে পারে না। সেখানে আর একটি প্রবলতর আকর্ষণ

আছে, তাহা কামিনীর প্রতি তাহার প্রকৃত ভালবাসা। তথাপি এই বলিয়া সে পুনরায় শ্বশুর-গৃহে যাইতে সম্মত হইল যে, 'এবারে যদি কিছু অহঙ্কারের চিহ্ন দেখি, তা হলে তার মুখে নাথি মেরে বৃন্দাবনে চলে যাব।' তারপর দ্বিতীয় বার অপমানের পর সে যখন বৈষ্ণব সাজিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া গেল, তখনও সেখানে বসিয়া ভাবিতে লাগিল, 'আর একটা পরীক্ষা ক'রে দেখি; শ্বশুরবাড়ী যাই, যদি স্নেহমমতা করে, তবে সংসারধর্ম করি। কখন কখন তার স্বভাবটা বড় মিষ্টি হয়।' সে বৃন্দাবনে চলিয়া আসিয়া বৈরাগী সাজিতে পারে, কিন্তু কামিনীর আশা একেবারে ছাড়িতে পারে না, সে যে তাহার মত দরিদ্রের সর্বস্ব! সেইজন্য পদ্মলোচন যখন বলে, 'পদাঘাত ভোজন কত্তে দেশে যেতে চাও', তাহার উত্তরেও হতভাগা এই বলিয়া নিজেকে সান্ত্বনা দেয়, 'পদাঘাত করে নি, কত্তে চেয়েছিল।' ইহার অর্থ এই, শুধু পদাঘাত করিতে চাওয়ায় আর বিশেষ কিই বা হইয়াছে। রাগের ঝোঁকে প্রথমে কথাটা রাষ্ট্র করিয়া দিয়া এখন যেন তাহার জন্য এই বলিয়া অনুতাপ হইতেছে যে, এই বিষয়টা লোক-জানাজানি না হইলেই ভাল হইত। আত্মাভিমানের সঙ্গে পত্নীর প্রতি প্রচ্ছন্ন প্রেমের সুকঠিন দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়াই অভয়ের আত্মপ্রকাশ হইয়াছে। ছদ্মবেশিনী বৈষ্ণবীর সঙ্গে যখন পদ্মলোচন অভয়কে কণ্ঠীবদল করিতে বলিল, তখনও অভয় ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, 'আর একবার দেখলে হত।' সে এ কার্যে 'সম্পূর্ণ মত' দিতে পারে নাই, কামিনীর আশা সে যে একেবারে বিসর্জন দিতে পারে না! সে যখন কামিনীর মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ শুনিতে পাইল তখনই কেবল দুই দিন বিছানায় পড়িয়া থাকিয়া, গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিয়া, দুই দিন উপবাসী থাকিয়া এই কণ্ঠীবদলে সম্মতি দিল। নতুবা সে কামিনীর কাছে ফিরিয়া যাওয়াই স্থির করিয়াছিল। অতএব কামিনীর প্রতি তাহার ভালবাসা সে অন্তরের অন্তরে অস্বীকার করিতে পারে না।

অভয়কুমারের আত্মবোধ অত্যন্ত প্রবল। সে যে জামাই-বারিকের আশ্রিত হইয়াও ইহার অন্যান্য জামাই হইতে স্বতন্ত্র এই বিষয়ে সে সর্বদা অত্যন্ত সতর্ক ছিল। বাহিরের দিক দিয়া তাহার স্বাতন্ত্র্য কিছুই ছিল না, অর্থাৎ ব্যবহারিক দিক দিয়া সে অন্যান্য জামাইয়ের মতই দরিদ্র ও মূর্খ, কিন্তু তথাপি কেন জানিনা তাহার অন্তরে এই দুরপনেয় অভিমান স্থান পাইয়াছিল যে সে তাহাদের সঙ্গে বাস করিয়াও তাহাদের একজন

নহে বলিয়াই মনে করিত; এইখানেই কামিনীর সঙ্গে তাহার বিরোধের সৃষ্টি হইত। অন্যান্য ভগ্নীরা তাহাদের স্বামীদিগের সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করিত, কামিনীও তাহার স্বামীর সঙ্গে সেই প্রকারই ব্যবহার করিতে যাইত, কিন্তু অভয় তাহার প্রতিবাদ করিত বলিয়াই প্রথম হইতেই কামিনীর সহিত তাহার বিরোধ বাধিয়া যাইত। দ্বিতীয় বারে যখন অভয় কামিনীর নিকট গেল তখন কামিনী অভয়কে বলিল—'টেবিলের উপর এক বোতল গোলাপ জল আছে, ওটা সব তোমার গায়ে ঢেলে দাও; আতর ল্যাভেণ্ডার মুখে রগড়ে রগড়ে মাখ, তারপর আমার কাছে এস।' শুনিবামাত্র অভয় বলিল, 'আমি তা করব না।' কামিনী নজির দেখাইয়া বলিল, 'অন্য অন্য জামাইরা ত করে।' অভয় উত্তর দিল, 'তারা জামাই-বারিকের জাম্বুবান, তাই করে।' তারপর বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিল, 'ও কথাগুলি আমি ভালবাসি না, ওতে আমার অপমান বোধ হয়।' ইহার মধ্য দিয়া অভয়ের চরিত্রটি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সে জামাই-বারিকের আশ্রিত হইয়াও আত্মবোধ বিসর্জন দেয় নাই, জামাই-বারিকের অন্যান্য জামাইরা কি পদার্থ তাহা সে বুঝে এবং নিজেকে কিছুতেই সে তাহাদের সঙ্গে এক করিয়া দেখিতে পারে না। অথচ কামিনী বুঝিতে পারে না তাহার এই স্বাতন্ত্র্য কিসে? ইহা তাহার পক্ষে বুঝিবার কথাও নহে, কারণ, অভয়ের এই স্বাতন্ত্র্যবোধ তাহার অন্তরের জিনিস, বাহিরে সে তাহার কোন স্বাতন্ত্র্য দেখাইতে পারে না, সেখানে সে সকল জামাইয়ের সঙ্গে একাকার হইয়া আছে। ইহার উপরই কামিনী ও অভয়ের দাম্পত্য জীবনের ট্র্যাজেডির অঙ্কুর উপ্ত হইয়াছিল—অবশ্য শেষ পর্যন্ত নাটকখানিকে মিলনান্তক করিতে গিয়া নাট্যকার এই অঙ্কুরটিকে আর পুষ্ট হইতে দেন নাই, উদ্গমেই মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন। অভয়ের চরিত্রের মধ্যে এই প্রকার একটি বিরাট ট্র্যাজেডির উপাদান ছিল; মনে হয়, এই নাটকখানিকে প্রহসন না করিয়া ট্র্যাজেডিতে পরিণত করিতে পারিলে বাংলা নাট্যসাহিত্যের আদি যুগেই আমরা একখানি উৎকৃষ্ট ট্র্যাজেডি লাভ করিতাম। কিন্তু যথার্থ ট্র্যাজেডি রচনার শিল্পগুণ দীনবন্ধুর আয়ত্ত ছিল না; তাঁহার লেখনীতে কণ্ঠের হাস্যরোল অন্তরের মৌন বেদনা প্রচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে। তথাপি তাঁহার রচনায় হাসি এবং অশ্রুর দুইটি ধারা পাশাপাশি অগ্রসর হইয়া গিয়াছে—একটি কলশব্দে মুখর হইয়া অপরটির মৌন নির্ঝরকে স্তব্ধ করিয়া রাখিয়াছে। অভয় সম্বন্ধে

আর একটি প্রধান কথা, সে দরিদ্র হইতে পারে, মূর্খ হইতে পারে, কিন্তু সে নীচ নহে। যাহার আত্মসম্মানবোধ আছে, সে কদাচ নিজেও নীচ আচরণ করিতে পারে না। কামিনী যখন অভয়কে বলিল, 'আজ তোমারি একদিন আর আমারি একদিন, খাটে উঠবে আর ন-দিদির মত দূর করব—নাতি মেরে দেব;' শুনিয়া অভয় বলিল,—'বটে—এতদূর!' কামিনী বলিল, 'চোখ রাঙ্গাচ্ছ? মারবে নাকি?' অভয় বলিল, 'গোঁয়ার হলে মাত্তেম।' সে গোঁয়ার নয়, এত নীচ আচরণ সে করিতে পারে না, সেই মুহূর্তেও অভয় এই চৈতন্যটুকু হারায় নাই। যে অবস্থায় লোক কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতে পারে, সেই অবস্থায়ও অভয় আত্মবিস্মৃত হয় নাই। ইহা অভয়-চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ। নাট্যকার তাহার চরিত্রগত এই বৈশিষ্ট্য আদ্যোপান্ত অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। অভয়ের আর একটি গুণ, সে মদ খায় না; তাহার চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়াই লেখক তাহার এই গুণটির পরিচয় দিয়াছেন।

এইবার কামিনীর কথা বলিতে হয়। অভয়কে যেমন নাট্যকার সাধারণ কুলীন জামাতার বাঁধাধরা পরিচয় হইতে পৃথক্ করিয়া একটি অপরূপ স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছেন, কামিনীকেও নাট্যকার তেমনই সাধারণ কুলীনকন্যা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া এক নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছেন। একটু সূক্ষ্মভাবে এই বিষয়টি বিচার না করিয়া দেখিলে অবশ্য তাহার এই বৈশিষ্ট্যের পরিচয়টি উদ্ধার করা সহজ হইবে না। সেইজন্য বিষয়টি একটু গভীর ভাবে বিচার করিয়া দেখা যাইতেছে। কামিনী ধনী জমিদারের কন্যা; সে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী। তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর একটু ইতিহাস আছে—তাহা কামিনীর মুখেই শুনিতে পাই, 'মেজো জামাই বড় মদ খেত, বাবা সেজন্য তাকে বাড়ী থেকে একদিন বা'র ক'রে দিয়েছিলেন, মেজদিদির দুচোখ দিয়ে টস্ টস ক'রে জল পড়তে লাগল; নাওয়া-খাওয়া ত্যাগ ক'রে সমস্ত দিন কাঁদলেন…মেজদিদি বাবার কাছে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বল্লেন, "বাবা, আমায় একখানি ছোট বাড়ী ক'রে দেন, আমি ওরে নিয়ে সেখানে থাকি; চাকরে তারে অপমান করে, আমার প্রাণে সহ্য হয় না।" বাবা বল্লেন, "বিধবা মেয়ে হয়ে যেমন বাপের বাড়ী থাকে, তেমনি থাক; ভাব, সে মরে গিয়েছে।" "পোড়া কপাল আর কি, বাপের মুখে কথা দেখ; যখন মেজদিদি তার ভাতারকে ভালবাসে, তখন সে মন্দ হক্, ছন্দ হক্, মাতাল হক্, গুলীখোর হক্, তার কাছে তাকে দেওয়াই ভাল। মেজদিদি মনে বড় ব্যথা পেলে…ব্যথা নিবারণ

কল্লে, রাত্রি পোহালে সকালে দোর খুলে দেখি, মেজদিদি গলায় ক্ষুর দিয়ে মরে রয়েছে (১।২)।”

মনে রাখিতে হইবে, কামিনী এই দিদিরই সহোদরা এবং তাহার নিজের স্বামীর সঙ্গে আচরণের মধ্যে এই ঘটনারও যে একটি প্রচ্ছন্ন প্রভাব তাহার উপর ছিল তাহাও অস্বীকার করিতে পারা যায় না। তাহার মেজদিদি সম্পর্কে সে যে এই কথাটি বলিয়াছে, তাহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার মত—‘যখন মেজদিদি তার ভাতারকে ভালবাসে, তখন সে মন্দ হক্, ছন্দ হক্, মাতাল হক, গুলীখোর হক্, তার কাছে তা'কে দেওয়াই ভাল।’ যে বুদ্ধিটি বৃদ্ধ জমিদারের নাই, সেই বুদ্ধিটি তাহার যুবতী কন্যার আছে। তাহার এই উক্তিটি হইতেই তাহার চরিত্রের কতকটা আভাস পাওয়া যাইতেছে এবং ইহার উপরই ‘জামাই বারিকে’র কাহিনীর উপসংহারও নির্ভর করিয়াছে। এই ঘটনার দুইটি দিক আছে—স্বহস্তে মৃত্যু-দুঃখ বরণ করিবার দুঃসাহসিকতা ও প্রবল আত্মবোধ। কামিনীর চরিত্রের মধ্যেও এই দুইটি গুণেরই বীজ ছিল, তবে কামিনীর ইহার অতিরিক্ত আরও একটি গুণ ছিল—তাহা তাহার বুদ্ধি; এই বুদ্ধি তাহার ভাবপ্রবণতা দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল না বলিয়াই সে মেজদিদির পথে অগ্রসর হইয়া না গিয়া জীবনে কল্যাণকর পরিণতির সন্ধান লাভ করিয়াছে।

কামিনীর সঙ্গে অভয়ের বিরোধ কোন্ জায়গায় তাহা অভয়ের চরিত্র আলোচনা সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করিয়াছি, এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু অভয়ের প্রতি কামিনীর প্রচ্ছন্ন ভালবাসা ছিল কি না তাহার সূক্ষ্মতম আভাসটিও নাটকের মধ্য হইতে উদ্ধার করা কঠিন—এই ঔৎসুক্যটুকু (suspense) রক্ষা করিয়া লেখক তাঁহার রচনার নাট্যিক মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। অথচ একথা সত্য যে, তাহা যদি না থাকিত তবে নাটকের পরিণতি অন্য রকম হইত। কামিনী যখন অভয়কে পদাঘাত করিয়া অপমান করিতে চাহিল, তখন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া অভয় বলিল, ‘কামিনী, আমি তোমার স্বামী; কামিনী, আমি জন্মের মত যাই। তোমাকে একটি কথা বলে যাই; তোমার কথায় আমার চক্ষু দিয়া জল কখন পড়েনি, আজ পড়ল’ (৩।২)। পূর্বেই বলিয়াছি, অভয় কামিনীকে প্রকৃতই ভালবাসিত, সেইজন্য [illegible]নীর ব্যবহারে সে মর্মান্তিক আঘাত পাইল-

তাহার অন্তর মথিত করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে—অতএব ইহা কামিনীরও

অন্তর স্পর্শ করিল। কারণ, নাট্যকার কামিনীকে এখানে এক অহঙ্কারের হৃদয়হীন পুত্তলিকারূপেই সৃষ্টি করেন নাই, তাহাকে রক্তমাংসের দেহ দিয়া গড়িয়াছেন। সমসাময়িক অন্যান্য অনুরূপ সামাজিক নাটকের কুলীন-পত্নীদিগের চরিত্রের সঙ্গে এখানেই কামিনীর মূল পার্থক্য। সেই জন্যই অভয়ের কথায় কামিনীর অন্তর স্পর্শ না করিয়া পারিল না। সে তৎক্ষণাৎ অনুতপ্ত হইয়া বলিল, 'আমার মাথা খাও, রাগ ক'রোনা, খাটে এস।' কিন্তু অভিমানী অভয় গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

কামিনীর অহঙ্কার-দুর্গে ইতিপূর্বেই ভাঙ্গন ধরিয়াছে, যে মুহূর্তে কামিনী অভয়ের অভিমানাহত মুখের দিকে তাকাইয়া অনুরোধের স্বরে বলিয়াছে, 'আমার মাথা খাও, রাগ ক'রোনো' সেই মুহূর্তেই কামিনী আর সেই কামিনী নাই। কঠিন উত্তাপে লৌহপিণ্ড একবার গলিতে আরম্ভ করিলে তাহার গলন যেমন আর রোধ করা যায় না, কামিনীরও সেই রকম হইল; অভয়কে ঘিরিয়া তাহার যে একটি দুর্ভেদ্য বিদ্বেষদুর্গ গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার কবাট খুলিয়া গেল এবং বাহির হইতে সহস্র দুর্বলতা তাহার ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিল, এইবার বুঝি সমগ্র দুর্গ ধ্বসিয়া পড়িয়া যায়। কামিনীর এই ভাবটি নাট্যকার এই প্রকার কৌশলে প্রকাশ করিয়াছেন—'কতবার অমন রাগ দেখিচি। (খট্টাঙ্গের উপরে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শয়ন এবং ক্ষণকাল পরে খট্টাঙ্গে উপবেশন, দীর্ঘ নিঃশ্বাস) ঘুম ত হয় না, (দীর্ঘ নিঃশ্বাস) আমি ত বিষম জ্বালায় পড়লেম,—"আজ পড়ল"—আমি ত আর রাখতে পারিনে, আমারও "আজ পড়ল" (রোদন), "তারা জামাই বারিকের জাম্বুবান"—"গোঁয়ার হ'লে মাত্তেম"—"আজ পড়ল।" ওমা, কি করি, বুক যে ফেটে যায় (৩।২)।' কামিনীর কোন দিন চোখ দিয়া জল পড়ে নাই, আজ পড়িল—কামিনীর প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল।

কামিনী চাহিত তাহার পিতৃগৃহাশ্রিত আর দশজন কুলীন জামাই তাহাদের পত্নীদিগের সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করে অভয়ও তেমনি করুক; অভয়ের কিছু নাই, কিন্তু তাহার আত্মাভিমান কেন? অপদার্থের আত্মাভিমানের অর্থ কি? ইহাই ছিল কামিনীর সঙ্গে অভয়ের বিরোধের কারণ। কিন্তু নাট্যকার কৌশলে দেখাইয়াছেন যে ইহার উপরই তাহাদের ভবিষ্যৎ স্থায়ী মিলনের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে, দুঃখের ভিতর দিয়া যাহা লাভ করা যায়, তাহার স্থায়িত্ব থাকে—এই চির-পুরাতন কথাই নাট্যকার এখানে নূতন

করিয়া বলিতে চাহিয়াছেন। অভয়ের এই অভিমান যদি না থাকিত, তবে সেও জামাই-বারিকের জাম্বুবানদিগের একজন হইয়া থাকিত, কামিনীও একান্তভাবে তাহার স্বামীকে কোন দিন লাভ করিতে পারিত না। কিন্তু যে দুঃখভোগের ভিতর দিয়া তাহাদের পুনর্মিলন সম্ভব হইল, তাহা উভয়ের জীবনেরই সকল গ্লানি দূর করিয়া দিয়া তাহাদের মিলনকে নিবিড় করিয়া দিল। 'জামাই-বারিক' প্রহসনের ইহাই মূল কথা।

ইহার পর পদ্মলোচনের কথা বলিতে হয়। পদ্মলোচন অভয়ের প্রতিবেশী ও বন্ধু, কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী চরিত্র। অভয় যেমন ব্যক্তিত্বাভিমানী, পদ্মলোচন তেমনই ব্যক্তিত্বহীন—দুই সপত্নীর হাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া দিয়া জীবনের চরম লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছে। নিজে অগ্রসর হইয়া গিয়া কোন কাজ করিবার শক্তি তাহার নাই, এমন কি দুই স্ত্রীর হাত হইতে পালাক্রমে মার খাইয়াও সে সকলই হজম করিয়া যাইতেছে, টুঁ শব্দটিও করিতেছে না। তারপর অভয় যখন বৈষ্ণব সাজিয়া বৃন্দাবন চলিল, তখন পদ্মলোচন তাহার সঙ্গী হইল; ইহার পূর্ব পর্যন্ত সকল অত্যাচার যে নীরবে সহিয়া গিয়াছে, অভয়ের বৃন্দাবন যাওয়ার প্রয়োজন না হইলে আমরণই যে সে এই অত্যাচার সহ্য করিত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই চরিত্রটির পরিকল্পনা দ্বারা একটি অপূর্ব নাট্যিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। অভয়ের ব্যক্তিত্ব-সজাগ চরিত্রের পার্শ্বে পদ্মলোচনের এই ব্যক্তিত্বহীন চরিত্রটি নাটকে বৈপরীত্য সৃষ্টি করিয়া উভয় চরিত্রই সুপরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে। দীনবন্ধু একখানি নাটকের ভিতর দিয়াই তৎকালীন প্রচলিত উভয় সামাজিক প্রথারই দোষ বর্ণনা করিতে চাহিয়াছেন, সেই হিসাবে ইহা একাধারে রামনারায়ণের 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' ও 'নব-নাটক'—'জামাই-বারিকে'র বর্ণনায় কৌলীন্যের দোষ, ও পদ্মলোচনের দাম্পত্যজীবন-বর্ণনায় বহুবিবাহ-প্রথার নিন্দা প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু দীনবন্ধুর নাট্যরচনার কৃতিত্বের গুণে এই নাটকের মধ্যে কোন বিশিষ্ট সামাজিক প্রথা সম্পর্কে তাঁহার নিজস্ব মতবাদ-প্রচার প্রকট হইয়া উঠিতে পারে নাই। এখানে ঘটনা-প্রবাহের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ রক্ষা পাইয়াছে, রামনারায়ণের নাটকে তাহা পায় নাই। ইহা 'নীল-দর্পণে'র না হইলেও 'জামাই-বারিকে'র একটি বিশিষ্ট গুণ বলিয়া অনুভূত হয়।

পদ্মলোচনের দুই স্ত্রী বগলা ও বিন্দুবাসিনী, বগলা জ্যেষ্ঠা ও বিন্দু কনিষ্ঠা। এই উভয়ের সপত্নী-কোন্দলের যে রূঢ় ও বাস্তব চিত্র এই নাটকে

দীনবন্ধু পরিবেশন করিয়াছেন, তাহা বহুবিবাহপীড়িত এই সমাজের চির-কলঙ্ক। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুকুন্দরাম-বর্ণিত চণ্ডীমঙ্গলে লহনা-খুল্লনার বিবাদের মধ্যেও অনুরূপ সপত্নী-কোন্দলের চিত্র পাওয়া যায়, দীনবন্ধুর চিত্রটি সেই ধারারই অনুবর্তন করিয়াছে, তাহার সঙ্গে রামনারায়ণ-রচিত 'নব-নাটকে'র অনুরূপ চিত্রটি আসিয়া ইহাতে যুক্ত হইয়া বগলা-বিন্দুর চিত্রটিকে পূর্ণাঙ্গ করিয়াছে। 'নব-নাটকে' বর্ণিত আছে যে বিচারালয়ে দাঁড়াইয়া এক চোর দ্বিপত্নীক এক গৃহস্থের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া দুই স্ত্রী কর্তৃক তাহার কি লাঞ্ছনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল তাহার এক জীবন্ত বর্ণনা দিয়াছে। দীনবন্ধু এই বর্ণনাটিকেই একটি নাট্যরূপ দিয়া এখানে গ্রহণ করিয়াছেন, 'নব-নাটকে'র দ্বিপত্নীক গৃহস্থই এখানে পদ্মলোচন এবং তাহার দুই স্ত্রীই এখানে বগলা ও বিন্দু। কিন্তু স্ত্রী-কোন্দলের ভাষা দীনবন্ধুর যে রকম আয়ত্ত ছিল, সমগ্র বাংলা সাহিত্যে তেমন আর কাহারও ছিল না; অতএব এই দুই সপত্নীর জীবন-চিত্রের মধ্যে কোন রকম নূতনত্ব না থাকিলেও ইহাদের মুখে যে ভাষা শুনিতে পাই, তাহা আর কোথাও কোনদিন শুনিতে পাই নাই। পদ্ম-লোচন বলে, বিন্দু অর্থাৎ তাহার কনিষ্ঠা স্ত্রী আগে এ রকম ছিল না, বগলা অর্থাৎ জ্যেষ্ঠাই তাহাকে এই রকম করিয়া তুলিয়াছে এবং বগলার শিক্ষার গুণে অল্প দিনেই বিন্দু প্রায় তাহাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। পদ্মলোচনের সংসারে দুই স্ত্রী ছাড়া আর কেহ নাই; শ্বশুর, শাশুড়ী, ভাসুর, দেবর, এমন কি পুত্রকন্যা ইহারা সংসারে থাকিলে সপত্নীদিগের রসনা ও আচরণ কতকটা সংযত থাকিবার কথা। কিন্তু নাট্যকার এই বিষয়ে দুই সপত্নীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছেন; বিশেষত স্বামী পদ্মলোচন সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বহীন পুরুষ, অতএব তাহার দিক হইতেও এই বিষয়ে কোনদিন কোন হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হয় নাই। তাহারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতির পথে দুই অশিক্ষিতা নারী ক্রমাগতই অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। তাহার ফল যাহা দাঁড়াইল তাহাতেই পদ্মলোচন গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। পূর্বেই বলিয়াছি, বাংলার প্রত্যক্ষ স্ত্রী-কোন্দলের ভাষা দীনবন্ধুর আয়ত্ত ছিল, সেই ভাষা তিনি বগলা ও বিন্দুর মুখে দিয়াছেন, সেইজন্যই এই ভাষা এত প্রত্যক্ষ ও জ্বালাময়ী বলিয়া বোধ হয়। এই ভাষার গুণেই সমগ্র নাটকখানির মধ্যে এই দুই নারীর কোন্দলের কোলাহল ছাড়া যেন আর কিছুই শুনিতে পাওয়া যায় না; পদ্মলোচনের দক্ষিণ এবং বাম অঙ্গ যেমন দুই নারী ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছিল পাঠকেরও

দুইটি শ্রবণেন্দ্রিয় দুই নারী তেমনি অধিকার করিয়া লয়—একটি বগী আরক্তি ও অপরটি বিন্দি পোড়ারমুখী। নাটক শেষ হইয়া গেলেও তাহাদের খর-রসনার জ্বালায় যেন পাঠকের দুইটি কর্ণই বহুক্ষণ পর্যন্ত জ্বলিতে থাকে। এই দুইটি সপত্নী-চরিত্রের মত এত জীবন্ত নারী-চরিত্র দীনবন্ধুর রচনায় খুব বেশি নাই।

'জামাই-বারিক' দীনবন্ধুর অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সের রচনা। ইহাতে ভাষার দিক দিয়া যেমন একটা সমতা লক্ষ্য করা যায়, তেমনই ইহার শিল্প-গুণেও অনেকটা পরিণতির ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার মধ্যে যে দুই একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাহা অতি উচ্চ শিল্পগুণসম্মত। ইহার মধ্যে একস্থলে যে একটি নাট্যিক ঔৎসুক্য (dramatic suspense) সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহা অতি উচ্চাঙ্গের বলিতে হইবে। অভয়ের দ্বিতীয়বার শ্বশুরগৃহ ত্যাগের পর পাঁচী ঝি যখন আসিয়া কামিনীকে বলিল যে, অভয় রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে তখন সে—

'কামিনী। তবে আমাকে একখান ক্ষুর এনে দেও, আমি মেজদিদির মত করি—
পাঁচী। তুমি যাও কোথা?
কামিনী। মেজদিদির কাছে।'

বলিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। যে পরিবারের মেয়েদের মধ্যে অনুরূপ অবস্থায় আত্মঘাতিনী হওয়ার একটি দৃষ্টান্ত আছে, সেই পরিবারেরই মেয়ে কামিনীকে এই অবস্থার মধ্যে স্থাপন করিয়া নাট্যকার সুকৌশলে এখানে একটি অপূর্ব নাট্যিক ঔৎসুক্য সৃষ্টি করিয়াছেন; যতক্ষণ পর্যন্ত বৃন্দাবনে দ্বিতীয় বৈষ্ণবীর মুখ হইতে অবগুণ্ঠন দূর না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এই ঔৎসুক্যটি অটুট থাকিয়া যায়, তারপর এক অতি নিরাবিল আনন্দরসের ভিতর দিয়া পাঠকের মন হইতে এই শঙ্কিত ঔৎসুক্য দূর হইয়া যায়।

পূর্বেই বলিয়াছি, 'জামাই-বারিকে' উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজিডির বীজ ছিল, কিন্তু নাট্যকার তাহা অনুকূল অবস্থায় শিকড় গাড়িবার সুযোগ না দিয়া লঘুহাস্যের দম্‌কা হাওয়ায় শূন্যে উড়াইয়া দিয়াছেন। দুই-এক স্থলে 'জামাই-বারিকের' অতিরঞ্জিত চিত্র একটু পীড়াদায়ক হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু অনাবিল হাস্যরস সৃষ্টির সার্থকতায় এই ত্রুটি দূর হইয়া গিয়াছে।

দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের বিরুদ্ধে যে মানহানির মোকদ্দমায় রেভারেণ্ড লং সাহেবের হাজার টাকা জরিমানা ও কারাদণ্ড হয়, সেই

মোকদ্দমার রায় প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ রায়ের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। ১৮৬১ সনের ২৭শে আগস্ট কলিকাতা শোভাবাজারের নাটমন্দিরে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের সভাপতিত্বে এক প্রতিবাদ সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, কালীপ্রসন্ন সিংহ, দিগম্বর মিত্র প্রভৃতি বক্তৃতা করেন এবং এতদ্দেশীয় অধিবাসীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক মনোভাব পোষণ করিবার জন্য উক্ত বিচারকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিয়া ইংলণ্ডের তদানীন্তন ভারত-সচিবের নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহাতে কলিকাতার কয়েকজন ইংরেজ বণিক কয়েকজন স্বার্থান্ধ দেশীয় লোকের সহায়তায় এক বিরুদ্ধসভার অধিবেশন করিয়া তাহাতে উক্ত বিচারপতিকে এক অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন। মনে হয়, তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া দীনবন্ধু 'কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ' নামক একখানি ক্ষুদ্র প্রহসন রচনা করেন। ইহার কাহিনী সংক্ষেপে এই,—ভোঁদা বলদ পঞ্চাননকে একখানি মানপত্র দিবার জন্য তাহার অনুচর গোমা, গ্যাঁটাগোঁটা, সার্থক দাস, সাতহাটের কানা কড়ি ও হুতোম-প্যাঁচাকে লইয়া তাহার আয়োজন করিতেছে। গোমা প্রায় দুই হাজার লোকের সহি সংগ্রহ করিয়াছে। ইহারা নিজেরাই পূর্বে বলদ পঞ্চাননকে দেশদ্রোহী বলিয়া বক্তৃতা করিয়াছিল, এখন স্বার্থের অনুরোধে অন্য রকম সুর ধরিয়াছে। যে প্রতিষ্ঠান হইতে এই মানপত্র দিবার আয়োজন করা হইয়াছে, তাহার নাম 'কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ'। তারপর একদিন ভোঁদা, গোমা ও গ্যাঁটাগোঁটা গিয়া বলদ পঞ্চাননকে একখানি অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিল।

প্রহসনটি নিতান্ত ক্ষুদ্র, মাত্র দুইটি ক্ষুদ্র দৃশ্যে সম্পূর্ণ। ইহাতে আলোচনা করিবার মত নাট্যকারের কিছুই নাই। তবে ইহাতে ইংরাজের খোসামোদকারী শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজ সম্পর্কে নাট্যকারের ক্রোধ প্রকট হইয়াছে।

অষ্টম অধ্যায়

বিবিধ নাটক ও নাট্যকার

(১৮৫৬—১৮৭২)

বাংলা নাটক রচনার আদিযুগে অনুবাদ ও সমাজ-সংস্কার বিষয়ক নাটকই প্রধানত রচিত হইয়াছিল—ইহাদের তুলনায় পৌরাণিক বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া রচিত মৌলিক নাটকের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য ছিল। অনুবাদের কথা বাদ দিলে সমাজ-সংস্কার বিষয়ক যে-সকল নাটক রচিত হইয়াছিল, তাহাদিগকে বিষয় অনুসারে কয়েকটি বিভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথমত, বহুবিবাহ-বিষয়ক—ইহা অবলম্বন করিয়া রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকই সর্বপ্রথম রচিত হয় এবং ইহারই অনুকরণ করিয়া তারকচন্দ্র চূড়ামণি 'সপত্নী নাটক' রচনা করেন। এই ধারারই অনুবর্তন করিয়া রামনারায়ণের 'নব নাটক', দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাই বারিক', হরিশ্চন্দ্র মিত্রের 'সপত্নী কলহ' প্রভৃতি নাটক রচিত হয়। ইহাদের মধ্যে তারকচন্দ্র চূড়ামণির 'সপত্নী নাটক'খানি একটু উল্লেখযোগ্য। কাহিনীর সংহতি ও বাস্তবতা এই নাটকটির বিশিষ্ট গুণ। বাস্তবানুগত্যের জন্যই ইহার কোন কোন স্থল অশ্লীল হইয়া উঠিয়াছে।

বহুবিবাহ-বিষয়ক নাটকের পরই বিধবাবিবাহ-বিষয়ক নাটকের কথা উল্লেখ করিতে হয়। এই যুগে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহ-বিষয়ক আন্দোলন অত্যন্ত প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল। অতএব ইহার প্রভাব হইতে নাট্যসাহিত্যও মুক্ত থাকিতে পারিল না। এই বিষয়ক নাটক-রচনাকারীদিগের মধ্যে দুইটি পরস্পর-বিরোধী দল ছিল, একদল ইহার স্বপক্ষে ও একদল বিপক্ষে। ইহার স্বপক্ষে সর্বপ্রথম নাটক রচনার দুঃসাহস যিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম উমেশচন্দ্র মিত্র। তাঁহার রচিত নাটকের নাম 'বিধবাবিবাহ নাটক'। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে যে বৎসর হিন্দু বিধবার বিবাহ বিধিবদ্ধ হয় (১৮৫৬) সেই বৎসরই উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবাবিবাহ নাটক' প্রকাশিত হয়। যুবতী বিধবাদিগকে বিবাহ না দিয়া গৃহে রাখিলে যে কি বিপদ হইতে পারে, উমেশচন্দ্র তাঁহার

নাটকে তাহার একটি বাস্তব চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার বিধবা চরিত্র সুলোচনার প্রতি নাট্যকারের যে সুগভীর সহানুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা নিতান্ত বাস্তব বলিয়াই মর্মস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে।

উমেশচন্দ্র তাঁহার 'বিধবাবিবাহ নাটকে'র ভিতর দিয়া সমাজমনের একটি অবরুদ্ধ অর্গল খুলিয়া দিলেন, সঙ্গে সঙ্গেই সেই পথে বহু নাট্যকার অগ্রসর হইয়া আসিলেন। তাহার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই 'বিধবোদ্বাহ নাটক', 'বিধবা-মনোরঞ্জন', 'বিধবাবিরহ' ইত্যাদি বহু নাটক রচিত হইল। বাস্তবতার নগ্ন বর্ণনার জন্য অধিকাংশ নাটকই শ্লীলতার মাত্রা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, এবং সেইজন্যই একটি সাধু উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে গিয়া ইহাদের অন্য দায়িত্ব বিস্মৃত হইয়াছে—অতএব সাহিত্যের পর্যায়ে ইহাদের স্থানও অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে।

সমাজসংস্কারমূলক আর এক শ্রেণীর সামাজিক প্রহসনের মধ্যে মদ্যপান ও নৈতিক চরিত্রের হীনতার জন্য নিন্দা প্রকাশ করা হইয়াছে। মধুসূদনের এই বিষয়ক দুইখানি সুপ্রসিদ্ধ প্রহসন রচনার পূর্ব হইতেই এই শ্রেণীর রচনা দুই একখানি প্রকাশ পাইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত 'চার ইয়ারের তীর্থযাত্রা' প্রহসনখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা তদানীন্তন সুরাসক্ত বিলাসী তরুণ-সম্প্রদায়ের কতকগুলি অতিরঞ্জিত চিত্রের সমষ্টি মাত্র—ইহাতে কোন কেন্দ্রীয় কাহিনী কিংবা মূল-চরিত্রের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারা যায় না। তখনকার রচনারীতি অনুসরণ করিয়া ইহা গদ্য ও পদ্যে রচিত হইয়াছে। মদনমোহন মিত্র রচিত 'মনোরমা নাটক' এই শ্রেণীর আর একখানি নাটক; ইহা বিধাদাত্মক, কিন্তু কোন প্রকার শিল্পগুণ ইহার ভিতর দিয়া প্রকাশ পায় নাই।

এই বিষয়ক অন্যতম প্রহসন নারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি রচিত 'কলি-কৌতুক নাটক' একই সময়ে প্রকাশিত হয়। ইহার মধ্য দিয়াও সমসাময়িক সমাজের দোষত্রুটিগুলি নির্দেশ করা হইয়াছে। ক্ষেত্রমোহন ঘটক রচিত 'কামিনী নাটকে' এক জমিদারের পত্নী ও কন্যাকে মদ্যাসক্তারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসন দুইটি প্রকাশিত হইবার পর ইহাদিগকে অনুকরণ করিয়া এই বিষয়ক অসংখ্য ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রহসন সেই যুগে রচিত হইয়াছিল, কিন্তু ইহাদের অধিকাংশের মধ্যেই মৌলিক কোন কৃতিত্ব প্রকাশ পায় নাই।

এদেশে গ্রাম্য দলাদলি দ্বারা 'যে মহৎ অনিষ্টপাত হইতেছে' তাহা বর্ণনা করিয়াও দুই একখানি প্রহসন রচিত হয়; তাহাদের মধ্যে হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'দলভঞ্জন নাটক'খানির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিধবাবিবাহ-সমর্থনকারীদিগের বিরুদ্ধে গ্রাম্য সামাজিক দলাদলির উপর ভিত্তি করিয়া ইহা রচিত। নাট্যকার মনে করেন, 'দেশের কুৎসিত ব্যবহার সর্ব-সাধারণের সমীপে প্রকাশ করা অনেকের মত' না হইলেও 'যখন তাহাতে উপকার ব্যতীত অপকারের কোন সম্ভাবনা নাই, তখন তাহা ব্যক্ত করায় কোন হানি হইতে পারে না।' এই উদ্দেশ্য লইয়াই নাট্যকার 'দল-ভঞ্জন নাটক' রচনা করেন।

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সংস্পর্শে আসিবার পর হইতেই এদেশের অবহেলিত স্ত্রীসমাজের প্রতি উদারমতাবলম্বী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহার ফলে বাঙ্গালী নারীর অসহায় অবস্থার কথা বর্ণনা করিয়াও কয়েকখানি নাটক রচিত হয়। ইহাদের মধ্যে বিপিনবিহারী সেনগুপ্ত রচিত 'হিন্দুমহিলা নাটক', হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'বঙ্গকামিনী নাটক', বটুকবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'হিন্দুমহিলা নাটক' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন স্তরে নারী যে লাঞ্ছনা গঞ্জনা ভোগ করিতেছে, এই সকল নাটকের ভিতর দিয়া পরম বস্তুনিষ্ঠার সঙ্গে তাহাই প্রকাশ করা হইয়াছে; তবে ইহাদের কোন কোন চিত্র যে সামান্য অতিরঞ্জিত না হইয়াছে, তাহা নহে। নাটক হিসাবে ইহাদের বিশেষ কোন মূল্য না থাকিলেও, ইহাদিগের মধ্যে সেযুগের সমাজের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন বাস্তব চিত্র পাওয়া যায় বলিয়া ইহাদের মূল্য স্বীকার করিতেই হয়।

মূর্খ ব্রাহ্মণ পুরোহিতের ভণ্ডামি ও বিলাসী ধনীর কুক্রিয়া বর্ণনা করিয়া সেই যুগে 'বুঝ্‌লে কি না' নামে একখানি প্রহসন রচিত হইয়াছিল, রচয়িতার নাম প্রিয়মাধব বসু। নব্য পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মোহাচ্ছন্ন ধনি-সম্প্রদায় যে কি ভাবে দুর্নীতির পঙ্কে ডুবিয়া গিয়াছিল, তাহারই বাস্তব রূপ ইহাতে চিত্রিত হইয়াছে। 'কিছু কিছু বুঝি' নাম দিয়া ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ইহার একটি প্রত্যুত্তর রচনা করেন। সমাজের দুর্নীতি দূর করিবার উদ্দেশ্যে ইহাদের মধ্য দিয়া সাহিত্যে দুর্নীতির যে স্থান দেওয়া হইয়াছে, তাহা ইহার মহান উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়াছে বলিয়াই অনুভূত হইবে। সমসাময়িক সমাজ-চিত্র হিসাবে ইহাদের মূল্য থাকিলেও সাহিত্যে ইহাদের স্থান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ।

সেই যুগের শেষ প্রান্তে সামাজিক সমস্যা-মূলক একখানি গুরু-বিষয়ক নাটক রচিত হইয়াছিল, তাহার নাম 'নয়শো রূপেয়া'—রচয়িতার নাম শিশিরকুমার ঘোষ। কন্যা-বিক্রয়ের নিষ্ঠুর প্রথা ইহার অবলম্বন; এই কুপ্রথার নির্মমতার অন্তরালে মানবিক সুখদুঃখবোধের সন্ধান ইহার বৈশিষ্ট্য, ইহার নীতিবোধ উন্নত; এই হিসাবে ইহা সমসাময়িক সামাজিক নাটকগুলির মধ্যে একটি ব্যতিক্রম।

বাংলায় সর্বপ্রথম প্রকাশিত নাটকই পৌরাণিক নাটক। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা নাটক' প্রকাশিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত পুরাণ অবলম্বনে আর দ্বিতীয় কোন মৌলিক নাটক রচিত হয় নাই। মধুসূদনের প্রথম পৌরাণিক নাটক রচিত হইবার সময় হইতেই তাঁহার সমসাময়িক নাট্যকারদিগের মধ্যে পৌরাণিক বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া মৌলিক নাটক রচনা করিবার প্রবৃত্তি দেখা দেয়। কিন্তু ইহাদের প্রায় প্রত্যেকটি প্রয়াসই অপরিণত ও অস্ফুট রহিয়া গিয়াছে। বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যযুগই পৌরাণিক নাটকের স্বর্ণযুগ, ইহার পূর্বে এই বিষয়ে যে সকল প্রয়াস দেখা গিয়াছে, তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর বলিতে হইবে। এই যুগের পৌরাণিক নাটকের মধ্যে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া দুর্গাদাস কর রচিত 'স্বর্ণশৃঙ্খল নাটক'খানির নাম উল্লেখ করিতে পারা যায়। পরবর্তী যুগের পৌরাণিক নাটকের মধ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষ ভক্তিরসের যে প্লাবন আনিয়াছিলেন ইহার মধ্যে তাহার প্রথম সূচনা অনুভব করা যায়। নিমাইচাঁদ শীলের 'ধ্রুব-চরিত্র' নাটকখানিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে; ইহা গীতাভিনয়ের লক্ষণাক্রান্ত।

এই যুগের পৌরাণিক নাটকের মধ্যে দুটি সুস্পষ্ট বিভাগ ছিল; প্রথমত, পাশ্চাত্ত্য আদর্শ অবলম্বনে রচিত পৌরাণিক নাটক, ইহার একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন'। দ্বিতীয়ত, গীতাভিনয়ের আদর্শে রচিত পৌরাণিক নাটক; ইহার একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন উল্লিখিত নিমাইচাঁদ শীলের 'ধ্রুব-চরিত্র'। প্রথমোক্ত শ্রেণীর পৌরাণিক নাটক সাধারণত ইংরেজি নাটকের মত গীতি-বর্জিত, দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর নাটক গীতি-ভারাক্রান্ত। সাধারণত, প্রথমোক্ত শ্রেণীর নাটকই এই যুগে অধিক সংখ্যায় রচিত হইয়াছিল। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীই ইহাদের উপজীব্য ছিল।

দীনবন্ধু মিত্রের কোন রোমান্টিক নাটক রচিত হইবার পূর্বেই যে সেইযুগে বাংলা রোমান্টিক নাটক রচনার ধারাটির উদ্ভব হইয়াছিল, প্রাণনাথ দত্ত রচিত 'প্রাণেশ্বর নাটক'ই তাহার প্রমাণ। এই ধারার অনুসরণ করিয়া প্রেমচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক 'চন্দ্রবিলাস নাটক' রচিত হয়। এই নাটকের একটি চরিত্রের ভিতর দিয়া পরবর্তী যুগ-সুলভ আদর্শবাদের ছায়াপাত হইয়াছে। এই শ্রেণীর আরও দুই একখানি নাটক সে যুগে রচিত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে নিমাইচাঁদ শীল রচিত 'চন্দ্রাবতী' নাটকখানি উল্লেখযোগ্য; ঘটনার বাহুল্যের জন্য ইহার চরিত্র-বিকাশ সম্ভব হয় নাই। ইহার ঘটনার বাহুল্য পাশ্চাত্ত্য প্রভাবজাত বলিয়া স্পষ্টই অনুভূত হইবে। দীনবন্ধুর রোমান্টিক রচনা সেই যুগের একেবারে শেষ প্রান্তে প্রকাশিত হইয়াছিল; অতএব এই সকল নাটক যে তাঁহার প্রভাবমুক্ত ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

এই যুগের একজন বিশিষ্ট নাট্যকাররূপে কালীপ্রসন্ন সিংহের নাম উল্লিখিত হইয়া থাকে। 'বাবু নাটক' নামক একখানি প্রহসন তিনি রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়। তাঁহার অন্য দুইখানি রচনার মধ্যে একখানি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ ও একখানি মৌলিক। তাঁহার 'বাবু নাটক'খানি কি প্রকৃতির ছিল, তাহা সঠিক জানিবার উপায় নাই; কারণ, তাহা কাহারও হস্তগত হয় নাই। সুপরিচিত পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া তিনি তাঁহার 'সাবিত্রী-সত্যবান নাটক' রচনা করেন। ইহার ভাষা পণ্ডিতী বাংলা, সেইজন্যই ইহা অভিনয়ের বিশেষ অনুপযোগী।

মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনার পর এই যুগে আর একখানি মাত্র উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক নাটক রচিত হইয়াছিল, তাহা জগবন্ধু ভদ্র প্রণীত 'দেবলাদেবী'। ইহার কাহিনী-বিন্যাসে কিছু নাটকীয় গুণ প্রকাশ পাইয়াছিল, সেইজন্যই ইহা ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। যে কয়খানি মাত্র বাংলা নাটক ইহার আদি যুগের সঙ্কীর্ণ বেষ্টনী হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পরবর্তী যুগেও রসিক সাধারণের মনোরঞ্জন করিয়াছিল, ইহা তাহাদের অন্যতম। কিন্তু প্রকৃত ঐতিহাসিক নাটক বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা সেইযুগে একখানিও রচিত হয় নাই, যে কয়খানি মাত্র এই শ্রেণীর নাটক রচিত হইয়াছে, তাহা সকলই রোমান্টিক নাটকেরই পর্যায়-ভুক্ত।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের অব্যবহিত পরবর্তী কালে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় যে আর এক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল, তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া যদুনাথ তর্করত্ন

'দুর্ভিক্ষ-দমন-নাটক' নামক একখানি নাটক রচনা করেন। সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুযায়ী নান্দী-নটী-সূত্রধার দিয়াই ইহার আরম্ভ; কিন্তু নাট্যকার দুর্ভিক্ষের বিবরণ দর্শকের সম্মুখে উপস্থাপিত করিবার একটি অভিনব প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহাতে 'দুর্ভিক্ষ' 'হাহাকার' 'দুর্গতি' ইত্যাদি নাটকীয় চরিত্রের রূপ লাভ করিয়া রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছে। 'শস্তারাম'কে কারাগারে আবদ্ধ রাখিয়া কি ভাবে যে রাজা 'দুর্ভিক্ষ' প্রধান মন্ত্রী 'হাহাকারে'র সহায়তায় রাজ্য শাসন করিতেছেন, তাহাই রূপকের আকারে এখানে প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহার ঘটনাসমূহ নাট্যিক ক্রিয়ার ভিতর দিয়া পরিস্ফুট হয় নাই, বরং নাটকীয় চরিত্রসমূহের মৌখিক বর্ণনার ভিতর দিয়াই প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার রচনা গদ্যপদ্যমিশ্র, ভাষা পণ্ডিতী বাংলা—অতএব অভিনয়ের অনুপযোগী। ইতিহাসকে প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তি সে যুগে যে কত গৌণ ছিল, ইহা হইতেও তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

সমাজের আধ্যাত্মিক মনোভাব অবলম্বন করিয়া সেই যুগে আর একখানি প্রায় অনুরূপ রূপকনাট্য রচিত হইয়াছিল, ইহার নাম 'বোধেন্দুবিকাশ নাটক', রচয়িতা সুপ্রসিদ্ধ 'প্রভাকর'-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। মোহগ্রস্ত জীব প্রকৃতির দায়ে দশ ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় বিষয় ভোগ করিতেছে, ক্রমে ইহাদের দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া কি ভাবে ইহা অহৈতুকী ভক্তির মধ্য দিয়া আধ্যাত্মিক চরিতার্থতা লাভ করিতেছে, 'বোধেন্দু-বিকাশ' নাটকের ইহাই বর্ণিতব্য বিষয়। ইহা নাটকের আকারে লিখিত হইলেও নাটক নহে, ধর্মতত্ত্ব। দুরূহ আধ্যাত্মিক বিষয় ইহাতে সহজ সংলাপের ভিতর দিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে—ইহার কৃতিত্ব কেবলমাত্র ইহাই।

মীর মশার্‌রফ হোসেন বাংলা সাহিত্যে কেবলমাত্র 'বিষাদ-সিন্ধু' নামক মহরম বিষয়ক শোকোচ্ছ্বাসপূর্ণ গদ্য রচনার জন্যই পরিচিত, কিন্তু তিনি যে একাধিক বাংলা নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাহা অনেকে বিস্মৃত হইয়াছেন। তাঁহার সর্বপ্রথম নাট্যরচনা 'বসন্তকুমারী নাটক' ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তিনি সকল বিষয়ে প্রায় ৩৫ খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, ইহাদের মধ্যে তিনি তাঁহার 'বসন্তকুমারী নাটক'কে তাঁহার 'অনুরাগ-তরুর দ্বিতীয় কুসুম' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, অর্থাৎ ইহা তাঁহার দ্বিতীয় রচনা। বসন্তকুমারী নাটকের বিষয়বস্তু রোমান্টিক। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার 'কীর্তিবিলাস' নাটক রচনায় যে বিষয়বস্তু ব্যবহার করিয়াছেন, ইহাতে তাহাই ব্যবহৃত হইয়াছে সত্য, কিন্তু যোগেন্দ্রচন্দ্রের রচনায়

কাহিনীর যে সুসংবদ্ধতার অভাব ও শৈথিল্য ছিল, মীর মশার্‌রফের রচনায় তাহা বহুলাংশে দূর হইয়াছে, তিনি কাহিনীকে নাট্যসম্মত একটি সুদৃঢ় সংহতি দান করিয়াছেন। বিশেষত যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের ভাষা ছিল শিথিল ও কাব্যধর্মী, কিন্তু মীর মশার্‌রফের গদ্য ভাষায় যে কাব্যধর্মিতাই প্রকাশ পাক না কেন, নাটকীয় সংলাপ রচনায় তাঁহার ভাষা প্রকাশভঙ্গির প্রত্যক্ষতার (directness of expression) গুণে বিশিষ্টতাপূর্ণ।

সৎমা ও সপত্নী-পুত্রের সম্পর্ক বিষয়ে যে সকল লৌকিক কাহিনী মধ্যযুগ হইতেই লিখিত ও মৌখিক সাহিত্যধারায় বাংলাদেশে ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে প্রচলিত আছে, প্রধানত তাহা ভিত্তি করিয়াই যোগেন্দ্র-চন্দ্রের 'কীর্তি-বিলাস' যেমন রচিত হইয়াছে, 'বসন্তকুমারী নাটক'ও তেমনই রচিত হইয়াছে। ইহা মীর মশার্‌রফ হোসেনের উপর 'কীর্তি-বিলাস' নাটকের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল নহে, বরং উভয়ে একই প্রচলিত জনশ্রুতি বা লৌকিক ভিত্তি আশ্রয় করিয়া পরস্পর স্বাধীন ভাবেই একই বিষয়ে নাটক রচনা করিয়াছেন। মীর মশার্‌রফ হোসেন সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুসরণ করিয়াই তাঁহার 'বসন্তকুমারী নাটকে'র প্রস্তাবনায় নটনটীর অবতারণা করিয়াছেন। বাংলা নাটক রচনায় ইতিমধ্যে দীনবন্ধু পাশ্চাত্ত্য আদর্শ যেভাবে অনুসরণ করিয়াছিলেন, তিনি তাহা স্বীকার করেন নাই। নটনটীর আবির্ভাবের পর নাটকের এই কাহিনী আরম্ভ হইয়াছে—ইন্দ্রপুরের রাজা বীরসিংহ বিপত্নীক হইলেন, তাঁহার পুনরায় বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই, যুবরাজ নরেন্দ্রসিংহকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া নিজে অবসর লইতে চাহেন, কিন্তু রাজমন্ত্রী বৈশম্পায়ন বৃদ্ধ রাজাকে বিবাহ করিতে বারবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি সম্মত হইয়া তরুণী ভার্যা রেবতীকে গৃহে আনিলেন। রেবতী সতীনপুত্র নরেন্দ্র সিংহের প্রতি আসক্ত হইয়া তাহার নিকট প্রণয় নিবেদন করিল। নরেন্দ্রসিংহ তাহা প্রত্যাখ্যান করিল। রেবতী প্রতিহিংসায় জ্বলিয়া উঠিল, রাজার নিকট যুবরাজের নামে কুৎসিত অভিযোগ করিয়া ইহার জন্য শাস্তি প্রার্থনা করিল। তাহার অভিপ্রায় মত বৃদ্ধ রাজা যুবরাজের ভীষণ শাস্তি দিলেন, জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া নরেন্দ্রসিংহ প্রাণ ত্যাগ করিল। তারপর যুবরাজকে লিখিত রেবতীর প্রেমপত্র রাজার হস্তগত হইল। রাজা তৎক্ষণাৎ তরবারি দ্বারা রেবতীকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলেন।

নাটকের নাম 'বসন্তকুমারী নাটক' হইলেও ইহার কাহিনীতে বসন্তকুমারী কোন প্রধান অংশ গ্রহণ করিতে পারে নাই, স্ত্রীচরিত্রের মধ্যে রেবতীই ইহার মধ্যে প্রধান অংশ অধিকার করিয়াছে। ভোজপুর রাজকন্যা বসন্তকুমারী নরেন্দ্রসিংহের চিত্রার্পিত রূপ দেখিয়া তাহার প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন মাত্র, তাহাদের মিলন কিংবা বিবাহ কিছুই হয় নাই। বসন্তকমারীর মধ্যে কুমারী-হৃদয়ের প্রথম প্রণয়াসক্তির সুকোমল লজ্জা ও বেদনার অভিব্যক্তি মাত্র প্রকাশ পাইয়াছে, রেবতীর চরিত্র ইহাতে নানাদিক দিয়া সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

মীর মশার্‌রফ হোসেনের 'বসন্তকুমারী নাটকে'র প্রধান গুণ ইহার কাহিনীতে নহে, ইহার সংলাপের ভাষায়। তিনি সংস্কৃত নাটক অনুসরণ করিয়া নটনটীর অবতারণা করিলেও তাহার নাটকীয় সংলাপের ভাষা সংস্কৃত-ঘেঁষা ছিল না, বরং নিতান্ত সহজ ও সরল ছিল, অথচ দীনবন্ধুর মত একেবারে গ্রাম্য প্রাদেশিক ভাষাও তিনি ব্যবহার করেন নাই। বাংলা নাট্যসাহিত্যের আদিযুগ হইতেই সংলাপের ভাষা যে কি ভাবে সহজ ও প্রত্যক্ষধর্মী হইয়া উঠিতেছিল, তাহা 'বসন্তকুমারী নাটকে'র এই উদ্ধৃত অংশ হইতেও বুঝিতে পারা যাইবে,—

প্রিয়ম্বদ। ফুল দেখ্‌লে মন খুশী হয় এও কি একটা কথা! কোথায় ফল আর কোথায় মন! সম্বন্ধও ভারি! কী মজার কথা, ছোঁবনা, খাবনা, দেখেই খুশী এমন মনকে আর কি বলব মহারাজ!...দেখুন এই উদর, এই অর্থভাণ্ডার, ইনি পূর্ণ থাক্‌লে ফুল না সুঁকলেও মন খুশী হয়। ...সে কি? কিসের বয়েস? আপনার চুল, পাক্‌ছে? কই আমি ত একটি পাকা চুল দেখ্‌তে পাইনে।

দীনবন্ধু মিত্র কর্তৃক 'নীল-দর্পণ' নাটক রচনার তের বৎসর পর অর্থাৎ ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন বাংলার ভূস্বামীদিগের অনুরূপ অত্যাচারের এক জ্বলন্ত কাহিনী বর্ণনা করিয়া মীর মশার্‌রফ হোসেন তাঁহার দ্বিতীয় নাটক 'জমিদার-দর্পণ' রচনা করেন। ভূস্বামীদিগের অত্যাচারের কথা প্রসঙ্গত ইতিপূর্বে অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ও প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত 'আলালের ঘরের দুলালে' বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হইলেও এই বিষয়ে বাংলা সাহিত্যে সামগ্রিক রচনা ইহাই প্রথম। নীলকরের অত্যাচার ও জমিদারের অত্যাচার বর্ণনার মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। নীলকরেরা ছিল বিদেশী, এবং বিজাতীয় বলিয়া

তাহাদের সম্বন্ধে দেশহিতৈষী ব্যক্তি মাত্র যাহা খুসী তাহাই লিখিতে পারিতেন। এমন কি, ইংরেজি অনুবাদ না হইলে 'নীল-দর্পণ' নাটকের জন্যও মানহানির মোকদ্দমা হইত না। কিন্তু জমিদারেরা কেবলমাত্র এই দেশেরই অধিবাসী ছিলেন, তাহা নহে—তাঁহাদের কেহ কেহ সামাজিক অগ্রগতি ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন, অথচ তাঁহাদের অত্যাচারী-স্বরূপটি মধ্যে মধ্যে এমন ভয়াবহ হইয়া উঠিত যে, তাহা নীলকরদিগকেও লজ্জা দিতে পারিত। বিশেষত বাংলা রচনা মাত্রই তাঁহাদের দৃষ্টিতে সহজেই আকৃষ্ট হইয়া লেখককে তাঁহাদের বিরাগভাজন করিয়া তুলিবার সম্ভাবনা ছিল। সেইজন্য সেই যুগে সামাজিক নানা সমস্যামূলক বিষয় লইয়া যত রচনাই প্রকাশিত হউক, আনুপূর্বিক জমিদারের অত্যাচারের ভয়ঙ্কর স্বরূপ প্রকাশিত করিয়া খুব অল্প রচনাই প্রকাশিত হইয়াছে। সেইজন্য 'জমিদার-দর্পণ' নাটকের ভিতর দিয়া লেখকের যে দুঃসাহসিক সত্যভাষণের প্রয়াস দেখা যায়, তাহা সে যুগের পক্ষে পরম বিস্ময়কর এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 'জমিদার-দর্পণ' নাটকের উপর দীনবন্ধুর 'নীল-দর্পণ' নাটক রচনার প্রভাবের কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, তথাপি ইহাদের মধ্যে যে পার্থক্যটুকু আছে, তাহাও লক্ষ্য করিবার যোগ্য। বিদেশীয় নীলকরের পরিবর্তে দেশীয় জমিদার সম্প্রদায়কে অবলম্বন করিয়া মীর মশার্‌রফ হোসেন এই বিষয়ে যে পার্থক্যটুকুও সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাও গভীর ভাবে বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক।

'বসন্তকুমারী নাটক' যেমন সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনা অনুযায়ী নটনটী দ্বারা আরম্ভ হইয়াছিল, 'জমিদার-দর্পণ' নাটকও তেমনই নট-নটী ও সূত্রধারকে দিয়াই আরম্ভ হইয়াছে; এই বিষয়ে মীর মশার্‌রফ হোসেন দীনবন্ধুর নাট্য-রচনার আঙ্গিককে স্বীকার করেন নাই। সুতরাং তিনি অন্য সকল দিক হইতেই দৃষ্টি রুদ্ধ করিয়া অন্ধভাবে দীনবন্ধুকেই সর্ববিষয়ে অনুসরণ করিয়াছেন, এমন কথা বলিতে পারা যায় না।

মীর মশার্‌রফ হোসেন অত্যন্ত উদার-চেতা ব্যক্তি ছিলেন; হিন্দু-মুসলমানের প্রীতি-সম্পর্ক কোন দিক দিয়া যাহাতে আহত না হয়, সেই দিকে গভীরভাবে লক্ষ্য রাখিয়া তিনি তাঁহার 'জমিদার দর্পণে'র কাহিনী পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। বাংলাদেশে হিন্দু ভূস্বামী ও মুসলমান প্রজার সংখ্যাই অধিক, সুতরাং জমিদারের অত্যাচারের বাস্তব স্বরূপ যথার্থ প্রকাশ করিতে হইলে

হিন্দু জমিদার কর্তৃক মুসলমান প্রজার উপর অত্যাচারের চিত্র পরিবেশন করিতে হয়। কিন্তু ইহা দ্বারা কোন সাম্প্রদায়িক অপব্যাখ্যা চলিতে পারে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অত্যাচারী জমিদারকে যেমন তিনি মুসলমান সমাজ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, অত্যাচারিত প্রজাকেও তেমনই মুসলমান সমাজ হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে হিন্দুচরিত্র আছে সত্য, কিন্তু তাহাদের আচরণ ও সংলাপের মধ্যে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোভাব-জাত কোনই ইঙ্গিত প্রকাশ পায় নাই; অথচ এ কথা সত্য, সমসাময়িক হিন্দু নাট্যকার ও ঔপন্যাসিকদিগের অনেকের মধ্যেই প্রতিবেশী মুসলমান সমাজের প্রতি অনুরূপ মনোভাব প্রকাশ পাইতে দেখা যায় নাই। মীর মশার্‌রফ হোসেনের রচনা মাত্রেরই ইহা একটি বিশিষ্ট গুণ। 'জমিদার-দর্পণ' নাটকের মূল কাহিনীটি সংক্ষেপে এই :

লম্পট জমিদার হায়ওয়ান আলী কুসঙ্গী পরিবৃত হইয়া নানা প্রকার নেশা ভাঙ খাইয়া স্বেচ্ছাচারী ও উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করেন। গ্রামের দরিদ্র প্রজা আবু মোল্লার সুন্দরী যুবতী স্ত্রী নুরুন্নেহার প্রতি তাহার লালসা-দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। কৃষ্ণমণি নাম্নী এক বৈষ্ণবী কুট্টিনী তাহার নিকট যাতায়াত করিতে লাগিল, নুরুন্নেহা তাহার প্রলোভনে অস্বীকৃত হওয়ায় হায়ওয়ান আলী বলপূর্বক তাঁহার লোক দিয়া তাহাকে নিজের বৈঠকখানায় ধরিয়া আনিলেন। অন্তঃসত্ত্বা নুরুন্নেহা তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহার নারীধর্ম রক্ষা করিল, কিন্তু প্রাণরক্ষা করিতে পারিল না, সেইখানেই তাহার মৃত্যু হইল। পুলিশ আসিল, জমিদারের বিরুদ্ধে হত্যার অপরাধে মোকদ্দমা আরম্ভ হইল। অর্থ দ্বারা সাক্ষী বশ করিয়া জমিদার হত্যার দায় হইতে অব্যাহতি পাইলেন। নুরুন্নেহার স্বামী আবু মোল্লা উন্মাদ হইয়া গ্রাম ত্যাগ করিয়া গেল।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল-দর্পণ' নাটকের ক্ষেত্রমণির কাহিনী অবলম্বন করিয়াই 'জমিদার-দর্পণ' নাটক রচিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে পার্থক্যও নিতান্ত অল্প নহে। পূর্বেই বলিয়াছি, নাট্যরচনার আঙ্গিকের দিক দিয়া 'জমিদার-দর্পণে'র নাট্যকার দীনবন্ধুকে অনুকরণ করেন নাই। দীনবন্ধুর সহিত সংস্কৃত নাটক কিংবা দেশীয় গীতাভিনয়ের ধারার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু মীর মশার্‌রফ হোসেন দেশীয় ঐতিহ্যের ধারার সঙ্গে যোগ রক্ষা করিয়াই তাঁহার নাটক রচনা করিয়াছিলেন। সেইজন্যই যেমন তিনি 'প্রস্তাবনা'র অবতারণা করিয়া নট-

নটী-সূত্রধার দ্বারাই নাটক আরম্ভ করিয়াছেন, তেমনই ইহাতে মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত যোজনা করিয়াছেন ; দীনবন্ধুর নাটকে পয়ার ছন্দের কবিতা থাকিলেও সঙ্গীত নাই। দীনবন্ধুর কৃত্রিম সাধুভাষাই হউক, কিংবা একান্ত গ্রাম্য চাষার ভাষাই হউক তাহাও 'জমিদার-দর্পণ' নাটকে অনুপস্থিত। দীনবন্ধুর 'নীল-দর্পণে'র মত এই নাটকের উপসংহারে মৃত্যুর ঘনঘটাও সৃষ্টি হয় নাই, একটি মৃত্যুকেই যথাসম্ভব করুণ করিয়া তুলিয়া তিনি নাটকের ট্র্যাজিক রস সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন। অল্প পরিসরের মধ্যে এবং গভীরতর জীবন-দৃষ্টির অভাবে তাহা যে সম্ভব হইয়া উঠিতে পারে নাই, তাহাও সত্য।

উক্ত দুইখানি পূর্ণাঙ্গ নাটক ব্যতীতও মীর মশার্‌রফ হোসেন আরও কয়েকখানি এই শ্রেণীর রচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে গীতাভিনয় 'বেহুলা' (১৮৮৯) ব্যতীত আর একখানি ক্ষুদ্রাকৃতি প্রহসন আছে. ইহার নাম 'এর কি উপায় ?' (১৮৭৬)। তাঁহার 'টালা অভিনয়' নামক একখানি নাটকও এক পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হইয়াছিল, পরে তাহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, জানিতে পারা যায় না। (মীর মশার্‌রফ হোসেন সম্পর্কিত বিস্তৃত আলোচনার জন্য আশরাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত 'জমিদার-দর্পণ', রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ এবং মুনীর চৌধুরী 'বসন্ত-কুমারী নাটক : মীর মশার্‌রফ হোসেন', সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা পৃঃ ২৯-৩৯ দ্রষ্টব্য)

সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বেই সমাজ-জীবনের সমসাময়িক ত্রুটি-বিচ্যুতি অবলম্বন করিয়া প্রহসন শ্রেণীর অসংখ্য ক্ষুদ্র রচনা বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। মধুসূদনের দুইখানি প্রহসন রচনার পর হইতেই তাঁহারই ব্যবহৃত বিষয়-বস্তু লইয়া প্রহসন রচনার একটি ধারা প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। তথাপি ইহাদিগকে কয়েকটি ভাগেও বিভক্ত করা যায় ; যেমন প্রথমত, নৈতিক. দ্বিতীয়ত আর্থিক এবং তৃতীয়ত সাংস্কৃতিক। মদ্যপান, নর-নারীর নৈতিক ব্যভিচার ইত্যাদি বিষয়ক প্রহসনগুলি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত ; পণপ্রথা, বিলাসীর অর্থের অপচয় ইত্যাদি বিষয়ক প্রহসন দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত এবং প্রধানত স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা, জাতি এবং ধর্মবিষয়ক সঙ্কীর্ণতা ইত্যাদি বিষয়ক প্রহসন তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। এই সকল প্রহসন রচনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। যে ব্রাহ্মসমাজ দেশের সকল

প্রকার প্রগতিশীল আন্দোলনের অগ্রদূত বলিলেই হয়, তাহার উপর ব্যঙ্গাত্মক আক্রমণ এবং স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রী-স্বাধীনতার উপর কটাক্ষপাত ইহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। প্রহসনগুলির ভিতর দিয়া সমাজের নীতিবোধ যে খব উন্নত ছিল, এ কথা বলিবার উপায় নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেশ্যাসক্তি এবং মদ্যপানের অতিরঞ্জিত চিত্র পরিবেশন করিয়া বিষয়কে অবাস্তব করিবার প্রয়াস দেখা যায়।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রহসন 'হাস্যার্ণব' সম্ভবত ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু বইখানির কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই, কেবলমাত্র উল্লেখই পাওয়া যায়। ইহার রচয়িতার নামও জানা যায় না। তবে একজন অবাঙ্গালীর রচিত বাংলা প্রহসন ইহারও পূর্ববর্তী রচনা, তাহা গেরাসিম লেবেডেফ রচিত ইংরেজি Disguise নাটকের বাংলা অনুবাদ 'কাল্পনিক সংবদল'। ইহাও প্রকৃত পক্ষে প্রহসনই। ইহা ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। তবে ইহার সঙ্গে পরবর্তী বাংলা প্রহসনগুলির কোন যোগ স্থাপিত হইতে পারে নাই। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে 'হাস্যার্ণব' নামক প্রহসন রচিত হইবার পর ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার প্রণীত 'কৌতুক সর্বস্ব নাটক' নামক একটি প্রহসন রচিত হয়, ইহা ৭৮ পৃষ্ঠার একটি ক্ষুদ্র রচনা। এদেশে বইখানির সন্ধান পাওয়া যায় না, বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ইহার একখানি রক্ষিত আছে বলিয়া জানিতে পারা যায়। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন সিংহ 'বাবু' নামে একখানি প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়, কিন্তু বইখানির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। তারপর ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ক্রমান্বয়ে প্রতি বৎসরই এক কিংবা একাধিক প্রহসন রচিত হইয়া প্রকাশিত হইতে থাকে। ইহাদের সংখ্যা প্রতি বৎসর ক্রমে বাড়িতে থাকে। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হইবার পরের বৎসরই যে অন্তত আঠারটি বাংলা প্রহসন রচিত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিতভাবে জানিতে পারা যায়; প্রকৃত সংখ্যা হয়ত তাহারও অধিক হইতে পারে।

এই সময়ে সহসা প্রহসন রচনার সংখ্যা বাড়িয়া যাইবার দুই একটি অন্যান্য কারণও ঘটিয়াছিল। প্রথমত, বাংলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে বাংলা নাটকের অভিনয় বিষয়ে এদেশের সমাজে এক নূতন আশা জাগ্রত হইয়াছিল। তারপর সমসাময়িক কালে এমন কয়েকটি উত্তেজনামূলক ঘটনা ঘটিয়াছিল, লঘু এবং ব্যঙ্গাত্মক প্রহসন রচনার মধ্য দিয়াই তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল।

১৮৭২ এবং ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তারকেশ্বরের মোহান্ত এবং এলোকেশীর বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া বাংলার সমাজে প্রবল উত্তেজনা দেখা দিয়াছিল; তারপর হাইকোর্টের বিচারে মোহান্তের যখন জেল হইয়া গেল, তখন সেই উত্তেজনা একেবারে চরমে পৌঁছিয়া গেল। ইহাই বহু প্রহসনের প্রেরণা দিয়াছিল। কিন্তু ইহারা সমসাময়িক উত্তেজনামূলক রচনা মাত্র ছিল। যদিও প্রহসনের আকারে ইহাদিগকে পরিবেশন করা হইত, তথাপি ইহাদের মধ্য দিয়া কোন সাহিত্য কিংবা নাট্যগুণ বিকাশলাভ করিবার সুযোগ পায় নাই।

এই যুগের প্রহসনগুলির মধ্যে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার মত ছিল, তাহা গৃহস্থ পরিবারের নারীদিগের ব্যভিচার বর্ণনা। অশিক্ষিত স্ত্রীসমাজ অন্তঃপুরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াও যে নানাভাবে দুর্নীতিপূর্ণ জীবন যাপন করিত, তাহা বহুসংখ্যক প্রহসনের মধ্যে নির্ভীকভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। 'কুলীন কুল-সর্বস্ব নাটকে'র মধ্যে তাহার পরিচয় প্রথম প্রকাশ পাইয়াছিল। ইহার ভিতর দিয়া সমসাময়িক বাংলার সমাজ-জীবনের কোন রূপ প্রতিফলিত হইয়াছে কি না তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু মনে হয়, বরং তাহার পরিবর্তে স্ত্রীসমাজে যে শিক্ষাবিস্তারের সবেমাত্র সূচনা হইয়াছিল, তাহা সমাজ সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখিতে পারে নাই বলিয়া তাহার প্রতি এইভাবে বিরূপ মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, অধিকাংশ প্রহসনে সমাজ সম্পর্কে রক্ষণশীল মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে, তাহারই ধারা পরবর্তীকালে অমৃতলাল বসু পর্যন্তও অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় ভাগ

মধ্যযুগ (১৮৭৩—১৯০০)

সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা হইতে স্বদেশী
আন্দোলনের পূর্ববর্তী কাল

সূচনা

গীতাভিনয় লইয়াই বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যযুগের সূত্রপাত হইয়াছিল। ক্রমে গীতাভিনয় এত লোকপ্রীতি লাভ করিল যে, ইহা যাত্রা ও উন্মুক্ত আসর পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতার সদ্যপ্রতিষ্ঠিত সাধারণ রঙ্গমঞ্চের ভিতর গিয়া প্রবেশ লাভ করিল। বাংলা নাটকের মধ্যযুগ প্রধানত এই গীতাভিনয়ের উপর ভিত্তি করিয়াই স্থাপিত। এই যুগের প্রায় সকল প্রতিনিধিই গীতাভিনয়ের আঙ্গিকের উপরই নিজেদের নাটক রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। ইহার সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এই যুগেরই নাটক এ পর্যন্ত শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত নির্বিশেষে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিল এবং ইহারই একজন নাট্যকার বাংলাদেশে আজ পর্যন্তও অবিসংবাদিতরূপে নাট্যকার রূপে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছেন। ইহার একমাত্র কারণ, দেশীয় বা জাতীয় রস-সংস্কারই এই যুগের নাটকের ভিত্তি ছিল। পূর্ববর্তী যুগের নাটকে সমাজকে আঘাত বা ব্যঙ্গ করিবার যে প্রবণতা দেখা গিয়াছিল, এই যুগের নাটকে তাহা হ্রাস পাইয়া সমাজের মধ্য হইতে নূতন আশা ও আশ্বাসের উপকরণ সংগ্রহ করা হইতেছিল।

আদর্শবাদ এই যুগের বাংলা নাটকের প্রধান লক্ষ্য ছিল। নবপ্রবুদ্ধ হিন্দু জাতীয়তাবোধের আদর্শ, নবোন্মেষিত ভক্তি ও প্রেমের আধ্যাত্মিক আদর্শ, ব্যক্তি- ও সমাজ-জীবনে পাশ্চাত্ত্য জীবনের আদর্শ—এই সকল সমুচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই এই যুগের নাট্যকারগণ নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার ফলে প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব জীবনের রূপ তাঁহাদের কাছে ম্লান হইয়া গিয়াছিল। সেইজন্য নাটক হিসাবে তাঁহাদের রচনায় কতকগুলি ত্রুটিও একান্ত অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। এই সর্বতোমুখী আদর্শবাদের প্রেরণা, বাংলার তদানীন্তন জাতীয় জীবন হইতেই আসিয়াছিল। সেইযুগেই সর্বপ্রথম হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠা এবং ভারতীয় জাতীয় মহাসভার (Indian National Congress) ভিত্তি স্থাপিত হয়। সিপাহীযুদ্ধের মধ্য দিয়া বৈদেশিক শাসনের দাসত্ব-বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার জন্য জাতির যে প্রয়াস দেখা দিয়াছিল

তাহা বাহিরের দিক হইতে ব্যর্থ হইলেও জাতির অন্তরের গভীরতর স্তরে সুগভীর রেখাপাত করিয়াছিল। যদিও সিপাহীযুদ্ধ সেই যুগের পূর্ববর্তী ঘটনা, তথাপি সেই যুগেই এই ঘটনা জাতীয় দৃষ্টিকোণ হইতে প্রত্যক্ষ করিবার প্রবৃত্তি দেখা দিয়াছিল। তাহারই ফলে রজনীকান্ত গুপ্তের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস' প্রকাশিত হয়। ইহাতে লক্ষ্মীবাঈর সাহসিকতা, নানা সাহেবের কূটকৌশল এবং অন্যান্য নেতৃবর্গের আত্মত্যাগের কথা যেমন গৌরবের সঙ্গে ঘোষিত হইয়াছে, তেমনি ইংরেজের নৃশংসতা প্রভৃতিরও যথাসম্ভব জ্বলন্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই সকল বিবরণের ভিতর দিয়া একটি সর্বভারতীয় জাতীয়তাবোধের যে বিকাশ হইতেছিল, তাহাই হিন্দুমেলা ও ভারতীয় জাতীয় মহাসভার মত প্রাতিষ্ঠান অবলম্বন করিয়া আরও প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। এই ভাবটি সেই যুগের নাট্যসাহিত্যের মধ্যেও অতি সহজেই প্রবেশ লাভ করিল।

বাঙ্গালীর আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে সেই যুগ নানা দিক দিয়া স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। এই যুগই রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সর্বধর্মসমন্বয়বাদের সিদ্ধি যুগ, দেশদেশান্তরে স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্তের বাণী প্রচারের যুগ, শুদ্ধাভক্তির আদর্শে উদ্বুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের পুনরুত্থানের যুগ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং কেশবচন্দ্রের একেশ্বরবাদ প্রচারের যুগ। অতএব এই যুগ বাঙ্গালীর আধ্যাত্মিক সাধনার ইতিহাসে স্বর্ণযুগ। ইহার প্রভাব স্বভাবতই সেই যুগের নাট্যসাহিত্যের উপর গিয়া বিস্তৃত হইয়াছিল; শুধু বিস্তৃত হইয়াছিল বলিলে ভুল করা হইবে, বরং ইহাকে নানা দিক দিয়া নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে বলিলেই বোধ হয় ঠিক হইবে। বাঙ্গালী নাট্যকারগণ জাতির এই সমসাময়িক আধ্যাত্মিক চৈতন্যকে তাঁহাদের নাটকের বিষয়ীভূত করিয়া ইহাকে কেবল মাত্র যে জাতীয় রূপ দিয়াছেন, তাহা নহে, বরং পূর্ববর্তী যুগের নৈতিক রুচিদুষ্টির কবল হইতে ইহাকে পরিত্রাণ করিয়াছেন। বাংলা নাট্যসাহিত্যের আদিযুগে নাটকে বাস্তবতার নামে যে দুর্নীতি এবং কুরুচির উদ্দাম নৃত্য দেখা দিয়াছিল, তাহা যদি ইহার পরবর্তী যুগে এই প্রবল আধ্যাত্মিক প্রেরণাজাত সমুচ্চ নীতিবোধ দ্বারা প্রতিহত না হইত, তাহা হইলে ইহার কলুষিত নীতি এবং রুচির ধারা আধুনিক যুগ পর্যন্তও অগ্রসর হইয়া আসিয়া ইহার বিভিন্নমুখী বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করিত।

এই যুগের সর্বপ্রধান ঘটনা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা। প্রকৃত পক্ষে এই

ঘটনা অবলম্বন করিয়াই এই যুগের সূত্রপাত হইয়াছিল এবং ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া এই যুগের সমগ্র নাট্যসাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। অতএব ইহাকে বাংলা নাটকের সাধারণ রঙ্গমঞ্চের যুগ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার প্রথম দুই বৎসরের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে যত নাটক রচিত হইয়াছিল, সমগ্র বাংলা নাট্যসাহিত্যের এক শত বৎসরের ইতিহাসে এত সংখ্যক নাটক আর কোন দুই বৎসরে রচিত হয় নাই। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা বাংলা নাট্যসাহিত্য সৃষ্টির মূলে কি অভূতপূর্ব প্রেরণার সঞ্চার করিয়াছিল। যে কয়জন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার এই যুগে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেই সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন এবং ইহারই পুষ্টিসাধনের জন্য তাহারই রুচির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নাটক রচনা করিয়াছিলেন; নাট্যকারের ব্যক্তি-রুচি অপেক্ষা এই যুগে গণ-রুচিই বাংলা নাট্যসাহিত্যকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে—ইহা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের উপর একান্ত নির্ভরশীলতারই অবশ্যম্ভাবী ফল বলিতে হইবে। নাট্যানুষ্ঠান তখন প্রতিযোগিতামূলক এক ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছিল; অতএব ব্যবসায়িক লাভক্ষতির নীতি ইহার উপর সমগ্রভাবেই প্রযোজ্য হইয়াছিল—তাহার ফলে সাহিত্য হিসাবে বাংলা নাটকের কতকগুলি ত্রুটিও অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছিল।

এই যুগের নাটকে বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের কাহিনী অপেক্ষা ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনীই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। ইহা বাঙ্গালীর নবপ্রবুদ্ধ আধ্যাত্মিক চেতনারই ফল বলিতে হইবে। এই যুগের প্রচারিত আধ্যাত্মিকতার ভিতর দিয়া প্রত্যক্ষ জীবন অপেক্ষা আদর্শ জীবনের প্রতিই অধিকতর আকর্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল; সেইজন্য আদর্শ পৌরাণিক চরিত্র, ঐতিহাসিক মহাপুরুষদিগের আদর্শ জীবন প্রভৃতিই নাটকের প্রধান উপজীব্য হইয়াছিল। বাঙ্গালীর ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের আদর্শবাদের সাধনার মধ্যে বাস্তব কিংবা প্রত্যক্ষ সমাজ-জীবনের প্রতি কোন মমতা প্রকাশ পায় নাই; এমন কি, বাংলা নাট্যসাহিত্যের পূর্ববর্তী যুগে যে বিভিন্ন প্রত্যক্ষ সামাজিক সমস্যা লইয়া নাটক রচনার প্রবৃত্তি দেখা দিয়াছিল, এই যুগে সাধারণভাবে তাহারও ব্যতিক্রম দেখা দিল। উচ্চ আদর্শবাদই এই যুগের নাট্যসাহিত্যকে নিয়ন্ত্রিত করিতে লাগিল—সমাজ এবং ব্যক্তিজীবনের ক্লেদ ইহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না। কেবল দুই একজন নাট্যকারের দৃষ্টিতে কোন কোন সামাজিক অসঙ্গতি স্নায়ু

কৌতুকের সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র। আঙ্গিকের দিক দিয়া দীনবন্ধুর সামাজিক নাটকের প্রভাব এই যুগের সকল শ্রেণীর সামাজিক নাটকের উপরই প্রবলভাবে অনুভূত হইতে লাগিল।

এই যুগের বাংলা নাটকে রস অপেক্ষা তত্ত্বই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। আদর্শ যেখানে লক্ষ্য, নাট্যরসসৃষ্টি সেখানে ব্যাহত হইতে বাধ্য এবং সাহিত্যে রসসৃষ্টি যে পরিমাণ ব্যাহত হয়, সাহিত্যসৃষ্টিও সেই পরিমাণেই ব্যর্থ হয়। অতএব এই যুগে সর্বাধিক বাংলা নাটক রচিত হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃত সাহিত্যের পুষ্টি কতদূর হইয়াছিল, তাহা বিশেষ ভাবেই বিবেচ্য। কিন্তু এই যুগের নাটক সাধারণ রঙ্গমঞ্চের ভিতর দিয়া গণ-মনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের যে বিপুল প্রয়াস পাইয়াছিল, তাহার প্রত্যক্ষ ফল বর্তমান যুগ পর্যন্তও অনুভূত হইতেছে—সমগ্রভাবে বাঙ্গালীর মধ্যে নাট্যরস জাগ্রত করিয়া দিবার কৃতিত্ব এই যুগেরই প্রাপ্য।

পৌরাণিক বিষয়বস্তুর বিস্তৃততর মৌলিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার ফলে এই যুগে বাংলা নাটকের মধ্যে সংস্কৃত কিংবা ইংরেজির আক্ষরিক অনুবাদের প্রবৃত্তি লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এই যুগের প্রথম ভাগে কেবলমাত্র একজন নাট্যকার পূর্ববর্তী যুগের ধারা অনুসরণ করিয়া কয়েকখানি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ প্রকাশ করিলেও সাধারণ ভাবে অনুবাদের উপর হইতে নাট্যকার এবং দর্শক উভয়েরই দৃষ্টি এই যুগে মৌলিক নাটকের উপরই গিয়া স্থাপিত হইয়াছিল। সকল দিক দিয়াই এই যুগ সামঞ্জস্য বিধানের (assimilation) যুগ; পাশ্চাত্ত্য এবং প্রাচ্য সামাজিক জীবনের আদর্শের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান ইত্যাদিই ছিল এই যুগের আদর্শ। এই প্রবৃত্তি সাহিত্যেও দেখা দিয়াছিল পাশ্চাত্ত্য আদর্শই হউক, কিংবা ভারতীয় প্রাচীন জীবনাদর্শই হউক, ইহাদের সঙ্গে বাঙ্গালী জীবনের সামঞ্জস্য বিধান করিয়াই সেই যুগের সাহিত্যের সৃষ্টি সার্থক হইয়াছিল—নাট্যসাহিত্যেও ইহার ব্যতিক্রম হইল না। সেইজন্যই সমগ্রভাবে অনুবাদের প্রবৃত্তি এই যুগে হ্রাস পাইয়া গিয়াছিল।

এই যুগ সাধারণ রঙ্গমঞ্চের যুগ বলিয়াও নির্দেশ করা যাইতে পারে; কারণ, সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণই ইহাতে অভিনয়ের উদ্দেশ্যেই এই যুগে প্রধানত নাটক রচনা করিয়াছিলেন—স্বাধীন প্রেরণার বশবর্তী হইয়া

কেহ নাটক রচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিবার মুখ্য উদ্দেশ্য লইয়া এই যুগে নাটক রচিত হইবার ফলে ইহাতে কতকগুলি দোষত্রুটিও অপরিহার্য হইয়াছিল; ইহাদের মধ্যে প্রধান এই যে নাট্যকারকে সর্বদা সাধারণ দর্শকের রুচি অনুযায়ীই নাটক পরিবেশন করিতে হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'ম্যাকবেথ' নাটকের অনুবাদের অভিনয় করিতে গিয়া দেখিলেন যে, প্রেক্ষাগৃহ প্রায় দর্শকশূন্য; তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলেন, ইহার মধ্যে যত উচ্চাঙ্গ অনুবাদ-কৌশলই প্রকাশ করা হউক না কেন, ইহা সাধারণ দর্শকের রুচির অনুগামী হয় নাই। অতএব ইহার অভিনয় দ্বারা রঙ্গমঞ্চকে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত করিবার পরিবর্তে তিনি অবিলম্বে পৌরাণিক বিষয়বস্তু লইয়া একখানি নাটক রচনা করিয়া তাহাই রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত করিলেন, ইহার জন্য দর্শকের আর অভাব হইল না। অতএব এই যুগের নাট্যকারগণ তাঁহাদের নিজস্ব ভাব ও রুচি বিসর্জন দিয়া একান্তভাবে দর্শকদিগের রুচির সেবায়ই আত্মনিয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; নাট্য-রচনা ব্যক্তি-প্রতিভার অনুগামী না হইয়া গণ-রুচির অনুগামী হইয়াছিল—আদি এবং আধুনিক যুগের সঙ্গে এইখানেই ইহার একটি মৌলিক পার্থক্য অনুভূত হইবে।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের এই মধ্যযুগের কবে অবসান হইয়া ইহার আধুনিক যুগের উন্মেষ হইয়াছিল, তাহা এখন আলোচনা করিতে হয়। মধ্যযুগের যে সকল বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা প্রধানত উনবিংশ শতাব্দী অতিক্রম করিয়া বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত যখন আসিয়া পৌছিল, তখন বাঙ্গালীর জীবনে এক সম্পূর্ণ নূতন জাগরণ দেখা দিল, তাহা স্বদেশী আন্দোলন নামে পরিচিত। তখন হইতেই পুরাণের পরিবর্তে ইতিহাস, অধ্যাত্মবোধের পরিবর্তে দেশাত্মবোধ এবং সমষ্টির পরিবর্তে ব্যষ্টিই সমাজের লক্ষ্য হইয়া উঠিল। এই যুগের সূচনা হইতেই যে নাটকগুলি রচিত হইতেছিল, তাহাদের মধ্যে এই নবপ্রবুদ্ধ জাতীয় ভাবের বিকাশ দেখা গিয়াছিল। তখন হইতেই বাংলা নাট্যকার আর আত্মনির্লিপ্ত নহেন, ইহার বস্তুধর্মের (objectivity) উপর আঘাত করিয়া ইহাকে সমসাময়িক জাতীয় নবজাগরণের রসে সঞ্জীবিত করিয়া লইয়াছেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁহার সুদীর্ঘ নাট্যকার-জীবনের প্রায় অবসানের মুহূর্তে এই নূতন জাতীয় জাগরণের সম্মুখীন হইয়াছিলেন; তাহা সত্ত্বেও তিনি ইহার প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার 'সিরাজুদ্দৌলা', 'মীরকাশিম', 'ছত্রপতি শিবাজী'—

এই ঐতিহাসিক নাটকগুলির সঙ্গে তাঁহার পূর্ববর্তী নাটকগুলির ভাবগত পার্থক্য এত বেশি যে, ইহাদিগকে একই নাট্যকারের রচনা বলিয়া সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। অতএব যদিও কোন কোন নাট্যকার মধ্যযুগেই তাঁহাদের নাট্যরচনা আরম্ভ করিয়া আধুনিক যুগেও উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা সেদিন জাতীয় নবজাগরণের মুখে নিজেদের সাধনার মূল সূত্র হারাইয়া ফেলিয়া সম্পূর্ণ নূতন উপকরণ এবং ভাব দ্বারা তাঁহাদের নূতন নাটক রচনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অতএব এদেশে বিংশতি শতাব্দীর সূচনায় যে স্বদেশী আন্দোলনের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহার পূর্ববর্তী কাল পর্যন্ত বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যযুগের সীমা নির্দেশ করিতে হয়।

গ্রন্থের প্রথম ভাগের ভূমিকাতেই উল্লেখ করিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারায় কোন যোগ নাই; অতএব ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে তাঁহার নাট্যরচনার সূত্রপাত হইলেও, সমসাময়িক বাংলা নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে তাঁহার কোন যোগ ছিল না। সুতরাং তাঁহাকে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে ইহার মধ্যযুগের প্রতিনিধি বলিয়া নির্দেশ করা যায় না। একটি বিষয়ে রবীন্দ্র-নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে বাংলা নাট্যসাহিত্যের আধুনিক যুগের যোগ অনুভব করা যায়—তাহা ইহার রোমান্টিক-ধর্মিতা। পূর্বেও বলিয়াছি, বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যযুগে ইহার বস্তুধর্ম আধুনিক যুগ হইতে প্রবলতর ছিল, আধুনিক যুগে ইহার এই ধর্ম খর্ব হইয়া রোমান্টিক ধর্ম বৃদ্ধি পাইয়াছে—এই যুগের পুরাণ এবং ইতিহাস নাট্যকারের স্বকীয় ভাবপ্রকাশ বা মতপ্রচারের বাহন মাত্র হইয়াছে; রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্যই প্রবল বলিয়া তাঁহাকে বাংলা নাট্যসাহিত্যের আধুনিক যুগেরই প্রথম প্রতিনিধি বলিয়া নির্দেশ করা যাইবে।

প্রথম অধ্যায়

(১৮৬৭—১৮৯০)

মনোমোহন বসু

বাংলা নাট্যসাহিত্যের আদি এবং মধ্য যুগের সন্ধিক্ষণে মনোমোহন বসুর আবির্ভাব হয়। তিনি আদিযুগের প্রভাব সম্পূর্ণ কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই সত্য; কিন্তু তাঁহার মধ্যে যে কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা হইতে তাঁহাকে বাংলা নাটকের মধ্যযুগেরই অগ্রদূত বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। তাঁহার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা নাটকে অধিক সংখ্যায় সঙ্গীত যুক্ত করিয়া ইহাকে এক নূতন রূপ দান করিয়াছেন। ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি তাঁহার 'সতী নাটকে'র ভূমিকায় যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এখানে বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করিবার যোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন—

'ইউরোপে নাটককাব্যে গান অল্পই থাকে, আমাদের তথাবিধ গ্রন্থে গীতাধিক্যের প্রয়োজন। ইহা জাতীয় রুচিভেদে স্বাভাবিক। যে দেশের বেদ অবধি গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় ধারাপাত পাঠ পর্যন্ত স্বর-সংযোগ ভিন্ন সাধিত হয় না; যে দেশের লোক সঙ্গীতের সাহচর্য বিরহিত পুরাণ পাঠও শ্রবণ করে না; যে দেশের আপামর সাধারণ জনগণ পরাধীনতার জন্য সর্ব প্রকার হীনতা ও দীনতার হস্তে পড়িয়াও পূর্ব গান্ধর্ববিদ্যার উন্নত অঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে নানা রঙ্গে অঙ্গ রঙ্গে যাত্রা, কবি, পাঁচালী, ফুল ও হাফ আখড়াই, কীর্তন, ঢপ্পা, ভজন প্রভৃতি নিত্য নূতন সঙ্গীতামোদে আবহমান ঘোর আমোদী; অধিক কি যে দেশের দিবাভিক্ষু ও রাত্রভিক্ষুকারীও গান না শুনাইলে পর্যাপ্ত ভিক্ষান্ন পাইতে পারে না, সে দেশের দৃশ্যকাব্য যে সঙ্গীতাত্মক হইবে, ইহা বিচিত্র কি? এ কথা এত করিয়া লিখিবার কারণ আছে।...অতএব চরিত্রগত স্বভাবের সমর্থন পূর্বক বাঙ্গালা নাটকে সৎসঙ্গীতের বাহুল্য যতই থাকিবে, ততই লোকের প্রীতির কারণ হইবে, সন্দেহ নাই। নাটকের অন্যান্য অঙ্গে কল্পনা ও বিচারশক্তি যেমন আবশ্যক, গীতি অংশেও তদপেক্ষা ন্যূন হওয়া উচিত নহে।

কিন্তু এই সম্পর্কে সেই যুগে সকলেই যে একমত ছিলেন, তাহা নহে। ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায় ইংরেজি নাট্যরচনার আদর্শে কি ভাবে যে বাংলা নাটক রচনা করিয়া চলিয়াছিলেন, তাহা আমরা বাংলা নাট্যসাহিত্যের আদিযুগের বিবরণ হইতেই দেখিতে পাইয়াছি। কিন্তু মনোমোহন অনুভব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের রচনা জাতির রসপিপাসা চরিতার্থ করিতে পারে

নাই। কেবলমাত্র অনুকরণ দ্বারা কোন সার্থক সৃষ্টি সম্ভব হইতে পারে না। ইহাদের সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন, 'অনুকরণ-ভক্ত কতকগুলি ভক্ত উন্নতির শীর্ষ ইউরোপের আদর্শ দেখিয়া বলিয়া থাকেন, "নাটকে গান কেন?" তিনি তাঁহাদের এই মনোভাবের জবাব দিতে গিয়া যথার্থই বলিয়াছেন, তাঁহারা বাহির দেখেন, স্বীয় সমাজের অভ্যন্তর দেখেন না। সমাজের হৃদয়খানি যে সুস্বর-সুধালোলুপ বাহ্যজ্ঞানহীন মৃগহৃদয়বৎ, তাহা তাঁহারা অনুভব করেন না।' অতএব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, মনোমোহন ইংরেজি নাটকই হউক, কিংবা সংস্কৃত নাটকই হউক—কাহারও অনুকরণ করিবার প্রেরণা লইয়া বাংলা নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন নাই। এই অনুকরণ-স্পৃহা পূর্ববর্তী যুগের নাট্যকারদিগের মধ্যে যে কত প্রবল ছিল, তাহা পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা গিয়াছে।

কিন্তু একথা সত্য যে, বাঙ্গালীর রস-পিপাসা চরিতার্থ করিতে গিয়া মনোমোহন তাঁহার নাটকের মধ্যে যে সঙ্গীত-যোজনার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে যে-আদর্শের প্রেরণায় বাংলায় সর্বপ্রথম নাটক উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা হইতে তাঁহার রচনা বহু দূরবর্তী হইয়া পড়িয়াছিল—তাঁহার নাটককে আর নাটক বলিয়া পরিচয় দিবার উপায় রহিল না; ইহা নূতন এক সংজ্ঞা লাভ করিল, তাহা গীতাভিনয়; ইহাতে অভিনয়-ক্রিয়া অপেক্ষা গীতিসুরই প্রাধান্য লাভ করিল। কিন্তু বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার এই দান ব্যর্থ হইল না; কারণ, ইহার ফলে দেশের আপামর জনসাধারণ সেদিন নাট্যাভিনয়ের দিকে আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিল। প্রথম যুগে যাহা নিতান্ত মুষ্টিমেয় পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাভিমানীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তাহাই জনসাধারণের বিস্তৃততর ক্ষেত্রে প্রসার লাভ করিল। জাতীয় রস ও রুচির অনুগামী করিয়া পূর্ব হইতেই যদি মনোমোহন এই ক্ষেত্রটি রচনা করিয়া না রাখিতেন, তবে ইহার সঙ্গে সাধারণের যোগ স্থাপন করিতে আরও বিলম্ব হইত, সাধারণ রঙ্গমঞ্চের (Public Stage) প্রতিষ্ঠাও ত্বরান্বিত হইত না।

ইংরেজি নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে মনোমোহনের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না; ইংরেজি নাটকের বাংলা অনুবাদ কিংবা ইংরেজি-প্রভাবান্বিত বাংলা নাটকের মধ্য দিয়া ইহার রস তিনি গৌণভাবে আস্বাদন করিয়াছিলেন মাত্র। সেইজন্য তাঁহার নাট্যরচনার মধ্যে তিনি ইংরেজি প্রভাব আত্মসাৎ করিয়া তুলিতে পারেন নাই। তিনি বিষাদান্তক নাটক রচনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনি

'বিষাদান্তক নাট্যরচনার অন্তর্নিহিত রস এবং বাহ্য শিল্পগুণ আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। অতএব দেখিতে পাওয়া যায়, প্রয়োজনের অনুরোধে তাঁহার একখানি বিষাদান্তক নাটকের সঙ্গে একটি অতিরিক্ত মিলনাত্মক অঙ্ক যোগ করিয়াই ইহাকে মিলনান্তক নাটক বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। নাট্য রচনায় মনোমোহনের সম্মুখে দুইটি আদর্শ ছিল—একটি সংস্কৃত নাটকের আদর্শ, অপরটি নূতন যাত্রার আদর্শ। কিন্তু ইহাদের কোনটিকেই তিনি পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না—সংস্কৃতের অনুবাদ কিংবা অনুকরণ যে বাংলায় অচল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যদিও অনুবাদের মোহ সেই যুগ তখন পর্যন্ত কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই, তথাপি তিনি একখানিও সংস্কৃত নাটকের অনুবাদে হস্তক্ষেপ করেন নাই। নূতন যাত্রাও যে তাঁহার সমসাময়িককালে 'জঘন্য' রূপ লাভ করিয়াছিল, তাহা তিনি তাঁহার প্রথম নাটকখানির প্রস্তাবনায় নটের মুখ দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি সংস্কৃত নাটকের কোন কোন আঙ্গিক যেমন তাঁহার রচনায় রক্ষা করিয়াছেন, আবার তেমনই নূতন যাত্রার ভিত্তিটিরও সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। তাহারই ফলে তাঁহার গীতাভিনয়-গুলির সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে নূতন যাত্রার মৌলিক ভিত্তির উপর সংস্কৃত নাটকের কাঠামোটি স্থাপিত হইয়াছে—ইংরেজির প্রভাব ইহার ভিতর কিংবা বাহির কোন দিক স্পর্শ করিতে পারে নাই। সেই জন্য তিনি সেই যুগের 'বাংলা নবীশ' নাট্যকার বলিয়া সর্বদা উল্লিখিত হইয়াছেন।

পৌরাণিক বিষয়-বস্তু লইয়া নাটক রচনা করিলেও মনোমোহন তাহাদের মধ্য দিয়া কোন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রকাশ করিতে যান নাই—মানবিক রসই তাঁহার নাটকের প্রধান উপজীব্য এবং ইহার মধ্যে করুণ রসই প্রধান। তাঁহার একখানি ব্যতীত সকল পৌরাণিক নাটকই মিলনাত্মক হওয়া সত্ত্বেও এই করুণ রসই তাঁহার নাটকের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এইজন্য তাঁহার নাটকের মিলনাত্মক পরিণতিগুলি কার্যকরী (effective) বলিয়া অনুভূত হয় না। এই বিষয়ে সংস্কৃতের আদর্শ তিনি উপেক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু সমসাময়িক রুচিবোধ যে তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন নাই, তাহা তাঁহার দ্বিতীয় পৌরাণিক নাটকখানির বিষাদান্তক হইতে মিলনাত্মক রূপদান করিবার প্রয়াস হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে।

পূর্ববর্তী যুগের পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে দেবচরিত্রসমূহ ইহাদের স্বাতন্ত্র্য কতকটা রক্ষা করিতে পারিয়াছিল, কিন্তু মনোমোহনের নিকটই ইহারা ইহাদের এই স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ পরিহার করিয়া মানব-চরিত্রের সমধর্মী হইতে বাধ্য হইয়াছে। ইহাদের পরিচয় পৌরাণিক; কিন্তু ইহাদের আচরণ বাঙ্গালীর চরিত্র-সুলভ হইয়া উঠিয়াছে। এই দিক দিয়া মনোমোহনের রচনা মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলির সঙ্গে যোগস্থাপন করিয়া লইয়া বাঙ্গালীর রস ও রুচির সম্পূর্ণ অনুগামী হইয়া উঠিয়াছে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাঙ্গালী পুনরায় নূতন করিয়া তাহার জাতীয় লোক-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় লাভ করিয়াছে।

মনোমোহনের রুচিবোধ উন্নত ছিল—এই উন্নত রুচিবোধই বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্য। চরিত্রগুলির ভাষা কিংবা আচরণের দিক দিয়া কোন প্রকার গ্রাম্যতা কিংবা ইতরতার তিনি প্রশ্রয় দেন নাই। কচিৎ দুই এক স্থানে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা পূর্ববর্তী যুগের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল, মনোমোহনের নিজস্ব রুচিবোধের পরিচায়ক নহে। এই উন্নত রুচিবোধই বাংলা নাটককে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের ভিতর দিয়া পরিবেশন করিবার উপযোগিতা দান করিয়াছিল।

নাটকীয় ভাষার উন্নতির মূলে মনোমোহনের বিশেষ দানের কথা স্মরণ করিবার যোগ্য। পূর্ববর্তী যুগের নাটকীয় ভাষার মধ্যে একটা সমতা কিংবা ঐক্য অনুভব করা যায় না—নাটকীয় ভাষা তখনও নিজের আদর্শের সন্ধান পায় নাই। চরিত্রগুলি অনেক সময় পরস্পর এত স্বতন্ত্র প্রকৃতির ভাষা ব্যবহার করিয়াছে যে, তাহার ফলে সমগ্র ভাবে একটি নাটকের মধ্যে একটি অখণ্ড রস ও ভাব গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। প্রত্যেক চরিত্রেরই নিজস্ব কথ্যভাষার মধ্যে যত বাস্তব রসই থাকুক না কেন, সমগ্রভাবে প্রত্যেক নাটকেরই একটি অখণ্ড রস গড়িয়া তুলিবারও দায়িত্ব আছে। পূর্ববর্তী যুগের খুব অল্প সংখ্যক নাটকেই এই দায়িত্ব পালন করা হইয়াছে। বাস্তব রসকে যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া মনোমোহন সর্বপ্রথম ভাষার দিক দিয়া একটি ঐক্যের সন্ধান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পরবর্তী নাট্যকারদিগের মধ্যে এই প্রচেষ্টা অধিকতর সাফল্য লাভ করিলেও ইহার প্রথম প্রয়াসের কৃতিত্ব মনোমোহনেরই প্রাপ্য।

নাটক রচনার একটি নিজস্ব আঙ্গিক গ্রহণ করিবার ফলে নাটক হিসাবে

মনোমোহনের রচনার ত্রুটিও অনেকখানি চোখে পড়িবে। সংলাপের দৈর্ঘ্য ইহাদের অন্যতম। দৃশ্যপটের সাহায্য ব্যতীত গীতাভিনয় অভিনীত হইবার ফলে দৃশ্য, স্থান কাল ইত্যাদি সম্পর্কিত বহু তথ্য নাট্যিক চরিত্রের মুখ দিয়াই বর্ণনা করিবার প্রয়োজন হয়, তাহার ফলে কোন কোন স্থলে সংলাপের দৈর্ঘ্য অপরিহার্য হইয়া উঠে। অতএব সাধারণ নাটকের আঙ্গিক দ্বারা ইহাদের মূল্য বিচার করিলে ভুল হইবে।

যদিও সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা-কাল বা ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যযুগ সূচিত হইয়াছে এবং মনোমোহনের তিনখানি নাটক ইহার পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে, তথাপি তিনি তাঁহার রচনার মাধ্যমে মধ্যযুগেরই ভিত্তিতল রচনা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে মধ্য যুগেরই প্রতিনিধি বলিয়া নির্দেশ করিতে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না।

মনোমোহন বসুর প্রথম রচনা 'রামাভিষেক নাটক বা রামের অধিবাস বা বনবাস।' রামের বনবাসগমনই ইহার প্রকৃত বিষয়, অতএব 'রামাভিষেক' অপেক্ষা ইহার রাম-বনবাস নামই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। দশরথের মৃত্যুর সঙ্গেই ইহার কাহিনী সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে মনোমোহন একটি দুঃসাহসিক পরীক্ষা করিয়াছিলেন—সংস্কৃত নাটকের আদর্শে ইহার প্রস্তাবনায় নটনটীর অবতারণা করিয়াও শেষ পর্যন্ত ইহাকে সংস্কৃত নাট্যাদর্শের বিরোধী করিয়া বিয়োগাত্মক পরিণতি দান করিয়াছেন—ইহাই মনোমোহনের একমাত্র বিয়োগাত্মক রচনা; তাঁহার পরবর্তী পৌরাণিক রচনা 'সতী নাটক' খানিকেও তিনি সর্বপ্রথম অনুরূপ বিয়োগাত্মক পরিণতি দান করিয়াছিলেন। কিন্তু 'বহু রঙ্গভূমির অধিনায়ক ও সাধারণ পাঠকগণের আগ্রহাতিশয্যে তাহাতে একটি মিলনান্তক দৃশ্য সংযুক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—তাহা হইতেই মনোমোহন বুঝিয়াছিলেন যে, তৎকালীন সমাজে ইংরেজি নাটকের প্রভাবের ফল যাহাই হউক না কেন, দেশীয় আদর্শের প্রভাবও তাহাতে কম কার্যকরী ছিল না। সেইজন্য কাহিনীর স্বাভাবিক গতি ব্যাহত করিয়াও তিনি তাঁহার সামাজিক দোষত্রুটি প্রদর্শনকারী প্রহসনগুলিকে পর্যন্ত মিলনাত্মক পরিণতি দান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু 'রামাভিষেক নাটক'খানির তাঁহার জীবিতাবস্থাতেই একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হইলেও, ইহার পরিণতি-বিষয়ক আর কোন পরিবর্তন করেন নাই। বিয়োগাত্মক পৌরাণিক গীতাভিনয় রচনা বিষয়ে ইহা তাঁহার একক কীর্তি হইয়া

রহিয়াছে। তিনি তাঁহার এই করুণ-রসাত্মক রচনাটির মধ্য দিয়া একটি পরীক্ষা-মূলক কার্যই যে করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা ইহার প্রস্তাবনায় নটের মুখ দিয়া এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন,—

'এখানকার নব্য ব'লে কেন, সকল দেশে সকল কালে নব্যমাত্রেই শান্তিরসকে বাঘের মত আর আদিরসকে পোষা শুকপাখীর ন্যায় জ্ঞান ক'রে থাকেন। সেটা কেবল বয়সের দোষ। বরং এখনকার কৃতবিদ্য নব্যদলের মধ্যে অনেকে বাৎসল্য, সখ্য, করুণ প্রভৃতি রসের অনুরাগী আছেন। আর এখন তাঁদের কাব্য ও সঙ্গীতাস্বাদশক্তি বিশুদ্ধ হওয়াতে এদেশে জঘন্য যাত্রার পরিবর্তে পুনর্বার নাট্যাভিনয় উদয় হচ্ছে। তাঁরা চান—অভিনয়ের নায়ক-নায়িকার নির্মল চরিত্র হ'বে। সুতরাং সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, শান্ত, দান্ত, ধীর, এমন কোনো বীরপুরুষ সম্পর্কে করুণরসের কোনো একটি অভিনয় যদি দেখাতে পারা যায়, তবে নির্বিবাদে যেমন সর্বমনোরঞ্জন হবে, এমন আর কিছুতেই না।'

কিন্তু তাঁহার পরবর্তী করুণরসাত্মক রচনা 'সতী নাটকে'র একটি মিলনাত্মক উপসংহারের জন্য 'বহু বঙ্গভূমির অধিনায়ক ও সাধারণ পাঠকগণে'র যে আগ্রহ দেখা গিয়াছিল, তাহা হইতে মনে হয়, করুণরসাত্মক রচনা সে যুগে তখনও 'সর্বজনমনোরঞ্জন' করিতে পারে নাই।

'রামাভিষেক নাটক'খানি রচনার ভিতর দিয়াই মনোমোহনের গীতাভিনয় রচনার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইলেও, তাঁহার পরবর্তী পৌরাণিক রচনা-খানির মধ্য দিয়াই তাহাদের পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ সম্ভব হইয়াছে—প্রথম রচনাখানির ভিতর তাঁহার প্রয়াস অপরিণত ও অপরিস্ফুট বলিয়া অনুভূত হয়। কৃত্তিবাস তাঁহার একান্ত অবলম্বন, কোন দিক দিয়াই তাঁহার কোন চরিত্রের উপরই তিনি নিজস্ব কোন মনোভাব আরোপ করিতে যান নাই। এই যুগেরই পরবর্তী নাট্যকার গিরিশচন্দ্র যেমন কৃত্তিবাসের ভাব অনেক সময় নিজের করিয়া লইয়া তাঁহার পৌরাণিক নাটক নূতন রূপে প্রকাশ করিয়াছেন, মনোমোহন তাহা করেন নাই। 'রামাভিষেক' কৃত্তিবাসী রামায়ণের অংশ-বিশেষের নাট্যরূপ মাত্র। তাঁহার অযোধ্যা বাংলা দেশেরই পঙ্কশেষ পানাপুকুরের তীরে অবস্থিত একটি গণ্ডগ্রাম, তাঁহার কৌশল্যা পুত্রের মঙ্গলকামনায় মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত উদ্‌যাপনে রত, পুত্রের অভিষেক উপলক্ষ্যে 'পাড়া-প্রতিবাসিনী'দিগের সঙ্গে 'আমোদ-আহ্লাদ' করিবার অভিলাষ করেন, পুত্রের বন-গমন উপলক্ষে বাঙ্গালী জননীর মতই সুদীর্ঘ বিলাপে অশ্রুস্নান করেন, তাঁহার দশরথ বহুবিবাহপ্রথা-পীড়িত বাংলার সমাজেরই একজন ভুক্তভোগী প্রতিনিধি;

সেইজন্য তাঁহার এই পরিণাম দেখিয়া তাঁহার মন্ত্রী এই বলিয়া আক্ষেপ করেন, 'হায়! হায়! বহুবিবাহ কি অশেষ অনর্থের মূল!—কি অপ্রতিহতরূপে সকল সুখ ও সকল ধর্ম নষ্ট করে! আজ নিশ্চয় জানলেম, পুরুষ যত কৃতী হউন, যত সতর্ক থাকুন, তথাপি বহুবিবাহবৃক্ষে বিষময় ফলোৎপাদন হবেই হবে, তার সন্দেহ নাই (৩।২)।'

দশরথের পরিণতির সুযোগটুকু অবলম্বন করিয়া মনোমোহন এখানে বাংলা দেশেরই একটি সমসাময়িক কুপ্রথার নিন্দা করিয়া লইয়াছেন। অযোধ্যার রাজপথে 'লাঙ্গল কাঁধে ও কাস্তে হাতে' যে দুইজন চাষা দেখা দেয়, তাহাদের মুখের ভাষায় ও আচরণে তাহাদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া চিনিয়া লইতে ভুল হয় না। বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যযুগের বাঙ্গালীর পুরাণ যে নাটকের উপজীব্য হইয়াছিল, এইখানেই তাহার সূত্রপাত দেখিতে পাওয়া যায়।

'রামাভিষেক' পাঁচ অঙ্কে সম্পূর্ণ হইলেও ইহার অঙ্কগুলি দীর্ঘ নহে, ইহার বিষয়বস্তু অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বলিয়া অপ্রাসঙ্গিকরূপে ইহাতে সীতার মুখে রাম-কর্তৃক হরধনুভঙ্গের বিস্তৃত কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে সঙ্গীতের সংখ্যাও অধিক নহে, সেইজন্য ইহাতে গীতাভিনয়ের লক্ষণ তত প্রকট হইয়া উঠিতে পারে নাই। একটি মাত্র দৃশ্যে নর্তকীগণের নৃত্যগীত ও তৎসহ 'বিদূষক কর্তৃক মধ্যে মধ্যে আহা! আহা! হায়! সাবাস! সাবাস্ ইত্যাদি উক্তি ও বিবিধ অঙ্গভঙ্গী'র মধ্য দিয়া যাত্রার লক্ষণ অত্যন্ত প্রকট হইয়া উঠিয়াছে; ইহাতে একান্ত যাত্রাসুলভ অন্য কোন চরিত্র নাই।

প্রথম নাটকখানির মধ্য হইতেই মনোমোহনের ভাষার প্রাঞ্জলতার পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও সম্পূর্ণভাবে পাণ্ডিত্যের সংস্কার হইতে তিনি তখনও মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই, তথাপি এই বিষয়ে তাহার সূচনা দেখা দিয়াছে। দুইজন কৃষকের মুখে যে গ্রাম্য বা ইতর ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা দীনবন্ধুর অনুরূপ চরিত্রের অনুকরণ-জাত। প্রথম সংস্করণে এই ভাষার মধ্যে যে 'যাবনিকত্ব দোষ' ছিল, তাহা পরবর্তী সংস্করণে তিনি নিজেই সংশোধন করিয়া লইয়াছিলেন।

দক্ষনিন্দায় সতীর দেহত্যাগের সুপরিচিত পৌরাণিক বৃত্তান্ত লইয়া মনোমোহন বসু 'সতী নাটক' নামক যে গীতাভিনয়খানি রচনা করেন, তাহাই নানা দিক দিয়া তাঁহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রচনা। ইহাতে অধিকতর

সংখ্যায় সঙ্গীত সংযুক্ত হওয়ায় ইহাকে পূর্ণতর গীতাভিনয় বা অপেরার রূপদান করিয়াছে। ইহার কাহিনী বিয়োগান্তক; কারণ, সতীর দেহত্যাগই ইহার বর্ণিতব্য বিষয়। মনোমোহন আশা করিয়াছিলেন, গীতাভিনয়ের মধ্যে বিয়োগান্তক বিষয় 'আধুনিক রুচি'র অনুমোদন লাভ করিবে; সেইজন্য 'সতী-নাটকে' তিনি প্রথম বিয়োগান্তক রূপই দান করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাচীন রুচির বিশেষ অনুরোধে নাটক প্রচারের কিয়দ্দিন পর তিনি ইহাতে 'হর-পার্বতী মিলন' নামক একটি মিলনাত্মক উপসংহার যোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 'অভিনয় ও সম্ভ্রান্ত অভিনেতাদের সুবিধার্থ' ইহার 'কেবল কুড়ি-খানা মাত্র মুদ্রিত হইয়াছিল।' তিনি ভাবিয়াছিলেন, ইহার অধিক আর ইহার প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু এখানেও তিনি একটি ভুল করিয়াছিলেন; কারণ, তিনি দেখিতে পাইলেন, তাহা 'বহু রঙ্গভূমির অধিনায়ক ও সাধারণ পাঠকগণ ক্রমশ চাহিয়া পাঠান, মুদ্রিত না থাকাতে প্রাপ্ত হয়েন না—তবে যাঁহাদের বিশেষ প্রয়োজন, তাঁহারা হস্তে লিখিয়া লইয়া যান।' অতঃপর 'তদভাব নিবারণার্থ নাটকের পুনর্মুদ্রাঙ্কন সুযোগে' তাহা নাটকের সঙ্গেই সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। ইহা হইতে একটি বিষয় স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে যে, মনোমোহন যাহাকে প্রাচীন রুচি বলিয়াছেন, তাহাই তদানীন্তন গীতাভিনয়-দর্শকদিগের মধ্যে প্রচলিত রুচি ছিল—নতুবা তিনি তাঁহার বিয়োগান্তক রচনাকে মিলনান্তক রূপ দান করিতে যাইতেন না। প্রচলিত রুচির নিকটই তাঁহাকে নতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। তবে তিনি এই সম্পর্কে পরামর্শ দিয়াছেন যে, 'বিয়োগান্ত নাটকপ্রিয় মহাশয়েরা সে অংশটি বর্জন এবং পুনর্মিলনানুরাগী মহাশয়েরা গ্রহণ পূর্বক অভিনয় করিতে পারেন।' মনোমোহন ইহার পরবর্তী সমস্ত নাটকই মিলনান্তক করিয়া রচনা করিয়াছিলেন; ইহা হইতেই মনে হয়, 'বিয়োগান্তক নাটক-প্রিয় মহাশয়'দিগের উপর তাঁহার আর বিশেষ আস্থা ছিল না।

'সতী নাটকে'র প্রস্তাবনায় সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুযায়ী মঙ্গলাচরণ ও নটনটীর অবতারণা করা হইয়াছে। উপসংহারের অতিরিক্ত অঙ্কটি বাদ দিলে ইহা পঞ্চম অঙ্কে সম্পূর্ণ। সতীর দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার যবনিকাপাত হইয়াছে; অতএব ইহা হইতে দক্ষযজ্ঞনাশ ও দক্ষের শাস্তিলাভের অংশ বর্জিত হইয়াছে। দক্ষ, শিব কিংবা নারদ ইহাদের কাহারও চরিত্রের মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য অনুভব করা যায় না; কেবলমাত্র ইঁহারা যে সকলেই বাঙ্গালী

তাহা চিনিয়া লইতে ভুল হয় না। পুরুষ চরিত্রের মধ্যে নারদের শিষ্য শান্তিরামের চরিত্রটির একটি বৈশিষ্ট্য আছে, ইহা নাট্যকারের মৌলিক সৃষ্টি। গীতাভিনয় এবং কোন কোন পৌরাণিক নাটকের মধ্যে যে বিষয়-বন্ধনহীন তত্ত্ব-দর্শী এক একটি পাগল পুরুষ কিংবা পাগলিনী স্ত্রীর চরিত্র পরিকল্পিত হইত, ইহার মধ্যেই তাহার সূচনা দেখিতে পাওয়া যায়। শান্তিরাম ছড়া ও সঙ্গীতের ভিতর দিয়া সুগভীর তত্ত্বকথা প্রকাশ করিয়াছে। কোন কোন গীতাভিনয়ের মধ্যে সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্বপরিবেশনের যে একটি দায়িত্ব থাকে, ইহার মধ্যে এই চরিত্রটির ভিতর দিয়াই তাহা পালন করা হইয়াছে। নিতান্ত হাল্কা ছড়ার মধ্য দিয়া নাট্যকার এই তত্ত্বকথা সাধারণের চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইহা তাঁহার কম কৃতিত্বের কথা নহে।

স্ত্রীচরিত্রের মধ্যে সতী ও প্রসূতি দুইটি চরিত্রই প্রধান। প্রসূতির সন্তান-বাৎসল্যের মধ্যে নাট্যকার বাঙ্গালী মাতৃহৃদয়ের সহজ স্পন্দন অনুভব করিয়াছেন; কিন্তু সতীর চরিত্রের মধ্যে নাট্যকার কোন বৈশিষ্ট্যই ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। সুদীর্ঘ সংলাপের জন্যই এই চরিত্রটির রসস্ফূর্তিতে বাধা হইয়াছে—সেইজন্য ইহা নিতান্ত আড়ষ্ট এবং প্রাণহীন বলিয়া মনে হয়। অশ্বিনী, অশ্লেষা ও মঘা এই তিনটি ভগিনীর চরিত্র বাঙ্গালী নাট্যকার নিজগৃহের ছায়াতলে বসিয়া রচনা করিয়াছেন—ইহাদের ক্ষুদ্র ঈর্ষ্যা ও অর্থহীন দম্ভের যে চিত্র নাট্যকার অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনে নিতান্ত সুলভ বলিয়াই এত বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে। স্বতন্ত্র পটভূমিকা হইতে আনীত কয়েকটি সুরচিত আগমনী সঙ্গীত নাটকটির মধ্যে যুক্ত হইবার ফলেও ইহা সমসাময়িক রসচৈতন্যের বাহন হইয়াছে। উমা-মেনকার সম্পর্কের উপর ভিত্তি করিয়াই সে যুগে আগমনী সঙ্গীত রচিত হইয়াছিল, সতী-প্রসূতির প্রসঙ্গের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক নাই; কিন্তু মনোমোহন সতী-প্রসূতির প্রসঙ্গের মধ্যেই ইহাক স্থান দিয়াছেন।

প্রথম পৌরাণিক নাটকখানির ভিতর দিয়া মনোমোহন যেমন বাংলার একটি সমসাময়িক সামাজিক কুপ্রথার দোষকীর্তন করিবার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন; কিংবা পরবর্তী একখানি পৌরাণিক নাটকের মধ্যেও যেমন তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবপ্রবুদ্ধ দেশাত্মবোধের ভাবটি প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন (পরে দ্রষ্টব্য), 'সতী' নাটকখানির মধ্যে তেমন কোন

প্রচেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় না। এই দিক দিয়া পৌরাণিক নাটক হিসাবে ইহা অধিকতর সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

হরিশ্চন্দ্রের আত্মত্যাগ বিষয়ক সুপরিচিত পৌরাণিক বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া মনোমোহন তাঁহার 'হরিশ্চন্দ্র নাটক' রচনা করেন। ইহা একখানি করুণরসাত্মক মিলনান্তক নাটক। করুণ রসের প্রাধান্যের জন্য ইহার মিলনান্তক পরিণতিটি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই—ইহার মধ্যে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক ভাবে উনবিংশ শতাব্দীর নবপ্রবুদ্ধ হিন্দু জাতীয়তার বাণী ঘোষিত হইয়াছে, পরাধীনতার গ্লানি ও বৈদেশিক শোষণের কথা স্মরণ করিয়াও অনুতাপ করা হইয়াছে।

মনোমোহন 'পার্থ পরাজয় নাটক অর্থাৎ বভ্রুবাহনের সঙ্গে অর্জুনের পরাভব' নামক একখানি গীতাভিনয় রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সর্বশেষ পৌরাণিক গীতাভিনয় 'রাসলীলা' রাধাকৃষ্ণের রাস-বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া রচিত। সঙ্গীতের আধিক্যের জন্য ইহা নূতন যাত্রার রূপ লাভ করিয়াছে।

মনোমোহন বসু যে দুইখানি মাত্র পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে 'প্রণয়-পরীক্ষা নাটক'খানিই প্রথম প্রকাশিত হয়। বহুবিবাহ-কুপ্রথার দোষ কীর্তন করা প্রথম যুগের নাট্যকারদিগের যে অন্যতম লক্ষ্য হইয়াছিল, তাহারই ধারা অনুবর্তন করিয়া মনোমোহন তাঁহার এই নাটকখানি রচনা করেন। ইহাতে পূর্ববর্তী যুগের নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্নের 'নব নাটক'খানিকেই অনুকরণ করা হইয়াছে; এই বিষয়ক দীনবন্ধুর সুপ্রসিদ্ধ প্রহসন 'জামাই বারিক' তখনও প্রকাশিত হয় নাই। তবে রামনারায়ণের 'নব নাটকে'র মত ইহা বিয়োগান্তক নহে। যদিও বিষয়টিকে বিয়োগাত্মক পরিণতি দান করাই স্বাভাবিক ছিল, তথাপি মনোমোহন ভারতীয় নাট্যাদর্শের মর্যাদা রক্ষা করিয়া ইহার একটি সুন্দর মিলনাত্মক পরিণতি দান করিয়াছেন। সংস্কৃত নাটকের আদর্শেই মনোমোহন ইহাতে একটি 'প্রস্তাবনা' যোগ করিয়া নট ও নটীর মধ্যস্থতায় নাট্যকাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন। 'প্রস্তাবনা'র মধ্যেই নটের মুখ দিয়া নাটকের উদ্দেশ্য ব্যক্ত হইয়াছে।

রামনারায়ণ ব্যতীত মনোমোহনের এই নাটকখানির উপর দীনবন্ধুর প্রভাবও অনুভব করা যায়। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণে'র এবং 'লীলাবতী'র প্রভাব ইহার কোন কোন অংশে সুস্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে। সে কথা পরে বিস্তৃতভাবে আলোচিত

হইবে। নাটকের কাহিনীর মধ্যে রামনারায়ণের 'নব নাটকে'র কাহিনীর প্রভাবই বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। কাহিনীটি সংক্ষেপে উল্লেখ করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

মানগড়ের জমিদার শান্তবাবুর প্রথমা স্ত্রীর কোন সন্তান না হইবার জন্ত মাতার অনুরোধে তিনি পুনরায় বিবাহ করিলেন। তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর নাম মহামায়া, দ্বিতীয়ার নাম সরলা। শান্তবাবু দুই স্ত্রীর প্রতিই সমান ব্যবহার করেন, মহামায়াও সপত্নীকে প্রকাশ্যে আদর-যত্ন করিয়া থাকেন, কিন্তু মনের মধ্যে একটু হিংসার অস্তিত্বও অনুভব করেন। তিনিও বিশ্বাস করেন যে, শান্তবাবু তাঁহাকে তাঁহার সপত্নী হইতে অভিন্ন বলিয়াই বিবেচনা করেন। কিন্তু মহামায়ার এক দাসী ছিল, নাম কাজলা। সে তাঁহাকে এক ঔষধের সন্ধান দিয়া বলিল, ইহা স্বামীকে খাওয়াইলেই বুঝিতে পারিবে, তিনি প্রকৃত কাহাকে বেশী ভালবাসেন। এই ঔষধের গুণে স্বামী অজ্ঞান অবস্থায় যাহার প্রতি তাঁহার বেশী আসক্তি তাহার নিকট যাইবেন, অন্যত্র তিষ্ঠিতে পারিবেন না। কাজলার পরামর্শে স্বামীকে গোপনে এই ঔষধ খাওয়াইয়া মহামায়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাহিলেন। পরীক্ষায় দেখা গেল, স্বামী সরলার দিকেই অধিক অনুরাগী। জানিতে পারিয়া মহামায়ার মনে হিংসার আগুন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তিনি সরলার সর্বনাশ করিতে উদ্যত হইলেন, ষড়যন্ত্র করিয়া সরলাকে স্বামীর নিকট অবিশ্বাসের পাত্রী বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন, শান্তবাবু ক্রুদ্ধ হইয়া সরলাকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। অবশেষে শান্তবাবুর ভগিনীপতি নটবরের সহায়তায় মহামায়ার সকল চক্রান্ত ধরা পড়িল। কাজলা গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইল, মহামায়া বনে পলাইয়া গিয়া ব্যাঘ্রহস্তে নিহত হইলেন। সরলা প্রত্যাবর্তন করিয়া স্বামীর সঙ্গে মিলিত হইল। তাহার সংসারের কাঁটা দূর হইল।

আপাতদৃষ্টিতে এই কাহিনীর একটি প্রধান ত্রুটি এই বলিয়া মনে হয় যে, একটি অলৌকিক বস্তু দ্বারা ইহার ঘটনা-প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে—তাহা দৈব ঔষধ। কিন্তু দৈব ঔষধের গুণ সম্পর্কে সে যুগের সাধারণ সমাজের বিশ্বাসের কথা ছাড়িয়া দিলেও, এই বিষয়ে আরও একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে, ইহাকে ঘটনার বাহ্যিক অলঙ্কাররূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে; অর্থাৎ দৈব ঔষধ ব্যতীতও মহামায়া বুঝিতে পারিতেন যে, শান্তবাবু সরলার প্রতি অধিকতর আসক্ত, কারণ, ইহা না হওয়াই অস্বাভাবিক। 'বিষবৃক্ষে'র কুন্দনন্দিনীর

অলৌকিক স্বপ্নদর্শন দ্বারা যেমন ইহার ঘটনা-প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে না, তেমনই দৈব ঔষধের ক্রিয়াদ্বারাও ইহার ঘটনা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইবে না। এই বিষয়টি কাহিনী হইতে বাদ দিলেও ইহার পরিণতি অভিন্নরূপ হইত।

'প্রণয়-পরীক্ষা' নাটকের কাহিনীতে যে যথার্থ নাট্যগুণ আছে, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। দুইটি বিরুদ্ধশক্তিকে নাট্যকার এখানে পরম কৌশলে পরস্পরের সম্মুখীন করিয়াছেন—একদিকে মহামায়া ও কাঙ্গলার পাপশক্তি, অপর দিকে সরলার পুণ্যশক্তি; এই দুইটি শক্তিকেই নাট্যকার যথার্থ দুর্জয় করিয়া তুলিয়াছেন বলিয়াই কাহিনীর পরিণতি অত্যন্ত কার্যকরী হইয়াছে বলিয়া বোধ হইবে। নাট্যকাহিনীর এইখানেই সার্থকতা।

'প্রণয়-পরীক্ষা' নাটকের মূল কাহিনীর ধারায় এই নাট্যগুণ থাকিলেও ইহার অন্যত্র যে কয়েকটি ত্রুটি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাও উপেক্ষণীয় নহে। ইহাতে রসিক ও তরলার একটি উপকাহিনী আছে। মূল কাহিনীর সঙ্গে ইহার কোন যোগ স্থাপিত হইতে পারে নাই, প্রচুর অবকাশ থাকা সত্ত্বেও কাহিনীর ঘটনা-প্রবাহ কোন দিক দিয়াই ইহা নিয়ন্ত্রিত করে নাই। দীর্ঘকাল নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবের মধ্যে ইহাতে অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি হইয়াছে। মনোমোহন এই বিষয়টি দীনবন্ধুর 'লীলাবতী' নাটক হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু দীনবন্ধু হইতেও মনোমোহন এই বিষয়ে অধিকতর অস্বাভাবিকতার প্রশ্রয় দিয়াছেন বলিয়া বোধ হইবে। পূর্বেই বলিয়াছি, মনোমোহন দীনবন্ধুর কতকগুলি ত্রুটিই অনুকরণ করিয়াছেন, তাঁহার কোনও গুণ অনুসরণ করিতে পারেন নাই। ইহা তাহার অন্যতম নিদর্শন।

সুশীলা ও নটবরের কাহিনী এই নাটকের অন্যতম উপকাহিনী। মূল কাহিনীর সঙ্গে ইহা প্রথম হইতেই সম্পূর্ণ অবিচ্ছেদ্য হইয়া গড়িয়া না উঠিলেও কাহিনীর পরিণতিতে নটবর চরিত্রের যে একটি বিশিষ্ট স্থান আছে, তাহা উপেক্ষা করা যায় না। যে সকল নাটকের মধ্য দিয়া সামাজিক কুপ্রথার দোষ কীর্তন করা হইয়া থাকে, তাহাদের বিভিন্ন উপকাহিনী একই কুপ্রথার বিভিন্ন দিক অসংলগ্ন এবং বিচ্ছিন্নভাবে বর্ণনা করিয়া থাকে মাত্র—ইহাদের পরস্পরের মধ্যে একটি অখণ্ড ঐক্যসূত্রের প্রায়ই সন্ধান পাওয়া যায় না—ইহাতেও তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। নটবর চরিত্রটি শেষ পর্যন্ত নাট্যকার কেবলমাত্র নিজের প্রয়োজনের অনুরোধেই মূল কাহিনীর মধ্যে আনিয়া স্থাপন করিয়া

ছেন। 'প্রণয়-পরীক্ষা' নাটকের কাহিনীর একটি প্রধান গুণ এই যে, ইহার ঘটনা-কাল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত,—বিভিন্ন অঙ্কে বিভক্ত ইহার ঘটনাগুলি একটি নিবিড় ঐক্য লাভ করিয়াছে; প্রথম হইতে ইহার ঘটনা শেষ পর্যন্ত একটি নাটকীয় গতিও লাভ করিতে পারিয়াছে—মনোমোহনের নাটকের ইহা একটি প্রধান গুণ।

শান্তবাবুই এই কাহিনীর নায়ক। নাট্যকার তাঁহাকে একটি আদর্শ চরিত্ররূপে প্রতিপন্ন করিবারই চেষ্টা করিয়াছেন। অতএব তাঁহার মধ্য দিয়া নাটকীয় চরিত্রের বিকাশ আশা করা যায় না; তথাপি ইহাতে কয়েকটি মানবিক গুণেরও স্পর্শ অনুভব করা যায়। তাঁহার সম্পর্কে নাট্যকার একটি চরিত্রের মুখ দিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, 'তিনি যথার্থই শান্তশীল, কিন্তু একবার ক্রুদ্ধ হইলে আর কোন হিতাহিত জ্ঞান থাকে না।' এই নাটকের মধ্যে তাঁহার চরিত্রের শান্ত ও উগ্র এই দুইটি দিকই দেখান হইয়াছে। তাঁহার শান্তভাবের মধ্যে আদর্শবাদের যেমন সন্ধান পাওয়া যায়, তাঁহার উগ্রমূর্তির ভিতরও তাহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার চরিত্রের হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য উগ্র ভাবের মধ্যে 'ওথেলো'র ট্র্যাজিডির বীজ ছিল, কিন্তু নাট্যকার তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই, বরং শেষ পর্যন্ত কাহিনীর মোড় ঘুরাইয়া দিয়া ইহাকে একটি কমেডির রূপ দিয়াছেন। ইহাতে কাহিনীর রস যেমন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, মানবিকতার দিক দিয়া নায়ক-চরিত্রটির ও সূক্ষ্ম সঙ্গতি-গুলি তেমনি বিনষ্ট হইয়াছে। স্বচক্ষে পত্নীকে বিশ্বাসহন্ত্রী দেখিতে পাইয়া এবং তাহার গর্ভে অপরের সন্তান রহিয়াছে জানিতে পারিয়া অসিহস্তে তিনি তাহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়াছেন সত্য; কিন্তু কেবল অসি আস্ফালন করিয়াই তিনি ক্ষান্ত রহিয়াছেন, ইহার অধিক আর অগ্রসর হন নাই। অতএব তাঁহার চরিত্রের হিতাহিত-জ্ঞানশূন্যতার দিকটিও বাস্তবরূপ লাভ করিয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই।

কাজলার চরিত্রই এই নাটকের খল (villain) চরিত্র; ইহাতে বাস্তবতার স্পর্শ আছে। সরলার সর্বনাশ সাধন করিবার জন্য সে ষড়যন্ত্রের বিস্তৃত ফাঁদ পাতিয়াছে, কিন্তু নিয়তির চক্রান্তে তাহাতে সরলার সর্বনাশ না হইয়া যাহার হিতার্থে সে এই ঘৃণিত কার্য করিয়াছিল, তাহারই সর্বনাশ হইয়াছে। মহামায়ার স্বার্থ ব্যতীত তাহার আর কোন লক্ষ্য ছিল না; এখানে সরলার সঙ্গে তাহার কোন ব্যক্তিগত স্বার্থের বিরোধ সৃষ্টি করিতে পারিলে তাহার ষড়যন্ত্রগুলি

অধিকতর কার্যকরী হইত। তথাপি এই খল-চরিত্রটির মধ্যে উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজিডি সৃষ্টি করিবার শক্তি ছিল বলিয়া অনুভূত হইবে।

সরলার চরিত্রের উপর দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটকের সরলতার এবং 'লীলাবতী' নাটকের লীলাবতী-চরিত্রের সুস্পষ্ট প্রভাব অনুভব করা যায়। ইহা আদর্শ চরিত্র, ইহার পরিকল্পনায় নাট্যকার কোন মৌলিক কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই।

শান্তবাবুর প্রথমা পত্নী মহামায়ার চরিত্রটির মধ্যে কোন কোন স্থানে বাস্তবতার স্পর্শ অনুভব করা যায়। সে নিঃসন্তানা বলিয়াই স্বামীকে পুনরায় বিবাহ করিবার জন্য মত দিতে বাধ্য হইয়াছে—সপত্নীর প্রতি তাহার মনোভাবটি তাহার এই একটি কথায় বড় সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে,—'আমিও মনে করি তারে মা'র পেটের ব'নের মতন ভালবাসি, কিন্তু তবু—কে জানে ছাই কি—তার মুখ দেখ্‌লে যেন বুক শুকিয়ে যায়।' সরলা সরলতার প্রতীক; তাহার চরিত্র-মাধুর্যের জন্য সকলেই তাহাকে ভালবাসে, কিন্তু মহামায়া তাহার সঙ্গে নিজের সম্পর্কের কথা স্মরণ করিবামাত্র শিহরিয়া উঠে। মহামায়ার এই চারিত্রিক দৌর্বল্যটির মধ্যে উচ্চাঙ্গ ট্র্যাজিডির বীজ ছিল।

কতকগুলি বিষয়ে 'প্রণয়-পরীক্ষা' নাটকের উপর দীনবন্ধুর প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। চরিত্র-সৃষ্টিতে এই প্রভাবের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। মনোমোহনের সাধারণ নীতিবোধ উন্নত হইলেও দুই একটি অশিষ্ট ইঙ্গিত এখানে তিনি দীনবন্ধুর নিকট হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে ননদ-ভাজের কথোপকথনের ভিতর দিয়া যে এক স্থানে শালীনতার অভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা পূর্ববর্তী প্রহসনকারদিগেরই প্রভাবের ফল। মনোমোহন কোন কোন স্থানে দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণে' ব্যবহৃত প্রবচনগুলি ব্যবহার করিয়াছেন; যেমন, মূলা ক্ষেত ও বেগুন ক্ষেতের তুলনা, কুঁদের মুখে বাঁক ইত্যাদি। 'নীলদর্পণে' এই প্রবচনগুলির ব্যবহার অত্যন্ত তাৎপর্যমূলক।

'প্রণয়-পরীক্ষা' নাটকের ভাষা সম্পর্কে এখন কিছু উল্লেখ করিব। ইহাতে দুই শ্রেণীর কথ্য ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে—এক শ্রেণী পুরুষ-চরিত্রের, অপর শ্রেণী স্ত্রী-চরিত্রের। পুরুষ-চরিত্রের ভাষা কতকটা সাধু প্রকৃতির হইলেও তাহা দীনবন্ধুর শিক্ষিত পুরুষ-চরিত্রের ভাষার মত এত আড়ষ্ট ও জটিল নহে—দীনবন্ধু হইতে মনোমোহনের ভাষা অনেকটা সরল হইয়া আসিয়াছে। বাংলা নাটকে মধ্যযুগের আদর্শ ভাষার সূচনা এখানেই দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রী-চরিত্রে

ভাষা কলিকাতা অঞ্চলের সাধারণ কথ্যভাষা হইলেও ইহা ইতর লোকের ভাষা নহে—ইহার মধ্য দিয়াই আদর্শ কথ্যভাষার জন্ম হইয়াছে। কোন কোন স্থলে মনোমোহন দীনবন্ধুর ভাষার অনুকরণ করিলেও এই বিষয়ে তাঁহার একটি স্বকীয়তাও ছিল। তাঁহার ভাষা একদিক দিয়া গ্রাম্যতা ও অপর দিক দিয়া পণ্ডিতীর বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সর্বপ্রথম আদর্শ নাট্যরচনার উপযোগিতা লাভ করিয়াছে।

মনোমোহন বসুর সর্বশেষ নাট্যরচনা 'আনন্দময় নাটক'। ইহা তাঁহার সর্বশেষ রচনা হইলেও ইহার মধ্যে তাঁহার পরিণত প্রতিভার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, বরং ইহার রচনার পূর্বেই তাঁহার প্রতিভা নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল বলিয়াই অনুভূত হইবে। ইহা সামাজিক নাটক হইলেও মুখ্য ভাবে কোন সামাজিক কুপ্রথার দোষ-কীর্তন ইহার উদ্দেশ্য নহে; ইহার মুখ্য উদ্দেশ্যটি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে না পারিলেও প্রাসঙ্গিক ভাবে ইহাতে মদ্যপানের কুফল, বাল্যবিবাহের দোষ, ব্রাহ্মধর্ম ও স্ত্রী-স্বাধীনতার নিন্দা ইত্যাদি সকল বিষয়েরই উল্লেখ করা হইয়াছে। নাটকের ভরত-বাক্যটি হইতে মনে হইতে পারে যে, ইহার রচনায় নাট্যকারের একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যও ছিল। ভরত-বাক্যটি এই প্রকার—'আমাদের এই ইতিহাস শুনে আজ অবধি বঙ্গ সমাজ যেন শিক্ষা পায় আর যেন কেউ কন্যা সন্তানের প্রতি অবজ্ঞা না করে, কন্যারত্ন আর পুত্ররত্ন উভয়কেই যেন সমদৃষ্টিতে দেখে, সমান যত্ন করে (৫।৫)।' কিন্তু নাট্যকাহিনীর ভিতর দিয়া এই বিষয়টি সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পায় নাই। ভরত-বাক্যে এই বিষয়টি এইভাবে উল্লিখিত না থাকিলে এই নাট্যরচনায় ইহাই যে নাট্যকারের উদ্দেশ্য ছিল, তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারা যাইত না। নাট্যকাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

আনন্দময় চৌধুরী হাঁসপুরের জমিদার। তাঁহার 'সর্বাধ্যক্ষে'র নাম কান্তচন্দ্র। কান্তচন্দ্র অত্যন্ত ধূর্ত, সে সরল-প্রকৃতির মনিবের সমস্ত সম্পত্তি করায়ত্ত করিয়া তাহার সকল স্বত্ব নিজে অধিকার করিয়া লইতে চাহিল: এই উদ্দেশ্যে মিথ্যা এক খুনের কথা তুলিয়া মনিবের যুবা পুত্র ভূষণকে দেশত্যাগী করাইল, ভূষণের একমাত্র শিশুপুত্র অপহৃত হইল, স্ত্রী পতিপুত্রের শোকে মৃত্যু বরণ করিল; বৃদ্ধা মাতাও পুত্রের শোকে প্রাণত্যাগ করিলেন। পুলিশের ভয়ে ভূষণ কানপুরে আত্মগোপন করিয়া রহিল। কিছুদিন পর সেখানেই পুনরায় বিবাহ করিল, তাহার ললিত নামক এক পুত্র জন্মিল, পুনরায় স্ত্রী যখন পূর্ণ

গর্ভবতী তখন পিতার অসুখের সংবাদ জানিয়া নৌকাপথে স্ত্রীপুত্র লইয়া দেশে রওয়ানা হইল। পথিমধ্যে কান্তচন্দ্র কর্তৃক নিযুক্ত একদল ডাকাত তাহাদের নৌকা ডুবাইয়া দিল। তিন জন তিন দিকে ভাসিয়া গেল। ভূষণের পত্নী কিরণশশী কান্তবাবুর ঘাটে আসিয়া উঠিল। কান্তবাবুর স্ত্রী কল্যাণী তাহাকে তাঁহার নিজের গৃহে তুলিয়া লইলেন, তিনিও সেই সময় পূর্ণ গর্ভবতী ছিলেন; কান্তবাবুর পাঁচ কন্যা, পুনরায় কন্যাসন্তান প্রসব করিলে তিনি পত্নীকে বিতাড়িত করিয়া দিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। প্রায় একই সময় কিরণশশী এক পুত্র এবং কল্যাণী পুনরায় এক কন্যাসন্তান প্রসব করিলেন। কান্তবাবুর তিরস্কারের ভয়ে কল্যাণী নিজের কন্যাসন্তানটি কিরণকে দিয়া তাহার পুত্রসন্তানটি নিজে গ্রহণ করিলেন। উভয়েই তাঁহার গৃহে মানুষ হইতে লাগিল; বালকের নাম হইল নির্মল এবং বালিকার নাম হইল নির্মলা। নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের জন্য চিন্তা করিতে করিতে আনন্দবাবু অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। এদিকে ভূষণ ব্রহ্মচারীর বেশে গয়াতীর্থে বাস করিতেছিলেন, সেখানে তাঁহার পিতার একজন বিশ্বস্ত কর্মচারীর মুখে কান্তবাবুর সকল ষড়যন্ত্রের কথা জানিতে পারিয়া দেশে ফিরিতে মনস্থ করিলেন। তাঁহার পুত্র ললিতও রক্ষা পাইয়াছিল, সে কলিকাতায় লেখাপড়া করিতে গিয়া মাতা এবং ভ্রাতার সঙ্গে মিলিত হইল। পিতাও কিছুদিনের মধ্যে আসিয়া তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইলেন, তাঁহার প্রথম পক্ষের নিরুদ্দিষ্ট সন্তানেরও সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। অতঃপর নানা বাধাবিঘ্ন উত্তীর্ণ হইয়া সকলে মিলিয়া গিয়া আনন্দবাবুর সঙ্গে মিলিত হইলেন। কান্তবাবুকে কোন দণ্ড না দিয়া আনন্দবাবু তাঁহার সপত্নীক কাশীবাসের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

ইহা মনোমোহনের পূর্ববর্তী সামাজিক নাটকখানির মত মিলনান্তক হইলেও ইহা সংস্কৃত নাটকানুযায়ী প্রস্তাবনা-নান্দী-সূত্রধার-নট-নটী-বর্জিত। ইহা প্রকাশিত হইবার পূর্বেই গিরিশচন্দ্রের কয়েকখানি প্রসিদ্ধ সামাজিক নাটক কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়া গিয়াছে, তাহা সত্ত্বেও ইহাতে গিরিশচন্দ্রের কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব অনুভব করা যায় না, বরং কোন কোন অংশে দীনবন্ধুর প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

এই নাটকের সর্বপ্রধান ত্রুটি ইহার কাহিনী। এই ত্রুটির জন্যই ইহার চরিত্রসৃষ্টিও কোন দিক দিয়া সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই। উপরি-উদ্ধৃত ভরত-বাক্যটি হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, নাট্যকার একটি বিশেষ সামাজিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়াই ইহার রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু রচনার দোষে

তাঁহার বক্তব্য বিষয়টি অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া ইহা নাট্যকারের উদ্দেশ্যও সার্থক করিতে পারে নাই। অতএব সকল দিক দিয়াই ইহা মনোমোহনের একখানি ব্যর্থ রচনা।

ইহা অতিরিক্ত ঘটনা-ভারাক্রান্ত বলিয়া বোধ হইলেও ইহার অধিকাংশ ঘটনাই নেপথ্যে ঘটিয়াছে এবং তাহা কেবল মাত্র বিভিন্ন চরিত্রের মৌখিক বর্ণনার ভিতর দিয়াই দর্শকের সম্মুখে পরিবেশন করা হইয়াছে, সেইজন্য ইহাতে অভিনয়ের অনুপযোগী সুদীর্ঘ স্বগতোক্তি এবং সংলাপের আশ্রয় লইতে হইয়াছে। যে সকল ঘটনার জের টানিয়া ইহার কাহিনী অগ্রসর হইয়াছে, তাহা সমস্তই নাট্যকাহিনী সূত্রপাতের পূর্বেই, এমন কি, কোন কোন ঘটনা তাহার বহু পূর্বেই সংঘটিত হইয়াছে; অতএব ইহাদের ক্রিয়া কার্যকরী বলিয়া বোধ হইতে পারে না। ঘটনার অসম্ভাব্যতা এবং চরিত্রগুলির অস্বাভাবিকতার কথা বাদ দিলেও ইহার বিচিত্র ঘটনারাশি যে জটিল ব্যূহ রচনা করিয়া রাখিয়াছে, তাহা ভেদ করিয়া ইহার ভিতরে প্রবেশ করা এক প্রকার দুরূহ বলিয়া বোধ হইবে।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, নাটকখানির উপর দীনবন্ধুর প্রভাব কোন কোন স্থানে অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কাহিনী-পরিকল্পনার মধ্যেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। দীনবন্ধুর 'লীলাবতী' নাটকখানির কাহিনীগত প্রভাব ইহার উপর অত্যন্ত স্পষ্ট তাহাতে জমিদার হরবিলাসের নিরুদ্দিষ্ট পুত্র অরবিন্দকে কেন্দ্র করিয়াই যেমন কাহিনী পরিকল্পিত হইয়াছে, ইহাতেও তেমন জমিদার আনন্দ-বাবুর নিরুদ্দিষ্ট পুত্র ভূষণের বৃত্তান্তকে কেন্দ্র করিয়াই কাহিনী পরিকল্পিত হইয়াছে। দীনবন্ধুই দীর্ঘকাল-নিরুদ্দিষ্ট চরিত্রের আকস্মিক পুনরাবির্ভাবের রোমান্টিক বৃত্তান্ত লইয়া বাংলায় নাটক রচনার সূত্রপাত করিয়াছিলেন; মনোমোহনের এই নাটকখানির ভিতর দিয়া তাহারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় মাত্র। কিন্তু নিরুদ্দিষ্ট চরিত্রের সংখ্যা দীনবন্ধুর নাটকের মত ইহাতে একটি কিংবা দুইটি নহে, বরং বহু। ইহাতে এই বহুসংখ্যক চরিত্রের সুদীর্ঘ নিরুদ্দেশ-জীবনের প্রায় সর্বত্রই অত্যন্ত আকস্মিকভাবে সমাপ্তি ঘটিয়াছে। এইজন্য ইহার রসসৃষ্টি একেবারেই ব্যর্থ হইয়াছে।

এই নাটকের মধ্যে কয়েকটি মুসলমান রাইয়তের চরিত্র আছে—মনোমোহন তাহাদের চিত্র অঙ্কিত করিবার কালে দীনবন্ধু-রচিত 'নীলদর্পণ' নাটকের চারিটি রাইয়ৎ চরিত্র সম্মুখে স্থাপন করিয়া লইয়াছিলেন। তাহাদের উক্তিগুলির মধ্যে

নীলকর কর্তৃক অত্যাচারিত তোরাপের কণ্ঠস্বরই যেন শুনিতে পাইতেছি,—'আমিন সুমুন্দির গুতোয় পাঁজরা ভাঙি যাচ্ছে। তার উপর হেই নয়া মাচটের চাপানে ঘাড়্ দোমড়াতে চায়! মোগার কি নাংলা গরুর ঘাড় করতা (২।৩)?' এই ভাষা ব্যবহার করিবার প্রতি মনোমোহনের যে কোন আন্তরিক প্রেরণা ছিল, তাহা নহে -সমসাময়িক নাট্যসাহিত্য হইতেও অনুরূপ ভাষার ব্যবহার লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তবে ইহা একান্তভাবেই দীনবন্ধুর অনুকরণ-জাত। ভাষার দিক দিয়া বরং মনোমোহন তাঁহার পূর্ববর্তী সামাজিক নাটকখানিতে যে যুগচৈতন্যের পরিচয় দিয়াছেন, ইহার মধ্যে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। নিঃশেষিত প্রতিভার যুগে ইহা রচিত হইয়াছে বলিয়া ইহার মধ্য দিয়া মনোমোহনের কোন মৌলিক কৃতিত্বই প্রকাশ পাইতে পারে নাই।

ইহার কাহিনীর আর একটি প্রধান ত্রুটি হইল এই যে, ইহা যখন একটি সুনির্দিষ্ট পথ ধরিয়া নিশ্চিত পরিণতির সম্মুখীন হইয়াছে, সেই সময়ই ইহার মধ্যে আর একটি ঘটনা যোগ করিয়া ইহার এই পরিণতি অনাবশ্যক বিলম্বিত করা হইয়াছে। যখন ভূষণবাবু পত্নীপুত্রের সঙ্গে মিলিত হইয়া সকলকে সঙ্গে লইয়া পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন, তখন পথিমধ্যে কান্তচন্দ্রের চক্রান্তে এক মিথ্যা অপরাধের দায়ে তাঁহার এক পুত্রকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিল—তারপর এক অলৌকিক চরিত্রের সাহায্যে তাহার মুক্তি সাধিত হইলে কাহিনীর অভিলষিত পরিণতির আর কোন বাধা রহিল না। ইহাতেই মনে হইবে, নাট্যকাহিনী-সম্পর্কিত মনোমোহনের যথার্থ কোন শিল্পবোধ ছিল না—তাহা হইলে অন্ততঃ তাঁহার এই ত্রুটি প্রকাশ পাইত না।

মনোমোহনের পূর্ববর্তী সামাজিক নাটকখানির কাহিনীর একটি প্রধান গুণ এই ছিল যে, ইহার ঘটনা-কাল অত্যন্ত পরিমিত ছিল—কিন্তু ইহার বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে সুদীর্ঘ সময়ের ব্যবধান রহিয়াছে—এইজন্যও ইহার কাহিনীর রস নিবিড় হইয়া উঠিতে পারে নাই।

ইহার মধ্যে দুইটি চরিত্রই একটু সজীব বলিয়া অনুভূত হয়—একটি কান্তচন্দ্রের ও অপরটি রাধু সরকারের; এতদ্ব্যতীত আর সকল স্ত্রী-পুরুষ চরিত্রই একান্ত নির্জীব বলিয়া অনুভূত হইবে। কান্তচন্দ্র ইহার খল (villain) চরিত্র, রাধু তাহার সহচর। যদিও মনোমোহন একখানিও বিয়োগান্তক সামাজিক নাটক রচনা করেন নাই, তথাপি তাঁহার দুইখানি সামাজিক নাটকেই বিয়োগান্তক নাটকের অনুরূপ খল-চরিত্রের স্থান দিয়াছেন—অতএব যে কাহিনী-

যারা ট্র্যাজিডি হওয়াই স্বাভাবিক ছিল, তাহা দ্বারাই তিনি কমেডির সৃষ্টি করিয়াছেন; ইহার ফলাফলও যাহা হইবার, তাহাই হইয়াছে। ইহার অন্যতম পূর্ণাঙ্গ আদর্শমুখী চরিত্র ভৈরবী যাত্রা বা গীতাভিনয়ের প্রভাব-জাত বলিয়া অনুভূত হইবে। ইহার রাজেশ্বরের চরিত্রটিও অনুরূপ প্রভাবেরই ফল। উপরের আলোচনা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, মনোমোহনের সামাজিক নাটক রচনার কোন প্রতিভা ছিল না, তাঁহার প্রতিভা গীতাভিনয় রচনার বা প্রাচীন যাত্রাগুলিতে নূতন রূপ দিবারই প্রতিভা; সমসাময়িক সামাজিক নাটকসমূহের প্রভাবের বশবর্তী হইয়া তিনি এই শ্রেণীর নাটক রচনায় হস্তক্ষেপ করিলেও ইহাদের উপর তাঁহার প্রতিভানুযায়ী যাত্রার বৈশিষ্ট্যই আরোপ করিয়াছেন— ইহাদের অন্তর্নিহিত নিজস্ব কোন বৈশিষ্ট্যের তিনি সন্ধান পান নাই। সেইজন্যই পরবর্তী নাট্যকারদিগের উপর তাঁহার প্রভাব কার্যকরী হইতে পারে নাই।

ব্রাহ্মসমাজকে আক্রমণ করিয়া মনোমোহন 'নাগাশ্রমের অভিনয়' নামক একখানি প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন। নাট্যকারের ব্যক্তিগত মনোভাব অতিক্রম করিয়া কোনদিক দিয়াই ইহা রসোত্তীর্ণ হইতে পারে নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(১৮৭২—১৯০০)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলা নাটক রচনার মধ্যযুগে বাস্তব জগৎ ও প্রত্যক্ষ জীবন পরিত্যাগ করিয়া ইহার মধ্যে যে আদর্শবাদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার একজন প্রথম পূজারী। কোন মৌলিক প্রতিভার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন নাই, প্রত্যক্ষ জীবনের প্রতি তাঁহার কোন সুগভীর সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায় না, কিংবা তাঁহার জীবন-বোধ ব্যক্তি-অথবা সমাজ-জীবনের সুগভীর স্তরও স্পর্শ করিতে পারে নাই—অনুকরণ ও অনুবাদই তাঁহার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল; এই দুইটি বৈশিষ্ট্যদ্বারাই তিনি বাংলা নাট্যসাহিত্যের আদিযুগের সঙ্গে মধ্যযুগের সেতু রচনা করিয়াছেন।

পূর্ববর্তী যুগের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কোন্ কোন্ বিষয়ে পার্থক্য ছিল, তাহা প্রথমেই এখানে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা প্রয়োজন; কারণ, অনেকেই তাঁহাকে প্রথম যুগেরই প্রতিনিধি বলিয়া ভুল করিয়াছেন। এই ভুলের একটি প্রধান কারণ এই যে, তিনি বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রথম যুগের অন্যতম প্রধান একটি বৈশিষ্ট্য একান্তভাবে আশ্রয় করিয়াছিলেন—তাহা অনুবাদ। পূর্বেই বলিয়াছি, মধ্যযুগের নাট্যসাহিত্যে অনুবাদের প্রবণতা বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়া গিয়াছিল, অথচ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রায় ৩৩খানি নাটকের মধ্যে প্রায় সব কয়খানিই অনুবাদ। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, মধ্যযুগের প্রথমভাগে আবির্ভূত হইবার ফলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পূর্ববর্তী যুগের প্রভাব সম্পূর্ণ অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন নাই; বিশেষত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মধ্যে মৌলিক প্রতিভার প্রেরণা ছিল না; সেইজন্য অনুবাদই তাঁহাকে একান্তভাবে আশ্রয় করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহার মধ্যে পূর্ববর্তী যুগের জীবনবোধ এবং সমাজ-চৈতন্যের একান্তই অভাব ছিল। রামনারায়ণ নিজেও কয়েকখানি সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদ রচনা করিলেও তাঁহার সামাজিক প্রহসনগুলির ভিতর দিয়া তাঁহার যে সুগভীর জীবন-বোধ ও ব্যাপক সমাজ-দৃষ্টির পরিচয়

পাওয়া গিয়াছে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মধ্যে তাহাদের একান্তই অভাব ছিল। ত্রিশখানির অধিক বাংলা নাটক রচনা করিলেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাংলার সামাজিক জীবনের বৃহত্তর পটভূমিকায় একখানি নাটকও রচনা করেন নাই—তাঁহার প্রহসনগুলির সঙ্গেও বাংলার বাস্তব সমাজ জীবনের কোন প্রত্যক্ষ যোগ নাই। অথচ আদিযুগের রামনারায়ণ-মধুসূদন-দীনবন্ধু ইঁহাদের প্রত্যেকেরই সমাজ কিংবা জীবন সম্পর্কে এক একটি বিশিষ্ট চৈতন্য তাঁহাদের রচনার ভিতর দিয়া রসরূপ লাভ করিয়াছে। বাস্তব সমাজ ও প্রত্যক্ষ জীবন সম্পর্কে ইঁহাদের প্রত্যেকেরই এক একটি বিশিষ্ট ও সুস্পষ্ট বক্তব্য ছিল—জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের তাহা ছিল না। তাহার পরিবর্তে একটি আদর্শ স্বপ্নলোকই তিনি তাঁহার কল্পনার বিহারক্ষেত্র করিয়া লইয়াছিলেন—ইহাই মধ্যযুগের একটি বিশিষ্ট ধর্ম ছিল। এই যুগের নাট্যসাহিত্যে বাংলার প্রত্যক্ষ সমাজ-জীবন গৌণ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার পরিবর্তে কতকগুলি আদর্শই মুখ্য হইয়া উঠিয়াছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একান্তভাবে এই আদর্শবাদেরই সেবক ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যযুগেরই প্রতিনিধি বলিয়া নির্দেশ করিতে হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র যেমন তাঁহার 'আনন্দ-মঠে'র ভিতর দিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর এক নিরক্ষর লুণ্ঠনকারী পশ্চিমা দস্যুদলের মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর নবোদ্ভূত দেশাত্মবোধের পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন, ইহার পূর্বেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই বিষয়ে আরও বহুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে অখণ্ড ভারত অবলম্বন করিয়া দেশাত্মবোধের যে নবজাগরণ বাংলা দেশে জন্ম-লাভ করিয়াছিল, তাহার পরিচয় প্রকাশ করিবার জন্য তিনি খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের আলেকজাণ্ডার কর্তৃক ভারত আক্রমণের বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়াছিলেন। একমাত্র আদর্শকেই জয়মাল্য দিয়া বরণ করিয়া লইবার আগ্রহে বাস্তবতার দায়িত্বকে যে কতদূর অস্বীকার করা যাইতে পারে, ইহা তাহার একটি বিশিষ্ট প্রমাণ।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যকার-জীবনের সূত্রপাত হইবার মাত্র পাঁচ বৎসর পূর্বেই ভারতীয় হিন্দু জাতীয়তাবাদের অগ্রদূত সুপ্রসিদ্ধ হিন্দুমেলার অনুষ্ঠান হয়। নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালী যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহার প্রভাব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল। এই সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার জীবন-স্মৃতিতে উল্লেখ করিয়াছেন, 'হিন্দুমেলার পর হইতে কেবলই আমার মনে হইত—কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশ-প্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে

স্থির করিলাম, নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্ব-গাথা ও ভারতের গৌরব-কাহিনী কীর্তন করিলে হয়ত কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতে পারে।' এই উদ্দেশ্যেই তিনি নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং প্রথম কয়েকখানি নাটক রচনা করিলেন। কিন্তু ইহাদের কতকগুলি ক্রটিও অপরিহার্য হইয়া উঠিল। কারণ, প্রাচীন ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু নাট্যকারের সমসাময়িক একটি বিশিষ্ট ভাবের বাহন করিবার ফলে নাটকের ঐতিহাসিকত্ব যেমন বিনষ্ট হইল, তেমনই ইহাদের মধ্যে একটি অখণ্ড রস নিবিড় হইয়া উঠিতে পারিল না। কারণ, প্রাচীন গ্রীসের পান-পাত্রে আধুনিক সোডা-লিমোনেড্ পরিবেশন করা যাইতে পারে না। আলেক্জাণ্ডারের ভারত আক্রমণের কালে উনবিংশ শতাব্দীর অখণ্ড ভারত সম্পর্কিত হিন্দু জাতীয়তাবোধের অস্তিত্ব ছিল না; সেইজন্য এই বিষয় অবলম্বন করিয়া নাটক রচিত হইলে ইহার চরিত্রসমূহ বিকৃত না করিয়া এই ভাব কিছুতেই প্রকাশ করা যাইতে পারে না। তদুপরি ঘটনাসমূহ ইতিহাসের পথে অগ্রসর হইতে বাধা পায়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, এই শ্রেণীর নাটক ঐতিহাসিক নাটক হইতে পারে না; যাহা হয়, তাহার রোমাণ্টিক নাটক বলিয়া পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক বীরত্ব-গাথা কীর্তন করিবার নামে এই প্রকার কয়েকখানি রোমাণ্টিক নাটক মাত্র রচনা করিয়াছেন।

কিন্তু আনুপূর্বিক রোমাণ্টিক নাটক এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই রোমাণ্টিক নাটকেও পার্থক্য আছে। আনুপূর্বিক রোমাণ্টিক নাটকের মধ্যে নাট্যকার যে স্বাধীনতা গ্রহণ করিতে পারেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার এই শ্রেণীর কয়েকখানি নাটকে তাহা গ্রহণ করিতে পারেন নাই; কারণ, ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু অবলম্বন করিবার ফলে ঐতিহাসিক ঘটনার মূল ধারা তাঁহার পক্ষে পরিত্যাগ করা সম্ভব হয় নাই। অতএব একদিক দিয়া ইতিহাস এবং অপর দিক দিয়া একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক চৈতন্য ইহাদের উভয়ের মধ্যে পড়িয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর নাটকগুলির যথার্থ রসস্ফূর্তি সম্ভব হয় নাই। বিশেষত ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি তাঁহার বিশিষ্ট মতবাদ বা ভাব-প্রকাশের বাহন হিসাবে ব্যবহার করিবার জন্য অনেক সময়ই ইহাদের পূর্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা পায় নাই, তাহার ফলে চরিত্র-সৃষ্টির মধ্যেও ক্রটি দেখা দিয়াছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি হইতে উপরে যে অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, উনবিংশ শতাব্দীর নবপ্রবুদ্ধ দেশাত্ম-বোধের চৈতন্য প্রকাশ করিবার জন্যই তিনি ভারতের প্রাচীন ইতিহাস অবলম্বন

করিয়া নাট্যরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—একটি বিশিষ্ট ভাব প্রকাশ করাই ছিল তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য, ইতিহাস কিংবা নাট্যশিল্পের মর্যাদা রক্ষা তাঁহার মুখ্য অভিপ্রায় ছিল না। তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকগুলি একটি আধুনিক ভাব-প্রকাশেরই বাহন হইয়াছে মাত্র, বস্তুনিষ্ঠা এবং ঐতিহাসিক তথ্য-পরিবেশনের দিক দিয়া ইহাদের প্রায় কোন মূল্যই নাই

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যরচনাকে প্রধানত চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—ঐতিহাসিক বিষয়াশ্রিত নাটক, গীতিনাটক, প্রহসন এবং অনুবাদ। তিনি চারিখানি ইতিহাস-বিষয়াশ্রিত নাটক রচনা করেন এবং ইহাদের মধ্যেই তাঁহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, তাঁহার তথাকথিত ঐতিহাসিক নাটকগুলি রোমান্টিক লক্ষণাক্রান্ত; অতএব ইহাদিগকে ঐতিহাসিক নাটক না বলিয়া রোমান্টিক নাটক বলিয়া উল্লেখ করাই কর্তব্য। এই চারিখানি নাটকের মধ্যে তিনি খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের বিবরণ হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলার মধ্য-যুগের ইতিহাসোক্ত বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরাম রায়ের বৃত্তান্ত পর্যন্ত গ্রহণ করিয়াছেন। মধুসূদন প্রবর্তিত ধারা অনুসরণ করিয়া রাজস্থানের কাহিনী অবলম্বন করিয়াও তিনি দুইখানি নাটক রচনা করিয়াছেন। তাঁহার তিনখানি নাটকের মধ্যে দেশাত্মবোধ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যে দুই পরস্পর-বিরোধী শক্তি তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা হিন্দু এবং মুসলমান। কিন্তু হিন্দু এবং মুসলমান একই দেশের সন্তান, সেইজন্য তাহাদের বিরোধের ভিতর দিয়া দেশাত্মবোধের পরিবর্তে অনেক সময় সাম্প্রদায়িক স্বার্থদ্বন্দ্বেরই পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠার যুগে যে জাতীয়তা প্রসার লাভ করিয়াছিল, তাহা প্রকৃত-পক্ষে হিন্দু জাতীয়তা; এই হিন্দু নবজাগৃতির ভাব ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের বাঙ্গালী হিন্দুর সমগ্র চিন্তার জগৎ আশ্রয় করিয়াছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই নাটক কয়খানির ভিতর দিয়া ইহারই সর্বপ্রথম অভিব্যক্তি দেখা গিয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কোন সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি ছিল এমন কথা বলিতে পারা যায় না। নবজাগ্রত এই হিন্দুজাতীয়তার ভাবটি অন্য কোন উপায়ে প্রকাশ করার কৌশল তাঁহার আয়ত্ত ছিল না বলিয়াই মধ্যযুগের হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক বিরোধ অবলম্বন করিয়াই তিনি তাহা প্রকাশ করিতে যথাসম্ভব হইয়াছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য, তাঁহার তথাকথিত এই সকল ভাবার পঙ্কপাত নাটক একখানিও মৌলিক রচনা নহে, ইহারা অনুবাদ মাত্র।

ঐতিহাসিক নাটকগুলির পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গীতি-নাটক কয়খানির কথা উল্লেখ করিতে হয়। তিনি তিনখানি ক্ষুদ্রাকৃতি গীতিনাটিকা রচনা করেন, কিন্তু ইহাদের মধ্য দিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজস্ব কোন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রথম গীতি-নাটকখানি রচিত হইবার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথের গীতি-নাটক রচনার যুগের সূত্রপাত হয়। তিনি প্রত্যক্ষভাবে তাহা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ইহাদের রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ইহার গীতি-অংশ আনুপূর্বিক রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক রচিত। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতগুলি ইহাদের মধ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়াই ইহাদের মূল্য প্রকাশ পাইয়াছে; কাহিনী-অংশেও রবীন্দ্রনাথের গীতিনাটকগুলির প্রভাব ইহাদের মধ্যে অত্যন্ত প্রকট। অতএব ইহাদের মধ্যে যাহার শিল্পকীর্তি সমুজ্জ্বল হইয়া আছে, তিনি রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নহেন। সুতরাং ইহাদের মধ্য হইতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কোন পরিচয় পাইবার উপায় নাই।

একখানি প্রহসন রচনার ভিতর দিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যকার-জীবনের সূত্রপাত হইলেও, প্রহসন-রচনার প্রেরণাও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মৌলিক বা নিজস্ব ছিল না। পূর্ববর্তী যুগের প্রহসন রচনার ধারাটি অনুসরণ করিয়াই তিনি তাঁহার যুগে প্রহসন রচনায় প্রবৃত্ত হন, কিন্তু পূর্ববর্তী যুগের প্রহসন-রচয়িতাদিগের জীবন-দৃষ্টি এবং শিল্পবোধ তাঁহার ছিল না বলিয়াই তাঁহার রচিত প্রহসন কয়খানি নিতান্ত প্রাণহীন বলিয়া বোধ হইবে। বাংলার সামাজিক জীবনের যে একটি বৃহত্তর বাস্তব ক্ষেত্র আছে, তাহা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিকট অপরিচিত ছিল; সেইজন্য তাঁহার কোন প্রহসনের মধ্যেই কোন সমাজ- এবং জীবন-জিজ্ঞাসা নাই। ইহারা তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের উপরিভাগে ভাসমান স্বল্পায়ু ফেনপুঞ্জের মত— তরঙ্গের উপরেই ইহাদের জন্ম, তরঙ্গের উপরেই ইহাদের লয়—সমুদ্রের সুগভীর তলদেশে যে অনন্ত রত্নসম্ভার আছে, ইহারা তাহার সন্ধানও জানে না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রহসন কয়খানিও সমাজের সুগভীর তলদেশের কোন সন্ধান রাখে নাই, ইহারা উপরিভাগেই শুভ্রহাস্যের ফেনঃপুঞ্জ বিস্তার করে মাত্র।

বাংলার সমাজ-জীবনের বৈচিত্র্যের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না বলিয়া, তিনি যে কয়খানি মাত্র প্রহসন রচনা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে বৈচিত্র্য কিংবা মৌলিকতা কিছুই দেখাইতে পারেন নাই; এমন কি মাত্র দুইখানি মৌলিক প্রহসন রচনা করিবার পরই তাঁহাকে অনুবাদের উপর অবলম্বন করিয়া আরও দুই তিনখানি প্রহসন রচনা করিতে হয়। এমন

মৌলিক রচনা দুইখানিও পূর্ববর্তী নাট্যকার দীনবন্ধুর অনুকরণে রচিত; কিন্তু দীনবন্ধুর অনুকরণ করিতে গিয়াও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দোষটুকুই অনুকরণ করিয়াছেন, গুণটুকুর অনুকরণ করিতে পারেন নাই।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রায় সকল রচনাই অনুবাদ। তিনি সংস্কৃতের প্রায় সকল নাটকই বাংলায় অনুবাদ করিয়াছেন, তদুপরি ফরাসী ভাষা হইতে নাটক এবং কয়েকখানি প্রহসনেরও অনুবাদ করিয়াছেন। ইংরেজী নাটকও একখানি অনুবাদ করিয়াছেন; শেষ জীবনে তিনি কেবলমাত্র অনুবাদের কার্যেই আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। একান্তভাবে প্রাচীন সংস্কৃত ও বৈদেশিক ভাষা হইতে অনুবাদ করিবার ফলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দৃষ্টি কোনদিনই বাংলার নিজস্ব জলবায়ুর মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে নাই। বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যযুগে নিজস্ব জলবায়ুর বাস্তব পরিবেশ উপেক্ষা করিবার যে প্রবণতা দেখা দিয়াছিল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মধ্যে তাহার প্রথম উল্লেখযোগ্য পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। একান্তভাবে জাতির প্রত্যক্ষ ও বাস্তব জীবন উপেক্ষা করিয়া কোন নাট্যকারই যে কোন দিক দিয়াই সাফল্য লাভ করিতে পারেন না, জ্যোতি-রিন্দ্রনাথ তাহার প্রমাণ। তাঁহার নাটক বাংলা নাট্যসাহিত্যের ঐতিহাসিকদের অনুসন্ধানের বিষয় হইলেও সাধারণ পাঠকের নিকট কিংবা প্রত্যক্ষ অভিনয়ের ক্ষেত্রেও মূল্যহীন হইয়াছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রুচি ও ভাষার দিক দিয়া পূর্ববর্তী যুগের নাট্যকার হইতে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিলেন। ইহাও বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যযুগেরই একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। ঠাকুর-পরিবারের উন্নত রুচিবোধ তাঁহার নাটক ও প্রহসন কয়খানির রচনায় নিয়োজিত হইলেও তখনও দীনবন্ধুর প্রভাব এতই প্রবল ছিল যে, তাঁহাকে অন্ততঃ তাঁহার প্রথম প্রহসনখানির মধ্যে তাহা কতকাংশে স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছিল; কিন্তু পরে তিনি সহজেই সেই প্রভাব কাটাইতে পারিয়াছিলেন। বিশেষতঃ দীনবন্ধুর মত তাঁহার বাঙালীর বাস্তব বা গ্রাম্যজীবন ভিত্তি ছিল না বলিয়া, এই বিষয়ে তিনি সহজেই স্বাধীন আদর্শ অনুসরণ করিবারও সুযোগ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যদিও সংস্কৃত নাটকের অনুবাদই অধিক করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার ভাষা কদাচ সংস্কৃত-ঘেঁষা কিংবা পণ্ডিতী বাংলা ছিল না। তিনি যথাসম্ভব সহজ ও সরল ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি আলালী ভাষার পক্ষপাতী ছিলেন না—কদাচ তিনি তাহা ব্যবহার করেন নাই। যদিও

পূর্ববর্তী যুগে রামনারায়ণ-মাইকেল-দীনবন্ধু এক শ্রেণীর চরিত্রে আলালী ভাষার ব্যাপক প্রয়োগ করিয়াছেন, তথাপি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহাদের সে পথ পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহাও বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যযুগেরই একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, এই যুগের নাটকে আলালী ভাষার প্রয়োগ অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র আলালী ও পণ্ডিতী বাংলার মধ্যগা যে ভাষা আদর্শ ভাষা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভাষা সেই ভাষা। সংস্কৃতের ব্যাপক অনুশীলনের ফলে তিনি যে সংস্কৃত শব্দসম্পদের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অনুবাদ-রচনায় ব্যবহার করিয়া বাংলা ভাষাকে সেই যুগে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার সাধনার একটি বিশিষ্ট দান। কিন্তু তাঁহার ভাষার সহজাত প্রাণশক্তি ছিল না, রামনারায়ণ-দীনবন্ধু, এমন কি মধুসূদন-মনোমোহনও তাঁহাদের রচনায় যে প্রবাদ-প্রবচন ও শব্দশৈলীর ব্যবহার করিয়াছেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনায় ইহার একান্ত অভাব ছিল ; সেইজন্য তাঁহার ভাষা নিষ্প্রাণ ও কৃত্রিম বলিয়া বোধ হয়। বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যযুগে এই ভাষাই প্রায় সকলের আদর্শ হইয়াছিল।

ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া অখণ্ড ভারতীয় দেশাত্মবোধমূলক যে কয়খানি নাটক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রচনা করেন, তাহাদের মধ্যে 'পুরু-বিক্রম নাটক অন্যতম। গ্রীক দেশীয় দিগ্বিজয়ী বীর সেকেন্দর শাহর ভারত আক্রমণ ও পাঞ্জাব দেশীয় নরপতি পুরুর সহিত তাঁহার যুদ্ধের কাহিনী লইয়া ইহা রচিত। রাজা পুরুর বিক্রম ব্যতীতও ইহার মধ্যে কুলু প্রদেশের রাণী ঐলবিলার সহিত পুরুর প্রেম, ঐলবিলার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী পাঞ্জাবের অন্যতম রাজা তক্ষশীলের সেকেন্দর শাহর নিকট আত্মসমর্পণ, তক্ষশীলের ভগিনী অম্বালিকার সঙ্গে সেকেন্দর শাহর প্রেম ইত্যাদির কাহিনীও ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে দেশাত্মবোধ ইহার লক্ষ্য হইলেও প্রেমভাব ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়া গিয়াছে। সেইজন্য ইহাতে নাট্যকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধিলাভ করিতে পারে নাই। যদিও সেকেন্দর শাহর ভারত আক্রমণের সময় অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হয় নাই, তথাপি ইহাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে উদ্ভূত ভারতীয় নূতন জাতীয়তাবোধের বাহন করা হইয়াছে। বক্তৃতায় ও সঙ্গীতে এই ভাবটি প্রকাশ করা হইয়াছে—

মিলে সবে ভারত-সন্তান একতান মনপ্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান
ভারতভূমির তুল্য আছে কোন স্থান
কোন অদ্রি হিমাদ্রি সমান।—ইত্যাদি

কিন্তু তথাপি পুরুকে তাঁহার পাঞ্জাবের স্বরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া যখন সেকেন্দর শাহ পূর্ব ভারতের গঙ্গাতীরবর্তী দেশগুলি জয় করিবার অভিপ্রায় জানাইলেন, তখন পুরু আর তাঁহার সে কার্যে বাধা দিয়া অখণ্ড ভারতের স্বাধীন গৌরব রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইলেন না। তিনি প্রণয়িনীর সঙ্গে মিলিত হইয়া স্বরাজ্যে শান্তিতে বাস করিতে লাগিলেন।

নাটকটি বিয়োগান্তক। ইহার মধ্যে কাহিনীর কোন জটিলতা নাই, কিংবা চরিত্রের কোন ক্রমবিকাশ নাই; যথার্থ নাট্যরচনার কোন কৌশল ইহাতে প্রদর্শিত হইতে পারে নাই। ইহার সংলাপ অনাবশ্যক দীর্ঘ ও পুনরুক্তি-দোষ-দুষ্ট, বীরত্ব শূন্যগর্ভ বক্তৃতায় পর্যবসিত। রক্তমাংসের চরিত্র ইহাতে প্রায় নাই বলিলেই চলে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখকগণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পুরুবিক্রম নাটকখানিকে তাঁহার অন্যতম মৌলিক রচনা বলিয়াই জানিতেন। ইহার প্রধান কারণ, তাঁহার অন্যান্য অনুবাদ নাটকের ক্ষেত্রে তিনি যেমন তাহা অনুবাদ বলিয়া নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন, এই নাটকখানির বিষয় তেমন কিছুই করেন নাই। বরং এই বিষয়ে তিনি তাঁহার আত্মজীবনীর মধ্যে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে কতকটা বিভ্রান্তিরও সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি তাহাতে ইহার সম্পর্কে লিখিয়াছেন, '....আমি "পুরুবিক্রম" নাটকখানি রচনা করিয়া ফেলিলাম। লিখিয়াই গুণুদাদাকে বইখানি আদ্যোপান্ত শুনাইলাম। তাঁহার এ নাটকখানি খুব ভাল লাগিল।, তিনি ছাপাইতে বলিলেন। "পুরুবিক্রম" প্রকাশিত হইল বটে, কিন্তু প্রথম সংস্করণে এবারও আমি নাম গোপন করিলাম।'

এমন কি, আত্মজীবনীর আর একটি উক্তিতে তিনি এই নাটক যে তাঁহারই মৌলিক রচনা, তাহা এক প্রকার স্পষ্ট করিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি তাহাতে লিখিয়াছেন, " 'পুরুবিক্রম' শেষে গুজরাটি ভাষাতেও অনূদিত হয়। ইউরোপের বিখ্যাত সমালোচক ও সংস্কৃতবিদ্যায় পারদর্শী Sylvan Levi সাহেব গুজরাটি সাহিত্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে 'পুরুবিক্রমে'র বিস্তর প্রশংসা করিয়াছিলেন, কিন্তু এখানি যে আমারই বাংলা 'পুরুবিক্রমের' অনুবাদ তাহা তিনি জানিতেন না।"

এইজন্যই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখকগণ এ যাবৎ ইহাকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মৌলিক রচনা বলিয়াই মনে করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু

সম্প্রতি মুনীর চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ হইতে প্রকাশিত 'সাহিত্য পত্রিকা'য় (নবম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, শীত ১৩৭২, পৃঃ ১২৫-১৭৬) 'জঁা রাসিন ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' নামক প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম' নাটকখানিও তাঁহার অন্যান্য নাটকের মতই এক বিশেষ প্রকৃতির অনুবাদ ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই প্রবন্ধখানির জন্য তিনি বাংলা সাহিত্যের অনুসন্ধানকারী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইবেন। কারণ, ইহা দ্বারা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রচলিত একটি ভ্রান্ত ধারণার দূর হইয়াছে।

১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী নাট্যকার জঁা রাসিন 'আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট' নামে যে নাটক রচনা৹ করেন, তাহাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম' নাটকের ভিত্তি স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ফরাসী জানিতেন, সুতরাং মূল ফরাসী ভাষা হইতেই তিনি অনুবাদ করিবার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। রবার্ট ব্রুস বস্‌ওয়েল এই নাটকখানির ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। উভয় নাটকের ভূমিকালিপি তুলনা করিলেই ইহাদের সম্পর্ক যে কত ঘনিষ্ঠ ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

জঁা রাসিনের 'আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটে'র ভূমিকালিপি এই প্রকার

Alexander	
Porus	Indian Kings
Taxiles	
Axiana	Queen of another part of India
Cleophila	Sister of Taxiles
Hephaestion	

Attendants of Alexander.

পুরুবিক্রমের ভূমিকালিপি এই প্রকার

সেকেন্দর শাহ	গ্রীসদেশীয় সম্রাট
পুরু রাজা	পাঞ্জাব দেশীয় দুই নরপতি
তক্ষশীলা	
একেটিয়ন	সেকেন্দর শার সেনাপতি

সেকেন্দর শাহর প্রহরীগণ

ও সৈন্যগণ

পুরুষ প্রহরী ও সৈন্যগণ

তক্ষশীলের রক্ষক ও একজন গুপ্তচর

চারিজন ক্ষুদ্র রাজকুমার

ঐলবিলা	কুলু পর্বতের রাণী
অম্বালিকা	তক্ষশীলের ভগিনী
সুহাসিনী	ঐলবিলার সখীদ্বয়
সুশোভনা	

একজন উদাসিনী গায়িকা

ইহাতে দেখিতে পাওয়া যাইবে, জঁা রাসিনের আলেকজাণ্ডার জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সেকেন্দর শাহে, এবং পুরু, তক্ষশীলা ও এফেটিয়ন চরিত্রগুলি উভয় ক্ষেত্রেই স্বনামেই প্রকাশ পাইয়াছে। তারপর Axiana ঐলবিলায় এবং Cleophila অম্বালিকায় পরিণত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত 'পুরুবিক্রমে' কয়েকটি যে নূতন চরিত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহাদের কেহই নাটকে কোন মুখ্য অংশ গ্রহণ করিতে পারে নাই। প্রধান চরিত্র প্রত্যেকটিই ফরাসী নাটকেরই অনুকরণে কল্পিত হইয়াছে।

পুরুবিক্রম মৌলিক নাটক বলিয়া ভ্রান্তি উৎপন্ন করিবার আর একটি প্রধান কারণ, ইহার প্রারম্ভিক অংশ বা প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্ক অংশটুকু মৌলিক। ইহাতে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের পটভূমিকায় যে ভাবে কাহিনীটি আনিয়া উপস্থাপনা করা হইয়াছে, তাহাতে ইহার মধ্যে কাহারও অনুকরণ আছে বলিয়া মনে করা কঠিন হইবে। কিন্তু পরবর্তী গর্ভাঙ্ক হইতেই কাহিনী পূর্বোক্ত ফরাসী নাটককে অনুসরণ করিয়াছে। এই অনুকরণের পরিমাণ বুঝাইবার জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রচিত পুরুবিক্রমের কিছু অংশের সঙ্গে ফরাসী নাটকের ইংরেজি অনুবাদের সামান্য কিছু অংশ এখানে তুলনা করিলেই যথেষ্ট হইবে।

Cleophila

What! you go to resist a king whose might
Seems to force Heav'n itself to take his side,
Before whose feet have fallen all the kings

Of Asia, who holds fortune at his beck?
Open your eyes, my brother, and behold
In Alexander one who casts down thrones,
Binds kings in chains, and makes nations slaves:
And all the ills they have incurred prevent.

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার 'পুরুবিক্রম' নাটকের প্রথম হইতেই ইহার যে কি ভাবে অনুকরণ আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা ইহার প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের এই অংশ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে—

অম্বালিকা। কি!—মহারাজ! দেবতারা যাঁর সহায়, সমস্ত সসাগরা পৃথিবী যাঁর অধীনতা স্বীকার করেছে সমস্ত নরপতি যাঁর পদানত হয়েছে, সেই প্রবল প্রতাপ সম্রাট্ সেকেন্দার শাহর সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে আপনি সাহস কর্‌ছেন? না মহারাজ! আপনি এখনও তবে তাঁহাকে চেনেন নি। দেখুন, তাঁহার বাহুবলে কত কত রাজ্য ভস্মসাৎ হয়ে গেছে, কত কত দেশ ছারখার হয়েছে, কত কত রাজা বিনষ্ট হয়েছে,—এই সকল দেখে শুনে মহারাজ! কেন বিপদকে আহ্বান কচ্ছেন?

আরও কিছু অংশ দেখা যাইতে পারে—

জঁ রাসিনের রচনায় পাওয়া যায়,

Taxiles

Why should he spare his wrath for me alone?
Of all Hydaspes arms against him, how
Have I deserved a pity that insults?
Why not to Porus make these overtures?
Doubtless he deems him too magnanimous
To heed an offer that is fraught with shame,
And seeking virtue of less stubborn mould,
Thinks me, forsooth, more worthy of his care.

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ইহার অনুবাদে লিখিয়াছেন—

তক্ষশীল। এত রাজা থাকতে আমার উপরই যে তাঁর এত অনুগ্রহ? তিনি কি বেছে বেছে আমাকেই তাঁর এই নীচ জঘন্য অনুগ্রহের পাত্র বলে মনে করেছেন? মহারাজ পুরুর সঙ্গে কি তিনি সখ্যতা স্থাপন করতে পারেন না? হা! তিনি এ বেশ জানেন যে, মহারাজ পুরু এরূপ নীচ নন,

যে তাঁর এই লজ্জাকর গর্হিত প্রস্তাবের প্রতি কর্ণপাতও করবেন। বুঝেছি, তিনি এরূপ একটি কাপুরুষ চান। যে নির্বিবাদে তাঁর অধীনতা স্বীকার করবে, আর আমাকেই সেই কাপুরুষ বলে তিনি স্থির করেছেন।

তারপর আরও দেখা যাইতে পারে—

Cleophila

Say not he thinks to find in you a slave,
But deems you bravest of his enemies,
And hopes that may he but disarm your hand,
His triumph o'er the rest will be secured.
His choice does no discredit to your name,
He offers friendship cowards may not share.
Tho' he would fain see all the world submit
To him, he wants no slave among his friends.
Ah, if his friendship can your glory soil,
You spared me not a stain of deeper dye.
You know his daily services to me,
Why did you ne'er attempt to check their course ?
You see me now the mistress of his heart,
A hundred secret missives make me sure
Of his devotion, and to reach me come
His ardent sighs across two hostile camps.
Instead of urging hatred and disdain,
You oft have blamed me for severity ;
You led me on to listen to his suit,
Ay, and perchance to love him in my turn.

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ইহার অনুবাদে লিখিয়াছেন,—

মধালিকা। ও কথা বলবেন না; আপনাকে তিনি কাপুরুষ বলে ঠাওরান নি। বরং তাঁর সকল শত্রুগণের মধ্যে আপনাকে অধিক সাহসী বীরপুরুষ মনে করে আপনারই সঙ্গে আগে

বন্ধুতা করবার জন্য ব্যগ্র রয়েছেন। তিনি এই মনে করেছেন, যে যদি আপনি এই যুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করেন, তা হলে তিনি অনায়াসে আর সকলের উপর জয়লাভ করতে সমর্থ হবেন। এ সত্য বটে, তিনি সমস্ত পৃথিবীকে পদানত করবার জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা কচ্চেন, কিন্তু এও তেমনই সত্য যে, তিনি যাকে বন্ধু বলে একবার স্বীকার করেন, তার প্রতি কখনও দাসবৎ আচরণ করেন না; তাঁর সহিত সখ্যতা করলে কি মহারাজ! মর্যাদার হানি হয়? তা বোধ হয়, আপনি কখনই মনে করেন না। তা যদি মনে করেন, তা হলে আমাকে এতদিন কেন নিবারণ করেন নি? দেখুন, সেকেন্দর শা আমার প্রেমের আকাঙ্ক্ষায় প্রতিদিন এখানে গোপনে দূত প্রেরণ কচ্চেন। আপনি তা জানতে পেরেও আমাকে নিবারণ করেন নি, বরং তাতে আপনি উৎসাহ প্রদান করেছেন।

পুরুবিক্রম নাটকের সর্বত্রই এই প্রকার অনুকরণের নিদর্শন পাওয়া যায়। তবে পুরুর বিক্রমের কাহিনী অবলম্বন করিয়া হিন্দুর বীরত্বগৌরব প্রকাশ করাই এই নাটকের উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া আলেকজাণ্ডারের বীরত্ব কথাকে এখানে অনেকাংশে সংক্ষিপ্ত করিয়া পুরুর বীরত্বব্যঞ্জক সংলাপকে অনেকখানি নাট্যকার নিজের কল্পনার সাহায্যে বিস্তৃত করিয়াছেন। নাটকের মধ্যে এই অংশই কেবলমাত্র মৌলিক, কিন্তু তাহাই সর্বাপেক্ষা শক্তিহীন।

পূর্বেই বলিয়াছি, এই নাটকে দেশাত্মবোধের পরিবর্তে প্রেম-ভাবই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ঐলবিলার প্রণয়-স্বপ্নের ব্যর্থতাই এই নাটকে শেষ পর্যন্ত মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই ইহার মধ্যে বিয়োগান্তক নাটকের বেদনার ভাবই অধিকতর কার্যকর হইয়াছে।

'পুরুবিক্রম' নাটক রচনার পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রাজস্থানের কাহিনী অবলম্বন করিয়া দেশাত্মবোধক দুইখানি নাটক রচনা করিলেন; তাহাদের প্রথমখানির নাম 'সরোজিনী-নাটক'। কাহিনী-বিন্যাস ও চরিত্রসৃষ্টির মধ্যে ইহাতে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকখানির প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট হইলেও, ইহার মধ্যে একখানি পাশ্চাত্ত্য নাটকেরও প্রত্যক্ষ প্রভাব অনুভব করা যায়। এই বিষয়েও মুনীর চৌধুরী 'সাহিত্য পত্রিকা' (প্রাগুক্ত, বর্ষ ১৩৭৩, পৃঃ ১৭১-২৬২) 'সরোজিনী ও ইফিজিনিয়া' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়া সর্বপ্রথম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সরোজিনীর কাহিনীটি সংক্ষেপে এই—

দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীন যখন দ্বিতীয় বার চিতোর আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিতেছিলেন, তখন মেবারের রাণা লক্ষ্মণসিংহ তাঁহার কুল-দেবতা

চতুর্ভুজা দেবীর মন্দির হইতে এক কপট আকাশ-বাণী শুনিতে পাইলেন যে, 'সরোজ-কুসুম সম' তাঁহার পরিবারের কোনও রমণীকে দেবীর সম্মুখে বলি না দিলে এবং তাঁহার দ্বাদশ পুত্র যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত না হইলে চিতোর আলাউদ্দীনের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবে না। মন্দিরে এক মুসলমান ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে ভৈরবাচার্য এই নাম লইয়া পৌরোহিত্য কার্যে নিযুক্ত ছিল—সে নিজেই এই কপট দৈববাণী করিয়াছিল, কিন্তু রাণা লক্ষ্মণসিংহ ইহা বিশ্বাস করিয়া নিজের কন্যা সরোজিনীকে দেবীর সম্মুখে বলি দিয়া চিতোর নিষ্কণ্টক করিতে চাহিলেন। সরোজিনীর প্রণয়ীর নাম বিজয়সিংহ, তাঁহার সঙ্গে সরোজিনীর বিবাহের কথাও প্রায় স্থির হইয়াছিল, নানা কারণে বিবাহের কার্যে বিলম্ব হইতেছিল। বিজয়সিংহ ইহাতে ঘোর আপত্তি করিলেন এবং এই বিষয় লইয়া লক্ষ্মণসিংহের সঙ্গে তাঁহার বিরোধ বাঁধিয়া গেল। লক্ষ্মণসিংহের মহিষী বিজয়-সিংহের সহায়তায় সরোজিনীর নিরাপত্তার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু সরোজিনী যখন জানিতে পারিল যে, এই বিষয় লইয়া বিজয়সিংহের সঙ্গে তাহার পিতা লক্ষ্মণসিংহের বিবাদ বাঁধিয়া গিয়াছে এবং এইজন্য তিনি তাহাকে বিজয়সিংহের হস্তে সমর্পণ করিবেন না বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তখন সরোজিনী নিজেই চতুর্ভুজার নিকট আত্মদান করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। বলির আয়োজন যখন সম্পূর্ণ হইল, সেই মুহূর্তে বিজয়সিংহ সহসা সদলবলে সেই মন্দির-প্রাঙ্গণে আবির্ভূত হইয়া সরোজিনীকে উদ্ধার করিয়া লইয়া গেলেন। রাজপুতদিগের মধ্যে আত্মকলহের সুযোগ লইয়া আলাউদ্দীন চিতোর আক্রমণ করিলেন। তাঁহাকে বাধা দিতে গিয়া রাণা লক্ষ্মণসিংহ তাঁহার দ্বাদশ পুত্র সহ নিহত হইলেন। বিজয়সিংহও নিহত হইলেন। আলাউদ্দীন পদ্মিনী ভ্রমে সরোজিনীকে যখন ধরিতে আসিলেন, সেই মুহূর্তে সরোজিনী জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া মৃত্যু বরণ করিল। অন্যান্য রাজপুত ললনাদিগের সহিত পদ্মিনী ইতিপূর্বেই সেই পথের অনুবর্তিনী হইয়া ছিলেন।

এই কাহিনীর সঙ্গে গ্রীক নাট্যকার ইউরিপিদিস রচিত 'ইফিজিনিয়া অ্যাট অলিস' নাটকের কাহিনীটি তুলনা করা যাইতে পারে। কারণ, কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটকের উপরোক্ত গ্রীক নাটকখানির 'প্রভাব' আছে। নিম্নোক্ত গ্রীক নাটকের কাহিনীটি হইতেই বুঝিতে পারা

যাইবে, 'সরোজিনী' নাটক ইহার মাত্র প্রভাবের ফলেই রচিত হয় নাই, বরং প্রত্যক্ষ অনুকরণের ফলেই রচিত হইয়াছে। গ্রীক নাটকের কাহিনীটি এই—

ট্রয়ের বিরুদ্ধে প্রেরিত গ্রীক্ সৈন্যবাহী নৌ-বহর অলিসের বন্দরে আসিয়া অচল হইয়া পড়িয়াছিল। একদিন রাজপুরোহিত কলচাস দৈববাণী শুনাইলেন যে, আগামেমননের কন্যা ইফিজেনিয়াকে দেবী ডায়নার উদ্দেশ্যে বলি দিতে হইবে, নতুবা গ্রীক্ নৌবহর ট্রয়ের পথে অগ্রসর হইতে পারিবে না। আগামেমনন স্ত্রীর নিকট এক পত্র লিখিয়া কন্যা ইফিজেনিয়াকে এ্যাশিলেশের সঙ্গে বিবাহ দিবার কথা লিখিয়া অলিসে সত্বর পাঠাইয়া দিতে বলেন। সেই মুহূর্তেই আগামেমনন অনুশোচনায় দগ্ধ হইয়া কন্যাকে না পাঠাইবার জন্য পুনরায় নির্দেশ দেন। কিন্তু পথিমধ্যে মিলিনস সেই পত্র কাড়িয়া লয়। ইফিজেনিয়াকে সঙ্গে লইয়া মা অলিসে আসিয়া উপস্থিত হন। কিন্তু সেখানে আসিবামাত্র তিনি স্বামীর উদ্দেশ্যের বিষয় জানিতে পারেন। এ্যাসিলেশ ইফিজেনিয়াকে রক্ষা করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। কিন্তু ইফিজেনিয়া নিজেই দেশবাসীর মঙ্গলের জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন করিবার সঙ্কল্প করেন।

টডের রাজস্থানের কাহিনীর সঙ্গে ইহার মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অতি সহজেই কতকটা ঐক্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন। হেলেনের সৌন্দর্য যেমন ট্রয় ধ্বংসের কারণ হইয়াছিল, তেমনই পদ্মিনীর সৌন্দর্যও চিতোর ধ্বংসের কারণ হইল। এই কাহিনীর মধ্যেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজস্ব মনোভাব অনুযায়ী হিন্দু জাতীয়তাবোধ প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে কোন কোন মৌলিক অংশেরও যোজনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা কাহিনীর সঙ্গে সর্বত্র সহজ সংযোগ স্থাপন করিতে পারে নাই।

সরোজিনী নাটকখানি ছয় অঙ্কে সম্পূর্ণ। রাজপুত মহিলাদিগের আত্ম-ত্যাগের চিত্রটি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়া ষষ্ঠ অঙ্কটি এই নাটকের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে—নতুবা পঞ্চমাঙ্কেই কাহিনী সমাপ্ত হইবার পক্ষে কোন বাধা ছিল না। এই অংশই নাট্যকারের মৌলিক রচনা। নাটকের শেষ দৃশ্যে জ্বলন্ত চিতার সম্মুখে রাজপুত রমণীদিগের এই গানটি বার বার উল্লেখ করা হইয়াছে; গানটি কিশোর রবীন্দ্রনাথের রচনা—

জ্বল্ জ্বল্ চিতা, দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,
পরাণ স'পিবে বিধবা বালা।
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা।

এবং সর্বশেষে ভরত বাক্যের মত ভারতের পরাধীনতার দুর্ভাগ্যের কথা দীর্ঘ কবিতায় এই ভাবে স্মরণ করা হইয়াছে—

> স্বাধীনতা-রত্নহারা, অসহায়া, অভাগা জননি।
> ধন-মান-যত পর-হস্তগত
> পর-শিরে শোভে তব মুকুটের মণি। ইত্যাদি

'সরোজিনী' নাটক সম্পর্কেও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এযাবৎ কতকগুলি ভ্রান্ত মত প্রচলিত ছিল। একজন বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট ইতিহাস লেখক ইহার সম্পর্কে বলিয়াছেন, 'সরোজিনী'র "আখ্যানে প্রাচীন গ্রীক নাট্যকার এউরিপিদিসির 'ইফিগেনেইয়া হে এন্ আউলিদি' নাটকের প্রবল ছায়াপাত হইয়াছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মূল গ্রীক পড়েন নাই, সম্ভবতঃ রেণার ফরাসী অনুবাদই ইঁহার উপজীব্য ছিল।" 'সরোজিনী' পুরুবিক্রমের মতই অনুবাদ মূলক রচনা। অনুবাদের আদর্শ গ্রীক নাটক নয়, গ্রীক নাটকের কোন ফরাসী অনুবাদও নয়। জঁা রাসিন কর্তৃক রচিত ফরাসী নাটক *Iphigenie*ই 'সরোজিনী'র মূল।

গ্রীক নাট্যকার ইউরিপিদিস খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে 'ইফিজেনিয়া এ্যাট অলিস' নামক নাটক রচনা করেন। গ্রীক পুরাণের একটি কাহিনী অবলম্বন করিয়া নাটকটি রচিত হইয়াছিল। তারপর সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ফরাসী নাট্যকার জঁা রাসিন এই কাহিনী অবলম্বন করিয়া তাঁহার 'ইফিজেনিয়া' নাটক রচনা করেন। ইহাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটকের ভিত্তি স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে, পুরাপুরি গ্রীক নাটকটি নহে। 'সরোজিনী' নাটক রচনাতেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কি ভাবে মূল ফরাসী নাটককে অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা উভয় নাটকেরই একটি সংলাপের তুলনামূলক বিচার করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

Agamemnon :

> Happy the man content
> With humble fortune, free from the proud yoke
> 'Neath which I bow, who lives a life obscure,
> Thanks to kind Heav'n.

লক্ষ্মণ। না রামদাস তা নয়!—হা! সেই সুখী যে রাজপদের মহান্ ভার হতে মুক্ত! যে সামান্য অবস্থায় মনের সুখে কালযাপন করে।

Achilles :

Sir, my slight successes
Are too much praised. May Heav'n that now detains us,
Soon show a nobler field to rouse the heat
That fain would prove itself worthy of prize
So rare as that thou off'rest. But, my lord,
Am I to trust a rumour that I hear
With joy? Dont deign so to promote my wishes?
Am I so soon the happiest of mortals?
'Tis said Iphigenia comes to Aulis,
As soon as our fortunes will be linked together.

বিজয়। মহারাজ! এই সামান্য জয়লাভে বিশেষ কোন গৌরব নাই। ভগবান করুন যেন আরও প্রশস্ততর গৌরব-ক্ষেত্র আমাদের জন্য উন্মুক্ত হয়। এইবার যবনদের বিরুদ্ধে যদি জয়লাভ করতে পারি—আপনার পিতৃব্য ভীমসিংহের অপমানের যদি প্রতিশোধ দিতে পারি—যদি সেই লম্পট আলাউদ্দীনের মস্তক স্বহস্তে ছেদন করতে পারি—তা হলেই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। (কিয়ৎক্ষণ পরে)

মহারাজ একটা জনরব শুনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি,—শুনতে পাই নাকি রাজকুমারী সরোজিনীকে এখানে এনে তাঁর সহিত উদ্বাহ বন্ধনে আমাকে চিরসুখী করবেন।

Agamemnon :

My daughter? who has told thee she comes hither?

লক্ষ্মণ। (চমকিত হইয়া) আমার দুহিতা? সরোজিনী? কে বল্লে তাহাকে এখানে আনা হবে?

ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটক জঁ। রাসিনের *Iphigenie*-র অনুকরণ মাত্র।

টডের রাজস্থানের কাহিনী অবলম্বন করিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে বাংলা নাটক রচনা করিবার ধারা প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহাই অনুসরণ করিয়া

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'অশ্রুমতী' নামক একখানি পূর্ণাঙ্গ বিয়োগাত্মক নাটক রচনা করেন। ইহাতে চিতোরের রাণা প্রতাপসিংহের শেষ জীবনের একটি কাহিনী অবলম্বন করা হইয়াছে। কাহিনীটি সংক্ষেপে এই—

প্রতাপসিংহের কন্যার নাম অশ্রুমতী; যেদিন মোগলসৈন্য প্রথম চিতোর আক্রমণ করে, সেইদিন তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার এই নাম রাখা হইয়াছিল। শৈশবাবধিই অশ্রুমতী ভীল সর্দারের পরিবারে মানুষ হইতেছিলেন, তারপর যৌবনে উত্তীর্ণ হইলে ভীল সর্দার প্রতাপের হস্তে তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করে—তখন হলদীঘাটের যুদ্ধের পর প্রতাপ রাজধানী ত্যাগ করিয়া সপরিবারে অরণ্য ও পর্বতে আশ্রয় লইয়াছিলেন। প্রতাপ কর্তৃক মানসিংহের অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য মানসিংহ প্রতাপের কন্যা অশ্রুমতীকে হরণ করিয়া মোগল-হস্তে সমর্পণ করিবার ষড়যন্ত্র করিলেন। একদিন মোগলসৈন্য আশ্রয়স্থল হইতে অশ্রুমতীকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। রাজকুমার সেলিম প্রতাপের বিরুদ্ধে মোগলসৈন্যের অধিনায়ক হইয়া চিতোর আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি অশ্রুমতীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যান এবং তাঁহাকে বিবাহ করিবার সঙ্কল্প করেন। অশ্রুমতীও সেলিমকে দেখিয়া মুগ্ধ হন—এবং তিনিও এই বিবাহে আনন্দের সঙ্গে সম্মতি দান করেন। প্রতাপের কন্যা মোগলের সঙ্গে পরিণয়-পাশে বদ্ধ হইতেছে জানিতে পারিয়া প্রতাপের গৌরবোজ্জ্বল পরিবারকে এই কলঙ্কের হাত হইতে ত্রাণ করিবার জন্য প্রতাপের ভ্রাতা শক্তসিংহ আকবরের সভাকবি পৃথ্বীরাজের সঙ্গে অশ্রুমতীর বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিলেন। ইহাতে সেলিমের মনেও এক মিথ্যা সন্দেহের উদয় হইল যে, অশ্রুমতী পৃথ্বীরাজের প্রতি অনুরাগিণী। এই সন্দেহের বশবর্তী হইয়া তিনি পৃথ্বীরাজকে বধ ও অশ্রুমতীকে অস্ত্রাঘাতে অজ্ঞান করিয়া ফেলিয়া চলিয়া যান। শক্তসিংহ অশ্রুমতীকে লইয়া গিয়া পুনরায় প্রতাপের নিকট অর্পণ করেন। প্রতাপ তখন মৃত্যুশয্যায়। তিনি তাঁহার কন্যার সেলিমের প্রতি অনুরাগের কথা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বিষপান করিয়া মৃত্যুবরণ করিতে আদেশ দিলেন। তারপর শক্তসিংহের মুখ হইতে তাঁহার নিষ্কলঙ্কতার কথা জানিয়া তাঁহাকে আজীবন কৌমার্য ব্রত অবলম্বন করিয়া যোগিনীর জীবন যাপন করিতে বলিলেন। প্রতাপের মৃত্যু হইল।

'অশ্রুমতী' নাটকের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকখানির প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। বিশেষত

অশ্রুমতীর চরিত্র ও কৃষ্ণকুমারী-চরিত্র প্রায় অভিন্ন উপাদানে গঠিত বলিয়াই অনুভূত হইবে। নায়িকা অশ্রুমতীর মৃত্যুর ভিতর দিয়া নাট্যকাহিনী সমাপ্ত হয় নাই সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার জীবনের পরিণতিও মৃত্যুর মতই ভয়াবহ। যে বিষ অধর-সংলগ্ন করিয়াও শেষ পর্যন্ত পিতার কথায় তিনি নামাইয়া লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহার ক্রিয়া তাহার মধ্যে নিবৃত্ত হয় নাই। নাটকের শেষ দৃশ্যে তাঁহাকে দেখিলাম শ্মশানচারিণী, প্রণয়াস্পদ সেলিমও তাঁহাকে মৃত বলিয়া মনে করিয়াছেন,—অতএব শেষ মুহূর্তে তাঁহার প্রতি তাঁহার পিতার অনুগ্রহ মৃত্যু-নিগ্রহেরই নামান্তর মাত্র।

রাজকুমার সেলিমের চরিত্রটি এই নাটকের অন্যতম লক্ষ্য করিবার বিষয়। শেষ মুহূর্তে তাহার মানসিক দ্বন্দ্বটি মানবিক অনুভূতিতে সরস হইয়া উঠিয়াছে। প্রতাপ ও মানসিংহের দ্বন্দ্বের ভিতর পড়িয়া দুইটি প্রস্ফুটোন্মুখ পুষ্পকোরক যে কি ভাবে শুকাইয়া গেল, অশ্রু ও সেলিমের চরিত্রের ভিতর দিয়া নাট্যকার তাহা পরম সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত করিয়াছেন।

রাজস্থানের ইতিহাসের পর মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস অবলম্বন করিয়াও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একখানি দেশাত্মবোধক নাটক রচনা করিয়াছিলেন—তাহার নাম 'স্বপ্নময়ী' নাটক। বর্ধমানের রাজা কৃষ্ণরাম রায়ের বিরুদ্ধে শুভসিংহের বিদ্রোহের কাহিনী অবলম্বন করিয়া এই নাটক রচিত। কৃষ্ণরামের কন্যার নাম স্বপ্নময়ী। কি ভাবে যে শুভসিংহ সাধুর ছদ্মবেশ ধরিয়া স্বপ্নময়ীর প্রণয় লাভ করিয়া বর্ধমান রাজপ্রাসাদ-সম্বন্ধে সকল সংবাদ অবগত হইলেন এবং একদিন প্রাসাদ আক্রমণ করিলেন, তারপর তাঁহার অনুচর সুরজমল প্রাসাদে অগ্নি-সংযোগ করিয়া দিয়া বৃদ্ধ রাজার মৃত্যু ঘটাইল—এই সকল কাহিনী ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। শুভসিংহ হিন্দুর প্রতি অত্যাচারকারী ঔরঙ্গজীবের অনুগত রাজা কৃষ্ণরাম রায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার উদ্দেশ্যে বর্ধমানের প্রাসাদ আক্রমণ করিয়া অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করেন, বর্ধমান-রাজদুহিতা স্বপ্নময়ীকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়া দিয়া এই বিষয়ে তাঁহার সহায়তা লাভ করেন। বৃদ্ধ রাজার মৃত্যুর পর স্বপ্নময়ীকে প্রবঞ্চনা করিয়া তাঁহার কার্যোদ্ধার করিবার জন্য আত্মগ্লানিতে শুভসিংহ আত্মহত্যা করেন, স্বপ্নময়ীও উন্মাদিনী হইয়া নিরুদ্দেশ হইয়া যান।

এই নাট্যকাহিনীর মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করিয়া তুলিবার অবকাশ খুব প্রচুর ছিল না, সেইজন্য ইহাতে যাহা জাগ্রত করিয়া তোলা হইয়াছে

তাহা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ। বিধর্মী ঔরঙ্গজীব হিন্দুদিগকে নানা দিক হইতে উৎপীড়ন করিতেছেন, এইজন্য তাঁহার বিরুদ্ধে শুভসিংহের বিদ্রোহ। অতএব ধর্ম ইহার লক্ষ্য, দেশ ইহার লক্ষ্য নহে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে 'হিন্দুমেলা'র ভিতর দিয়া এ দেশে যে দেশাত্মবোধের উন্মেষ হইয়াছিল, তাহা এই হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল না—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই নাটকখানির মধ্যে তাহারই পরিচয় পাওয়া যাইবে।

স্বপ্নময়ীর চরিত্রও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরিকল্পিত এক আদর্শ চরিত্র। ইহার মধ্যে রক্তমাংসের সম্পর্ক খুব সহজে অনুভব করা যায় না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই একই শ্রেণীর তিনটি চরিত্র অশ্রুমতী, সরোজিনী ও স্বপ্নময়ীর মধ্যে স্বপ্নময়ীর পরিকল্পনা সর্বাপেক্ষা অবাস্তব; সেইজন্য তাঁহার স্বপ্নময়ী নাম সর্বাপেক্ষা সার্থক।

শুভসিংহের চরিত্রটি নাট্যকার নায়কোচিত গুণদীপ্ত করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার এই প্রয়াস সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে হইবে না। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যেও উল্লেখ করিবার মত কিছুই নাই।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গীতিনাট্য সম্বন্ধে এখন কিছু বলিতে হয়। রাধাকৃষ্ণের দোল-লীলা অবলম্বন করিয়া তাঁহার 'বসন্ত-লীলা' রচিত; ইহার কাহিনীর মধ্যে কোন বৈচিত্র্য নাই, সঙ্গীতগুলিই ইহার বৈশিষ্ট্য, কিন্তু ইহারও সঙ্গীতগুলি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক রচিত, অতএব ইহার মধ্যেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিজস্ব কোন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইবার সুযোগ পায় নাই।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুনর্বসন্ত' নামক ক্ষুদ্র গীতিনাট্যখানিতে রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের গীতিনাট্যগুলির প্রভাব এতই সুস্পষ্ট যে, ইহার মধ্যে তাঁহার নিজস্ব কোন প্রতিভা বিকাশ পাইবার সুযোগ পায় নাই। ইহার সঙ্গীত, সংলাপ ও কাহিনী সমস্তই রবীন্দ্র-ভাবে অনুপ্রাণিত, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিজস্ব নাট্যরচনার ধারার সঙ্গে ইহার যোগ নাই। ইন্দ্রকে উর্বশীর প্রতি আসক্ত সন্দেহ করিয়া শচীদেবী অভিমান করিলেন, অভিমানের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে নাট্যকাহিনীর যবনিকাপাত হইল। রবীন্দ্রনাথ-রচিত প্রেমসঙ্গীতগুলিই এই নাটিকার বৈশিষ্ট্য; অতএব ইহার জন্য কৃতিত্ব তাঁহারই প্রাপ্য—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রাপ্য নহে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'ধ্যানভঙ্গ' নামক গীতিনাটিকার মধ্যে মদন-ভস্মের

বৃত্তান্তটি অবলম্বন করা হইয়াছে। নাটিকার পরিশিষ্টে 'কুমার-সম্ভব' কাব্যের তৃতীয় সর্গের কতকাংশের পদ্যানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহার কাহিনীর পরিকল্পনায় কালিদাসের প্রেরণা রহিয়াছে এবং ইহার মধ্যে যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সঙ্গীতের যোজনা করা হইয়াছে, তাহাও রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক রচিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিজস্ব বলিতে ইহার মধ্যেও কিছুমাত্র নাই।

প্রহসন রচনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য তাঁহার প্রথম রচনাখানির ভিতর দিয়াই প্রকাশ পাইয়াছিল, ইহার নাম 'কিঞ্চিৎ জলযোগ'। আঙ্গিকের দিক দিয়া ইহার মধ্যে দীনবন্ধুর প্রভাব অনুভূত হইলেও, ভাবের দিক দিয়া ইহা দীনবন্ধুর ছায়াটুকুও স্পর্শ করিতে পারে নাই। মদ্যপান, বেশ্যাসক্তি, স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রতি ব্যঙ্গবিদ্রূপ ইত্যাদি বিষয় পূর্ববর্তী প্রহসন-রচয়িতাদিগের নিকট হইতে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল বিষয়ের কুফল কিংবা পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের উপর ইহাদের প্রতিক্রিয়া দেখান তাঁহার ইচ্ছা ছিল না—ইহারা তাঁহাকে কেবল মাত্র লঘু হাস্যের সুলভ উপকরণ জোগাইয়াছে। হাস্যরসের সুগভীর স্তরে যে এক অতি সূক্ষ্ম করুণ রস প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাহার সন্ধান পান নাই; দীনবন্ধু তাহার সন্ধান জানিতেন। অতএব আঙ্গিকের দিক দিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দীনবন্ধুর কতকটা অনুকরণ করিলেও, দীনবন্ধুর সেই সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি অনুসরণ করিতে পারেন নাই। দীনবন্ধুর দোষটুকু তিনি অনুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার গুণটুকু অনুকরণ করিতে পারেন নাই।

'কিঞ্চিৎ জলযোগে'র বিষয়বস্তু নিতান্ত সাধারণ। এক বেকার ব্যক্তি পাওনাদারের তাড়া খাইয়া শিক্ষিতা মহিলা বিধুমুখীর পরিত্যক্ত পাল্কীতে ঢুকিয়া পড়ে। বেহারারা, তাহাদের কর্ত্রী পাল্কীতে প্রবেশ করিয়াছেন ভাবিয়া তাহাকে লইয়াই গৃহে আসিয়া উপস্থিত হয়। বেকার পেরুরাম পাল্কী হইতে গোপনে নামিয়া সেই বাড়ীতেই আশ্রয় লয়। অতঃপর বিধুমুখী একজন খ্রীষ্ট-ধর্মপ্রচারকের সঙ্গে গভীর রাত্রে বাড়ী ফিরেন, পেরুরামের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, তাঁহার স্বামী তাঁহাকে সন্দেহ করেন কিনা পেরুরামের সাহায্যে তিনি তাহা পরীক্ষা করেন; দেখা গেল, তিনি তাঁহাকে প্রকৃতই সন্দেহ করেন। বিধুমুখীও পেরুরামের নিকট প্রাপ্ত এক টুকরা চিঠিতে জানিতে পারেন, তাঁহার স্বামী এক বেশ্যার প্রতি আসক্ত। পেরুরামের সহায়তায় উভয়ের প্রতি উভয়ের সন্দেহের নিরসন হয়। পেরুরাম সেই গৃহেই

উভয়ের অনুগ্রহে একটি চাকুরি লাভ করে, তাহারও বেকার জীবনের অবসান হয়।

কাহিনীর অস্বাভাবিকতার কথা বাদ দিলেও ইহার বিন্যাসের মধ্য দিয়া নাট্যকার যে একটি যথার্থ নাটকীয় কৌশল দেখাইয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সে যুগের প্রহসনগুলির অধিকাংশই নক্সা জাতীয় হইত, অর্থাৎ তাহাতে চিত্রের পার্শ্বে চিত্র স্থাপন করিয়া সমাজের রূপ অঙ্কিত করা হইত; তাহাতে বিভিন্ন চিত্রের ভিতর দিয়া কাহিনীগত একটি সুনিবিড় ঐক্য গড়িয়া উঠিবার অল্পই সুযোগ লাভ করিত। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই প্রথম প্রহসনখানির বিভিন্ন দৃশ্য, চরিত্র ও ঘটনাগুলি এমন ভাবে পরস্পর আপেক্ষিক করিয়া পরিকল্পিত হইয়াছে যে, কাহিনীর শেষ মুহূর্তে আসিয়া না পৌঁছিলে কাহারও সম্যক্ তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। ইহা নাটকীয় কাহিনী-পরিকল্পনার একটি বিশিষ্ট গুণ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যে এই গুণ আয়ত্ত ছিল, তাহা তাঁহার প্রথম রচনাখানি হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে। কিন্তু ইহা নাটকের বহিরঙ্গগত গুণ, অন্তরঙ্গগত গুণ নহে।

'কিঞ্চিৎ জলযোগে'র মধ্যে চরিত্রসৃষ্টির কোন প্রয়াস সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই। ইহার নায়িকা বিধুমুখী বহুরূপীর মত অভিনয় করিয়াছেন মাত্র। স্ত্রীশিক্ষার নামে সেদিন সমাজে যাঁহারা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, ইহার সঙ্গে কোন প্রত্যক্ষ পরিচয় স্থাপন না করিয়াই যাঁহারা এক অমূলক ভয়ে সেদিন কণ্টকিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদেরই মনোভাব এই বিধুমুখী-চরিত্র-পরিকল্পনার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। পূর্ববর্তী যুগের প্রহসনগুলি যেমন বাংলার ধূলিমাটির উপর দিয়া নিজেদের পথের চিহ্ন আঁকিয়া চলিয়াছিল, এই যুগে তাহা এই সর্বপ্রথম ধূলিমাটির ঊর্ধ্বে উঠিয়া গেল।

সামাজিক প্রহসনও যদি বাস্তব জীবনের প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র হইতে উপাদান সংগ্রহ করিতে পরাঙ্মুখ হয়, তবে কোন উদ্দেশ্যই যে তাহা দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না, তাহার প্রমাণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অলীকবাবু' নামক প্রহসন। সামাজিক প্রহসনের ভিতর দিয়া অধিকাংশ নাট্যকারই তাঁহাদের বিশিষ্ট সামাজিক মতবাদগুলি প্রকাশ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তথাপি এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে গিয়া প্রত্যক্ষ জীবন ও জগৎকে যাঁহারা উপেক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদের বক্তব্য অস্পষ্ট ও উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে। 'অলীকবাবু'র সমাজ ও চরিত্র-পরিকল্পনা কোন বাস্তব ক্ষেত্র হইতে উদ্ভূত হয় নাই, নাট্যকারের নিজস্ব কল্পনার ক্ষেত্র

হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে ; সেইজন্য ইহার মধ্যে নাট্যকারের একটি বিশিষ্ট বক্তব্য থাকিলেও তাহা সুস্পষ্ট ও কার্যকর হইয়া উঠিতে পারে নাই। বঙ্কিমের উপন্যাস পাঠ করিয়া ধনিকন্যা হেমাঙ্গিনী কি ভাবে উপন্যাসের নায়িকার মত আচরণ করিতেছে, তাহার ব্যঙ্গচিত্র ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং ইহাতে নাট্যকার হেমাঙ্গিনীর চরিত্র হইতে সকল প্রকার স্বাভাবিকতা বর্জন করিয়া তাহাকে একটি যাত্রা গানের সখীর মত সাজাইয়া আসরে দাঁড় করাইয়াছেন। প্রহসনে অস্বাভাবিকতা আপাতফলদায়িনী হইলেও পরিণাম-নিষ্ফলা। আনুপূর্বিক অস্বাভাবিকতা এই প্রহসনখানিকে পরিণাম-নিষ্ফল করিয়াছে।

ইহার প্রধান চরিত্র অলীক। ইহার কোন বাস্তবরূপ নাই, ইহা ছায়ারূপী মাত্র। মিথ্যাবাদী ভণ্ড ও প্রবঞ্চক চরিত্রও যথার্থ বাস্তব অথচ হাস্যরসোজ্জ্বল করিয়া চিত্রিত করা যাইতে পারে এবং ইতিপূর্বেই বাংলা নাট্যসাহিত্যে তাহার প্রয়াসও যে কোন কোন ক্ষেত্রে সার্থক হইয়াছে তাহাও সত্য, কিন্তু অলীক-চরিত্রের সঙ্গে তাহাদের কোন যোগ নাই। ইহা অবসর-বিনোদনের জন্য বৈঠকখানায় বসিয়া এক নিঃশ্বাসে শেষ করিয়া ফেলা একটি হাল্কা গল্পের মত। জোরাল গল্পের যে একটি ধর্ম আছে, ইহার তাহাও নাই ; ইহার কাহিনীর কোন অংশেই কোন ঔৎসুক্য সৃষ্টি করিবার প্রয়াস নাই, ঘটনার উত্থান-পতন নাই, কাহিনী একটানা কতকগুলি বক্তৃতার ভিতর দিয়া যেন শেষ পর্যন্ত গড়াইয়া গিয়াছে, আপনার শক্তিতে অগ্রসর হইয়া যাইতে পারে নাই।

মূর্খ ও ভণ্ডচরিত্র অলীক কেবলমাত্র প্রতারণার উপর নির্ভর করিয়া ধনিকন্যা হেমাঙ্গিনীকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু সে স্বয়ং এই প্রতারণার জাল যে-ভাবে পাতিয়াছিল, তাহাতে তাহার উদ্দেশ্য মুহূর্তেই ব্যর্থ হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। এই বিষয়ে সে গদাধর নামক আর এক ধূর্তের সহায়তা লাভ করিয়াছিল এবং সে যখন তাহার সকল উদ্দেশ্য প্রায় সার্থক করিয়া তুলিবার উপক্রম করিয়াছিল, সেই মুহূর্তেই সে নিজে হইতেই সকল বিষয় প্রকাশ করিয়া দিয়া অলীকের সকল স্বপ্ন নিষ্ফল করিয়া দিল। গদাধরের আচরণ এই প্রহসনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অস্বাভাবিক। সে কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অলীকে সকল মিথ্যা কথা সত্য প্রতিপন্ন করিয়া দিলেও, অলীক এই বিষয়ে কিছু জানিত না ; অথচ একই গদাধর কখনও হিন্দুস্থানী সাজিয়া, কখনও চীনাম্যান সাজিয়া, কখনও সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী সাজিয়া একই দৃশ্যের মধ্যে যে একজন বি

ব্যক্তিকে বারবার প্রতারণা করিতেছে, ইহার পরিকল্পনা যেমন অস্বাভাবিক, তেমনই পীড়াদায়ক বলিয়া মনে হইবে।

হেমাঙ্গিনীর পিতা সত্যসিন্ধু বাবুর আচরণ যেমন অস্বাভাবিক, সম্রান্ত ব্যক্তি জগদীশবাবুর আচরণও তেমনই অসঙ্গত। জগদীশবাবু তাঁহার 'পদ-রজঃ প্রত্যাশিত' নিতান্ত অনুগৃহীত এক ব্যক্তির পত্র প্রাপ্তিমাত্র তাহার পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য স্বয়ং তাহার অনুসন্ধান করিয়া তাহার গৃহে আসিয়া একাকী উপস্থিত হইলেন। প্রহসনের শেষাংশে অলীককে সকল দিক দিয়া প্রতারক প্রতিপন্ন করিয়া ইহার উপসংহার করিতে হইবে, যেন ইহাই মনে করিয়া নাট্যকার তাঁহার অবতারণা করিয়াছেন। কাহিনীর পরিণতি পর্যন্ত ঔৎসুক্য (suspense) রক্ষা করিতে না পারিলে নাটকই হউক, প্রহসনই হউক, কাহারও উদ্দেশ্য যে সফল হইতে পারে না, 'অলীকবাবু'ই তাহার প্রমাণ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাংলার বিস্তৃত প্রাণরস-সমুজ্জ্বল প্রান্তরের সবুজ তৃণাস্তীর্ণ ভূমির উপর দিয়া নগ্নপদে পদচারণা করিতে পারেন নাই; তাহা হইলে বাঙ্গালীর বিচিত্র জীবনের স্পর্শে যে পুলক-শিহরণ অনুভব করিতে পারিতেন, তাহা হইতে তাঁহার প্রহসন রচনা সার্থকতর হইতে পারিত। কৃত্রিম পরিবেশের মধ্যে সুনিবিড় জীবনরসের অভাব আছে, ইহা বহুরূপীর অঙ্গসজ্জার মত—এই সজ্জা বাহিরের, অন্তরের নহে। সেইজন্যই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অলীকবাবু' ক্ষণিক চোখ ভুলাইলেও মনের উপর দাগ কাটিতে পারে না।

দীনবন্ধু মিত্রের 'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো'র অনুকরণে যে সকল প্রহসন অনতিকাল ব্যবধানে রচিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'হিতে বিপরীত' অন্যতম। এক বৃদ্ধ কৃপণ চতুর্থ বার দার পরিগ্রহ করিতে গিয়া কি প্রকার লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিল, তাহারই একটি গতানুগতিক কাহিনী ইহাতে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কোন গূঢ় ইঙ্গিত কিংবা সূক্ষ্ম রসাভাস নাই, দীনবন্ধুর অনুকরণ ইহাতে এত প্রকট যে ইহাতে নাট্যকারের কোন মৌলিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশের অবকাশ ঘটে নাই।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'দায়ে পড়ে দার-গ্রহ' নামক প্রহসনখানি বিখ্যাত ফরাসী লেখক মোলিয়েরের কৃত 'মারিয়াজ ফোর্সে' নামক প্রহসনের ছায়াতলে রচিত হইলেও, ইহার মধ্যে নাট্যকার যে দুইটি স্বাধীন দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে—একটি দৃশ্য এদেশের একজন নৈয়ায়িক পণ্ডিত এবং আর একটি দৃশ্য একজন বৈদান্তিক পণ্ডিতকে অবলম্বন

করিয়া পরিকল্পিত। দৃশ্য দুইটির পরিকল্পনার সূক্ষ্ম রসবোধ এবং গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রকাশ পাইলেও, কাহিনীর সঙ্গে ইহারা সুনিবিড় যোগ স্থাপন করিতে পারে নাই; অতএব সমগ্রভাবে প্রহসনখানির উপর ইহাদের কোন কার্যকর প্রভাব নাই—কেবলমাত্র বিচ্ছিন্ন দৃশ্য হিসাবেই ইহাদের মূল্য স্বীকার করিতে হয়। কাহিনীর অন্যান্য অংশে বিজাতীয় লক্ষণ অত্যন্ত প্রকট বলিয়া ইহার যথার্থ রসোপলব্ধিতে বাধা হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

(১৮৭৭—১৯১২)

গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁহার সমসাময়িক কালে বাংলা নাট্যকাররূপে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার নিজস্ব প্রতিভা ও অধ্যবসায় দ্বারা বাংলা নাট্যরচনার তৎকালীন প্রচলিত ধারাটি বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর করিয়া দিয়াছিলেন; তাঁহার সমসাময়িক এবং পরবর্তী কাল পর্যন্তও সেই ধারা অনুসরণ করিয়া বাংলার কয়েকজন বিশিষ্ট নাট্যকার নিজেদের যশ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার বৈশিষ্ট্যটুকু বুঝিতে পারিলেই এই যুগের সকল প্রতিষ্ঠাবান্ নাট্যকারেরই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় লাভ করা সহজ হইবে।

গিরিশচন্দ্র তাঁহার নাট্যকার-জীবনের সূত্রপাত হইতেই তাঁহার সমসাময়িক সমাজের রস ও রুচি সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক ও অবহিত ছিলেন। তিনি প্রথম হইতেই এই বিষয়ে উন্মুক্ত ও সজাগ দৃষ্টি লইয়া নাট্যরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, একান্ত আত্ম-সচেতনতার পরিবর্তে প্রত্যক্ষ সমাজ-চৈতন্য দ্বারাই তাঁহার নাট্যসাহিত্য সঞ্জীবিত করিয়া লইয়াছিলেন। ইহাই গিরিশচন্দ্রের জনপ্রিয়তার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কারণ। ইংরেজ সমালোচকের এই উক্তি যদি সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয় যে, "the great dramatist of a period when drama has flourished has always produced his plays for performance in the theatre of his own time, by the actors of his own time and for the spectators of his own time' —তাহা হইলে গিরিশচন্দ্রকে বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলিয়া নির্দেশ করিতে হয়; কিন্তু এই সঙ্গে এই কথাও স্বীকার করিতে হয় যে, তাঁহার শ্রেষ্ঠতা তাঁহার সমসাময়িক কালের গণ্ডী উত্তীর্ণ হইয়া আসিতে পারে নাই। অতএব ইংরেজ নাট্যকার সেক্সপীয়র কিংবা সংস্কৃত নাট্যকার কালিদাসের সঙ্গে তাঁহার তুলনা হইতে পারে না। কিন্তু তাঁহার রচনার বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য অনেক সময় এই ভ্রম উৎপাদন করিয়া থাকে।

গিরিশচন্দ্রের যখন আবির্ভাব হয়, তখনও বাংলা নাট্যসাহিত্যের দুইটি ধারা

পরস্পর স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছিল—একটি গীতাভিনয়ের ধারা ও অপরটি ইংরেজী নাট্যসাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব-সৃষ্ট বাংলা নাটকের ধারা। পাশ্চাত্ত্য আদর্শে উদ্বুদ্ধ মাইকেল-দীনবন্ধু প্রবর্তিত ধারার সঙ্গে মনোমোহন বসু প্রমুখ নাট্যকারগণ প্রবর্তিত 'নূতন যাত্রা' বা গীতাভিনয়ের ধারাটির মধ্যে যোগ স্থাপন করাই গিরিশচন্দ্রের জীবনের সর্বপ্রধান কীর্তি। দেশীয় রস ও রুচির আবহাওয়ার মধ্যেই গিরিশচন্দ্রের সাধনার সূত্রপাত হইয়াছিল; এক অবৈতনিক যাত্রার দলের মধ্য দিয়াই তিনি সর্বপ্রথম নাট্য-জগতে প্রবেশ করিয়াছিলেন; এমন কি, মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকখানির মধ্যে নৃত্যগীত যুক্ত করিয়া ইহাকে একখানি পূর্ণাঙ্গ যাত্রার রূপ দিয়া তিনি তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত যাত্রার দলে ইহা সর্বপ্রথম অভিনয় করিয়াছিলেন। তাঁহার যাত্রাভিনয়ের এই সংস্কার শেষ জীবন পর্যন্ত কোনদিনই সম্পূর্ণভাবে তাঁহার মধ্য হইতে বিদূরিত হইয়া যায় নাই। ইহার একটি প্রধান গুণ এই হইল যে, তাঁহার নাট্যরচনা কোনদিনই দেশীয় রস-সংস্কার হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারিল না, তাঁহার সমগ্র জীবনের নাট্যসাধনা দেশীয় সংস্কৃতিকে অবলম্বন করিয়াই বিকাশ লাভ করিল; ইহা তাঁহার ব্যাপক জনপ্রীতির অন্যতম সহায়ক হইল।

গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাবকালে গীতাভিনয়ের বহুল প্রচলন থাকিলেও, তখন নব্য ইংরেজী-শিক্ষিত অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে ইউরোপীয় নাট্যকলানুমোদিত অভিনয়ের সমাদর ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিতেছিল। কিন্তু সেই যুগে ইংরেজি আদর্শে রচিত নাটক সংখ্যায় যেমন অল্প ছিল, তেমনই তাহা কেবলমাত্র উচ্চশিক্ষিত এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। জাতীয় চৈতন্য কিংবা জাতীয় রস-প্রেরণার সঙ্গে তাহার কোনই যোগ ছিল না বলিয়া এই সকল নাটকের অভিনয় এতদ্দেশীয় জনসাধারণের কৌতূহল নিবৃত্তি করিতে সমর্থ হইলেও, জাতীয় রসপিপাসা চরিতার্থ করিতে সক্ষম হইল না। গিরিশচন্দ্র সেই যুগে বাংলা নাট্যসাহিত্যের এই অভাবটুকু পূর্ণ করিলেন। তিনি নাট্যরচনার ভিতর দিয়া বাঙ্গালীর নিজস্ব জাতীয় রস নিবেদন করিয়া বাংলা নাট্যসাহিত্যকে সর্বপ্রথম যথার্থ জাতীয় গৌরব দান করিলেন। বাংলা নাট্যসাহিত্যের এই জাতীয় রূপের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য নাটকের আঙ্গিক আনুপূর্বিক ব্যবহৃত না হইলেও ইহা দ্বারা বাঙ্গালী দর্শকের রসপিপাসা নিবৃত্তির কোন অন্তরায় হইল না। গিরিশচন্দ্র তাঁহার নাট্যরচনায় ইউরোপীয় ভাবাদর্শের

পরিবর্তে দেশীয় রস ও রুচিরই মুখরক্ষা করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন বলিয়া চিরন্তন সাহিত্য-বিচারে শেষ পর্যন্ত তাঁহার নাটকের যে মূল্যই নির্ধারিত হউক, সমসাময়িক বাঙ্গালী দর্শকের প্রত্যক্ষ রস-বিচারে যে তাহা উত্তীর্ণ হইয়াছিল, এই বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

বহিরঙ্গের দিক দিয়াই যে কেবল গিরিশচন্দ্র দেশীয় যাত্রার প্রভাব স্বীকার করিয়াছিলেন তাহাই নহে, তাঁহার নাট্যসাহিত্যের অন্তর্বস্তুর সঙ্গেও জাতীয় অনুভূতির যোগ অত্যন্ত নিবিড় ছিল। প্রধানত উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের বাংলার নাগরিক সমাজই তাঁহার নাট্যসাহিত্যের ভিত্তি। তখন এই সমাজ ইংরেজি-প্রভাবের প্রথম বিপর্যয় কাটাইয়া উঠিয়া নিজের মধ্যে কতকটা আত্মস্থ হইয়াছে ; এই অবস্থায় তখন সে নিজের প্রকৃত পরিচয় লাভ করিবার জন্য স্বভাবতই আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। সাহিত্য ও সমাজের দিক দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র এবং আধ্যাত্মিক দিক দিয়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেই পরিচয় প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালীর সম্মুখে তাহা স্থাপন করিলেন। গিরিশচন্দ্রও সেই আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই অগ্রসর হইলেন ; নাটকের মধ্য দিয়া বাংলার নিজস্ব জাতীয় পৌরাণিক মহিমা কীর্তন করিয়া, সমাজের চিরাচরিত কুপ্রথা-গুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া, ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির গৌরব প্রচার করিয়া তিনি সেই যুগের নাগরিক সমাজের সম্মুখে এক উচ্চ জাতীয় আদর্শ স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন এবং এই কার্যে তিনি যে বিপুল অধ্যবসায় ও সুগভীর আন্তরিকতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতেই দেশের জনসাধারণের মধ্যে ইহাদের প্রভাব বহুদূর পর্যন্ত কার্যকর হইয়াছিল। কলিকাতার নাগরিক সমাজের নিকট যখন এই দেশের পৌরাণিক বিষয়বস্তুসমূহ উপেক্ষিত, সামাজিক আদর্শসমূহ অশ্রদ্ধেয় ও ঐতিহাসিক চরিত্রসমূহ অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছিল, সেই সময় তিনি তাহার সম্মুখে ক্রমাগত নাটকের পর নাটক রচনা ও তাহাদের অভিনয় করিয়া এই সকল বিষয় সম্পর্কে সকলের সহানুভূতি জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছিলেন। সেই যুগে এই অধ্যবসায়ী নাট্যকারের আবির্ভাব না হইলে, এই কার্য এত সহজে সম্ভব হইত না।

গিরিশচন্দ্র ছিলেন যথার্থই বাংলার জাতীয় নাট্যকার। তিনি পৌরাণিক নাটকের ভিতর দিয়া বাংলারই পুরাণ-কথা প্রচার করিয়াছেন। বাংলা-দেশের চতুঃসীমা অতিক্রম করিয়া তাঁহার দৃষ্টি হিন্দুসংস্কৃতির মৌলিক আদর্শ সন্ধান করিতে যায় নাই। সেইজন্য বাল্মীকির পরিবর্তে কৃত্তিবাস, বেদব্যাসের

পরিবর্তে কাশীরাম দাস, মুকুন্দরাম, রামেশ্বর, ভারতচন্দ্রই তাঁহার অবলম্বন ছিল। বাংলার নিজস্ব জাতীয় সংস্কৃতির উপর এত সুগভীর মমতা ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে আর কেহ দেখাইতে পারেন নাই। যদিও সেই যুগে মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব বশত ভারতীয় পৌরাণিক চরিত্রসমূহ নূতন-ভাবে ব্যাখ্যা করিবার প্রবৃত্তি দেখা দিয়াছিল, তথাপি গিরিশচন্দ্র সেই যুগে আবির্ভূত হইয়াও এই বিষয়ে বাংলার জাতীয় সংস্কৃতির নিজস্ব ধারাটিই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন। মাইকেল রাম, লক্ষ্মণ ও রাবণ-চরিত্রের অভিনব পরিচয় প্রকাশ করিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণ-চরিত্রের ব্যাখ্যায় শ্রীকৃষ্ণের নূতন পরিচয় দিলেন; কিন্তু গিরিশচন্দ্র তাঁহাদের পরবর্তী হইয়াও সেই পথ পরিত্যাগ করিয়া ইহাদের সম্পর্কে বাংলার নিজস্ব জাতীয় পরিচয়টিই অনুসরণ করিয়া চলিলেন। সেই যুগের বাংলা সাহিত্যে এই দুইজন মনীষীর প্রভাব অস্বীকার করিয়া প্রাচীন সনাতন পথে অগ্রসর হওয়া কম সাহসিকতার কথা ছিল না; কিন্তু গিরিশচন্দ্র অন্যান্য কোন বহিরঙ্গের দিক দিয়া তাঁহাদের সামান্য প্রভাব স্বীকার করিয়া লইলেও, মূল পৌরাণিক চরিত্রগুলির পরিকল্পনায় জাতীয় আদর্শের প্রতিই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন—নূতনত্বের মোহে, কিংবা অনুকরণ-প্রিয়তার বশবর্তী হইয়া জাতীয় আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হন নাই। ইহার মধ্যে গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার যে বিশেষ একটি পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয় এবং ইহার তাৎপর্য বুঝিতে পারিলেই গিরিশচন্দ্রের সমগ্র সাধনার মূল শক্তি যে কোথা হইতে আসিয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলির ভিতর দিয়া বাংলার প্রাচীন কবি কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, মুকুন্দরাম, রামেশ্বর প্রভৃতির চির-পরিচিত বিষয়-বস্তুসমূহ নাটকীয় রূপ লাভ করিয়াছে মাত্র—অন্তরের দিক দিয়া তাহাদের কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীতে চারিদিক দিয়া যখন বাংলার সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের মাপকাঠিতে বিচার করিয়া গ্রহণ বা বর্জন করিবার হিড়িক পড়িয়া গিয়াছিল—বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে যখন হিন্দু-শাস্ত্রের বিশ্লেষণ হইতেছিল, সেই যুগে আবির্ভূত হইয়া এবং সমসাময়িক জনসাধারণের মধ্যে নাট্যরস পরিবেশনের ব্রত গ্রহণ করিয়াও গিরিশচন্দ্র এই নূতন পথ পরিত্যাগ করিয়া যে কতদূর দুঃসাহসিকতার কাজ করিয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে; কিন্তু সেইদিন গিরিশচন্দ্র নিজেও পাশ্চাত্ত্য আদর্শের মোহে বিভ্রান্ত সমাজের সম্মুখে এই জাতীয় আদর্শটি যদি

আবিল করিয়া দিতেন, তাহা হইলে যেদিন এই জাতির মধ্যে পুনরায় স্থৈর্য ফিরিয়া আসিয়াছিল, সেদিন আর এই প্রাচীন আদর্শটির প্রকৃত পরিচয় উদ্ধার করাও অসম্ভব হইয়া পড়িত। যে কৃত্তিবাস, কাশীরাম, মুকুন্দরাম বাঙ্গালীর জাতীয় সংস্কৃতির প্রবাহ আজ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিয়াছে। সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের যুগে গিরিশচন্দ্র তাঁহাদের কথা এই ভাবে বাঙ্গালীর স্মৃতিপথের সম্মুখে ধরিয়া না রাখিলে, আজ তাহাদের সঙ্গে আমাদের অন্তরের যোগ অনুভব করা কঠিন হইয়া পড়িত। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবযুগের পঞ্চমুণ্ডীতে নিজের সাধন-পীঠ স্থাপন করিয়াও গিরিশচন্দ্র প্রাক্তন যুগগুরুর বীজমন্ত্র অন্তরে জপ করিয়াছেন।

সেইজন্য গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকে বাঙ্গালার প্রাণ-রসের সহজ স্পন্দন অনুভব করিতে পারা যায়। বাংলার পুরাণ বাঙ্গালীর নিজস্ব সৃষ্টি ; তাহার নিজস্ব সুখ-দুঃখানুভূতি দ্বারা তাহার পুরাণ চিহ্নিত করিয়া দিয়াছে ; গিরিশচন্দ্রও এই সংস্কৃতির ধারাই তাঁহার নাটকের মধ্যে অনুসরণ করিয়াছেন, কোন পাণ্ডিত্যের প্রেরণায় ইহাদিগকে অতিক্রম করিয়া গিয়া ইহাদের সুদূর উৎস সন্ধান করিতে যান নাই।

মধ্যযুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ভিতর দিয়া বাঙ্গালীর প্রাণরসের সহজ অভিব্যক্তি দেখা গিয়াছিল; উনবিংশ শতাব্দীতে এই গৌড়ীয় ধর্মের যখন নব অভ্যুদয় হয়, তখন গিরিশচন্দ্র তাঁহার নাটকের ভিতর দিয়া ইহার মূল আদর্শটি প্রচার করিয়া এই কার্য বহুদূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছিলেন। একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মূল আদর্শটি বৃন্দাবনদাস রচিত 'চৈতন্যভাগবতে'র ভিতর দিয়াই সর্বাধিক সার্থকতার সঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র চৈতন্যজীবনী-বিষয়ক নাটকগুলির মধ্যে সেইজন্য 'চৈতন্যভাগবত'-কেই অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার পৌরাণিক নাটকগুলি যেমন কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাসেরই সহজ নাট্যরূপ, তাঁহার চৈতন্য-জীবনীবিষয়ক নাটকগুলিও তেমনই বৃন্দাবনদাস রচিত 'চৈতন্যভাগবতের' নিতান্ত সহজ নাট্যরূপ। তাঁহার চৈতন্য-ধর্মবিষয়ক নাটকগুলির মধ্য দিয়া সে-যুগে পুনরায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অভ্যুত্থান হইয়াছিল ; কারণ, ইহাদের ভিতর দিয়া গিরিশচন্দ্র যে ভাব-বন্যা প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তাহা উনবিংশ শতাব্দীর বুদ্ধি ও বিচারমূলক ধর্মপ্রেরণা হইতে জাত নহে, তাহা পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীর ভাবাবেগ হইতে উৎসারিত। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর ধর্ম পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাজাত যুক্তি-

ও বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; কিন্তু গিরিশচন্দ্র ঊনবিংশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াও, ইহার প্রভাব অতিক্রম করিয়া, পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার বিশিষ্ট জাতীয় ধর্মের সত্যস্বরূপটির উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। গিরিশচন্দ্রের নাটকের ভিতর দিয়া আমরা সুদূর মধ্যযুগের ভক্তিবিহ্বলতাই প্রত্যক্ষ করিলাম। শুধু চৈতন্য-জীবনীবিষয়ক নাটকের মধ্যেই নহে, গিরিশচন্দ্র এই ভাবটি তাঁহার পৌরাণিক, সামাজিক কিংবা জীবনী নাটকে, যেখানেই অনুকূল একটু অবসর পাইয়াছেন, সেখানেই প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। যদিও পরবর্তী দুইএকখানি নাটকের ভিতর দিয়া গিরিশচন্দ্র যুক্তিবাদের উপরই ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তথাপি একথা সত্য যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অহৈতুকী ভক্তির প্রভাবই তাঁহার উপর অধিকতর কার্যকর হইয়াছিল। যদিও ইহার আদর্শ ঐতিহাসিক কালে চৈতন্যদেব কর্তৃকই এদেশে প্রবর্তিত হইয়াছিল, তথাপি গিরিশচন্দ্র তাঁহার কয়েকটি পৌরাণিক চরিত্রের ভিতর দিয়া এই আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন। মহাভারতের কৃষ্ণ, রামায়ণের রাম, ভারতীয় মধ্যযুগের বিভিন্ন সাধকের ঐতিহাসিক চরিত্র প্রভৃতির ভিতর দিয়াও গিরিশচন্দ্র অতি সহজেই এই আদর্শটি প্রচার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই আদর্শের সঙ্গে বাঙ্গালীর আধ্যাত্মিক চৈতন্যের সুনিবিড় যোগ ছিল বলিয়া, তাঁহার এই বিষয়ক নাটকগুলি অতি সহজেই বাঙ্গালী দর্শকের একান্ত নিজস্ব বলিয়া গৃহীত হইল। বাংলার মধ্যযুগকে গিরিশচন্দ্র যেন আরও প্রায় দুই শতাব্দী অগ্রসর করাইয়া দিলেন।

ভারতের জাতীয় চরিত্রগুলির প্রতি গিরিশচন্দ্র অপরিসীম শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। পৌরাণিক চরিত্রগুলির প্রতি পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করিয়া যেমন তিনি তাঁহার পৌরাণিক নাটকসমূহ রচনা করিয়াছেন, তেমনই ভারতীয় সাধকদিগের মধ্য হইতে কয়েকটি শ্রেষ্ঠ চরিত্র অবলম্বন করিয়া কয়েকখানি নাটক রচনা করিয়া তিনি তাঁহাদের প্রতি ভক্তিনিবেদন করিয়াছেন। পৌরাণিক চরিত্রকে যেমন তিনি কোথাও নূতন ব্যাখ্যা দিবার প্রয়াস পান নাই, তেমনই এই সকল চরিত্রকেও তাহাদের ঐতিহাসিক এবং জনশ্রুতিমূলক পরিচয়ের ভিতর দিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন। যেখানে নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের অভাব, সেখানেই তিনি প্রচলিত জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও নিজের কল্পনা এবং অতিশয়োক্তি দ্বারা তাহাদিগকে বিকৃত করিয়া তুলেন নাই। জনশ্রুতি ইতিহাস নয় সত্য, কিন্তু জনশ্রুতিরও একটি বৈজ্ঞানিক মূল্য আছে—জনশ্রুতি মাত্রই

সমাজের জনমন-সৃষ্ট ও জনমন-দ্বারাই কীর্তিত; জনসাধারণ বিশেষ কোন বিষয় সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করে, জনশ্রুতির মধ্য দিয়া তাহাই প্রকাশ পায়; অতএব জনশ্রুতিরও যে একটি মূল্য আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। গিরিশচন্দ্রের নাটক জনসাধারণের জন্য রচিত, অতএব জনমন-সৃষ্ট শ্রুতির উপর নির্ভর করিবার ফলে তাহা তাহাদের প্রীতিকরই হইয়াছিল। কিন্তু যেখানে ঐতিহাসিক তথ্যের অভাব নাই, সেখানে তিনি পরম অধ্যবসায়ের সঙ্গে তথ্য সংগ্রহ করিয়া সুনিপুণভাবে তাহা তাঁহার নাট্যরচনায় নিয়োগ করিয়াছেন। তবে তিনি ঐতিহাসিক তথ্যের মর্যাদা রক্ষার জন্য জাতীয় চরিত্রকেও কোন স্থলেই অশ্রদ্ধেয় করিয়া তুলেন নাই। তাঁহার জীবনী-নাট্যের উদ্দেশ্য মহিমা-কীর্তন, তথ্য পরিবেশন নহে; অতএব যে সকল তথ্য মহিমা-প্রচারেরই সহায়ক, তাহাই কেবল তিনি তাঁহার নাটকের জন্য সংগ্রহ করিয়াছেন—যে তথ্য দ্বারা তাঁহার অবলম্বিত চরিত্রের মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়, সে তথ্য তিনি তাহা হইতে পরিহার করিয়াছেন। যুক্তি, তর্ক, বিচার, বিবেচনার পথে তিনি কোনদিন অগ্রসর হন নাই, হৃদয়ের পথই তাঁহার পথ; সেইজন্য যুক্তিতর্ক দিয়া কোন সত্যই তিনি প্রতিষ্ঠাও করিতে যান নাই, হৃদয় দিয়াই তিনি তাহা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাঁহার নাটকের মধ্যে তিনি যে সকল চরিত্রের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন, তাহাদিগকেও সেইভাবেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। হৃদয়ের পথ সহজ পথ, ইহা সাধারণ বাঙ্গালীর চিরপরিচিত পথ। এই পথেই বাংলার শ্রেষ্ঠ সাধকগণের আবির্ভাব হইয়াছিল; অতএব এই পথেই অগ্রসর হইবার ফলে গিরিশচন্দ্র অতি সহজেই সাধারণ বাঙ্গালীর হৃদয় অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্রের যেমন একটি সুস্পষ্ট আধ্যাত্মিক বোধ ছিল, পারিপার্শ্বিক বাস্তব সমাজ-সম্পর্কে তাঁহার তেমন কোন বিশিষ্ট ধারণা ছিল না। বাস্তব পরিবেশের আলোচনা তিনি 'নর্দমা ঘাঁটা' বলিয়া ঘৃণা করিতেন। প্রয়োজনের অনুরোধে তাঁহাকে কয়েকখানি সামাজিক নাটক রচনা করিতে হইলেও, তিনি যে তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভার সহজ প্রেরণায় তাহা রচনা করেন নাই, তাহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। যদিও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাংলার কয়েকজন মনীষী এদেশের হিন্দুসমাজ সম্পর্কে নানা দিক হইতে গভীর ভাবে ভাবিয়া দেখিতেছিলেন, তথাপি গিরিশচন্দ্রের দৃষ্টি সে দিকে আদৌ আকৃষ্ট হয় নাই। তাঁহার প্রতিভা ছিল ভাবমুখী, বস্তুমুখী নহে; সেইজন্য

সমাজ-সংস্কার সম্পর্কে তিনি বিশিষ্ট কোন মতবাদ প্রচার করিতে যান নাই। কয়েকটি সামাজিক বিষয়-সম্পর্কে নাট্য রচনা করিবার জন্য বন্ধুবান্ধব এবং কোন কোন সমাজ-সংস্কারক কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া যে কয়খানি নাটক তিনি রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের কাহারও সঙ্গে তাঁহার নিজের অন্তরের কোন যোগ স্থাপিত হইতে পারে নাই। সেইজন্য তাঁহার রচিত পৌরাণিক নাটকসমূহের তুলনায় তাঁহার সামাজিক নাটক কয়খানি শক্তিহীন হইয়া আছে।

ইংরেজী সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া এদেশের শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে সর্বপ্রথম আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধের জন্ম হইয়াছিল। ভারতীয় হিন্দুর সামাজিক আদর্শের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য সমাজের আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধের মৌলিক বিরোধ আছে। আত্মবোধ বিলুপ্ত করিয়াই হিন্দুর সামাজিক জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে। অতএব ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যে সকল মনীষী সমাজ-সংস্কারে মনোযোগী হইয়াছিলেন, তাঁহারা হিন্দুর সামাজিক আদর্শের এই মৌলিক তত্ত্বটি বিস্মৃত হইয়া, এই দেশের উপর পাশ্চাত্ত্য আদর্শই প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র এই দলের লোক ছিলেন না, তিনি প্রাচীনপন্থী ছিলেন; সেইজন্য চিরাচরিত সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি নূতন করিয়া কিছু ভাবিয়া দেখিতে যান নাই। এক কথায় বলিতে গেলে, প্রত্যক্ষ সমাজ তাঁহার লক্ষ্য ছিল না, তাঁহার লক্ষ্য ছিল আধ্যাত্মিক আদর্শ। সেইজন্য বাংলার সমাজ-জীবন হইতে যথার্থ রস তিনি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। বিশেষত, গিরিশচন্দ্রের সামাজিক অভিজ্ঞতা ছিল নিতান্ত সীমাবদ্ধ। অনুভূতি দ্বারা ভাবলোকের ঐশ্বর্য লাভ করিতে পারা যায়, কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকিলে বস্তুলোকের রসের সন্ধান পাওয়া যায় না। সেইজন্য দেখিতে পাওয়া যায়, যে গিরিশচন্দ্র ভাবমার্গের বহু ঊর্ধ্বে আরোহণ করিয়া অমরাবতীর সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাবে বাংলার ধূলিমাটির উপর একখানি ধূলির খেলাঘরও সার্থকভাবে গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই। কারণ, ধূলার জগতে স্বপ্নের প্রভাব সীমাবদ্ধ।

বাংলার বিভিন্নমুখী সামাজিক জীবনের বিচিত্র রূপ ও রসের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় না থাকিবার জন্য তাঁহার নাটকে ইহার কেবলমাত্র একটি দিকেরই পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে—তাহা ইহার ব্যবহারিক সমস্যার দিক। এই সমস্যাগুলির গুরুত্বে তাঁহার সামাজিক নাটকগুলি অত্যন্ত ভারাক্রান্ত। নানা ছোটবড় অসঙ্গতি, অসামঞ্জস্য, অভাব অভিযোগের ভিতর দিয়াও জীবনের রস

নানাদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া যে বিচিত্র রঙের রামধনু সৃষ্টি করিতেছে,—গিরিশচন্দ্র তাঁহার নাটকের ভিতর দিয়া তাহার পরিচয় দিতে পারেন নাই। সেইজন্য দেখা যাইবে যে, বাস্তব জীবনের প্রতি কোনও মমত্ব কিংবা কৌতূহল তিনি জাগাইয়া তুলিতে পারেন নাই। অথচ নাট্যকারের ইহাই প্রধান কর্তব্য। সেক্সপীয়র কিংবা কালিদাস বাস্তব জীবনকে উপেক্ষা করেন নাই বলিয়াই কালোত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছেন। গিরিশচন্দ্রের নাটকে এই একটি বড় অভাব অতি সহজেই অনুভব করা যায়। জীবন ত কেবল সমস্যার জিনিস নহে—ইহার একটি নিবিড় ভোগের দিকও আছে, এই ভোগের মধ্যে ইহার সৌন্দর্য ও রস অনুভূত হইয়া থাকে। গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকে জীবনের এই ভোগের কথা নাই —বহির্বিক্ষোভের কথাই আছে। বিক্ষোভের ভিতর দিয়া রস বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, ভোগের ভিতর দিয়া তাহা নিবিড় হইয়া থাকে। যেখানে নিবিড়তা নাই, সেখানে রিক্ততার হাহাকার দেখা দেয়। সেইজন্য গিরিশচন্দ্র এতগুলি বাঙ্গালা নাটক রচনা করা সত্ত্বেও, একখানিও সার্থক সামাজিক প্রহসন রচনা করিতে পারেন নাই। অথচ দীনবন্ধু, এমন কি তাঁহার পূর্ববর্তী রামনারায়ণ পর্যন্ত, সামাজিক প্রহসন রচনার একটি বলিষ্ঠ আদর্শ সেই প্রথম যুগের নাট্য-সাহিত্যেই স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বিশেষত গিরিশচন্দ্র রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন; অতএব সামাজিক প্রহসনের যে ব্যবহারিক মূল্য কতদূর, তাহা তিনি বুঝিতেন। বাস্তব জীবনের প্রতি সহানুভূতিহীনতা এবং তাহার অন্তর্লীন রহস্যোদ্‌ঘাটনের অক্ষমতাই যে গিরিশচন্দ্রের এই বিষয়ে ব্যর্থতার কারণ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সামাজিক নাটক রচনায় গিরিশচন্দ্র দীনবন্ধুকে অনুকরণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু দীনবন্ধুর প্রহসনগুলি নিজে বার বার অভিনয় করা সত্ত্বেও ইহাদের সৃষ্টিধর্ম তিনি আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। তিনি দীনবন্ধুর কেবলমাত্র 'নীলদর্পণ'খানিরই অনুকরণ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার 'সধবার একাদশী' কিংবা 'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়োর রস-রহস্য উদ্ভেদ করিতে পারেন নাই। গিরিশচন্দ্রের অধ্যাত্মবোধ তাঁহার সামাজিক জীবন-দর্শনে দুরপনেয় বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল। নাট্যকার যদি দার্শনিক হন, তাহা হইলে এই ত্রুটি অপরিহার্য হইয়া উঠে।

অবশ্য এ কথা সত্য যে, কতকগুলি রোমান্টিক বা আরব্য-পারস্য উপন্যাসের কাহিনী লইয়া তিনি কতকগুলি স্নিগ্ধ হাস্যরসোজ্জ্বল প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন এবং কতকগুলি সামাজিক নক্সা রচনার ভিতর দিয়াও তাঁহার হাস্যরস সৃষ্টির

ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু ইহারা স্বতন্ত্র বস্তু; বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের গভীরতর স্তর হইতে হাস্যরসের মণিমুক্তা সংগ্রহ করার ক্ষমতা এক জিনিস এবং বৈদেশিক রোমান্টিক কাহিনী কিংবা অতিরঞ্জিত নাগরিক জীবনের নক্সা অঙ্কিত করিয়া হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস অন্য জিনিস;—একটি হইতে অন্যটির কোন পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে না।

সম্মুখে বাঁধাধরা একটি আদর্শ লাভ করিলে তাহা অবলম্বন করিয়া গিরিশচন্দ্র যত সার্থক নাটক রচনা করিতে পারিতেন, স্বাধীন রচনায় তিনি সে কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। ইহার কারণ, নাট্যোল্লিখিত ঘটনা-প্রবাহ প্রথম হইতেই নিয়ন্ত্রিত করিয়া লওয়া তাঁহার পক্ষে অনেক সময় সম্ভব হইত না। এইজন্য তাঁহার সামাজিক নাটকের শেষাঙ্কগুলি ঘটনা দ্বারা অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িত—অবশ্য এই বিষয়েও তিনি দীনবন্ধুকেই আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পৌরাণিক কিংবা ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে গিরিশচন্দ্রের এই ত্রুটি প্রকাশ পায় নাই। কারণ, পৌরাণিক কাহিনীসমূহের একটি নির্দিষ্ট ধারা থাকিত; পূর্বেই বলিয়াছি, গিরিশচন্দ্র তাহার ব্যতিক্রম করিতেন না—অতি সন্তর্পণে সেই পথ ধরিয়াই অগ্রসর হইয়া যাইতেন। পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে গিরিশচন্দ্রের যদি মূল বিষয়ের প্রতি এই আনুগত্য না থাকিত, তবে তিনি তাহাদের রচনায়ও, তাঁহার সামাজিক নাটকগুলির মত, ব্যর্থকাম হইতেন। তাঁহার জীবনী-বিষয়ক ঐতিহাসিক নাটকগুলি সম্বন্ধেও এই কথাই প্রযোজ্য; সেইজন্য এই সকল নাটক রচনায় তিনি অধিকতর সাফল্য লাভ করিয়াছেন। একমাত্র এই কারণেই তিনি যে একখানি মাত্র অনুবাদ-নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতেই সর্বাধিক সাফল্য লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সেক্সপীয়রের 'ম্যাক্‌বেথ' নাটকখানির অনুবাদ কেবলমাত্র তাঁহার একখানি শ্রেষ্ঠ রচনা নহে—বাংলা সাহিত্যের একখানি শ্রেষ্ঠ অনুবাদ-রচনা। গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা-সম্পর্কে গভীরভাবে আলোচনা করিতে হইলে এই বিষয়টি উপেক্ষা করা যায় না। ঘটনা-প্রবাহ যথাযথ নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহা স্বাভাবিক পরিণতির পথে অগ্রসর করিয়া দেওয়া নাট্যশিল্পীর একটি প্রধান লক্ষ্য। যাহাতে অবান্তর প্রসঙ্গ ইহার মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিতে না পারে, ঘটনা-প্রবাহ লক্ষ্যহীন হইয়া না যায়, গৌণ বিষয় প্রাধান্য না পায়, এই সকল বিষয়ে নাট্যকারকে অত্যন্ত সতর্ক হইয়া চলিতে হয়। যে সকল রোমান্টিক এবং সামাজিক নাটক গিরিশ-

চন্দ্রের স্বাধীন রচনা, তাহাদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র এই সতর্কতা অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন, এমন কথা বলিতে পারা যায় না।

মস্তিষ্ক অপেক্ষা হৃদয়কেই গিরিশচন্দ্র প্রাধান্য দিয়াছেন, সেইজন্য হৃদয়াবেগের প্রাবল্যে অনেক সময় তিনি যুক্তির বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। কাহিনীর পরিবর্তে ভাবই তাঁহার লক্ষ্য ছিল, একটি বিশেষ ভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া সেইজন্যই তাঁহার কাহিনী অনেক সময় লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

গিরিশচন্দ্র বাংলার জাতীয় আদর্শের পরিপোষক হইলেও, তিনি সংস্কৃত নাটকদ্বারা একেবারেই প্রভাবান্বিত হন নাই। সেই যুগে দীনবন্ধুর পর গিরিশচন্দ্রই সংস্কৃত নাটকের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ ঠাকুরের পর বাংলা নাট্যসাহিত্যে সংস্কৃত নাটকের আর কোন প্রভাব একেবারেই দেখিতে পাওয়া যায় না। গিরিশচন্দ্রই সর্বপ্রথম এই বিষয়ে একেবারে মোড় ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। সংস্কৃত নাটক বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের আদর্শের অনুকূল নহে। গিরিশচন্দ্র বাঙ্গালীর জাতীয় রসচৈতন্যের যে মূল ধারাটির অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের কোনই স্থান ছিল না। যে জাতীয় রসপ্রেরণায় গিরিশচন্দ্র বাল্মীকি-বেদব্যাসকে পরিত্যাগ করিয়া কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাসকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই প্রেরণার বশবর্তী হইয়াই তিনি সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের বিপুল সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালীর মঙ্গলকাব্য-পাঁচালী-কবিওয়ালার গান ইত্যাদির বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া নাটক রচনা করিয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি যেমন কোন সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ রচনা করেন নাই, তেমনই তাঁহার কোন স্বাধীন রচনাতেও সংস্কৃতের প্রভাব একেবারেই স্বীকার করেন নাই। গিরিশচন্দ্রের নাটকে যে বিদূষকের চরিত্র আছে, তাহার সঙ্গে সংস্কৃত নাটকের বিদূষক অপেক্ষা সেক্সপীয়রের নাটকের fool-এর সামঞ্জস্যই অধিক।

সেক্সপীয়রের নাটকের বহিরঙ্গগত প্রভাব গিরিশচন্দ্রের নাটকে অনুভব করা যায়। সেক্সপীয়রের প্রভাবের কথা গিরিশচন্দ্র নিজেও স্বীকার করিতেন। সেক্সপীয়রের নাটকের বহিরঙ্গগত প্রভাবের ফলে গিরিশচন্দ্রের নাটকের জাতীয় মূল্য যে কোন কোন স্থানে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সেক্সপীয়রের নাটকের বহিরঙ্গ পরিচয়ের ভিতর দিয়া এলিজাবেথীয় ইংলণ্ডের সামাজিক পরিবেশটি রূপ লাভ করিয়াছে, সেই রূপ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-সৃষ্ট বলিয়াই এত বাস্তব। কিন্তু গিরিশচন্দ্র সেই পরিচয়টি ইহার দেশ ও কাল

উপেক্ষা করিয়া তাঁহার রচিত বাংলা নাটকের মধ্যেও অনেক সময় গ্রহণ করিয়াছেন। এমন কি, তাঁহার অনেক পৌরাণিক নাটকের মধ্যেও তাহা অবিকল গৃহীত হইয়াছে। ইহার ফল যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে; বর্তমান যুগের বাঙ্গালীর জীবনে যাহা একান্ত অপরিচিত, ইহাদের মধ্যে তাহাই পরিবেশন করা হইয়াছে। গিরিশচন্দ্রের নাটকে যদি কোন বিজাতীয়তা প্রকাশ পাইয়া থাকে, তবে তাহা এইখানেই প্রকাশ পাইয়াছে; সেক্সপীয়রের নাটক-সমূহের বহিরঙ্গের পরিবর্তে অন্তরঙ্গের নিগূঢ় পরিচয় যথার্থ লাভ করিতে পারিলে, গিরিশচন্দ্র এই ত্রুটি হইতে অব্যাহতি পাইতেন। সেক্সপীয়রের বহিরঙ্গগত-প্রভাবজাত যে সকল লক্ষণ গিরিশচন্দ্রের নাটকের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাদের মধ্যে বিষ প্রদান, নিষ্ঠুর হত্যা, আকস্মিক মৃত্যু, ভৌতিক চরিত্র, নারীর পুরুষবেশ ধারণ করিয়া ছলনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত সেক্সপীয়রের কোন বিচ্ছিন্ন চরিত্রও আনুপূর্বিক অনুসরণ করিয়া তিনি তাঁহার পৌরাণিক কিংবা সামাজিক নাটকের মধ্যে নূতন চরিত্র গঠন করিয়াছেন। বর্তমান যুগের বাঙ্গালীর সামাজিক নাটক রচনা করিতে গিয়া এই সকল ঘটনা যেমন অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করা প্রয়োজন ছিল, বাঙ্গালীর জাতীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ পৌরাণিক নাটক রচনা করিতেও এই সতর্কতা অবলম্বন করা তেমনই প্রয়োজন ছিল। গিরিশচন্দ্রের উপর সেক্সপীয়রের এই প্রভাববশতই গিরিশচন্দ্র স্থান, কাল ও পাত্রের ব্যবধান বিস্মৃত হইয়া বাংলা নাটকের মধ্যে কোন কোন সময় এলিজাবেথীয় যুগের ইংলণ্ডের চিত্র আনিয়া সমাবেশ করিয়াছেন। কিন্তু বহিরঙ্গগত এই চিত্রের পরিবর্তে যদি গিরিশচন্দ্র সেক্সপীয়রের নাটকের অন্তর্গূঢ় পরিচয়টি লাভ করিয়া তাহা বাংলা নাট্যরচনার কার্যে নিয়োজিত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে সেই যুগে কয়েকখানি শ্রেষ্ঠ বাংলা নাটক রচিত হইতে পারিত। সেক্সপীয়রের নাটকের জটিল অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয় গিরিশচন্দ্রের নাটকে নাই, সেইজন্য হত্যা, ষড়যন্ত্র, বিষ-প্রয়োগ এই সমস্ত থাকা সত্ত্বেও সেক্সপীয়রের নাট্যকাহিনীর যে সুগভীর স্তর হইতে ইহাদের প্রেরণা আসিয়াছে, তাহার পরিচয় গিরিশচন্দ্রের নাটকে কোন দিক দিয়াই প্রকাশ পাইতে পারে নাই।

গিরিশচন্দ্র যে প্রথম হইতেই আধ্যাত্মিক বিষয়ে কোন বিশিষ্ট মতবাদ লইয়া নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা নহে। তাঁহার জীবনী হইতে জানিতে পারা যায় যে, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সংস্পর্শে আসিবার পূর্বে

গিরিশচন্দ্র বিশিষ্ট কোন ধর্মমতে বিশ্বাসী ছিলেন না—অর্থাৎ ধর্ম তখন পর্যন্ত তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল না; এই বিষয়ে তিনি বিশেষ কিছু ভাবিতেনও না। তবে তাঁহার প্রথম পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে কিংবা চৈতন্য-জীবনীবিষয়ক একখানি নাটকেও যে ভক্তিভাব প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা তাঁহার নিজের ধর্মবোধের প্রেরণা হইতে জাত নাও হইতে পারে, বরং তাহা তাঁহার মূলের প্রতি আনুগত্যের ফলই বলিতে হইবে। যে কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত অবলম্বন করিয়া গিরিশচন্দ্র প্রথম জীবনের পৌরাণিক নাটকসমূহ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা ভক্তিরস-প্রধান। তাঁহার নাটকেও সেই আধ্যাত্মিক রসধারাটিই তিনি রক্ষা করিয়াছেন মাত্র। বিশেষত তিনি অনুভব করিয়াছিলেন, ইহাই বাঙ্গালীর জাতীয় অনুভূতি। কিন্তু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সংস্পর্শে আসিবার পর হইতেই গিরিশচন্দ্র সর্বপ্রথম আধ্যাত্মিকতাবোধ-বিষয়ে সজাগ হইয়া উঠেন। এই ভাব ক্রমে গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে হইতে শেষ পর্যন্ত বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদে গিয়া পৌঁছায়। পরমহংসদেবের সংস্পর্শে আসিবার পর গিরিশচন্দ্র যে সকল নাটক রচনা করিয়াছেন, একমাত্র ঐতিহাসিক নাটক ব্যতীত তাহাদের প্রায় প্রত্যেকটির মধ্যেই তাঁহার এই আধ্যাত্মিক মনোভাবের প্রভাব অনুভব করা যাইবে। রামকৃষ্ণদেবের নিষ্কাম কর্ম, সর্বধর্মসমন্বয় ও অদ্বৈতবাদের আদর্শ গিরিশচন্দ্রের যুগের নাটকগুলির মধ্যে সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করিয়া নাট্যিক ঘটনা-প্রবাহ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। বলা বাহুল্য, যতদিন পর্যন্ত গিরিশচন্দ্র ধর্মবোধকে আত্মনিরপেক্ষ হইয়া অনুভব করিয়া তাঁহার নাট্যকাহিনীর মধ্যে ব্যবহার করিয়াছেন, ততদিন পর্যন্ত তাহার জাতীয় ও বাস্তব (objective) মূল্য বর্তমান ছিল, নাট্যরসও তাহাতে ব্যাহত হইত না; কিন্তু যে দিন হইতে এ সম্বন্ধে সচেতন হইয়া আত্মবোধ দ্বারা তিনি ইহা নিয়ন্ত্রিত করিয়া লইতে গেলেন, সেইদিন হইতেই ইহার জাতীয় ও বাস্তব (objective) মূল্য বিনষ্ট হইয়া ইহা একান্ত ব্যক্তি-অনুভূতির মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িল। দর্শকের দিক হইতে তখন ইহার একমাত্র শিক্ষাগত মূল্য ব্যতীত আর কোন মূল্যই অবশিষ্ট রহিল না। সেইজন্য গিরিশচন্দ্রের শেষ জীবনের নাটকগুলি প্রথম জীবনের নাটকগুলির মত এত রসোচ্ছল নহে, সামগ্রিক জাতীয় অনুভূতি বর্জিত হইয়া নাট্যকারের একান্ত আত্মানুভূতির বাহন মাত্র।

গিরিশচন্দ্রের নাটকের একটি প্রধান ত্রুটি এই যে, তাঁহার অধিকাংশ নাটকেই কোন দ্বন্দ্ব নাই—নিরবচ্ছিন্ন ঘটনা-প্রবাহ একটানা স্রোতে ইহাতে

শেষ পর্যন্ত বহিয়া যায়—দুরতিক্রম্য কোন বাধার সম্মুখীন হইয়া সেই প্রবাহ কোন আবর্ত কিংবা উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করে না। পৌরাণিক নাটকের মধ্যে দুই একটি রচনায় এই ত্রুটি লক্ষ্য করা না গেলেও, তাঁহার প্রায় সকল নাটকেই ইহা বর্তমান। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলি দেশীয় যাত্রার আদর্শে রচিত মাহাত্ম্য-প্রচারমূলক নাটক; কিন্তু মাহাত্ম্য-প্রচারমূলক নাটকের মধ্যেও যে বিরোধের ভিতর দিয়াই মাহাত্ম্য প্রচারিত হইয়া থাকে, গিরিশচন্দ্রের নাটকে সেই বিরোধ-সৃষ্টিরও পরিচয় পাওয়া যায় না। মূলের প্রতি ঐকান্তিক আনুগত্যের জন্য তিনি আদর্শ চরিত্র ও ঘটনাসমূহের মধ্য হইতে নিজের কল্পনা দ্বারা নূতন কোন সমস্যার উদ্ভাবন না করিয়া তাঁহার নাটক রচনা করিয়াছেন। অতএব তাহা অধিকাংশই বাহির হইতে অঙ্কে ও দৃশ্যে বিভক্ত আদ্যোপান্ত কথোপকথনের মধ্য দিয়া বর্ণিত নাটকের লক্ষণাক্রান্ত হইলেও অন্তরের দিক দিয়া প্রকৃত নাটক বলিয়া স্বীকার করা কঠিন। কারণ, ইহাতে কাহিনী, রস, এমন কি, চরিত্র থাকিলেও দ্বন্দ্ব নাই এবং দ্বন্দ্ব নাই বলিয়াই দ্বন্দ্বের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিও নাই। সামাজিক নাটকেও চরিত্রগুলি অবস্থার সম্মুখীন হইয়া তাহার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক সংগ্রাম করিতে পারে নাই—একটানা ঘটনা-প্রবাহে ভাসিয়া গিয়াছে। অতএব ইহাদের মধ্যে যে রস, তাহা কেবল আখ্যায়িকা শ্রবণের রস, নাটক্য ঔৎসুক্য (suspense) রক্ষা করিয়া কাহিনীর সতর্ক পরিণতি অনুসরণ করিবার রস নহে। এক রামায়ণ অবলম্বন করিয়াই গিরিশচন্দ্র বারখানি নাটক রচনা করিয়াছেন; কিন্তু রামায়ণের যে অংশে প্রকৃত নাট্যিক দ্বন্দ্ব আছে, সেই অংশগুলিই যে তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা নহে—তিনি রঙ্গমঞ্চের ভিতর দিয়া বাঙ্গালীকে আনুপূর্বিক কৃত্তিবাসী রামায়ণ শুনাইয়াছেন মাত্র। যে কাজ গায়েনগণ হাতে চামর লইয়া ও পায়ে নূপুর বাঁধিয়া আসরে দাঁড়াইয়া দোহারের সহায়তায় করিত, সেই কাজই তিনি সেই যুগে নটনটীর সহযোগিতায় বিভিন্ন দৃশ্যপটের ভিতর দিয়া রঙ্গমঞ্চের মধ্যে নিষ্পন্ন করিয়াছেন। মহাভারত এবং ভাগবত সম্বন্ধেও একই কথা বলিতে পারা যায়। ইহাদের মধ্য হইতে নূতন কোন সৌন্দর্যের সন্ধান করিয়া বিচিত্র দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মধ্য দিয়া তাহা তিনি প্রকাশ করেন নাই। মহাভারত হইতে শকুন্তলার উপাখ্যানটি গ্রহণ করিয়া কালিদাস তাঁহার 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটকের ভিতর যে অভিনব সৌন্দর্যে ইহাকে মণ্ডিত করিয়াছেন, গিরিশচন্দ্রের

কোন পৌরাণিক নাটকের মধ্যেই অনুরূপ প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায় না। কালিদাস নিজের শক্তিদ্বারা মহাভারতের বহু উর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছেন; কিন্তু গিরিশচন্দ্র কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন নাই।

জীবনের গুরুগম্ভীর বিষয়ের প্রতিই সর্বদা লক্ষ্য ছিল বলিয়া গিরিশচন্দ্রের নীতিজ্ঞানও অত্যন্ত উন্নত ছিল। যদিও তাঁহার প্রায় প্রত্যেক নাটকেই কোন-না-কোন পতিতা চরিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়, তথাপি পতিতা-দিগের ভিতর হইতে তিনি একটি উচ্চ নৈতিক শক্তিরই সন্ধান করিয়াছেন, তাহাদের কদর্য জীবনের বাস্তব চিত্র পরিবেশন করেন নাই।

এইবার গিরিশচন্দ্রের নাটকে ব্যবহৃত ভাষা ও ছন্দ সম্পর্কে আলোচনা করিতে হয়। গিরিশচন্দ্র সাধারণত সামাজিক ও ঐতিহাসিক নাটকে গদ্য এবং পৌরাণিক ও রোমান্টিক নাটকসমূহে 'পদ্য' ব্যবহার করিয়াছেন; তবে কোন কোন রচনায় এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখিতে পাওয়া যায়। গিরিশচন্দ্রের 'পদ্য' সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। রামনারায়ণ, মাইকেল, দীনবন্ধুর ভিতর দিয়া বাংলা নাট্যসাহিত্যের যে গদ্যভাষা ক্রম-বিকাশের পথে অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল, গিরিশচন্দ্র তাহার সঙ্গে কোন যোগ স্থাপন করিতে পারেন নাই—'আলাল' ও 'হুতোমে'র ভিতর দিয়া কথ্যভাষার যে অনুশীলন ইতিপূর্বেই সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, গিরিশচন্দ্র তাহার সঙ্গেও নিজের গদ্য রচনার যোগ স্থাপন করেন নাই। অথচ নাটকের ভাষা কথ্যভাষা; অতএব পূর্ববর্তী নাটকসমূহের সংলাপের ভাষা কিংবা প্রচলিত গদ্য সাহিত্যে ব্যবহৃত কথ্যভাষা, ইহাদের উভয়ের সঙ্গেই নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের যোগ থাকিবার কথা ছিল। বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমারের সাধুভাষার সঙ্গে তাঁহার কোন সম্পর্ক থাকিবার কথাও নহে এবং তাহা ছিলও না। অতএব সকল দিক দিয়া বিচার করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, গিরিশচন্দ্রের গদ্যভাষা তাঁহার নিজস্ব সৃষ্টি—ইহা কোন বিশিষ্ট বাংলা গদ্যরীতির ক্রম-বিকাশের স্বাভাবিক ফল নহে; সেইজন্য বাংলা নাটকের ভাষার ক্রমবিকাশের ধারায় ইহার কোনও স্থান নাই। যে ভাষার শক্তি আছে, তাহারই জীবন আছে—জীবন অর্থ গতি; অতএব যাহার জীবন আছে, তাহার ক্রম-বিকাশও আছে। গিরিশচন্দ্রের গদ্যভাষা বাংলা গদ্যের জীবনধারা হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল। অতএব বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশের সূত্র ধরিয়া ইহার প্রকৃতি বিচার করা সম্ভব হইবে না।

রামনারায়ণ, দীনবন্ধু, এমন কি, মাইকেল মধুসূদনেরও বাংলার সমাজের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা ছিল, গিরিশচন্দ্রের তাহা ছিল না। বাংলার সমাজ বলিতে গিরিশচন্দ্র কেবলমাত্র এখনকার উত্তর কলিকাতা অঞ্চলের মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী ও চাকুরীজীবী সমাজকেই জানিতেন। অবশ্য উত্তর কলিকাতা বলিতে তখন কলিকাতাই বুঝাইত, দক্ষিণ কলিকাতার তখনও জন্ম হয় নাই। দেশীয় এবং পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় এই সমাজ অগ্রসর হইলেও বিশিষ্ট একটি নাগরিক জীবনের নির্দিষ্ট পরিবেশের মধ্যে অবস্থান করিবার ফলে ইহার মধ্যে বৈচিত্র্যও বেশি প্রকাশ পাইতে পারে নাই। বাঙ্গালীর যথার্থ সামাজিক জীবন বাংলার পল্লীতেই তখনও বিকাশ লাভ করিতেছিল, সদ্যপ্রতিষ্ঠিত নাগরিক জীবনে তাহার একটা সংহতিহীন ও কৃত্রিম পরিচয় মাত্র প্রকাশ পাইত। দুর্ভাগ্যের বিষয়, বাংলার বিস্তৃত পল্লীজীবনের নিভৃত ছায়া-শীতল লোকে বাংলার যে জীবন আপনার সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ ছিল, গিরিশচন্দ্র তাহার সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতাই লাভ করিতে পারেন নাই; সেই সঙ্গে বাঙ্গালীর কথ্যভাষার যে প্রাণরস, তাহারও তিনি সন্ধান পান নাই। সুতরাং বাধ্য হইয়া একটি নব-প্রতিষ্ঠিত অসংবদ্ধ সামাজিক জীবনের অপরিণত ভাষা অবলম্বন করিয়া গিরিশচন্দ্রকে তাঁহার নাটক রচনা করিতে হইয়াছে। বিশেষত গিরিশচন্দ্র বস্তুবাদী ছিলেন না; অতএব বাংলা গদ্যভাষার যে একটি বস্তুরস আছে, তাহা তিনি তেমন গভীরভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেও যান নাই। বস্তু-অভিনিবেশ থাকিলে কৃত্রিম নাগরিক জীবনে বাস করিয়াও তিনি বাংলার কথ্যভাষার কতকটা বৈচিত্র্যের সন্ধান লাভ করিতে পারিতেন। সেইজন্য গিরিশচন্দ্রের গদ্যভাষা কতকটা কৃত্রিম এবং প্রাণহীন, সতেজ প্রাণরস ইহার ভিতর দিয়া স্ফূর্তিলাভ করিতে পারে নাই। রামনারায়ণ-দীনবন্ধু, এমন কি, মাইকেল মধুসূদনও তাঁহাদের সামাজিক প্রহসনগুলিতে ব্যবহৃত গদ্যভাষায় যে পরিমাণ বাংলা প্রবচন ও বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ বা 'ইডিয়ম' ব্যবহার করিয়াছেন, গিরিশচন্দ্র তাহার একাংশও ব্যবহার করিতে পারেন নাই। নাটকের ভাষা প্রত্যক্ষ কথ্যভাষা বলিয়াই ইহার মধ্যে প্রচলিত প্রবচন ও বিশিষ্টার্থক শব্দের যত বেশি প্রয়োগ হয়, ততই ইহার প্রত্যক্ষতা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে—দীনবন্ধুর ভাষার ইহা একটি প্রধান আকর্ষণীয় গুণ ছিল। গিরিশচন্দ্রের গদ্যভাষা এই দিক দিয়া অত্যন্ত নিষ্প্রাণ। প্রবচন ও 'ইডিয়মে'র প্রয়োগ তাহাতে এক প্রকার নাই বলিলেই চলে—তা

যে নবপ্রতিষ্ঠিত সংহতিহীন নাগরিক সমাজ অবলম্বন করিয়া তিনি তাঁহার সামাজিক নাটক কয়খানি রচনা করিয়াছেন, তাহার মধ্য হইতে ভাষার মৌলিক রসরূপের উদ্ধার সাধনও সম্ভবপর ছিল না।

গিরিশচন্দ্রের পদ্যভাষা সম্পর্কে এবার কিছু বলিব। পৌরাণিক ও রোমাণ্টিক নাটকের মধ্যে গিরিশচন্দ্র যে অমিত্র পদ্যচ্ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা 'গৈরিশ ছন্দ' বলিয়া পরিচয় লাভ করিয়াছে। অবশ্য এই ছন্দ গিরিশচন্দ্রই যে সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন, তাহা নহে—তাঁহার পূর্বে মাইকেল মধুসূদন দত্তই, অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্যরচনার পূর্বেই, তাঁহার 'পদ্মাবতী' নাটকের মধ্যে এই ছন্দ সর্বপ্রথম ব্যবহার করিয়াছিলেন। অতএব নাটকে মধুসূদন ইহার সর্বপ্রথম প্রচলন করেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দে পূর্ণাঙ্গ কাব্য-রচনার পর তিনি এই ছন্দ আর ব্যবহার করেন নাই। তবে গিরিশচন্দ্রই এই ছন্দ অত্যন্ত ব্যাপকভাবে ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া ইহা 'গৈরিশ ছন্দ' নামে পরিচিত হইয়াছে। যতিস্থানে চরণচ্ছেদই এই ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য। গিরিশচন্দ্র তাঁহার রচনা নিরক্ষর অভিনেত্রী ও অল্পশিক্ষিত অভিনেতাদিগের সহজ আবৃত্তিযোগ্য করিবার জন্যই এই রীতি গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—কারণ, চরণচ্ছেদ দ্বারা যতিস্থানটি এখানে এতই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, তাহার জন্য অর্থ কিংবা বিরামচিহ্নের অনুসন্ধান করিতে হয় না। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের চরণসমূহ চৌদ্দ অক্ষরের শৃঙ্খলে বাঁধা থাকিয়াও যতির যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা অভাবনীয়। ক্ষিপ্র রচনায় বাধা হইবে বলিয়া গিরিশচন্দ্র চৌদ্দ অক্ষরের শাসন অস্বীকার করিয়াছেন, নতুবা গৈরিশ ছন্দ মাইকেলী অমিত্রাক্ষরেরই প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে সৃষ্টি বলিতে হইবে।

নিয়মিত যতিস্থানেই যে গিরিশচন্দ্র চরণচ্ছেদের রীতি রক্ষা করিয়াছেন, তাহা নহে; কোন কোন স্থলে যতিস্থানে বিরামচিহ্ন ব্যবহার করিয়াও ইহার চরণ দীর্ঘায়িত করিয়াছেন, এই দীর্ঘীকরণ অনেক সময় চৌদ্দ অক্ষরের শাসনও অস্বীকার করিয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

> আজ্ঞা দেহ যাদব-প্রধান,
> পুত্রবধূ সনে যাব পুনঃ বিরাট-ভবনে—
> স্নান করি জাহ্নবী-সলিলে।
> হে কেশব, চিরদিন আশ্রিত পাণ্ডব তব,

আসন্ন সংগ্রাম, শুনি দুর্যোধন,
সংযোজন করিয়াছে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা।
বিরাট-পাঞ্চাল মাত্র পাণ্ডব-সহায়,—
ভাবি, হে মধুসূদন, মহারণে না জানি কি হবে।

এখানে চরণচ্ছেদের বিশিষ্ট কোন নিয়মরক্ষা করা হইয়াছে বলিয়া অনুভূত হইবে না। মধুসূদন তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দে যতি-বিন্যাস অনিয়মিত রাখিয়াও প্রতি চরণে চৌদ্দ অক্ষরের নিয়ম-রক্ষা করিয়াছিলেন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নবীনচন্দ্র সেনের অমিত্রাক্ষর ছন্দে যতি-বিন্যাসের বৈচিত্র্য না থাকিলেও প্রতি চরণে চৌদ্দ অক্ষরের নিয়ম কোথাও লঙ্ঘিত হয় নাই; কিন্তু গিরিশচন্দ্রের অমিত্রাক্ষর ছন্দে চৌদ্দ অক্ষরের কোন শাসন স্বীকার করা হয় নাই এবং যদিও যতিস্থানে চরণচ্ছেদ ইহার মৌলিক লক্ষ্য ছিল বলিয়া মনে হয়, তথাপি এই রীতিও সর্বত্র প্রতিপালিত হয় নাই। অনুপ্রাস এবং যুক্ত ব্যঞ্জনের যথাযথ প্রয়োগ দ্বারা মধুসূদন তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দে যে ধ্বনিরস সৃষ্টি করিয়াছিলেন, গিরিশচন্দ্রের ছন্দে তাহার অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না। নাটকের সংলাপে অনুপ্রাস শ্রুতিকটু হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু যুক্ত ব্যঞ্জনের যথাযথ ব্যবহার করিতে পারিলে অনেক সময় রস নিবিড় হইয়া উঠিতে পারিত—গিরিশচন্দ্র মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের এই নিগূঢ় মর্মটুকু গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তথাপি একথা সত্য, গিরিশচন্দ্রের এই ছন্দ তাঁহার কোন মৌলিক সৃষ্টি নহে, মধুসূদনেরই অমিত্রাক্ষরের উপর ভিত্তি করিয়া সৃষ্ট। মধুসূদন-প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষরের মূল প্রাণধর্মটি সমসাময়িক অন্যান্য কবি এবং নাট্যকার যেমন বুঝিতে না পারিয়া তাহার নিষ্ফল অনুকরণ মাত্র করিয়াছেন, গিরিশচন্দ্রেও তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যাইবে না। ক্ষিপ্র রচনার জন্য গিরিশচন্দ্রের ছন্দে কতকগুলি ত্রুটি অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। অনেক সময় ইহার গাঁথুনি নিতান্ত শিথিল বলিয়া অনুভূত হইবে, যেমন,

ধন্য মাহিষ্মতীপুরী
ধন্য মম পিতৃদেবগণ,
ধন্য প্রজা,
পাখী শাখী জীবজন্তু পতঙ্গনিচয়।

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও গিরিশচন্দ্রের ছন্দের কতকগুলি বিশিষ্ট গুণও ছিল। ইহার নিরাভরণ ও অলঙ্কার-বর্জিত রূপ নাট্যকাহিনী সহজভাবে বর্ণনা করিয়া যাইবার পক্ষে পরম সহায়ক হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র সচেতনভাবে ইহার কোন শিল্পরূপ

না দিলেও বাংলা শব্দের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুণে ইহার মধ্য দিয়া কোন কোন সময় যে শিল্পপরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা একেবারে উপেক্ষণীয় বলিয়া বোধ হইবে না।

পৌরাণিক নাটক

গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলি তাহাদের বিষয়বস্তুর দিক হইতে এই কয়েকটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে ; যথা পৌরাণিক নাটক, চরিত-নাটক, রোমান্টিক নাটক, ঐতিহাসিক নাটক এবং সামাজিক নাটক। সামাজিক নাটকগুলি আবার দুই ভাগে বিভক্ত—নাটক ও প্রহসন।

পৌরাণিক নাটক কথা দুইটি আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী বলিয়া মনে হয় ; কারণ, যাহা পুরাণ, তাহা নাটক হইতে পারে না এবং যাহা নাটক, তাহা পুরাণ নহে। পুরাণের বৈশিষ্ট্য অলৌকিকতা এবং নাটকের বৈশিষ্ট্য বাস্তবতা—ইহাদের উভয়ের মধ্য দিয়া পরস্পর যে ভাব ও আদর্শগত বিরোধ আছে, তাহাই এই শ্রেণীর নাটক রচনার পরিপন্থী। কিন্তু বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে পৌরাণিক নাটক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী হইয়াছে এবং নিজের বৈশিষ্ট্য দ্বারা ইহা সাহিত্যিক পরিচয় লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। কি গুণে ইহা নাটক হইয়াও পুরাণ এবং পুরাণ হইয়াও নাটক হইয়াছে, তাহাই এখানে বিচার করিয়া দেখা যাইবে।

নাট্যসাহিত্যে ঐতিহাসিক নাটকের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। কারণ, ইতিহাস সত্য ঘটনার বিবরণ, ইহার মধ্যে অলৌকিকতা কিছুমাত্র নাই। ইতিহাসের মধ্যে কেবল মাত্র প্রকৃত ঘটনারই বিবরণ থাকে, ঘটনারাশির অন্তরালে চরিত্রগুলির যে একটি সহজ মানবিক পরিচয় আছে, তাহা প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে ; ঐতিহাসিক ঘটনারাশির অন্তরাল হইতে ইহার চরিত্রগুলির মানবিক পরিচয় উদ্ধার করাই ঐতিহাসিক নাট্যকারের কাজ। এখানে ঐতিহাসিক নাটক যেমন সত্য, ইহার চরিত্রগুলির মানবিক পরিচয়ও তেমনই বাস্তব হইয়া উঠিবার সুযোগ পায়। অতএব ঐতিহাসিক নাটকের নাটকীয় উপযোগিতা লাভ করিবার পক্ষে ভাব কিংবা বস্তুগত বিরোধ নাই। সুতরাং ঐতিহাসিক নাটক একাধারে যেমন ইতিহাস, অন্য দিক দিয়া তেমনই নাটকও বটে। পৌরাণিক নাটক সম্পর্কে এ কথা বলিতে পারা যায় না ; কারণ, পুরাণের অলৌকিক বিষয় অবলম্বন করিয়া আর যাহাই রচিত হউক, নাটক

রচিত হইতে পারে না। বাংলা পৌরাণিক নাটকের মধ্যে কি ভাবে সে অলৌকিকতা এবং বাস্তবতার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হইয়াছে, তাহাই এখানে বিবেচ্য বিষয়।

পৌরাণিক নাটক আর যাহাই হউক, ইহা নাটকই। অতএব নাটকের যাহা বিশিষ্ট ধর্ম, তাহা এখানেও আমরা স্বভাবতই আশা করিব। নাটক বাস্তব জীবন-দ্বন্দ্বের রূপায়ণ। সুতরাং পৌরাণিক নাটক যদি নাটকই হয়, তবে ইহার মধ্যেও যে জীবনের পরিচয় পাওয়া যাইবে, তাহাও বাস্তব জীবনকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিবে না। অতএব পৌরাণিক নাটকের মধ্যে যে সকল চরিত্র থাকিবে, তাঁহাদের পরিচয় যাহাই থাকুক না কেন, অর্থাৎ তাঁহাদের নামগুলি পুরাণাগত হইলেও তাঁহাদের আচরণ সম্পূর্ণ লৌকিক হইতে বাধ্য। ইহার অর্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণ, মহাদেব, পার্বতী এই সকল পৌরাণিক দেবদেবীর চরিত্র যদি কোনও নাটকাখ্যানে স্থান পায়, তবে তাঁহাদের আচরণ বাস্তব জীবনানুগ হইতে হইবে—পুরাণানুগ হইলে চলিবে না। কিন্তু সম্পূর্ণ যদি তাহাই হইত, তবে পৌরাণিক নাটকের জন্য স্বতন্ত্র একটি বিভাগ নির্দেশ করিবার কোনই কারণ ছিল না—সাধারণ নাটক বলিয়াই তাহা গৃহীত হইতে পারিত। পৌরাণিক নাটকের মধ্যে অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, পৌরাণিক চরিত্রগুলি ইহাদের অলৌকিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছে; যদি তাহাই হয়, তবে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, ইহারা নাট্যকাহিনীর মূল ধারা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে কি না। যদি অলৌকিক বা পৌরাণিক চরিত্রগুলি ইহাদের অলৌকিকত্ব বিসর্জন না দিয়া লৌকিক চরিত্রগুলির সঙ্গে সমান অংশ গ্রহণ করে এবং মূল নাট্যকাহিনীর ধারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া কাহিনীকে ইহার বিশিষ্ট পরিণতির পথে অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইতে সহায়তা করে, তবে তাহা পুরাণ হইবে, নাটক হইবে না। কিন্তু ইহার অলৌকিক চরিত্রগুলি যদি মূল কাহিনীর বাহ্য অলঙ্কার স্বরূপ মাত্র অবস্থান করে, ইহার পরিণতি কোন দিক দিয়া নিয়ন্ত্রিত করিতে সহায়তা না করে, তবে কেবলমাত্র ইহাদের উপস্থিতি দ্বারা কাহিনীর নাটকীয় গৌরব ক্ষুণ্ণ করিতে পারিবে না; প্রকৃত পক্ষে ইহাদিগকেই পৌরাণিক নাটক বলা হইয়া থাকে। অলৌকিক চরিত্র কিংবা অলৌকিক বিষয় নাটকে থাকিলেই যে তাহা নাটক বলিয়া গণ্য পারিবে না, এমন কোনও কথা হইতে পারে না। সেক্সপীয়রের নাটকেও প্রেতাত্মা, ডাইনী ইত্যাদি অলৌকিক চরিত্র আছে, কিন্তু তাহা

সত্ত্বেও তাঁহার কাহিনীর নাটকীয় ধর্ম কোনও দিক দিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, এমন কথা বলিতে পারা যায় না। অলৌকিক বিষয় কিংবা অলৌকিক চরিত্র নাটকে কি ভাবে ব্যবহার করা হয়, তাহার উপরই পৌরাণিক নাটকের নাটকত্ব নির্ভর করে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের ভিতর দিয়া কুন্দনন্দিনীর স্বপ্নদর্শন বিষয়ক একটি অলৌকিক বৃত্তান্তের অবতারণা করিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও 'বিষবৃক্ষে'র ঔপন্যাসিক ধর্ম ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, এমন কথা বলিতে পারা যাইবে না। কারণ, কুন্দনন্দিনীর স্বপ্নদর্শন মূল 'বিষবৃক্ষ' কাহিনীর বহিরঙ্গগত অলঙ্কার স্বরূপ মাত্র—কাহিনীর মূলধারা এই ঘটনা-নিরপেক্ষ এবং স্বাধীনভাবেই ঘটিয়া গিয়াছে বলিয়া অনুভব করিতে এতটুকুও বেগ পাইতে হয় না। অতএব ইহা বিষবৃক্ষ-কাহিনীর বহিরঙ্গগত সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে মাত্র, কোনদিক দিয়া ইহার অন্তর স্পর্শ করিতে পারে নাই। এই প্রকার পৌরাণিক নাটকের অলৌকিক চরিত্রগুলি নিজের আচরণ বাস্তবধর্মী করিয়া কিংবা কাহিনীর ধারা হইতে দূরবর্তী থাকিয়া নাটকের মধ্যে অবস্থান করিয়া থাকে। পৌরাণিক নাটকের অলৌকিক চরিত্রগুলি অনেক সময় কোনও নিরবয়ব (abstract) ভাবের বস্তুরূপ বা রূপক হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর রূপক চরিত্র দ্বারা কাহিনীর ধারা কখনও নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না, ইহা দ্বারা কাহিনীর বহিরঙ্গগত সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় মাত্র। অপরেশ-চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'কর্ণার্জুন' বহু-প্রশংসিত পৌরাণিক নাটক—নিয়তি ইহার একটি অলৌকিক চরিত্র। নিয়তির দ্বারা যে মানুষের জীবনের পরিণতি নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে, ভারতীয় হিন্দুমাত্রই তাহা বিশ্বাস করিয়া থাকে। এই নিয়তি অদৃশ্য থাকিয়া মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত করে—সেই জন্যই ইহার নাম অদৃষ্ট। নিয়তি অপ্রত্যক্ষ থাকিয়া মানুষের জীবনে যে কাজ করিয়া থাকে, নাটকের মধ্যে তাহা প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিলেও জীবনে সেই কার্যের কোনও ব্যতিক্রম হইবার কথা নহে—অদৃশ্যকে দৃশ্য করিবার ফলে, অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিবার ফলে মূল নাট্য-কাহিনীর ধারায় কোনও ব্যতিক্রম সৃষ্টি হয় না—হইবার কথাও নহে; তবে ইহা দ্বারা একটি সার্থক লৌকিক আবেদন (popular appeal) সৃষ্টি হইয়া থাকে। অতএব যাঁহারা জনপ্রিয় নাট্যকার তাঁহারা এই লৌকিক আবেদনের প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

রূপক চরিত্র ব্যতীতও পৌরাণিক নাটকে স্বাধীন দৈব চরিত্রের সঙ্গেও আমাদের সাক্ষাৎকার ঘটিতে পারে। একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলে আমার

বক্তব্য বিষয় স্পষ্টতর হইতে পারে। এই বিষয়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষের জনপ্রিয় পৌরাণিক নাটক 'জনা'র উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহার শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র অলৌকিক চরিত্র বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ইহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ যে সকল আচরণ করিয়াছেন, তাহা সবই লৌকিক—বিন্দুমাত্রও অলৌকিক নহে। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সখা এবং আত্মীয় অর্জুনের নিরাপত্তা রক্ষা করিবার জন্য রাজধানী দ্বারকা পরিত্যাগ করিয়া মাহিষ্মতীপুরীতে অর্জুনের শিবিরে উপস্থিত হইয়াছেন। ইহা দ্বারা তিনি কোনও অলৌকিক আচরণ করেন নাই। স্পষ্টতই বুঝিতে পারা যাইতেছে, তাঁহার এই আচরণ নিতান্ত মানবিক। সখা এবং আত্মীয়কে রক্ষা করিবার জন্য এখানে তিনি সাধারণ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন মাত্র। তিনি যদি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত না হইয়া দ্বারকা হইতেই অর্জুনকে রক্ষা করিবার জন্য কোনও অলৌকিক কৌশল অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার এই চরিত্রটি অলৌকিক লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া মনে হইত। 'জনা' নাটকের অলৌকিক চরিত্র মহাদেব। কিন্তু মহাদেব এই নাটকের কাহিনীর ধারায় কোনও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নাই—তাঁহার সম্পর্কিত দৃশ্যটি এই নাটকে যোজনা না করিলেও নাট্যকাহিনীর পরিণতি অন্য প্রকার হইত না; অতএব দেখা যাইতেছে, তাঁহার সম্পর্কিত দৃশ্যটি নাট্যকাহিনীর অনিবার্য ধারাক্রমে এখানে উপস্থিত করা হয় নাই। সুতরাং তাঁহার অবস্থিতির জন্য জনা-নাটকের কাহিনী অলৌকিকতা দ্বারা ভারাক্রান্ত হয় নাই। ইহাই আদর্শ পৌরাণিক নাটকের বৈশিষ্ট্য। 'জনা'—নাটকের মধ্যে কয়েকটি অলৌকিক নারীচরিত্র আছে; যেমন গঙ্গা, রতি, ডাকিনী ও যোগিনীগণ; ইহারা প্রত্যেকেই কাহিনীর বহিরঙ্গগত সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে মাত্র; কেহই ইহার অন্তর স্পর্শ করিতে কিংবা কাহিনীর ধারা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে নাই। অতএব কাহিনীর নাট্যগুণ ইহাদের দ্বারা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। এই চরিত্রগুলি 'জনা'-নাট্যকাহিনীর সঙ্গে সংযুক্ত আছে বলিয়াই, এই নাটক পৌরাণিক নাটকের সংজ্ঞালাভ করিয়াছে—নতুবা বস্তুধর্মী নাটকের সঙ্গে ইহার কোনও ব্যতিক্রম লক্ষ্য হইত না।

রামায়ণ-মহাভারত হইতে কাহিনী গ্রহণ করিয়া বাংলায় অসংখ্য নাটক রচিত হইয়াছে—তাহাও সাধারণত পৌরাণিক নাটক বলিয়াই পরিচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রামায়ণ কাব্য এবং মহাভারত একাধারে কাব্য ও ইতিহাস—

প্রকৃত পুরাণ বলিতে যাহা বুঝায়, মূলত ইহাদের একটিও তাহা নহে। তবে ইহাদের মধ্য হইতে বিষয়বস্তু সংগ্রহ করিয়া রচিত নাটক পৌরাণিক নাটক আখ্যা দেওয়া কতদূর সমীচীন? কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলা', কিংবা ভবভূতির 'উত্তর-রামচরিত'কে কি কেহ পৌরাণিক নাটক সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া থাকেন? সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে পৌরাণিক নাটক নামে নাটকের কোনও শ্রেণীবিভাগ করা হয় নাই, আধুনিক ইংরাজি নাট্যসাহিত্যেও mythological drama নামক নাটকের কোনও শ্রেণীবিভাগ স্বীকৃত হয় নাই; মধ্যযুগীয় Miracle Play স্বতন্ত্র জিনিস। বাইবেলের বিষয় লইয়াও ইউরোপে বহু আধুনিক নাটক রচিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে সাধারণ নাটকের ব্যতিক্রম কিছু পাওয়া যায় না। বাইবেলের চরিত্র তাহাতে থাকিলেও তাহাদের আচরণ সম্পূর্ণ মানবিক অনুভূতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বাংলা পৌরাণিক নাটকের মত কাহিনীর অলঙ্কার স্বরূপও তাহাতে কোনও অলৌকিক চরিত্র স্থান পায় না। অতএব দেখা যাইতেছে, ধর্মবিশ্বাসী বাঙ্গালী হিন্দুর জাতীয় রস-চেতনার মধ্যেই পৌরাণিক নাটক জন্মগ্রহণ করিয়াছে—ইহা উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর ও পাশ্চাত্ত্য জীবনাদর্শের সমন্বয় সাধনার এক বিচিত্র রসময় ফল।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, বাংলার পৌরাণিক নাটকগুলি এদেশে প্রচলিত যাত্রা বা গীতাভিনয় হইতে উদ্ভূত হইয়াছে; কিন্তু একথা সত্য নহে। এদেশে পাশ্চাত্ত্য আদর্শে রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে আধুনিক যাত্রা বা 'নূতন যাত্রা'র কোন অস্তিত্ব ছিল না। নাটগীত নামক মধ্যযুগে যে একশ্রেণীর নৃত্য-সম্বলিত সঙ্গীতানুষ্ঠান প্রচলিত ছিল, তাহার প্রকৃতি স্বতন্ত্র ছিল। 'অক্রূরযাত্রা' কিংবা 'কালীয়দমন যাত্রা' ইত্যাদির প্রকৃতিও স্বতন্ত্র। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাত্মবোধের সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্ত্য নাট্যসাহিত্যাগত বাস্তবজীবনবোধের সংমিশ্রণের মুখ্য ফলস্বরূপই বাংলা পৌরাণিক নাটকগুলির জন্ম হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের মত নাট্যসাহিত্যের মধ্য দিয়াও যে বাঙ্গালী তাহার জাতীয় চেতনা সম্পূর্ণ বিসর্জন দেয় নাই, বাংলা পৌরাণিক নাটকগুলিই তাহার প্রমাণ।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ বাংলা পৌরাণিক নাটক রচনায় যে দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন, তাঁহার অনুকরণকারীদিগের মধ্যে কেহই তাহা দেখাইতে পারেন নাই। রাজকৃষ্ণ রায়ের পৌরাণিক নাটকসমূহ পুরাণ, নাটক নহে। কেহ কেহ পৌরাণিক নাটকের মধ্যে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব পরিবেশন করিয়াছেন; অতএব তাহা দর্শন,

নাটক নহে। রবীন্দ্রনাথও পৌরাণিক বিষয় লইয়া কয়েকখানি নাটক রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা পুরাণও নহে, নাটকও নহে—তাহা কাব্য।

অতি-আধুনিক যুগে পৌরাণিক নাটক রচনার প্রেরণা যে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহার কারণ, সমাজের দৈব বিশ্বাস ইতিমধ্যে শিথিল হইয়া গিয়াছে; অদৃষ্ট-বাদের পরিবর্তে যুক্তিবাদের বিকাশ হইয়াছে। অতএব পৌরাণিক নাটকের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছে।

পৌরাণিক গীতিনাট্য রচনার ভিতর দিয়াই গিরিশচন্দ্রের নাট্যকার-জীবনের সূত্রপাত হয়। গিরিশচন্দ্র যখন আবির্ভূত হন, তখন কলিকাতার নাগরিক সমাজে যাত্রা, কবি ও অন্যান্য লোক- ও রাগ-সঙ্গীতের অত্যন্ত ব্যাপক প্রভাব; সাধারণের রস-রুচি ইহাদের আদর্শেই গড়িয়া উঠিতেছিল। দেশীয় যাত্রা-সমূহের মধ্যে উত্তর ভারত হইতে আগত বিবিধ রাগসঙ্গীত প্রবিষ্ট হইবার ফলে ইহারা নূতন রূপ লাভ করিতেছিল এবং যাত্রার এই পাঁচমিশেলী নূতন রূপটি নাগরিক সমাজের নিকট অত্যন্ত রুচিকর হইয়া উঠিয়াছিল। এই ধারাটির প্রতি গিরিশচন্দ্র প্রথম হইতেই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং বাহির হইতে ইহাই অবলম্বন করিয়া তাঁহার সাধনার সূত্রপাত হয়।

ধর্মবোধ এই জাতির একটি বিশিষ্ট সংস্কার। দুই শত বৎসরের ইংরেজি শিক্ষার ফলস্বরূপ উচ্চতর সমাজের মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সেই সংস্কারে আঘাত লাগিলেও, অন্তরের দিক দিয়া এই জাতির যে বিশেষ পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা নহে। অতএব গিরিশচন্দ্র যখন এই ধর্মবোধ অবলম্বন করিয়া তাঁহার পৌরাণিক নাটকসমূহ রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, তখন সহজেই ইহাদের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টিও আকৃষ্ট হইল। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলার সমাজে পৌরাণিক বিষয়বস্তুর যে মূল্য দাঁড়াইয়াছে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে তাহা অপেক্ষা যে ইহার অধিক মূল্য ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। তখনও সামাজিক কিংবা ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুর প্রতি সাধারণ দর্শকের অনুরাগ সৃষ্টি হয় নাই। বিশেষত যাত্রার পৌরাণিক আবহাওয়া তখনও বাঙ্গালী রসিকের চিত্তাকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ছিল। এই অবস্থায় গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া তাঁহার নাটক রচনার সূত্রপাত করিয়া প্রথম হইতেই অতি সহজে বাঙ্গালীর মনোরাজ্য অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্র তাঁহার পৌরাণিক নাটকে বাঙ্গালীর নিজস্ব ধর্মবোধকেই রূপ দিয়াছেন। বাংলার প্রাচীন সাহিত্যে দেবতার সঙ্গে মানুষের যে একটি সহজ

সম্পর্কের বর্ণনা পাওয়া যায়, গিরিশচন্দ্রও তাহারই সূত্র ধরিয়া তাঁহার পৌরাণিক নাটকসমূহ রচনা করিয়াছেন—পুরাণের যে সকল চরিত্রের সঙ্গে বাংলাদেশের মানবিক চরিত্রসমূহ কোন সহজ যোগ স্থাপন করিতে পারে নাই, গিরিশচন্দ্র তাহাদিগকে তাঁহার নাটকে স্থান দেন নাই। যে সকল পুরাণ বাংলার জলবায়ুতে স্বাঙ্গীকৃত (naturalized) হইয়া গিয়াছিল, তাহাই গিরিশচন্দ্রের অবলম্বন ছিল। এই ভাবে কৃত্তিবাসের রাম-লক্ষ্মণ, কাশীরামদাসের কুরু-পাণ্ডব, বৈষ্ণব কবির রাধাকৃষ্ণ, শাক্ত কবির চণ্ডীমনসা, কবিওয়ালার উমা-মেনকা,—ইহারাই গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকসমূহে নায়ক নায়িকা রূপে স্থানলাভ করিয়াছে, বাল্মীকি-বেদব্যাস তাঁহার কল্পনার রাজ্য অধিকার করিতে পারেন নাই। অতএব গিরিশচন্দ্রের পুরাণ বাঙ্গালীর পুরাণ, সনাতন পুরাণ নহে। সনাতন হিন্দুধর্ম অতিক্রম করিয়াও বাঙ্গালীর যে একটি নিজস্ব জাতীয় ধর্ম আছে, গিরিশচন্দ্র তাহারই উদ্গাতা ছিলেন; সেইজন্য তাঁহার পৌরাণিক নাটকগুলি বাঙ্গালীর প্রাণরসে উচ্ছল।

তথাপি গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাট্যরচনার একটি ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করিয়া গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহার শেষ জীবনের রচনাগুলির মধ্যে এই ভাব ক্রমে হ্রাস পাইয়া গিয়াছে। পরমহংসদেবের সংস্পর্শে আসিবার পর হইতেই গিরিশচন্দ্র যে একটি বিশিষ্ট অধ্যাত্মবোধ সম্বন্ধে সজাগ হইয়া উঠিয়াছিলেন, সে কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই ভাব তাঁহার শেষ জীবনের পৌরাণিক নাটকগুলির উপর আরোপ করিবার ফলে তাহাদের মধ্য হইতে পূর্বোক্ত সহজ স্বাচ্ছন্দ্য দূর হইয়া যায়—তখন রসের পরিবর্তে তাহারা তত্ত্বের বাহন হইয়া দাঁড়ায়। তবে এই ত্রুটি তাঁহার শেষ বয়সের পৌরাণিক নাটক অপেক্ষা রোমান্টিক নাটকেই অধিকতর প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

যাত্রার মধ্যে যেমন কোন দ্বন্দ্ব কিংবা পরস্পর-বিরোধী আদর্শের সংঘাত নাই, গিরিশচন্দ্রের অধিকাংশ পৌরাণিক নাটকও তেমনই। ইহারা কেবলমাত্র পৌরাণিক কাহিনীর এক একটি বাহ্যিক নাট্যরূপ মাত্র, অন্তরের দিক দিয়া প্রকৃত নাটকের কোন লক্ষণ ইহাদের মধ্যে নাই। কেবলমাত্র তাঁহার শেষ জীবনের দুই একটি নাটক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের দিক দিয়া কতকটা নাটকীয় গৌরব লাভ করিয়াছে।

যাত্রার মধ্যে মানুষের কার্যাবলী দেবতা দ্বারা সর্বদাই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে

বলিয়া ইহা কখনও নাটকের মর্যাদা লাভ করিতে পারে না। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকসমূহ যাত্রার আদর্শে রচিত হইলেও, ইহাদের মধ্যে দেবতা অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে মানুষের কার্যাবলী সর্বদা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে বলিয়া অনুভূত হইবে না, ইহার কারণ, বাঙ্গালীর নিজস্ব ধর্মবোধের মধ্যে দেবতা ও মানুষের পার্থক্য বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানে দেবতা শ্রেষ্ঠ মানব বা superman মাত্র এবং মানুষের সাহচর্যেই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব (superiority) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মানুষকে বাদ দিয়া এখানে দেবতার স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নাই। প্রাচীন গ্রীক্ সাহিত্যে দেবতা ও মানুষের মধ্যে যে সম্পর্ক কল্পিত হইয়াছে, বাংলার সমাজে তাহার ব্যতিক্রম আছে—গিরিশচন্দ্র বাঙ্গালীর দেবতাসম্পর্কিত বিশিষ্ট ধারণা অবলম্বন করিয়া তাঁহার নাটক রচনা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাটকে দেবতা ও মানুষের পার্থক্যটুকু এত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই। দেবতার মধ্যে রাম এবং কৃষ্ণই গিরিশচন্দ্রের অধিকাংশ পৌরাণিক নাটকের নায়ক। রামকে অতিমানব বা superman রূপে এবং কৃষ্ণকেও মানুষের নিতান্ত সন্নিহিত স্থানে আসন দিয়া গিরিশচন্দ্র তাঁহার নাটকসমূহ রচনা করিয়াছেন—তাঁহাদিগের উপর কোন প্রকার অলৌকিকত্ব আরোপ করিয়া তাঁহাদিগকে সাধারণ মানুষ হইতে পৃথক্ করিয়া রাখেন নাই। সাধারণ যাত্রার সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের ইহাই স্থূল পার্থক্য।

গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের মধ্যে রামায়ণ-বিষয়ক রচনাই সংখ্যায় সর্বাধিক—প্রকৃতপক্ষে তিনি সপ্তকাণ্ড কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রায় আদ্যোপান্তই নাট্যরূপে প্রকাশ করিয়াছেন—রঙ্গমঞ্চের ভিতর দিয়া বাঙ্গালীর চির-আদরণীয় রামায়ণ-গান তাহাদিগকে শুনাইয়াছেন। রামায়ণের পরই মহাভারত-বিষয়ক নাটক। ইহাদের সংখ্যা রামায়ণ-বিষয়ক নাটক হইতে অনেক অল্প, এই অল্প-সংখ্যক নাটকও সমগ্র মহাভারতের কাহিনী ব্যাপিয়া বিস্তৃত নহে—ইহার যে সকল অংশে কৃষ্ণ-কাহিনী প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, গিরিশচন্দ্র সাধারণত সেই অংশসমূহই গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার পরই ভাগবত-সম্পর্কিত নাটক। ইহাদের সংখ্যা খুব অল্প না হইলেও ইহারা অধিকাংশই ক্ষুদ্রাকৃতি এবং অতিমাত্রায় গীতিভারাক্রান্ত—ইহাদের মধ্য দিয়া বাংলা বৈষ্ণব গীতিকবিতার সুরই ধ্বনিত হইয়াছে। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের মধ্যে সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য তাঁহার হরগৌরী-বিষয়ক নাটক। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের কবিদিগের মত গিরিশচন্দ্রও হরগৌরীকে পৌরাণিক দেবতারূপে প্রত্যক্ষ করেন নাই—একটি বাঙ্গালী গ্রাম্য

দম্পতিরূপেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এই জন্যই ইহাদের ভিতর দিয়াও বাঙ্গালীর জাতীয় অনুভূতি অতি সহজেই স্পন্দিত হইয়াছে।

রামায়ণ-মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত অথচ ইহাদের মূল কাহিনীর বহির্ভূত স্বতন্ত্র কতকগুলি খণ্ড খণ্ড কাহিনী অবলম্বন করিয়াও গিরিশচন্দ্র কয়েকখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের বিষয়বস্তু নির্বাচন করিতেও তিনি বাঙ্গালীর নিজস্ব রস ও অধ্যাত্মবোধ সম্বন্ধে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন; সেইজন্য বাঙ্গালীর চিরকীর্তিত চরিত্র ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নলদময়ন্তী, শ্রীবৎসচিন্তা, দাতা কর্ণ প্রভৃতির কাহিনীই তিনি এই স্থলে অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে চণ্ডীমঙ্গলের অন্তর্গত ধনপতি সদাগরের কাহিনীও অন্যতম।

বিষয়-অনুসারে নাটকগুলি এখন স্বতন্ত্রভাবে বিচার করিয়া দেখা যাইতেছে প্রত্যেক বিষয়ের অন্তর্গত নাটকগুলির কালানুক্রমিক আলোচনা করা যাইবে।

শারদীয়া পূজোপলক্ষে অভিনয় করিবার জন্য গিরিশচন্দ্র কৃত্তিবাসী রামায়ণের শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া 'অকাল-বোধন' নামক একখানি অতি ক্ষুদ্র নাটিকা রচনা করেন—ইহার মাত্র কয়েক দিবস পূর্বে তিনি 'আগমনী' নামক তাঁহার সর্বপ্রথম নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তাহা হরগৌরী-বিষয়ক নাটকের মধ্যে পরে আলোচনা করা হইয়াছে। 'অকাল-বোধন' গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয় নাট্য রচনা। কিন্তু ইহা নিতান্ত ক্ষুদ্রাকৃতি—মাত্র দুইটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ। এই অল্প পরিসরের মধ্যে ইহার কোন বিশেষত্বও প্রকাশ পাইতে পারে নাই। রামায়ণ-বিষয়ক নাটকের মধ্যে ইহার পরই গিরিশচন্দ্রের 'রাবণ-বধ' নামক নাটক রচিত হয়। 'রাবণ-বধ'ই তাঁহার প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাট্য-রচনা। ইহা তাঁহার ভক্তিমূলক পৌরাণিক নাটকসমূহের অন্যতম। কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণোক্ত রাবণের জীবন-নাট্যের শেষ অধ্যায় লইয়া এই নাটক রচিত। রাবণ এখানে বিষ্ণুর অংশাবতার রামচন্দ্রের ভক্ত; শত্রুরূপে সম্মুখীন রামচন্দ্রকে এই ভাবে তিনি বন্দনা করিতেছেন,—

সাগর ভূধর তরুবর,
স্থাবর জঙ্গম ভুজঙ্গম বিহঙ্গম আদি
বিরাজিত প্রতি লোমকূপে.
ভৃগুপদচিহ্ন বক্ষঃস্থলে।
নিরুপম শ্যামকান্তি,
শ্রীচরণে পতিত-পাবনী গঙ্গা।
ওহে, প্রভু, দয়াময়,

কর কর অস্ত্রাঘাত,
ত্যজিয়া রাক্ষস-বপু,
পুলকে গোলোকে চলে যাই। (৩।১)

রামচন্দ্রও এখানে করুণার অবতার; তিনি কেবল মাত্র বলিতেছেন, 'দিতেছি জীবন-দান, ফিরে দেহ সীতা।' কিন্তু রাবণ রামচন্দ্রের হাতেই মৃত্যুর মধ্য দিয়া মুক্তি কামনা করে; সেইজন্য জীবনে তাহার কোন আকর্ষণ নাই। এতৎসত্ত্বেও রাবণের চিত্রটি নাটকে আনুপূর্বিক ভক্তের চিত্ররূপে অঙ্কিত হয় নাই; কারণ, সীতা-সম্পর্কিত তাঁহার আচরণ প্রকৃত ভক্তজনোচিত নহে। অশোক-কাননে সীতা ও সরমার কথোপকথনের দৃশ্যের মধ্যে (৪।২) মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র চতুর্থ সর্গের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। অন্যত্রও মধুসূদনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কাহিনীর মধ্যে মৌলিক কোন বৈশিষ্ট্য নাই, চরিত্র-সৃষ্টির মধ্যেও নাট্যকার কোনও অভিনবত্ব দেখাইতে পারেন নাই। সমগ্র পরিবেশটি ব্রহ্মা, মহাদেব, ইন্দ্র, অগ্নি, দুর্গা, কালী ইত্যাদি দেব-চরিত্রের সন্নিবেশ দ্বারা অতিমাত্রায় যাত্রার লক্ষণাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। কোন ঘটনা কিংবা কোন চরিত্রই কেন্দ্রীয় নাটকীয় ঘটনা কিংবা চরিত্র হিসাবে বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। লৌকিক উপাদান ইহাতে যথেষ্ট থাকার ফলে বিষয়বস্তুর দিক দিয়া ইহা জন-সাধারণের আকর্ষণীয় হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। 'মেঘনাদ-বধ কাব্যে' মধুসূদন কর্তৃক পরিকল্পিত রাম-লক্ষ্মণ চরিত্রের ত্রুটি স্খালন করিবার উদ্দেশ্যেই যে রাম এবং লক্ষ্মণের দেবত্ব এখানে বিশেষ জোর দিয়াই প্রচার করা হইয়াছে, তাহা সত্য।

'রাবণবধ' নাটকের অভিনয়-সাফল্য দেখিয়া গিরিশচন্দ্র রামায়ণের অন্যান্য বিষয়বস্তু লইয়াও নাটক রচনায় উৎসাহী হইয়া উঠেন এবং ইহার পরই 'সীতার বনবাস' নামক নাটক রচনা করেন। নাট্যকার ইহার মধ্যে কৃত্তিবাস ব্যতীতও বাংলা দেশে প্রচলিত অন্যান্য বিভিন্ন লৌকিক রামায়ণ (Popular Ramayana) কাহিনীর উপকরণও মিশ্রিত করিয়া লইয়াছিলেন—এই বিভিন্ন উপাদানের একত্র সংমিশ্রণের ফলে নাট্যকাহিনীটি আনুপূর্বিক সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া একটি সুসংবদ্ধ রসরূপ লাভ করিতে পারে নাই। ইহার কাহিনীর একটি প্রধান ত্রুটি এই যে, রামচন্দ্র নিজেও সীতার কলঙ্ক-সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়াই তাঁহাকে বিসর্জন দিয়াছিলেন। ঊর্মিলার অনুরোধে সীতা রাবণের একটি চিত্র আঁকিয়া দেখাইলেন, তারপর গর্ভভারজনিত আলস্যবশত অলক্ষিতে সেই চিত্রের উপর

শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। দুর্মুখের মুখ হইতে সীতার কলঙ্ক সম্বন্ধে জনমত শুনিয়া রামচন্দ্র অন্তঃপুরে আসিয়া এই দৃশ্য দেখিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সীতাকে বিসর্জন দিয়া আসিতে লক্ষ্মণকে আদেশ দিলেন—

শুন শুন প্রাণের লক্ষ্মণ,
দুষ্টা নারী সীতা,
চিত্রি রাবণের অবয়ব,
হানি বাজ লাজে,
স্বচক্ষে দেখেছি ঢলিয়াছে কায়,
রাক্ষস ছবির পরে। (১।৩)

বলা বাহুল্য, এই প্রসঙ্গ ভবভূতির 'উত্তররামচরিতে' নাই; এমন কি, কৃত্তিবাসী রামায়ণেও নাই, তবে চন্দ্রাবতীর রামায়ণে আছে। কোন্ সূত্র হইতে চন্দ্রাবতীর রামায়ণে যে ইহা গিয়াছে, তাহা জানিতে পারা যায় না। রামকর্তৃক কলঙ্কিনী বলিয়া স্থির হইয়া যদি সীতা নির্বাসিতা হইয়া থাকেন, তবে নাটকের করুণ রস যে নিবিড় হইতে পারে না, সম্ভবত নাট্যকার তাহা ভাবিয়া দেখেন নাই। এমন কি, এই জন্যই বাল্মীকির বাক্যেও শেষ দৃশ্যে লবকুশকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে গিয়া রামচন্দ্রের নিঃসঙ্কোচ ভাবের মধ্যেও বাধা আসিয়া পড়ে। নাট্যকার এইভাবে সীতা-বিসর্জনজনিত রামচন্দ্রের কলঙ্ক ক্ষালন করিতে চাহিয়াছিলেন। ভবভূতি, কৃত্তিবাস, চন্দ্রাবতী প্রভৃতি বিভিন্ন আদর্শের পরিবর্তে নাট্যকার যদি কেবলমাত্র একটি আদর্শই আদ্যোপান্ত অনুসরণ করিতেন, তাহা হইলে এই ত্রুটির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারিতেন।

রামায়ণের কাহিনী অবলম্বন করিয়া গিরিশচন্দ্র 'লক্ষ্মণ-বর্জন' নামক একখানি ক্ষুদ্র নাটকও রচনা করিয়াছিলেন—ইহা মাত্র নয়টি দৃশ্যে সম্পূর্ণ। ইহা স্বতন্ত্র নাটক হইলেও ইহাকে গিরিশচন্দ্রের 'সীতার বনবাসে'র উপসংহার বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে—ইহার নিতান্ত অপরিসর ক্ষেত্রে কোন চরিত্র স্বকীয় বৈশিষ্ট্য লাভ করিতে পারে নাই, অন্যান্য নাটকের ধারাই অনুসরণ করিয়াছে মাত্র। ইহার বিষয়বস্তু করুণ হইলেও, অপরিসর ক্ষেত্রে ইহার করুণ রস সুপরিস্ফুট হইতে পারে নাই।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের কাহিনী অবলম্বন করিয়া গিরিশচন্দ্র যে কয়খানি নাটক লিখিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে 'সীতার বিবাহ' অন্যতম। ইহার মধ্যে বিশ্বামিত্র কর্তৃক দশরথের নিকট রাম-লক্ষ্মণকে প্রার্থনা, তাড়কা রাক্ষসী বধ, অহল্যা উদ্ধার, সীতার স্বয়ম্বর, হরধনুভঙ্গ, পরশুরাম-মিলন ও দশরথের চারি পুত্রের

বিবাহের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে,-- নাটকটি মাত্র তিনটি অঙ্কে সম্পূর্ণ। বিবাহের স্ত্রী-আচার প্রভৃতির বর্ণনায় গিরিশচন্দ্র আধুনিক বাঙ্গালী পরিবারে প্রচলিত স্ত্রী-আচারসমূহেরই বর্ণনা করিয়াছেন। রামায়ণের কাহিনীটিই এখানে নাটকের আকারে রূপ দান করা হইয়াছে মাত্র—ইহাতে নাট্যকারের কোন উচ্চাঙ্গ শিল্প-কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায় না।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের কাহিনী অবলম্বন করিয়া গিরিশচন্দ্র 'রামের বনবাস' নামেও একখানি পঞ্চাঙ্ক নাটক রচনা করিয়াছিলেন—ইহাতে শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস যাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া চিত্রকূট পর্বতে ভরত-মিলন পর্যন্ত কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। নাটকখানি পঞ্চাঙ্ক হইলেও ইহার মধ্যস্থ অঙ্কগুলি সংক্ষিপ্ত। কৃত্তিবাসের কাহিনীটিকে নাট্যরূপ দেওয়া ব্যতীত ইহাতে গিরিশ-চন্দ্রের আর কোন বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ পায় নাই, তবে বৃদ্ধ রাজা দশরথের পুত্র-বাৎসল্যের চিত্রটি এখানে অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছে বলিয়া অনুভূত হইবে তিনি বলিতেছেন,

> পদ্ম-পত্র জল—
> বিচঞ্চল অন্তর আমার,
> রাম মাত্র সার এ সংসারে—
> ধরি প্রাণ তার মুখ চাহি ;
> সংসার আঁধার জ্ঞান হয়, দেবী মম—
> তিল মাত্র হলে অদর্শন। (১।১)

এই প্রকার ভক্তিমিশ্রিত বাৎসল্যরস নাটকের অন্তর্নিহিত করুণ রসকে অনেক সময় ছাপাইয়া উঠিয়াছে। দৃশ্যগুলি সংক্ষিপ্তভাবে চিত্রিত হইয়াছে বলিয়া ইহার অন্তর্নিহিত সুগভীর করুণ রস কোথাও নিবিড় হইয়া উঠিতে পারে নাই।

ইহার পর গিরিশচন্দ্র কৃত্তিবাসী রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড ও সুন্দরা কাণ্ডের ঘটনা অবলম্বন করিয়া আর একখানি পঞ্চাঙ্ক নাটক রচনা করেন, তাহার নাম 'সীতাহরণ'। ইহাতে লক্ষ্মণ কর্তৃক শূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদন হইতে আরম্ভ করিয়া হনুমান কর্তৃক অশোকবন হইতে সীতার সংবাদ আনয়নের বৃত্তান্ত পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র চতুর্থ সর্গের অন্তর্গত সীতা ও সরমার কথোপকথনটির প্রত্যক্ষ প্রভাব অনুভব কর

যায়। রামায়ণের এই সুদীর্ঘ ঘটনাবহুল অংশ মাত্র সংক্ষিপ্ত পাঁচটি সর্গের মধ্যে সংহত করিয়া লইবার ফলে কাহিনীর রস কোথাও নিবিড় হইয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই—কেমন যেন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, নাট্যক্রিয়ার ঐক্য (unity of action) ইহাতে একেবারেই নাই ; কারণ, বিচিত্র এবং বিভিন্নমুখী ঘটনার ভিতর দিয়া রামায়ণের এই দুইটি কাণ্ডের কাহিনী অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, অতএব এখানে কাহিনীর কেন্দ্রগত একটি ঐক্য সৃষ্টি করিয়া তাহার একমুখীন একটি লক্ষ্য স্থির করা সম্ভব হয় নাই।

কাশীরাম দাসের মহাভারত হইতে অভিমন্যু-বধের আখ্যান গ্রহণ করিয়া গিরিশচন্দ্র একখানি পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা করেন, তাহার নাম 'অভিমন্যু-বধ'। নাটকখানির মুখপত্রে গিরিশচন্দ্র কাশীরাম দাসের এই দুইটি পঙক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

> ......সুধারস অভিমন্যু বধে।
> কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে॥

এই পঙক্তি দুইটির সঙ্গে সঙ্গে মাইকেল মধুসূদনের 'কাশীরাম' নামক চতুর্দশ-পদী কবিতা হইতেও এই দুইটি পঙক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা—

> মহাভারতের কথা অমৃত সমান
> হে কাশী! কবীশ দলে তুমি পুণ্যবান্।

পূর্বেই বলিয়াছি, রামায়ণ-মহাভারত বিষয়ক নাট্যরচনায় গিরিশচন্দ্র সংস্কৃত মূল রামায়ণ এবং মহাভারতের পরিবর্তে যথাক্রমে কৃত্তিবাস এবং কাশীরাম দাসকেই অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাহার ফলে এই শ্রেণীর পৌরাণিক রচনার মধ্যে বাঙ্গালীর জাতীয় রসধারারই স্বাভাবিক বিকাশ হইয়াছে। সেইজন্য উত্তরা ও সুভদ্রার চরিত্র দুইটি বীরাঙ্গনা ও বীরমাতার চিত্র না হইয়া বাঙ্গালী বধূ ও বাঙ্গালী মাতারই চিত্র হইয়াছে। তবে অভিমন্যুর চরিত্রটির ভিতর দিয়া ক্ষত্রিয়োচিত বীর্য কতকটা প্রকাশ পাইয়াছে। অভিমন্যুর নিধন-বার্তাপ্রাপ্ত অর্জুনের চিত্রটিরও যথোচিত মর্যাদা রক্ষা পাইয়াছে—তবে ইহার উপর মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ-বধ কাব্যে' বর্ণিত ইন্দ্রজিতের মৃত্যুসংবাদ-প্রাপ্ত রাবণ-চিত্রের প্রভাব অনুভব করা যায়।

মহাভারতের অন্তর্গত পাণ্ডবদিগের অজ্ঞাতবাসের সুপরিচিত বৃত্তান্তটি অবলম্বন করিয়া গিরিশচন্দ্র একখানি নাটক রচনা করেন, তাহার নাম 'পাণ্ডবের

'অজ্ঞাতবাস'। মহাভারতোক্ত পাণ্ডবদিগের অজ্ঞাতবাসের বৃত্তান্তটি ঘটনা-বহুল, ইহার বিভিন্নমুখী ও বিচিত্র ঘটনারাজি মাত্র চারিটি অঙ্কের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়া নাট্যকার যে শিল্পকৌশলের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য। ইহার মধ্যে কীচক বধ, দুর্যোধন কর্তৃক বিরাটরাজের গোধন হরণ, কৌরব সৈন্য ও বৃহন্নলার যুদ্ধ, অভিমন্যু-উত্তরার বিবাহ—সকল বৃত্তান্তই সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে, অথচ কোন ঘটনার উপর অনাবশ্যক জোর দেওয়া হয় নাই। নাট্যোল্লিখিত কাহিনীগুলির আনুপূর্বিক সমতা এই নাটকটির একটি বিশিষ্ট গুণ। পাণ্ডবদিগের অজ্ঞাতবাসকালীন ঘটনাবলীর কোনটিই যাহাতে পরিত্যক্ত না হয়, সে বিষয়ে যেমন নাট্যকার এখানে লক্ষ্য রাখিয়াছেন, আবার কোন ঘটনাই যাহাতে অনাবশ্যক প্রাধান্য লাভ করিয়া পূর্ববর্তী ঘটনা ম্লান করিয়া না দেয়, তাহাও নাট্যকার লক্ষ্য করিয়াছেন। সমগ্র নাটকের মধ্যে দুইটি চরিত্র সুপরিস্ফুট হইয়াছে—তাহা শ্রীকৃষ্ণ ও দ্রৌপদীর চরিত্র। শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রটি নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হইলেও নাট্যকার ইহার মধ্য দিয়াই তাঁহার পরিকল্পিত কৃষ্ণচরিত্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্যটি সহজ ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই কৃষ্ণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধকের ধ্যানের আনন্দ, দীনতারণ; কৃষ্ণের নিজের মুখেই এই নাটকে তাঁহার এই পরিচয়টি সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে—

> দীনের নন্দন,
> দীন কোলে আসিনু যমুনাপার
> দীন বৃন্দাবনে
> দেখিলাম দীন হীন গণে,
> দীন নন্দ, দীনা মা যশোদা,
> দীন বাল্যসখা, দীনা সহচরীগণে,
> দীন গোপালবালক,—
> বুঝিয়াছি দীনের বেদনা। (৪,৩)

দ্রৌপদীর চরিত্রটির মধ্যে মূল মহাভারতে পরিকল্পিত দ্রৌপদী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য রক্ষা পাইয়াছে। গিরিশচন্দ্রের পক্ষে ইহা একটি বিশেষ কৃতিত্বের কথা যে, তিনি প্রায় সমস্ত পৌরাণিক, এমন কি, ঐতিহাসিক চরিত্রও বাঙ্গালীর ছাঁচে ঢালিয়া লইলেও দ্রৌপদী-চরিত্রটির মূল বৈশিষ্ট্য ধরিতে পারিয়াছিলেন। পাচকের ছদ্মবেশধারী ভীমকে কীচক বধে উত্তেজিত করিতে দ্রৌপদীর যে পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বীর ক্ষত্রিয় রমণীর চরিত্রগত

মর্যাদা রক্ষায় সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে বলিতে হইবে। তারপর শেষ অঙ্কে শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্রৌপদীর নিকট এই আশঙ্কা প্রকাশ করিলেন যে, ধর্মভীরু যুধিষ্ঠির কৌরবের সঙ্গে যুদ্ধ না করিয়া সন্ধি স্থাপন করিতে পারেন তখনও দ্রৌপদীর সেই একই পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে—যুধিষ্ঠির যাহাতে যুদ্ধই করেন এবং তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা পায়, সেইজন্য তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। নাট্যকাহিনীর মধ্যে চরিত্রটির আনুপূর্বিক সঙ্গতি এই ভাবে রক্ষা পাইয়াছে।

সেক্সপীয়রের নাটকসমূহ দ্বারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে প্রভাবিত হইয়া গিরিশচন্দ্র যে সকল নাটক রচনা করেন, 'জনা' তাহাদের অন্যতম। ইহার মূল আখ্যান-ভাগ কাশীরাম দাস কৃত মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব হইতে গৃহীত হইলেও, ইহার নায়িকাচরিত্র-সৃষ্টির প্রেরণা সম্পূর্ণভাবেই পাশ্চাত্ত্য আদর্শ হইতে আসিয়াছে। 'ম্যাকবেথে'র বঙ্গানুবাদ রঙ্গমঞ্চে দর্শকদিগের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারিল না দেখিয়া গিরিশচন্দ্র আর কোন ইংরেজি নাটকের এমনভাবে ভাবানুবাদ করিয়া অভিনয় করিবার প্রয়াস পান নাই; কিন্তু দেশীয় ভিত্তি এবং পরিবেশ সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ইংরেজি আদর্শের চরিত্র সৃষ্টি দ্বারা যে কয়েকখানি নাটক তিনি এই সময় রচনা করেন, 'জনা' তাহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। দেশীয় পাত্রে বৈদেশিক রস পরিবেশন করিবার যে প্রয়াস ইতিপূর্বেই কাব্যের ক্ষেত্রে সার্থকতা অর্জন করিয়াছিল, গিরিশচন্দ্র তাহাই নাট্যসাহিত্যে সার্থক করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইলেন। এই বিষয়ে তাঁহার 'জনা'য় তিনি যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। ইহার মধ্যে বাংলার সমসাময়িক যুগধর্ম অহেতুক ভক্তিবাদের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয়ের কর্তব্যবোধের সংঘর্ষ উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহাতে একদিক দিয়া অতি উচ্চাঙ্গ নাট্যিক রচন-কৌশলের পরিচয়ও পাওয়া যায়।

মাহিষ্মতীপুরীর বৃদ্ধ রাজা নীলধ্বজ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছেন; এমন সময় তাঁহার জামাতা ছদ্মবেশী অগ্নির কৌশলে পাণ্ডবের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব তাঁহার রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজপুত্র প্রবীর যজ্ঞাশ্বের ললাটে দর্পিত লিখন দেখিয়া ক্ষত্রিয় যুবকের কর্তব্যানুরোধে অশ্বটি অবরোধ করিলেন। পত্নী মদনমঞ্জরী অশ্ব প্রত্যর্পণ করিবার জন্য স্বামীকে অনুরোধ করিলেন, রাজা নীলধ্বজ পাণ্ডবের সঙ্গে বিরোধ বাধাইতে অস্বীকৃত হইলেন। কিন্তু মহিষী জনা পতির বিরোধিতা সত্ত্বেও ক্ষত্রিয়ের ধর্মরক্ষার্থে

পাণ্ডবের বিরুদ্ধে পুত্রকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। মহাতেজস্বিনী জনা জাহ্নবীকে মাতৃভাবে সর্বদা অর্চনা করেন। তাঁহার মনে অফুরন্ত তেজ। বৃদ্ধ মন্ত্রী কিংবা সেনাপতি কেহই পাণ্ডবের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে প্রস্তুত নহেন। জনা তাঁহাদিগকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। প্রবীর এবং অর্জুনের মধ্যে এক মহাযুদ্ধ আশঙ্কা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবপক্ষের কল্যাণের জন্য দ্বারকা হইতে অর্জুনের শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

অচিরে উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। প্রবীরের পরাক্রমে পাণ্ডব সৈন্যগণ পরাজিত হইতে লাগিল। এমন সময় প্রবীরের এক আকস্মিক ভাবান্তর উপস্থিত হইল। এক অদৃশ্য মায়াশক্তির প্রভাবে তাঁহার বলবীর্য ও পৌরুষ তিরোহিত হইল। শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় তখন সহজেই অর্জুন কর্তৃক প্রবীর নিহত হইল। যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত পুত্রের পার্শ্বে জনা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পুত্রহন্তা অর্জুনের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার মানসে তিনি ভীষণা হইয়া উঠিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কৌশলে অর্জুনকে জনার ক্রোধ হইতে রক্ষা করিলেন। প্রবীরের পতনের পর অর্জুন নীলধ্বজের সহিত সন্ধি করিতে চাহিলেন। নীলধ্বজও শ্রীকৃষ্ণকে নিজের পুরীতে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার সুযোগ পাইয়া আহ্লাদে আত্মহারা হইয়া গেলেন। তাঁহার আদেশে সমগ্র পুরী শ্রীকৃষ্ণের অভ্যর্থনার আয়োজন করিতে লাগিল। পুত্রহন্তার অভ্যর্থনার আয়োজনের কথা শুনিয়া মহিষী জনা আসিয়া রাজা নীলধ্বজকে ভর্ৎসনা করিলেন। স্বামীকে এই কাপুরুষোচিত কার্য হইতে নিবৃত্ত করিয়া তাঁহাকে পুত্রহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য বলিলেন। কিন্তু নীলধ্বজ তাঁহার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে চাহিলেন না। তখন জনা একাকিনী রাজধানী ত্যাগ করিয়া জাহ্নবী-জলে আত্মবিসর্জন করিলেন। পত্নী-পুত্রহীন রাজধানীতে নীলধ্বজ কৃষ্ণার্জুনের অভ্যর্থনা নিষ্পন্ন করিলেন।

গিরিশচন্দ্রের সমসাময়িক কালে 'জনা'র ব্যাপক লোকপ্রীতির বিশেষ কতকগুলি কারণ ছিল। তাহা বিস্তৃতভাবে আলোচনার যোগ্য।

জাতির প্রাচীন ঐতিহ্যের অনুশীলনের ভিতর দিয়া জাতি আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া নব-জাগরণের প্রেরণা অনুভব করিয়া থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার শিক্ষা-দীক্ষার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তাহাতে জাতীয় ঐতিহ্য-অনুসন্ধানের ব্যাপক প্রেরণা দেখা দিয়াছিল এবং মূলত তাহার

উপর ভিত্তি করিয়াই সেদিন বাঙ্গালীর নূতন জাতীয় চেতনার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত যে সুদীর্ঘ যুগ ধরিয়া বাঙ্গালী তুর্কী, পাঠান ও মোগলের দাসত্ব করিয়াছে, ততদিন ব্যাপিয়া তাহার মধ্য হইতে তাহার আত্মোপলব্ধির প্রেরণা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল এবং তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল বলিয়াই সেই দাসত্ব সহনীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল—অসীম লাঞ্ছনার মধ্যেও কেবলমাত্র দৈব সান্ত্বনার সন্ধান করিয়া কোন প্রকারে বাঁচিয়া থাকিবার উপায়ই সেদিন সন্ধান করা হইয়াছিল। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সংস্পর্শে আসিবার ফলে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে দেশের প্রাচীন ইতিহাস ও সাহিত্যকে উদ্ধার করিয়া তাহার শক্তি জাতীয় জীবনে অনুভব করিবার যে প্রেরণা দেখা দিয়াছিল, তাহার ভিতর দিয়াই প্রথম এই জাতি সুদীর্ঘ কালের মানসিক জড়তা হইতে পরিত্রাণ পাইবার স্বপ্ন সার্থক করিয়া তুলিতে অগ্রসর হইয়াছিল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে মাইকেল মধুসূদন দত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া আর যে কেহ সামান্যও সার্থকতা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেই জাতীয় জীবনের প্রাচীন ঐতিহ্যের মধ্যেই নূতন ভাবধারা সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। জাতীয় নবজাগরণের এই প্রেরণার মধ্য হইতেই জাতির পরাধীনতা হইতে মুক্তি লাভের প্রেরণাও জন্মলাভ করিয়াছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে যখন প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনের অমূল্য তথ্যগুলির সন্ধান পাওয়া যাইতে লাগিল, ম্যাক্স মূলর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, স্যার উইলিয়ম জোন্স্, প্রিন্সেপ্ প্রভৃতি পণ্ডিতদিগের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের প্রত্যক্ষ উপকরণগুলি সংগৃহীত হইয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায় সংযোজিত হইল, কিংবা প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ও রামায়ণ মহাভারতের মত গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইতে লাগিল, তখন জাতি এক অপরিসীম আত্মমর্যাদাবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়া জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নূতন আশার স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। পাশ্চাত্ত্য ঐতিহাসিকগণ এই কথাই প্রমাণিত করিলেন যে, ভারতের অধিবাসিগণ ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতির মতই আর্যজাতির সন্তান, কালক্রমে মূল ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভারতবর্ষের প্রকৃতি ও জন-জীবনের সহায়তায় এক নূতন সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিয়াছে মাত্র,—এই জ্ঞান এই জাতিকে নূতন প্রাণশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করিল, ইহার মধ্যে পরাধীনতার শৃঙ্খল-মুক্তির এক দুর্জয় কামনা দেখা দিল। ক্রমে ভারতীয় উপনিষদের অনুশীলন

আরম্ভ হইল, ইহার উচ্চ চিন্তা এবং বলিষ্ঠ জীবনাদর্শ জাতির ক্লেদাক্ত জীবনের মধ্যে নূতন আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চারিত করিল। উপনিষদের মতই ভারতীয় রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের মধ্যেও নূতন প্রেরণা এবং জীবন-বাণীর সন্ধান দেখা দিল। একদিকে যেমন পাশ্চাত্ত্য দেশ হইতে আগত খ্রীষ্টধর্মের প্রেম ও বিশ্বাসের প্রেরণা এবং উপনিষদের জীবন ও দর্শন-চিন্তার অনুভূতি, উভয়ের সংমিশ্রণে নূতন আধ্যাত্মিক চিন্তার উন্মেষ হইল, অন্যদিকে তেমনই হিন্দুধর্মের মধ্যে আচার-সর্বস্বতা প্রবেশ করিবার ফলে ইহার প্রাণশক্তি নির্জীব হইয়া গিয়াছিল। ক্রমে তাহার মধ্য হইতে আবিলতা এবং আবর্জনা পরিহার করিয়া ইহার শাশ্বত রূপটি উদ্ধার করিবার প্রেরণা দেখা দিয়াছিল; এইভাবে রামমোহন প্রবর্তিত ব্রাহ্ম-সমাজ এবং নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হিন্দু-সমাজের (Neo-Hinduism) উদ্ভব হইল।

ক্রমে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা বিস্তারের ফলে একদিকে যেমন সমাজে যুক্তিবাদের বিকাশ হইতে লাগিল, তেমনই আর একদিক দিয়া যে ভক্তিবোধ এই জাতির মজ্জাগত গুণ ছিল, তাহাও যুগোচিত পরিমার্জনা লাভ করিয়া বিশুদ্ধ রূপে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠা দ্বারা যে পরিমাণে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষালব্ধ প্রগতিশীল সমাজ উপকৃত হইয়াছিল, তেমনই ব্রাহ্ম-সমাজের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে হিন্দু-সমাজের মধ্যেও যুগোপযোগী করিয়া যাহা রক্ষণীয়, তাহাই রক্ষা পাইয়া ইহারও গ্লানিকর উপকরণগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছিল। বহুবিবাহ দূর হইল, বিধবা বিবাহ আইন সিদ্ধ হইল, বাল্যবিবাহ লুপ্ত হইল এবং ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রীস্বাধীনতার বিস্তার হইতে লাগিল।

সমগ্র মধ্যযুগ ব্যাপিয়া সমাজ-জীবনের বিপর্যয়ের ফলে নারীসমাজের মধ্যে যে দুর্গতির সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা নবজাগরণের প্রথম উষালোকেই দূর হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। যে নারীকে অবলারূপে বিবেচনা করিয়া সমাজ-জীবনের দুর্ভার বলিয়াই আমরা একদিন গণ্য করিয়াছিলাম, কন্যাসন্তানকে পরিবারের অভিশাপরূপেই গণ্য করিতে আমরা অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম, তাহাদের চরিত্রের মধ্যেও সেদিন অপার মহিমা এবং অসীম গৌরব অনুসন্ধান করিবার প্রেরণা দেখা দিয়াছিল। ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাস হইতে কেবলমাত্র বিদুষী কন্যার নহে, বরং বীর্যবতী নারীচরিত্রের যে সন্ধান পাওয়া গেল, তাহাদের জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়া বাংলা সাহিত্যে নারী চরিত্রেরও পরিকল্পনা কর হইতে লাগিল। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রমীলা এবং 'বীরাঙ্গনা'

গিরিশচন্দ্র তাঁহারই ব্যক্তিজীবনের আচার-আচরণ ভিত্তি করিয়া যে কয়টি আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন (mystic) চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, বিদূষক চরিত্র তাহাদের অন্যতম। সুতরাং পুরাণের মধ্য হইতে যেমন এই চরিত্রটি আসে নাই, তেমনই সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের বিদূষক চরিত্রের উপর ভিত্তি করিয়াও তাহা রচিত হয় নাই—ইহা উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর একটি বিশিষ্ট চরিত্র অবলম্বন করিয়াই রচিত হইয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে হিন্দুধর্মের যে পুনরভ্যুত্থান দেখা দিয়াছিল, তাহার মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মানুসারী শুদ্ধা ভক্তির একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কালেই এই অনুভূতির প্রথম বিকাশ হইলেও কালক্রমে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের নানা অর্থহীন আচার-আচরণ দ্বারা ইহা বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে যখন হিন্দুধর্মের সকল স্তরেই নূতন চিন্তা প্রবেশ করিয়া ইহাকে নানা দিক দিয়া সমসাময়িক যুগের উপযোগী করিয়া তুলিতে প্রয়াস পাইয়াছিল, তখন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যেও ইহার মৌলিক আধ্যাত্মিক চেতনা সঞ্চারিত হইয়া ইহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছিল। বিদূষক তাহার প্রতিনিধি। তাহার বিশ্বাসের মধ্যে কোন সংশয় নাই, কোন আশঙ্কা নাই, কোন প্রতীক্ষাও নাই,—বিশ্বাসে ইহার সকল দিক পরিপূর্ণ। চৈতন্যদেবের পর কেবলমাত্র রামকৃষ্ণদেবের মধ্যেই ইহার পরিচয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। সেইজন্য তাঁহারই আদর্শে গিরিশচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর নব পৌরাণিক নাটক রচনা করিয়াছেন; মহাভারতের যুগচিত্রের পটভূমিকায় উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর যুগগুরুর রেখাচিত্র আঁকিয়াছেন।

অহৈতুকী ভক্তিবাদের পুনরাবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীতে পারিবারিক নীতির দিক হইতে আর একটি গুণের বিকাশ হইয়াছিল, তাহা মাতৃভক্তি। কাশীরাম দাসের মহাভারতে প্রবীরের যে চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহার মধ্যে মাতৃভক্তির কোন অবকাশ দেখা যায় না। কিন্তু 'জনা'-নাটকের নায়ক চরিত্র প্রবীরের প্রধান শক্তিই আসিয়াছে তাঁহার মাতৃভক্তি হইতে। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সম্পর্কে বলিয়াছেন,

> দেবের প্রসাদে
> মাতৃভক্তি অপার তাহার।
> সত্য কহি,
> শক্তি নাহি ধরে ষড়ানন—
> বিমুখিতে মাতৃভক্ত যোধে।

মাতৃ-পদধূলি বীর নিত্য ধরে শিরে,
ম্রিয়মাণ ডরে মম চক্র আসে ফিরে,
পাছে ভস্ম হয়।
মাতৃভক্ত মহাতেজা!
প্রবীরে নিবারে বীর নাহি ত্রিভুবনে।

মাতৃভক্তই প্রবীর চরিত্রের যথার্থ রক্ষাকবচ। একদিন নিয়তির নির্বন্ধ অনুসারে মাতৃপদধূলি গ্রহণ না করিবার জন্যই যুদ্ধে তাহার পতন অনিবার্য হইয়া উঠিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ব্যক্তি-চরিত্রের এই বিষয়ক একটি সুমহা আদর্শ সেদিন নব সমাজ-জীবন-চেতনায় প্রবুদ্ধ বাঙ্গালীর সম্মুখে একটি সুমহান্ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিল। জননীর আদেশে এবং উপদেশে তিনি যে কত দুঃসাহসিক কর্মে হস্তক্ষেপ করিয়া সাফল্য লাভ করিতেন, জননীর প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধায় যে তাঁহার সমগ্র জীবন নিয়ন্ত্রিত হইত, তাহা উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর সমাজ-জীবনের সম্মুখে এক নূতন আদর্শ স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র মহাভারতের যুগের প্রবীর চরিত্রের উপর উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর এই মনোভাবটি আরোপ করিয়াছেন। এখানে জননী জনার আশীর্বাদ এবং নির্দেশে প্রবীরের সমগ্র জীবন পরিচালিত হইয়াছে, নিয়তির এক অমোঘ বিধানে যেদিন তিনি জননীর প্রতি এই কর্তব্য বিস্মৃত হইয়াছেন, সেই দিনই তাঁহার সর্বনাশ হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলার সমাজে ভগবতী দেবীর মত জননী চরিত্র এবং সন্তানের উপর তাঁহার এমন প্রভাবের আর কোন পরিচয় কোথাও পাওয়া যায় নাই। সেইজন্য উনবিংশ শতাব্দীর সমাজের সম্মুখে ইহা সেদিন এক বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছিল; গিরিশচন্দ্র যুগের এই ভাবটিই তাঁহার পরিকল্পিত জনা এবং প্রবীরের সম্পর্কের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর সমাজে কেবল মাত্র আধ্যাত্মিক জগতেই যে শুদ্ধা ভক্তি-ভাবের বিকাশ হইয়াছিল, তাহা নহে—মধ্য যুগের বৈষ্ণব পদাবলীর সুর আবার নূতন করিয়া যেন এই দেশের আকাশে বাতাসে বাজিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সেইজন্য মধুসূদনের হাতে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' এবং এমন কি, রবীন্দ্রনাথের হাতেও 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' গান শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের 'জনা' নাটক আদ্যোপান্ত কেবল শুদ্ধা ভক্তি-ভাবেই পরিপূর্ণ তাহা নহে, ইহা বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীর রসে এবং সুরে গাঁথা। নীলধ্বজ, জনা ও অর্জুনের কৃষ্ণবন্দনায়, সখী ও বালক-

গণের কীর্তন গানে, এমন কি, কৈলাসপুরীর প্রমথ ও যোগিনীগণের বৈত সঙ্গীতে, গোপিনীগণের কৃষ্ণপ্রেম-গানে নিরবচ্ছিন্ন বৈষ্ণব পদাবলীর রাগিণীই ধ্বনিত হইয়াছে। যদিও প্রতিহিংসামূলক একটি বিষয়বস্তু 'জনা'-নাটকের অবলম্বন, তথাপি বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেম ও মাধুর্যে ভরা সঙ্গীতগুলি ইহার মধ্যে সরস অবকাশ সৃষ্টি করিয়া বাঙ্গালীর চিত্তের সঙ্গে ইহার সুনিবিড় যোগ রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে। বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীর গোষ্ঠ প্রসঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া বিরহ পর্যন্ত প্রায় সমস্ত বিষয়ই ইহার মধ্য দিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণব পদাবলী বাঙ্গালীর প্রাণে অফুরন্ত আনন্দ ও ভক্তির নির্ঝর সৃষ্টি করিয়াছে। বিশেষত বৈষ্ণব পদাবলীর যে অংশ বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের সঙ্গে সুনিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে, অর্থাৎ বৈষ্ণব পদাবলীর বাৎসল্য রস তাহার বর্ণনায় গিরিশচন্দ্র বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণনা করিয়া তিনি নাটকের চতুর্থ অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে যে বালকগণের একটি গীত রচনা করিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য :

হামা দে পলায়, পাছু ফিরে চায়,
রাণী পাছে তোলে কোলে,
রাণী কুতুহলে, ধর ধর বলে
হামা টেনে তত গোপাল চলে॥
পড়ে পড়ে চায় ধুলা লাগে গায়
আবার উঠে আবার পলায়।
মুছায় আঁচলে রাণী কোলে তোলে
ব্রহ্মর খেলায় পাষাণ গলায়॥

গৌড়ীয় বৈষ্ণব উপাসনায় কেবলমাত্র বাৎসল্য নহে, দাস্য ভাবেরও একটি বিশেষ স্থান আছে, সেইজন্য 'জনা' নাটকে গিরিশচন্দ্র অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ সখা বলিয়া কল্পনা করিবার পরিবর্তে দাস ভাবেই কল্পনা করিয়াছেন। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের নিকট দাসভাবে আত্মনিবেদন করিয়া বলিয়াছেন,

'তুমি প্রভু, দাস মোরা সবে।
চিন্তামণি সহায় যাহার,
কিবা চিন্তা তার;
নিজ কার্য উদ্ধার, কেশব।'—১।৪

ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবাদর্শেরই অনুকূল, মহাভারতের পার্থসখার উপযুক্ত আচরণ নহে। এইভাবে খুঁটিনাটি বিষয় লইয়া বিচার করিলে দেখা যায়,

মহাভারতের কাহিনীর পটভূমিকায় গিরিশচন্দ্র 'জনা'-নাটকে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর অধ্যাত্ম ও সমাজ চিন্তাই রূপায়িত করিয়াছেন এবং তাহাই নাটকখানির জনপ্রিয়তার অন্যতম উল্লেখযোগ্য কারণ।

বাংলাদেশে ইংরেজের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বেই ইউরোপীয় খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকগণ খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এদেশের মাটিতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক নীতি সম্পর্কে একটি কথা সকলেরই পরিচিত, তাহা এই যে—'First send the missionaries, then send the merchants and last send the army'.

একটি জাতিকে পরিপূর্ণভাবে দাসত্বের শৃঙ্খল পরাইতে হইলে আকস্মিক অস্ত্র প্রয়োগ করিলে তাহার ফল স্থায়ী হয় না, তাহাকে ধীরে ধীরে সকল দিক হইতে অধিকার করিয়া লইবার আবশ্যক হয়। প্রথম ধর্মযাজক পাঠাইয়া নানা হিতকথা বলিয়া এবং বৈষয়িক প্রলোভন দেখাইয়া তাহাদের মন নরম করিতে হইবে, তারপর বণিক্ পাঠাইয়া তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্য কিংবা কাঁচা মাল ছলে বলে কিংবা কৌশলে গ্রাস করিতে হইবে, তাহাতেও কার্য সিদ্ধ না হইলে অস্ত্র দ্বারা দেশ অধিকার করিতে হইবে। অন্তর এবং বাহির, মন এবং দেহ এইভাবে যখন সম্পূর্ণ নিজের অধিকারভুক্ত হইতে পারিবে, তখন দেশজয় যথার্থ সার্থক হইবে। ইংরেজও ভারতবর্ষ সম্পর্কে সেই পদ্ধতিই অনুসরণ করিয়াছিল। যদিও ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের ইতিহাস অনুসরণ করিলে আপাত দৃষ্টিতে দেখা যায় যে, ধর্মযাজক এবং ইংরেজ শাসকদিগের মধ্যে সম্পর্ক অনেক সময় তিক্ত ছিল, তথাপি এই উভয় সম্প্রদায়ের মূল লক্ষ্য বিষয়ে কোন বিরোধ ছিল না, তবে ব্যক্তিগত দায়িত্ব এবং কর্তব্যবোধ বশত অনেক সময়ই হয়ত অনেক ধর্মযাজককে শাসক সম্প্রদায়ের অপ্রীতিকর কাজ করিতে হইয়াছে। কিন্তু বিদেশ হইতে যাহারা একই সঙ্গে ধর্মযাজক এবং বণিক এদেশে পাঠাইয়াছে, তাহারা যে এক এবং অভিন্ন উদ্দেশ্যেই একাজ করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যাইবে না।

নতুবা যে ভারতবর্ষ সমগ্র জগৎকে ধর্মশিক্ষা দিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ধর্মযাজক পাঠাইবার উদ্দেশ্য কি? বাংলার যে কুটীরশিল্প সে যুগে জগতের বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছে, সে দেশে পাশ্চাত্ত্য শিল্পজাত দ্রব্য প্রেরণেরও কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। এই দুই উপকরণ দ্বারা দেশের মনোবল এবং অর্থবল সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করিয়া ইংরেজ শক্তি যখন অস্ত্রবল লইয়া আবির্ভূত হইল,

তখন এই দেশ রক্ষা করিবার আর কোন উপায় রহিল না। কিন্তু ইংরেজের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিতে পারিল না। ঐতিহ্যহীন জাতিকে পদদলিত করিবার যে প্রণালী অনুসরণযোগ্য—যে জাতির একটি সুপ্রাচীন ঐতিহ্য আছে, তাহাকে পদানত করিবার জন্য সেই পদ্ধতি অনুসরণ করা যাইতে পারে না। পাশ্চাত্ত্য জাতিসমূহ ভারতবর্ষকেও দক্ষিণ-আফ্রিকার সমতুল্য বিবেচনা করিয়া ইহার উপরও দক্ষিণ আফ্রিকার নীতি আরোপ করিতে গিয়াছিল, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তাহারা বুঝিতে পারিল, এ দেশ সম্পর্কে তাহাদের স্বতন্ত্র নীতি অবলম্বন করা উচিত ছিল। এই ভুলের দাম দিতে গিয়াই একদিন ইংরেজকে দুই শত বৎসর পরে একটি বিস্তৃত সাম্রাজ্যের উপর অধিকার পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইয়াছিল।

খ্রীষ্টান মিশনারীগণ যখন হিন্দুধর্মের নিন্দা করিয়া খ্রীষ্টধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন, তখন প্রাচীন ঐতিহ্য-মণ্ডিত এই জাতির আত্মমর্যাদাবোধে কঠিন আঘাত লাগিয়াছিল। তাহারই প্রেরণা বশত সে আত্ম-বিশ্লেষণ এবং আত্ম-নিরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইল। বিজিত জাতির পক্ষেও সেদিন ইহা কল্যাণকর হইয়া উঠিয়াছিল; কারণ, দীর্ঘ দিনের অন্ধ আচার পালনের মধ্য দিয়া হিন্দুধর্মের ভিতরে স্বভাবতই যে দোষত্রুটি প্রবেশ করিয়াছিল, ইহার ফলে তাহা নিরাকরণ করিবার যে সুযোগ পাওয়া গেল, তেমনই ইহার শাশ্বত স্বরূপটি সমাজের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া বিদেশী ধর্মযাজকের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিবার প্রয়াসও সার্থক হইয়া উঠিল। খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকগণ সেদিন নিজেদের ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করিবার পরিবর্তে হিন্দুজাতির ধর্ম ও সমাজকে যেরূপ কুৎসিত ভাবে আক্রমণ করিয়া ইহার নিন্দা প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহারই প্রতিবাদ রূপে যুগের প্রতিনিধি স্বরূপ রামমোহনের আবির্ভাব হইল। রামমোহনের আবির্ভাবের মধ্যে কেবল বাংলারই নহে, সমগ্র ভারতের আধুনিক সমাজ-জীবনের ভিত্তি স্থাপিত হইল। বাংলার সমাজের উপর খ্রীষ্টান ধর্মযাজকের আক্রমণ সেদিন যদি এমনই নির্লজ্জ ভাবে আত্মপ্রকাশ না করিত, তবে রামমোহনের আবির্ভাব যে আরও কত বিলম্বিত হইত, তাহা কে বলিতে পারে?

রামমোহনের একক ব্যক্তিত্ব সেদিন সমাজ-মানসে নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার

সৃষ্ট করিয়াছিল। তিনি একদিকে যেমন ধর্মযাজকদিগকে নিরস্ত করিবার জন্য হিন্দুর প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের মধ্যস্থ মৌলিক সত্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তেমনই আর একদিক দিয়া যে সনাতন হিন্দুধর্ম কেবল মাত্র আচার (ritual)-কে অবলম্বন করিয়া ইহার অস্তিত্বের অন্তিম প্রহর গণনা করিতেছিল, তাহাকেও তাঁহার বলিষ্ঠ চিন্তা এবং কর্মশক্তি দ্বারা আঘাত করিয়া তাহার ভিতর হইতেও ইহার শাশ্বত রূপটি উদ্ধার করিবার প্রেরণা দিয়াছিল। সনাতন হিন্দুসমাজ একদিন তুর্কী আক্রমণের পরও যেমন অবিচলিত ভাবে নিজের চিরাচরিত আচার ও প্রথা অনুসরণ করিয়া চলিতেছিল, ইংরেজ ধর্ম-যাজকের উত্তেজনামূলক কটূক্তির প্রতিও ইহা তেমনই নির্বিকার হইয়া ছিল। ধর্মযাজকদিগের নিন্দা এবং আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে রামমোহন যে পথ অবলম্বন করিলেন, তাহাতে একদিকে পাশ্চাত্ত্য ধর্মযাজক সম্প্রদায় যেমন তাঁহার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হইল, সনাতন হিন্দুসমাজও তেমনই বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। কিন্তু একটি অবিচল এবং স্থির আদর্শের মধ্যে যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হইল, তাহাও ইহাকে শেষ পর্যন্ত কল্যাণের পথেই আগাইয়া দিয়াছিল। রামমোহন যখন নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা বা ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা করিলেন, হিন্দুধর্মের সাকার উপাসনাও তখন ইহার চিরাচরিত ধারার মধ্যে যুগোচিত পরিমার্জনা স্বীকার করিয়া লইল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের ভিতর দিয়া হিন্দু সমাজ একদিকে খ্রীষ্টধর্ম এবং আর একদিকে ব্রাহ্মধর্ম এই উভয়ের মধ্য হইতেই পরিত্রাণ পাইবার পথ সন্ধান করিয়া লইল। উনবিংশ শতাব্দীর নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ এবং নবসংস্কারপ্রবুদ্ধ হিন্দুসমাজ পরস্পরের যথার্থ প্রতিদ্বন্দ্বী না হইয়া পরস্পরের পরিপূরক হইয়া ইহাদের যুগ্মশক্তি দ্বারা খ্রীষ্টধর্মের সকল প্রকার প্রভাব জয় করিতে সক্ষম হইল। ইহারই অন্তরাল দিয়া সনাতন হিন্দুধর্মের মৌলিক শাখাটি ক্ষীণতম পরিচয় রক্ষা করিয়া অতি সন্তর্পণে এবং সঙ্কোচের সঙ্গে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ক্রমে অদৃশ্য হইয়া গেল। ক্রমে ব্রাহ্মধর্মের ধারাটিও আর স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিল না, হিন্দুসমাজ ক্রমেই প্রশস্ত হইতে প্রশস্ততর হইয়া ইহাকেও নিজের মধ্যে গ্রাস করিয়া লইল। সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য সেদিন যে-ভাবেই উদ্বুদ্ধ হইয়া যিনি যাহাই কিছু করুন না কেন, শেষ পর্যন্ত তাহার সকলই বৃহত্তর হিন্দু সমাজের কল্যাণ কর্মেই নিয়োজিত হইয়াছিল। কারণ, ব্রাহ্মধর্ম স্বতন্ত্র কিংবা স্বাধীন কোন ধর্মমত ছিল না, হিন্দুধর্মের আচার-নিরপেক্ষ মৌলিক ভাবাদর্শটির প্রতি লক্ষ্য

রাখিয়াই ইহার সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া ইহার প্রগতিশীল বৃহত্তর হিন্দুসমাজের মধ্যে একদিন একাকার হইয়া যাইতে কোন বাধা হয় নাই। ইহাদের পদ্ধতিতে যে পার্থক্য ছিল, তাহার মধ্যেও রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সার্থক সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াস পাইয়াছেন। গুরুদেবের আদর্শে সামঞ্জস্যের বাণী একদিকে যেমন প্রচার করিবার ভার লইয়াছিলেন ব্রহ্মবান্ধব কেশবচন্দ্র সেন, অপরদিকে তেমনই সে ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ—একজন বাগ্মিতায়, আর একজন নাট্যরচনায় এবং অভিনয়ে।

যে বলিষ্ঠ আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া ব্রাহ্ম-সমাজের উদ্ভব হইয়াছিল, রামমোহনের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা শিথিল হইয়া পড়িল। ফলে এই সমাজ তিনটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া গেল,—আদি, সাধারণ ও নববিধান। একমাত্র রামমোহনের মত ব্যক্তিত্বের অভাবের ফলেই যে তাহা হইল, তাহা নহে—যে উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মসমাজ একদিন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই উদ্দেশ্য ইতিমধ্যে বহুল পরিমাণে সিদ্ধ হইয়াছিল। খ্রীষ্টান ধর্মের আক্রমণের প্রথম আঘাত রুদ্ধ হইয়াছিল এবং হিন্দু সমাজের মধ্যেও ব্রাহ্মধর্মোচিত উদারতা বহুলাংশে প্রকাশ পাইল। পাশ্চাত্ত্যশিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দুসমাজ বুঝিতে পারিল, হিন্দু হিন্দু থাকিয়াও যুগ এবং সময়োপযোগী করিয়া তাহার সমাজকে গঠন করিতে পারে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কর্ম এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের চিন্তা উভয়ই হিন্দুধর্মের এ'যাবৎ সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রকে নানা দিকে প্রসারিত করিয়া দিল। রামমোহন সতীদাহ প্রথা রোধ করিতে গিয়া যে সমাজ-সংস্কারের সূচনা করিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর আরও বহুমুখী সংস্কারের মধ্য দিয়া তাহার ক্ষেত্র আরও বহুদূর প্রসারিত করিলেন। ধ্যানের মধ্য দিয়া পরমহংসদেব যে অনুভূতি ও বিশ্বাস লাভ করিয়াছিলেন, কর্মের ভিতর দিয়া বিবেকানন্দ তাহাকে প্রত্যক্ষ করাইলেন। রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ ব্রাহ্মধর্মের প্রচারকগণও হিন্দুধর্মের মৌলিক রূপের যথাযথ শক্তি সম্পর্কে নানা যুক্তি প্রদর্শন করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিতে লাগিলেন। হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত রাজনারায়ণ বসু লিখিলেন—"হিন্দুধর্মের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা নিষ্কাম উপাসনার কথা সগৌরবে ঘোষণা করে। হিন্দুধর্মে সকাম ও নিষ্কাম দুই প্রকার উপাসনার নির্দেশ আছে, কিন্তু অন্যান্য ধর্মে নিষ্কাম উপাসনার উল্লেখ নাই।' রাজনারায়ণ বসু যেন তাঁহার দিব্য দৃষ্টিতে সেদিন দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, এই হিন্দুধর্ম নূতন প্রাণশক্তিতে পুনরায় উজ্জীবিত হইবে।

তিনি লিখিলেন, 'হিন্দুধর্মের প্রকৃতি আলোচনা করিলে বোধ হয় যে এ ধর্ম কোন কালে বিলুপ্ত হইবে না। যতকাল এই ভারতবর্ষ থাকিবে, ততকাল এই ধর্ম থাকিবে। অনেকে বলেন, হিন্দুধর্ম বিনষ্ট হইবে, তাঁহাদের কথা অমূলক। এ ধর্মকে কে বিলুপ্ত করিতে পারে? বৌদ্ধেরা হিন্দুধর্মকে বিলুপ্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য হয় নাই। মুসলমানেরা হিন্দুধর্মের বিনাশার্থ যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু ইহার কিছুই করিতে পারে নাই। খ্রীষ্টীয় মিশনারীরা এখানে ধর্মপ্রচার করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু হিন্দুধর্মের বল দেখিয়া তাঁহাদিগকে এখন পালাই পালাই ডাক ছাড়িতে হইয়াছে। সম্প্রতি ডক্ক সাহেব বিলাতে এক বক্তৃতা করেন। তাহাতে বলিয়াছেন যে হিন্দুদিগের দর্শনশাস্ত্র এমন ব্যাপক যে ইউরোপীয় সকল প্রকার দার্শনিক মতের অনুরূপ তাহাতে পাওয়া যায়। এরূপ বুদ্ধিমান্ জাতিকে খ্রীষ্টীয় ধর্মে প্রবৃত্ত করান দুষ্কর। হিন্দুধর্ম হাতির মত। ইহার গাত্র মশার ন্যায় অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা আক্রমণ করে। কিন্তু একবার গা ঝাড়া দিলেই কে কোথায় উড়িয়া যায়।... যতকাল হিন্দুধর্ম থাকিবে, ততকাল হিন্দুনাম থাকিবে। হিন্দুনাম কখনই পরিত্যাগ করিতে পারি না। হিন্দুনামের সঙ্গে কত হৃদয়গ্রাহী ও মনোহর ভাব জড়িত রহিয়াছে। দেখিতেছি, আমার সম্মুখে মহাবল-পরাক্রান্ত হিন্দুজাতি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া বীরকুণ্ডল পুনরায় স্পন্দন করিতেছে। এবং দেববিক্রমে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে প্রবৃত্ত হইতেছে। আমি দেখিতেছি যে এই জাতি পুনরায় জ্ঞানধর্ম ও সভ্যতাতে উজ্জ্বল হইয়া পৃথিবীকে সুশোভিত করিতেছে, হিন্দুজাতির গরিমা পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত হইতেছে।'
(বিপিনচন্দ্র পাল, 'নবযুগের বাংলা' ১৩৬২, পৃ, ২৩)

একজন ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারকের মুখে হিন্দুধর্মের এই প্রশস্তির অর্থই এই যে, ইতিমধ্যে ব্রাহ্মসমাজ এবং হিন্দুসমাজের আদর্শ এবং লক্ষ্য এক ও অভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। মনীষী রাজনারায়ণ সেদিন হিন্দুধর্ম-পুনরুত্থানের যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, ইহা যে কেবল মাত্র তাঁহার ব্যক্তিমানসের ভাব-স্বপ্ন ছিল না, পরমহংসদেবের ধ্যানে এবং বিবেকানন্দের কর্মে তাহার আধ্যাত্মিক পরিচয়টি রূপায়িত করিয়াছিল, তাহার কথা সকলেই জানেন। হিন্দু সমাজ ও ধর্মচেতনার এই পুনরুত্থানের যুগে ভারতের প্রাচীন সাহিত্য ও পুরাণ স্বভাবতই বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ অনুবাদের একটি ধারা মধ্যযুগ হইতেই এ'দেশে প্রচলিত ছিল, কিন্তু অনুবাদগুলি প্রথম

হইতে একটি বিশেষত্ব লাভ করিয়াছিল; তাহা এই যে, ইহারা কেহই প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ মাত্র হইয়া জাতির কেবল শিক্ষাগত (academic) কৌতূহল নিবৃত্ত করে নাই, বরং তাহার পরিবর্তে জাতীয় জীবনের সঙ্গে যোগরক্ষা করিয়া জাতীয় রসসম্পদরূপে গণ্য হইয়াছে। এইভাবেই কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত এবং বাঙ্গালীর পুরাণ স্বরূপ শত শত মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছে। মূলের প্রতি আনুগত্য বিসর্জন দিয়া জাতীয় জীবন-রসের চর্চাই ইহারা লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, এইজন্যই ইহারা জাতির সাহিত্যের ইতিহাসে আসন পাইয়াছিল।

মধ্যযুগে তুর্কী আক্রমণের বিপর্যয়ের সম্মুখে সমাজ-জীবনে যে হীনমন্যতা প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা হইতে মানসিক পরিত্রাণের উপায় সন্ধান করিতে গিয়া এই অনুবাদকাব্যগুলি কোন উচ্চতর জীবনাদর্শের সন্ধান দিতে পারে নাই; কেবলমাত্র পরাজিত মনোভাব এবং অধঃপতিত সমাজ-জীবনের গ্লানিকর রূপ প্রকাশ করিলেও প্রাচীন সাহিত্যকেও সমসাময়িক জীবনের উপযোগী করিয়া পুনর্গঠনের প্রবণতা তাহার মধ্যেও দেখা গিয়াছিল। সে দিন রাম-চরিত্র রামায়ণের বীর-রূপ রক্ষা করিতে পারে নাই সত্য, তথাপি তাঁহার যে করুণাময় রূপের সেদিন বিকাশ হইয়াছিল, তাহা সমাজ-জীবনের সহস্র দুর্গতির মধ্যে নিজেকে টিকাইয়া রাখিবার শক্তি দিয়াছিল বলিয়া মনে হইবে। ঊনবিংশ শতাব্দীতেও রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণ নূতন যুগের পরিবেশে সেই প্রকার যুগোপযোগী নূতন [illegible] সিদ্ধ করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। সে'দিন আর মধ্যযুগের পরাজিত মনোভাবের অস্তিত্ব ছিল না, বরং তাহার পরিবর্তে জাতীয় জীবনের স্বপ্নদৃষ্টির সম্মুখে নূতন আশার আলোক দেখা দিয়াছিল; সেইজন্য সেই অনুযায়ীই রামায়ণ-মহাভারত এবং পুরাণের কাহিনীর মধ্যে নূতন প্রেরণা সঞ্চারিত হইয়াছিল। মধুসূদন রামায়ণ হইতে কাহিনী গ্রহণ করিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার রচনা বাল্মীকির রামায়ণও যেমন হইল না, মধ্যযুগের কৃত্তিবাসী রামায়ণও হইল না, বরং তাহাদের পরিবর্তে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর নবজাগরণের নূতন রামায়ণের রূপ লাভ করিল। কৃত্তিবাসের হাতেও যেমন বাল্মীকির রামায়ণ মধ্যযুগের বাঙ্গালীর রামায়ণ হইয়াছিল, মধুসূদনের হাতেও বাল্মীকির রামায়ণ ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর রামায়ণ হইল, অর্থাৎ যাঁহারা জাতীয় কবির মর্যাদালাভ করিবার শক্তির অধিকারী, তাঁহারা কোন কালেই ইহাদের ব্যতিক্রম করিতে পারিতেন না।

উনবিংশ শতাব্দীর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বৃত্রসংহার কাব্য'ও বৃত্রাসুর বধের পৌরাণিক কাহিনীর পরিবেষণ মাত্র নহে, বরং তাহার পরিবর্তে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর জাতীয় নবজাগরণের মহাকাব্য। এইভাবে রামায়ণ-মহাভারত এবং পুরাণ যুগে যুগেই জাতির সেবা করিয়া আসিলেও মধ্যযুগে জাতীয় জীবনের উচ্চ আদর্শের অভাবে সে যুগের রামায়ণ-মহাভারত এবং পুরাণাশ্রিত কাব্য জাতীয় জীবনের কোন উচ্চ আদর্শ কিংবা মহিমা প্রচার করিতে ব্যর্থ হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর জাতির সম্মুখে উচ্চ আদর্শের প্রেরণা ছিল বলিয়া তাহা দ্বারা যে সাহিত্যসৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে সমুচ্চ ভাবাদর্শের প্রভাব ছিল। তাহাই অবলম্বন করিয়া মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র মহাকাব্য রচনার ক্ষেত্রে যে জাতীয় দায়িত্ব পালন করিয়াছেন, গিরিশচন্দ্র তাহাই তাঁহার নাটক রচনার মধ্য দিয়া পালন করিয়া গিয়াছেন মাত্র।

পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের প্রথম আঘাত কাটাইয়া উঠিয়া কলিকাতার নব্য বাংলা সমাজ যখন জাতীয় ঐতিহ্যের অন্তর্মুখী বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইল, তখনই গিরিশ-চন্দ্রের আবির্ভাব হইল। পূর্বেই বলিয়াছি, ব্রাহ্মসমাজ তখন হিন্দুসমাজকে আঘাত করিবার মনোভাব পরিত্যাগ করিয়া ইহার সঙ্গে সহমর্মিতা প্রকাশ করিবার ফলে হিন্দুসমাজ নূতনভাবে তখন অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিতে লাগিল। নববিধান ব্রাহ্মসমাজ কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাধনা হইতে প্রেরণা লাভ করিয়া বিরোধের মধ্য দিয়াও সামঞ্জস্য স্থাপনের প্রয়াস পাইতে লাগিল। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাব বাংলার মুমূর্ষু হিন্দু সমাজকে তখন নূতন আশায় উদ্দীপ্ত করিল। সেই সময়ের অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া রাজনারায়ণ বসু অন্যত্র লিখিয়াছেন, 'বর্তমান সময়ে ভগবান ভারতের পক্ষে সদয়। নতুবা কে আশা করিয়াছিল যে, ইউরোপ প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই ঋগ্বেদ সংহিতা অনুবাদ করিয়া বঙ্গবাসীদের উপকার সাধন করিবেন। বিখ্যাত উপন্যাস লেখক বঙ্কিমবাবু পার্থিব প্রেমকে তুচ্ছ করিয়া পরম প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র ব্যাখ্যায় বদ্ধ-পরিকর হইবেন এবং চতুষ্পাঠীর ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁহাদিগের নিজেদের ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া হিন্দুধর্ম প্রচার করিবেন।'

হিন্দুধর্মের এই পুনরুত্থানের যুগেই ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাব হইয়াছিল। হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান বিষয়টিকে একটু ব্যাপকভাবে দেখিতে হইবে। মধ্যযুগে চৈতন্য-প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে ভক্তিবাদের যে আদর্শ

স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা যদিও প্রথম অবস্থায় পঞ্চোপাসক হিন্দুসম্প্রদায়ের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি করিয়াছিল, তথাপি ক্রমে যেমন ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মের সঙ্গে একাকার হইয়া গিয়াছিল, তেমনই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মও হিন্দুধর্ম এবং সমাজের সঙ্গে একাকার হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং যখন হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান কথাটি বলিতে চাহি, তখন তাহার মধ্যে সেই সঙ্গেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের পুনরভ্যুত্থান কথাটি বাদ যায় না। তবে এ' কথা সত্য যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম কিংবা তাহার সমাজ স্বাধীনভাবে সেদিন পুনরাবির্ভূত না হইলেও হিন্দুধর্মের মধ্য দিয়াই তাহার পুনরভ্যুত্থান সম্ভব হইয়াছিল। অবশ্য ইহারও পরবর্তীকালে নবগঠিত বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়া নূতন আদর্শে যে ইহা পুনরুজ্জীবিত না হইয়াছিল, তাহা নহে। কিন্তু সেদিন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব নিজস্ব সাধনার মধ্য দিয়া ভক্তিবাদের আদর্শটিকে যেভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই সেদিন সমাজ-জীবনের সম্মুখে অহৈতুকী কিংবা শুদ্ধা ভক্তির আদর্শরূপে ব্যাপক প্রচার লাভ করিয়াছিল। অধিকন্তু, সেই ভক্তিবাদ সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তাহার পরিবর্তে অলৌকিক দৈবশক্তিকে অতিক্রম করিয়াও নব নব লক্ষ্যকে আশ্রয় করিয়াছিল, এবং জননী-জন্মভূমিও ক্রমে ভক্তির লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

ভক্তি-চেতনা বাঙ্গালীর জাতীয় ধর্মচেতনার অন্তর্নিবিষ্ট গুণ। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব হইতেই যে দিন বাংলাভাষা ও বাঙ্গালীর সংস্কৃতি একটি বিশেষ রূপ লাভ করিয়াছিল, সেইদিন হইতেই ইহাও জাতির হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর তাহা ফুলে ফলে বিকাশলাভ করিয়াছিল মাত্র। সেইজন্য পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার সংস্পর্শে আসিবার ফলে এ'দেশে উনবিংশ শতাব্দীতে যে বুদ্ধিবাদের বিকাশ হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ইহার শক্তি অনুভূত হইয়াছিল। সেইজন্য মধ্যযুগের শেষপ্রান্তে আসিয়া শাক্ত সম্প্রদায় কালীভক্তির মধ্যে নিজের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহারই ধারা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়া রামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবকে সহজ এবং সম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল। এমন কি, রামমোহন রায়ের ব্রাহ্ম ধর্ম-চেতনার মধ্যেও যে ব্রহ্মানুভূতির কথা আছে, তাহাও ঐকান্তিকী ভক্তি নিরপেক্ষ নহে; কারণ, ভক্তি এবং বিশ্বাস ব্যতীত ব্রহ্মানুভূতি সম্ভব নহে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে এই ভাবটি স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে এবং ব্রহ্মবান্ধব কেশবচন্দ্রের মধ্যে তাহারই পূর্ণতম শক্তি বিকাশলাভ করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর যুগগুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মধ্যে

বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের সাধনা ভক্তির পথেই সার্থকতা লাভ করিয়াছে। জা,
জীবনের ভক্তি-সাধনার এই ধারা অনুসরণ করিয়াই সে যুগের সাহিত্যের এ‹.
বিশেষ অংশ,—পৌরাণিক নাটক রচিত হইয়াছে। সুতরাং জাতীয় সাহিত্যে
ইহা স্বাভাবিক নিয়মেই আসিয়াছে, ব্যক্তিবিশেষের কোন একক চেতনায়
তাহা সম্ভব হয় নাই।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব প্রাচ্য কিংবা পাশ্চাত্ত্য কোন পদ্ধতির শিক্ষার
সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন না; অথচ এ কথা সত্য, ঊনবিংশ শতাব্দীর
আধ্যাত্মিক এবং মানবিক সকল চেতনাই তাঁহার অন্তরে বিধৃত হইয়াছিল।
সহজ এবং সরল কথায় অধ্যাত্মচেতনার যে সুগভীর অভিব্যক্তি তাঁহার মধ্য দিয়া
প্রকাশ পাইত, তাহা আপামর জনসাধারণের মধ্যে ভক্তি ও বিশ্বাস সৃষ্টি করিতে
সহায়ক হইয়াছে। কেবলমাত্র সুগভীর অধ্যয়ন দ্বারা জ্ঞানলাভের পথেই যে
অধ্যাত্মচেতনা লাভ করা যায় না, এই চেতনা সাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত
হইবার ফলে প্রত্যেকেই নিজের সম্পর্কে আশান্বিত হইয়া উঠিবার সুযোগ
পাইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র ঘোষও উচ্চশিক্ষার কোন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ
করিয়া কোন জ্ঞানলাভ করেন নাই। পরমহংসদেব যেমন স্বাভাবিক সূত্রেই
তাঁহার অন্তরের মধ্যে ভক্তিচেতনা অনুভব করিয়াছিলেন, ভক্ত গিরিশচন্দ্রের
মনেও সেইভাবে তাহা উদিত হইয়াছিল, কোন জটিল শাস্ত্রের পথ ধরিয়া তাহার
উদয় হয় নাই। সেইজন্য গিরিশচন্দ্র অতি সহজেই পরমহংসদেবকে গুরু বলিয়া
গ্রহণ করিবার প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নবপ্রবুদ্ধ
বাঙ্গালীর অধ্যাত্মচেতনা যাহা হওয়া আবশ্যক ছিল, রামকৃষ্ণ তাহারই বাণীবহ
ছিলেন বলিয়া প্রত্যেকেই তাঁহার মধ্যে নিজের ধ্যান ও বিশ্বাসের স্বরূপটিই
লক্ষ্য করিয়াছিলেন, গিরিশচন্দ্রও তাহাই করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের
প্রভাব যখন নানা কারণেই হ্রাস পাইতেছিল, তখন এক বলিষ্ঠ আধ্যাত্মিক
আদর্শ অবিচল রাখিয়া তিনি সাধনার পথে সে'দিন অগ্রসর হইতেছিলেন,
সেইজন্য ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনের মধ্য দিয়াও যাঁহাদের আধ্যাত্মিক চেতনা সেদিন
নূতন ভাবে জাগ্রত হইতেছিল, তাঁহারাও তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিয়া নিজেদের
আধ্যাত্মিক পিপাসা চরিতার্থ করিতে লাগিলেন। সেইজন্য নিঃশেষিত-শক্তি
ব্রাহ্ম-সমাজের নানা বিক্ষিপ্ত এবং বিচ্ছিন্ন উপকরণের মধ্য হইতেও রামকৃষ্ণের
ধর্মমতের শক্তি বিস্তারলাভ করিতে লাগিল।

বাঙ্গালীর যে শাশ্বত রস-সংস্কার এবং যে অধ্যাত্মচিন্তার ধারা অনুসরণ

করিয়া গিরিশচন্দ্রের সে যুগে আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহার মধ্যেও ভক্তির একটি প্রবাহ সংযুক্ত হইয়াছিল। জীবনের বিচিত্র আচার-আচরণের মধ্য দিয়া তাহার প্রভাব তাঁহার প্রথম জীবনে যতই গৌণ হইয়া পড়ুক না কেন, রামকৃষ্ণের জীবন এবং সাধনার পুণ্যস্পর্শে তাহা তাঁহার মনে পরিপূর্ণ শক্তিতে পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিল। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটক রচনার প্রথম যুগ হইতে তাঁহার মধ্যে ভক্তির একটি ক্ষীণ রেখা প্রবাহিত হইতেছিল, তাহাই ক্রমে প্রশস্ত হইতে প্রশস্ততর হইয়া তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের সাধনার সঙ্গেও যুক্ত হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটক মাত্রই রামচন্দ্র কিংবা শ্রীকৃষ্ণের লীলাকাহিনী-ভিত্তিক রচনা; ইহাদের মধ্যে ভক্তির ভাব যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহা যতখানি জাতির ঐতিহ্য হইতে আগত, ততখানি রামকৃষ্ণের প্রভাবজাত নহে। কর্মজীবনের বিশেষ একটি পর্ব হইতেই তিনি প্রত্যক্ষভাবে রামকৃষ্ণের সাধনার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিলেন এবং এ'কথাও সত্য, তখন হইতে তাঁহার রচনায় ভক্তিবাদের তত্ত্বকথা যত প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, জীবনের সহজ অনুভূতি তত প্রকাশ পাইতে পারে নাই। সুতরাং গিরিশচন্দ্রের জীবনে ভক্তি-সাধনার দুইটি দিকের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে—প্রথম যুগে তাঁহার ভক্তির প্রেরণা সহজাত ও জাতীয় ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত, কিন্তু পরবর্তী জীবনে তাহাতে রামকৃষ্ণের সাধনার আদর্শ আসিয়াও সংযুক্ত হইয়াছে। সেইজন্য তাঁহার প্রথম যুগের রচনাগুলি যেমন সহজ সরল, অথচ পবিত্র ও সুনির্মল ভক্তিচন্দনে সুরভিত, তেমন পরবর্তী রচনাগুলির অনেকাংশই তত্ত্বকথায় ভারাক্রান্ত।

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর জাতীয় ভক্তি-চেতনার সঙ্গে যোগ রক্ষা করিয়া 'জনা' নাটক রচিত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে মধ্যযুগের ভক্তিপ্রচারমূলক জীবনীকাব্য 'ভক্তিরত্নাকরে'র সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। 'ভক্তিরত্নাকরে'র বিভিন্ন তরঙ্গের মধ্য দিয়া যেমন মধ্যযুগের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সমাজ-জীবনের ভক্তিবাদের বিচিত্র পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, 'জনা' নাটকের মধ্য দিয়াও উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর জীবনে ভক্তিবাদ যে বিচিত্র ধারা সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। মধ্যযুগের বাঙ্গালার ভক্তিবাদ বলিতে যেমন কেবলমাত্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অহেতুকী কৃষ্ণভক্তিই বুঝাইত, 'জনা' নাটকে তাহার পরিবর্তে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর সমাজ জীবন হইতে যে বিভিন্নমুখী ভক্তির ধারা উৎসারিত হইয়াছিল, তাহার রূপ প্রকাশ পাইয়াছে। সেইজন্য ইহাতে বিদূষকের কৃষ্ণভক্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রবীরের

মাতৃভক্তি, জনার গঙ্গাভক্তি ও মদনমঞ্জরীর পতিভক্তির কথাও প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার কারণ, উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর জীবনে ভক্তির ধারা কেবলমাত্র একমুখীন ছিল না, যদিও মধ্যযুগের অহৈতুকী কৃষ্ণভক্তির আদর্শ হইতে ইহা জন্মলাভ করিয়াছিল, তথাপি উনবিংশ শতাব্দীতে তাহা সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা হইতে পরিত্রাণ পাইয়া সমাজ-জীবনের নূতন নূতন আদর্শের সন্ধান লাভ করিয়া শতমুখী ধারায় প্রবাহিত হইতেছিল। এই সর্বব্যাপী ভক্তি-অনুভূতির মধ্যে কালক্রমে দেশভক্তি আসিয়াও যোগস্থাপন করিয়াছিল। স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ববর্তী কালে গিরিশচন্দ্রের মনে দেশাত্মবোধের বিকাশ হয় নাই বলিয়া 'জনা' নাটকে দেশভক্তির কোন পরিচয় প্রকাশ পাইতে পারে নাই, কিন্তু ইহাতে সেই পরিচয় দিবার অবকাশ ছিল।

'জনা' নাটকের প্রথম হইতেই দেখিতে পাওয়া যায়, রাজা নীলধ্বজ কৃষ্ণভক্ত; আমরা দেখিয়াছি, কাশীরাম দাসের মহাভারতে তাহা নাই; সুতরাং যুগপ্রভাব বশত ইহা গিরিশচন্দ্র নিজেই যোজনা করিয়াছেন। কাশীরাম দাসে জনা একমাত্র গঙ্গাজলে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন ব্যতীত তাঁহার গঙ্গাভক্তির আর কোন কথা নাই। গিরিশচন্দ্র প্রথম হইতেই জনাকে গঙ্গার প্রতি একান্ত ভক্তিমতী করিয়া কল্পনা করিয়াছেন, জামাতা অগ্নির নিকট তিনি বর প্রার্থনা করিতেছেন,

> যেন অন্তকালে গঙ্গাজলে
> ত্যজি প্রাণবায়ু;
> ভাগীরথী-পদে মতি রহে চিরদিন;

স্বাহাও স্বামীর নিকট হইতে কেবলমাত্র পতিভক্তির বর প্রার্থনা করিয়া লইল। বিদূষকের মধ্যে প্রথম হইতেই সাত্ত্বিক ভক্তির বিকাশ হইয়াছিল। তিনি প্রথম হইতেই বিশ্বাস করিতেন যে, 'কৃষ্ণ দয়াময়, নাম কল্লেই হন উদয়।' সুতরাং তাঁহার ভক্তির প্রেরণা তাঁহার একান্ত জন্মসিদ্ধ গুণ। অগ্নিও বিদূষককেই আদর্শ ভক্ত বলিয়া প্রচার করিলেন,

> ধন্য ধন্য তুমি দ্বিজোত্তম,
> হরি-ভক্ত তোমা সম নাহি ত্রিভুবনে।
> হরির মহিমা তোমা সম কেবা জানে।
> এক নামে মুক্তি পায় নরে,
> এ বিশ্বাস হৃদে যেবা ধরে,
> এ ভব-সাগর গোষ্পদ সমান তার।—১।১

বাংলাদেশে প্রচলিত রাধাকৃষ্ণের কাহিনী অবলম্বন করিয়া রচিত রাসলীলা, অর্থাৎ ইহাতে রাধা প্রধানা নায়িকা। ইহার ভিতর দিয়া গিরিশচন্দ্র বাংলার প্রাচীন বৈষ্ণব কবিতার রস-ধারাটি অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া ইহা অতি সহজেই দর্শকের হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। রচনাটির মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র সুস্পষ্ট প্রভাব অনুভব করা যায়। গিরিশ-চন্দ্রের প্রতিভার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, তিনি অতি সহজে বাংলা দেশের বিভিন্ন ধর্মীয় আদর্শগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করিতে পারিতেন, তাহাতে সকল সম্প্রদায়ের লোকই এক আসরে বসিয়া তাঁহার রচনার রসাস্বাদন করিতে পারিত। কৃষ্ণলীলা-বর্ণনা প্রসঙ্গেও তিনি এখানে শ্রীরাধার মুখ দিয়া কালীকীর্তন করাইয়াছেন, কৃষ্ণকালী করাইয়াছেন, কৃষ্ণকালী পরিকল্পনার এক অভিনব ব্যাখ্যা তিনি তাঁহার এই রচনাটির ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যার ভিতর দিয়া শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইহার মধ্যেই গিরিশচন্দ্রের সর্বধর্মসমন্বয়গত আদর্শের প্রেরণা সর্বপ্রথম অঙ্কুরিত হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার প্রভাস-মিলন বিষয়বস্তু হিসাবে অবলম্বন করিয়া গিরিশচন্দ্র একখানি পূর্ণাঙ্গ পৌরাণিক নাটক রচনা করেন, তাহার নাম 'প্রভাস-যজ্ঞ'। 'প্রভাস-যজ্ঞে'র মধ্যে ঐশ্বর্য ও মধুর রসের মিলন হইয়াছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণলীলার যে মধুর দিকটির কথা তাঁহার অধিকাংশ কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক নাটকে সার্থকতার সঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন, ইহার মধ্যেও তাহারই প্রকাশ [illegible]তর হইয়াছে। কৃষ্ণ চরিত্রের মধুর দিকটিই প্রধানত সকল বাঙালীকেই [illegible]ন আকৃষ্ট করিয়াছিল, গিরিশচন্দ্রও স্বভাবতই তাহা দ্বারাই আকৃষ্ট [illegible]য়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহার 'প্রভাস-যজ্ঞে'র নাটকেও মধুর-রসই প্রাধান্য [illegible] করিয়াছে। ইহার মধ্যে কৃষ্ণ-বিরহিণী রাধিকার যে রূপটি পাওয়া যায়, [illegible]র সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীর বিরহিণী রাধিকার কোন পার্থক্য নাই। [illegible] শ্রীরাধিকা বলিতেছেন, 'সখি, আমি কি কৃষ্ণকে ভুলেছি, কৃষ্ণ বিনা কেমনে জীবিত আছি? আমার কালাচাঁদ কি কাছে ছিল? দেখ, [illegible]আর নেই, সকলি কৃষ্ণময়; রাধা আর কোথায়? এই যে আমার [illegible]ই যে আমার কৃষ্ণ!' (১।২) ইহার মধ্যে বৈষ্ণব কবিতার এই [illegible]ধ্বনিত হইয়াছে, 'অনুখন মাধব, মাধব সুমরত, সুন্দরী ভেলী মাধাই।'

কৃষ্ণ-বিরহিত নন্দালয়ের চিত্র পরিকল্পনার মধ্যেও নাট্যকারের আন্তরিকতার পরিচয় মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি, দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের মধ্যেও এই মধুর রসের স্পর্শ গিয়া পৌঁছিয়াছে। এইদিক দিয়া নাটকটি একটি অনবদ্য রস মধুর সৃষ্টি।

'নন্দদুলাল' গিরিশচন্দ্রের একখানি পৌরাণিক ত্র্যঙ্ক গীতি-নাট্য। ইহার তিনটি বিভিন্ন অঙ্কে কৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলার স্বতন্ত্র তিনটি কাহিনীকে নাট্যরূপ দেওয়া হইয়াছে; ইহাদের মধ্য দিয়া কৃষ্ণের মহিমা প্রচার করাই নাট্যকারের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। ইহার প্রথম অঙ্কে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম বা জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব, দ্বিতীয় অঙ্কে শ্রীকৃষ্ণের অন্নভিক্ষা এবং তৃতীয় অঙ্কে কৃষ্ণকালীর বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে; এই সকল কাহিনীর মধ্যে পরস্পর কোন যোগসূত্র রক্ষিত হয় নাই। নাটকখানি জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে অভিনীত হইবার উদ্দেশ্যেই রচিত, সেইজন্যই ইহার মধ্য দিয়া প্রকৃত নাট্যরস অপেক্ষা আধ্যাত্মিক তত্ত্বেরই সমধিক বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে বালক কৃষ্ণবলরামের মুখে এই প্রকার তত্ত্বকথার অবতারণা করা হইয়াছে—

> শ্রীকৃষ্ণ।.........কর্মক্ষয় ব্যতীত আমায় কেউ পায় না। জন্মজন্মান্তরে সঞ্চিত পাপপুণ্য [illegible]ই ছিল। দুয়েরই ফলভোগ ব্যতীত জীবের মুক্তি হয় না। আমার নাম স্মরণ করেছে, [illegible] ওকে মুক্তি অপেক্ষা সারবস্তু দিয়েছি।.........
>
> বলরাম। ওর পাপপুণ্য ক্ষয় হলো কিসে?
>
> শ্রীকৃষ্ণ। আমার স্মরণ, মনন, ধ্যানে যে আনন্দ, সেই আনন্দ উপভোগে ওর পুণ্যক্ষয় [illegible]ছে, আর আমার বিরহ তাপে পাপ দগ্ধ হয়েছে,...(২।৭)

নাটক হিসাবে ইহা অকিঞ্চিৎকর হইলেও ইহার সঙ্গীতাংশ [illegible]চত— বৈষ্ণব গীতি-কবিতার প্রেম-ভক্তির স্বতঃস্ফূর্ত রাগিণীটি ইহার [illegible]ঙ্গীতগুলির মধ্য দিয়া ধ্বনিত হইয়াছে।

আগমনীর বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া গিরিশচন্দ্র 'আগমনী' নামক একখানি ক্ষুদ্র পৌরাণিক গীতিনাট্য রচনা করেন। ইহাই গিরিশচন্দ্রের প্রথম রচনা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহাতে কেবলমাত্র আগমনীর কাহিনী সংক্ষিপ্ত গীতিনাট্যাকারে গ্রথিত হইয়াছে, গিরিশচন্দ্রের স্বরচিত আগমনী সঙ্গীতগুলির মধ্য দিয়া রামপ্রসাদ-প্রবর্তিত আগমনীগীতির ধারাটিই অনুসৃত হইয়াছে। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে, যে বাংলার জাতীয় উপাদান ভিত্তি করিয়াই গিরিশচন্দ্রের নাট্যরচনায় প্রথম প্রয়াস দেখা দিয়াছিল। যে

আগমনী গানগুলি কবিওয়ালাদিগের রচনার ভিতর দিয়াই সেই যুগে প্রকাশ পাইত, গিরিশচন্দ্র তাহাই নাট্যরচনার ভিতর সর্বপ্রথম স্থান দিয়াছিলেন, এই ভাবেই গিরিশচন্দ্রের নাটক প্রথম হইতেই সমসাময়িক জাতীয় রস-চৈতন্যের বাহন হইয়াছিল।

দক্ষযজ্ঞের সুপরিচিত পৌরাণিক বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া গিরিশচন্দ্র একখানি নাটক রচনা করেন, তাহার নাম 'দক্ষযজ্ঞ'। নাটকখানি চারি অঙ্কে সম্পূর্ণ। অঙ্কের অন্তর্গত দৃশ্যগুলি সংক্ষিপ্ত ও আদ্যোপান্ত গিরিশচন্দ্রের নিজস্ব ছন্দে রচিত। ইহার অন্তর্গত দশমহাবিদ্যা ও সতীর দেহত্যাগের পর মহাদেবের শোকাকুল অবস্থা বর্ণনায় ভারতচন্দ্র ও হেমচন্দ্রের প্রভাব অনুভব করা যায়। তবে ইহাতে সতীদেহ স্কন্ধে করিয়া শিবের ত্রিভুবন ভ্রমণ বৃত্তান্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহা না হইলে শিবের চরিত্রটি আরও সুপরিস্ফুট হইতে পারিত। প্রসূতির চরিত্রটিতে মেনকার ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। এই কাহিনী রচনায় গিরিশচন্দ্র বিশেষ কোন পুরাণকে অবলম্বন করিবার পরিবর্তে প্রচলিত কথকতাকে অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে রামেশ্বর ভট্টাচার্য কর্তৃক রচিত শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্যখানি অবলম্বন করিয়া গিরিশচন্দ্র 'হরগৌরী' নামক একখানি ক্ষুদ্র গীতিনাট্য রচনা করেন—ইহা মাত্র দুইটি অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত বাংলার নিজস্ব জাতীয় উপকরণ লইয়া রচিত গিরিশচন্দ্রের নাটকসমূহের অন্যতম। ইহাতে হরগৌরীর কোন্দল, শিবের চাষ, বাগ্দিনীরূপিণী পার্বতীর শিবকে ছলনা, পার্বতীর শাঁখা পরিবার ইচ্ছা, পার্বতীর পিত্রালয় গমন, শাঁখারী বেশে শিবের হিমালয় যাত্রা ও পরিশেষে হরগৌরী মিলনের কাহিনী পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। নানা লৌকিক ছড়া ও গীতিকায় এই সকল কাহিনী মধ্যযুগের বাংলার সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিক্ষিপ্ত হইয়া ছিল, রামেশ্বর ভট্টাচার্য সেই সকল উপকরণের উপরই ভিত্তি করিয়া তাঁহার শিবায়ন কাব্যখানি রচিত করিয়াছিলেন—কিন্তু ইহাকে সম্পূর্ণ গ্রাম্যতামুক্ত করিতে পারেন নাই। গিরিশচন্দ্র বাংলার এই নিজস্ব জাতীয় রসবস্তুকে সর্বপ্রথম গ্রাম্যতামুক্ত করিলেন এবং ভদ্রসমাজের রুচির উপযোগী করিয়া ইহাকে নূতন রূপ দান করিলেন। যাহা একান্ত বাংলার কৃষকের গান ছিল, তাঁহা কলিকাতা রঙ্গমঞ্চের পাদালোকের সম্মুখীন হইয়া এক নূতন রূপ লাভ করিল।

পৌরাণিক ধ্রুবচরিত্র অবলম্বন করিয়া গিরিশচন্দ্র একখানি পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা করেন, ইহার মধ্যে তাঁহার বিশিষ্ট ভক্তিবাদ এবং সর্বধর্মসমন্বয় আদর্শের উন্মেষ দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও পরবর্তী নাটকসমূহে এই ভাবের পূর্ণতার বিকাশ দেখা দিয়াছিল, তথাপি ইহার ভিতর দিয়াই যে তাহার পূর্বাভাস সূচিত হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিতে পারা যায়। অতএব গিরিশচন্দ্রের আধ্যাত্মিক আদর্শের ক্রমবিকাশের ধারায় এই নাটকখানির একটি বিশেষ মূল্য স্বীকার করিতে হয়।

পৌরাণিক ধ্রুব-কাহিনীর সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের 'ধ্রুব চরিত্রে'র কাহিনীগত কোন পার্থক্য নাই। কেবলমাত্র গিরিশচন্দ্র ইহাতে মহাদেব ও তাঁহার অনুচরদিগের কয়েকটি চরিত্র আনিয়া অতিরিক্ত সংযোগ করিয়াছেন। হরির মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিবার জন্যই অবশ্য এখানে হরের চিত্র আনিয়া সংযোগ করা হইয়াছে, কারণ মহাদেব এখানে বলিতেছেন,

মহাদেব। আয় ধ্রুব, আয় কোলে আয়, বৈষ্ণব স্পর্শে আমার তনু পবিত্র হ'ল।

ধ্রুব। পদ্মপলাশলোচন, এত দুঃখ আমায় কেন দিলে?

মহাদেব। ওরে আমি পদ্মপলাশলোচন নই, আমি সেই শ্রীচরণ আশে সন্ন্যাসী, আমি তোর কাছে হরিপ্রেম ভিক্ষা করতে এসেছি, তোর দর্শনে আমি হরিপ্রেম লাভ করব, এই আশে এসেছি। (৩।৪)

এইভাবে গিরিশচন্দ্রের মধ্যে বৈষ্ণবী ভক্তির অঙ্কুরোদগম হইয়াছিল।

ইহার মধ্যে বিষ্ণুর চরিত্রটি শ্বেত-চন্দনের মত সুরভি ও পবিত্র। ইহার ভিতর দিয়া গিরিশচন্দ্রের সুনির্মল ভক্তিভাবের প্রথম অরুণোদয় দেখা দিয়াছে। পরবর্তী ভক্তিমূলক নাটকসমূহে ইহারই পূর্ণতর বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব নাটকীয় বিষয়-বিন্যাসের দিক হইতে অকিঞ্চিৎকর হইলেও গিরিশ-চন্দ্রের আধ্যাত্মিক সাধনার ইতিহাসে এই 'ধ্রুবচরিত্র' নাটকটির একটি বিশেষ স্থান আছে।

এই নাটকখানিতে দ্বিতীয়া রাণী সুরুচির চরিত্রে মানবীয় রসস্ফূর্তির একটু অবকাশ ছিল। কিন্তু নাট্যকার তাহার সুযোগ গ্রহণ করিতে সফলকাম হইয়াছেন, এ কথা বলিতে পারা যায় না। ভক্তিরসাত্মক নাটক রচনা করিতে গিয়া গিরিশচন্দ্র তাঁহার চারিদিককার ধূলামাটির পরিবেশের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া যাইতেন, সকল কিছুই 'একটি আদর্শলোকে তুলিয়া লইয়া তাহার রূপদান করিবার চেষ্টা করিতেন। তাহার ফলে তাঁহার এই শ্রেণীর

নাটক সর্বদাই ধূলিমাটির স্পর্শ বাঁচাইয়া চলিত—ইহাতেও তাহার কোন ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় না। সুরুচি চরিত্রটিকেও এই জন্যই এখানে রক্তমাংসের মানবী বলিয়া মনে হয় না।

নলদময়ন্তীর সুপরিচিত পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করিয়াও গিরিশচন্দ্র একখানি পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা করিয়াছেন; নাটকখানি চারি অঙ্কে সম্পূর্ণ, ইহার মধ্যেও গিরিশচন্দ্রের অন্যান্য পৌরাণিক নাটকের মত মূলের প্রতি সুগভীর আনুগত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। নাটকখানি আদ্যোপান্ত গিরিশচন্দ্রের ব্যবহৃত নিজস্ব পদ্যচ্ছন্দে রচিত। বিষয়বস্তুর সঙ্গে ইহার রচনা সুন্দর সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়াছে। বনমধ্যে সদ্য স্বামি-পরিত্যক্তা দময়ন্তীর চিত্র হিসাবে এই রচনাটি সার্থক—

> বল, বল—রাখ গো মিনতি,
> জান যদি,
> বল—কোন পথে গেছে মোর পতি,—
> আয়ত লোচন—
> বর্ণ যেন উত্তপ্ত কাঞ্চন—
> গুণধাম, সর্বসুলক্ষণঠাম :
> ব'লে দাও, কোন পথে যা'ব। (৩।৪)

কাহিনীটি অনাবশ্যক দীর্ঘ না করিবার জন্য ইহার সকলগুলি দৃশ্যই যথাযথ বলিয়া বোধ হইবে। এক হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, কাহিনীর সংক্ষিপ্ততা ইহার একটি বিশিষ্ট গুণ—কোন বিষয়েই ভূমিকার বাহুল্য না করিয়া বর্ণনীয় বিষয়টি সর্বাগ্রে নাট্যকার প্রত্যক্ষভাবে এখানে উপস্থিত করিয়া দিয়াছেন, এমন কি প্রচুর অবকাশ থাকা সত্ত্বেও নৃত্য ও সঙ্গীতের বাহুল্যও ইহাতে বর্জিত হইয়াছে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের কোন বিষয়-বস্তু অবলম্বন করিয়া গিরিশচন্দ্রের পূর্বে আর কেহ কোন বাংলা নাটক রচনা করেন নাই। তিনি বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্তর্গত চৈতন্যভাগবত অবলম্বন করিয়া যেমন 'চৈতন্য-লীলা' ও 'নিমাই সন্ন্যাস' নামক দুইখানি নাটক রচনা করিয়াছেন, তেমনই মঙ্গলকাব্যের অন্তর্গত চণ্ডীমঙ্গলের শ্রীমন্ত-কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া 'কমলে কামিনী' নাটক রচনা করিয়াছেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীই এই বিষয়ে তাঁহার ভিত্তি ছিল। কাহিনীটিকে নাটকের পরিমিত পরিধির মধ্যে স্থান দিবার জন্য

পৌরাণিক ধ্রুবচরিত্র অবলম্বন করিয়া গিরিশচন্দ্র একখানি পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা করেন, ইহার মধ্যে তাঁহার বিশিষ্ট ভক্তিবাদ এবং সর্বধর্মসমন্বয় আদর্শের উন্মেষ দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও পরবর্তী নাটকসমূহে এই ভাবের পূর্ণতার বিকাশ দেখা দিয়াছিল, তথাপি ইহার ভিতর দিয়াই যে তাহার পূর্বাভাস সূচিত হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিতে পারা যায়। অতএব গিরিশচন্দ্রের আধ্যাত্মিক আদর্শের ক্রমবিকাশের ধারায় এই নাটকখানির একটি বিশেষ মূল্য স্বীকার করিতে হয়।

পৌরাণিক ধ্রুব-কাহিনীর সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের 'ধ্রুব চরিত্রে'র কাহিনীগত কোন পার্থক্য নাই। কেবলমাত্র গিরিশচন্দ্র ইহাতে মহাদেব ও তাঁহার অনুচরদিগের কয়েকটি চরিত্র আনিয়া অতিরিক্ত সংযোগ করিয়াছেন। হরির মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিবার জন্যই অবশ্য এখানে হরের চিত্র আনিয়া সংযোগ করা হইয়াছে, কারণ মহাদেব এখানে বলিতেছেন,

মহাদেব। আয় ধ্রুব, আয় কোলে আয়, বৈষ্ণব স্পর্শে আমার তনু পবিত্র হ'ল।

ধ্রুব। পদ্মপলাশলোচন, এত দুঃখ আমায় কেন দিলে?

মহাদেব। ওরে আমি পদ্মপলাশলোচন নই, আমি সেই শ্রীচরণ আশে সন্ন্যাসী, আমি তোর কাছে হরিপ্রেম ভিক্ষা করতে এসেছি, তোর দর্শনে আমি হরিপ্রেম লাভ করব, এই আশে এসেছি। (৩।৪)

এইভাবে গিরিশচন্দ্রের মধ্যে বৈষ্ণবী ভক্তির অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছিল।

ইহার মধ্যে বিষ্ণুর চরিত্রটি শ্বেত-চন্দনের মত সুরভি ও পবিত্র। ইহার ভিতর দিয়া গিরিশচন্দ্রের সুনির্মল ভক্তিভাবের প্রথম অরুণোদয় দেখা দিয়াছে। পরবর্তী ভক্তিমূলক নাটকসমূহে ইহারই পূর্ণতর বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব নাটকীয় বিষয়-বিন্যাসের দিক হইতে অকিঞ্চিৎকর হইলেও গিরিশ-চন্দ্রের আধ্যাত্মিক সাধনার ইতিহাসে এই 'ধ্রুবচরিত্র' নাটকটির একটি বিশেষ স্থান আছে।

এই নাটকখানিতে দ্বিতীয়া রাণী সুরুচির চরিত্রে মানবীয় রসস্ফূর্তির একটু অবকাশ ছিল। কিন্তু নাট্যকার তাহার সুযোগ গ্রহণ করিতে সফলকাম হইয়াছেন, এ কথা বলিতে পারা যায় না। ভক্তিরসাত্মক নাটক রচনা করিতে গিয়া গিরিশচন্দ্র তাঁহার চারিদিককার ধূলামাটির পরিবেশের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া যাইতেন, সকল কিছুই 'একটি আদর্শলোকে তুলিয়া লইয়া তাহার রূপদান করিবার চেষ্টা করিতেন। তাহার ফলে তাঁহার এই শ্রেণীর

নাটক সর্বদাই ধূলিমাটির স্পর্শ বাঁচাইয়া চলিত—ইহাতেও তাহার কোন ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় না। সুরুচি চরিত্রটিকেও এই জন্যই এখানে রক্তমাংসের মানবী বলিয়া মনে হয় না।

নলদময়ন্তীর সুপরিচিত পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করিয়াও গিরিশচন্দ্র একখানি পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা করিয়াছেন; নাটকখানি চারি অঙ্কে সম্পূর্ণ, ইহার মধ্যেও গিরিশচন্দ্রের অন্যান্য পৌরাণিক নাটকের মত মূলের প্রতি সুগভীর আনুগত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। নাটকখানি আদ্যোপান্ত গিরিশচন্দ্রের ব্যবহৃত নিজস্ব পদ্যচ্ছন্দে রচিত। বিষয়বস্তুর সঙ্গে ইহার রচনা সুন্দর সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়াছে। বনমধ্যে সদ্য স্বামি-পরিত্যক্তা দময়ন্তীর চিত্র হিসাবে এই রচনাটি সার্থক—

> বল, বল—রাখ গো মিনতি,
> জান যদি,
> বল—কোন পথে গেছে মোর পতি,—
> আরক্ত লোচন—
> বর্ণ যেন উত্তপ্ত কাঞ্চন—
> গুণধাম, সর্বসুলক্ষণঠাম;
> ব'লে দাও, কোন পথে যা'ব। (৩।৫)

কাহিনীটি অনাবশ্যক দীর্ঘ না করিবার জন্য ইহার সকলগুলি দৃশ্যই যথাযথ বলিয়া বোধ হইবে। এক হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, কাহিনীর সংক্ষিপ্ততা ইহার একটি বিশিষ্ট গুণ—কোন বিষয়েই ভূমিকার বাহুল্য না করিয়া বর্ণনীয় বিষয়টি সর্বাগ্রে নাট্যকার প্রত্যক্ষভাবে এখানে উপস্থিত করিয়া দিয়াছেন, এমন কি প্রচুর অবকাশ থাকা সত্ত্বেও নৃত্য ও সঙ্গীতের বাহুল্যও ইহাতে বর্জিত হইয়াছে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের কোন বিষয়-বস্তু অবলম্বন করিয়া গিরিশচন্দ্রের পূর্বে আর কেহ কোন বাংলা নাটক রচনা করেন নাই। তিনি বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্তর্গত চৈতন্যভাগবত অবলম্বন করিয়া যেমন 'চৈতন্য-লীলা' ও 'নিমাই সন্ন্যাস' নামক দুইখানি নাটক রচনা করিয়াছেন, তেমনই মঙ্গলকাব্যের অন্তর্গত চণ্ডীমঙ্গলের শ্রীমন্ত-কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া 'কমলে কামিনী' নাটক রচনা করিয়াছেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীই এই বিষয়ে তাঁহার ভিত্তি ছিল। কাহিনীটিকে নাটকের পরিমিত পরিধির মধ্যে স্থান দিবার জন্য

শ্রীমন্তের পিতৃসন্ধানে বহির্গত হওয়ার বৃত্তান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া সিংহলে ধনপতির সঙ্গে তাহার মিলন পর্যন্ত বৃত্তান্তই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে, ইহার পূর্ববর্তী বৃত্তান্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে। নাট্যকার ইহাকে 'ভক্তিরসাত্মক নাটক' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহার মধ্যেও তাঁহার অন্যান্য পৌরাণিক নাটকের অনুকূল আবহাওয়া ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র রচিত অন্যান্য নাটকের ভক্তির আদর্শের সঙ্গে ইহার ভক্তিভাবের পার্থক্য আছে। ইহাতে অহৈতুকী ভক্তির কথা নাই, বরং ইহাতে যাহা আছে তাহা সকামা ভক্তি—মঙ্গলকাব্যের দেবতাদিগের প্রতি ভক্তির যে আদর্শ মধ্যযুগে গড়িয়া উঠিয়াছিল, ইহা তাহাই। এইজন্যই অন্যান্য পৌরাণিক নাটকের মত ইহার মধ্যে গিরিশচন্দ্রের স্বাভাবিক প্রতিভা বিকাশের অন্তরায় হইয়াছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের একটি মানবিক দিক আছে—ইহার মধ্যে দেবতাও দোষগুণে মানুষেরই স্তরে নামিয়া আসিয়াছে; কিন্তু গিরিশচন্দ্রের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি স্বতন্ত্র ছিল, সেইজন্য ইহাতে চণ্ডীমঙ্গলের স্বাভাবিক আবহাওয়া সৃষ্টি হইতে পারে নাই—অতএব একদিক দিয়া ইহা গিরিশচন্দ্রের অন্যান্য পৌরাণিক নাটকের মূল আদর্শ হইতে যেমন স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে, তেমনই ইহার নিজস্ব রস-পরিবেশ হইতেও ইহা বিচ্যুত হইয়াছে—সেইজন্য এই নাটকখানি কোন দিক দিয়াই রসোত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। তথাপি কতকগুলি খণ্ডদৃশ্য সুপরিকল্পিত হওয়ার ফলে ইহার মধ্যে গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভার একটি নূতন দিকের সন্ধান পাওয়া যায়।

ইহার প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে গুরুমহাশয়ের পাঠশালার বর্ণনাটি বাস্তব হইয়াছে, বাঙ্গাল মাঝিদিগের চিত্রগুলিও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীমন্তের চরিত্রের মধ্যে নাটকীয় উপাদান ছিল, কিন্তু মুকুন্দরামের প্রতি একান্ত আনুগত্যের ফলে গিরিশচন্দ্রের নাটকে তাহার যথার্থ বিকাশ সম্ভব হয় নাই।

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল-বহির্ভূত কোন আখ্যান গিরিশচন্দ্র ইহাতে গ্রহণ করেন নাই, এই বিষয়ে তিনি অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সমগ্রভাবে এই কাহিনীর মধ্যে যথার্থ নাটকীয় উপাদান তেমন কিছু ছিল না বলিয়া গিরিশচন্দ্রের এই প্রচেষ্টা সার্থক হয় নাই। রচনার কোন কোন স্থানে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র

প্রভাব অনুভব করা যায়। গিরিশচন্দ্রের নিম্নোদ্ধৃত ভাষা ও ভাব মধুসূদনের প্রভাবের ফল,—

পদ্মা !
মম প্রাণ উচাটন বল কি কারণ,
কে কোথায় ডাকিছে আমায়,
কে চাহে আশ্রয়, কহ ত্বরা শুবদনি ?
স্তনে ঝরে ক্ষীর, হতেছি অস্থির,
ব্যাকুল সন্তান কোথা ! (৩।৫)

কাশীরাম দাসের মহাভারতোক্ত দাতাকর্ণের কাহিনীটি অবলম্বন করিয়া গিরিশচন্দ্র একটি অতি ক্ষুদ্র পৌরাণিক নাটিকা রচনা করেন—ইহার নাম 'বৃষকেতু'; ইহা মাত্র একটি অঙ্কে সম্পূর্ণ। মূল সংস্কৃত মহাভারতে এই কাহিনীটি নাই, কবিচন্দ্র নামক মধ্যযুগের একজন বাঙ্গালী কবি এই বিষয়ে একখানি ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করেন। কাশীরাম দাস তাহাই তাঁহার মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন, ধর্মমঙ্গলের হরিশচন্দ্র পালাটিও কবিচন্দ্রের উক্ত কাহিনী অবলম্বন করিয়া লিখিত। তবে কাশীরাম দাসই গিরিশচন্দ্রের ভিত্তি। নাট্য-কাহিনীটির মধ্যে গিরিশন্দ্রে কোন বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করিতে পারেন নাই—ইহা নিতান্ত অল্পপরিসর ও একান্ত আদর্শমুখী বলিয়া কোন চরিত্রসৃষ্টিরই প্রয়াস ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল মাত্র কাশীরাম দাসের কাহিনীটি নাট্যাকারে পরিবেশন করা ভিন্ন গিরিশচন্দ্রের এখানে আর কোন গৌরব প্রকাশ পায় নাই।

শ্রীবৎস-চিন্তার সুপরিচিত পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া গিরিশচন্দ্র একখানি পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা করেন, ইহার নাম 'শ্রীবৎস-চিন্তা'। কাহিনীর দিক দিয়া নাট্যকার এখানে পুরাণোক্ত কাহিনীরই আনুপূর্বিক অনুসরণ করিয়াছেন, গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটক রচনার সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ ইহার মধ্য দিয়াও প্রকাশ পাইয়াছে। শ্রীবৎস চিন্তা, শনি এবং লক্ষ্মী ইহার প্রধান চরিত্র, ইহাদের পরিকল্পনায় গতানুগতিক পথই অনুসরণ করা হইয়াছে—তাহাতে কোন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে আদর্শ পালনের জন্য শ্রীবৎস রাজার দুঃখ-দুর্গতি-সহনশীলতার যে চিত্র নাট্যকার অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা অনেক স্থলেই মর্মস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে; চিন্তার চরিত্রটিও নাট্যকার সহানুভূতির সঙ্গে অঙ্কিত করিয়াছেন। বাহু-রাজকন্যা ভদ্রার

চরিত্রটির মধ্যে বাঙ্গালী নারীর স্বভাব-কমনীয়তার সামান্য স্পর্শ অনুভব করিতে পারা যায়।,

দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু ও তৎপুত্র প্রহ্লাদের কাহিনী অবলম্বন করিয়া গিরিশচন্দ্র একখানি ক্ষুদ্র পৌরাণিক নাটক রচনা করেন—নাটকখানি মাত্র দুইটি অঙ্কে সম্পূর্ণ। কিন্তু এই অল্প পরিসরের মধ্যেই ইহার রস নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। কাহিনীটির মধ্যে যে একটি আদর্শগত দ্বন্দ্ব আছে, তাহাই ইহার নাট্যগুণ বর্ধিত করিয়াছে। একদিকে হিরণ্যকশিপুর প্রবল কৃষ্ণদ্রোহিতা ও অন্যদিকে প্রহ্লাদের আন্তরিক কৃষ্ণাসক্তি এই উভয়ের সংঘাতে ইহার কাহিনী একটি নাট্যিক গৌরব লাভ করিয়াছে। তবে ইহা গিরিশচন্দ্রের অন্যান্য ভক্তিরসাশ্রিত নাটকের মতই একান্ত আদর্শনিষ্ঠ রচনা। প্রহ্লাদের জননী কয়াধুর চরিত্রটির মধ্যে সামান্য একটু মানবিকতার স্পর্শ অনুভব করা গেলেও মূল নাট্য-কাহিনীর একান্ত আদর্শনিষ্ঠার প্রভাবে তাহাও সম্যক্ উপলব্ধি করা সহজ হয় না। তবে ভক্তিরসাশ্রিত রচনা হিসাবে ইহা গিরিশচন্দ্রের অন্যান্য অনুরূপ রচনার সমকক্ষ।

দুষ্টা সরস্বতীর অভিশাপে নারদ ও পর্বতমুনির মতিভ্রম ও তাঁহাদের অভিশাপ হইতে অম্বরীষকে রক্ষা করিয়া তাঁহাকে বিষ্ণু কর্তৃক বৈকুণ্ঠে স্থান দান করিবার কাহিনী অবলম্বন করিয়া গিরিশচন্দ্র একখানি ক্ষুদ্র পৌরাণিক নাটক রচনা করেন, তাহার নাম 'অভিশাপ'। নাটকখানি মাত্র দুইটি অঙ্কে সম্পূর্ণ; অন্যান্য কোন কোন পৌরাণিক নাটকের মত ইহার মধ্য দিয়াও গিরিশচন্দ্র তাঁহার সর্বধর্মসমন্বয়ের আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। বিষ্ণু কেন রামাবতার রূপ গ্রহণ করিবেন নারদের এই প্রশ্নের উত্তরে বিষ্ণু বলিতেছেন, 'জগৎকে জানাবো, কেবল রামের গুরু শিব নয়, শিবের গুরু রাম। জগৎ দেখবে, জগৎ শিখবে—শিবরাম অভেদ (২।৫)।' এইভাবে গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক আখ্যায়িকাগুলির পরস্পর বিচ্ছিন্ন সাম্প্রদায়িক রূপের অন্তরালে ঐক্যের সন্ধান করিয়াছেন।

বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের বিবাদ ও পরিণামে মিলন, বিশ্বামিত্রের তপস্যা, ত্রিশঙ্কুর স্বর্গ ইত্যাদি কাহিনী অবলম্বন করিয়া গিরিশচন্দ্র একখানি পূর্ণাঙ্গ পৌরাণিক নাটক রচনা করেন, তাহার নাম 'তপোবল'। তপস্যা দ্বারা বিশ্বামিত্র যে কি শক্তি লাভ করিয়াছিলেন, পৌরাণিক কাহিনীর উপর ভিত্তি

করিয়া তাহাই বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা এই নাটকের উদ্দেশ্য। নাটকের উপসংহারে বিশ্বামিত্র বলিতেছেন,

> হে মানব,
> ব্রহ্মর্ষিত্ব, দেবদ্বিজ-কৃপায় লভিয়ে
> আকাঙ্ক্ষা নহেক সম্পূরণ।
> আকাঙ্ক্ষা আমার—
> নরত্ব দুর্লভ অতি বুঝুক মানব।
> নাহি জাতির বিচার,
> লভে নর উচ্চপদ তপোবলে। (৫৬)

এই উক্তি হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, তপোবল প্রচারের নামে সর্বসংস্কারমুক্ত মানবতাবোধের বিকাশই এই নাটক রচনার মূল উদ্দেশ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ হইতেই এদেশের ধর্মসংস্কারের ভিতর দিয়া যে আত্মবোধের পরিচয় প্রকাশ পাইতেছিল, গিরিশচন্দ্র একটি পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া অবিমিশ্র পৌরাণিক পরিবেশের মধ্যেই সেই ভাবটির রূপদান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তপস্যায় চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধন ও সদনুষ্ঠান দ্বারা অব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ হইতে পারে—ব্রাহ্মণত্ব কেহ একমাত্র জন্মগত অধিকার সূত্রেই প্রাপ্ত হয় না—ইহাই এই নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়।

বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র এই নাটকের দুইটি প্রধান চরিত্র। জ্ঞানে বশিষ্ঠ এবং কর্মে বিশ্বামিত্র আদর্শ। নাট্যকার অপূর্ব কৌশলে প্রত্যেকটি চরিত্রের আনুপূর্বিক সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন। এই নাটকের একটি উচ্চ লক্ষ্য ছিল যে, চরিত্রবলই প্রকৃত বল। ব্রাহ্মণত্ব চরিত্রগুণের (ethical qualities) সমষ্টি, বশিষ্ঠ তাহার প্রতীক। বিশ্বামিত্র তাঁহার বিপুল তপঃ-সাধনার ভিতর দিয়াও অভিমান ত্যাগ করিতে পারেন নাই বলিয়াই তাঁহার সকল সাধনা ব্যর্থ হইয়াছিল; বশিষ্ঠের নিকট হইতে তিনি অবশেষে তাহা শিক্ষা করিয়া বশিষ্ঠের চারিত্রিকশক্তির নিকট নিজের মস্তক অবনত করিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এই চারিত্রিক শক্তির সাধনা বাংলা দেশে নূতন প্রেরণা লাভ করিয়াছিল। যুগ-প্রেরণার উপর ভিত্তি করিয়া এই নাটক রচিত বলিয়া ইহা গিরিশচন্দ্রের অন্যতম শক্তিশালী রচনা বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল।

চরিত নাটক

ভারতীয় ইতিহাসের কয়েকজন ধর্মসাধকের চরিত্র অবলম্বন করিয়া গিরিশচন্দ্র কয়েকখানি পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা করিয়াছেন—ইহাদিগকে প্রকৃত

ঐতিহাসিক নাটক বলিয়া নির্দেশ করা যায় না; কারণ, ধর্মসাধকদিগের সম্পর্কে যে সকল অতিরঞ্জিত ও অলৌকিক জনশ্রুতি সমাজে সহজেই জন্মলাভ করে, ইহারা প্রধানত তাহাদের উপরই ভিত্তি করিয়া রচিত—নাট্যকার এই সকল চরিত্রের ঐতিহাসিক দিক সন্ধান করিয়া ইহাদিগকে বাস্তব সামাজিক চরিত্র-রূপে উপস্থিত করেন নাই, বরং জনমতের অনুগামী করিয়া সকল দিক দিয়াই অলৌকিক ভাবাপন্ন করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে প্রধান সুরটি ভক্তির; চৈতন্য-জীবনী অবলম্বন করিয়াই এই ধারাটির সূত্রপাত হয় এবং ক্রমে তাহা আরও কয়েকজন মধ্যযুগীয় ভারতীয় সাধককে অবলম্বন করিয়া বিকাশ লাভ করে। কেবলমাত্র দুইটি নাটকের বিষয়বস্তু ভারতীয় মধ্যযুগের পূর্ববর্তী—একটি 'বুদ্ধচরিত' ও অপরটি 'শঙ্করাচার্য'। ভাবের দিক দিয়া প্রথমটির মধ্যে না হইলেও, দ্বিতীয়টির মধ্যে সামান্য ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যাইবে। গিরিশচন্দ্রের ধর্মবোধের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই নাটকগুলিরও ভাবাদর্শ নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে।

এই চরিত-নাটকগুলির একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহাদের মধ্যে চারিত্রিক ক্রমবিকাশ দেখান হয় নাই—কীর্তিত চরিত্রটি প্রথম হইতেই ভগবানের অবতার বলিয়া ধরিয়া লইয়া তাহার আনুপূর্বিক জীবনই অলৌকিকতায় আচ্ছন্ন করিয়া দেখান হইয়াছে—এখানেই এই চরিত-নাটকগুলি পৌরাণিক নাটকের লক্ষণাক্রান্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া অনুভূত হইবে। এই নাটকগুলিতে দুই শ্রেণীর চরিত্র আছে—একটি ভগবানের শ্রেণী, আর একটি ভক্তের শ্রেণী। ভগবানের শ্রেণীতে চৈতন্য, নিত্যানন্দ, বুদ্ধ ও শঙ্করাচার্য—ইঁহারা সকলেই ভগবানের অবতার। দ্বিতীয় শ্রেণীর চরিত্রের মধ্যে বিল্বমঙ্গল ঠাকুর, রূপ-সনাতন, পূর্ণচন্দ্র ও করমেতি বাঈ—ইঁহারা ভক্ত। এখানে গিরিশচন্দ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব আদর্শকেই প্রধানত অবলম্বন করিয়া ভগবান ও ভক্তকে পরস্পর সন্নিহিত স্থানে আসন দিয়াছেন, এমন কি অনেক সময় ইঁহারা একাকার হইয়া গিয়াছেন।

গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাট্যরচনার ধারা অনুসরণ করিয়াই এই নাটকগুলি রচিত হইয়াছে এবং ইহাদের মধ্যেও গৌড়ীয় ভক্তিবাদের আদর্শ সুপরিস্ফুট হইয়াছে—এই হিসাবে বাংলার জাতীয় রসচৈতন্যের সঙ্গে ইহাদের নিবিড় যোগ স্থাপিত হইয়াছে। এই নাটকগুলির মধ্যে যে সকল অলৌকিকতার বর্ণনা আছে, তাহা অতি-আধুনিক যুক্তিবাদী বাঙ্গালীর নিকট

মূল্যহীন হইলেও গিরিশচন্দ্রের সমসাময়িক সাধারণ দর্শকের নিকট মূল্যহীন ছিল না। সেইজন্য ইহারা সেইযুগে ব্যাপক লোকপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল।)

চৈতন্য-জীবনী অবলম্বন করিয়া গিরিশচন্দ্র দুইখানি পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা করেন—তাহাদের মধ্যে 'চৈতন্য-লীলা' শ্রীচৈতন্যের বাল্যজীবন হইতে সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প পর্যন্ত এবং 'নিমাই-সন্ন্যাস' তাঁহার সন্ন্যাস-জীবনের বৃত্তান্ত লইয়া রচিত। প্রথমোক্ত নাটকখানি বৃন্দাবন দাস রচিত চৈতন্যভাগবতের আদি ও মধ্য খণ্ড ও দ্বিতীয় নাটকখানি অন্ত্য খণ্ড অবলম্বন করিয়া রচিত।

'চৈতন্য-লীলা' নাটকখানিতে বৃন্দাবনদাসোক্ত ঐতিহাসিক চরিত্র ব্যতীতও ষড়রিপু, কলি, বিবেক-বৈরাগ্য প্রভৃতি নৈর্ব্যক্তিক (abstract) চরিত্রেরও সমাবেশ করা হইয়াছে। শেষোক্ত নাটকখানিতে কেবলমাত্র ঐতিহাসিক চরিত্রই আছে, অন্য কোন নৈর্ব্যক্তিক চরিত্রের উল্লেখ নাই। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে চৈতন্যকে যেমন প্রথম হইতেই কৃষ্ণের অবতার বলিয়াই ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, গিরিশচন্দ্রও তাহাই করিয়াছেন। বরং বৃন্দাবন দাস কচিৎ বিশ্বম্ভর মিশ্রের যে মানবিক পরিচয়টিও প্রকাশ করিয়াছেন, গিরিশচন্দ্র তাহাও একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া তাঁহাকে শিশুকাল হইতেই পূর্ণাঙ্গ অবতাররূপেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সমসাময়িক সমাজ হইতেই গিরিশচন্দ্র এই ভাবটি গ্রহণ করিয়াছিলেন; কারণ, বৃন্দাবন দাসের সময় চৈতন্যের আবির্ভাবকাল হইতে বেশি দূরবর্তী ছিল না বলিয়া পূর্ণাঙ্গ দেবতারূপে তাঁহার প্রতিষ্ঠা তখনও সমাজে সম্ভব ছিল না, অন্তত বৈষ্ণব সমাজের বাহিরে তখনও তাঁহার সেই প্রতিষ্ঠা হয় নাই। সেইজন্যই বৃন্দাবন দাসের বর্ণনায় কচিৎ তাঁহার মানবিক রূপটি প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের সময় চৈতন্যের দেবত্বে সাধারণ সমাজে আর কোন অবিশ্বাস কিংবা সংশয় ছিল না, সেইজন্য গিরিশচন্দ্র তাঁহাকে সেইভাবেই চিত্রিত করিয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে, কেবলমাত্র বৃন্দাবন দাসের উপর নির্ভর করিয়াই তিনি চৈতন্য-চরিত্র চিত্রিত করেন নাই, এই বিষয়ে চৈতন্য-সম্পর্কিত যুগ-প্রচলিত বিশ্বাস এমন কি গিরিশচন্দ্রের নিজস্ব আধ্যাত্মিক বোধও কতকটা যুক্ত হইয়াছিল। তবে যুগ-চৈতন্য অবলম্বন করিয়াই গিরিশচন্দ্রের আধ্যাত্মিক বোধ গড়িয়া উঠিয়াছিল; অতএব তাহা স্বতন্ত্র কিছু ছিল।

চৈতন্যের জীবনীতে নাটকীয় উপাদানের অভাব নাই; এমন কি, চৈতন্য-

ভাগবতের মধ্যখণ্ড পর্যন্তও তাহার যে উপাদান রহিয়াছে, তাহা দ্বারা একাধিক পূর্ণাঙ্গ নাটক রচিত হইতে পারে। তথাপি গিরিশচন্দ্র সেই উপাদানের যথার্থ সদ্ব্যবহার করিয়াছেন, এমন কথা বলিতে পারা যায় না। তিনি যেমন অনেক উচ্চাঙ্গ নাটকীয় উপাদান ইহাতে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তেমনি আবার অনেক নগণ্য উপাদানকেও অতিরিক্ত প্রাধান্য দিয়াছেন। এমন কি, চৈতন্য-ভাগবতে চৈতন্য-চরিত্রের যে রসঘন রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাও এখানে তেমন সার্থকতার সঙ্গে প্রকাশ পায় নাই। নাট্যকার যদি চৈতন্য-চরিত্রের মানবিক ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইতেন, তাহা হইলে চৈতন্যচরিত্রের মধ্যেও যথার্থ নাট্যিক গুণ প্রকাশ পাইত। কিন্তু তাহা সমসাময়িক যুগের আধ্যাত্মিক আদর্শের বিরোধী ছিল, গিরিশচন্দ্রও তাহার পক্ষপাতী ছিলেন না, সেইজন্য এই পথে তিনি আর অগ্রসর হন নাই; অতএব দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই অতিথি ব্রাহ্মণ নিমাইকে এই বলিয়া স্তব করিতেছেন,

জয় জয় জনার্দন মুকুন্দ মুরারি।
জয় জয় শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী।

চৈতন্য-জীবনের ধারাবাহিকতাও এই নাটকে রক্ষা পায় নাই; কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে, নিত্যানন্দের সঙ্গে বিশ্বম্ভরের মিলনের পূর্বেই অতিথি ব্রাহ্মণ এই বলিয়া গান গাহিতেছেন—

জয় নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র জয় জয় ভবতারণ

চৈতন্যভাগবত বহির্ভূত বিশ্বম্ভরের উপনয়নের একটি দৃশ্য নাট্যকার ইহাতে সংযোগ করিয়াছেন।

চৈতন্যের চরিত্র ঐতিহাসিক হইলেও 'চৈতন্যলীলা' গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের আদর্শে রচিত, তিনি ইহাকে নিজেও 'ভক্তিমূলক নাটক' বলিয়াছেন। কেবল মাত্র শচীর চরিত্রটির পরিকল্পনায় বৃন্দাবন দাসের শচী-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য কতকটা রক্ষা পাইয়াছে। অন্যথায় সকল চরিত্রই তিনি নিজের মত করিয়া গড়িয়া লইয়াছেন। পরমহংসদেব স্বয়ং এই নাটকটির অভিনয় দর্শন করিতে আসিয়া গিরিশচন্দ্রকে সম্মানিত করিয়াছিলেন।

বৃন্দাবন দাস রচিত চৈতন্যভাগবতের অন্ত্য খণ্ড অবলম্বন করিয়া গিরিশচন্দ্র 'নিমাই সন্ন্যাস' নাটক রচনা করেন। ইহাতেও চৈতন্যভাগবতের অন্ত্য খণ্ডের

অনুযায়ী চৈতন্যের সন্ন্যাস-গ্রহণ হইতে নীলাচল গমন পর্যন্ত কাহিনীর বর্ণনা আছে। চৈতন্য-জীবনীর এই অংশেও প্রচুর নাটকীয় উপাদান রহিয়াছে, গিরিশচন্দ্র তাহার সদ্ব্যবহার করিতে এখানে বহুল পরিমাণে সার্থক হইয়াছেন। চৈতন্যের চরিত্রটি এখানে 'চৈতন্যলীলা' নাটক অপেক্ষা সার্থক হইয়াছে। তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদনার ভাবটি এখানে নাট্যকার দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত করিয়াছেন। নাটকের আদ্যোপান্ত চৈতন্যের এই কৃষ্ণপ্রেমানুভূতির একটি পবিত্র সুর অখণ্ড ও অব্যাহত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। চৈতন্যভাগবতের মধ্যে তত্ত্বকথা সামান্যই আছে, ইহা চৈতন্যের জীবন-চরিত হইলেও ইহার মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের দার্শনিক তত্ত্ব অপেক্ষা ভাবোন্মাদনার সুরই প্রবলতর হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র বৃন্দাবন দাসের এই মূল সুরটি ধরিতে পারিয়াছিলেন, সেইজন্যই তাঁহার রচনাতেও চৈতন্য-চরিত্রের সেই ভাবপ্রবণতার দিক্‌টিই ফুটিয়া উঠিয়াছে। গিরিশচন্দ্র যদি চৈতন্যভাগবত পরিত্যাগ করিয়া এই বিষয়ে চৈতন্য-চরিতামৃত অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে ইহার ব্যতিক্রম হইত। নাটকের প্রথমেই গিরিশচন্দ্র চৈতন্যভাগবতে উল্লিখিত 'অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর' গৌরাঙ্গ অবতারের এই মূল তত্ত্বটি রামানন্দের মুখ দিয়া অতি সহজ ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তারপর প্রকৃত নাট্যকাহিনীর সূত্রপাত হইয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি, নিমাই চরিত্রটিই এই নাটকের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য চরিত্র। কিন্তু এই চরিত্রটির সৃষ্টিতে নাট্যকার একান্তভাবে যে বৃন্দাবন দাসকে অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা অনুভব করিতে বেগ পাইতে হয় না। তবে কোন কোন স্থলে তিনি লোচনদাস হইতে এবং জনশ্রুতি হইতেও গৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়া সম্পর্কিত যে সকল কাহিনী আনিয়া ইহাতে সংযোগ করিয়াছেন, তাহা নাটকের মূল চৈতন্যচরিত্রের সঙ্গে সহজ সংযোগ স্থাপন করিতে পারে নাই। বিষ্ণুপ্রিয়া-সম্পর্কিত যে কাহিনীর ইহার মধ্যে উল্লেখ আছে, তাহা চৈতন্য-ভাগবত-বহির্ভূত। লোচনদাসের চৈতন্য-মঙ্গল হইতে এই সকল অংশ গিরিশচন্দ্র গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু বৃন্দাবন ও লোচনের আদর্শ ছিল পরস্পর-বিরোধী, অতএব এই দুই আদর্শের মধ্যে গিরিশচন্দ্র সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। 'নিমাই-সন্ন্যাসে'র ভাষা সুপরিচ্ছন্ন ও স্থানে স্থানে কবিত্বপূর্ণ। এই সম্পর্কে নিমাইর নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটির উল্লেখ করা যাইতে পারে—

হে শ্যামা যমুনা পুলিনে তোমার—
মুরলিমোহন বাজাত বাঁশী
আদরে হৃদয়ে ধরি যার ছবি
উথলিত তব লহর রাশি।
বিরহবিধুরা আসি ব্রজবালা
মনেরি বেদনা জানা'ত তোরে,
জানতো সজনি, ব'লে দেহ মোরে
কোথা গেলে পাব সে চিতচোরে। ৩।১

চৈতন্যভাগবত গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ, চৈতন্যের জীবনীর দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে 'নিমাই-সন্ন্যাসে'র কাহিনীও সেই প্রকারই অসম্পূর্ণ। ইহাতেও চৈতন্যভাগবতের মত চৈতন্যের নীলাচলবাস পর্যন্ত বর্ণনা আছে, তবে গিরিশচন্দ্র তাঁহার নাট্য-কাহিনীর সমাপ্তিতে বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে গৌরাঙ্গের ভাব-সম্মেলনের একটি চিত্র দিয়া কাহিনীটি মিলনাত্মক করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

এড্উইন্ আরনল্ডের সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজি কাব্য *Light of Asia*-র অনুকরণে গিরিশচন্দ্র তাঁহার অন্যতম চরিত-নাট্য 'বুদ্ধদেব-চরিত' রচনা করেন। নাটকখানি কবি আরনল্ডকেই উৎসর্গ করা হয়, উৎসর্গ-পত্রে নাট্যকার ইংরেজ কবির নিকট তাঁহার ঋণের কথা গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করিয়াছেন।

নাটকখানি ইংরেজ কবির কাব্য অবলম্বন করিয়া রচিত হইলেও, ইহার ভিতর দিয়া গিরিশচন্দ্র তাঁহার নিজস্ব আধ্যাত্মিক মনোভাব বিকাশ করিবারও সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন; বিশেষতঃ বুদ্ধদেবের অহিংসার আদর্শের সঙ্গে তদানীন্তন বাঙ্গালীর আধ্যাত্মিক মনোভাবের কতকটা সাদৃশ্য ছিল। তিনি তাঁহার নাটকের সূচনাতেই গোলোকধামের দৃশ্যের অবতারণা করিয়া বিষ্ণুর বুদ্ধরূপ গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। এই সূচনা অংশটি তাঁহার নিজস্ব যোজনা; বাঙ্গালীর তদানীন্তন আধ্যাত্মিক চৈতন্যের অনুগামী করিয়া ইহার পরিকল্পনা দ্বারা গোড়া হইতেই তিনি নাটকাখ্যানটিকে একটি বাঙ্গালী-রূপ দিয়া লইয়াছেন। পূর্বেই বলিয়াছি, ইহা গিরিশচন্দ্রের জীবনী-নাট্য-রচনার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু অন্যান্য জীবনী-নাট্যের মূল কাহিনীর তাঁহাকেই পরিকল্পনা করিতে হইত বলিয়া এই বিষয়ে তাঁহার যে সুবিধাটুকু ছিল, এই নাটক রচনায় তাহা ছিল না; তথাপি এই বিষয়ে তিনি

যে সাফল্যলাভ করিয়াছেন তাহা উপেক্ষণীয় নহে। গিরিশচন্দ্রের রচনা-গুণে ইংরেজ কবির রচনার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত এই নাটকখানিও সকল প্রকার বিজাতীয় রূপ পরিহার করিয়া বাঙ্গালীর রুচি ও ভাবের অনুগামী হইয়াছে। বিষ্ণুর অবতাররূপে বুদ্ধদেবকে প্রতিষ্ঠিত করিবার ফলে তাঁহার আনুপূর্বিক চরিত্র বাঙ্গালীর তদানীন্তন আধ্যাত্মিক ভাবের অনুগামী করিয়া চিত্রিত করিতেও তাঁহার কোন প্রকার বেগ পাইতে হয় নাই।

চরিত্রের আনুপূর্বিক ক্রমবিকাশ না দেখাইয়া প্রথম হইতেই তাহা অবতাররূপে পরিকল্পনা করিবার ফলে গিরিশচন্দ্রের নাট্যবর্ণিত মহাপুরুষ-চরিত্র-সমূহের যে নাট্যিক ঔৎসুক্য বিনষ্ট হইত, তাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই নাটকেও তাহার কোন ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় না। সূতিকা-গৃহেই নবজাত রাজপুত্র,—

> অকস্মাৎ নব শিশু: করি গাত্রোত্থান
> সপ্তপদ হল অগ্রসর,
> কহিল গম্ভীর স্বরে,—
> "হের দেব নাগ নরে,
> আমি বুদ্ধ প্রণম্য সবার।" ১।১

বলা বাহুল্য, ইহা গিরিশচন্দ্রের নিজস্ব যোজনা, আরনল্ডের ইংরেজি কাব্যে তাহা নাই। নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কেই ইহা পাঠ করিবার পর বুদ্ধদেবের চরিত্র সম্পর্কে পাঠকের মনে আর কোন নাট্যিক ঔৎসুক্য অবশিষ্ট থাকে না। অতএব ইহার পরবর্তী বর্ণনা জুড়িয়া যাহা পাঠ করি, তাহাও দৃশ্যত নাটকাকারে রচিত হইলেও প্রকৃত নাটক নহে, কাব্যেরই বর্ণনা। অতএব একটি কাব্য এখানে নাটকাকারে পরিবর্তিত করিয়া অনুবাদ করা হইলেও ইহার মধ্যে নাটকের লক্ষণ অপেক্ষা কাব্যের লক্ষণ অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। বুদ্ধদেবের জীবন অবলম্বন করিয়া স্বাধীন নাটক রচনা করিবার প্রচুর অবকাশ ছিল। সংস্কৃত কিংবা কোন প্রাদেশিক ভাষায় এই সুযোগের সার্থক সদ্ব্যবহার যে কেন করা হয় নাই, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। গিরিশচন্দ্রও এই ক্ষেত্রে ইংরেজি কাব্যের অবলম্বনে বাংলা নাটক রচনার প্রয়াস না পাইয়া স্বাধীন ভাবেই কেন যে এই বিষয়ে নাটক রচনা করেন নাই, তাহাও বোধগম্য নহে। তবে একথা সত্য যে, গিরিশচন্দ্রকে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে রচনা কার্য সম্পন্ন করিতে হইত, সেইজন্য সম্মুখে কোন

অবলম্বন পাইলে অগ্রে তাহার সদ্ব্যবহার করিতেন। এই ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

আরনল্ডের কাব্যরস গিরিশচন্দ্র তাঁহার রচিত নাটকের ভিতর দিয়া বিন্দুমাত্রও বাঙ্গালী পাঠককে পরিবেশন করিতে পারেন নাই। গিরিশচন্দ্র যাহা দিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজস্ব দান; ইংরেজ কবির সব কিছু তিনি নিজের মতে ঢালিয়া সাজিয়া নিজের পাত্রে পরিবেশন করিয়াছেন। অতএব আরনল্ডের কাছে ঋণের কথা যদি তিনি নিজে উৎসর্গ-পত্রে উল্লেখ না করিতেন তাহা হইলে ইহা তাঁহার নিজের রচনা বলিয়া ভুল হইতে পারিত।

'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' গিরিশচন্দ্রের অন্যতম জনপ্রিয় নাটক। নাট্যকার ইহাকে 'প্রেম ও বৈরাগ্যমূলক নাটক' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভক্তমাল গ্রন্থের অন্তর্গত বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের কাহিনীকে গিরিশচন্দ্র এখানে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে নাট্যরূপ দিয়াছেন, ইহার সঙ্গে তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রেম ও ভক্তির আদর্শ আনিয়া যুক্ত করিবার ফলে ইহা অতি সহজেই বাঙ্গালীর আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের জীবনে প্রকৃত নাট্যিক উপাদানের অভাব ছিল না, কিন্তু নাট্যকার বিশেষ আদর্শ-প্রণোদিত হইয়া এই নাটকখানি রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া সেই সকল উপাদান কোন উচ্চাঙ্গ নাট্য-রচনায় নিয়োজিত না করিয়া আদর্শ-সেবাতেই নিয়োজিত করিয়াছেন। কিন্তু কাহিনীর যে অংশে এই আদর্শের প্রভাব স্পর্শ করে নাই, সেই অংশে এই উপাদানগুলি যথার্থ নাট্যরূপ লাভ করিয়াছে বলিয়া অনুভূত হইবে। এই সম্পর্কে 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' নাটকের প্রথম অঙ্কটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে গিরিশচন্দ্রের বিল্বমঙ্গল ঠাকুর ও চিন্তামণি যথার্থ রক্তমাংসের নরনারী বলিয়াই অনুভূত হয়।

কিন্তু আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, রক্তমাংসের চরিত্র সৃষ্টি বাংলা নাটকের একটি খুব বড় কথা নহে, ইহার বিল্বমঙ্গল ও চিন্তামণির চরিত্রের পরবর্তী অঙ্কের আচরণসমূহ আদর্শমুখী করিবার ফলে ইহাদের আকর্ষণীয় গুণ কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। কারণ, উন্মূলিতচক্ষু কৃষ্ণান্বেষী বিল্বমঙ্গল ঠাকুরকে এখানে গিরিশচন্দ্র কৃষ্ণদর্শনকাতর সদ্যোগৃহীতসন্ন্যাস চৈতন্য-চরিত্রের আদর্শে চিত্রিত করিয়াছেন। বিল্বমঙ্গল যেখানে কৃষ্ণের জন্য এই বলিয়া হাহাকার করিতেছেন,

কই কৃষ্ণ ?
কই শুনি বাঁশরী নিনাদ ?

কই কালাচাঁদ ?
সাধে বাদ কে সাধ এখন ?
সে কি এতই নির্দয় ?
হক্‌, সয় স'ক, প্রাণে স'ক। (৪।৪)

এখানে চৈতন্যভাগবতের চৈতন্য-চরিত্রের কণ্ঠস্বরই যেন শুনিতে পাই। প্রকৃতপক্ষে বিল্বমঙ্গল ও চৈতন্যভাগবতের গয়া-প্রত্যাগত কিংবা সদ্যোগৃহীত-সন্ন্যাস চৈতন্য-চরিত্রে কোন পার্থক্য নাই—চৈতন্যের আদর্শেই গিরিশচন্দ্র এখানে বিল্বমঙ্গল-চরিত্র পরিকল্পনা করিয়াছেন। চৈতন্যের সাধনার মূল আদর্শটি এখানে অবলম্বন করিবার ফলেই বিল্বমঙ্গলের চরিত্রের শেষাংশ বাঙ্গালী পাঠকের এত আপনার মনে হয়।

পরিবর্তিত চিন্তামণির চরিত্রের মধ্য দিয়াও গৌড়ীয় বৈষ্ণবকবি-পরিকল্পিত কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদিনী রূপ প্রকাশ পাইয়াছে। যে রূপের সঙ্গে বাঙ্গালী ভাবুক চিরকাল পরিচিত, গিরিশচন্দ্র সেই রূপই যে এখানে আঁকিয়াছেন। বিল্বমঙ্গল চিন্তামণিকে নিজের প্রেমশিক্ষাদাত্রী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—ইহাই রাধার স্বরূপ, তিনিই ত কৃষ্ণের প্রেমের গুরু।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের একটি মূল আদর্শও চিন্তামণির চরিত্রের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে—তাহা ইহার পতিতোদ্ধারের আদর্শ। জগাই-মাধাইর মত পাষণ্ড যে মন্ত্রে উদ্ধার পাইতে পারে, চিন্তামণির মত পতিতাও সেই মন্ত্রেই উদ্ধার পাইল। সমাজের চরম পতিতেরও যে উদ্ধারের উপায় আছে, পুণ্যের স্পর্শে তাহারও সকল মালিমা যে একদিন ঘুচিয়া যাইতে পারে—এই আশাবাদের উপরই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রতিষ্ঠিত। গিরিশচন্দ্র চিন্তামণির ভিতর দিয়া সেই আদর্শেরই রূপ দিয়াছেন।

নাটকের শেষাংশে যে রাখালের চরিত্রটি আছে তাহাকেও চিনিয়া লইতে বিলম্ব হয় না, বাঙ্গালী ভাবুকের ইহা ধ্যানের স্বপ্ন—কখনও তিনি প্রেমিক, কখনও রাজা, বাঙ্গালীর ভাবসাধনার কল্পবিগ্রহ; ভক্ত গিরিশচন্দ্র চরিত্রটির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া আদ্যোপান্ত রূপদান করিয়াছেন।

অতএব দেখা যাইতেছে, আদর্শমুখীন হইলেও যে আদর্শ বাঙ্গালীর আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা প্রায় পাঁচশত বৎসর ধরিয়া নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, প্রধানত সেই আদর্শেরই সার্থক বাহন বলিয়া গিরিশচন্দ্রের 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' নাটকখানি বাঙ্গালীর চিত্ত অধিকার করিয়াছিল।

চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, ভক্তিরত্নাকর, ভক্তমাল এই সকল প্রামাণিক ও অর্ধপ্রামাণিক বৈষ্ণব চরিতাখ্যানসমূহ অবলম্বন করিয়া গিরিশচন্দ্র আর একখানি 'প্রেম ও বৈরাগ্যমূলক' নাটক রচনা করেন, তাহার নাম 'রূপ-সনাতন'। তবে এই শ্রেণীর অন্যান্য নাটকের মত চৈতন্যভাগবতই ইহারও সর্বপ্রধান অবলম্বন। যদিও নাট্যোল্লিখিত আখ্যানের মধ্যে সনাতনের কাহিনীই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তথাপি ইহাতে বুদ্ধিমন্ত খান, জীবন চক্রবর্তী, ইহাদের কাহিনীও কতক অংশ অধিকার করিয়াছে। রূপ গোস্বামীর কাহিনী ইহাতে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত—এমন কি, এই দিক দিয়া বিচার করিলে নাটকখানির নাম 'রূপ-সনাতন' না রাখিয়া কেবল 'সনাতন' রাখাই সঙ্গত ছিল বলিয়া মনে হইবে। রূপের সংসার-ত্যাগের পর কেবলমাত্র সনাতনের সংসার-ত্যাগের বৃত্তান্ত লইয়াই প্রধানত ইহা রচিত, প্রসঙ্গত বুদ্ধিমন্ত খাঁর কথাও ইহার মধ্যে আসিয়াছে। রূপ কিংবা সনাতনের বৃন্দাবন-জীবনের বিপুল জ্ঞান-সাধনার কথা এখানে আদৌ বর্ণিত হয় নাই, তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের কোন আভাসই এই নাটকের মধ্যে নাই, কেবলমাত্র সনাতনের ভক্তিরসোদয়ের কথাই ইহাতে আছে, এই হিসাবে নাটকখানিতে গোস্বামী ভ্রাতৃদ্বয়ের জীবনের একটি মূল্যবান্ অংশের সহিত পরিচিত না হইতে পারিলেও ইহাতে তাঁহাদের জীবনের ভাবপ্রবণতার দিকটি বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ইহা সহজে সাধারণ দর্শকের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। মীরাবাঈর সঙ্গে সনাতন গোস্বামীর সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে যে জনপ্রবাদ লৌকিক সাহিত্যে প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে উৎকৃষ্ট নাট্যিক উপাদান ছিল—কিন্তু গিরিশচন্দ্র সেই কাহিনী তাঁহার এই নাটকের মধ্যে গ্রহণ করেন নাই। জীবন চক্রবর্তীর স্পর্শমণি লাভের কাহিনীটি মাত্র ভক্তমাল গ্রন্থের উপর ভিত্তি করিয়া ইহাতে গ্রহণ করা হইয়াছে। হুসেন শাহর পুত্র নাসির শাহর নামে বিদ্যাপতি কয়েকটি বৈষ্ণব পদাবলীর পদ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের উপরই ভিত্তি করিয়া হয়ত গিরিশচন্দ্র নাসির শাহকেও একজন চৈতন্য-ভক্তে পরিণত করিয়াছেন। ভক্তি-রস সৃষ্টির দিক দিয়া নাটকখানির রচনা সার্থক বলিতে পারা যায়—তবে ইহার কোন ঐতিহাসিক দাবী নাই।

একটি প্রসিদ্ধ পাঞ্জাবী উপকথা অবলম্বন করিয়া 'পূর্ণচন্দ্র' নামে গিরিশচন্দ্র একখানি পঞ্চাঙ্ক নাটক রচনা করেন, ইহাকে নাট্যকার 'ভগবদ্বিশ্বাসমূলক নাটক' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পাঞ্জাবের অন্তর্গত শিয়ালকোটের রাজা

শালিবাহন তাঁহার কনিষ্ঠা রাণী চর্মকার-কন্যা লুনা কর্তৃক প্রচারিত মিথ্যা অপবাদের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র পূর্ণচন্দ্রকে কূপে নিক্ষেপ করেন, তারপর পূর্ণচন্দ্র গুরু গোরক্ষনাথের কৃপায় সেখান হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া চরিত্রবল দ্বারা যোগ-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া মাতাপিতার সহিত পুনর্মিলিত হইয়াছিলেন, নাটকখানির ইহাই কাহিনী।

ভগবদ্‌বিশ্বাসমূলক নাটকগুলির মধ্যে কৃষ্ণভক্তি-বিষয়ক নাটক রচনায় গিরিশচন্দ্রের স্বাভাবিক প্রতিভার যেমন বিকাশ হইয়া থাকে, ইহার মধ্যে তাহা তেমন হয় নাই; ইহার কারণ, ইহার পরিবেশটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এমন কি, কোন কোন পৌরাণিক বিষয়বস্তু যেমন তিনি অতি সহজেই বাঙ্গালী রূপ দিয়া লইয়াছেন, ইহার মধ্যে তাহাও করিতে পারেন নাই। সেইজন্য ইহার ভাব, ভাষা ও চরিত্র সবই যেন আড়ষ্ট হইয়া আছে। ভগবদ্‌বিশ্বাসের ভাবটিও ইহার ভিতর দিয়া যে খুব সার্থক ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাও বলিতে পারা যায় না। পরিবেশটি এখানে নাট্যকার আপন করিয়া লইতে পারেন নাই বলিয়াই ইহাতে কোন দিক দিয়া তাঁহার সার্থকতার পরিচয় প্রকাশ পায় নাই।

বিবাহের সময় হইতেই স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা যুবতী করমেতি বাঈ কি ভাবে শ্যামপ্রেমোন্মাদিনী হইয়া অবশেষে বৃন্দাবন ধামে গিয়া রাধাকৃষ্ণের দর্শন লাভ করিয়াছিল, গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'করমেতি বাঈ' নামক নাটকে তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। নাটকখানিকে গিরিশচন্দ্র 'ভক্তি ও জ্ঞানমূলক' নাটক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে ভক্তির কথাই আছে, জ্ঞানের কথা নাই—তখনও গিরিশচন্দ্রের মধ্যে জ্ঞানবাদের বিকাশ হয় নাই, ইহাও তাঁহার রচিত সুনির্মল ভক্তিরসাশ্রিত নাটকগুলিরই অন্যতম। মীরাবাঈর মতই করমেতি বাঈ শ্যামপ্রেমোন্মাদিনী, বৃন্দাবনে গিয়া রাধাকৃষ্ণের সাধনায় সিদ্ধিলাভের ভিতর দিয়াই তাঁহার এই দিব্য উন্মাদনার সমাপ্তি; কৃষ্ণপ্রেম-সাধনার দিক দিয়া ইহার সঙ্গে বিল্বমঙ্গল-চিন্তামণির সাধনার সম্পর্ক রহিয়াছে।

করমেতি বাঈর স্বামী আলোকের চরিত্রটি এই নাটকের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যে পত্নীকে সে প্রথম হইতেই পরিত্যাগ করিয়াছিল, পরে তাহাকেই পাইবার লালসা হইতে তাহার মধ্যে ক্রমে শ্যামপ্রেমের উন্মেষ হয়—এই প্রেমের বশবর্তী হইয়াই সে পরিণামে সর্বসংস্কারমুক্ত হইয়া যায়। সাত্ত্বিক কৃষ্ণপ্রেমের বিকাশের ভিতর দিয়া সে জীবনের সকল বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে। এই ভাবটি তাহার ভিতর দিয়া নাট্যকার পরম কৌশলে

বিকাশ করিয়াছেন। গিরিশচন্দ্রের অন্যান্য ভক্তিরসাশ্রিত নাটকের মত ইহাও আদর্শমূলক রচনা—এই আদর্শ-প্রতিষ্ঠা ইহার মধ্যে সার্থক হইয়াছে বলিয়াই অনুভূত হইবে।

করমেতি বাঈর পবিত্র জীবনের সুনির্মল সাধনার সঙ্গে নাট্যিক বৈপরীত্য-সৃষ্টিকারী আগমবাগীশের তান্ত্রিক সাধনার যে একটি অতি আবিল বর্ণনা ইহাতে আছে, তাহা রসোত্তীর্ণ হইয়াছে বলিয়া বোধ হইবে না—ভক্তিরসের প্রেরণা গিরিশচন্দ্রের নিজস্ব অন্তর হইতে জাত বলিয়া ইহা যত কার্যকরী বলিয়া বোধ হয়, তান্ত্রিক সাধনার কথা পুঁথি-পাঠ্য বিষয় হইতে সংগৃহীত বলিয়া তাহা তত শক্তিশালী বলিয়া বোধ হইবার কথাও নহে; তথাপি অনেক সময় তান্ত্রিক ও তাহার অনুচরদিগের সংলাপ ও আচরণ একঘেয়ে ও বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। পরশুরামের দাসী অম্বিকার আচরণ অনেক সময় পীড়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছে।

গিরিশচন্দ্রের চরিত-নাটকগুলির মধ্যে 'শঙ্করাচার্য'ই সর্বাধিক অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ—ইহার কারণ, শঙ্করাচার্যের জীবনীর নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক ভিত্তি প্রায় নাই বলিলেই চলে,—এইজন্য বাধ্য হইয়াই নাট্যকারকে তাঁহার সম্পর্কিত প্রচলিত জনশ্রুতির উপরই নির্ভর করিতে হইয়াছে। মহাপুরুষ সম্পর্কিত অনৈতিহাসিক জনশ্রুতি সহজেই অলৌকিকতার পর্যায়ে গিয়া পড়ে, শঙ্করাচার্য সম্পর্কেও ইহার কোন ব্যতিক্রম হয় নাই; সেইজন্য তাঁহার জীবন অবলম্বন করিয়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন জনশ্রুতির উদ্ভব হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র তাঁহার এই নাটকের মধ্যে সেই সকল জনশ্রুতি নাট্যাকারে রূপদান করিয়া লইয়াছেন। তাহাতে নাটকখানি পাঁচটি অঙ্কে সীমাবদ্ধ থাকিয়াও অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল নিয়মে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিনয় শেষ করিবার জন্য ইহার কোন কোন অংশ অভিনয়কালে পরিত্যাগ করিবার জন্য চিহ্নিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

এই নাটকখানি গিরিশচন্দ্রের উপর পরমহংসদেবের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল। নাট্যকার তাঁহার রচনাখানি স্বর্গত কালীপদ ঘোষকে উৎসর্গ করিতে গিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, "আমরা উভয়ে একত্রে বহুবার শ্রীদক্ষিণেশ্বরে মূর্তিমান বেদান্ত দর্শন করেছি। তুমি এখন আনন্দধামে, কিন্তু আমার আক্ষেপ—তুমি নরদেহে আমার 'শঙ্করাচার্য' দেখলে না।" ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, দক্ষিণেশ্বরের 'মূর্তিমান্ বেদান্ত' তাঁহার উপর কি প্রভাব বিস্তার

করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে গিরিশচন্দ্রের আধ্যাত্মিক বোধের একটি নূতন পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিপূর্বে ভক্তিমূলক নাটকগুলির রচনার মধ্য দিয়া তাঁহার যে ভাবপ্রবণতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল, ইহার মধ্যে তাহার লেশমাত্রও নাই—জ্ঞানবাদের উপর অদ্বৈততত্ত্ব প্রতিষ্ঠাই ইহার উদ্দেশ্য। তত্ত্বপ্রচারের সহায়ক হইলেও নাটক হিসাবে ইহার মূল্য খুব উচ্চাঙ্গের বলিয়া বোধ হইবে না। কেবলমাত্র দার্শনিক তত্ত্বপ্রচার ও অলৌকিকতাই যে ইহার ত্রুটি তাহা নহে, ইহার বহু দৃশ্য রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হওয়াও ব্যবহারতঃ অসম্ভব।

নীলাচলে চৈতন্যদেবের নিকট হইতে প্রত্যাবর্তনের পর নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর জীবনের অবশিষ্ট অংশ বর্ণনা করিয়া গিরিশচন্দ্র একখানি ক্ষুদ্র 'প্রেম ও ভক্তিমূলক' নাটক রচনা করেন—ইহার নাম 'নিত্যানন্দ-বিলাস'। নাটকখানি কোথাও অভিনীত হইয়াছিল বলিয়া জানিতে পারা যায় নাই। চৈতন্যভাগবত কিংবা চৈতন্যচরিতামৃত এই নাটকখানির ভিত্তি নহে, নিত্যানন্দ-সম্পর্কিত প্রচলিত অন্যান্য জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়া ইহা রচিত। ইহাতে যমপুরীর যম ও গৌরাঙ্গের একটি কথোপকথন এবং জাহ্নবী দেবীর শবদেহ যে কি ভাবে নিত্যানন্দের আগমনে পুনর্জীবিত হইয়াছিল তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। প্রেম ও ভক্তির তরঙ্গে ইহার ঐতিহাসিক তথ্য বহুদূর ভাসিয়া গিয়াছে।

রোমাণ্টিক নাটক

দীনবন্ধু মিত্র বাঙ্গালী জীবনের প্রত্যক্ষ ও বাস্তব ভিত্তির উপর বাংলা নাটক রচনা করিয়া যশোলাভ করিলেও আগাগোড়া কল্পনামূলক বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়াও যে নাটক রচনা করিয়াছিলেন তাহার কথা যথাস্থানে পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। গিরিশচন্দ্র দীনবন্ধু মিত্রের এই ধারাটি অনুসরণ করিয়া নিজেও কয়েকখানি পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা করিয়াছিলেন—তাহাই রোমাণ্টিক নাটক বলিয়া উল্লেখ করা যাইতেছে। গিরিশচন্দ্রের রোমাণ্টিক নাটকের দুইটি প্রধান বিভাগ—প্রথমত নাটক ও দ্বিতীয়ত গীতিনাট্য। রোমাণ্টিক নাটকগুলির রচনার মধ্যে গিরিশচন্দ্রের উপর দীনবন্ধু মিত্রের সুস্পষ্ট প্রভাব অনুভূত হইলেও তাঁহার এই শ্রেণীর গীতিনাট্যগুলির রচনায় তরুণ রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক গীতিনাট্যগুলির প্রভাব অনুভূত হয়—মনে হয়, গিরিশচন্দ্র তাঁহার রোমাণ্টিক গীতিনাট্যগুলির রচনায় রবীন্দ্রনাথের ভাব ও ভাষা দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের অধিকাংশ রোমাণ্টিক গীতিনাট্যের বিষয়বস্তু

প্রেম—ইহাদের মধ্যে বিভিন্ন দিক হইতে প্রেমের মূল্য ও সার্থকতা বিচার করা হইয়াছে। তবে ভারতীয় ও পারস্য দেশীয় উপকথা অবলম্বন করিয়া তিনি যে দুই একখানি গীতিনাট্য রচনা করিয়াছেন, তাহাদের বিষয়বস্তু একটু স্বতন্ত্র। কারণ, সেই সকল বিষয়বস্তু গিরিশচন্দ্র নিজের আদর্শে পুনর্গঠন করিয়া না লইয়া তাহাদের নিজেদের আদর্শের মধ্যেই তাহাদিগকে রূপদান করিয়াছেন। প্রেম-বিষয়ক গীতিনাট্যগুলি আয়তনে যেমন ক্ষুদ্র, ভাবের দিক দিয়াও তেমনই সংযত—কল্পজগতের নায়ক-নায়িকার পবিত্র প্রণয়ের শুচিশুভ্র চিত্র ইহাদের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে—হৃদয়ের ভাবাবেগ অসংযত করিয়া দিয়া নাট্যকার কোথাও চরিত্রগুলিকে উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তুলেন নাই। শুচিতা ও সংযম ইহাদের প্রধান গুণ— সঙ্গীতে ও সংলাপে এই ভাবটি নাট্যকার পরম কৌশলে ইহাদের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

ভারতীয় ও পারস্য দেশীয় উপকথা হইতে বিষয়বস্তু সংগ্রহ করিয়া গিরিশচন্দ্র যে কয়খানি এই শ্রেণীর গীতিনাট্য রচনা করিয়াছেন তাহা রঙ্গ-প্রধান, প্রেম-প্রধান নহে। প্রেম-বিষয়ক গীতিনাট্যগুলির মধ্যে রঙ্গের ভাব নাই, ইহারা গুরু-বিষয়ক (serious); কিন্তু বিভিন্ন দেশীয় উপকথা হইতে বিষয়বস্তু সংগ্রহ করিয়া গিরিশচন্দ্র যে গীতিনাট্যগুলি রচনা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে প্রেমের কথা থাকিলেও তাহা গুরুত্ব লাভ করে নাই, রঙ্গের (humour) দিকটাই তাহাতে গুরুত্ব লাভ করিয়াছে।

রোমান্টিক নাটকগুলির মধ্যে গিরিশচন্দ্র কল্পনার কোন সংযম রক্ষা করিতে পারেন নাই—ইহাদের ঘটনাস্রোত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ্যহীন হইয়া পঞ্চমাঙ্ক পর্যন্ত উদ্দাম গতিতে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। ঘটনা-বাহুল্যের দিক দিয়া ইহারা গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকগুলির সমগোত্রীয়। কোন লক্ষ্য এবং বিশেষ কোন নির্দিষ্ট আদর্শ সকল সময় সম্মুখে ছিল না বলিয়াই ইহাদের ঘটনা এবং চরিত্র পরিকল্পনায় নাট্যকার কোন বাঁধাধরা পথে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। এই রোমান্টিক নাটকগুলির বিষয়বস্তু সম্বন্ধেও কোন স্থিরতা ছিল না। ভগবদ্ভক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া মানবিক প্রেম পর্যন্ত ইহাদের বিষয়ীভূত হইয়াছে। ঘটনার দিক দিয়া বাস্তব জগতের সম্পর্ক ইহাদিগের মধ্যে অত্যন্ত অল্প বলিয়াই সর্বত্র অনুভূত হইবে—অনেক সময় ঘটনার অসম্ভাব্যতাও পীড়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছে। যে কথাই হউক, নাটকীয় ঘটনা যথার্থ সংযমের ভিতর দিয়া প্রকাশিত না হইলে তাহা যে কার্যকরী হইতে

পারে না, গিরিশচন্দ্রের রোমান্টিক নাটকগুলিই তাহার প্রমাণ। কিন্তু তাঁহার রোমান্টিক গীতিনাট্যগুলির মধ্যে কতকটা সংযমের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া তাহা এত নিরর্থক বলিয়া বোধ হইবে না।

পরমহংসদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্কের ফলে তাঁহার আধ্যাত্মিক আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া গিরিশচন্দ্র যে কয়খানি নাটক রচনা করেন, 'নসীরাম' তাহাদের অন্যতম। 'নসীরাম' পূর্ণাঙ্গ পঞ্চাঙ্ক নাটক, নাট্যকার ইহাকে 'ভগবদ্বাক্যমূলক নাটক' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার কাহিনীর সঙ্গে বাস্তব জগতের সম্পর্ক নাই বলিলেই চলে, সেইজন্য ইহাকে রোমান্টিক নাটকের অন্তর্ভুক্ত করিয়া আলোচনা করা যাইতেছে। ইহার নসীরামের চরিত্রটি পরমহংসদেবের চরিত্রের ছায়া, নসীরামের কথা ও আচরণের মধ্য দিয়া রামকৃষ্ণের জীবনেরই পরিচয় মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। এতদ্ব্যতীত অন্য নাটকের বিদূষক চরিত্রেরও পূর্বাভাস ইহার ভিতরে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাহিনীটি সংক্ষেপে উল্লেখ করিলেই নাটকের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। মগধের বন্দিনী বালা বিরজাকে দেখিয়া গৌড়ের রাজকুমার অনাথনাথ তাঁহার প্রণয়-পাশে আবদ্ধ হইয়াছেন, বিরজাও তাঁহাকে গোপনে পতিরূপে বরণ করিলেন। গৌড়েশ্বর যোগেশনাথ বিরজার রূপলাবণ্য দেখিয়া তাঁহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। রাজগুরু কাপালিকও তাঁহাকে ভৈরবীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে চাহিলেন। রাজকুমার পিতার অভিলাষের কথা জানিতে পারিয়া ভগ্নহৃদয়ে অরণ্যে গিয়া হরিনাম করিতে লাগিলেন। পাপ-বাসনা চরিতার্থ করিতে গিয়া কাপালিক মৃত্যুমুখে পতিত হইল, রাজাও নিজের ভুল বুঝিয়া শেষে নসীরামের উপদেশে হরিনাম করিতে করিতে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া বনে চলিয়া গেলেন। বিরজাও হরিনামে দীক্ষা লইয়া অরণ্যে পিতার সন্ধানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে বনমধ্যে তাঁহাদের সকলের মিলন হইল—তাঁহারা তখন সকলেই হরিনামে মত্ত—সংসার-বাসনা আর কাহারও নাই। তাঁহার কার্য শেষ হইয়াছে দেখিয়া ইঁহাদের চোখের সম্মুখে নসীরাম জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

এই কাহিনী হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, অহৈতুকী হরিভক্তি প্রচারই ইহার উদ্দেশ্য—ইহার কোন নাট্যিক দাবী নাই।

রোমান্টিক নাটকের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের 'বিবাদ' নামক বিয়োগান্তক নাটক-

খানির মধ্যে কল্পনার যত উদ্দাম নৃত্য দেখিতে পাওয়া যায়, আর কোন নাটকের মধ্যে তাহা পাওয়া যায় না। কাহিনীর অসঙ্গতি ও অস্বাভাবিকতা মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত পীড়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছে, চরিত্রগুলির অসম্ভাব্যতাও ইহার শিল্পগুণ বহুলাংশে খর্ব করিয়াছে। নাটকের কাহিনীটি সংক্ষেপে এই প্রকার— অযোধ্যার রাজা অলর্ক রাজবয়স্য মাধবের প্রভাবে রাণী সরস্বতীকে পরিত্যাগ করিয়া সর্বদা ভোগবিলাসে দিন কাটাইয়া চলিয়াছেন। মন্ত্রী আসিয়া সংবাদ দিল, শত্রু রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত আক্রমণ করিয়াছে, কিন্তু রাজার তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। রাণী স্বামীকে পাইবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়া অবশেষে বিষাদ নাম গ্রহণ করিয়া বালকবেশে রাজার রক্ষিতা গণিকা উজ্জ্বলার সেবাকার্য গ্রহণ করিল। উজ্জ্বলা রাজাকে বশীভূত করিয়া নিজেই রাজসিংহাসন অধিকার করিল, তারপর রাজাকে গোপনে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে বন্দী করিয়া রাখিল। একদিন বিষাদ অচেতন রাজাকে দুই চোরের সহায়তায় মুক্ত করিয়া লইয়া অরণ্যে পলাইয়া গেল। কাশ্মীর-রাজ অযোধ্যার রাণীর ভ্রাতা ; তিনি দূতমুখে ভগ্নীর অপমানের কথা শুনিতে পাইয়া রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ভগ্নীকে সিংহাসনে উপবিষ্ট করাইবার জন্য সসৈন্যে অযোধ্যা আক্রমণ করিলেন। অরণ্যমধ্যে সন্ধান করিয়া তাঁহার সৈন্য অলর্ককে খুঁজিয়া বাহির করিয়া বন্দী করিতে গেল, বিষাদ বাধা দিতে গিয়া বিপক্ষ সৈন্যের অস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করিল। অলর্ক নিজের পত্নীকে চিনিতে পারিয়া গভীর অনুতাপে উন্মত্ত হইয়া গেলেন। মাধবকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করিয়া উজ্জ্বলা নিজেও আত্মঘাতিনী হইল, তাহার পাপকার্যের সহায়ক ছিল বলিয়া তাহার পরিচারিকা সোহাগীকেও এই সঙ্গে হত্যা করিল। মৃত্যুকালে মাধব বলিয়া গেল যে, অলর্ক তাহার সহোদর ভ্রাতা— তাহার আরও তিন ভ্রাতা আছে, তাহারা সকলেই সংসার-বিরাগী, অলর্ককেও সংসারত্যাগী করিবার উদ্দেশ্যে সে এই পথ অবলম্বন করিয়াছিল।

নাট্যকাহিনীকে বিষাদান্তক করিবার মুখ্য উদ্দেশ্যেই যেন নাট্যকার শেষ অঙ্কের মৃত্যুগুলি সংঘটিত করিয়াছেন, ইহা কাহিনীর স্বাভাবিক পরিণতি বলিয়া মনে হয় না, সুতরাং সহজেই ইহাতে পাঠকের মন পীড়িত হইয়া পড়ে। নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র সরস্বতীর মৃত্যুর আকস্মিকতা কাহিনীর সকল গৌরব বিনষ্ট করিয়াছে। সেক্সপীয়রের হ্যামলেট্‌ নাটকের অনুকরণে গিরিশচন্দ্রও এখানে রাজ-মাতা ও সরস্বতীর ছায়ামূর্তির অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে কাহিনীর কোন গৌরব বৃদ্ধি পায় নাই।

'মুকুল-মুঞ্জরা' পূর্ণাঙ্গ পঞ্চাঙ্ক মিলনাত্মক নাটক। বিভিন্ন দেশের দুই রাজপুত্র ও দুই রাজকুমারীর প্রেম ও তাহার শুভ পরিণতি নির্দেশ করাই এই নাটকের উদ্দেশ্য, তথাপি পাণ্ডিয়ানার রাজপুত্র মুকুল ও কেরোলীর রাজকুমারী মুঞ্জরার কাহিনীই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে বলিয়া নাটকখানির এই প্রকার নামকরণ করা হইয়াছে। কাহিনীর মধ্যে বৈচিত্র্য কিছুই নাই, বরং ইহার শেষ দিকটা অনাবশ্যক দীর্ঘায়িত হওয়ার ফলে ইহা বহুলাংশে একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছে। কাহিনীটি সংক্ষেপে এই—পাণ্ডিয়ানার জ্যেষ্ঠা রাণী তাঁহার এক কন্যা ও এক বোবা পুত্র সহ কনিষ্ঠা মহিষীর প্ররোচনায় রাজা কর্তৃক অরণ্যে নির্বাসিত হইলেন। সেখানে রাণী পুত্র-কন্যাদের সঙ্গচ্যুত হইলেন, পুত্র মুকুল ও কন্যা তারা এক সন্ন্যাসীর আশ্রয় লাভ করিল। সেই দেশের নাম কেরোলী; তথাকার রাজার এক পুত্র এবং এক কন্যা ছিল—নাম চন্দ্রধ্বজ ও মুঞ্জরা। তাহারা সন্ন্যাসীর আশ্রিত রাজপুত্র ও রাজকন্যাকে দেখিতে পাইল; চন্দ্রধ্বজ তারার ও মুঞ্জরা মুকুলের প্রণয়াসক্ত হইল। বহু বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া পরিণামে তাহাদের মিলন হইল।

দুঃখের ভিতর দিয়া পাওয়াই প্রকৃত পাওয়া—এই নাটকের মধ্য দিয়া ইহাই বলিবার উদ্দেশ্য। সন্ন্যাসী বলিতেছেন,—

> সহজে পাইলে রত্ন না হয় আদর,
> পরীক্ষা করিয়া লব প্রেমিক অন্তর।
> অনল উত্তাপে হয় উজ্জ্বল কাঞ্চন,
> পরীক্ষা করিয়া প্রেম বুঝিবে তেমন। (৩।৪)

প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনের পথে নানা সাময়িক বাধার সৃষ্টি করিয়া তাহাদের প্রেমের পরীক্ষা করা হইয়াছে—তাহারা সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মিলনকে মধুর করিয়া তুলিয়াছে।

কাহিনীর পরিবেশটি অতিমাত্রায় রোমান্টিক, ধূলিমাটির বহু ঊর্ধ্বে তাহা স্থাপিত হইয়াছে। প্রেমের যাদুস্পর্শে বোবা যে ভাষা লাভ করিতে পারে, তাহা কবির কল্পনার ফল হইতে পারে, কিন্তু নাটকের দাবী মিটাইতে পারে না—গিরিশচন্দ্র এখানে কাব্যের বিষয় নাটকের ভিত্তি করিয়াছেন।

পারস্যদেশীয় ইতিহাসের পটভূমিকায় পরিকল্পিত কাল্পনিক কাহিনীর উপর ভিত্তি করিয়া গিরিশচন্দ্র একখানি পূর্ণাঙ্গ মিলনাত্মক নাটক রচনা করেন—

তাহার নাম 'মনের মতন'। লঘু পরিবেশের মধ্য দিয়া নাট্যকাহিনীটির সূত্রপাত হইলেও কিছুদূর গিয়াই ইহার আবহাওয়া অকস্মাৎ অত্যন্ত গুরু-গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে; তারপর একেবারে শেষ দৃশ্যে অপ্রত্যাশিত মিলনের মধ্য দিয়া ইহা পুনরায় লঘু স্তরে নামিয়া আসিয়াছে। ইহার মধ্যে সন্দেহ, প্রেম, ঈর্ষা, বৈরাগ্য, আত্মদান প্রভৃতি বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে এবং ইহাদের মধ্য দিয়া কোন কোন স্থলে কাহিনীর উচ্চাঙ্গ নাট্যিক গুণও প্রকাশ পাইয়াছে। নাট্যকার ইহাতে পারস্যদেশীয় কথা সাহিত্যের চরিত্র ও পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য আদ্যোপান্ত অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে রক্ষা করিয়াছেন —তবে ইহাতে নাট্যকারের কল্পনাশক্তির পরিচয় পাওয়া গেলেও, প্রত্যক্ষ জগতের সঙ্গে ইহার কাহিনী সম্পর্কহীন বলিয়া নাটক হিসাবে ইহা তেমন কার্যকর হইতে পারে নাই। কাহিনীটি সংক্ষেপে এই,—কাউলফ ও দেলেরা পরস্পর গভীর প্রণয়াসক্ত হইয়াছে, কিন্তু টাহেরের সঙ্গে দেলেরার বিবাহ হইবার কথা। বাদশা মির্জান কাউলফের বন্ধু, সেই সূত্রে বেগম গোলেন্দানের সঙ্গেও তাহার পরিচয় আছে। মির্জান সন্দেহ করিল, গোলেন্দান কাউলফের প্রণয়াসক্ত। এই সন্দেহে মির্জান ফকির সাজিয়া বিবাগী হইয়া গেল। স্বামীর জন্য গোলেন্দানও ফকিরণী সাজিয়া মনোদুঃখে প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া গেল। কাউলফ একথা জানিয়া নিজেও পাগল হইয়া দেশত্যাগী হইল। এদিকে টাহেরের সঙ্গে দেলেরার বিবাহ হওয়া সত্ত্বেও ভুল করিয়া টাহের দেলেরাকে 'তালাক্' দিল। পরে ভুল বুঝিতে পারিল। এখন অন্য আর একজন তাহাকে বিবাহ করিয়া 'তালাক্' না দিলে সে পুনরায় দেলেরাকে বিবাহ করিতে পারে না। সেইজন্য একটা পাগলকে ধরিয়া আনিয়া তাহার সঙ্গে তাহার বিবাহ দিল—স্থির হইল পাগল কিছু টাকা লইয়া বিবাহের পরদিন তাহাকে 'তালাক্' দিয়া যাইবে। সেই পাগল কাউলফ। সে দেলেরাকে বিবাহ করিল—বাসর ঘরে তাহাদের পরিচয় হইল। তখন কেহ কাহাকেও ত্যাগ করিতে চাহিল না। শেষ পর্যন্ত তাহাদের প্রেম অক্ষুণ্ণ রহিল। মির্জান নিজের ভুল বুঝিতে পারিল, গোলেন্দানের সঙ্গে তাহারও পুনরায় মিলন হইল। কাহিনী-বিন্যাসে নাট্যকার এখানে কতকটা কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন; নাটকের মূল কাহিনীর সঙ্গে ইহার একটি শাখা-কাহিনী এমন সহজভাবে আনিয়া সংযুক্ত করিয়াছেন যে, তাহাতে নাট্যকাহিনীর পরিণতি অত্যন্ত সহজ হইয়াছে।

দুইটি সমবয়স্কা কুমারীর নাম-সম্পর্কিত সামান্য একটু গোলযোগের উপর

ভিত্তি করিয়া গিরিশচন্দ্র একখানি ঘটনা-বহুল পঞ্চাঙ্ক বিয়োগান্তক নাটক রচনা করিয়াছিলেন—তাহার নাম 'ভ্রান্তি'। যদিও কয়েকটি ঐতিহাসিক চরিত্রের নাম আনিয়া ইহার সহিত যুক্ত করা হইয়াছে, তথাপি কাহিনীটি আদ্যোপান্ত কল্পনামূলক—সেইজন্য ইহা গিরিশচন্দ্রের রোমান্টিক নাটকের অন্তর্গত বলিয়া বিচার করিতে হয়। নাট্যকার ইহাকে 'ভ্রান্তিমূলক বৈচিত্র্যপূর্ণ নাটক' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইহার অর্থ খুব স্পষ্ট নহে; সেইজন্য সাধারণভাবে ইহাকে রোমান্টিক নাটক বলিয়া নির্দেশ করাই সঙ্গত।

মাধুরী উদয়নারায়ণের গোপনে বিবাহিতা স্ত্রীর কন্যা ও ললিতা তাঁহার গৃহে প্রতিপালিতা বন্ধু-কন্যা। উদয়নারায়ণ ইহাদের বিবাহ দিবার উদ্দেশ্যে একদিন ফাগুয়া উৎসব উপলক্ষে দুই বিভিন্ন স্থানের দুই জমিদার-পুত্রকে তাঁহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন—তাহাদের নাম নিরঞ্জন ও পুরঞ্জন, ইহারা পরস্পর বন্ধু। নিরঞ্জন ললিতার ও পুরঞ্জন মাধুরীর প্রেমে পড়িল। কিন্তু ইহার মধ্যে একটু গোল বাধিল—নিরঞ্জন মনে করিল, সে যাহাকে ভালবাসিল, তাহার নাম মাধুরী। সে পিতাকে জানাইল, সে মাধুরীকে বিবাহ করিবে। সেই মতে পিতা উদয়নারায়ণের কন্যা মাধুরীর সঙ্গে তাহার বিবাহ স্থির করিলেন। তারপর বিবাহের মুহূর্ত যখন আসন্ন হইয়া আসিল, তখন সে বন্ধু পুরঞ্জনের হাবভাব দেখিয়া বুঝিল যে, মাধুরী পুরঞ্জনের আকাঙ্ক্ষিতা সুতরাং সে বন্ধুর পথে অন্তরায় না হইবার জন্য গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। সেই লগ্নে পুরঞ্জনের সঙ্গেই মাধুরীর বিবাহ হইল। ললিতা বিবাগিনী হইয়া গেল। নাটকের মূল কাহিনী প্রকৃতপক্ষে এখানেই শেষ হইয়াছে; কিন্তু এখান হইতে নাট্যকার কাহিনীটিকে নানা বিচিত্র ও অতি-নাট্যিক ঘটনা-প্রবাহের ভিতর দিয়া উদ্দেশ্যহীন ভাবে লইয়া অগ্রসর হইয়াছেন। ইহার পর মাধুরী পুরঞ্জন কর্তৃক 'বেশ্যা-কন্যা' বলিয়া আকস্মিক-ভাবে পরিত্যক্তা হইয়া সরফরাজ খাঁর লোলুপ দৃষ্টিতে পতিত হইল, উদয়-নারায়ণের হস্তে নিরঞ্জনের পিতা নিহত হইলেন, মিথ্যা হত্যাকারী বলিয়া নিরঞ্জন ধৃত হইল, তারপর বধ্যভূমি হইতে পুরঞ্জন কর্তৃক উদ্ধার প্রাপ্ত হইল। উদয়নারায়ণ মুর্শিদকুলি খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া নিরঞ্জনের হস্তে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, 'গোপনে বিবাহিতা পত্নী' অন্নদা তাঁহার সঙ্গে সহমরণে গেল, তাঁহার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে পুরঞ্জন ও মাধুরীর পুনর্মিলন ও নিরঞ্জন ও ললিতার মিলন হইল। শেষ মুহূর্তে নিরঞ্জন বুঝিল, সে যাহাকে

ভালবাসিয়াছিল, তাহার নাম মাধুরী নহে, ললিতা। যদিও শেষ পর্যন্ত ইহাতে মিলনের কথাই বলা হইয়াছে, তথাপি যে পরিবেশের ভিতর দিয়া এই মিলন সম্ভব হইয়াছে—তাহা চারিদিক দিয়া বিষাদপূর্ণ বলিয়া মিলনান্তক নাটক হিসাবে ইহা সার্থক হইতে পারে নাই, অর্থাৎ ইহা 'comedy of error' না হইয়া 'tragedy of error' হইয়াছে, অথচ ইহাতে যে error বা ভ্রান্তিটুকু নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহা লঘু কমেডিরই বিষয় ছিল, ট্র্যাজিডির বিষয় ছিল না।

নাটকটিকে একটি পঞ্চাঙ্ক রূপ দিবার জন্যই যেন ইহাতে কতকগুলি অনাবশ্যক ঘটনা ও দৃশ্যের সমাবেশ করা হইয়াছে, এতদ্ব্যতীত ইহাদের আর কোন তাৎপর্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কোন চরিত্রসৃষ্টিই ইহাতে রসস্ফূর্তি লাভ করিতে পারে নাই। নিরঞ্জন ও পুরঞ্জনের বন্ধুত্ব ইহার মধ্যে সামান্য একটু লক্ষ্য করিবার বিষয়, কিন্তু তাহা উচ্চ আদর্শবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, অবশ্য এই আদর্শও যে শেষ পর্যন্ত সমান ভাবে রক্ষা পাইয়াছে তাহাও নহে, মধ্যে মধ্যে ইহাদের একের অন্যের প্রতি আকস্মিক ও অসঙ্গত ব্যবহার তাহাও ক্ষুণ্ণ করিয়াছে।

রোমান্টিক বিষয়বস্তু লইয়া গিরিশচন্দ্র আর একখানি ক্ষুদ্র গীতিনাট্য রচনা করেন—ইহার নাম 'মায়াতরু'। ইহার বিষয়বস্তু অত্যন্ত সাধারণ—গন্ধর্বরাজ চিত্রভানুর দৌহিত্র সুরত স্ত্রীমুখ দর্শন করিবার ভয়ে সখাগণ সমভিব্যাহারে গভীর বনের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। মাতা গন্ধর্ব-রাজকন্যা হইয়া মনুষ্যকে বিবাহ করিবার জন্য, চিত্রভানু স্ত্রীজাতির উপর বিরূপ হইয়া তাঁহার দৌহিত্রকে জন্মাবধি স্ত্রীমুখ-দর্শন হইতে বিরত রাখিয়াছেন। বনদেবী ফুলহাসি একথা জানিতে পারিলেন। তিনি সুরতের এই স্পর্ধা ভাঙ্গিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন—তিনি সুযোগ সন্ধান করিয়া তাহার পিছনে পিছনে বেড়াইতে লাগিলেন। সেই অরণ্যের মধ্যে সুরতের জননী উদাসিনী কর্তৃক স্বামী পরিত্যক্তা হইয়া একাকিনী দীনভাবে জীবন যাপন করিতেছিলেন, তিনি ফুলহাসিকে তাঁহার কার্যে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন। তিনি এক মায়াতরু সৃষ্টি করিলেন, সুরত তাহার সখাগণসহ এই মায়াতরু দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল—এই মায়াতরু হইতে ক্রমে ক্রমে এক একজন রমণী নিষ্ক্রান্ত হইয়া সুরত ও তাহার এক একজন সখার সঙ্গে মিলিত হইল। কাহিনীর মধ্যে আর কোন বৈশিষ্ট্য নাই, কিংবা ইহার পরিণতিও খুব সুস্পষ্ট নহে

'মোহিনী প্রতিমা' গিরিশচন্দ্রের একখানি প্রেম-বিষয়ক গীতিনাট্য। ইহার উদ্দেশ্যরূপে নাট্যকার এই কয়টি পদ মুখবন্ধেই উদ্ধৃত করিয়াছেন

পাষাণে প্রেমের স্থান পাষাণেও গলে প্রাণ
পাষাণে প্রেমের খেলা কোথা তার সীমা ?
প্রতিদিন আশা যায় পাষাণ ফিরিয়া চায়
পাষাণ আবৃত দেখে মোহিনী প্রতিমা।

এক গণিকার সত্যে আবদ্ধ হইয়া একজন শিল্পী বিবাহের পর তাহার স্ত্রীর সঙ্গে সকল সম্পর্ক পরিত্যাগ করে। পবিত্র প্রেমের স্পর্শে গণিকার জীবনের সকল গ্লানিমা ঘুচিয়া যায়, সে শিল্পীর বিবাহিতা পত্নীর দুঃখ সকল অন্তর দিয়া অনুভব করে—তারপর শিল্পীকে পুনরায় আর এক সত্যে আবদ্ধ করিয়া সে তাহার নিকট তাহার পত্নীকে 'সমর্পণ করে। এই পুণ্য মিলনে শিল্পীর সকল সাধনা সিদ্ধ হয়।

এই ক্ষুদ্র গীতিনাট্যটি গিরিশ-প্রতিভার একটি পরম বিস্ময়। ইহার মধ্যে প্রেমের যে উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, গিরিশচন্দ্রের অন্য কোন রচনার ভিতর দিয়া তাহার আভাসও পাওয়া যায় না ; অন্যত্র এই প্রেমই আধ্যাত্মিকতার রূপ লাভ করিয়াছে, কিন্তু এখানে তাহা সহজ মানবিক সম্পর্কের ভিতর দিয়াই স্বর্গীয় হইয়া উঠিয়াছে।

প্রায় আদ্যোপান্ত সঙ্গীত দ্বারা গিরিশচন্দ্র আর একখানি রোমান্টিক নাটিকা রচনা করেন—তাহার নাম 'মলিন-মালা'। ইহার ভাষায় ভারতচন্দ্রের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট, নাট্যকার নিজেও ইহার মুখপত্রে ভারতচন্দ্রের চারিটি পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীতও রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের গীতিনাট্যগুলির প্রভাব ইহার উপর স্পষ্ট অনুভব করা যায়। বিষয়বস্তুটি এই—লঙ্কাদ্বীপাধিপতির পুত্র লহরকুমার বিমাতার চক্রান্তে পড়িল—রাজা রাণীকে একখানি মালা পরাইয়াছিলেন, বিমাতা সেই মালা রাজকুমারকে পরাইল। রাজকুমার লহর বিমাতার প্রতি ভক্তিবশত সেই মালা গ্রহণ করিয়া নিজকণ্ঠে পরিল, তারপর রাণী রাজাকে ডাকিয়া দেখাইল যে তাহার কণ্ঠের মালা রাজকুমার নিজের কণ্ঠে লইয়া পরিয়াছে, অতএব সে বিমাতার প্রতি অনুরাগ পোষণ করে। রাজা ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া লহরকুমারকে এক ভগ্ন তরীতে করিয়া সমুদ্রে ভাসাইয়া দিলেন। স্নেহবশত মন্ত্রী তাহার সঙ্গী হইল। মালদ্বীপের উপকূলে গিয়া তরী ডুবিল, রাজকুমার কোনমতে তীরে উঠিল, অন্যান্য সঙ্গীরাও তীরে উঠিয়া

আসিল। মালদ্বীপের রাজকুমারীদ্বয়ের নাম বরুণা ও তরুণা। তাহারা রাজকুমারকে আতিথ্য দান করিল। পরে মন্ত্রীর নিকট হইতে মালদ্বীপের রাজা সকল বৃত্তান্ত শুনিলেন। কিছুদিন পরে অনুতপ্ত লঙ্কাদ্বীপাধিপতিও পুত্রের সন্ধানে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মালদ্বীপাধিপতি নিজের কন্যা বরুণাকে লহরকুমারের হস্তে অর্পণ করিতে চাহিলেন; কিন্তু লহরকুমার এই বলিয়া পুনরায় তরীতে আরোহণ করিয়া নিরুদ্দেশ যাত্রা করিল—

> পিতা বিদায় মাগি, নমি চরণ-তলে,
> কলঙ্কমালা মম আছিল গলে,
> যাই মলিনমালা আজি ভাসায়ে জলে,
> সখা হৃদি কমলে।

নৃপতিদ্বয় দ্রুত তরীতে আরোহণ করিয়া তাহার সন্ধানে বাহির হইলেন। কাহিনীটির মূলে একটি মিথ্যা কলঙ্কের ঘৃণ্য ইঙ্গিত থাকিলেও, একটি স্বর্গীয় প্রেমের শুচি-স্পর্শে ইহা পবিত্র হইয়াছে বলিয়া বোধ হইবে। নাটিকাটি চিত্ররস-সমৃদ্ধ, কবিত্বের স্পর্শ ইহাকে সজীব করিয়াছে।

গিরিশচন্দ্র 'হীরার ফুল' নামক একখানি রোমান্টিক গীতি-নাটিকা রচনা করেন। ইহা আকারে নিতান্ত ক্ষুদ্র, মাত্র পাঁচটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ। রুশদেশীয় রূপকথা Stone of the Flower-এর সঙ্গে ইহার কাহিনীর সামান্য সাদৃশ্য আছে। মদন ও রতির সহায়তায় কি ভাবে এক অপ্রেমিক রাজপুত্র ও অপ্রেমিকা রাজকুমারীর মিলন সম্ভব হয়, তাহাই সংক্ষিপ্ত গীতি-নাট্যাকারে এখানে বর্ণিত হইয়াছে। রচনার দিক দিয়া ইহার বিশেষত্ব কিছুই অনুভব করিতে পারা যায় না। তবে ইহার মধ্যে একটি অতি লঘু পরিবেশ অতি সহজে সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হইবে—গীতে ও কথায় কাহিনীটির প্রবাহ সাবলীল হইয়া উঠিয়াছে।

রাজকুমারী মলিনা ও রাজপুত্র বিকাশের একটি রোমান্টিক প্রণয়াখ্যান অবলম্বন করিয়া গিরিশচন্দ্র 'মলিনা-বিকাশ' নামক একখানি ক্ষুদ্র গীতিনাট্য রচনা করেন। রাজকুমার বিকাশ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যে-নারী তাঁহাকে রাজকুমার না জানিয়া প্রেম নিবেদন করিবে, তিনি তাহাকেই বিবাহ করিবেন, অন্য কাহাকেও বিবাহ করিবেন না। এদিকে ভিন্ন দেশের এক রাজকুমারীর উপরও দৈবাদেশ ছিল যে, যতদিন তাহার বিবাহ না হয় ততদিন সে অরণ্যে সন্ন্যাসিনীর বেশে জীবন যাপন করিবে—বিবাহের পর

গৃহে ফিরিতে পারিবে; এই রাজকুমারীর নাম মলিনা। অরণ্যমধ্যে ছদ্মবেশী রাজকুমারের সঙ্গে সন্ন্যাসিনী রাজকুমারীর মিলন হইল, তাহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইল, তারপর শিব-সাক্ষাতে তাহাদের বিবাহ হইল। এই কাহিনীর উপর ভিত্তি করিয়া গিরিশচন্দ্র এই ক্ষুদ্র নাটকখানি রচনা করিয়াছেন। রচনার গুণে কাহিনীটি স্নিগ্ধ ও পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে। রচনায় কোন কোন স্থলে পদ্য ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে প্রণয়-কাহিনীটির গীতিসুর বর্ধিত হইয়াছে। অন্য কোন বৈশিষ্ট্য ইহাতে নাই। রচনা ও কাহিনী-পরিকল্পনার দিক দিয়া ইহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে রচিত গীতিনাট্যসমূহের প্রভাব অনুভব করা যায়।

গিরিশচন্দ্রের রোমান্টিক গীতিনাট্যগুলির মধ্যে 'স্বপ্নের ফুল' নামক নাটকখানির একটু বিশেষত্ব আছে। নাট্যকার ইহাকে রূপক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ইহার চরিত্রগুলি নৈর্ব্যক্তিক ও ভাবাশ্রিত মাত্র—যথা, ধীর, অধীর, মনোহরা, যূথী, বেলা ও অন্যান্য বনফুল ইত্যাদি। ইহা একটি নিশাস্বপ্ন, প্রেম যে আত্মবিসর্জন, অহঙ্কার নহে—ইহাই ইহার বক্তব্য বিষয়। ইহার পরিবেশের পরিকল্পনায় সেক্সপীয়রের *A Midisummer Night's Dream*-এর কতকটা প্রভাব অনুভব করা যায়। স্বপ্ন ও নৈর্ব্যক্তিক ভাব অবলম্বন করিবার ফলে কাহিনীটি অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে।

বাংলা দেশের একটি সুপরিচিত রূপকথা অবলম্বন করিয়া গিরিশচন্দ্র একখানি রোমান্টিক গীতিনাট্য রচনা করেন, তাহার নাম 'ফণীর মণি'। বাংলার প্রসিদ্ধ রূপকথা-সংগ্রাহক রেভারেণ্ড লালবিহারী দে'র *Folk Tales of Bengal* নামক গ্রন্থে Fakir Chand নামে এই রূপকথাটির একটি ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই কাহিনীরই একাংশের উপর ভিত্তি করিয়া নাটিকাটি রচিত হইয়াছে। কাহিনীটি সম্পর্কে প্রচলিত কোন স্থানীয় জনশ্রুতিও গিরিশচন্দ্রের নাটকের ভিত্তি হইতে পারে, কিংবা নাট্যিক প্রয়োজনেও গিরিশচন্দ্র উক্ত লালবিহারী দে সংগৃহীত কাহিনীর মূল লক্ষ্য স্থির রাখিয়া এখানে সেখানে একটু পরিবর্তন করিয়াও লইতে পারেন।

রূপকথাটির নাট্যরূপ এখানে খুব সার্থকতা লাভ করিতে পারিয়াছে, এমন কথা বলিতে পারা যায় না; কারণ, রূপকথার মধ্যে আনুপূর্বিক একটি রস নিবিড় হইয়া থাকে। নাট্যিক প্রয়োজনে ইহার মধ্যে মূল কাহিনীর বহির্ভূত কতকগুলি চরিত্র আনিয়া প্রবেশ করাইবার ফলে তাহা বহুলাংশে ইহাতে·

বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। রূপকথার রাজ্যে আধুনিক বাস্তব জগতের কোন চরিত্রের স্থান হইতে পারে না; কারণ, তাহা স্বপ্ন-জগৎ, সত্যের জগৎ নয়। গিরিশচন্দ্র এই ভুল করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র হয়ত তাহা নিজেও বুঝিয়াছিলেন, সেইজন্য অনুরূপ প্রয়াস পরবর্তী জীবনে আর কখনও করেন নাই। তবে গিরিশচন্দ্র সকল সম্ভাবিত ক্ষেত্র হইতেই নাট্যবস্তুর সন্ধান করিবার যে বিপুল প্রয়াস করিয়াছিলেন, ইহার মধ্যে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়।

পারস্যদেশীয় উপকথা অবলম্বন করিয়া গিরিশচন্দ্র আর একখানি গীতিনাট্য রচনা করেন—তাহার নাম 'পারস্য-প্রসূন' বা 'পারিসানা'। উজীর কর্তৃক বসোরার নবাবের জন্য ক্রীত পারিসানা নামক এক সুন্দরী ক্রীতদাসাকে কি ভাবে উজীরের পুত্র নুরুদ্দীন নিজেই পত্নীরূপে লাভ করিল, তারপর নবাবের ক্রোধ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বোগদাদে পলাইয়া গিয়া অবশেষে হারুণ-অল্-রসিদের সহায়তায় বসোরায় ফিরিয়া আসিয়া নিজেই বসোরার তখ্‌ত্‌ লাভ করিল, এই গীতিনাট্যে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। ঘটনাবহুল হইলেও এই গীতিনাট্যের লঘু পরিবেশটি কোথাও ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া বোধ হইবে না। পারিসানার চরিত্রটির 'পারস্য-প্রসূন' নামকরণ সার্থক হইয়াছে—পুষ্পের মতই ইহা নির্মল ও পবিত্র।

রোমান্টিক বিষয়বস্তু লইয়া গিরিশচন্দ্র যে সকল গীতিনাটিকা রচনা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে 'দেলদার' গীতিনাট্যখানিও রূপকাশ্রিত। ইহাকে নাট্যকার 'রূপক গীতিনাট্য' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কতকগুলি নৈর্ব্যক্তিক চরিত্র—যথা নেশা, পিয়াসা, কুহকী, কুহকিনী, স্বর-সঙ্গিনী, ভাব-সঙ্গিনী প্রভৃতির সহায়তায় একটি রাজকুমার ও তাহার সখার দুই অপ্সরাকুমারীর সঙ্গে প্রণয়-বৃত্তান্ত বর্ণনা করাই নাটকখানির উদ্দেশ্য। 'কুহক-কাননে'র মধ্যে এই প্রণয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইল। একান্ত ভাবে ভাবসর্বস্ব ও নৈর্ব্যক্তিক বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করিবার ফলে ইহার বর্ণনা অত্যন্ত অস্পষ্ট ও বৈচিত্র্যহীন হইয়া পড়িয়াছে। সেইজন্য ইহার কাহিনীর গতিও খুব সাবলীল ও স্বচ্ছ বলিয়া বোধ হইবে না।

'বাসর' গিরিশচন্দ্রের আর্যরাজ-মহিমা-কীর্তিত গীত-প্রধান রোমান্টিক নাটক। উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্য সম্পর্কিত একটি উপকথা অবলম্বন করিয়া এই নাটক রচিত হইয়াছে। ভারতে অনার্য শকরাজত্বের অবসানে বিক্রমাদিত্যকে অবলম্বন করিয়া কি ভাবে যে আর্যধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইল,

প্রধানত তাহাই নির্দেশ করা এই নাটকের উদ্দেশ্য। ইহার অধিকাংশ সঙ্গীতেই আর্য-গরিমা কীর্তিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, সমসাময়িক স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য দিয়া যে দেশাত্মবোধের প্রেরণা সেদিন সমাজে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, ইহার মধ্য দিয়াও তাহারই অভিব্যক্তি দেখা দিয়াছে। একটি উপকথাকেই এখানে নাট্যরূপ দেওয়া হইয়াছে মাত্র, ইহার আর কোন নাটকীয় মূল্য নাই। ইহা আদ্যোপান্ত গদ্যে রচিত এবং ইহা গিরিশচন্দ্রের নাটকীয় গদ্য রচনার একটি অতি প্রশংসার্হ নিদর্শন।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে গিরিশচন্দ্র 'মিলন-কানন' নামক একখানি গীতিনাট্য রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। ইহার দুইটি মাত্র দৃশ্য রচিত হইয়াছিল, এমন কি দ্বিতীয় দৃশ্যটিও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। গিরিশচন্দ্র ইহা আর শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই; তাঁহার মৃত্যুর পর অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

আরব্য উপন্যাসের আলাদীনের আশ্চর্য-প্রদীপ কাহিনী অবলম্বন করিয়া গিরিশচন্দ্র একখানি 'রঙ্গ-নাটিকা' রচনা করেন। চটুল নৃত্যগীত ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে একটি লঘু পরিবেশ ইহাতে সুন্দর সৃষ্টি হইয়াছে। এই শ্রেণীর নাটক রচনায় গিরিশচন্দ্রের স্বাভাবিক প্রতিভার একটি স্বাধীন বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা তাঁহার পরবর্তী নাটক 'আবু হোসেনে'র আলোচনা সম্পর্কেও দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইহার সংলাপ ও চিত্র পরিবেশনের মধ্যে আরব্য-উপন্যাসের অলোক-জগতের আভাসটুকু বর্তমান রহিয়াছে। ইহার আদ্যোপান্ত সমগ্র কাহিনীটি যেন একটি চটুল নৃত্যের ছন্দে বাঁধা, এই গুণেই ইহা রসোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্য দিয়া কয়েকটি সঙ্গীত রচনায় গিরিশ চন্দ্র উচ্চাঙ্গের রচনা-কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন।

আরব্য উপন্যাসের বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া গিরিশচন্দ্র যে কয়খানি গীতিনাট্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে 'আবু হোসেন' বা 'হঠাৎ বাদসা'ই সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহাকে নাট্যকার 'কৌতুকপূর্ণ গীতিনাট্য' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। লেখকের রচনাগুণে ইহার কৌতুক রসটি আদ্যোপান্ত স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, কোথাও এতটুকুও আড়ষ্ট হইয়া পড়ে নাই। ইহার একক ও দ্বৈত সঙ্গীতগুলি ইহার সমস্ত পরিবেশটিকে লঘু ও সহজ-উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে, ইহার মধ্যে উচ্চাঙ্গ নাট্যিক গুণ কিছু না থাকিলেও ইহার চটুল রসালাপ ও লঘু সঙ্গীত ইহার উপর এমন এক রস বিস্তার করিয়াছে

যে, তাহাতে সহজেই মনকে আকর্ষণ করিতে পারে। সেইজন্য ইহা গিরিশ-চন্দ্রের নাটকসমূহের মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় নাটক হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার কাহিনীটি সুপরিচিত তথাপি এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি—বোগদাদের খালিফ্ হারুণ-অল্-রসিদের অনুগ্রহে আবু হোসেন তাহার অজ্ঞাতে একদিনের জন্য বাদশাহী তখ্‌ত্ লাভ করিল, পরদিন পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়া বাদশাহ অবস্থায় সে রোশেনা নাম্নী যে এক যুবতীকে দেখিয়া ভুলিয়াছিল, তাহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইল। রোশেনা বেগমের বাঁদী। বাদশাহের অনুগ্রহে আবু হোসেন রোশেনাকে লাভ করিল, কিন্তু আবু হোসেনের অর্থকষ্ট দূর হয় না। সে কপটতা করিয়া বাদশাহের নিকট হইতে কিছু অর্থ আদায় করিয়া লইল। শেষ পর্যন্ত বাদশাহের অনুগ্রহে তাহার সাংসারিক স্বচ্ছলতাও ফিরিয়া আসিল। কাহিনীটি পড়িতে পড়িতে মনে হয়, একটি রঙিন স্বপ্ন চোখের পাতার উপর দিয়া লঘু পদভরে নাচিয়া যাইতেছে, কাহিনীটি শেষ হইয়া গেলে মনের উপর ইহার আর দাগ থাকে না, কিন্তু নাসিকায় আতরের খোস্‌বো যেন তখনও লাগিয়া থাকে, কানের ভিতর গানের সুর অনেকক্ষণ রিনিরিনি করিয়া বাজিতে থাকে।

সামাজিক নাটক

বাংলার সামাজিক জীবনের বিভিন্ন স্তরে যে বিচিত্র নাটকীয় উপাদান বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, তাহার যথার্থ ব্যবহার করিতে পারিলে যে বাংলা সাহিত্যে উচ্চাঙ্গ সামাজিক-নাটক রচিত হইতে পারে, সে কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু তাহা ব্যবহার করিবার পূর্বে নাট্যকারের এই বিচিত্র উপকরণ সম্পর্কে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকার প্রয়োজন, তাহা প্রথমেই বলিয়া রাখিতে হইতেছে। ব্যাপক সামাজিক অভিজ্ঞতার উপর মানব-চরিত্রের জটিল রহস্য-সম্পর্কে সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি ও ব্যক্তিচরিত্র সম্পর্কে আন্তরিক সহানুভূতি না থাকিলে সামাজিক নাটক রচনায় কেহ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন না। বিশেষত সামাজিক নাটক কেবল মাত্র ব্যক্তি-জীবনের বাহিক ঘটনার উত্থান-পতনের বর্ণনামাত্র নহে; ইহার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন সমস্যা আছে, জীবনের গভীরতর স্তর হইতে তাহা উদ্ধার করিয়া লইয়া সামাজিক কর্তব্যবোধ ও আত্মবোধের সঙ্গে তাহার সংঘর্ষ সৃষ্টি করাই ইহার উদ্দেশ্য। সামাজিক নাটকের সমস্যা কোন সমসাময়িক সামাজিক সমস্যা নহে, অর্থাৎ সামাজিক নাটকে যে

সকল সমস্যার অবতারণা করা হইয়া থাকে, তাহা বিধবা-বিবাহ, পণপ্রথা, মদ্যপান প্রভৃতির মত কোন সমসাময়িক সামাজিক অবস্থা-বৈগুণ্য নহে, বরং বিশেষ কোন সামাজিক পরিস্থিতির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি-চরিত্রের সুগভীর জীবন-সমস্যা। নরওয়েদেশীয় প্রসিদ্ধ নাট্যকার ইব্‌সেনের *A Doll's House* নাটক-খানির সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের যে কোন সামাজিক নাটকের তুলনা করিলেই এই উক্তির তাৎপর্য বুঝিতে পারা যাইবে।

গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা এই শ্রেণীর সামাজিক নাট্যরচনার প্রতিকূল ছিল। কারণ, প্রত্যক্ষ জীবনের প্রতি যাঁহার সুগভীর মমতা নাই, সমুচ্চ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক আদর্শই যাঁহার লক্ষ্য, তিনি কেমন করিয়া প্রত্যক্ষ জীবনের পঙ্কিল আবর্তের মধ্যে নিজের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে পারেন? পূর্বেই বলিয়াছি, গিরিশচন্দ্র নিজেও এই শ্রেণীর রচনাকে 'নর্দমা ঘাঁটা' বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছেন —এই সকল রচনার সঙ্গে তাঁহার কোন আন্তরিক যোগ স্থাপিত হইতে পারে নাই। অতএব ইহাদের রচনায় গিরিশচন্দ্রের সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়োজিত হয় নাই।

সমসাময়িক বাংলার সামাজিক সমস্যা, যেমন মদ্যপান, পণপ্রথা, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতির নিন্দাই গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকের লক্ষ্য। এই সকল সমসাময়িক সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র নিজে যে সর্বদা দুশ্চিন্তা পোষণ করিতেন, তাহা নহে; কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, এই প্রকার সামাজিক কোন সমস্যাই তাঁহার চিত্ত কোনদিন অধিকার করিয়া ছিল না। তিনি সমাজ-সংস্কারক ছিলেন না—এই সকল বিষয়-সম্পর্কে সমসাময়িক সমাজ-নেতৃবৃন্দের চিন্তাধারা যে দিকে অগ্রসর হইতেছিল, তিনি ইহাদের মধ্যে তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র। এমন কি, তিনি অন্যকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াও এই শ্রেণীর নাটক রচনা করিয়াছেন। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, সামাজিক নাটক রচনার ভিতর দিয়া গিরিশচন্দ্রের সহজ প্রতিভার স্বাভাবিক বিকাশ হয় নাই।

বাংলার সমাজ-সম্পর্কে গিরিশচন্দ্রের অভিজ্ঞতার যে দৈন্য ছিল, তাহাও তাঁহার সামাজিক নাটকগুলির ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। নবপ্রতিষ্ঠিত কলিকাতা নগরীর বিশিষ্ট একটি অঞ্চলের বাহিরে বাংলার যে বিস্তৃত সমাজ আপনার বিচিত্র রূপে ও রসে সেদিন সমৃদ্ধ ছিল, গিরিশচন্দ্র তাহার সঙ্গে কোন পরিচয় স্থাপন করিতে পারেন নাই। যে ক্ষুদ্র নাগরিক সমাজটির

সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল, তাহার বৈচিত্র্যহীন জীবনের মধ্যে নাটকীয় উপাদানের প্রাচুর্য ছিল না বলিয়াই গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকগুলি বৈচিত্র্যহীন হইয়া রহিয়াছে—প্রায় অনুরূপ বিষয়বস্তুর মধ্যেই তাহা বার বার আবর্তিত হইয়াছে। দুই একখানি সামাজিক নাটকের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের ব্যক্তিগত, আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক আদর্শও রূপ লাভ করিয়াছে।

গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকেরও দুইটি প্রধান বিভাগ—নাটক ও প্রহসন। কিন্তু কোন পূর্ণাঙ্গ সামাজিক প্রহসন গিরিশচন্দ্র রচনা করেন নাই। বিস্তৃত সামাজিক অভিজ্ঞতার অভাবই যে ইহার কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার প্রহসনগুলি তৎকালীন নাগরিক জীবনের নানা অসঙ্গতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্সা বা অতিরঞ্জিত চিত্র। তিনি ইহাদের অধিকাংশকেই 'পঞ্চরঙ্' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সঙের নৃত্য দেখিলে যে শ্রেণীর হাস্যরস সৃষ্টি হয়, ইহাদের মধ্যেও অনুরূপ হাস্যরস সৃষ্ট হইয়াছে—ইহা খুব উচ্চাঙ্গের বলিয়া অনুভূত হইবে না। গিরিশচন্দ্র তাঁহার সামাজিক ও রোমান্টিক নাটক রচনায় দীনবন্ধু মিত্রের অনুসরণ করিলেও, দীনবন্ধুর অনবদ্য প্রহসনগুলির তিনি অনুকরণ করিতে পারেন নাই—সমাজ-জীবন সম্পর্কে গিরিশচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যও ইহার অন্যতম কারণ বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু ইহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কারণ এই যে, দীনবন্ধুর যে ব্যাপক সামাজিক অভিজ্ঞতা ও সুগভীর সহানুভূতি ছিল, গিরিশচন্দ্রের তাহা ছিল না।

জীবনের প্রতি একটি উচ্চতর দৃষ্টিভঙ্গি থাকিবার ফলেই গিরিশচন্দ্র যথার্থ হাস্যরস সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। নাটকের মধ্যেও তাঁহার হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস অনেক সময়ই শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। হাস্যরস সৃষ্টির জন্য যে একটি বিশেষ আত্মনির্লিপ্ত ভাবের প্রয়োজন হয়, গিরিশ-প্রতিভায় তাহার অভাব ছিল। সেইজন্য সামাজিক প্রহসন রচনার প্রেরণা কোনদিনই তিনি অনুভব করিতে পারেন নাই। প্রত্যক্ষ জীবনের খুঁটিনাটির প্রতি যাঁহার মমতা নাই, জীবনের অসঙ্গতিগুলিও তিনি নিবিড় ভাবে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না; অথচ জীবনের ছোট বড় অসঙ্গতিগুলি লইয়াই প্রহসন কিংবা হাস্যরসাত্মক সাহিত্য রচিত হয়। এই শক্তির অভাব গিরিশ-প্রতিভার একটি বিশিষ্ট ত্রুটি।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সমাজ বহুদিনের চিন্তার জড়তা এবং সংস্কারের দাসত্ব হইতে পরিত্রাণ পাইবার যে প্রয়াস পাইয়াছিল, তাহা সে যুগের বাংলা সাহিত্যের মধ্য দিয়া যতখানি সুস্পষ্ট ও ব্যাপক পরিচয় লাভ করিয়াছে অন্য কোন বিষয়ের মধ্য দিয়া তাহা তত স্পষ্ট ও ব্যাপক হইয়া উঠিতে পারে নাই। গদ্যসাহিত্য বিকাশের মধ্য দিয়া সে যুগে এই বিষয়ে যে একটি নূতন সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, এদেশের সমাজহিতৈষী ও শিক্ষিত সমাজ তাহার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া তাহাদের ধ্যান ও কর্মের বিচিত্র পরিচয় যেমন একদিকে প্রবন্ধ রচনার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, তেমনই অন্যান্য সাহিত্যরূপের মধ্য দিয়াও প্রকাশ করিবার কার্যে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। প্রবন্ধ সাহিত্যের পরই এই বিষয়টি বাংলা সাহিত্যে অন্য যে সাহিত্যরূপের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাই নাটক। নাটকও প্রধানত গদ্য রচনা এবং বাংলা গদ্য ভাষার ক্রমবিকাশের ধারায় ইহারও বিশেষ দান অস্বীকার করিতে পারা যায় না। রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর ইঁহারা প্রবন্ধ রচনা করিয়া একদিকে যেমন তাঁহাদের কর্ম ও সাধনার পরিচয় সমাজের মধ্যে প্রকাশ করিতেছিলেন, তেমনই আর একদিক দিয়া সে যুগের নাট্যকারগণ, যেমন রামনারায়ণ তর্করত্ন, উমেশ মিত্র, মধুসূদন, দীনবন্ধু—ইঁহারা প্রত্যেকেই নাটক-প্রহসন রচনার মধ্য দিয়া যুগের রূপটিকে জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিয়া সে'দিকে সমাজহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিলেন। সমাজের চারিদিকেই যখন এই প্রকার প্রয়াস দেখা যাইতেছিল, তখনই উনবিংশ শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের আবির্ভাব হয়। জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দেখিতে পাইলেন, সমাজে একদিকে প্রাচীন সংস্কারের জীর্ণ রূপটি ধ্বসিয়া পড়িতেছে এবং তাহার মধ্য হইতে নূতন এক সমাজ-রূপ আত্মপ্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইতেছে; কিন্তু তাহার আত্ম-প্রতিষ্ঠা তখনও সম্ভব হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই কলিকাতা মহানগরী গড়িয়া উঠিতে লাগিল এবং শিল্প ও বাণিজ্যকেন্দ্রিক এই নূতন মহা-নগরীকে কেন্দ্র করিয়া বাঙালীর শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক জীবনের এক নূতন ধারা প্রবর্তিত হইবার সূচনা হইল। এতদিন কৃষিকেন্দ্রিক পল্লী-জীবনাশ্রিত হইয়া বাংলার সমাজ-জীবনের মধ্যে যেমন বৈচিত্র্যহীন নির্জীবতা প্রকাশ পাইতেছিল, তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়া নূতন পরিবেশে নূতন এক ব্যষ্টি-কেন্দ্রিক সমাজ-জীবন বিকাশ লাভ করিতে লাগিল। কৃষিভিত্তিক

সমাজ-জীবনের মধ্যে যে অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা ছিল, এই জীবনের মধ্যে তাহা ছিল না। বাণিজ্যই হোক, শিল্পই হোক, ইহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া যে অর্থনৈতিক জীবন গড়িয়া উঠে, তাহা অনিশ্চয়তায় সংশয়াচ্ছন্ন—ইহার মধ্যে উত্থান-পতন আছে, ইহাতে বাস করিয়া জীবনে কোন আদর্শ অবিচলভাবে ধরিয়া রাখিবার কোন উপায় থাকে না। তারপর পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাবিস্তারের ফলে আমাদের সমাজ-নীতির আদর্শ পরিবর্তিত হইতে লাগিল, মানুষের মধ্যে আত্মবোধ প্রখর হইতে প্রখরতর হইতে লাগিল। একদিন সামাজিক স্বার্থ, পারিবারিক স্বার্থের মূলে এদেশের মানুষ আত্মবলি দিয়াছে, তাহার আদর্শ ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হইয়া ব্যক্তিস্বার্থবোধ তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিতে লাগিল। আমাদের সমাজ এবং পরিবার কঠিন দারিদ্র্যের মধ্যেও একদিন যেমন পরস্পর ত্যাগ এবং সহিষ্ণুতার মধ্য দিয়া বিকাশ লাভ করিয়াছে পাশ্চাত্ত্য সমাজ-জীবনের সংস্পর্শে আসিবার ফলেই সেখানে একান্ত স্বার্থ-পরতাবোধের সৃষ্টি হইল, যেখানে বৃহত্তর সমাজ কিংবা যৌথ পরিবারের কল্যাণ আমাদের লক্ষ্য ছিল, সেখানে একান্ত স্বার্থ-চেতনা জাগ্রত হইয়া তাহার মধ্যে ফাটল ধরাইয়া দিল।

অথচ পাশ্চাত্ত্যশিক্ষা-প্রভাবিত নূতন সমাজ-চেতনার স্পর্শ মাত্র যদি প্রাচীন জীবনের সকল সংস্কার মুহূর্তে ভাসিয়া যাইত, তবে উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-জীবনের মধ্যে এত সমস্যা এবং জটিলতা দেখা যাইত না। কিন্তু প্রাচীন সংস্কার ত এক মুহূর্তেই সমাজ-মানস হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতে পারে না, ইহারও একটা শক্তি আছে; সেইজন্য তাহা নির্ভর করিয়াও ইহা নূতন প্রেরণার সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হয়; শেষ পর্যন্ত সেই সংগ্রামে সে টিকিতে পারে না, একথা সত্য; কিন্তু তথাপি ইহার দ্বারা সমাজ-মানসে উভয় পক্ষে যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের সৃষ্টি হয়, তাহা দ্বারা সমাজের চিন্তা ও কর্মের রাজ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়। উনবিংশ শতাব্দী প্রাচীন ও নূতনের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের যুগ, এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়াই নবপ্রবুদ্ধ বাঙ্গালী জাতির নূতন যুগের সাহিত্য-সাধনার নূতন চেতনা বিকাশ লাভ করিয়াছিল। সেই যুগ-চেতনায় দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বিক্ষোভ ছিল বলিয়া সে যুগের সাহিত্যেও বৈচিত্র্য দেখা দিয়াছিল।

(গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই প্রকার যুগেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে পাইলেন, ধর্ম ও রাজনৈতিক চেতনায়, সমাজে এবং

সাহিত্যে সর্বত্রই প্রাচীন বিশ্বাসের প্রতি শৈথিল্য প্রকাশ পাইতেছে। তিনিও তাহার মধ্যে যে গা ভাসাইয়া দিলেন, তাহা নহে; কারণ, আমরা দেখিতে পাইব, তাঁহার মধ্যে প্রাচীনকে ধরিয়া রাখিবার যে একটি শক্তি ছিল, তাহা তিনি মুহূর্তেই বিসর্জন দিলেন না, বরং তাহাকেই উজ্জীবিত করিয়া লইবার প্রেরণা অনুভব করিলেন। কিন্তু অন্তরের মধ্যে তাঁহার সে দিন যে প্রেরণাই থাকুক, বাহিরের প্রভাবকেও তিনি অস্বীকার করিতে না পারিয়া ইহাদের মধ্যে সামঞ্জস্যের পথ খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।)

তিনি দেখিলেন, যাত্রা, পাঁচালী, কবি, হাফ্‌ আখড়াই ইত্যাদি তখনকার দিনে সাধারণ লোকের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত; ইহাদের মধ্য দিয়া এক-দিকে যেমন দেশের প্রাচীন সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি রক্ষা করিবার প্রয়াস দেখা যাইতেছে, অন্যদিকে ইহাদের মধ্যে নাগরিক জীবনের রস ও রুচিসম্মত বিষয়ও পরিবেষণ করিবার প্রয়াস দেখা দিয়াছে। ইহাদের মধ্য দিয়া সামঞ্জস্য বিধানের একটি প্রয়াস দেখা যাইতেছে, কিন্তু দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইলে যেমন উভয়েরই মৌলিক শক্তিটির উদ্ধার করিবার আবশ্যক হয়, কেবলমাত্র উপরিস্তরের উপকরণগুলি দ্বারা সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হয় না, ইহাদের মধ্য দিয়া তাহাই হইতেছিল; সেইজন্য ইহাদের মধ্যে প্রকৃত সামঞ্জস্যের পরিবর্তে সর্বনাশেরই চেষ্টা দেখা যাইতেছিল। গিরিশচন্দ্র বাল্যকাল হইতেই ইহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইলেও এই বিষয়ে প্রথম হইতেই তাঁহার মনে একটি বলিষ্ঠ চেতনা জন্মলাভ করিয়াছিল। তিনি ইহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া-ছিলেন সত্য, কিন্তু ইহাদের গতানুগতিক যে ধারাটি ক্রমে আবিল হইয়া উঠিতেছিল, তাঁহার নিজস্ব চিন্তা দ্বারা তাহা পরিশুদ্ধ করিয়া লইবার প্রয়াসী হইয়াছিলেন। কারণ, শৈশব শিক্ষার মধ্য দিয়াই গিরিশচন্দ্র বাঙ্গালীর সমাজ-জীবনের প্রাচীন আদর্শগুলির সঙ্গে পরিচিত হইয়া ইহাদের প্রতি একটি শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতেছিলেন। পরবর্তী জীবনে তিনি তাঁহার পৌরাণিক নাটক রচনার মধ্য দিয়া যেমন পৌরাণিক চরিত্রগুলির প্রতি সেই ভক্তির ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তেমনই কোন কোন সামাজিক নাটকের মধ্য দিয়া প্রাচীন আদর্শে উদ্বুদ্ধ সামাজিক চরিত্র সম্পর্কেও সেই ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। 'প্রফুল্ল' সামাজিক নাটকের প্রফুল্ল চরিত্র তাহাদেরই অন্যতম।

প্রাচীন সমাজ-জীবনের আদর্শের প্রতি গিরিশচন্দ্র যে শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন, তাহার প্রেরণা তিনি তাঁহার শৈশব জীবনেই পারিবারিক শিক্ষার মধ্য দিয়াই

লাভ করিয়াছিলেন। খুল্লপিতামহী তাঁহাকে সন্ধ্যাকালে শৈশবকালেই রামায়ণ-মহাভারত পাঠ করিয়া শুনাইতেন, ভাগবত পুরাণ পাঠ করিয়া শুনাইতেন, তাঁহার শিশু মনে ইহারা গভীর রেখাপাত করিত। তাঁহার স্বাভাবিক কবি-মন রামায়ণ-মহাভারতের সুখদুঃখপূর্ণ বিচিত্র ঘটনাজালের মধ্যে জড়াইয়া পড়িত। তিনি পিতামহীর সঙ্গে বসিয়া কথকতা শুনিতেন ভক্তিভাবে তাঁহার শিশুমন আপ্লুত হইত। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি কবি ও যাত্রার দলে যোগ দিলেন; কেবলমাত্র বহির্মুখী আনন্দোপভোগই তাঁহার লক্ষ্য ছিল না, অন্তর্মুখী ভক্তিরসের প্রেরণাও সেখানে সক্রিয় ছিল বলিয়াই কবির দলে যোগ দিয়াও কদর্যতা হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারিলেন, যাত্রার অভিনয়ের মধ্য দিয়াও নৃত্যে ও সঙ্গীতে শুচিতা ও সম্ভ্রম রক্ষা পাইল।

গিরিশচন্দ্র আজন্ম সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। এই বিষয়ে জননীর চরিত্র তাঁহাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। সেইজন্য তাঁহার নাটকে আমরা কয়েকটি আদর্শ জননী চরিত্রের সন্ধান পাইয়াছি। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর পারিবারিক জীবনের মধ্যে পুরুষ-চরিত্রের উপর বাহিরের সংঘাত আসিয়া যত প্রবলভাবে আঘাত করিয়াছিল, স্ত্রী-চরিত্রকে তাহা তত প্রবলভাবে তখনও আঘাত করিতে পারে নাই। সেইজন্য জননী চরিত্র সন্তানের উপর সেদিন যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার ভিতর দিয়াই তাহাদের মধ্যে তাহার প্রতি শ্রদ্ধাশীলতার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। একদিক দিয়া গৃহে জননীর প্রভাব আর একদিক দিয়া বহির্মুখী পাশ্চাত্ত্যশিক্ষার প্রভাব ইহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই সেদিন অনেকেরই সাহিত্যসৃষ্টি সার্থকতা লাভ করিয়াছে। মধুসূদনের জীবনে আমরা ইহা যেমন দেখিতে পাই, গিরিশচন্দ্রের জীবনেও তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্য উভয়েরই সাধনার মৌলিক ভিত্তি জাতীয় সংস্কার, অর্থাৎ রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের জীবনাদর্শ।

গিরিশচন্দ্রের ব্যক্তিজীবনের সততাবোধ সম্পর্কে তাঁহার জীবনীতে একটি কাহিনী বর্ণিত আছে, তাহা এখানেও উল্লেখ করা যায়। যৌবনের প্রারম্ভেই পিতার পরলোকগমনের পর বিষয়-সম্পত্তি সংক্রান্ত এক ব্যাপারে গিরিশচন্দ্র এক মোকদ্দমায় জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই মোকদ্দমায় গিরিশচন্দ্র নিজের ক্ষতি স্বীকার করিয়াও সত্য কথা প্রকাশ করিয়া সাক্ষ্য দেন। তাহাতেই তিনি মোকদ্দমায় হারিয়া যান। ইহাতে বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন আত্মীয়-স্বজনগণ

তাঁহাকে নির্বোধ বলিয়া গালাগালি দিয়াছিলেন। ইহা হইতেই তিনি সমাজের যথার্থ স্বরূপটিকে চিনিয়া লইতে পারিয়াছিলেন। কপটতা, মিথ্যা, অসদাচরণের প্রতি তাঁহার যে ঘৃণা তাঁহার প্রতিটি নাটকের মধ্যেই প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা তাঁহার অন্তরের মর্মমূল হইতে উৎসারিত বলিয়া তাহা এমন তীব্র এবং জ্বালাময় হইয়াছে। ঐ মামলা সম্পর্কে তিনি উকিল ব্যারিস্টারের যে পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার নিকট মর্মান্তিক হইয়া উঠিয়াছিল। সেই বেদনাই তিনি তাঁহার সামাজিক নাটকের উকিল-এ্যাটর্নির চরিত্র রূপায়ণের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাদের সম্পর্কে তাঁহার এই প্রকার বিশিষ্ট ধারণা ছিল বলিয়া তাঁহার এই শ্রেণীর চরিত্রগুলিকে কখনও তিনি নিজস্ব এই সংস্কার হইতে মুক্ত করিয়া চিত্রিত করিতে পারেন নাই। তাঁহার ক্রোধ তাঁহার মর্মান্তিক বিতৃষ্ণার লক্ষ্য হইয়া ইহারা তাহাদের বস্তুধর্ম বিসর্জন দিয়া তাঁহার চিন্তায় ও দৃষ্টিতে প্রতিভাসিত হইয়াছে। সেইজন্যই তাহারা যে কিছু-মাত্র অতিরঞ্জিত হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের যে যোগাযোগ, তাহা কোন আকস্মিক ব্যাপার নহে; এমন যোগাযোগ কখনও আকস্মিক হইতে পারে না। নট এবং নাট্যকার গিরিশচন্দ্র বাল্যকাল হইতেই যে উচ্চ নীতি ও আদর্শের মধ্যে মানুষ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার নট-জীবনের মধ্য দিয়াও তিনি যে তাঁহার পৌরাণিক নাটকে বাংলার প্রাণের ভক্তিসুধারসের ধারাটি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন, তাহাই অনিবার্য গতিতে রামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের সান্নিধ্যে আনিয়া তাঁহাকে উপস্থাপিত করিয়াছিল। তাঁহার নট-জীবনের অন্তরালে যদি এই ধারাটি সঞ্জীবিত না থাকিত, অর্থাৎ তাঁহার প্রাণটি যদি নিরেট পাষাণ হইয়া যাইত, তবে শত রামকৃষ্ণও তাঁহার মধ্যে অধ্যাত্মচেতনা আর বিকাশ করিয়া তুলিতে পারিতেন না। সুতরাং ধর্ম এবং সত্যবোধের প্রতি আকর্ষণ তাঁহার জীবনের সূত্রেই গ্রথিত হইয়া ছিল—নটজীবনের কর্মের বিপরীতমুখী ধারার মধ্যেও তাহা একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই। বিশেষত জন্মসূত্রে প্রাপ্ত সংস্কার কিংবা শৈশবশিক্ষার মধ্যে মুদ্রিত সংস্কার ইহাদের প্রভাব জীবনব্যাপী স্থায়ী হয়, গিরিশচন্দ্রেরও হইয়াছিল। এই কথাটি একটু বিশেষভাবে বুঝিবার প্রয়োজন আছে। এই জন্যই গিরিশচন্দ্র খল (Villain) চরিত্রের প্রতি কোনও প্রকার সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারেন নাই; তাঁহার অন্তরের বলিষ্ঠ সত্যবোধই ইহার কারণ।

সেক্সপীয়র সাইলককেও মানুষ করিয়া অনুভব করিয়াছেন; নরমাংস-লোলুপ পিশাচ সাইলক গৃহে ফিরিয়া যখন একদিন দেখিল, তাহার একমাত্র কন্যা অপহৃতা হইয়াছে, তখন তাহার অন্তরের মানবিক স্নেহবোধ উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের কোন খলচরিত্রের মধ্যে এই মানবিক অনুভূতির অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারা যায় না; তাহার ইহাই কারণ যে, গিরিশচন্দ্র নিজের জীবনের সত্যনিষ্ঠা দ্বারা বুঝিয়াছিলেন, যে সত্য ভ্রষ্ট, সে মানবিক ধর্ম হইতে বিচ্যুত। সেইজন্য তাঁহার খল চরিত্রগুলি দানব মাত্র, রক্তমাংসের লেশমাত্র স্পর্শ তাহাদের মধ্যে নাই। নাটকীয় চরিত্র হিসাবে ইহা ত্রুটিজনক, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, একথা সত্য; কিন্তু গিরিশচন্দ্র তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্রের আদর্শবোধ দ্বারা তাঁহার নাটকীয় চরিত্রগুলি সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া তিনি তাহার ব্যতিক্রম করিতে পারেন নাই।

গিরিশ-চরিত্রের আর একটি প্রধান বিশেষত্ব, তিনি ভাবপ্রবণ কবি। বাঙ্গালী তাঁহাকে মহাকবি গিরিশচন্দ্র, জাতীয় কবি গিরিশ—এই বলিয়াই জানে। সুতরাং তাঁহার এই ভাবপ্রবণ কবি-চরিত্র তাঁহার নাট্যরচনাকে নিয়ন্ত্রিত করিবে, ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু রোমান্টিক বা পৌরাণিক নাটক রচনা বিষয়ে তাঁহার কবিধর্ম সহায়ক হইলেও তাঁহার সামাজিক নাটক রচনা যে তাহা দ্বারা অনেক ব্যাহত হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সামাজিক নাটক রচনা তাঁহার কবিচরিত্রের বিরোধী গুণ ছিল, একথা তিনি নিজেও স্বীকার করিয়াছেন; তাঁহার ভাবাবেগ-প্রবণতা এবং কবিধর্মিতা তাঁহার সামাজিক নাটকগুলিকেও অনেক ক্ষেত্রে রোমান্টিক করিয়া তুলিয়াছে। কবিচিত্তে প্রত্যক্ষ জগতের পরিবর্তে যে একটি ভাব-জগৎ সৃষ্ট হইয়া থাকে, গিরিশচন্দ্র তাহাতেই অবস্থান করিতেন। রূঢ় বাস্তব জীবনের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা ছিল বলিয়া ভাবজগতের স্বপ্ন-কল্পনার মধ্যে তিনি চিত্তের আরাম পাইতেন; সেইজন্য তাহা দ্বারা তাঁহার সামাজিক নাটকের প্রত্যক্ষ-লোকের সমস্যাগুলি অনেক সময় কল্পিত সমস্যার সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া অবাস্তব হইয়া উঠিত। ইহা তাঁহার সাহিত্যিক-প্রকৃতির অন্তর্নিহিত গুণ ছিল বলিয়া ইহার প্রভাব হইতে তিনি তাঁহার সামাজিক নাটক রচনাতেও পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন নাই।

কলিকাতার ধনী ব্যবসায়ী যোগেশ, সংসারে তাঁহার বিধবা মাতা উমাসুন্দরী ও দুই ভাই রমেশ ও সুরেশ; রমেশ এটর্নি, সুরেশ ভবঘুরে; যোগেশের পত্নী

জ্ঞানদা ও পুত্র যাদব, রমেশের পত্নী প্রফুল্ল; প্রফুল্ল নিঃসন্তান, সুরেশ অবিবাহিত। ইহারা সকলে একান্নবর্তী পরিবারের সন্তান। জীবনের সায়াহ্নে যোগেশ যখন তাঁহার বৈষয়িক ব্যাপার সুস্থির করিয়া নিশ্চিন্ত মনে মাতাকে লইয়া বৃন্দাবন যাত্রার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় সংবাদ পাইলেন, যে-ব্যাঙ্কে তাঁহার যথাসর্বস্ব গচ্ছিত ছিল, সেই 'রি-য়ুনিয়ন ব্যাঙ্ক' ফেল পড়িয়াছে এবং তাঁহার আজীবন-সঞ্চিত যথাসর্বস্ব ধন বিনষ্ট হইয়াছে। যোগেশ পূর্ব হইতেই সামান্য মদ্যপান করিতেন, এই সংবাদ শুনিবামাত্র বৃন্দাবন যাত্রার সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া এই নিদারুণ আঘাতের বেদনা ভুলিয়া থাকিবার জন্য মদ্যপানের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া চলিলেন। সততা ও সাধুতা যোগেশের ব্যবসায়িক উন্নতির মূল ছিল, আজ বিপদে পড়িয়াও তিনি তাঁহার সেই আদর্শ হইতে চ্যুত হইতে চাহিলেন না। তিনি তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা রমেশকে ডাকিয়া নিজেদের বিষয়-আশয় বিক্রয় করিয়া পাওনাদার-ব্যাপারিদের টাকা মিটাইয়া দিতে বলিলেন। রমেশ এটর্নি, সে নিতান্ত কূটবুদ্ধি ও স্বার্থপর ব্যক্তি। সে কৌশলে ভ্রাতার সম্পত্তি বেনামি করাইয়া নিজে সর্বস্ব হস্তগত করিবার উপায় সন্ধান করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে আবার আর একটি ঘটনা ঘটিয়া গেল। রমেশের স্ত্রীর নাম প্রফুল্ল। প্রফুল্ল তাহার দেবর সুরেশের পরামর্শে তাহার মাকড়িজোড়া পোদ্দারের নিকট বাঁধা দিয়া যোগেশের জন্য ঔষধ আনিয়া দিতে বলিল। রমেশ ইহা জানিতে পারিয়া চুরির দায়ে সুরেশকে পুলিশ দিয়া ধরাইয়া হাজতে পুরিল। যোগেশ এ কথা শুনিয়া আরও অধীর হইয়া কেবল মদ খাইয়া সকল জ্বালা বিস্মৃত হইয়া থাকিতে চাহিলেন। মাতা ও পত্নী আসিয়া বার বার নিষেধ করিতে লাগিল, কিন্তু লোকলজ্জা কিংবা মাতৃসম্মান জলাঞ্জলি দিয়া তিনি কেবল মদ খাইয়া চলিলেন। যোগেশের মাতাল অবস্থায় রমেশ তাঁহাকে দিয়া বাড়ী বেনামী 'মর্টগেজ' করিবার কাগজপত্র সহি করাইয়া লইল। তারপর রমেশের দুরভিসন্ধি-চালিত মাতা ও স্ত্রীর অনুরোধে তিনি সেই কাগজপত্র রেজেষ্ট্রী করিয়া দিলেন— পাওনাদারগণ প্রতারিত হইল। কিন্তু যোগেশ এই কার্যের জন্য গভীর অনুতাপ করিতে লাগিলেন এবং সকল জ্বালা ভুলিয়া থাকিবার জন্য কেবল মদের মাত্রা বাড়াইয়া চলিলেন। ক্রমে আর প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিতে পারিলেন না। ইতিমধ্যে সংবাদ পাওয়া গেল, ব্যাঙ্ক দিন পনেরর মধ্যে 'রিকভর' করিবে, কিন্তু যোগেশের নিকট হইতে রমেশ এই সংবাদ গোপন রাখিল। চুরির দায়ে সুরেশের জেল

হইয়া গেল। রমেশ আপীল করিবার লোভ দেখাইয়া সুরেশের বিষয়ের অংশ নিজে হাত করিবার উদ্দেশ্যে জেলখানায় তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কিছু সাদা কাগজ সহি করাইয়া আনিতে গেল, কিন্তু রমেশের সঙ্গে কাঙ্গালীকে দেখিতে পাইয়া সুরেশ সহি করিয়া দিতে অস্বীকৃত হইল। কাঙ্গালী ও তাহার স্ত্রী জগমণি রমেশের সকল দুষ্কার্যের সহায়ক ছিল—সুরেশ তাহাদের চিনিত। সুরেশের জেল হইবার কথা তাহার মাতা উমাসুন্দরীর নিকট গোপন ছিল, একদিন রমেশের পরামর্শে জগমণি আসিয়া তাঁহার নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া দিল। এই আঘাতে তিনি উন্মাদ হইয়া গেলেন। মদের মাত্রা বাড়িয়া চলিতে চলিতে ক্রমে যোগেশ বদ্ধ মাতাল হইয়া পড়িলেন, চেন ঘড়ি বাঁধা দিয়া মদ খাইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া মাতলামি করিতে লাগিলেন। বিশ্বস্ত কর্মচারী পীতাম্বর রাস্তা হইতে ধরিয়া তাঁহাকে কোন কোন দিন গৃহে লইয়া আসিত। যোগেশের স্ত্রী জ্ঞানদার নামে একটি বাড়ী ছিল, অভাবে পড়িয়া জ্ঞানদা তাহা বিক্রয় করিলেন। অল্পদিনের মধ্যে নিজের গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যোগেশ স্ত্রীপুত্রের হাত ধরিয়া এক ভাড়া বাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন। যোগেশ জ্ঞানদার বাড়ী বিক্রয়ের টাকা মদ খাইয়া উড়াইয়া দিলেন, জ্ঞানদার গয়নার বাক্স জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়া গিয়া তাহা দিয়া মদ খাইলেন। বালক পুত্র যাদবকে লইয়া জ্ঞানদা অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাইতে লাগিলেন। বাড়ীর ভাড়া বাকি পড়িল দেখিয়া বাড়ীওয়ালী তাহাদিগকে বাড়ী হইতে পথে বাহির করিয়া দিল। পথে পড়িয়া জ্ঞানদার মৃত্যু হইল। যোগেশের বংশধরকে নির্মূল করিবার উদ্দেশ্যে কাঙ্গালী ও তাহার স্ত্রী জগমণির সহায়তায় যাদবকে ধরিয়া লইয়া গিয়া রমেশ তাহাকে বিষ দিয়া হত্যা করিবার চেষ্টা করিল। প্রফুল্ল নিজে রমেশের হাতে প্রাণ বিসর্জন দিয়া যাদবকে বাঁচাইল। সুরেশ জেল হইতে ফিরিল, সে পুলিশ ডাকিয়া রমেশ ও তাহার অনুচর দুইজনকে ধরাইয়া দিল। 'আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল', বলিয়া যোগেশ পাগল হইয়া পথে পথে ঘুরিতে লাগিলেন।

গিরিশচন্দ্র প্রায় চল্লিশখানি নানাবিষয়ক পৌরাণিক নাটক রচনা করিবার পর তাঁহার 'প্রফুল্ল' নামক সামাজিক নাটকখানি রচনা করিয়াছিলেন; সুতরাং ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক যে, তাঁহার এই সামাজিক নাটক রচনার ভিতর দিয়া তাঁহার পৌরাণিক নাটক রচনার সংস্কার হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন নাই। কারণ, পৌরাণিক নাটক রোমান্টিকধর্মী, ইহার জগৎ ও জীবন আমাদের সম্মুখে

প্রত্যক্ষ নহে বলিয়াই ইহার সম্পর্কিত কোন বিষয়ই আমাদের নিকট অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। কিন্তু সামাজিক নাটকে এই বিষয়ে নাট্যকারকে একটি বিশেষ দায়িত্ব পালন করিবার আবশ্যক হয়। ইহার চিত্র ও চরিত্রগুলি আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত—ইহাদের চিত্রগুলিকে আমরা প্রত্যহ চোখে দেখিয়া থাকি, চরিত্রগুলিও আমাদের প্রতিবেশিরূপে বাস করে, সুতরাং ইহাদের সম্পর্কে কোন অস্বাভাবিকতা কিংবা অসঙ্গতি আমাদের নিকট পীড়াদায়ক হইয়া উঠে। 'প্রফুল্ল' নাটক রচনায় গিরিশচন্দ্র কতদূর তাঁহার পৌরাণিক নাটক রচনার সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে বাংলার সমাজ-জীবনের প্রত্যক্ষ একটি পরিচয় প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক।

পৌরাণিক নাটকের অমিত্র পদ্যসংলাপের পরিবর্তে 'প্রফুল্ল' নাটকে অবশ্য গিরিশচন্দ্র আনুপূর্বিক গদ্য সংলাপই ব্যবহার করিয়াছেন, এখানে তিনি পৌরাণিক নাটক রচনার ধারা পরিত্যাগ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু দেখা যায়, চরিত্রসৃষ্টির বিষয়ে তিনি পৌরাণিক নাটকের সংস্কার সর্বত্র পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। কয়েকটি মাত্র চরিত্রের কথা উল্লেখ করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

প্রথমত মদন ঘোষ নামক ইহাতে যে একটি চরিত্র আছে, তাহা পৌরাণিক নাটকের সংস্কার অনুসরণ করিয়াই এই নাটকে আবির্ভূত হইয়াছে। ইহার সম্বন্ধে উমাসুন্দরীর ধারণা, 'সে পাগল নয়, অমনি পাগ্‌লামো করে বেড়ায়। ও সব লোক কি ধরা দেয়!' (১।১)।

তাহার চরিত্র ও আচরণ রহস্যাচ্ছন্ন (mystic)। গিরিশচন্দ্রের রচিত পৌরাণিক নাটকের মধ্যেই এই শ্রেণীর চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়; বাহিরে ইহারা পাগলের রূপ ধারণ করিয়া থাকে, কিন্তু মুখে তাহাদের সর্বদাই তত্ত্বকথা শুনা যায়, সেই তত্ত্ব সুগভীর জীবন-দর্শনজাত তত্ত্ব। /এই সকল চরিত্রের সঙ্গে পার্থিব চরিত্র কিংবা প্রত্যক্ষ জীবনের সম্পর্ক থাকে না, ইহারা বৃন্তহীন পুষ্পের মত আপনা আপনি ফুটিয়া উঠে, নাটকের প্রয়োজনমত আসে, প্রয়োজন ফুরাইলেই চলিয়া যায়। কোথায় যায়, কোথা হইতে আসে তাহা কেহ জানে না। পূর্বেই বলিয়াছি, পৌরাণিক নাটকের রোমান্টিক-ধর্মী পরিবেশের মধ্যে ইহাদের যে স্থানই থাকুক, বাস্তবধর্মী সামাজিক নাটকের মধ্যে যে ইহাদের স্থান হইতে পারে না, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।/

এই শ্রেণীর দ্বিতীয় চরিত্র যোগেশের বালক পুত্র যাদব। সে শিশু, কিন্তু শিশুর পক্ষে যে জীবন নিতান্ত স্বাভাবিক ও বাস্তব, তাহা তাহার মধ্যে নাই। সে আদর্শ শিশু, মাতা ও পিতার প্রতি ভক্তিতে সে আদর্শ এবং এই মাতৃপিতৃভক্তি ছাড়া সংসারে আর কিছুই সে জানে না। এই শিশুর মধ্যে পৌরাণিক শিশু চরিত্র ধ্রুব, প্রহ্লাদ ও বৃষকেতুর প্রভাব অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। গিরিশচন্দ্র ইতিপূর্বে পৌরাণিক শিশু চরিত্রগুলি লইয়া নাটক রচনা করিয়াছেন, সেই সংস্কার হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া তিনি বাস্তব জগতের এই শিশু চরিত্রটি অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। মনে হয়, ইহার উপর 'সরলা' নাটকের গোপাল চরিত্রের প্রভাবও কতকটা সক্রিয় ছিল, গোপালের চরিত্র হইতেও পিতৃভক্তির দিক দিয়া যাদব চরিত্র অনেক অগ্রসর। অন্যায়ভাবে মাতাল পিতার নিকট হইতে প্রহার লাভ করিয়াও সে মায়ের নিকট জানিতে চাহে, 'বাবা আমায় রোজ ডাকেন, আজ ডাকেন নি কেন?' পিতার স্নেহহীন আচরণকেও ক্ষমা করিয়া মাতাল পিতার মদ্যপানকে তাঁহার 'অসুখ হইয়াছে' মনে করে। তাহার এই আদর্শ পিতৃভক্তি যে পিতৃ-মাতৃ-হরিভক্ত পূর্বোক্ত পৌরাণিক শিশু-চরিত্রগুলিরই প্রভাবের ফল, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

রামনারায়ণ তর্করত্ন তাঁহার 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকে বাংলা সাহিত্যে প্রথম জীবন্ত শিশু চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ইহার পর তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা'র গোপাল, সেই তুলনায় অনেক হীনপ্রভ হইলেও সম্পূর্ণ অবাস্তব হইয়া উঠিতে পারেন নাই; কিন্তু পৌরাণিক নাটক রচনার সংস্কার বশতই গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'প্রফুল্ল' নাটকে শিশু যাদবের চরিত্রটিকে বাস্তব ও জীবন্ত করিয়া তুলিতে পারেন নাই।

চরিত্রের এবং ঘটনার আকস্মিক ও আমূল পরিবর্তন পৌরাণিক নাটকের বৈশিষ্ট্য। 'প্রফুল্ল' নাটকে শিবনাথ চরিত্রের মধ্য দিয়াও সেই ভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে। শিবনাথ সুরেশের মত চরিত্রহীন যুবকের বন্ধু, সে যে একটি 'প্রচ্ছন্ন মহাপুরুষ' পূর্বে একথা বুঝিতে পারা যায় নাই, কিন্তু সহসা চতুর্থ অঙ্কের পর হইতেই তাহার চরিত্র কোন অজ্ঞাত কারণে পরদুঃখ-কাতরতায় বিগলিত হইয়া গেল এবং তাহার মহাপুরুষ পরিচয় আর গোপন রহিল না। সুরেশের মত পাষণ্ডের সঙ্গে যে এই প্রকৃতির একটি চরিত্রের কি ভাবে বন্ধুত্বের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায় না; তাহার আকস্মিক চরিত্র পরিবর্তনের কারণও খুব স্পষ্ট নহে। সুতরাং ইহা বাস্তবজীবনাশ্রিত চরিত্ররূপে স্ফূর্তি লাভ

করিতে পারে নাই; পৌরাণিক জীবনের সংস্কার হইতেই যে ইহার আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাই ইহার বিষয়ে মনে হওয়া স্বাভাবিক।

এই নাটকের পীতাম্বরও এই শ্রেণীর আর একটি চরিত্র। নিজের সকল স্বার্থ বিসর্জন দিয়া যোগেশের পরিবারকে রক্ষা করাই তাহার লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই প্রকার অহৈতুকী প্রভুভক্তি কেবল পৌরাণিক জীবনের পটভূমিকাতেই সম্ভব। যখন চরম সঙ্কট উপস্থিত হয়, তখনই পৌরাণিক নাটকে সঙ্কটত্রাতা দেবতার আবির্ভাব ঘটে, তাহার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত দেবতাও নির্বিকার হইয়া থাকেন। 'প্রফুল্ল' নাটকেও দেখা যায়, যখন জ্ঞানদা যাদবের হাত ধরিয়া গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিতেছেন—'হা ভগবান্, অদৃষ্টে এই লিখেছিলে! ভিক্ষে কত্তেও যে জানি নি, কোথায় যাব? কোথায় দাঁড়াব? সেই মুহূর্তেই প্রফুল্লর আবির্ভাব হইল, প্রফুল্ল যাদবকে খাবার কিনিয়া আনিবার পয়সা দিয়া বিপদে আশ্বাস দিল।

পৌরাণিক নাটকের ধারা অনুসরণ করিয়াই 'প্রফুল্ল' নাটকে যে এই বিষয়গুলি আসিয়াছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে।

এ কথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা প্রধানত যুগাশ্রয়ী, অর্থাৎ তাঁহার সমসাময়িক যুগ হইতেই তিনি প্রেরণা লাভ করিয়া নাটকের রূপে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। সাহিত্য যুগকে আশ্রয় করিয়াই যুগোত্তীর্ণ হইয়া যাইতে পারে সত্য, কিন্তু যুগের উপর একান্ত ভাবে যিনি নির্ভর করিয়া থাকেন, তাঁহার রচনা কিছুতেই যুগোত্তীর্ণ হইয়া যাইতে পারে না। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের মধ্যেও সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর যুগের পরিবর্তে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর অধ্যাত্মচিন্তারই বিকাশ হইয়াছে। যদি পৌরাণিক নাটকের মধ্যেই গিরিশচন্দ্র ইহা পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া থাকেন, তবে সামাজিক নাটকের মধ্যে যে তাহা একেবারেই পারিবেন না, ইহা ত নিতান্তই স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে, 'প্রফুল্ল' নাটকে তাহাই হইয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলিকাতার নাগরিক জীবন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার যৌথ পরিবারের ভিত্তি শিথিল হইয়া আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার পরিচয়টিই যে 'প্রফুল্ল' নাটকে মূলত বিধৃত হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুভব করা যায়। ইতিপূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক কালে ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' নামক বাংলার প্রথম পারিবারিক জীবনভিত্তিক উপন্যাসের ভিতর দিয়া এই ভাবটি বাংলা সাহিত্যে প্রথম

আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু তারকনাথ পল্লীজীবনের পটভূমিকায় তাঁহার কাহিনী স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহাতে যৌথ পরিবার ভাঙ্গিবার যে কারণ নির্দেশ করা হইয়াছিল, তাহা 'প্রফুল্ল' নাটক হইতে স্বতন্ত্র হইলেও ইহা দ্বারা গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'প্রফুল্ল' রচনায় যে প্রভাবিত হইয়াছিলেন, তাহা অন্যান্য বিষয় হইতেও জানিতে পারা যায়। কিন্তু তথাপি গিরিশচন্দ্র যৌথ পরিবারের বন্ধন শিথিল হইবার যে কারণটি তাঁহার 'প্রফুল্ল' নাটকে দেখাইয়াছেন, তাহাই প্রকৃত এবং যথাযথ। 'স্বর্ণলতা'-র শশিভূষণের যৌথ পরিবারটি বিনষ্ট হইবার একমাত্র কারণ একটি মাত্র চরিত্র, তাহা প্রমদা। কিন্তু একটি নূতন সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনের ব্যাপক ভিত্তির উপর গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'প্রফুল্ল' নাটকের যৌথ পরিবারের ভাঙ্গনের পরিচয়টি প্রকাশ করিয়াছেন। নব-প্রতিষ্ঠিত নাগরিক জীবনে ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবিকা উপার্জনের সূচনা হইতেই আধুনিক বাংলার যৌথ পরিবারগুলির বন্ধন শিথিল হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। 'প্রফুল্ল' নাটকের মধ্য দিয়া সেই বিষয়টিই সার্থকভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। তারকনাথের 'স্বর্ণলতা'য় তাহা নাই। এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 'প্রফুল্ল' যে বৎসর প্রকাশিত হয় (১৮৮৯), তাহার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের বাংলার পারিবারিক জীবনাশ্রিত ছোট গল্পগুলি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে নাই। সুতরাং গিরিশচন্দ্র যে রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে এই বিষয়ে কোন প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও নহে। প্রত্যক্ষদৃষ্ট নাগরিক জীবনের মধ্য হইতেই গিরিশচন্দ্র এই নাটকের বিষয়-বস্তু আহরণ করিয়াছিলেন বলিয়াই ইহার চিত্রগুলি এত জীবন্ত হইতে পারিয়াছে।

'প্রফুল্ল' নাটকের মধ্যে যোগেশের মদ্যপান ও তাহার পরিণামের যে চিত্রটি অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাও উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের বাঙ্গালীর সমাজ-জীবনের কলঙ্কস্বরূপ ছিল, ইহারও চিত্র গিরিশচন্দ্র তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত সমাজ-জীবন হইতেই লাভ করিয়াছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা', দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' ইত্যাদি রচনার পর হইতেই তদানীন্তন নাগরিক জীবনের এই কলঙ্কের কথা প্রচার লাভ করিয়া কত নাটক-প্রহসন যে রচিত হইয়াছিল, তাহার অন্ত নাই। শুধু তাহাই নহে, দেশে সমাজ-হিতকর প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া সমাজদেহের এই দুরন্ত ব্যাধি দূর করিবার প্রয়াসও দেখা দিয়াছিল। 'প্রফুল্ল' নাটকের মধ্য দিয়াও সমসাময়িক বাংলা দেশের এই মসীলিপ্ত চিত্রটি প্রকাশ করিয়া সমাজের দৃষ্টি ইহার মর্মান্তিক

পরিণতির দিকে আকৃষ্ট করা হইয়াছিল। সে দিন কলিকাতা মহানগরীর কত অন্তঃপুরই যে জ্ঞানদার মত কত হতভাগিনী পত্নীর দীর্ঘনিঃশ্বাসে বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার হিসাব কোনদিনই কেহ করিতে পারিবে না এবং এই পথেই যে কত সাজান বাগান শুকাইয়া গিয়াছে, তাহাই বা কে বলিতে পারিবে? গিরিশচন্দ্র সেদিনকার সমাজের এই রূপটিকে সুদৃঢ় ভাবে তাঁহার 'প্রফুল্ল' নাটকে আশ্রয় করিয়াছিলেন বলিয়া যোগেশের চরিত্রটি এমন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। জ্ঞানদার সংলাপেও সর্বত্রই বক্তৃতার মত সুরে মদ্যপানের নিন্দা শুনিতে পাওয়া যায়। প্রফুল্ল যখন জ্ঞানদাকে একদিন বলিল 'দিদি, তুমি খেতে দাও কেন, দিদি?' জ্ঞানদা তাহার উত্তরে বক্তৃতার মত সুরে বলিল,—'আমি কি করবো বোন, সহরে অলিতে গলিতে শুঁড়ির দোকান, কিনে খেলেই হ'লো। আহা! কোম্পানির রাজ্যে এত হ'চ্ছে, যদি মদের দোকানগুলি তুলে দেয়, তা হলে প্রাণভরে আশীর্বাদ করে, আর লোকে ভাতারপুত নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর করে।' ইহাই ছিল উনবিংশ শতাব্দীর কলিকাতার নাগরিক জীবনের চিত্র।

যোগেশ একদিন মাতলামি করিতে করিতেই বলিল, 'সাবাস, সাবাস, উকিল কি চিজ....আমার মা রত্নগর্ভা, একটি মাতাল, একটি উকিল, একটি চোর।' (২১৪)। উনবিংশ শতাব্দীতে কলিকাতার নাগরিক জীবন প্রতিষ্ঠার ফলে ইংরেজের অনুকরণে মদ্যপানের অভ্যাস সৃষ্টি হইবার সঙ্গে সঙ্গে মামলা মোকদ্দমারও সৃষ্টি হইয়াছিল; মদ এবং মোকদ্দমা দুই-ই সেদিন বাংলার পরিবার ধ্বংস করিতেছিল। মোকদ্দমার সহায়ক উকিল-মোক্তার, অর্থোপার্জনের জন্য সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠা করাই তাহাদের বৃত্তি ছিল, তাহাদের কবলে পড়িয়া সাধারণ লোক যে কি ভাবে লাঞ্ছিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, ইহার মধ্য দিয়া সেই ভাবটিও প্রকাশ পাইয়াছে। পল্লীজীবনে একদিন যে কাজ একটি বৈঠকেই পঞ্চায়েৎ কিংবা গ্রামবৃদ্ধগণ মীমাংসা করিয়া দিতেন, তাহাই উকিল-মোক্তারের কল্যাণে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর মাস, মাসের পর বৎসর ধরিয়া টানা-পোড়েন হইতে লাগিল, তাহার ফলে ভুক্তভোগীর জীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠিতে লাগিল। সমসাময়িক সমাজের এই ভাবটিই এই উক্তির মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে যাহা ট্র্যাজিডি বলিয়া পরিচিত, তাহার মধ্যে এমন একটি চরিত্র থাকে, নাটকীয় ঘটনায় তাহার দুষ্কার্যে অত্যন্ত সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার জন্যই নাটকের করুণ পরিণতি ত্বরান্বিত হইয়া থাকে, ইংরেজিতে এই

শ্রেণীর চরিত্রকে Villain বলে, বাংলায় তাহাকে খল-চরিত্র বলিয়া উল্লেখ করা যায়। 'প্রফুল্ল' যদিও পাশ্চাত্য আদর্শে রচিত ট্র্যাজিডি নহে, বরং সাধারণ বিয়োগান্তক নাটক, তথাপি ইহাতে এই শ্রেণীর একাধিক চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাদের আচরণের জন্যই নাটকের করুণ পরিণতি দ্রুততর হইয়াছে। খল চরিত্র না থাকিলে যে কাহিনীর ট্র্যাজিক পরিণতি সংঘটিত হইতে পারে না, তাহা নহে; তবে তাহা বিলম্বিত হয়; কিন্তু কাহিনীর সংক্ষিপ্ততা নাটকের একটি বিশেষ গুণ; সেইজন্য বিয়োগান্তক নাটক মাত্রেই খল চরিত্র অপরিহার্য হইয়া থাকে। 'প্রফুল্ল' নাটকে যোগেশের মধ্যম ভ্রাতা রমেশ এই অংশ গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহার কাজের সহায়ক রূপে কাঙ্গালী ও জগমণিকে লাভ করিয়াছে। ইহাদের আচরণ বিয়োগান্তক নাটকের পক্ষে কতদূর স্বাভাবিক হইয়াছে, তাহা বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক।

('প্রফুল্ল' নাটকের করুণ পরিণতির জন্য নায়ক চরিত্র যোগেশের নির্বিচার মদ্যাসক্তিই মূলত দায়ী হইলেও তাঁহারই পরিবারস্থ নিজ ভ্রাতা রমেশ তাঁহার এই দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগটুকু গ্রহণ করিয়াছে। নিজস্ব বিশেষ স্বার্থ দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই খলচরিত্র নায়কের বিরুদ্ধে অন্যায় আচরণ করিয়া থাকে। রমেশও এখানে ভ্রাতার সমস্ত সম্পত্তি নিজে একা অধিকার করিবার অভিপ্রায়েই এই অন্যায় আচরণ করিতে অগ্রসর হইয়াছে; সুতরাং ইহা বহির্মুখী বিষয়ের প্রলোভন, অন্তর্মুখী কোন বিদ্বেষ নহে। একমাত্র সম্পত্তি হস্তগত করা ব্যতীত যোগেশের বিরুদ্ধে রমেশের শত্রুতা সাধন করিবার আর কোন কারণ ছিল বলিয়া জানিতে পারা যায় না। যোগেশ কিংবা তাঁহার পরিবারস্থ অন্য কাহারও উপর তাঁহাদের কোন অন্যায় কার্যের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার কোন সঙ্কল্প হইতে যে রমেশ যোগেশের সর্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহা নহে। বরং যোগেশের সম্পর্কে তাহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কথাই তাহার মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। সে যোগেশকে বলিতেছে, 'আমায় মানুষ করেছেন, লেখাপড়া শিখিয়েছেন', (১।১); সে দাদার জন্যই 'মানুষ' হইয়াছে, লেখাপড়া শিখিয়াছে, সুতরাং দাদার বিরুদ্ধে তাহার মত লেখাপড়া জানা লোকের কোন অভিযোগ থাকার কোনও কারণ নাই। কিন্তু সহসা আবার তাহার মুখেই অকারণ ভ্রাতৃবিদ্বেষের এই বক্তৃতা শুনিতে পাই,—'ভাইয়ের চেয়ে পর কে? প্রথমে মা বখ্‌রা, তারপর বাপের বিষয় বখ্‌রা, ভাইপো হ'বেন জ্ঞাতি শত্রু! (১।৩)।' রমেশের বাপের বিষয় বলিতে কিছু ছিল না, সুতরাং তাহা বখ্‌রা

হইবার আশঙ্কা অর্থহীন, সুতরাং তাহার অভিযোগের মধ্যে কেবল মা বধূরা, আর ভাইপো জ্ঞাতিশত্রু হইবে, তাহারই আশঙ্কা। শুধু ইহাই যোগেশের বিরুদ্ধে রমেশের অভিযোগ। তারপর তাহার সঙ্কল্প এই প্রকার, 'দাদাকেও ফাঁকি দেওয়া চাই, ব্যাপারিগুলোকেও ঠকান চাই। যখন মদ ধরেছে, সই করে নেবার কথা ভাবিনি, আজই হ'ক, কালই হ'ক, সব সই করে নিচ্ছি। ....মদ আমার সহায়। আজই দাদাকে মদ খাওয়াতে হবে।' (ঐ)। এই সঙ্কল্পে রমেশ আর কোন বাধা পাইল না, তাহার সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। (খল চরিত্রের সঙ্গে নায়ক চরিত্রের শত্রুতার এখানে কোন অন্তর্মুখী বিদ্বেষমূলক কারণ ছিল না, ইহার কারণ নিতান্ত বহির্মুখী অর্থাৎ বিষয়-গত। সুতরাং মাত্র এই কারণ এত মর্মান্তিক একটি পরিণতির পক্ষে নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়াই গণ্য হইবার যোগ্য। অন্তর্মুখী বিদ্বেষ যত তীব্র, বহির্মুখী বিষয়-আশয়ের প্রতি লিপ্সা তত তীব্র নহে! বিদ্বেষ তীব্র না হইলে পরিণতির ক্রিয়া সুদূরপ্রসারী হইতে পারে না। রমেশের বিদ্বেষ এত কিছু তীব্র ছিল না, যাহার জন্য সে একসঙ্গে নিজ জননীকে উন্মাদিনী, পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সর্বনাশ, মাতৃতুল্য ভ্রাতৃবধূকে গৃহচ্যুত, ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা, এমন কি, সর্বশেষে প্রতিরোধকারিণী নিজ স্ত্রীকে হত্যা পর্যন্ত করিতে পারে। সুতরাং ঘটনার পরিণতির তুলনায় ইহার কারণ নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য।)

কাহিনীর মর্মান্তিক পরিণতি সংঘটন করিবার বিষয়ে কাঙ্গালী ও জগমণির কি স্বার্থ ছিল, তাহাও বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। যোগেশের পরিবারের সঙ্গে তাহাদের কোন পরিচয়ই ছিল না; অথচ তাহারা কেবলমাত্র রমেশের কথায় বিষ প্রয়োগ করিয়া যাদবের হত্যার আয়োজন করিয়াছে। রমেশের কথা কাঙ্গালীর শুনিবার কারণ, রমেশ তাহার পূর্ব জীবন-বৃত্তান্ত জানে, সেই পূর্বজীবনে কৃত পাপ যাহাতে প্রচার লাভ করিয়া তাহাকে দণ্ডভোগ করিতে না হয়, সেইজন্য সে আর এক নূতন পাপাচরণ করিতেছে। এক লঘু পাপ ঢাকিবার জন্য আর এক গুরুতর পাপ করিতেছে। সুতরাং ইহাকেও স্বাভাবিক বলিয়া মনে করা কঠিন। এখানেও অন্তর্মুখী বিদ্বেষ কিছুই নাই, সুতরাং তাহারও শিশুহত্যা করিবার মত পাপে লিপ্ত হইবার কোন প্ররোচনা এখানে দেখা যায় না। সুতরাং কাঙ্গালী রমেশেরই একটি ছায়ামূর্তি কিংবা প্রসারিত রূপ মাত্র, তাহার আর কোন স্বতন্ত্র পরিচয় নাই।

জগমণিকে নারী এবং কাঙ্গালীর স্ত্রী বলিয়াই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে কিন্তু

চরিত্রগুণের দিক দিয়া স্বামী-স্ত্রী উভয়েই এক। স্ত্রী হইলেই যে পাপাচারী স্বামীর অনুগামিনী হইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। সেক্সপীয়রের 'ওথেলো' নাটকে খল চরিত্র ইয়াগো পাপাচরণ করিলেও তাহার পত্নী এমিলি দুঃসাহসিকতার সঙ্গে সত্যভাষণ করিয়া দুর্বৃত্ত স্বামীর হস্তে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছে। কিন্তু এখানে জগমণির স্বাতন্ত্র্য নাই। তবে সে কোন্ স্বার্থে উদ্বুদ্ধ হইয়া শিশু-হত্যার কার্যে সাহায্য করিয়াছে? হয়ত অর্থলোভ, কিন্তু সে যদি প্রকৃত নারীই হইয়া থাকে, তবে অর্থের এই প্রলোভন ত্যাগ করিয়াও এমন জঘন্য কার্য হইতে সে দূরে থাকিত, অন্ততঃ তাহাই স্বাভাবিক নারীপ্রকৃতি। স্বাভাবিক প্রকৃতিই সাহিত্যের উপজীব্য, অস্বাভাবিক চরিত্র কদাচ তাহা নহে।

প্রতিভা কখনও অনুকরণ-জাত হইতে পারে না, ইহা সর্বদাই সহজাত। যদিও গিরিশচন্দ্রের পূর্বে যাঁহারা বাংলায় সামাজিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রামনারায়ণ তর্করত্ন এবং দীনবন্ধু মিত্রের সহজাত হাস্যরসিকের প্রতিভা ছিল; এমন কি, মাইকেল মধুসূদন দত্তও তাঁহার দুইখানি প্রহসন রচনার ভিতর দিয়া তাঁহারও এই বিষয়ক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁহার সামাজিক নাটক রচনায় বহুলাংশে ইঁহাদের প্রবর্তিত ধারাই অনুসরণ করিয়াছিলেন; তথাপি এ কথা সত্য যে, ইঁহাদের প্রত্যেকেরই হাস্যরস সৃষ্টির যে প্রতিভা ছিল, তাহা গিরিশচন্দ্র অনুকরণ করিতে পারেন নাই। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, জীবন সম্পর্কে গিরিশচন্দ্রের সর্বদাই এক গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, তাহারই ফলে কোন জিনিসকেই তিনি লঘু বা হালকা করিয়া দেখিতে পারিতেন না। অবশ্য রচনার মধ্য দিয়া হাস্যরস সৃষ্টি করিলেই যে জীবন-দৃষ্টি লঘু হইয়া যায়, তাহা নহে। রামনারায়ণ কিংবা দীনবন্ধুর নাটক যাঁহারা গভীরভাবে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, হাস্যরসের ভিতর দিয়া গভীরতম জীবনবোধেরও অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। কিন্তু গিরিশচন্দ্র সেই প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না, নাটকের মধ্যে তাঁহার হাস্যরসসৃষ্টির প্রয়াস এক স্বতন্ত্র ধারা অনুসরণ করিয়াই আসিয়াছে, সেই ধারাটি যে কি, তাহাই এখানে সন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক।

সাধারণত পৌরাণিক নাটকে গিরিশচন্দ্র বিদূষক চরিত্রের সহায়তায় হাস্যরস সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বিদূষক সংস্কৃত নাটকের বিদূষক নহে, বরং সেক্সপীয়রের নাটকের fool কিংবা clown চরিত্রের অনুরূপ। সংস্কৃত নাটকের বিদূষক এবং ইংরেজী নাটকের fool বা clown চরিত্রে পার্থক্য

আছে। সংস্কৃত নাটকের বিদূষক কাহিনীর অনিবার্য ধারা অনুসরণ করিয়া আসে না, বরং কেবলমাত্র কৌতুকরস সৃষ্টি করিবার প্রয়োজনে কাহিনী-নিরপেক্ষ হইয়াই আবির্ভূত হইয়া থাকে। গিরিশচন্দ্রের বিদূষক তেমন নহে। তাঁহার 'জনা' নাটকের বিদূষক চরিত্র কাহিনী-নিরপেক্ষ চরিত্র নহে, বরং কাহিনীর মধ্যে তাহার একটি বিশেষ সক্রিয় অংশ আছে, তাহার মধ্য দিয়া নাটকের বক্তব্য বিষয়টি সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ পাইয়াছে। অবশ্য একথা স্বীকার করিতেই হয় যে, 'জনা' নাটকে বিদূষক কিংবা হাস্যরসাত্মক কোন চরিত্র তত প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। তথাপি তাহাদের কেহই সংস্কৃত নাটকের মত সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত চরিত্র নহে।

'প্রফুল্ল' নাটক সম্পর্কে আলোচনা করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহাতেও এমন কতকগুলি চরিত্রের মাধ্যমে তিনি হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছেন, কাহিনীর মধ্যে যাহাদের অত্যন্ত সক্রিয় অংশ রহিয়াছে। অথচ একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহা বিয়োগান্তক নাটক এবং 'প্রফুল্ল' নাটকের বিয়োগান্তক রস যে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তাহাও বলিবার উপায় নাই; অবশ্য বিয়োগান্তক রসকে আমি ট্রাজিক রস বলিতেছি না। সাধারণ ভাবে বিয়োগান্তক রস বা করুণরস যে 'প্রফুল্ল' নাটকের মধ্যে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না; অথচ এ কথাও সত্য যে, কতকগুলি চরিত্রের মধ্য দিয়া তাঁহার হাস্যরস সৃষ্টিরও প্রয়াস দেখা যায়। সুতরাং নাটকের করুণ রসকে অব্যাহত রাখিয়া ইহার মধ্যে হাস্যরস তিনি কতখানি, কি ভাবে ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহা এখন বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক।

'প্রফুল্ল' নাটকে প্রধানত মদন ঘোষ, ভজহরি, জগমণি এই তিনটি চরিত্র আশ্রয় করিয়া হাস্যরসের সৃষ্টি হইয়াছে, নাট্যকাহিনীর অগ্রগতি এবং পরিণতির মধ্যে তিনটি চরিত্রেরই অংশ আছে। এই তিনটি চরিত্রের মধ্যে মদন ঘোষকে পাগল বলিয়া উল্লেখ করা আছে; তাহার মুখের কথা খাপছাড়া; পাগল চরিত্রের মধ্য দিয়া যে হাস্যরস সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহাকে নিতান্ত উচ্চস্তরের হাস্যরস বলা যায় না, কিন্তু মদন ঘোষ সেই শ্রেণীর পাগল নহে। উমাসুন্দরী তাহাকে মহাপুরুষ বলিয়াই মনে করিতেন এবং শেষ পর্যন্ত সে তাহার মহত্ত্ব দিয়া কাহিনীর একটি অতি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা নিবারণ করিল। সুতরাং ইহাকে পূর্ণাঙ্গ হাস্যরসাত্মক চরিত্র বলা যায় না এবং তাহার এই আচরণের মধ্য দিয়া যে সামান্য অসঙ্গতির কথা এখানে-সেখানে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা দ্বারা নাটকের

করুণ রস ক্ষুণ্ণ হইতে পারে নাই। নাটকের প্রথমেই উমাসুন্দরী এবং যোগেশ স্বয়ং তাহার প্রতি যে শ্রদ্ধার ভাবটি প্রকাশ করিয়াছেন এবং শেষ পর্যন্ত সে নিজে যে ভাবে যাদবকে রক্ষা করিবার কার্যে সহায়তা করিয়াছে, তাহাতে তাহার আচরণে যত অসঙ্গতিই প্রকাশ পা'ক না কেন, নাটকের করুণ রস ব্যাহত হয় নাই। বাহ্যতঃ এক হাস্যরসাত্মক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াও চরিত্রটি অন্তরের গভীরতম প্রদেশে করুণ রসের সন্ধান পাইয়া তাহাতেই পদচারণা করিয়াছে, সুতরাং সে নাটকের করুণ রস পরিপুষ্টিরই সহায়ক হইয়াছে।

তারপর ভজহরির কথা উল্লেখ করিলেও দেখা যায়, তাহারও জীবনের একটি অতি করুণ কাহিনী ছিল। তাহা তাহার নিজের ভাষাতেই শুনি, সে বলিতেছে, 'মুখ মনে কর্‌তে গেলে অনেকের মুখ মনে পড়ে। আমার ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ নয়—এক গৃহস্থ বাপ ছিল, হাস্যমুখী মা ছিল, গ্যাঁটা গোঁটা সব ভাই ছিল, বোনটা আমি না খাইয়ে দিলে খেত না; তারপর শোন, একদিন খেলিয়ে এ'সে বাড়ীতে দেখি, সব বাড়ীশুদ্ধ কাঁদ্‌ছে। কি সমাচার?—না জমিদার আমার বাপকে খুব মেরেছে, রক্ত ঝুঁঝিয়ে প'ড়্‌ছে, প্রাণ ধুক ধুক কর্‌ছে। সেই রাত্রিতেই তো তিনি মরেন; তারপর জমিদার বাহাদুর ঘরে আগুন ধরিয়ে দিলেন, ছেলে-পুলে নিয়ে মা ঠাকরুণ বেরুলেন; দেশে আকাল, ভিক্ষে পাওয়া যায় না, যা দুটি পান, আমাদের খাওয়ান, আপনি উপোস যান, এক দিন ত গাছতলায় প'ড়ে মরেন—।' তাহার মুখ হইতে এই করুণ কাহিনী শুনিবার পর তাহার মধ্য দিয়া যে হাস্যরস সৃষ্টি করা হইয়াছিল, তাহাও করুণরসে বিগলিত হইয়া গেল। সুতরাং তাহার কোনও হাস্যরসাত্মক আচরণ দ্বারাই নাটকের করুণ রস আর ক্ষুণ্ণ হইতে পারিল না। একজন সমালোচক বলিয়াছেন, এই শ্রেণীর চরিত্র 'সেক্সপীয়র রচিত Fool-এর নিকটতম প্রতিবেশী'। সেক্সপীয়রের Fool-এর মধ্যেও বাহিরের হাস্যরস দিয়া অন্তরের সুগভীর করুণ রস চাপা থাকে। পূর্বোক্ত সমালোচকের কথায় বলিতে গেলে 'দুঃখের আঘাতে কেহ সিনিক হয়, কেহ হিউমরিস্ট হয়, ভজহরি সিনিক নয়, হিউমরিস্ট। দুঃখের আলখাল্লাটা উল্টাইলেই দেখা যায় যে, সেটা বিদূষকের চাপকান। হাস্যরস ও করুণরস অদৃষ্টের যমজ সন্তান, একটু নিরিখ করিয়া দেখিলেই দু'জনের মুখের আদল ধরা পড়িবে।' ভজহরির হাস্যরসের উৎস করুণরস বলিয়াই তাহার হাস্যরসাত্মক আচরণের জন্য 'প্রফুল্ল' নাটকের করুণরস ক্ষুণ্ণ হইতে পারে নাই।

এইবার জগমণির কথা কিছু বলা প্রয়োজন; কারণ, ইহার মধ্য দিয়াও গিরিশচন্দ্র হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়াছেন, গিরিশচন্দ্রের পরিকল্পনায় জগমণি চরিত্রটি অত্যন্ত অস্পষ্ট; ইহার পরিচয় যে, সে স্ত্রী চরিত্র; কিন্তু ইহার আচরণ স্ত্রীজনোচিত নহে, ইহার আকৃতি কুৎসিত; তাহার কুৎসিত আকৃতি-প্রকৃতির প্রতি কটাক্ষ করিয়া হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস দেখা গিয়াছে। কখনও বিদ্যাধরী, কখনও রূপসী বলিয়া তাহাকে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে; ইহা যে-প্রকৃতির হাস্যরস সৃষ্টি করিয়া থাকে, তাহা অত্যন্ত স্থূল। জগমণি কাঙ্গালীর স্ত্রী বলিয়া পরিচিত হইলেও কখনও কখনও চাপ্‌রাসীর কাজ করিয়া থাকে বলিয়া মনে হয় (১ম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক)। ইহাও যে শ্রেণীর হাস্যরসের জনক, তাহাও খুব উচ্চ স্তরের বলিয়া মনে হইতে পারে না, বরং নিতান্ত গ্রাম্য স্তরের বলিয়া মনে হইবে। জগমণির কুৎসিত আকৃতি এবং বিকৃত প্রকৃতির জন্য ক্রমে ক্রমে তাহার বিরুদ্ধে ঘৃণা বা জুগুপ্সার ভাব পুঞ্জীভূত হইতে থাকে, অকৃত্রিম হাস্যরস তাহাকে আশ্রয় করিয়া কিছুতেই সৃষ্টি হইতে পারে না। জীবনাচরণের ছোট বড় অসঙ্গতি হাস্যরসের আশ্রয়, যেখানে জীবনাচরণ বাস্তব নহে,—বিকৃত এবং অবাস্তব, সেখানে যাহা সৃষ্টি হয়, তাহা হাস্যরস নহে। জগমণি চরিত্রের আচরণের মধ্যে এমন কতকগুলি অসঙ্গতি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে ইহার মধ্যে একটি বিকৃত মানসিকতারই পরিচয় পাওয়া যায়, কোন সুস্থ এবং স্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি হইতে পারে না। জগমণির চরিত্র শেষ পর্যন্ত শিশু-হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে, সুতরাং যে হাস্যরসাত্মক পরিমণ্ডল তাহার আকৃতি এবং প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাও শেষ পর্যন্ত অন্তর্হিত হইয়া গিয়া তাহার বিরুদ্ধে ঘৃণার ভাব দুর্জয় হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং নিরবচ্ছিন্ন হাস্যরস তাহাকে অবলম্বন করিয়াও সৃষ্ট হইতে পারে নাই, সুতরাং ইহা দ্বারাও 'প্রফুল্ল' নাটকের সুনিবিড় করুণ রস কোথাও তরলায়িত হইয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই।

সুতরাং দেখা গেল, 'প্রফুল্ল' নাটকে যথার্থ হাস্যরসাত্মক চরিত্র বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা নাই; আপাতদৃষ্টিতে যে সকল চরিত্র হাস্যরসাত্মক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহারা ভিতরের দিক হইতে কেহ স্বার্থ-তাড়িত, কেহ বেদনা-পীড়িত, কেহ বা আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ। সুতরাং ইহাদের দ্বারা নাটকের করুণ রস পরিপুষ্টিরই সহায়তা হইয়াছে, কোন দিক দিয়াই তাহা তরলায়িত হইতে পারে নাই।

গিরিশচন্দ্র সচেতন ভাবে যে 'প্রফুল্ল' নাটকের করুণ রস অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য হাস্যরসকে ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিতে দেন নাই, তাহা নহে;

তিনি ইচ্ছা করিলেই হাস্যরসকে প্রাধান্য দিতে পারিতেন না; কারণ, ইহা তাঁহার প্রতিভার অনুকূল ছিল না। পূর্বেই বলিয়াছি, প্রথমত জীবন সম্পর্কে তাঁহার যে গুরুত্ববোধ ছিল, তাহাই তাঁহার মধ্যে পূর্ণাঙ্গ হাস্যরসাত্মক নাটক সৃষ্টির অন্তরায়; তারপর যে সুগভীর জীবন-দৃষ্টি হইতে হাস্যরসের মধ্য দিয়াও করুণ রসের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, গিরিশচন্দ্রের সে জীবনদৃষ্টিরও অভাব ছিল। এমন কি, ভজহরির মুখ দিয়া যে কথা তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার আচরণের মধ্য দিয়া তাহা প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

গিরিশচন্দ্রের যেমন একটি সুস্পষ্ট আধ্যাত্মিক বোধ ছিল, পারিপার্শ্বিক বাস্তব সমাজ-সম্পর্কে তাঁহার তেমন কোন বিশিষ্ট ধারণা ছিল না। বাস্তব পরিবেশের আলোচনা তিনি 'নর্দমা ঘাঁটা' বলিয়া মনে করিতেন। গিরিশচন্দ্র একবার অমৃতলাল বসুকে বলিয়াছিলেন, 'এসব realistic বিষয় নিয়ে নাটক লেখা আর নর্দমা ঘাঁটা এক'। ব্যবসায়িক প্রয়োজনের অনুরোধে তাঁহাকে কয়েকখানি সামাজিক নাটক রচনা করিতে হইলেও, তিনি যে তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভার সহজ প্রেরণায় তাহা রচনা করেন নাই, তাহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। যদিও উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাংলার কয়েকজন মনীষী এদেশের হিন্দুসমাজ সম্পর্কে নানা দিক হইতে গভীর ভাবে ভাবিয়া দেখিতে-ছিলেন, তথাপি গিরিশচন্দ্রের দৃষ্টি সে দিকে আদৌ আকৃষ্ট হয় নাই। তাঁহার প্রতিভা ছিল ভাবমুখী, বস্তুমুখী নহে; সেইজন্য সমাজসংস্কার সম্পর্কে তিনি বিশিষ্ট কোন মতবাদ প্রচার করিতে যান নাই। হিন্দুর সমাজ-জীবনের সনাতন আদর্শের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন, সীতা এবং সাবিত্রীকেই তিনি স্ত্রীজাতির আদর্শ বলিয়া মনে করিতেন, উনবিংশ শতাব্দীর স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি তাঁহার সহানুভূতি ছিল না। কয়েকটি সামাজিক বিষয়-সম্পর্কে নাটক রচনা করিবার জন্য বন্ধুবান্ধব ও কোন কোন সমাজ-সংস্কারক কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া যে কয়খানি নাটক তিনি রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের কাহারও সঙ্গে তাঁহার রচিত পৌরাণিক নাটকের তুলনা হইতে পারে না; তাঁহার সামাজিক নাটক কয়খানি অপেক্ষাকৃত হীনপ্রভ হইয়া আছে।

ইংরেজী সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া এদেশের শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে সর্বপ্রথম আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধের জন্ম হইল। ভারতীয় হিন্দুর সামাজিক জীবনের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য সমাজের আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধের মৌলিক বিরোধ আছে। আত্মবোধ লুপ্ত করিয়াই হিন্দুর সামাজিক জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে। অতএব

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যে সকল মনীষী সমাজসংস্কারে মনোযোগী হইয়াছিলেন, তাঁহারা হিন্দুর সামাজিক আদর্শের এই মৌলিক তত্ত্বটি বিস্মৃত হইয়া এই দেশের সমাজের উপর পাশ্চাত্ত্য আদর্শেরই প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র এই দলের লোক ছিলেন না; তিনি ছিলেন প্রাচীনপন্থী; সেইজন্যই সমাজ-সম্পর্কে তিনি নূতন করিয়া কিছু ভাবিয়া দেখিতে যান নাই। এক কথায় বলিতে গেলে প্রত্যক্ষ সমাজ তাঁহার লক্ষ্য ছিল না, তাঁহার লক্ষ্য ছিল আধ্যাত্মিক আদর্শ। সেইজন্য বাংলার সমাজ-জীবন হইতে যথার্থ রস তিনি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। বিশেষত গিরিশচন্দ্রের সামাজিক অভিজ্ঞতা ছিল নিতান্ত সীমাবদ্ধ। অনুভূতির দ্বারা ভাবলোকের পরমতম ঐশ্বর্য লাভ করিতে পারা যায়, কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকিলে বস্তুলোকের রসের সন্ধান পাওয়া যায় না। সেইজন্য দেখিতে পাওয়া যায়, যে গিরিশচন্দ্র ভাব-স্বর্গের বহু ঊর্ধ্বে আরোহণ করিয়া অমরাবতীর সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাবে বাংলার ধূলিমাটির উপর একখানিও খেলাঘর সার্থকভাবে রচনা করিতে পারেন নাই। কারণ, ধূলার জগতে স্বপ্নের প্রভাব সীমাবদ্ধ।

ইব্‌সেনের নাটকে যে গভীর সমাজ-চেতনা এবং সনাতন সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যক্তি-মানসের সুতীব্র বিদ্রোহের ভাব দেখা যায়, গিরিশচন্দ্রের নাটকে তাহা নাই। ইব্‌সেনে দ্বন্দ্ব অন্তর্মুখী, গিরিশচন্দ্রের নাটকে দ্বন্দ্ব কেবল বহির্মুখী; সেক্সপীয়রের নাটকে দ্বন্দ্ব অন্তর্মুখী এবং বহির্মুখী উভয়ই; বাংলার বিভিন্নমুখী সামাজিক জীবনের বিচিত্র রূপ ও রসের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় না থাকিবার জন্য তাঁহার নাটকে ইহার কেবল একটি দিকেরই পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে—তাহা ইহার বহির্মুখী সমস্যার দিক। এই সমস্যাগুলির গুরুত্বে তাঁহার সামাজিক নাটকগুলি অত্যন্ত ভারাক্রান্ত। গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকগুলির ব্যর্থতার পশ্চাতে রহিয়াছে সমাজ-সম্পর্কে এই অভিজ্ঞতার দৈন্য। নানা ছোট বড় অসঙ্গতি, অসামঞ্জস্য, অভাব-অভিযোগের ভিতর দিয়াও জীবনের রস নানা দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া যে বিচিত্র রঙের রামধনু সৃষ্টি করিতেছে, গিরিশচন্দ্র তাঁহার নাটকের ভিতর দিয়া তাহার পরিচয় দিতে পারেন নাই। সেইজন্য দেখা যায়, বাস্তব জীবনের প্রতি কোনও মমত্ব কিংবা কৌতূহল তিনি জাগাইয়া তুলিতে ব্যর্থকাম হইয়াছেন। অথচ নাট্যকারের ইহাই প্রধান কর্তব্য। সেক্সপীয়র কিংবা কালিদাস এই বাস্তব জীবনকে উপেক্ষা

করেন নাই বলিয়াই কালোত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছেন। গিরিশচন্দ্রের এই শ্রেণীর নাটকের এই একটি অতি বড় অভাব সহজেই অনুভব করা যায়। জীবন ত কেবল সমস্যার বিষয় নহে—ইহার একটি নিবিড় ভোগের দিকও আছে, এই ভোগের মধ্যে ইহার সৌন্দর্য ও রস অনুভূত হইয়া থাকে। গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকে জীবনের এই ভোগের কথা নাই—বহি-র্বিক্ষোভের কথাই আছে। বহিরঙ্গনে যেখানে মারামারি কাটাকাটি চলিতেছে, সেখানে গিরিশচন্দ্র লেখনী লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি অন্তঃ-পুরের দ্বার ঠেলিয়া সূক্ষ্ম হৃদয়লীলার তীব্র ঘাত-প্রতিঘাত দেখিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই! অথচ বিক্ষোভের ভিতর দিয়া রস বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, ভোগের ভিতর দিয়া তাহা নিবিড় হইয়া থাকে। যেখানে রসের নিবিড়তা নাই, সেখানে রিক্ততার হাহাকার দেখা দেয়। এই ধারণার অভাবে সামাজিক রীতিনীতি, বিধিসংস্কার প্রভৃতির ঘূর্ণ্যমাণ আবর্তে সাধারণ নরনারীর জীবন কি ভাবে আবর্তিত হইতে থাকে, মানুষের ধর্মবোধ নীতিবোধের সহিত তাহার দুর্দম কামনা এবং দুর্বার প্রবৃত্তির কি রকম নিদারুণ সংগ্রাম অহরহ ঘনাইয়া উঠে, তাহার পরিচয় গিরিশচন্দ্রের এই শ্রেণীর নাটকে দুর্লভ। সেই কারণেই তিনি এতগুলি বাংলা নাটক লেখা সত্ত্বেও একখানিও সার্থক সামাজিক নাটক কিংবা প্রহসন রচনা করিতে পারেন নাই। (যদিও সামাজিক নাটক রচনায় গিরিশচন্দ্র দীনবন্ধুকে অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন সত্য, তথাপি তিনি দীনবন্ধুর সৃষ্টিধর্ম আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহার তীব্র অধ্যাত্মবোধ তাঁহার সামাজিক জীবনদর্শনে দুরপনেয় বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল। নাট্যকার যদি দার্শনিক হন, তাহা হইলে এই ত্রুটি নিতান্তই অপরিহার্য হইয়া উঠে।

সম্মুখে বাঁধাধরা একটি আদর্শ লাভ করিলে তাহা অবলম্বন করিয়া গিরিশচন্দ্র যত সার্থক নাটক রচনা করিতে পারিতেন, স্বাধীন রচনায় সে কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। ইহার কারণ, নাট্যোল্লিখিত ঘটনা-প্রবাহ প্রথম হইতে নিয়ন্ত্রিত করিয়া লওয়া তাঁহার পক্ষে অনেক সময় সম্ভব হইত না। এইজন্য তাঁহার সামাজিক নাটকের শেষাঙ্কগুলি দীনবন্ধুর নাটকের মতই ঘটনাধারা অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িত—অবশ্য এই বিষয়েও তিনি দীনবন্ধুকেই আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়া ছিলেন। কিন্তু পৌরাণিক কিংবা ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে গিরিশচন্দ্রের এই ত্রুটি প্রকাশ পায় নাই। কারণ, পৌরাণিক কাহিনীসমূহের

একটি নির্দিষ্ট ধারা থাকিত; পূর্বেই বলিয়াছি, গিরিশচন্দ্র তাহার ব্যতিক্রম করিতেন না—অতি সন্তর্পণে সেই পথ ধরিয়াই অগ্রসর হইয়া যাইতেন। পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে গিরিশচন্দ্রের যদি মূল বিষয়ের প্রতি এই আনুগত্য না থাকিত, তবে তিনি তাহাদের রচনায় তাঁহার সামাজিক নাটকগুলির মত ব্যর্থকাম হইতেন। তাঁহার জীবনী-বিষয়ক ঐতিহাসিক নাটকগুলি সম্বন্ধেও এই কথাই প্রযোজ্য—সেইজন্য এই সকল নাটক রচনায় তিনি অধিকতর সাফল্যলাভ করিয়াছেন। একমাত্র এই কারণেই তিনি যে একখানি মাত্র অনুবাদ নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতেই সর্বাধিক সাফল্য লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সেক্সপীয়রের অনুবাদ 'ম্যাক্‌বেথ' নাটকখানি কেবলমাত্র তাঁহার একখানি শ্রেষ্ঠ রচনা নহে—বাংলা সাহিত্যের একখানি শ্রেষ্ঠ অনুবাদ রচনা। গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা-সম্পর্কে গভীরভাবে আলোচনা করিতে হইলে এই বিষয়টি উপেক্ষা করা চলে না। ঘটনা-প্রবাহ যথাযথ নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহা স্বাভাবিক পরিণতির পথে অগ্রসর করিয়া দেওয়া নাট্য-শিল্পীর একটি প্রধান লক্ষ্য। যাহাতে অবান্তর প্রসঙ্গ ইহার মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিতে না পারে, ঘটনা-প্রবাহ লক্ষ্যহীন হইয়া না যায়, গৌণ বিষয় প্রাধান্য না পায়, এই সকল বিষয়ে নাট্যকারকে অত্যন্ত সতর্ক হইয়া চলিতে হয়। যে সকল রোমান্টিক ও সামাজিক নাটক গিরিশচন্দ্রের স্বাধীন রচনা, তাহাদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র এই সতর্কতা অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন, এমন কথা বলিতে পারা যায় না।

মস্তিক অপেক্ষা হৃদয়কেই গিরিশচন্দ্র প্রাধান্য দিয়াছেন, সেইজন্য হৃদয়াবেগের প্রাবল্যে অনেক সময় তিনি যুক্তির বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। কাহিনীর পরিবর্তে ভাবই তাঁহার লক্ষ্য ছিল, একটি বিশেষ ভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া সেইজন্যই তাঁহার কাহিনী অনেক সময় লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

গিরিশচন্দ্র সামাজিক নাটকগুলিতে সমসাময়িক বাংলার বহির্মুখী সামাজিক সমস্যা, যেমন মদ্যপান, পণপ্রথা, বিধবাবিবাহ ইত্যাদির নিন্দা করিয়াছেন। এই সকল সমস্যা সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র নিজে যে সর্বদা দুশ্চিন্তা পোষণ করিতেন, তাহা নহে। কোন সামাজিক সমস্যাই তাঁহার চিত্ত কোনদিন অধিকার করে নাই; কারণ, তিনি সমাজ-সংস্কারক ছিলেন না, সামাজিক সমস্যামূলক বিষয়-সম্পর্কে সমসাময়িক নেতৃবৃন্দ যাহা ভাবিতেন, তাঁহার নাটকের মধ্যে তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র। এমন কি, তিনি

অন্ত কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াও এই শ্রেণীর নাটক রচনা করিয়াছেন। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, সামাজিক নাটক রচনার ভিতর দিয়া গিরিশচন্দ্রের সহজ প্রতিভার স্বাভাবিক বিকাশ হয় নাই। তবে তিনি যে গতানুগতিকতার স্রোতে গা ভাসাইয়া চলিতেন না, তাহার প্রমাণ এই যে, তিনি বিধবা-বিবাহ আন্দোলনকে সমর্থন করেন নাই, তাঁহার 'শাস্তি ও শাস্তি' তাহার প্রমাণ। আত্মবোধ বিসর্জন দিয়া তিনি কোন সামাজিক আন্দোলনকে সমর্থন করেন নাই। ভারতীয় স্ত্রীজাতির সনাতন আদর্শে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন, 'প্রফুল্ল' তাহারই প্রমাণ।

কিন্তু 'প্রফুল্ল' নাটককে পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক বলিতে পারা যায় কি না, তাহাও বিবেচনার বিষয়। ইহাকে পারিবারিক নাটক বা পারিবারিক সমস্যামূলক নাটক বলিয়া গ্রহণ করা যায় কি না, তাহাও বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক।

সামাজিক এবং পারিবারিক নাটকের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কি? সাধারণত দেখা যায়, বৃহত্তর সামাজিক সমস্যা লইয়া রচিত নাটককেই সামাজিক নাটক বলা যায়; যেমন রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুল-সর্বস্ব', উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা-বিবাহ' ইত্যাদি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক। কিন্তু দীনবন্ধুর 'নীল-দর্পণ' নাটক সেই প্রকৃতির নহে; কারণ, ইহাতে নাট্যকাহিনী একটি বৃহত্তর সামাজিক সমস্যার মধ্যে জন্মলাভ করিলেও, তাহা শেষ পর্যন্ত একটি পারিবারিক ঘটনার মধ্যে সীমায়িত হইয়া পড়িয়াছে। একটি কিংবা দুইটি বিশেষ পরিবারের উপর ইহার কার্যকারিতা সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিবার ফলে যে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যাটির ইহাতে অবতারণা করা হইয়াছিল, তাহার শক্তি ইহাতে লাঘব হইয়াছে। ঐতিহাসিক কিংবা পৌরাণিক কাহিনী বা চরিত্র না থাকিয়া যদি নাটকে কোন সামাজিক কাহিনী কিংবা চরিত্র থাকে, তবেই তাহাকে সামাজিক নাটক বলা হয়, তবে অবশ্য 'নীলদর্পণ'কে পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক বলিয়াও স্বীকার করা যায়। কিন্তু তাহা হইলে পারিবারিক নাটকে এবং সামাজিক নাটকে কোন পার্থক্য থাকে না। অথচ সামাজিক এবং পারিবারিক নাটকের পার্থক্যের উপর লক্ষ্য করিয়াই আমি এখানে 'প্রফুল্ল' কোন্ শ্রেণীর নাটক, তাহা বিচার করিতে চাই। কারণ, দেখা যাইবে, বাহিরের দিক হইতে ইহাদের মধ্যে যে ঐক্যই থাকুক না কেন, ভিতরের দিক হইতে ইহাদের মধ্যে অনৈক্যও কম নাই।

এখন 'প্রফুল্ল' নাটকের মধ্যে কোনও বৃহত্তর সামাজিক সমস্যার অবতারণা করা হইয়াছে, না একান্ত একটি পরিবারিক সমস্যাকেই রূপায়িত করা হইয়াছে, তাহাই বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায়, যোগেশের নির্বিচার মদ্যপানের ফলে তাহার পরিবারটি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। যোগেশ পূর্ব হইতেই মদ্যপান করিতেন, ইহার জন্য তিনি পত্নীর অনুযোগভাজন হইয়াছেন। সহসা ব্যাঙ্ক ফেল পড়িবার সংবাদ পাইয়া তিনি মদ্যপানের মাত্রা বাড়াইয়া দেন, তাহার ফলেই তাহার পরিবারের সর্বনাশ হয়। এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, মদ্যপান একটি বৃহত্তর সামাজিক সমস্যা হইলেও এই নাটকের মধ্যে যে ভাবে যোগেশের মদ্যাসক্তির কথা প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার এই দুর্বলতা বৃহত্তর সমাজকে স্পর্শ করে নাই, ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনাচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়াছিল। অর্থাৎ যোগেশের মদ্যাসক্তির ফলে কেবল মাত্র তাঁহার পরিবারটি ধ্বংস হইয়া গেলেও, তাঁহার জীবনের এই কু-অভ্যাস তাঁহার পরিবারের বাহিরে আর কাহাকেও কোন দিক দিয়া আঘাত করিতে পারে নাই। মদ্যপান যোগেশের একটি ব্যক্তিগত চারিত্রিক ত্রুটি, তাঁহার চারিত্রিক এই ত্রুটি তাঁহার পরিবারের মধ্যেও আর কেহই অনুকরণ পর্যন্ত করে নাই; সুতরাং তাঁহার ত্রুটি তাঁহার নিজেরই সর্বনাশ করিয়াছে, ইহাতে অন্যের কিছু ক্ষতি হয় নাই। শুধু মদ্যপানই নহে, যোগেশের চরিত্রের আর একটি দুর্বলতা ছিল, তাহা তাঁহার সুনাম রক্ষার প্রতি অতিমাত্রায় সতর্কতা। তাঁহার সুনামের উপর আকস্মিক একটি আঘাত বাহির হইতে আসিয়া পড়িবার জন্য তিনি আর নিজের মধ্যে নিজেকে স্থির রাখিতে না পারিয়া যে কু-অভ্যাস তাঁহার মধ্যে পূর্ব হইতেই জন্মলাভ করিয়াছিল, তাহার স্রোতেই গা [illegible] দিলেন। অর্থাৎ মদ্যাসক্তি তাঁহার পতনের সহায়ক হইল মাত্র। সুতরাং 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' কিংবা 'বিধবা-বিবাহ' নাটকের মধ্যে যেমন বিভিন্ন পরিবারের বিভিন্ন চরিত্রের উপর কতকগুলি সামাজিক কুপ্রথার প্রতিক্রিয়া দেখাইয়া হিন্দু সমাজকে ইহাদের জন্য দায়ী করা হইয়াছে, 'প্রফুল্ল' নাটকে তেমন করা হয় নাই। যোগেশের পতনের জন্য ইহাতে কোন সামাজিক প্রথাকেই দায়ী করা হয় নাই এবং, এমন কি, মদ্যপানও তাঁহার চরিত্রের একান্ত ব্যক্তিগত ত্রুটি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না; সুতরাং যোগেশের সর্বনাশের জন্য যোগেশ নিজে ব্যতীত আর কেহ দায়ী নহে। অতএব সামাজিক নাটকের সাধারণত যে সকল লক্ষণ দেখা যায়, 'প্রফুল্ল' নাটকের মধ্যে সে লক্ষণ নাই।

গিরিশচন্দ্রের 'বলিদান' নাটকের মধ্যে একটি বৃহত্তর সামাজিক সমস্যার অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা পণপ্রথা। এই বহির্মুখী সামাজিক প্রথাটিই 'বলিদানে'র কাহিনীকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, কোন ব্যক্তিগত চরিত্রের দোষত্রুটি দ্বারা ইহার কাহিনী নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। সুতরাং 'বলিদান'কে পারিবারিক নাটক বলিয়া উল্লেখ করিতে পারা যায় না; কারণ, কাহিনীর পরিণতির জন্ত পরিবারের ব্যক্তিবিশেষ সেখানে দায়ী ছিল না—একটি সামাজিক প্রথাই বিশেষভাবে দায়ী ছিল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, যেখানে বাহিরের কোন সামাজিক প্রথা নাট্যকাহিনীকে নিয়ন্ত্রিত করে, নাটকীয় চরিত্রগুলি সেই প্রথার ক্রীড়নক রূপে আচরণ করে, সেইখানেই নাটক যথার্থ সামাজিক নাটক বলিয়া পরিচিত হইতে পারে। 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' সেই শ্রেণীর নাটক; কিন্তু 'প্রফুল্ল' সেই শ্রেণীর নাটক নহে। 'প্রফুল্ল'কে পারিবারিক নাটকেরই অন্তর্ভুক্ত করিতে হয়।

'প্রফুল্ল' নাটকের সমগ্র ঘটনা একটি মাত্র পরিবারের মধ্যেই আদ্যোপান্ত সীমাবদ্ধ রহিয়াছে; এমন কি, একাধিক পরিবারের মধ্যেও তাহা বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। বাহিরের কোন আঘাত ইহার কোন চরিত্রেরই সুখ-দুঃখকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে নাই। পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যেই একজন আর একজনকে আঘাত করিয়াছে এবং এই আঘাত-প্রত্যাঘাতের ফলাফল একটি পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া আছে। 'নীলদর্পণ' নাটকের মধ্যে যে দুইটি পরিবারের কথা আছে, তাহাদের উভয়ের উপরই আঘাত বাহির হইতে আসিয়াছে, পরিবারস্থ কোন চরিত্র দ্বারা সেই আঘাতে সহায়তা করা হয় নাই। 'নীলদর্পণে' প্রত্যেক পরিবারস্থ সকলে মিলিয়া যেন একটি অখণ্ড চরিত্র; কিন্তু 'প্রফুল্ল' নাটক তাহা নহে, ইহার আঘাত ভিতর হইতে আসিয়াছে বলিয়া ইহার পরিবারস্থ প্রত্যেকটি চরিত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীন আচরণ করিয়া নাট্যকাহিনীর পরিণতিকে করুণ করিয়া তুলিয়াছে। ইহাতে নায়ক চরিত্র যোগেশই যে কেবল আঘাত করিয়া পরিবারটি চূর্ণবিচূর্ণ করিয়াছেন, তাহা নহে, ইহাতে রমেশও ইহার বিনাশের কার্যে সক্রিয় অংশ লইয়াছে, সুরেশেরও ইহাতে যে কিছুই দান নাই, তাহাও নহে—সুরেশ তাহার দুষ্প্রবৃত্তি দ্বারা কাহিনীকে দুর্গতির পথে অগ্রসর করাইয়া দিয়াছে। সুতরাং একটি পরিবারেরই কয়েকটি নরনারীর আচার-আচরণের মধ্য দিয়া ইহার নাট্যকাহিনী রূপ লাভ করিয়াছে; ইহাতে বহির্জগতের কোন আঘাত আসিয়া লাগিতে পারে নাই।

কিন্তু এমন কথা যদি কেহ মনে করেন যে, ব্যাঙ্ক ফেল হওয়া ত একটি বহির্মুখী ঘটনা, ইহাকে রোধ করিবার ত পরিবারস্থ কাহারও কোন অধিকার ছিল না; সুতরাং এই দিক দিয়া বিচার করিলে ইহাকে একান্ত পারিবারিক নাটকই বা কি ভাবে বলা যাইতে পারে? ব্যাঙ্ক ফেল হওয়া বহির্মুখী ঘটনা সত্য, কিন্তু এই বহির্মুখী ঘটনার বিরুদ্ধেও পরিবারস্থ ব্যক্তি অর্থাৎ যোগেশ যদি প্রকৃতিস্থ থাকিয়া সেই অবস্থার সম্মুখীন হইতেন, তবে তাঁহার পারিবারিক বিপর্যয় হইতে তিনি রক্ষা পাইতেন। এমন কি, ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার দুর্ঘটনা দ্বারাই এত বড় একটা সমৃদ্ধ পরিবারের এই প্রাণঘাতী সর্বনাশ হইত না। পরিবারটি দরিদ্র হইয়া যাইতে পারিত,—রমেশ এটর্নি হইয়াছিল, সুতরাং তাহারও কোন কারণ ছিল না,—তথাপি এই প্রকার নির্বিচার প্রাণনাশ হইবার কোনও কারণ ছিল না। বিশেষত ব্যাঙ্ক যে প্রকৃতপক্ষে 'ফেল'ও হয় নাই, পনর দিন পর 'রিকভর' করিয়াছে, নাট্যকার তাহাও আমাদিগকে জানাইয়াছিলেন। কিন্তু নীলকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধেই হউক কিংবা 'বলিদানে'র পণপ্রথার বিরুদ্ধেই হউক পরিবারস্থ কাহারও ব্যক্তিগতভাবে কিছু করিবার শক্তি ছিল না।)

পূর্বেই বলিয়াছি, গিরিশচন্দ্র বাঙ্গালীর প্রাচীন জীবনধারার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বাণিজ্য এবং শিল্পকেন্দ্রিক নাগরিক জীবনের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এদেশের সমাজ হইতে যৌথ পরিবারের সকল বন্ধন শিথিল হইয়া যাইতে আরম্ভ করিলেও তিনি তাঁহার 'প্রফুল্ল' নাটকের মধ্যে যৌথ পরিবারের যে যথার্থ শক্তিটি কোথায় নিহিত, তাহা নির্দেশ করিয়াছেন। ইতিপূর্বে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'সরলা'র মধ্য দিয়া বাংলার যৌথ পরিবারের ভাঙ্গনের পরিচয়টি তিনি নাটকের মধ্যে প্রথম প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন সত্য, তথাপি বাঙ্গালীর যৌথ পরিবার প্রকৃতপক্ষে নাগরিক জীবনের মধ্যে আসিয়াই বিপর্যস্ত হইয়াছে; যতদিন পল্লী-জীবনাশ্রিত ছিল, ততদিন ইহার মধ্যে শৈথিল্য দেখা দিতে পারে নাই। সেইজন্যই 'স্বর্ণলতা'র যৌথ পরিবারের সমস্যা হইতে 'প্রফুল্ল'র যৌথ পরিবারের সমস্যা আরও বাস্তব। \যৌথ পরিবার-জীবনকেই গিরিশচন্দ্র আদর্শ মনে করিয়াছিলেন বলিয়াই যোগেশের মুখে এ কথা।তিনি বলিয়াছেন যে, আয় দায় সমস্ত শোধ করিয়া ব্যাঙ্কে যে অর্থ অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা তিন ভায়ের মধ্যে তিন ভাগ হইবে। যোগেশকেও গিরিশচন্দ্র প্রাচীন আদর্শে বিশ্বাসবান্ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন; সেইজন্য জননীর প্রতি

ভক্তি, কনিষ্ঠদিগের প্রতি দায়িত্ববোধ ইত্যাদি আদর্শ গৃহস্থের সকল কর্তব্যই তাহাকে দিয়া তিনি পালন করাইতে গিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত তাঁহার এটর্নি ভ্রাতা নিজে স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া তাহার সকল সঙ্কল্পকেই ব্যর্থ করিয়া দিল। জননী উমাসুন্দরী, যোগেশ এবং পরিবারের দুইটি বধূ সকলে মিলিয়া যৌথ পরিবারটি রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন, কিন্তু একমাত্র শিক্ষিত এটর্নির ষড়যন্ত্রের সম্মুখে সকলই বিনষ্ট হইয়া গেল।

নাগরিক জীবনের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই যে বাংলার যৌথ পরিবারগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল, তাহার অর্থনৈতিক এবং মনস্তত্ত্বগত কারণ ছিল। কৃষিভিত্তিক পল্লীসমাজের মধ্যে সেই সকল কারণের উদ্ভব হয় নাই। যোগেশের পরিবারের মধ্যেই দেখা যায়, যোগেশ একা পরিশ্রম করিয়া বিত্ত সঞ্চয় করিয়াছেন, একটি ভাইকে 'মানুষ' করিয়াছেন, আর একটিকে মানুষ করিতে গিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন; সে জননীর স্নেহাধিক্যে কেবল নিষ্কর্মা জীবনই যাপন করে না, অর্থের অপচয়ও করে। যৌথ পরিবারের মধ্যে এই শ্রেণীর নিষ্কর্মা চরিত্রই চক্ষুঃশূল হয়। মূলত তাহাদিগকে কেন্দ্র করিয়াই যৌথ পরিবারের ভাঙ্গনের সূচনা দেখা দেয়। কারণ, নাগরিক জীবনে একজনের আর্থিক আয় অনুযায়ী তাহার জীবনের মান এক স্তরে গঠিত হয়। এক পরিবারে বাস করিতে গিয়া উপার্জনশীল ভ্রাতা এবং তাহার স্ত্রীপুত্রগণ সুখস্বাচ্ছন্দ্যের যে স্তরে থাকিবে, নিষ্কর্মা ভ্রাতাও যদি তাহার স্ত্রীপুত্র লইয়া সেই স্তরেই বাস করিতে চায়, তবে যথার্থ পারিবারিক অসন্তোষের কারণ হয়। গিরিশচন্দ্র এইভাবে খুঁটিনাটি করিয়া যোগেশের যৌথ পরিবারের ভাঙ্গনটি বিশ্লেষণ করিয়া দেখান নাই সত্য, তথাপি সুরেশের চরিত্রের যে রূপটি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মধ্য দিয়া ইহার ইঙ্গিতটি গোপন করেন নাই। পরিবারস্থ স্ত্রীচরিত্রের স্বার্থত্যাগ এবং সর্বত্র সমদর্শিতার গুণেই যে যৌথ পরিবার রক্ষা পায়, তাহাই অনুভব করিয়া গিরিশচন্দ্র ইহার স্ত্রীচরিত্রগুলি এবং বিশেষত প্রফুল্ল চরিত্রটিকে আদর্শ করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। প্রফুল্ল চরিত্র এবং নাটকের নামকরণ বিষয়টি আলোচনা সম্পর্কে বিষয়টি বিস্তৃততর ভাবে আলোচনা করিব।

কেহ কেহ এমনও মনে করিয়াছেন যে, 'স্বর্ণলতা'র প্রেরণা বশতই হউক, কিংবা সমাজের কল্যাণকামী রূপেই হউক বাঙ্গালার যৌথ পরিবারের ভাঙ্গনের রূপটি প্রত্যক্ষ করাইবার জন্যই গিরিশচন্দ্র তাঁহার সামাজিক নাটক

'প্রফুল্ল' রচনা করিয়াছেন। কিন্তু নাটকটি পাঠ করিলে ইহার মধ্য দিয়া যে বিশেষ কোন মত প্রচারিত হইয়াছে, তাহা মনে হইবে না; তবে এ কথা সত্য, একটি যৌথ পরিবারের জীবনকে আশ্রয় করিয়া তিনি তাঁহার নাট্য-কাহিনী রচনা করিয়াছেন এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কলিকাতার সমাজে যৌথ পরিবারের যে রূপ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহারই একটি বাস্তব রূপ তিনি ইহার মধ্যে তুলিয়া ধরিয়াছেন। ইহার মধ্য দিয়াই সমস্যাটি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার বিশেষ মতবাদ প্রচারের জন্য তাহা হয় নাই।

এ কথা সত্য, মদ্যপানের নিন্দাই হোক, কিংবা যৌথ পরিবারের ভাঙ্গনের রূপই হোক, ইহাদের কিছুই 'প্রফুল্ল' নাটকের লক্ষ্য ছিল না; তবে ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়া কয়েকটি জীবনের করুণ পরিণতির কথা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে; এমন কি, গিরিশচন্দ্রের কোন কোন পৌরাণিক নাটকের মধ্যে নিয়তি বা অদৃষ্ট একটি প্রধান অংশ অধিকার করিলেও, ইহার মধ্যে তাহারও কোন পরিচয় প্রকাশ পায় নাই।

দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল-দর্পণে'র মত গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল'ও কোন উদ্দেশ্য-মূলক রচনা কি না, তাহাও আলোচনা করিয়া দেখিবার বিষয়। কারণ, একথা অনেকেই জানেন, একদিকে 'নীল-দর্পণ' নাটকের অভিনয় এবং অপর দিক দিয়া তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস 'স্বর্ণলতা'র নাট্যরূপ 'সরলা' দ্বারা প্রভাবিত হইয়া গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'প্রফুল্ল' নাটক রচনা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে 'নীল-দর্পণ' নাটকের উদ্দেশ্য কাহারও নিকট গোপন ছিল না। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' অবশ্য কোন উদ্দেশ্যমূলক রচনা বলিয়া প্রত্যক্ষভাবে বুঝিতে পারা যায় না; তবে তাহাতেও লেখক পল্লী-বাংলার বাস্তব পারিবারিক জীবনকে রূপায়িত করিবার প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য লইয়াই যে এই উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন, এইটুকু নিজেই স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে 'নীল-দর্পণে'র ন্যায় কোন মত প্রচারের কথা নাই, লেখকের সাধারণ জীবনবোধের কথাই তাহার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। 'প্রফুল্ল' নাটকের মধ্য দিয়াও কি নাট্যকারের এমনই কোন বিশিষ্ট মতবাদহীন জীবনবোধের বিকাশ হইয়াছে? কিংবা ইহার মধ্য দিয়া তিনি কি কোন নীতি প্রচার করিয়াছেন?

যদিও নির্বিচার মদ্যপানের ভিতর দিয়া ইহার কাহিনীর নায়ক চরিত্রের অধঃপতন ত্বরান্বিত হইয়াছে, তথাপি মদ্যপানের কু-ফলকে নিন্দা করা যে ইহার

লক্ষ্য ছিল না, তাহা বুঝিতে পারা যায়। কারণ, রমেশের বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা যোগেশের পতন যত ত্বরান্বিত হইয়াছে, মদ্যপান দ্বারা তাহা তত ত্বরান্বিত হয় নাই। যে ভাইকে 'মানুষ' করিলাম, সেই ভাই বিশ্বাসঘাতকতা করিল, এই চিন্তা যতখানি যোগেশের অন্তর অধিকার করিয়া লইয়া তাহাকে অধঃপতনের পথে ঠেলিয়া দিয়াছে, মদ্যপানের অভ্যাস তাহার পূর্ব হইতেই ছিল বলিয়া এই নির্মম বিশ্বাসঘাতকতার কথা ভুলিয়া থাকিবার জন্য তিনি মদ্যপানের মধ্যে আত্মবিস্মৃতির সন্ধান করিলেন। বিশেষত উনবিংশ শতাব্দীর কলিকাতার বাস্তব জীবনের রূপায়ণের সূত্রেই এই মদ্যপানের কথা আসিয়াছে, ইহার শোচনীয় পরিণাম নির্দেশের জন্য তাহা আসে নাই। এমন কি, দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী'র নিমচাঁদের মদ্যপানও তাহার একটি বহির্মুখী বিলাসমাত্র ছিল না, তাহারও মদ্যপানের বাসনা তাহার অন্তরের গভীরতম একটি বেদনার অনুভূতির ভিতর হইতে আসিয়াছিল। যোগেশেরও তাহাই হইয়াছিল মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা'র নববাবুর মদ্যপান এবং দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী'র নিমচাঁদের এবং গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটকের যোগেশের মদ্যপান এক প্রকৃতির নহে। বরং নববাবুর মদ্যপান এবং 'সধবার একাদশী'র অটলের মদ্যপান এক প্রকৃতির; ইহাদিগকে মত-প্রচারমূলক চরিত্র বলিয়া মনে হইলেও যোগেশ চরিত্রকে তাহা মনে হইতে পারে না। যোগেশ জীবন-যুদ্ধে পরাজিত মানুষ মাত্র—যে মানুষ বুদ্ধিবলে সমাজের আদর্শ স্থানীয় হইয়াও প্রচ্ছন্ন চারিত্রিক কোন দুর্বলতার জন্য মুহূর্তে ধরাশায়ী হইয়া পড়িতে পারে, যোগেশ সেই মানুষ। মদ্যপানের কথা উনবিংশ শতাব্দীর নাগরিক জীবন হইতে তাঁহার মধ্যে আসিয়া স্বাভাবিক ভাবেই মিশিয়াছে—ইহার মধ্য দিয়া তাঁহার এই বিষয়ে কোন মতবাদ প্রকাশ পায় নাই। তবে প্রত্যক্ষভাবে মত প্রচার না করিয়াও যৌথ পরিবারের শক্তি যে তিনি ইহার মধ্যে অনুভব করিয়াছেন, তাহা সত্য; ইহা তাঁহার বিশ্বাস মাত্র, এই বিশ্বাসকে তিনি 'প্রফুল্ল' নাটকে ঢাক বাজাইয়া প্রচার করিয়াছেন বলিয়া মনে হইতে পারে না। 'প্রফুল্ল'কে যে তিনি আদর্শ চরিত্ররূপে কল্পনা করিয়াছেন, তাহারও অর্থ ইহা নহে যে, ইহা দ্বারা তাঁহার বিশেষ কোন মতপ্রচার প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। পৌরাণিক নাটকের মধ্য দিয়া যিনি সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, দ্রৌপদী, কুন্তীর গুণকীর্তন করিয়াছেন, তিনি তাঁহার সামাজিক নাটকের মধ্য দিয়াও বাংলার নারী-চরিত্রের গৌরব এবং মহিমাকেই প্রকাশ করিবেন, ইহা তাঁহার পক্ষে

নিতান্তই সাধারণ কথা। সেই সূত্রেই তিনি 'প্রফুল্ল'কে আদর্শ নারীচরিত্ররূপে এই নাটকে উপস্থিত করিয়াছেন। প্রফুল্ল সীতা সাবিত্রীর দেশেরই কন্যা—এই বিশ্বাস হইতেই তিনি প্রফুল্ল চরিত্রকে আদর্শ চরিত্ররূপে পরিকল্পনা করিয়া সেদিনকার লক্ষ্যভ্রষ্ট সমাজের সম্মুখে আনিয়া স্থাপন করিয়াছেন; যৌথ পরিবারের কেন্দ্রীয় শক্তিরূপে কোন অসঙ্গত প্রাধান্য দিবার জন্য তাহা করেন নাই।

'প্রফুল্ল' নাটকের নামকরণ লইয়া সমালোচকদিগের মধ্যে দুইটি মতের সৃষ্টি হইয়াছে—একদল সমালোচক বলিয়াছেন, ইহার নামকরণ সার্থক হইয়াছে। আর একদল বলিয়াছেন, ইহা ব্যর্থ হইয়াছে। দুইটি মতই পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

সর্বপ্রথমেই একথা মনে হইতে পারে যে, 'সরলা' নাটকের যেমন নায়িকার নামে নামকরণ হইয়াছে, 'প্রফুল্ল' তাহারই প্রভাবিত রচনা বলিয়া ইহারও নায়িকার নাম অনুসারেই নামকরণ করা হইয়াছে। কিন্তু 'প্রফুল্ল' কি এই নাটকের নায়িকা? সুতরাং ইহাও মনে হইতে পারে যে, প্রফুল্ল এই নাটকের নায়িকা কি না তাহা বিচার না করিয়াই কেবলমাত্র 'সরলা'র অনুকরণেই ইহার 'প্রফুল্ল' নামকরণ করা হইয়াছে। ইহা বহির্মুখী বিচারমাত্র, ইহার একটি অন্তর্মুখী দিকও আছে, তাহার উপরই বিষয়টির গুরুত্ব যথাযথ নির্ভর করিতেছে, সুতরাং সেদিক হইতেও তাহা বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে।

প্রফুল্ল চরিত্র 'প্রফুল্ল' নাটকের নায়িকা নহে, একথা সত্য; কারণ, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া কাহিনী নিয়ন্ত্রিত হয় নাই; কিন্তু সে ইহার ঘটনাপ্রবাহ কোনদিক দিয়া রোধ করিতে পারে নাই, একথা বলিতে পারা যায় না। দেখা যায়, মদন ঘোষের মুখ হইতে নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই 'বংশরক্ষা'র যে ভবিষ্যৎ সাবধান বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল, এই নাটকের নায়ক-চরিত্র যোগেশের সর্বনাশের মধ্যেও প্রফুল্ল দ্বারা তাহার বংশরক্ষা সম্ভব হইয়াছে। কাহিনীতে মদন ঘোষের সহায়তায় তাহারই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার ফলে যাদবের প্রাণ রক্ষা পাইয়াছে; সুতরাং প্রফুল্ল এই নাট্যকাহিনীর মধ্যে কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে নাই, সে যে কেবলমাত্র ঘটনার দ্রষ্টা একথা বলিতে পারা যায় না। তবে একথা সত্য, প্রফুল্লের একক প্রচেষ্টায় এই কাজ সিদ্ধ হয় নাই, মদন ঘোষের সহায়তা তাহার প্রয়োজন হইয়াছিল; সেইজন্য কাহিনীর মধ্যে তাঁহার এই দায়িত্ব পালন যত গুরুত্বপূর্ণই হউক না কেন, তাহা কতকটা লাঘব হইয়াছে মনে হইতে

পারে। কিন্তু বিষয়টি কেবল বাহির হইতে দেখিলেই চলে না, ইহাকে ভিতর হইতেও দেখিতে হইবে, অর্থাৎ প্রফুল্ল তাহার এই বিষয়ে আন্তরিকতার যে অকৃত্রিমতা এবং গভীরতার পরিচয় দিয়াছে, তাহার মধ্য দিয়াই ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে। সেই দিক দিয়া যে প্রফুল্ল উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে, তাহা সত্য। প্রফুল্ল তাহার মৃত্যু দ্বারা রমেশকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই; কিন্তু হয়ত রমেশের মত পাপিষ্ঠকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করা নাট্যকারেরও উদ্দেশ্য ছিল না—কারণ, রমেশের চরিত্রের মধ্যে এমন কোন অবকাশ ছিল না, যাহার ভিতর দিয়া সত্যের আলো কোন ভাবে প্রবেশ করিতে পারে। সেইজন্য তাহার সত্য দর্শন সম্ভব না হইলেও নাটকের মূল উদ্দেশ্য যে ছিল বংশরক্ষা—প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের মধ্য দিয়াই মদন ঘোষের কথায় যে ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহাই প্রফুল্ল দ্বারা পালন করা সম্ভব হইয়াছে। নাট্য-কাহিনীর পক্ষে যে ঘটনা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, প্রফুল্ল তাহারই নিয়ামক হইয়াছে। সুতরাং প্রফুল্ল চরিত্র যে নাটকের কেন্দ্রীয় ঘটনার নিয়ন্ত্রী, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নাট্যকাহিনীর মধ্যে কোন্ চরিত্র কত বিস্তৃত স্থান অধিকার করিয়া থাকে, তাহা দ্বারা কোন নাটকীয় চরিত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারা যায় না, বরং অপরিসর ক্ষেত্র অধিকার করিয়া থাকিয়া যদি তাহা ঘটনার ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, তবে তাহা দ্বারাই চরিত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি হইয়া থাকে। প্রফুল্ল যোগেশের পরিবারের সরলা বধূ হইয়াও শেষ পর্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করিয়াছে। সুতরাং তাহার নামে নাটকের নামকরণে বাধা কোথায়?

কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, কিছু বাধা যে নাই, তাহা নহে। প্রথমত প্রফুল্ল চরিত্রের প্রথমাংশ যেমন ব্যক্তিত্বহীন, তাহাতে তাহা দ্বারা যে সংসারের কোন গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্ভব, তাহা মনে হয় না। শেষ মুহূর্তে সহসা দেখা যায়, কাহিনীর প্রয়োজনীয়তার জন্যই যেন তাহার মধ্যে আকস্মিকভাবে পরিণত বুদ্ধির বিকাশ হইয়া গিয়াছে, তাহার ফলে সে তখন যে আচরণ করিয়াছে, তাহার সঙ্গে তাহার পূর্ববর্তী আচরণের কোন সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যদি তাহার প্রথম দিকের আচরণ এবং পরবর্তী আচরণের মধ্যে সুদীর্ঘ সময়ের ব্যবধান থাকিত, তবে একথা মনে করা যাইত যে, তাহার বয়স এবং অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে পরিণত বুদ্ধির উদয় হইয়াছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে ত তাহাও হয় নাই। কারণ, এখানে সময়ের কোন ব্যবধান

সৃষ্টি হইতে পারে নাই ; সুতরাং প্রথম দৃশ্যে যে প্রফুল্লকে পাইয়াছি, শেষ দৃশ্যেও সেই প্রফুল্লকেই পাইবার কথা ; কিন্তু সময়ের কোন ব্যবধান না থাকা সত্ত্বেও দুই প্রফুল্লর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, একজন শিশু প্রকৃতির—আর একজন পরিণতবয়স্ক প্রকৃতির। তবে একথাও সত্য, অনেক সরলমতি বালিকাও অবস্থার বশবর্তী হইয়া আপনা হইতেই তাহার মনের ভিতর পরিণত বুদ্ধির প্রেরণা পায়, ইহা অশিক্ষিত পটুত্বেরই একটি দিক। সুতরাং যখন প্রফুল্ল দেখিতে পাইল, চারিদিকে হিংসা এবং হত্যার আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তখন আপনা হইতেই তাহার মধ্যে পরিণত বুদ্ধি বিকশিত হইয়া গেল এবং দুই হাতে সেই বিরুদ্ধ অবস্থার সঙ্গে সে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া গেল। সুতরাং এই দিক দিয়া বিচার করিলে ইহাতেও অস্বাভাবিকতা কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

পূর্বেই বলিয়াছি, গিরিশচন্দ্র তাঁহার পৌরাণিক নাটক রচনার মধ্য দিয়া সীতা সাবিত্রী দময়ন্তীর গুণকীর্তন করিয়া ভারতীয় নারীচরিত্র সম্পর্কে যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ভাবটি অন্তরে সৃষ্ট করিয়াছিলেন, বাংলার পরিবারাশ্রিত নারীচরিত্রকেও সেই ভাব হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে পারেন নাই। এদেশের নারী তাহার ত্যাগ ও দুঃখসহিষ্ণুতার মধ্য দিয়া ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন দিয়া কি ভাবে যে বৃহত্তর পারিবারিক স্বার্থ রক্ষা করিয়া থাকে, তাহা তিনি গভীর-ভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। বাংলার পরিবারের মধ্যেই তিনি সীতা-সাবিত্রীর সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাঁহার বিভিন্ন নাটকের মধ্য দিয়াই নারীচরিত্রের এই মহিমার দিকটি বিকাশ লাভ করিয়া তাঁহার নাটক মাত্রকেই একটি বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। এইকথা পূর্বেও বলিয়াছি, আমাদের প্রাচীন জীবনের আদর্শের প্রতি গিরিশচন্দ্রের অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল ; সেইজন্য স্ত্রীজাতি-সম্পর্কিত কোন প্রগতিশীল আন্দোলনের প্রতি তিনি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। বাংলার যৌথ পরিবারের কেন্দ্রীয় শক্তিরূপেই তিনি নারীকে গণ্য করিতেন। প্রফুল্ল চরিত্রের মধ্য দিয়া নারীর কল্যাণী শক্তিটিকেই সেদিন তিনি ভ্রান্ত সমাজের সম্মুখে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন ; সেইজন্যই তিনি ইহার প্রফুল্ল নামকরণ করিয়াছিলেন।

নাটকের মধ্য দিয়া গিরিশচন্দ্র এই সমাজকে কেবল কাহিনী শুনাইতে আসেন নাই, প্রত্যেক নাট্যকাহিনীর মধ্য দিয়াই তিনি একটি উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে আসিয়াছিলেন। 'প্রফুল্ল' নাটকের মধ্য দিয়াও তিনি বাঙালীর পারিবারিক জীবনে নারীর কল্যাণী রূপটি উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইয়াছিলেন।

প্রফুল্ল আত্মবিসর্জন দিয়া সমাজের সম্মুখে তাহার অন্তর্নিহিত সেই কল্যাণী শক্তির যথার্থ পরিচয়টি প্রকাশ করিয়াছে। আদর্শভ্রষ্ট সমাজের সম্মুখে বিস্মৃতপ্রায় প্রাচীন আদর্শটি পুনরায় উচ্চে তুলিয়া ধরিয়া পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-দীক্ষানুমোদিত নূতন প্রগতিশীল নারী-আন্দোলনকে গিরিশচন্দ্র ধিক্কার দিয়াছেন। অমৃতলাল বসু যাহা প্রহসন রচনার ভিতর দিয়া ব্যঙ্গাত্মকভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই গিরিশচন্দ্র বিষয়ের গুরুত্ব রক্ষা করিয়া গুরুবিষয়ক নাটকের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু তাঁহার 'বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ' (১৯৪৮, পৃ ১৫৩) গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, "আমাদের প্রেমপূর্ণ প্রাচীন সংসারের আদর্শ ফিরাইয়া আনিবার জন্য স্নেহময়ী প্রফুল্লর আত্মবিসর্জনই এই নাটকটির মেরুদণ্ড এবং সেইজন্যই নাট্যকার ইহার নাম দিয়াছেন 'প্রফুল্ল'।" এই কথাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

কেহ কেহ প্রফুল্লর মৃত্যু 'আত্মবিসর্জন' কি না, এই বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন; তাঁহাদের ধারণা, ইহা 'হত্যা'—আত্মবিসর্জন নহে; কারণ, পূর্ব হইতে ইহার কোন প্রস্তুতি ছিল না। কিন্তু কোন কল্যাণবুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া তাহার মধ্যে আত্মসমর্পণ করা আত্মবিসর্জন ছাড়া আর কি হইতে পারে? স্বামীর অসদাচরণ, মিথ্যা প্রবঞ্চনা, শঠতা এবং নিষ্ঠুরতার সঙ্গে তাহার পূর্ব হইতে যে পরিচয় না হইয়াছিল, তাহা নহে; কারণ, স্বামীকে দেবতা বলিয়া ভক্তি করিতে গিয়াও যখন সে বুঝিতে পারিল, স্বামী মিথ্যাবাদিতা ও শঠতা দ্বারা জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রতারিত করিতেছে, তখন তাহার চিত্ত দ্বিধাগ্রস্ত হইল। স্বামী মিথ্যা কথা বলে, স্বামীর কথা শুনিলে মিথ্যা কথা শুনা হয়, একথা যখন সে বুঝিতে পারিল, তখন তাহার স্বামীর স্বরূপটি চিনিতে আর বাকি রহিল না; বিশেষত স্বামীর নিকট হইতে প্রফুল্ল কোন দিন সস্নেহ ব্যবহার পায় নাই, সুতরাং স্বামীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবার আর কোন কারণ তাহার রহিল না। এই অবস্থায় যখন সে কেবলমাত্র যাদবকে রক্ষা করিবার জন্য স্বামীর একটি নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিতে অগ্রসর হইল, তখনই দেখা গেল, সে তাহার স্বার্থবোধ বিসর্জন দিয়া স্বামীর নিষ্ঠুরতার সম্মুখে যাদবকে আড়াল করিয়া নিজেকে অনাবৃত করিয়া দিয়াছে—ইহাই আত্মবিসর্জন। স্বার্থ-প্রণোদিত স্বেচ্ছামৃত্যু আত্মহত্যা; কিন্তু স্বার্থমুক্ত হইয়া পরার্থে যে মৃত্যুবরণ করা হয়, তাহাই আত্মবিসর্জন। সুতরাং এখানে

প্রফুল্লর আত্মবিসর্জনের মধ্যে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। যৌথ পরিবারের কল্যাণে একটি বধূ যেখানে নিজের স্বার্থের এতখানি উর্ধ্বে উঠিয়া গিয়া পরার্থে মৃত্যুবরণ করিয়াছে, তাহার চরিত্রকে সকলের সম্মুখে প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস, নাট্যকারের পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক। সেই সূত্রেই নাটকের 'প্রফুল্ল' নামকরণ সমর্থনযোগ্য বিবেচিত হইতে পারে।

এই নাটকের মধ্যে পরিবারের অন্যতম বধূ-চরিত্র জ্ঞানদারও মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু জ্ঞানদার মৃত্যু দ্বারা কাহিনী শেষ হয় নাই, প্রফুল্লর মৃত্যুর পরই কাহিনী শেষ হইয়াছে; সুতরাং জ্ঞানদার মৃত্যুর ভিতর দিয়াই নাট্যকার চরম কথা প্রকাশ করিতে চাহেন নাই, প্রফুল্লর মৃত্যুর জন্যও তাঁহাকে প্রতীক্ষা করিতে হইয়াছে। সুতরাং এই দিক হইতেও 'প্রফুল্ল' নামকরণ সার্থক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

যাঁহারা 'প্রফুল্ল' নামকরণ সমর্থন করেন না, তাঁহাদের বক্তব্য এই যে যোগেশ এই নাটকের 'কেন্দ্রীয় পুরুষ'; সুতরাং যোগেশের নামানুসারেই নাটকের নামকরণ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে, নামকরণের ব্যাপারে নৈতিক দিকটি কিছুতেই উপেক্ষিত হইতে পারে না। কাহিনীর দিক দিয়া অনেক সময় কোন খল চরিত্র (Villain) কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করিতে পারে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহার নামেই রচনার নামকরণ করা সঙ্গত নহে, তাহার নিদর্শনও পাওয়া যায় না। সেক্সপীয়রের *Merchant of Venice*-এ কেন্দ্রীয় চরিত্র কি? এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে কেহ কি তাহার উত্তরে ভেনিসের বণিক এণ্টোনিওর নাম বলিবেন? এমন কি, ইহার কেন্দ্রীয় চরিত্র রূপে সাইলকেরও নাম স্মরণ হইতে পারে; কারণ, সাইলকের প্রতিহিংসা এবং পরাজয় ইহার কাহিনীর ধারা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। সাইলকের ট্রাজিডি, এই নাটকের ট্রাজিডি। কিন্তু এণ্টোনিও যে কেন্দ্রীয় চরিত্র নহে, তাহা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। তথাপি সাইলকের নামে যে এই নাটকের নামকরণ হয় নাই, তাহা একান্ত নৈতিক প্রশ্নের জন্যই, অন্য কোন বিষয়ের জন্যই নহে। এমন কি, এই নৈতিক প্রশ্নের জন্যই ইহাতে সাইলকের ট্রাজিডি হইয়াছে বলিয়া কেহ ইহাকে ট্রাজিডি বলিয়াও স্বীকার করিবে না, বরং ইহা কমেডির গৌরব লাভ করিয়া থাকে। বিচারের নামে অবিচারে দণ্ডিত, অপমানিত সর্বহারা বৃদ্ধ কুসিদজীবীর শূন্য হৃদয় ভেদ করিয়া যে মর্মভেদী হাহাকার ধ্বনিত হইয়াছিল, তাহাও এই নৈতিক প্রশ্নের মূলে সম্পূর্ণ তলাইয়া

গিয়াছে ; সুতরাং নীতির প্রশ্ন একেবারে উপেক্ষণীয় বিবেচিত হইতে পারে না। যদি তাহা না হয়, তবে 'প্রফুল্ল' নামকরণকেও অযথার্থ বলিয়া নির্দেশ করা যায় না।

যোগেশ কেন্দ্রীয় চরিত্র হইলেও যোগেশ নীতির দিক দিয়া অধঃপতিত, নিজের দুর্বলতায় নিজের এবং পরিবারের সর্বনাশকে অনিবার্য করিয়া তুলিয়া নিষ্ক্রিয়ভাবে স্রোতের জলে গা ভাসাইয়া চলিয়াছে মাত্র। ইহা কোন উচ্চ আদর্শের দ্যোতক হইতে পারে না।

(গিরিশচন্দ্র সমাজ এবং ভাব-জীবনের দিক হইতে ভারতীয় বিশেষতঃ বাঙ্গালীর প্রাচীন আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইলেও তাঁহার নাটক রচনার আঙ্গিকের দিক হইতে যে কেবল ভারতীয় আদর্শকেই অন্ধ ভাবে অনুকরণ করিয়াছিলেন, তাহা নহে ; এই বিষয়ে তিনি পাশ্চাত্ত্য আদর্শ, বিশেষত সেক্সপীয়রকেও গভীরভাবে অনুসরণ করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি নিজের সম্পর্কে একদা বলিয়াছিলেন, 'মহাকবি সেক্সপীয়রই আমার আদর্শ। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে চলেছি।' (কুমুদবন্ধু সেন, 'গিরিশচন্দ্র ও নাট্য সাহিত্য', পৃঃ ৩৮) কিন্তু এ'কথাও পুরাপুরি সত্য নহে ; কারণ, তিনি জাতীয় ঐতিহ্য-চিন্তা সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়া যদি সেক্সপীয়রকেই অনুসরণ করিতেন, তবে বাঙ্গালীর নিকট তাঁহাকে এতখানি জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে পারিত না। তবে এ'কথা সত্য, সেক্সপীয়রের ট্রাজিডিগুলির কোন কোন উপকরণ তাঁহার নাট্য রচনায় তিনি স্বাঙ্গীকৃত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, ভারতীয় নাট্যসাহিত্যাদর্শের বিরোধী হইলেও তিনি বিয়োগান্তক কাহিনীকে তাঁহার নাট্যরচনায় নিঃসঙ্কোচে স্থান দিয়াছেন। এমন কি, যে পৌরাণিক নাটক বিয়োগান্তক হইবার যোগ্য নহে, ইচ্ছা করিলেই মিলনান্তক করা যায়, তাহাদিগকেও তিনি বিয়োগান্তক করিয়া রচনা করিয়াছেন। শেষ রক্ষা করিবার জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে পঞ্চাঙ্ক নাট্যকাহিনীর বহির্ভাগেও 'ক্রোড় অঙ্ক' যোজনা করিয়া তাহাতে মিলন দেখাইয়াছেন। এই বিষয়ে গিরিশচন্দ্রের মধ্যে কোন গোঁড়ামি ছিল না। উন্মুক্ত এবং উদার দৃষ্টি লইয়া বাংলা নাট্যসাহিত্যের সর্ব বিভাগেই অর্থাৎ পৌরাণিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক, রোমান্টিক প্রভৃতি সকল শ্রেণীর নাটকেই তিনি বিয়োগান্তক কাহিনীর অবাধ প্রবেশাধিকার দিয়াছিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি, 'প্রফুল্ল' নাটকের মুখ্য প্রেরণা দিয়াছিল বিয়োগান্তক নাটক 'সরলা', সেই সূত্রে অতি সহজেই তিনি তাঁহার 'প্রফুল্ল' নাটককেও বিয়োগান্তক পরিণতি

দান করিয়াছেন। তথাপি যে সেক্সপীয়রের পদাঙ্ক তিনি অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া দাবী করিয়াছেন, তাঁহার রচিত বিয়োগান্তক নাটক অনুযায়ী তিনি কতদূর তাঁহার নাট্যরচনাকে সার্থক করিতে পারিয়াছেন, তাহাই এখানে আলোচ্য বিষয়। কারণ, সেক্সপীয়রের নাটক কেবল বিয়োগান্তকই নহে, তাহা ট্রাজিডি—ইংরেজী সাহিত্যের আলঙ্কারিকদিগের মধ্যে ট্রাজিডির কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণ আছে; সেই লক্ষণগুলির মধ্য দিয়াই শ্রেষ্ঠ ট্রাজিডির মূল্য প্রকাশ পাইয়া থাকে। গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটকের মধ্যে সেই লক্ষণগুলি কতকদূর সার্থকভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা আলোচনার যোগ্য।

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যেও ট্রাজিডির পরিকল্পনা একটি ক্রমবিকাশের সূত্র ধরিয়া বিকাশ লাভ করিয়া আসিয়াছে। প্রাচীন গ্রীক্ মনীষী অ্যারিস্টটল্ ট্রাজিডির যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা ইংরেজ নাট্যকার সেক্সপীয়রের যুগে আনুপূর্বিক অনুসরণ করা হয় নাই; জীবন ও জগৎ সম্পর্কে নূতন ধারণা লইয়া সেক্সপীয়রের ট্রাজিডিগুলি রচিত হইয়াছে। আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের মধ্যে তাহার আদর্শ আরও পরিবর্তিত হইয়াছে। সুতরাং ট্রাজিডি সম্পর্কে একটি সনাতন আদর্শ পাশ্চাত্ত্য নাট্যকারদিগের সম্পর্কেও অবিচল হইয়া থাকিতে পারে নাই। তবে গিরিশচন্দ্র সেক্সপীয়রেরই 'পদাঙ্ক' অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া দাবী করিয়াছেন; সেইজন্য সেক্সপীয়রের আদর্শ তাঁহার মধ্যে কতদূর রক্ষা পাইয়াছে, তাহা বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে।

প্রাচীন গ্রীকজাতির ট্রাজিডির মধ্যে যেমন নিয়তি নামক এক অদৃশ্য শক্তিকে স্বীকার করিয়া লইয়া মনুষ্য চরিত্রকে তাহার ক্রীড়নক করা হইয়াছে, সেক্সপীয়রের ট্রাজিডিতে তাহা করা হয় নাই। সেক্সপীয়রের ট্রাজিডির মধ্যে প্রত্যক্ষ মানুষই নিয়তির স্থান অধিকার করিয়াছে, ট্রাজিডির সম্ভাবনা মানুষের চরিত্রের মধ্যেই বীজাকারে প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে। মানুষেরই ভুল-ভ্রান্তি, দুর্বলতার কোন সুযোগ লাভ করিয়া তাহা পরিণামে ভয়াবহ হইয়া উঠে—কোন অলৌকিক কিংবা অদৃশ্য শক্তিকে সেখানে স্বীকার করা হয় না। গিরিশচন্দ্রের কোন কোন পৌরাণিক নাটকে নিয়তিবাদকে স্বীকার করা হইলেও, সামাজিক নাটক 'প্রফুল্ল'র মধ্যে তাহার পরিবর্তে সেক্সপীয়রের ট্রাজিডির ধারাকেই যে স্বীকার করা হইয়াছে, তাহা সত্য। নায়ক চরিত্রের বিষাদান্তক পরিণতির মধ্য দিয়াই সেক্সপীয়রের ট্রাজিডির বিশিষ্ট রূপ প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং 'প্রফুল্ল'

নাটকের নায়ক চরিত্রের কথাই এই সম্পর্কে প্রথম আলোচনা করিবার আবশ্যক হইতেছে।

সেক্সপীয়রের ট্রাজিডির আদর্শ অনুযায়ী নায়ক চরিত্রের কোন প্রচ্ছন্ন একটি দুর্বলতার পথ দিয়াই তাহার পতনের সূত্রপাত হয় এবং পরিণতিতে তাহাকে এমন একটি অবস্থার সম্মুখীন করিয়া দেয়, যাহা তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অনতিক্রম্য হইয়া উঠে—সে মৃত্যুবরণ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু নায়ক চরিত্রকে শক্তিশালী পুরুষকারের মূর্ত বিগ্রহ হইতে হয় এবং সমগ্র শক্তি দ্বারা তাহাকে বিরুদ্ধ অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হয়। তারপর এই অবিরাম আত্মরক্ষার সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হইতে হইতে যখন তাহার শেষ রক্তবিন্দুও ক্ষয় হইয়া যায়, তখন সে ধরাশায়ী হইয়া পরাজয় বরণ করে এবং মৃত্যুর মধ্যে জীবনের অন্তিম শয্যা রচনা করে। তাহার এই পতনের মধ্য দিয়াও গৌরব প্রকাশ পায়; কারণ,মানুষ ইহাতে মানুষের আত্মরক্ষার শক্তি যে কত গভীর, তাহা উপলব্ধি করিয়া বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া যায়, তাহার শক্তির ঐশ্বর্য তাহার অন্তিম পরাজয়ের অবমাননার মধ্যেও তাহাকে গৌরবের টিকা পরাইয়া দিয়া যায়। এখন আমাদের বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, 'প্রফুল্ল' নাটকের নায়ক যোগেশ চরিত্রের মধ্য দিয়া এই সকল গুণ প্রকাশ পাইয়াছে কি না।

দেখা যায়, 'প্রফুল্ল' নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই ইহার নায়ক যোগেশ মদ্যপানের জন্য তাঁহার স্ত্রীর অনুযোগভাজন হইয়াছেন। মদ্যপান করিতে তাঁহার কিছুমাত্র যে সঙ্কোচ ছিল, তাঁহাও তাহার আচরণে দেখা যাইতেছে না। সংসারের দশটা কথা বলিতে বলিতে সহসা তাঁহার মদের পিপাসা হয় এবং হাত বাড়াইয়া স্ত্রীর নিকট হইতে মদের বোতলটা চাহিয়া লন। এই আচরণের মধ্যে সামাজিক ঘৃণা কিংবা পারিবারিক লজ্জার কথা যাহাই থাকুক না কেন, যোগেশ এই বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচ, এই বিষয়ে তিনি সকল লজ্জা ও সম্ভ্রমবোধ কাটাইয়া উঠিয়াছিলেন। সুতরাং মদ্যপান তাঁহার চরিত্রের একটি দুর্বলতা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

যোগেশের আর একটি দুর্বলতা, তিনি কি করিয়াছেন, না করিয়াছেন—পরিবারের মধ্যে অনাথ পিতৃহীন ভাইদিগের জন্য তিনি একদিন কি করিয়াছিলেন, কি ভাবে নিজে পরিশ্রম করিয়া পিতৃহীন পরিবারটিকে আজ দাঁড় করাইয়াছেন—এই বিষয়ে তিনি বিশেষ সচেতন। এই আত্মসচেতনতা তাঁহার একটি দুর্বলতা। মানুষ কর্তব্য পালনের জন্য কর্তব্য সম্পাদন করে; যাহা কর্তব্য,

তাহা সম্পাদন করিয়া তাহার জন্ম দীর্ঘকাল ব্যবধানেও আত্মগুণ কীর্তন করে না, যে করে, সে দীনাত্মা—একটি ট্রাজিডির নায়ক হইবার যোগ্যতা তাহার নাই। তারপর নিজের সুনাম রক্ষা করিবার বিষয়েও তাঁহার একটু দুর্বলতা ছিল—সুনাম কোন অবস্থাতেই যাহাতে নষ্ট না হয়, সেই বিষয়ে তিনি অত্যন্ত সতর্ক; তিনি বলেন, 'সুনাম থাক্‌লে খেটে খাওয়া চলবে।' এই সুনাম রক্ষা করিবার জন্ম তিনি মনে যত ব্যগ্র, কাজে কিন্তু তত সক্রিয় নহেন। মদ্যপান করিলে সুনামহানির আশঙ্কা আছে জানিয়াও, স্ত্রীর নিষেধ সত্ত্বেও মদ্যপান করেন; তারপর মাতাল হইয়া স্ত্রীকে লাথি মারেন, শিশুসন্তানকে প্রহার করেন এবং বৃদ্ধা মাকে গালাগালি করেন। সুতরাং এই বিষয়ে তাঁহার যেমন সাধ আছে, তেমন সাধ্য নাই। কিন্তু মানুষকে কেবল তাহার সাধ দিয়াই চেনা যায় না, তাহার প্রকৃত সাধ্য কি, তাহা দ্বারাই তাহাকে চিনিতে হয়। সাধ্য না থাকা সত্ত্বেও মনে মনে সুনাম রক্ষার যে সাধটি তিনি পোষণ করেন, ইহাও তাঁহার দুর্বলতা। এই সকল প্রত্যক্ষ ত্রুটি ব্যতীত তাঁহার চরিত্রের যাহা বিশিষ্ট গুণ, তাহা তাঁহার নিজের মুখেই শুধু প্রকাশ পাইয়াছে। শৈশবে পিতৃহীন হইয়া তিনি পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়া গৃহহীন হইলেন, তারপর ক্রমে নিজের চেষ্টা, যত্ন ও অধ্যবসায় দ্বারা আজ কেবল যে নিজে দুই পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাহা নহে,—মধ্যম ভ্রাতা রমেশকে 'মানুষ' করিয়াছেন, কনিষ্ঠকে চেষ্টা করিয়াও কিছু করিতে পারেন নাই। বাড়ীঘর, অতিথিশালা নির্মাণ করিয়াছেন তীর্থ-ভ্রমণেরও আয়োজন হইয়াছে। ব্যাঙ্কে কয়েক লক্ষ টাকাও জমিয়াছে। কিন্তু সহসা বিপদ দেখা দিল ব্যাঙ্কের টাকা লইয়া। তাঁহার কর্মচারী একদিন আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল, 'ব্যাঙ্ক বাতি জ্বেলেছে।' অমনি তিনি পূর্ব অভ্যাসমত মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান করিতে করিতে শেষ পর্যন্ত সেই মদ্যের স্রোতেই যেন ভাসিতে ভাসিতে পারের ঘাটে আসিয়া ঠেকিলেন, সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের সকলকে সর্বনাশের স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া চলিলেন।

সেক্সপীয়রের ট্রাজিডির আদর্শ অনুযায়ী 'প্রফুল্ল' নাটকের নায়ক চরিত্রের মধ্যে কতকগুলি দুর্বলতার অস্তিত্ব থাকিলেও, সেই দুর্বলতা যে-ভাবে নাটকের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা দ্বারা যে ইহা ট্রাজিডি রূপে রসোত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যাইবে না। ইহার প্রধান কারণ, নায়ক চরিত্রের মধ্যে প্রচ্ছন্ন যে দুর্বলতার ইঙ্গিত থাকুক না কেন, ইহাকে অন্যান্য দিক দিয়া একটি মহান চরিত্র হইতে হইবে, তাহার চরিত্রের প্রতি যদি অন্য কোন দিক

দিয়া সমাজের আকর্ষণ সৃষ্টি করা সম্ভব না হয়, তবে তাহার পতন করুণার উদ্রেক করিতে পারে না,—তাহার করুণ পরিণতির জন্য কাহারও দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িবে না। কিন্তু যোগেশ চরিত্রের যে সকল গুণের কথা আমরা তাহার নিজের মুখে শুনিতে পাই, তাহা সকলই এই নাট্যকাহিনীর পূর্ববর্তী ঘটনা, নাটকীয় দৃশ্যের মধ্য দিয়া তাহা প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে পারে নাই বলিয়াই তাহা যথার্থ কার্যকর হইয়া উঠিতেও পারে নাই। এমন কি, মদ্য পানের ভিতর দিয়াও প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে যে মাতৃভক্তি এবং পারিবারিক দায়িত্ববোধ সম্পর্কে তাঁহাকে সচেতন দেখিতে পাই, তাহাও সেই অঙ্কের সেই দৃশ্যের শেষাংশে ব্যাঙ্ক বাতি জ্বালিবার সংবাদ তাঁহার কর্মচারীর মুখে শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া গেল; তিনি সেই মুহূর্ত হইতে চারিদিকের অবস্থার প্রতি একবারও চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিবার পরিবর্তে নির্বিচার মদ্যপানের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া চলিলেন, হাত বাড়াইয়া তৃণাগ্র ধরিয়াও আত্মরক্ষার কোন প্রয়াস পাইলেন না। ইহা ট্রাজিডির নায়ক চরিত্রের লক্ষণ নহে। নায়ক চরিত্রের প্রধান গুণ তাহার প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার শক্তির মধ্য দিয়া প্রকাশ পায়, দেহের শেষ রক্তবিন্দু পাত করিয়া যখন সে জীবন-সংগ্রামে পরাজিত হইয়া ধরাশায়ী হইবে, তখন তাহার সেই মৃত্যুর মধ্য দিয়াই তাহার চরিত্রের একটি বিশেষ মহিমা প্রকাশ পাইবে। কিন্তু আত্মরক্ষার চেতনায় নির্লিপ্ত-চরিত্র যোগেশের মধ্যে সেই মহিমা বিন্দুমাত্রও প্রকাশ পাইতে পারে নাই। সুনাম রক্ষার জন্য যে যোগেশ-চরিত্রের অবিচল নিষ্ঠা ছিল বলিয়া তাঁহার নিজের মুখ হইতেই শুনিতে পাই, তাহার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার পথে পথে একটি পয়সা ভিক্ষা করিয়া বেড়াইবার চিত্র যেমন বিসদৃশ, তেমনই অবিশ্বাস্য। সুতরাং সুনাম রক্ষার কথা তাঁহার মুখের কথা মাত্র, প্রকৃত পক্ষে ইহা তাঁহার কোন চারিত্রিক দুর্বলতা নহে; যদি সত্যই তাহা হইত, তবে তিনি ঘরের মধ্যে বসিয়া যাহাই করুন না কেন, ভিক্ষা করিবার জন্য পথে বাহির হইতেন না—ঘরে বসিয়াই মদ না খাইয়া মরিতেন। সুতরাং যোগেশের চরিত্রটি কেবল মাত্র যে নায়কোচিত গুণ-বিবর্জিত, তাহাই নহে—তাহা স্বাভাবিকতা এবং সঙ্গতির মাত্রাও ছাড়াইয়া গিয়াছে।

।নায়ক চরিত্রের ট্রাজিক সমুন্নতির অভাবেই যে 'প্রফুল্ল' নাটক ট্রাজিডি হইতে পারে নাই, তাহা নহে—ইহার আরও কারণ আছে। ইহার মধ্য দিয়া যে দুইটি নারীচরিত্রের মৃত্যুর অবতারণা করা হইয়াছে, তাহাদের স্বাভাবিকতার

ভিতর দিয়া নাটকের করুণরস সুনিবিড় হইয়া উঠিবার অবকাশ ছিল। ট্রাজিডির মধ্যে একটি মৃত্যু দৃশ্যের অবতারণা করিলে বহু পূর্ব হইতে তাহাতে যে প্রকার প্রস্তুতির আবশ্যক—যে ভাবে ধীরে ধীরে দর্শকদিগকে ইহার সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন হয়, 'প্রফুল্ল' নাটকে তাহাও করা হয় নাই। যোগেশের পরিবারের দুইটি বধূরই ইহাতে মৃত্যু হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অত্যন্ত অস্বাভাবিক উপায়ে জ্যেষ্ঠা বধূর পথে পড়িয়া মৃত্যু হইয়াছে, আর কনিষ্ঠা বধূকে তাহার স্বামী রমেশ আকস্মিক উত্তেজনায় হত্যা করিয়াছে। ইহাদের একটি অস্বাভাবিক, আর একটি আকস্মিক; সুতরাং ইহাদের মধ্য দিয়া অতি-নাটকীয় (melodramatic) বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইলেও, ইহারা যে ট্রাজিডির গুণ-বিবর্জিত, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

সাধারণত ট্রাজিডির পরিণতিকে ত্বরান্বিত এবং অনিবার্য করিবার জন্য সেক্সপীয়রের নাটকের Villain বা খল-চরিত্রের পরিকল্পনা করা হইয়া থাকে। খল-চরিত্রও নাটকীয় চরিত্র; সুতরাং তাহারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে খল (wicked) আচরণ করিলেও, তাহাদের রক্তমাংসের মানবিক পরিচয় লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে না; স্বার্থসিদ্ধির ক্ষেত্র ব্যতীতও তাহাদের জীবনে এমন কতকগুলি ক্ষেত্র থাকে, যেখানে তাহারা সহজ মানুষের মতই আচরণ করে; সেখানে তাহারা স্নেহ, বাৎসল্য, প্রেমের অনুভূতি স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করিয়া থাকে। 'প্রফুল্ল' নাটকে খল চরিত্র রমেশ, তাহার সহযোগী কাঙ্গালী এবং জগমণি। এই তিনটি চরিত্রেরই অস্বাভাবিকতা এমন পীড়াদায়ক হইয়াছে যে, ইহাদিগকে নাটকীয় চরিত্র অর্থাৎ রক্তমাংসের নরনারীর চরিত্র বলিয়া মনে করাও কঠিন হইয়া পড়ে। সুতরাং তাহাদের অস্বাভাবিকতায় নাটকের ট্রাজিক রসও স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই। এই ভাবে নানা দিক হইতে বিচার করিলে 'প্রফুল্ল' নাটককে অতি-নাটক (melodrama) কিংবা সাধারণ বিয়োগান্তক নাটক বলিয়া মনে হইলেও, পাশ্চাত্ত্য আদর্শে রচিত ট্রাজিডি বলিয়া মনে হইতে পারে না।

নট-জীবনের সূচনাতেই গিরিশচন্দ্র দীনবন্ধু রচিত 'নীল-দর্পণ' নাটকখানি কয়েক বার অভিনয় করিয়াছিলেন, সেই সূত্রেই 'নীল-দর্পণ' নাটকের আঙ্গিককে আশ্রয় করিয়াই সামাজিক নাটক সম্পর্কে দীনবন্ধুর যে একটি বিশেষ সংস্কার গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। বিশেষত 'নীল-দর্পণ' নাটক বাংলার সমাজে সেদিন রাজনৈতিক কারণেও যে প্রভাব বিস্তার

করিয়াছিল, তাহা হইতে মুক্ত থাকাও গিরিশচন্দ্রের মত যুগন্ধর নাট্যকারের পক্ষে কঠিন ছিল; সেইজন্য তাঁহার জ্ঞাতসারেই হোক, কিংবা অজ্ঞাতসারেই হোক, 'নীল-দর্পণ' নাটকের কাহিনী এবং ভাবগত প্রভাব নানাদিক দিয়াই গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটকে প্রবেশ করিয়াছে। একদিকে দীনবন্ধুর 'নীল-দর্পণ' এবং আর এক দিক দিয়া তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'স্বর্ণলতা'র নাট্যরূপ 'সরলা' এই দুইখানি নাটকের বহিরঙ্গগত প্রভাব এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রত্যক্ষ যুগচেতনা—ইহাদের উপর আশ্রয় করিয়াই প্রধানত গিরিশ-চন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটকখানি রচিত হইয়াছে। এখানে প্রফুল্ল নাটকের উপর 'নীল-দর্পণ' নাটকের প্রভাব লক্ষ্য করা যাইতে পারে।

'নীল-দর্পণে'র যে পরিবারটি নীলকরের অত্যাচারের ফলে বিধ্বস্ত হইয়া গেল এবং 'প্রফুল্ল'র যে পরিবারটি রমেশের ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্তের ফলে বিনষ্ট হইয়া গেল, তাহাদের উভয়ের মধ্যে গঠনের দিক দিয়া ঐক্য আছে। 'নীল-দর্পণে'র পরিবারের কর্ত্রী সাবিত্রী এবং 'প্রফুল্ল'র কর্ত্রী উমাসুন্দরীতে কোন পার্থক্য নাই। উভয়েই এক প্রকৃতির—সরলা, স্নেহশীল, প্রাচীন আদর্শে শ্রদ্ধাবতী। উভয়েই পুত্রশোকে উন্মাদিনী হইয়াছিলেন এবং একথা বুঝিতে ভুল হয় না যে, 'নীল-দর্পণে'র সাবিত্রীর উন্মাদনার সম্পূর্ণ অনুকরণ করিয়াই উমাসুন্দরীর উন্মাদনার পরিকল্পনা করা হইয়াছে। সর্বপ্রথম উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা-বিবাহ' (১৮৫৬) নাটক হইতেই বাংলা নাটকে ইংরেজি নাটকের আদর্শে উন্মাদ চরিত্রের অবতারণার সূচনা হইয়াছিল। দীনবন্ধু তাঁহার 'নীল-দর্পণ' নাটকে (১৮৬০) তাহার ব্যবহার করিবার পর গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'প্রফুল্ল' নাটকে তাহার ব্যবহার করিলেন; কিন্তু 'প্রফুল্ল' নাটক রচনার পরও গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'জনা' নাটকে (১৮৯৩) পুত্র-শোকাতুরা উন্মাদিনী নারীচরিত্রের রূপ পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। তথাপি তাঁহার 'প্রফুল্ল' নাটকেই ইহার প্রথম উল্লেখ-যোগ্য ব্যবহার দেখা যায়। তাহা প্রত্যক্ষভাবে সেক্সপীয়রের পরিবর্তে দীনবন্ধুর 'নীল-দর্পণ' নাটকেরই অনুকরণের ফল বলিয়া মনে হইতে পারে। 'নীল-দর্পণে'র সাবিত্রী মৃতকল্প জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দেখিয়া শোকে উন্মাদিনী হইয়াছিলেন, 'প্রফুল্ল' নাটকের কর্ত্রী উমাসুন্দরীও কনিষ্ঠ পুত্রের কারাবাস হইয়াছে জানিতে পারিয়া তাহার জন্য উন্মাদিনী হইয়াছিলেন। এই উন্মাদ অবস্থা হইতে কাহিনীর শেষ পর্যন্ত সাবিত্রী কিংবা উমাসুন্দরী কেহই নিষ্কৃতি পান নাই। তবে মুহূর্তের জন্য জ্ঞান সঞ্চারিত হইবার ফলে সাবিত্রীর মৃত্যু হয়

প্রফুল্ল নাটকে উমাসুন্দরীর মৃত্যু হয় নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার মধ্যে মৃত্যুর আর কিছুই বাকি ছিল না।

'নীল-দর্পণে'র বসু পরিবারের দ্বিতীয় পুত্রবধূ সরলতা এবং 'প্রফুল্ল' নাটকের যোগেশের পরিবারের দ্বিতীয় বধূ প্রফুল্ল প্রায় অভিন্ন চরিত্র। তবে প্রফুল্ল যেমন কাহিনীর শেষাংশে আসিয়া সহসা পরিণত-বুদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া উঠিয়া বিজ্ঞের মত আচরণ করিয়াছে, সরলতার চরিত্রে তাহা দেখা যায় না। সে কোন অবস্থাতেই তাহার স্বভাব পরিত্যাগ করে নাই, তবে পরিবারের সুখের দিনে সে হাস্যময়ী, দুঃখের দিনে নীরব, তাহার নীরবতার মধ্য দিয়াই তাহার বেদনার প্রকাশ হইয়াছে। কিন্তু প্রফুল্ল শেষ পর্যন্ত মুখরা হইয়া উঠিবার ফলে তাহার চরিত্রের আদ্যোপান্ত সঙ্গতি বিনষ্ট হইয়াছে। 'নীল-দর্পণ' নাটকে সরল নিষ্পাপ চরিত্র সরলতাকে যেমন দৃশ্যের মধ্যেই দর্শকের চোখের সম্মুখেই হত্যা করা হইয়াছে, 'প্রফুল্ল' নাটকেও প্রফুল্ল চরিত্রকেও দৃশ্যের মধ্যেই হত্যা করা হইয়াছে। এমন কি, হত্যার প্রণালীর মধ্যেও বিশেষ পার্থক্য নাই। সরলতাকে উন্মাদিনী শাশুড়ী গলায় পা দিয়া শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা করিয়াছে, প্রফুল্লকেও তাহার ক্রোধোন্মত্ত স্বামী দুই হাতে গলা টিপিয়া হত্যা করিয়াছে। এই দুইটি হত্যাকাণ্ডের একটিও কাহিনীর অনিবার্য পরিণতির পথে অগ্রসর হইয়া না আসিবার জন্য অতি-নাটকীয় (melodrama) লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছে। দুইটি হত্যাকাণ্ড দুইটি নাটকের পক্ষেই ত্রুটি-জনক হইয়াছে। সুতরাং দেখিতে পাওয়া যায়, গিরিশচন্দ্র এখানে দীনবন্ধুর ত্রুটিগুলিও তাঁহার নাটকের মধ্যে অনুসরণ করিয়াছেন।

'নীল-দর্পণ' নাট্যকাহিনীর পরিবারের জ্যেষ্ঠা বধূ সৈরিন্ধ্রী এবং 'প্রফুল্ল' নাট্যকাহিনীর যোগেশের পরিবারের জ্যেষ্ঠা বধূ জ্ঞানদার চরিত্রের মধ্যে বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই। তবে সংলাপের ভাষার ত্রুটিতে সৈরিন্ধ্রীর চরিত্র যেমন একটু আড়ষ্ট রহিয়াছে, জ্ঞানদার তেমন হয় নাই। উভয় পরিবারেরই জ্যেষ্ঠা বধূ কনিষ্ঠাকে সহোদরার মত স্নেহ করে; তাহাদের মধ্যে ঈর্ষা, কলহ, দ্বন্দ্বের কোন ভাব নাই। 'নীল-দর্পণে'র জ্যেষ্ঠা বধূ সৈরিন্ধ্রীর একটি বালক সন্তান আছে, তাহার নাম বিপিন; কিন্তু সে সর্বদাই নেপথ্যে রহিয়াছে; গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'প্রফুল্ল' নাটকে তাহাকে নেপথ্য হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়া যাদব নামে প্রকাশ্য দৃশ্যে স্থাপন করিয়াছেন এবং তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই নাটকের মূল ঘটনাটি পরিকল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু চরিত্রটির বাস্তবধর্ম রক্ষা করিতে পারেন নাই, ইহাকে কৃত্রিম করিয়া তুলিয়াছেন; মনে হয়, সে যেন পৌরাণিক জগতের

কল্পরাজ্য হইতে উড়িয়া আসিয়া কঠিন বাস্তব জগতের ধূলিমাটিতে আছাড় খাইয়া পড়িয়াছে।

'নীল-দর্পণে'র সাধুচরিত্র তোরাপের প্রভুভক্তির কথা 'প্রফুল্ল'র প্রভুভক্ত কর্মচারী পীতাম্বরের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। 'নীল-দর্পণে'র খল-চরিত্র পদী ময়রাণী এবং 'প্রফুল্ল'র অন্যতম খল চরিত্র জগমণির মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা কেবল মাত্র মাত্রাগত, তবে দীনবন্ধুর বাস্তব জীবনবোধ এবং সহানুভূতিগুণ প্রখরতর ছিল বলিয়া পদী ময়রাণী জীবন্ত, সেই তুলনায় গিরিশচন্দ্রের বাস্তব জীবনবোধের অভাবে তাঁহার জগমণি কৃত্রিম। তারপর 'নীল-দর্পণে'র অত্যাচারী চরিত্র ডব্লিউ ডব্লিউ উড্-এর হৃদয়হীনতার সঙ্গে প্রফুল্ল নাটকের রমেশের হৃদয়হীনতার কোন পার্থক্য নাই—উভয়েই যথার্থ অর্থে হৃদয়হীন।

একটি সম্পন্ন যৌথ পরিবারকে আশ্রয় করিয়া যেমন 'নীল-দর্পণে'র কাহিনী পরিকল্পিত হইয়াছে, 'প্রফুল্লে'ও তাহাই হইয়াছে। তবে 'নীল-দর্পণে' পারিবারিক জীবনের আঘাত বাহিরের ঘটনা হইতে আসিয়াছে, অর্থাৎ যে ঘটনার উপর পরিবারস্থ কাহারও কোন হাত ছিল না, তাহা হইতেই ইহাতে আঘাত আসিয়াছে, কিন্তু 'প্রফুল্ল'র পারিবারিক জীবনের উপর আঘাত ভিতর হইতে আসিয়াছে। দুইটি পরিবারই ধ্বংস হইয়া গেল, তবে একটির ধ্বংস রোধ করিবার কোন শক্তি যেমন পরিবারস্থ কাহারও ছিল না, আর একটির সর্বনাশ তেমনই পরিবারস্থ লোক দ্বারাই সম্ভব হইয়াছে। 'নীল-দর্পণ' নাটকে কাহিনীর পরিণতিতে যেমন অতি-নাট্যিক (Melodramatic) ঘটনার পরিবেশ সৃষ্ট হইয়াছে, 'প্রফুল্ল' নাটকেও তাহাই হইয়াছে। নিরপরাধ স্ত্রী-চরিত্রের হত্যা দ্বারা যেমন 'নীল-দর্পণে' করুণরস সৃষ্টির ব্যর্থ চেষ্টা করা হইয়াছে, 'প্রফুল্ল' নাটকেও তাহারই অনুকরণ করা হইয়াছে। উভয় ক্ষেত্রে ফল একই প্রকারের হইয়াছে—নাট্যকাহিনীকে উচ্চ ট্রাজিক মর্যাদা হইতে বিচ্যুত করিয়াছে।

বাংলা সাহিত্যে 'নীল-দর্পণ' নাটকেই সর্বপ্রথম মামলা-মোকদ্দমার উল্লেখ এমন কি, একটি প্রকাশ্য বিচারালয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। তাহাতে আইন ব্যবসায়ের নামে মোক্তারের যে ঘৃণিত মিথ্যার বেসাতির রূপটি প্রকাশ পাইয়াছে তাহা পরবর্তী বহু নাটককেই প্রভাবিত করিয়াছে। গিরিশচন্দ্রও এই ধারাটির বিষয়ে 'নীল-দর্পণ' নাটক হইতেই প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হইবে। তিনি তাঁহার 'প্রফুল্ল' নাটকে একটি প্রকাশ্য বিচারালয়ের অবতারণ করিয়াছেন এবং মামলা-মোকদ্দমা সংক্রান্ত বহু কথা ইহার মধ্যে ব্যবহার

করিয়াছেন। আইন ব্যবসায়ী সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ 'নীল-দর্পণ' নাটকের অনুরূপ। তবে 'নীল-দর্পণ' একান্ত পল্লীজীবন-ভিত্তিক রচনা, সহর সেখান হইতে বহু দূরে ; তাহার পরিবর্তে 'প্রফুল্ল'র ঘটনা নব প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা মহানগরীর কেন্দ্রস্থলে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া তাহাতে নাগরিক জীবনের বহু অভিনব উপকরণ স্বভাবতই আসিয়া মিশ্রিত হইয়াছে।

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'সরলা'র অভিনয় প্রযোজনা করিবার কিছুদিনের মধ্যেই গিরিশচন্দ্র তাঁহার প্রথম সামাজিক নাটক 'প্রফুল্ল' রচনা করিয়াছিলেন ; সেইজন্য কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, 'সরলা' দ্বারা প্রত্যক্ষ ভাবে প্রভাবিত হইয়াই তিনি 'প্রফুল্ল' নাটক রচনা করিয়াছেন। এই কথা সত্য, গিরিশচন্দ্রের প্রযোজনার ও অভিনয়ের গুণে 'সরলা' নাটকের অভিনয় অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। ইহারই সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া গিরিশ-চন্দ্র একখানি সামাজিক নাটক রচনা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। সুতরাং 'সরলা' নাটকের অভিনয় এবং তাহার সাফল্য লক্ষ্য না করিলে গিরিশচন্দ্র কদাচ তাঁহার সামাজিক নাটক 'প্রফুল্ল' রচনা করিতেন কি না সন্দেহ। কারণ, 'সরলা' নাটকের অভিনয়-সাফল্য তাঁহার মনে একটি নূতন বিশ্বাস সৃষ্টি করিল। এদেশের দর্শকগণ পৌরাণিক এবং রোমান্টিক নাটকের অভিনয় দেখিতেই অভ্যস্ত ছিলেন—'সরলা'র অভিনয়ের মধ্য দিয়া দেখা গেল, গার্হস্থ্য জীবনের সুখ-দুঃখের কথা জানিবার এবং দেখিবার জন্যও তাহারা সমান উৎসুক। ইহাতে গিরিশচন্দ্রের মন হইতে একটি সুদৃঢ় সংস্কার ভাঙ্গিয়া গেল। বাঙ্গালীর মধ্যবিত্ত পারিবারিক জীবনের সুখ-দুঃখ লইয়া রচিত নাটক যে ব্যবসায়ের দিক দিয়াও অভিনীত হইবার যোগ্য, এই বিষয়ে তাঁহার আর কোন সন্দেহ রহিল না। গিরিশচন্দ্রের সকল নাটকই প্রেক্ষাগৃহের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া রচিত হইয়াছে, ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চের আর্থিক ক্ষতিসাধন করিয়া কেবল তাঁহার নিজস্ব খাম-খেয়াল মিটাইবার জন্য তিনি কোন নাটক রচনা করেন নাই। 'প্রফুল্ল' সম্পর্কে 'সরলা'র মধ্য দিয়া যদি তিনি এই আশ্বাস কোনদিনই না পাইতেন, তবে তিনি কদাচ কেবল পরীক্ষামূলক কার্যরূপেও সামাজিক নাটক রচনা করিতেন কি না সন্দেহ। তবে 'ম্যাক্‌বেথ' নাটকের অনুবাদ লইয়া অতঃপর তিনি পরীক্ষা-মূলক কার্য (experiment) করিতে গিয়া ব্যর্থ হইয়াছিলেন, এ কথা সত্য।

'সরলা' নাটক যৌথ পরিবারাশ্রিত রচনা, তাহাতেও যৌথ পরিবারের ভাঙ্গনের রূপটি স্পষ্ট করিয়া দেখান হইয়াছে, ইহার পারিবারিক জীবন-চিত্রের

একান্ত বাস্তবানুগত্য সেদিনা বঙ্কিমের রোমান্টিক উপন্যাসের পাঠকদিগকেও চমৎকৃত করিয়াছিল। গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'প্রফুল্ল' নাটকের মধ্যে সেই সুকঠিন বাস্তবানুগত্য কতদূর ফুটাইতে পারিয়াছেন এবং সেই বিষয়ে কতখানি তারক-নাথের অনুসরণ করিয়াছেন, তাহাই আমাদের এখন আলোচ্য।

এ কথা সত্য, দুইটি রচনাই যৌথ পরিবারের সমস্যামূলক রচনা হইলেও 'সরলা'র পরিবার এবং 'প্রফুল্ল'র পরিবারে পার্থক্য আছে। 'সরলা'র পরিবার পল্লীজীবনাশ্রিত, 'প্রফুল্ল'র পরিবার নাগরিক জীবনাশ্রিত। যৌথ পরিবারের ভাঙ্গন নাগরিক জীবনে যত সহজে সম্ভব হইয়াছে, পল্লীজীবনে তাহা তত সহজে সম্ভব হয় নাই। কারণ, পল্লীসমাজ ভূমি-সম্পত্তিভিত্তিক, পূর্বপুরুষার্জিত ভূমির আয় উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সকলেই সমান লাভ করে এবং সেই আয় একই সাধারণ ক্ষেত্র হইতে'উদ্ভূত হয়। এই সকল ক্ষেত্রে যৌথ পরিবারের মধ্যে ভাঙ্গন সহজে দেখা দিতে পারে না। সেইজন্য 'সরলা'র মধ্যে শশিভূষণ এবং বিধুভূষণ দুই ভ্রাতাকে ভূমিসম্পত্তিহীন দরিদ্র বলিয়া উল্লেখ করিয়া শশিভূষণকে জমিদারের কাছারীর কর্মচারী এবং বিধুভূষণকে কর্মহীন বেকার বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে—শশিভূষণ ব্যক্তিগত আয় দ্বারা ধনী এবং বিধুভূষণ বেকার বলিয়া দরিদ্র হইলেন; অবশেষে বিধুভূষণ কর্মের সন্ধানে সহরে আসিলেন। সুতরাং 'সরলা'কেও একান্ত পল্লীজীবনাশ্রিত রচনা বলা যায় না। শশিভূষণ চাকুরি করেন, বিধুভূষণও চাকুরির সন্ধানে সহরে ঘুরিয়া বেড়ান—সহুরে কর্ম দ্বারাই উভয়ের জীবিকার ব্যবস্থা হয়। গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'প্রফুল্ল' নাটকের পরিবারটির এই প্রকার পল্লী ও সহরের দোটানা জীবন হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়া যেখানে যৌথ পরিবার ভাঙ্গিয়া যাইবার সর্ববিধ কারণের উদ্ভব হইয়াছিল, সেখানেই স্থাপন করিয়াছিলেন। সুতরাং যৌথ পরিবারের ভাঙ্গনের দিকটির কঠিনতর বাস্তব রূপটি 'প্রফুল্ল' নাটকের মধ্য দিয়াই প্রকাশ পাইয়াছে, 'সরলা'য় সেই ভাঙ্গনটি অনেকটা জোর করিয়া দেখান হইয়াছে। অতএব 'সরলা' নাটকের যৌথ পারিবারিক জীবনের রূপটি 'প্রফুল্ল' নাটকে গিরিশচন্দ্র অনুকরণ করিলেও, তাহা তিনি উন্নততর করিয়াছেন।

'সরলা'র পরিবার গ্রাম্য নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার, 'প্রফুল্ল'র পরিবার সহরের উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবার। সুতরাং সরলার দুঃখ-দারিদ্র্য প্রফুল্ল ভোগ করে নাই সরলার প্রকৃতি এবং প্রফুল্লর প্রকৃতি প্রথম দিকে অভিন্ন হইলেও প্রফুল্লর মধ্যে কাহিনীর শেষাংশে যে আকস্মিক পরিণত-বুদ্ধির উদয় হইয়াছিল, সরলা

মধ্যে কোন সময়ই তাহা হয় নাই। এই দিক দিয়া সরলার চরিত্রটি অধিকতর বাস্তব, প্রফুল্লর চরিত্র শেষ পর্যন্ত আদর্শমুখী হইয়া গিয়াছে। কাহিনীর দিক দিয়া 'সরলা' নাটকে সরলা চরিত্র যে প্রাধান্য পাইয়াছে, 'প্রফুল্ল' নাটকে প্রফুল্ল চরিত্র সেই প্রাধান্য পায় নাই; বরং ইহাতে যোগেশ চরিত্র প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। 'সরলা'র সরলা ব্যতীত আর বিশেষ কোন চরিত্র 'প্রফুল্ল' নাটকে আনুপূর্বিক অনুকরণ করা হয় নাই। সুরেশের মধ্যে বিধুভূষণের সামান্য একটু প্রভাব অনুভব করা যায়, কিন্তু উভয়ের মধ্যে স্থূল পার্থক্য এই যে, একজন একটি দরিদ্র পরিবারে পত্নী এবং পুত্র লইয়া সংসারী, আর একজন ধনী পরিবারের দায়িত্বজ্ঞানহীন অবিবাহিত যুবক। তবে বিধুভূষণের বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত তাহার আচরণের মধ্যে সুরেশের আচরণের কিছু সম্পর্ক আছে। যোগেশের পরিবারের অন্যান্য স্ত্রী-চরিত্র প্রধানত 'সরলা'র পরিবর্তে দীনবন্ধুর 'নীল-দর্পণ' নাটকের স্ত্রী-চরিত্রগুলির অনুকরণে রচিত হইয়াছে। তবে 'সরলা'র প্রমদা, শ্যামা, গদাধর এবং নীলকমল 'প্রফুল্ল' নাটকে একেবারেই অনুপস্থিত। উভয় নাটকেই স্ত্রী-পুরুষে মিলিয়া একাধিক খলচরিত্র (villain) আছে। 'সরলা'র শশিভূষণের সঙ্গে 'প্রফুল্ল'র রমেশ চরিত্রের কিছু ঐক্য আছে। কিন্তু শশিভূষণ চরিত্রের মধ্য দিয়া যে একটি মানবিক পরিচয়ও বিকাশ লাভ করিয়াছে—তাহার স্ত্রৈণ প্রকৃতির মধ্যে কিংবা তাহার বিপন্ন ভ্রাতার প্রতি প্রচ্ছন্ন স্নেহবোধে সে মধ্যে মধ্যে যে মানবিক গুণের পরিচয় দিয়াছে, রমেশ তাহা দিতে পারে নাই।

সেইজন্য রমেশ প্রাণহীন অত্যাচারের যন্ত্রস্বরূপ হইলেও শশিভূষণকে মানুষ বলিয়া চিনিয়া লইতে ভুল হয় না। বহির্মুখী এই সকল নানা পার্থক্যের মধ্য দিয়াও যে 'সরলা' এবং 'প্রফুল্ল'র মধ্যে অন্তর্মুখীন একটি ঐক্য ছিল, তাহা গভীরভাবে অনুভব করিলে বুঝিতে পারা যাইবে।

উভয় রচনাই বিয়োগান্তক, তবে 'সরলা'র কাহিনীর ধারা একটানা বৈচিত্র্যহীন দুঃখের পাঁচালী মাত্র, 'প্রফুল্ল'র কাহিনী নাটক বলিয়া ইহাতে ঘটনার উত্থান-পতন আছে এবং চরিত্রের বৈচিত্র্য আছে। তবে একথা সত্য, 'সরলা'র করুণ রস গভীরতর, 'প্রফুল্ল' অতিনাট্যিক লক্ষণাক্রান্ত হইবার ফলে ইহার করুণ রস তেমন নিবিড় হইয়া উঠিতে পারে নাই।

উনবিংশ শতাব্দীতে কলিকাতার নাগরিক জীবন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে নব-প্রতিষ্ঠিত সমাজ-জীবনের মধ্যে যে সকল দুষ্ট ক্ষত প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাদের

মধ্যে মদ্যপান যেমন অন্যতম ছিল, মামলা-মোকদ্দমাও তেমনি ছিল। মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা'র ভিতর দিয়া বাংলা নাটকে মদ্যপানের যে কুফল বর্ণনার সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ পর্যন্ত বাংলা নাটকগুলির অবলম্বন হইয়াছিল। এমন কি, সে যুগের বাংলার এমন কোন সামাজিক নাটক কিংবা প্রহসন ছিল না, যাহাতে মদ্যপান সম্পর্কে নিন্দা প্রকাশ করা না হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র যুগের সেই প্রভাবকে স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহার সামাজিক নাটক 'প্রফুল্ল'র নায়ক চরিত্র যোগেশের অধঃপতনের মূলে তাঁহার এই কু-অভ্যাসটিকে আনিয়া যুক্ত করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর কলিকাতার বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজে মদ্যপান প্রায় সামাজিক আচারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল, সমাজ-দেহে ইহা দ্বারা যে বিষক্রিয়া সৃষ্টি হইতেছে, গিরিশচন্দ্র গভীরভাবে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার প্রথম সামাজিক নাটকের নায়ক-চরিত্রের মধ্যেই ইহার রূপটি প্রতিফলিত করিয়াছেন। মধুসূদন যেমন নিজের জীবনে ইহার কুফল অনুভব করিয়াই তাঁহার 'একেই কি বলে সভ্যতা'র ভিতর দিয়া ইহার রূপটি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহারই অনুসরণ করিয়া দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার 'সধবার একাদশী' নাটকের মধ্যে ইহারই পরিচয়টিকে আরও জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, গিরিশচন্দ্রও সেই পথই অনুসরণ করিয়া তাঁহার যোগেশ চরিত্র পরিকল্পনা করিয়াছেন। সুতরাং বাংলা সামাজিক নাটকের একটি ধারা অনুসরণ করিয়াই মাতাল চরিত্র যোগেশের সৃষ্টি হইয়াছে। পারিপার্শ্বিক সমাজের মধ্যে এই রূপটি প্রত্যক্ষ ছিল বলিয়া গিরিশচন্দ্র তাঁহার যোগেশ চরিত্রের মাতাল রূপটিকে জীবন্ত এবং বাস্তব করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু মধুসূদন 'একেই কি বলে সভ্যতা'র মধ্যে মদ্যপায়ী নব-বাবুর যে চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে কেবলমাত্র সবিশেষ কোন চারিত্রিক রূপ ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই—ইহা যেন মদ্যপায়ীর একটি 'টাইপ' বা ছাঁচ মাত্র; বিশেষত তাহার মধ্যে মদ্যপানের জন্যই মদ্যপানের তৃষ্ণা অনুভূত হইত, ইহা তাহার অর্থহীন লোক-দেখানো খেয়াল এবং বিলাসিতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না; কিন্তু মদ্যপায়ী তাহার মদ্যপানের মধ্য দিয়াও যে নাটকের একটি বিশিষ্ট চরিত্র হইতে পারে, তাহা দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার 'সধবার একাদশী'র নিমে দত্তর চরিত্রের মধ্য দিয়া সর্বপ্রথম দেখাইলেন। তাহা সত্ত্বেও তাঁহার পরও অধিকাংশ নাটকেই মদ্যপ কোন বিশিষ্ট নাটকীয় চরিত্ররূপে প্রকাশ পাইতে পারে নাই, কেবলমাত্র মদ্যপায়ীর আদর্শ, টাইপ বা ছাঁচ হইয়া

রহিয়াছে। দীনবন্ধুর পর গিরিশচন্দ্রই যোগেশের মধ্য দিয়া মদ্যপায়ীকে একটি বিশিষ্ট নাটকীয় চরিত্ররূপে গড়িয়া তুলিলেন। সেইজন্য মাতাল হইয়াও যোগেশ সাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারে, তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচার করিয়া, বিশেষত সন্তানতুল্য তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার অকারণ বিশ্বাসঘাতকতা লক্ষ্য করিয়া তাহার অবস্থার প্রতি সকলেরই বেদনা অনুভূত হইতে পারে। কিন্তু কেবলমাত্র 'টাইপ' চরিত্রের প্রতি কৌতুকবোধ হইলেও কোন সহানুভূতির উদ্রেক হইতে পারে না।

যোগেশের মাতলামির একটি ধারা আছে। মদ্যপান করিয়াও কিছুতেই তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া যান না; তিনি কখনও জ্ঞানহারা হইয়া কোনও আচরণ করেন না। বহু জঘন্য আচরণও তিনি তাঁহার মত্ত অবস্থায় করিয়াছেন, কিন্তু সচেতন ভাবেই তিনি তাহা করিয়াছেন। যেমন রমেশের বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে আক্রোশ মিটাইবার জন্য নিজের চুল নিজে টানিয়া ছিঁড়িয়াছেন, নিজের দেহকে নখে আঁচড়াইয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়াছেন। রমেশের সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া তিনি আত্মরক্ষার কোন উপায় যে সন্ধান করিলেন না, তাহা তাঁহার মদ্যপানজনিত বুদ্ধিভ্রংশের ফল নহে—বরং যেন ভ্রাতার বিরুদ্ধে আক্রোশ মিটাইবার উপায় বলিয়াই তিনি তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যে কি, তাহা তিনি যেমন জানিতেন, তেমনই রমেশ যে কি, তাহাও তিনি জানিয়াছিলেন; এমন কি, সুরেশ সম্পর্কেও তাঁহার কোন অজ্ঞতা ছিল না। সেইজন্যই তিনি সহজভাবে তাঁহার জননীকে বলিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার তিনটি পুত্র-সন্তানই সমান—'একটি মাতাল, একটি উকিল, একটি চোর।'

উকিল সম্পর্কেও গিরিশচন্দ্রের ধারণা মাতাল হইতে কোন বিষয়েই উন্নত ছিল না। মামলা-মোকদ্দমা নাগরিক জীবনের অভিশাপরূপে এই দেশে ইংরেজ রাজত্বে প্রথম আত্মপ্রকাশ করিল, পরে পল্লীর নিরুপদ্রব জীবনকেও ইহা গ্রাস করিল। সত্যনিষ্ঠ গিরিশচন্দ্র উকিল-মোক্তারের অসদাচরণ কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেন না। সেইজন্য তীব্রতম ভাষায় তিনি তাহাদের ব্যবসায় এবং তাহার সঙ্গে যাহারা প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত, তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার রচিত 'প্রফুল্ল' নাটকের প্রধান villain বা খল-চরিত্রকে তিনি এটর্নি বা আইন ব্যবসায়ী রূপে পরিচয় দিয়াছেন; মদ্যপান তাঁহার মতে যে শ্রেণীর সামাজিক পাপ, ওকালতি ব্যবসায়ও তাঁহার দৃষ্টিতে সেই শ্রেণীর সামাজিক অপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল।

নাগরিক জীবনের অল্পশিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত সমাজের আইন বিষয়ের অজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া সেদিন যে আইনজ্ঞগণ, যাঁহারা বিপন্ন হইয়া তাঁহাদের দ্বারস্থ হইতেন, তাঁহাদের সর্বনাশ সাধন করিতেন, সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মামলা মোকদ্দমায় জড়িত হইবার ফলে কত মধ্যবিত্ত অল্পশিক্ষিত পরিবার যে নাগরিক জীবনে সেদিন আইন ব্যবসায়ীদিগের নিকট কতভাবে আর্থিক দিক দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, গিরিশচন্দ্র তাহা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, 'প্রফুল্ল' নাটকে তাহারই প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে মাত্র।

বাংলা নাটকের মধ্যে দীনবন্ধু মিত্রই 'নীল-দর্পণ' নাটকে সর্বপ্রথম মিথ্যা মামলা-মোকদ্দমার চিত্র এবং অর্থগৃধ্নু আইন-ব্যবসায়ী দুই মোক্তারের চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। মোক্তারের চক্রান্তে মিথ্যা মোকদ্দমার ফলে সেখানেও একটি পরিবার বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। তাহাতেও নাট্যকার নীলকর পক্ষীয় যে এক মোক্তারের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার মধ্য হইতে গিরিশচন্দ্র আইন-ব্যবসায়ীদিগের সম্পর্কে এই ধারণা সৃষ্টি করিবার প্রেরণা পাইয়াছিলেন। ইহার সঙ্গে তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা আসিয়া মিশ্রিত হইবার ফলে আইন-ব্যবসায়ীদিগের বিরুদ্ধে তাঁহার ঘৃণা তীব্রতম হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু রমেশ কেবল মাত্র নামেই এটর্নি, প্রত্যক্ষ কর্মের মধ্য দিয়া তাহার এটর্নির কোন পরিচয় প্রকাশ পায় নাই। দীনবন্ধুর 'নীল-দর্পণে'র মোক্তারদিগের ঘৃণিত আচরণ তাহাদের প্রত্যক্ষ কর্মের মধ্য দিয়াও প্রকাশ পাইয়াছে। সেই-জন্য আইন-ব্যবসায়ীর প্রতি ঘৃণাবোধ 'নীল-দর্পণ' নাটকের মধ্যে যেমন সক্রিয় হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইয়াছিল, রমেশ কেবল নামে আইন-ব্যবসায়ী বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে ঘৃণাবোধ তেমন তীব্র হইয়া উঠিতে পারে নাই; তাহার অন্যান্য আচরণের জন্য তাহার বিরুদ্ধে পাঠকের বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হইলেও, কেবল মাত্র আইন-ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিবার জন্য তাহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ সৃষ্টি হইবার অবকাশ হয় নাই—কারণ, রমেশ আইনশিক্ষা লাভ করিলেও আইন-ব্যবসায়ী আদৌ ছিল না।

মাতাল, উকিল এবং চোরকে এক শ্রেণীর অন্তর্গত করিয়া যোগেশ সুরেশকেও এখানে রমেশ এবং তাহার নিজের তুল্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার মতে মাতলামি এবং ওকালতি চুরি করার মতই পাপ—সুরেশ, যোগেশ এবং রমেশের মতই পাপী। কিন্তু একথা সত্য, সুরেশ আর যাহাই

হউক, সে রমেশের তুল্য পাপী নহে। সে পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ বলিয়া এবং পিতৃহীন বালকের প্রতি পরিবারস্থ সকলেরই অতিরিক্ত স্নেহের ফলে সে হয়ত মানুষ হইতে পারে নাই, কিন্তু তাহার অপরাধ গুরুতরভাবে কাহাকেও আঘাত করে নাই; নিজে মানুষ না হইলেও অন্যের মনুষ্যত্বও সে কাড়িয়া নেয় নাই। তাহার 'চুরি' প্রকৃত চুরি নহে—রমেশের ষড়যন্ত্রের ফলে সৃষ্ট অপবাদ মাত্র। সুতরাং রমেশ যে স্তরের পাপী, সুরেশ সেই স্তরের পাপী নহে—এমন কি, যোগেশও যে স্তরে অধঃপতিত হইয়াছিলেন, সুরেশ তাহা হইতেও উচ্চতর স্তরে অবস্থান করিয়াছে। সুতরাং যোগেশ, রমেশ এবং সুরেশকে কথনও এক স্তরের পাপী বলিয়া নির্দেশ করা সঙ্গত হয় না। ইহাদের মধ্যে তারতম্য আছে এবং সুরেশই নিঃসন্দেহে ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দোষমুক্ত চরিত্র। তবে ইহা যোগেশের নৈরাশ্যজনিত আক্ষেপোক্তি মাত্র—ইহার বাস্তব মূল্য বিচার করিলে ইহা এই নাটকে সর্বথা সমর্থনযোগ্য হইবে না।

পৌরাণিক নাটক রচনায় সিদ্ধহস্ত গিরিশচন্দ্র তাঁহার প্রথম সামাজিক নাটকখানির মধ্য দিয়াও মধ্যে মধ্যে পৌরাণিক নাটক রচনার সংস্কার অতিক্রম করিতে না পারিয়া এমন দুই একটি চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাদের পরিচয় কেবল মাত্র সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনের উপরিস্তরে সীমাবদ্ধ নহে—পৌরাণিক নাটক-সুলভ কোন কোন চরিত্রের মত ইহাদের মধ্য দিয়া কোন কোন সময় সুগভীর ইঙ্গিত প্রকাশ পাইয়াছে। এই শ্রেণীর একটি চরিত্র মদন ঘোষ। গিরিশচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল যে, বহির্মুখী দৈন্য অন্তরের ঐশ্বর্য লাভের অন্তরায় নহে; মানুষের মহত্ত্ব সম্বন্ধে এই বিশ্বাস লইয়াই তিনি তাঁহার শেষ জীবনের অবতার-চরিতমূলক নাটকগুলি রচনা করিয়াছেন। কিন্তু অবতার-চরিত্রমূলক নাটকগুলির প্রেরণা যে তাঁহার পৌরাণিক নাটক রচনার যুগেই উদ্ভূত হইয়া তাহা সামাজিক এবং ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্য দিয়াও প্রচ্ছন্নভাবে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, তাহা 'প্রফুল্ল' নাটকের মদন ঘোষ এবং 'সিরাজদ্দৌল্লা' নাটকের করিম চাচা প্রভৃতি চরিত্র দ্বারা প্রমাণিত হয়। এখানে মদন ঘোষের কথাটি একটু বিস্তৃত করিয়া বুঝাইয়া বলি।

মদন ঘোষ প্রফুল্ল নাটকের নায়ক যোগেশের পরিবারভুক্ত কোন চরিত্র নহে—কিন্তু ঐ পরিবারের সঙ্গে তাহার দীর্ঘদিনের পরিচয় আছে বলিয়া জানা যায়। যোগেশ তাহাকে 'পাগল' বলিয়া জানেন, সে কথনও নিরুদ্দিষ্ট হইয়া যায়, আবার কথনও আসিয়া আবির্ভূত হয়। সে কলিকাতায় আসিয়া আবির্ভূত

হইলে যোগেশের গৃহে আশ্রয় পায় বলিয়া মনে হয়। এই নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কেই দেখা গেল, সে নিরুদ্দিষ্ট জীবন হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। যোগেশ সেই সংবাদ উমাসুন্দরীকে দিয়া বলিয়াছেন, 'মা, সে পাগ্‌লা মদন ঘোষ ফিরে এসেছে।' জননী উমাসুন্দরী ব্যগ্র হইয়া তাহার সন্ধান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথায়, কোথায়?' যেন তাহার আসিবার জন্যই তিনি অধীরভাবে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। যোগেশ জানাইলেন, তাহাকে বাস করিবার জন্য বাহিরে একটি ঘর দেওয়া হইয়াছে। উমাসুন্দরীর বিশ্বাস, 'সে পাগল নয়, অমনি পাগ্‌লামো করে বেড়ায়!' তিনি বলেন, 'ও সব লোক কি ধরা দেয়?'

আমাদের দেশে বহির্মুখী দৈন্য আত্মার অসীম ঐশ্বর্যকে কোনদিনই গোপন রাখিতে পারে নাই। দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাধনার পরিচয় তখন কলিকাতার শিক্ষিত জনসাধারণের দৃষ্টিতে আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাঁহাকে তখন সকলে 'পাগ্‌লা ঠাকুর' বলিয়া জানিত। অথচ বহির্মুখী আচার আচরণে যাঁহাকে সেদিন দশজন 'পাগল' বলিয়াই জানিয়াছে, তাঁহার অন্তরে কী অতুল ঐশ্বর্যের পরিচয় প্রচ্ছন্ন হইয়া ছিল! তাহাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া বিশ্ববাসীর আত্মিক কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ চিরকাল ধরিয়াই এমনই দেশ, উলঙ্গ সন্ন্যাসী গাছের নীচে ধুনি জ্বালাইয়া দিনের পর দিন কি আনন্দে যে রৌদ্র-বৃষ্টি মাথায় করিয়া নিরাহারে অর্ধাহারে দিন কাটান, তাহা বাহির হইতে সকলে সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারে না, কিন্তু ইঁহাদেরও আত্মা মধ্যে মধ্যে এমন ঐশ্বরিক ঐশ্বর্যের স্পর্শ পায়, যাহার জন্য ব্যবহারিক দুঃখ তাঁহাদের কাছে দুঃখ বলিয়া মনে হয় না। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবন ও সাধনা গিরিশচন্দ্রের জীবনকে কতভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল, কেবলমাত্র অবতার-চরিতমূলক নাট্যরচনায় নহে—বাংলার সাধারণ ঘরোয়া বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া রচিত নাটকের মধ্যেও যে সেই পুণ্য জীবনের শুচিস্পর্শ সঞ্চারিত করিয়া দিয়া তাহাও যে তিনি কি ভাবে পবিত্র করিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন, মদন ঘোষের চরিত্র তাহারই প্রমাণ। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 'প্রফুল্ল' নাটক রচনার পূর্বেই তাঁহার অধিকাংশ অবতার-চরিতমূলক নাটক লিখিত হইয়াছিল, যেমন 'চৈতন্যলীলা' (১৮৮৬), 'বুদ্ধদেব চরিত' (১৮৮৭), 'রূপ-সনাতন' (১৮৮৮) ও 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' (ঐ); সুতরাং গিরিশচন্দ্রের ভক্তি ও বিশ্বাস-রসাশ্রিত চিত্তভূমির যে অংশ হইতে মহাপুরুষের জীবনীমূলক এই নাটকগুলি রচিত

হইয়াছিল, তাঁহার ১৮৮৯ সনে রচিত 'প্রফুল্ল' নাটকের মধ্যেও সেখান হইতেই আর একটি মহাপুরুষের কল্পনা ইতিহাস এবং জনশ্রুতির পরিবর্তে তাঁহার মনের মধ্য হইতে উদিত হইয়াছিল—মদন ঘোষের চরিত্রটি তাহাই।

মহাপুরুষমাত্রই আপাতদৃষ্টিতে 'পাগল'। সংসারের বাঁধাধরা পথে যে চলে না, সে-ই সমাজের নিয়মে পাগল; অথচ সংসারের বাঁধাধরা পথে চলেন না বলিয়াই মহাপুরুষ মহাপুরুষ। সেইজন্য মহাপুরুষকে আমরা পাগল বলিয়া ভুল করি।

'প্রফুল্ল' নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে মদন ঘোষের আবির্ভাব যে নাট্যকাহিনীর পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল, তাহার চরিত্র কেবলমাত্র পাগল বলিয়াই যে তাহার আগমন এবং নির্গমন যাত্রাগানের বিবেকের মত স্বেচ্ছাচার-প্রসূত নহে, গিরিশচন্দ্র সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এই চরিত্রটিকে ইহার মধ্যে আনিয়া স্থান দিয়াছেন। মদন ঘোষের পাগলামির একটি ধারা আছে। তাহার মুখে শুধু একটি কথাই শুনিতে পাওয়া যায়, 'বংশটা লোপ হ'লো'! যোগেশের পরিবারের শোচনীয় পরিণতির পূর্বমুহূর্তে আবির্ভূত হইয়া সে যেন ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করিয়া সকলকে সাবধান করিতে চাহিল যে, 'বংশটা লোপ পায় যে'; ইহা যেন যোগেশের পরিবারের একমাত্র সন্তান যাদবের আসন্ন হত্যা-ষড়যন্ত্রের পূর্বগামিনী সাবধানবাণী মাত্র। সুতরাং ইহা তাহার নিরর্থক পাগলামি মাত্র নহে। সমগ্র কাহিনীর মধ্য দিয়া সে বারবার এই কথাই বলিয়া বলিয়া যেন যাদবের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সতর্কবাণী শুনাইয়া গিয়াছে। আমরা সাধারণ-বুদ্ধি মানুষ, তাহাকে পাগল বলিয়া মনে করিয়াছি, কিন্তু সে তাহার প্রজ্ঞার দৃষ্টি দ্বারা সত্যকে যেন প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইয়াছে। শুধু মুখে এই কথা বলাই নহে, শেষ পর্যন্ত কাহিনীর মধ্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া যোগেশের বংশরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে; তাহার সহায়তা ব্যতীত কিছুতেই যাদবের প্রাণরক্ষা পাইত না, কিংবা কাহিনীর পরিণামে অন্যায়কারী কোন শাস্তিভোগও করিতে পারিত না। সুতরাং তাহার পাগলামি ব্যর্থ পাগলামি ছিল না। কাহিনীর সর্বত্র যে সে বলিয়া গিয়াছে,—'কি ন বংশরক্ষা, বংশরক্ষা।' ইহা যেন 'প্রফুল্ল' নাটকের অন্তর্নিহিত আত্মার ক্রন্দনধ্বনি রূপে কাহিনীর সর্বত্র ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। কিন্তু পাগলের কথা যেমন কেহ কান পাতিয়া শুনে না, তাহার কথাও আমরা কান পাতিয়া শুনি নাই—অথচ তাহার কর্তব্য সে নিরন্তর করিয়া গিয়াছে, সত্য-

আসিয়া হৃদয়ের দ্বারে বার বার করাঘাত করিয়া ফিরিয়া গিয়াছে, মোহাচ্ছন্ন হৃদয় লইয়া তাহা আমরা অনুভবও করিতে পারি নাই। সুতরাং মদন ঘোষ এই নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র। ইহার আচার আচরণ দেখিয়া ইহাকে সাধারণ বলিয়া মনে হয়, সেইজন্য ইহার গুরুত্ব প্রায় কেহই উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

কিন্তু মদন ঘোষ চরিত্র সম্পর্কে একটি কথা আছে। একটি সুমহতী বাণীর বাহক এবং একটি মহৎ উদ্দেশ্যের সাধকরূপে নাট্যকার তাহাকে এই নাটকের মধ্যে আনিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার দ্বারা দলিল চুরির মত একটি ঘৃণ্য ব্যবহারিক আচরণ কেন তিনি সিদ্ধ করাইলেন? ব্যবহারিক জীবনের এই সকল নিতান্ত পার্থিব ধূলিমলিন বিষয় হইতে তাহাকে দূরে রাখিলেই কি ভাল হইত না? ইহা এই চরিত্রের একটি ত্রুটি বলিয়াও মনে হইতে পারে। কিন্তু এমনও মনে হইতে পারে যে, তাহার মধ্যে একদিক দিয়া মহাপুরুষের প্রেরণা, আর একদিকে রক্তমাংসের দেহের প্রেরণা—ইহাদের উভয়েরই একটি দ্বন্দ্ব ছিল; সেইজন্যই সে পাগল ছিল, নতুবা সে পরিপূর্ণ মহাপুরুষই হইতে পারিত। সেইজন্য বিবাহ করাইবার লোভ দেখাইয়া তাহাকে দিয়া দলিল চুরির মত ঘৃণ্য আচরণ করান সম্ভব হইয়াছে। ইহাকে চরিত্র সৃষ্টির ত্রুটি হিসাবে দেখিলে তাহাতে যে কি দোষ ঘটিয়াছে, সেই বিষয়ে পরে আলোচনা করিয়াছি।

যোগেশ 'প্রফুল্ল' নাটকের নায়ক-চরিত্র, তাঁহার আচরণের জন্যই কাহিনীর বিয়োগান্তক পরিণতি অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। নাটকের প্রথম দৃশ্যে তাঁহার মুখের কথা হইতে জানিতে পারা যায় যে, তিনি অত্যন্ত দীন অবস্থা হইতে কেবলমাত্র নিজের পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও সততার গুণে বিশেষ সম্পন্ন ব্যক্তিতে পরিণত হইয়াছেন। তাঁহার এই বিষয়ক উক্তি হইতে তিনি যে একজন অত্যন্ত বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি তাহাই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু পরবর্তী দৃশ্যগুলির ভিতর দিয়া তিনি যে প্রত্যক্ষ আচরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার সম্পর্কিত উক্ত বিশ্বাস সৃষ্টি হইবার পক্ষে বিরোধী। তিনি বহুকাল যাবৎই মদ্যপান করিতেন; কাহিনীর সূচনা হইতেই দেখা যায়, তাহার মাত্রা তিনি একটু বাড়াইয়া দিয়াছেন এবং সেজন্য স্ত্রীর অনুযোগের ভাগী হইয়াছেন। স্ত্রী তাঁহার সম্পর্কে অভিযোগ করিয়া নিতান্ত বিরক্তি সহকারে বলিতেছেন, 'আগে দিনে ছিল না, এখন আবার দিনে একটু হয়েছে; ঐ এক কাচ্চা চন্নামেত্তর মুখে না দিলেই নয়?' সুতরাং যোগেশ নিজের মুখের কথায় নিজের যে চরিত্রগুণ ও আত্মত্যাগের কথা কীর্তন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার

প্রত্যক্ষ আচরণ দ্বারা সমর্থিত হইতেছে না; এমন কি, তাঁহার চরিত্রগুণ ও আত্মত্যাগের কথায় তাঁহার স্ত্রীও সায় না দিয়া তাঁহার একটি চারিত্রিক আচরণ সম্পর্কে অভিযোগ করিতেছে। আত্মপ্রশংসা দ্বারা তিনি তাঁহার চরিত্রের গুণ নিজে যতখানি ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন, স্ত্রীর মুখ হইতে তাঁহার আচরণ সম্পর্কে অভিযোগ দ্বারা তাহা ততোধিক ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। স্ত্রীর হাত হইতে মদের বোতল চাহিয়া লইয়া, কনিষ্ঠ ভ্রাতার চোখের সম্মুখেই বোতল হইতে মদ ঢালিয়া পান করিয়া তাঁহার চারিত্রিক গুণ যে কতদূর বিকাশলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহা বুঝাইয়া বলিবার আবশ্যক করে না। এমন কি, স্ত্রীও তাঁহার মদ্যপানের আধিক্য দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন, 'ও মা আবার ঢাল্‌ছ কেন?' তিনি তাহার জবাবে কেবল মাত্র বলিয়াছেন, 'বড় বৌ আজ বড় আমোদের দিন।' মদ্য পান করিয়া যে আমোদ করে, তাহার চরিত্র সম্পর্কে কোন উচ্চ ধারণা সৃষ্টি করা কঠিন হইয়া পড়ে। কারণ, মদ্য পান কেবল এই যুগেই নয়, উনবিংশ শতাব্দীর মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা' রচনাকাল হইতেই নিন্দিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং এ কথা যদি কেহ বলেন যে, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সমাজে ইহাই শিষ্টাচার ছিল, তবে তাহাও স্বীকার করা যাইবে না। দেখা যাইতেছে যে, স্ত্রী পর্যন্ত স্বামীর আচরণে ঘৃণা ও আতঙ্ক প্রকাশ করিতেছে। তারপর এই শ্রেণীর চরিত্রের যাহা হয়, তাহাই হইয়াছে। নিজ কর্মচারীর মুখ হইতে 'ব্যাঙ্ক বাতি জ্বেলেছে', এই সংবাদ শুনিবামাত্র নিজের সর্বনাশ সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া ফেলিলেন 'আবার ফকির হলুম।' তিনি প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই ফকির হইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করিবার ফলে তিনি যে কবে ধনী ছিলেন, তাহা তাঁহার মুখের কথা ব্যতীত আচার-আচরণে কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় নাই। সুতরাং তাঁহার সম্পর্কে সহানুভূতিই হউক, কিংবা কোন প্রকার ঔৎসুক্যই হউক, পাঠকের পক্ষে সৃষ্টি হওয়া কঠিন। তারপর তিনি যে, 'গেল একদিনে গেল, ভোজবাজী ফুরিয়ে গেল', ইত্যাদি আক্ষেপোক্তি করিতে করিতে নির্বিচার মদ্যপানের পথ ধরিয়া চলিলেন, তাহার কোন অংশেই তাঁহার প্রতি নূতন করিয়া পাঠকের সহানুভূতি আর জাগ্রত হইতে পারে নাই। কিন্তু যে ব্যক্তি নিতান্ত দরিদ্র অবস্থা হইতে কেবলমাত্র নিজের চেষ্টায় বিপুল ঐশ্বর্য সঞ্চয় করিয়াছে, তাহার পক্ষে এই বিষয়-বুদ্ধিহীন হৃদয়াবেগ-প্রবণতা যেমন অসম্ভব, তেমনই অস্বাভাবিক।

তারপর প্রফুল্লর কথায় শুনা যায়, তিনি মদ খাইয়া 'দিদিকে লাথি মেরেছেন, ছেলেটাকে চড় মেরেছেন, মাকে গালাগালি দিয়েছেন'; সুতরাং তাঁহার সর্বনাশের আর কিছুই বাকি ছিলনা, এই অবস্থায় তাঁহার চরিত্রের কেবল দোষের দিকটাই নাট্যকার নানাভাবে দেখাইয়াছেন; গুণের দিকটা কিছুই ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। 'প্রফুল্ল' নাটক পাঠ করিলে, কিংবা ইহার অভিনয় দেখিলে ইহার নায়ক যোগেশ চরিত্রের বিশেষ যে কি গুণ ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। গুণ কেবলমাত্র নিজের মুখের কথায় প্রকাশিত, কাজে তাহার কিছুই প্রকাশ পায় নাই। তবে দেখা যায়, প্রথম অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কেই যোগেশ একটু প্রকৃতিস্থের মত কথা কহিতেছেন, মদ্যের প্রভাব সাময়িকভাবে কাটাইয়া উঠিয়া তাঁহার বিষয় আশয়ের একটা বন্দোবস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, 'সুনাম' এবং 'সাধুতা' রক্ষা করিবার কথা মুখে বার বার শুনা যাইতেছে, তারপর যেই মুহূর্তে রমেশ চক্রান্ত করিয়া মুখ-খোলা একটি মদের বোতল তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া চলিয়া গেল এবং সেই মুহূর্তেই শিশুপুত্র যাদব আসিয়া বলিল, 'ছোটকাকাবাবু চোর হ'য়েছে, কাকীমার মাকড়ী নিয়ে গিয়েছে'—সেই মুহূর্তে তিনি খোলা মদের বোতল সম্পূর্ণ উপুড় করিয়া গলায় ঢালিতে গিয়া বলিলেন, 'এই যে সুরাদেবী! যখন কৃপা ক'রে এ'সেছ, আমি পরিত্যাগ কর্‌বো না; আজ থেকে তোমার দাস!' এই বলিয়া পুনরায় নির্বিচার মদ্যপানের স্রোতে গা ভাসাইয়া চলিলেন। মনে হয়, শিশুপুত্রের মুখের কথাটা একটা উপলক্ষ্য মাত্র, মদ্যপানই তাঁহার চরিত্রের মূল লক্ষ্য। নতুবা মাকড়ী চুরি সম্পর্কে কিছুমাত্র কৌতূহলী কিংবা অনুসন্ধিৎসু না হইয়া তিনি যে হাত বাড়াইয়া মদের বোতলটির গ্রীবা ধারণ করিয়া তাহা কণ্ঠে নিঃশেষ করিয়া ঢালিয়া দিলেন, ইহার আর কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। সুতরাং তাঁহার আচরণে কোনও মহত্তর দিক প্রকাশ পায় নাই; যে দিকটা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার উপর একটা বিয়োগান্তক নাটকের নায়ক-চরিত্রের ভিত্তি রচিত হইতে পারে না। কারণ, নায়কের চরিত্রের মধ্যে কোন না কোন গুণ থাকা আবশ্যক, নির্বিচার মদ্যপান ছাড়া যোগেশ চরিত্রের আচরণে (কথায় নহে) কোন গুণ প্রকাশ পায় নাই।

মাতাল হইলেও যোগেশ সচেতন মাতাল। কারণ, রমেশ যে তাঁহাকে মদ খাওয়াইয়া দলিল সহি করিয়া লইয়া গিয়াছে, এই বিষয়টি মত্ত অবস্থায়ও তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং বুঝিতে পারিয়াও সই করিয়া নিজের ও নিজের

স্ত্রীপুত্রের সর্বনাশ নিজ ইচ্ছায় ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। কারণ, তিনি নিজেই বলিতেছেন, 'রমেশ মাতাল দেখে সই করিয়ে নিয়ে গেল।' (১।৪) এই কথা যদি তিনি বুঝিয়া থাকেন, তবে তিনি কেন যে সই করিয়াছিলেন, তাহাও বুঝিতে পারা কঠিন। পূর্বেই বলিয়াছি, ব্যাঙ্ক সত্যই 'ফেল' পড়ে নাই, এমন কি, ব্যাঙ্কের দেওয়ান বাড়ী বহিয়া যোগেশকে এই সংবাদ দিতে আসিয়াছিল; কিন্তু তখন যোগেশ সংবাদ পাইলে কাহিনী আর অগ্রসর হইতে পারে না, যোগেশের মাতলামি সংযত হইয়া যাইতে পারে, সেইজন্য দেওয়ান বাড়ী আসিয়াও সেই সংবাদ যোগেশকে দিতে পারিল না, বরং রমেশকে দিল। যোগেশ পীতাম্বরের মুখ হইতে ব্যাঙ্ক ফেল পড়িবার মিথ্যা সংবাদ শুনিবার পর হইতে ব্যাঙ্কে গিয়া কিংবা বাহির হইয়া অন্য কাহারও নিকট কোন সংবাদ লন নাই; যোগেশের এই আচরণ কেবল অসম্ভব নহে, অস্বাভাবিকও বটে।

যোগেশ সজ্ঞানে ধাপে ধাপে নিচের দিকে নামিয়াছেন। যে ব্যক্তি দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইয়াছেন, তাঁহার এই সজ্ঞান অধঃপতন কোনদিক হইতেই সম্ভব নহে; কারণ, ইহা বিষয়বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক, কিন্তু তিনি যে বিষয়বুদ্ধিহীন নহেন, সেকথা ত তাঁহার মুখ হইতেই শুনিয়াছি। ক্রমে যোগেশের চরিত্র এমন একটি স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়া গেল, যেখানে মানব-চরিত্রের স্বাভাবিক পরিচয় তাঁহার মধ্য হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তিনি মদ্যপানে উন্মত্ত, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য, নিজের এবং পরিবারের স্ত্রীপুত্রের সর্বনাশ সকল দিক দিয়া পূর্ণ করিয়া তুলিবার পথের পথিক। সুতরাং তাঁহার মধ্যে স্বাভাবিক মানব-চরিত্র বিকাশের আর কোন অবসর নাই।

যোগেশের চরম অধঃপতনের মধ্যেও যে তিনি তাঁহার 'সাজান বাগান শুকিয়ে গেল' বলিয়া বার বার খেদোক্তি করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্যটিও লক্ষ্য করিবার বিষয়। পূর্বে যে বলিয়াছি, তিনি সচেতনভাবেই সর্বনাশের পথে অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন, ইহার মধ্য দিয়াও তাহারই পরিচয় প্রকাশ পায়। পরিপূর্ণ মত্ততার মধ্যেও তাঁহার মুহূর্তের জন্যও আত্মবিস্মৃতি আসে নাই; কিন্তু, মদ্যপানের মধ্য দিয়া মানুষ আত্মবিস্মৃতিরই সন্ধান করিয়া থাকে। ইহাই যোগেশের জীবনের করুণতম ট্রাজিডি। তাঁহার চরিত্রের মধ্যে যে দৃঢ়তার অভাব ছিল, তাহাই তাঁহার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে অশান্তিতে বিদ্ধ করিয়াছে। যে শ্রেণীর চরিত্র মদ্যপানের মধ্যে আত্মবিস্মৃতির সুলভ উপায় অনুসন্ধান করিয়া থাকে, যোগেশের চরিত্র তাহাদের অপেক্ষা কঠিনতর

উপাদানে গঠিত; সেইজন্যই তাঁহার অশান্তি কেহই দূর করিতে পারে নাই।

(খল-চরিত্র (Villain) বর্ণনা প্রসঙ্গে রমেশের কথা একবার উল্লেখ করিয়াছি। 'প্রফুল্ল' নাটকের বিয়োগান্তক পরিণতির জন্য তাহার দায়িত্ব সর্বাধিক। অতএব তাহার চরিত্র-রূপায়ণ যদি অবাস্তব ও অসঙ্গত হইয়া থাকে, তবে ইহার বিয়োগান্তক কাহিনীও যে রসোত্তীর্ণ হইতে পারে না, তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, তাহার চরিত্রই সর্বাপেক্ষা অস্বাভাবিক হইয়াছে। যোগেশ তাহাকে 'মানুষ' করিয়াছেন বলিয়া সে নিজেই ঘোষণা করিয়াছে, তারপর মনুষ্যত্বের যে পরিচয় সে দিয়াছে, তাহা দেখিয়া মানুষ মাত্রই শিহরিয়া উঠিবে। সে মুখে প্রচার করিয়াছে, 'আমি সম্প্রতি এটর্নি হ'য়েছি।' কিন্তু তাহার এটর্নির কাজ কেবলমাত্র নিজ পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সর্বনাশ সাধনেই নিয়োজিত হইয়াছিল; প্রকৃত এটর্নির বেশে কোর্টের আঙিনায় একদিনের জন্যও তাহাকে দেখা যায় নাই; বরং হাতে হাতকড়ি পরিয়া আসামী সাজিতে দেখা গিয়াছে। সুতরাং পরিচয় অনুযায়ী নাট্যকার তাহার চরিত্রকে রূপ দিতে পারেন নাই। প্রফুল্লর মত দেবীতুল্য চরিত্রের পার্শ্বে রমেশের নারকীয় রূপ যে বৈপরীত্য সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার একটি নাট্যিক সার্থকতা ছিল; কিন্তু চরিত্রগুলিই যদি রক্তমাংসে গঠিত না হয়, তবে কোন নাটকীয় গুণই তাহাদের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতে পারে না। রমেশের মত চরিত্রের সঙ্গে নাট্যকারের রক্তমাংসের পরিচয় ছিল না বলিয়াই নাট্যকারের বৈপরীত্য সৃষ্টির প্রয়াসও সার্থক হইতে পারে নাই।

এটর্নি শ্রেণীর অভিজাত চরিত্রের কেবলমাত্র বাহিরের ব্যবসায়ী রূপটাই নাট্যকার লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহার শিক্ষা-দীক্ষা অভিজাত জীবন-পরিচয় ইত্যাদির কোন সন্ধানই তিনি জানিতেন না। সেইজন্য এক অতি হীন পরিবেশে এক এটর্নির পরিচয় তিনি ইহাতে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। নাট্যকারের সে প্রয়াস সার্থক হয় নাই। রমেশ উদ্দেশ্যহীনভাবে অন্যায়ের পর অন্যায় আচরণ করিয়া গিয়াছে। গিরিশচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনে উকিল এটর্নি আইন-আদালত সম্পর্কে যে সকল তিক্ত অভিজ্ঞতা সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাই রমেশের পরিকল্পনায় রূপ পাইয়া তাহার চরিত্রকে অবাস্তব করিয়া তুলিয়াছে। সেইজন্য খলচরিত্ররূপেও ইহা সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই।)

যোগেশের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরেশের চরিত্রটি নানাদিক দিয়া বৈশিষ্ট্যপূর্ণ

হইয়া উঠিয়াছে। সে পরিবারের কনিষ্ঠ সন্তান, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও বিধবা জননীর অত্যধিক স্নেহে এবং কুসঙ্গ-দোষে যৌবনে উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির হইয়াছে সত্য, কিন্তু তথাপি তাহার অন্তরের অন্তস্তলে আর একটি সুরেশ ছিল; সে যেমন উদার, তেমনই দৃঢ়প্রকৃতির। রমেশের ষড়যন্ত্রে বিপন্ন ভ্রাতার প্রতি সে যে কর্তব্য পালন করিতে পারে নাই, সেইজন্য তাহাকে অনুতাপ করিতে শুনিতে পাই; ষড়যন্ত্র করিয়া রমেশ যখন তাহাকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিতে চাহিল, তখন নিজের স্বার্থরক্ষায় সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিল। সুতরাং যোগেশের চরিত্রে যে গুণ নাই, সুরেশের চরিত্রে তাহা আছে; ইহার মধ্যেই তাহার যথার্থ মানবিক গুণের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। রমেশের ষড়যন্ত্র-জালে সে যোগেশের মত নিজেকে ধরা না দিয়া যে তাহা হইতে আত্মরক্ষার জন্য সংগ্রাম করিয়াছে, ইহাতেই তাহার চরিত্রের যথার্থ নাটকীয় গুণটিও বিকাশ লাভ করিয়াছে। আঘাতের মধ্য দিয়া অনেক সময় মানুষের সুষুপ্ত আত্মা জাগিয়া উঠে, তাহারও জীবনে তাহাই হইয়াছিল। রমেশের নিকট হইতে আঘাত পাইয়াই সে সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল, নতুবা হয়ত সে পঙ্ককুণ্ডের অতল তলে তলাইয়া যাইত। দোষে-গুণে যে মানুষের পরিচয়, একমাত্র সুরেশই এই নাটকে তাহার প্রমাণ। নতুবা 'প্রফুল্ল'র অন্যান্য চরিত্রগুলি হয় কেবলমাত্র গুণের উপাদান, নতুবা কেবল দোষের উপাদানে গঠিত হইয়াছে। কিন্তু কাহিনীর মধ্যে সুরেশ চরিত্রটি যথাযথ প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই।

'প্রফুল্ল' নাটকের যাদব চরিত্র গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের সংস্কার অনুসরণ করিবার ফল, সে কথা পূর্বেও বলিয়াছি। বাস্তব শিশুর মনস্তত্ত্ব গিরিশচন্দ্র উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, এই চরিত্রটি তাহারই প্রমাণ।

সুরেশের বন্ধু শিবনাথ আদর্শমূলক চরিত্র। সে একজন প্রচ্ছন্ন মহাপুরুষ—দাতা ও পরোপকারী। সুরেশের মত ব্যক্তির সঙ্গে তাহার বন্ধুত্ব যে কি ভাবে সম্ভব হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। যোগেশের কর্মচারী পীতাম্বরও এই শ্রেণীর চরিত্র। শিবনাথ তাহার সম্পর্কে বলিয়াছে, 'অমন লোক আর হবে না।' কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যোগেশের সর্বনাশের সূচনা তাহার দ্বারাই হইয়াছিল। মদ্যপানরত যোগেশকে ব্যাঙ্ক ফেল হইবার দুঃসংবাদটি সে-ই আসিয়া সোজাসুজি শুনাইয়া দিয়াছিল; সাধারণতঃ অপ্রিয় সংবাদ যেমন লোকের মধ্যে প্রকাশ করিবার অনিচ্ছা দেখা যায়, কিংবা সোজাসুজি প্রকাশ না করিয়া অন্যভাবে সময় ও সুযোগ মত বলা হয়, পীতাম্বর মত উদার চরিত্রই হউক, এই

সামান্য বুদ্ধিটুকুর অধিকারী ছিল বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং সে যত পরোপকারী ব্যক্তিই হোক, তাহার নির্বুদ্ধিতার জন্যই, বিশেষত যে নির্বুদ্ধিতার জন্য যোগেশের সর্বনাশ হইল, তাহাই তাহার চরিত্রের মধ্যে একটি দাগ ফেলিয়া দিল, শত শুভ সঙ্কল্প সত্ত্বেও তাহার সে দাগ কিছুতেই মুছিল না।

কাঙ্গালীচরণের কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, সে খল-চরিত্র। উকিল সম্পর্কে গিরিশচন্দ্রের যেমন কোন শ্রদ্ধাবোধ ছিল না, ডাক্তার সম্পর্কেও তেমনই অশ্রদ্ধা ছিল বলিয়া মনে হয়। পরবর্তী কালেও একজন নাট্যকার ডাক্তারের সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, ডাক্‌তার (ডাক্তার) নহে, 'ডাক্ আত' অর্থাৎ ডাকাত, কাঙ্গালী তাহাদেরই একটি রূপ। কিন্তু কাহিনীর মধ্যে তাহার অংশ যে একেবারে অপরিহার্য ছিল, তাহা নহে; একমাত্র রমেশের দ্বারাই সকল দুষ্কার্য সাধিত হইতে পারিত। রমেশ যেমন এটর্নিগিরি করে নাই, কাঙ্গালীকেও তেমনই কোথাও ডাক্তারি করিতে দেখা যায় না। সে সুদে টাকা খাটায়, রমেশের নির্দেশ মত শিশুকে বিষপ্রয়োগে সাহায্য করে। তাহার মধ্যেও মানবিক অনুভূতির সন্ধান পাওয়া যায় না।

ভজহরির কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কি ভাবে যে সে অন্তরের মধ্যে বেদনার একটি বোঝা লইয়া বাহিরে রঙ্গ পরিহাস করিতেছে, তাহার হাসি যে তাহার চাপা কান্না ছাড়া আর কিছুই নহে, সে কথাই নাট্যকার তাহার চরিত্রের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তবে তাহার জীবনের বেদনার দিকটি কাহিনীর নেপথ্যে ঘটিয়াছে এবং কাঙ্গালী ও সুরেশের প্ররোচনায় যোগেশের সর্বনাশ করিবার দিকটিই রঙ্গমঞ্চে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া তাহার সম্পর্কে এই ভাবটি পাঠকের মনে খুব স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই।

'প্রফুল্ল' নাটকের স্ত্রী-চরিত্রগুলির কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছি যে, ইহারা প্রধানত 'নীল-দর্পণ'এর স্ত্রী-চরিত্রের অনুকরণেই সৃষ্ট হইয়াছে। প্রথমত উমাসুন্দরীর কথাই যদি ধরা যায়, তবে দেখা যায় যে, তিনি সাবিত্রীর একটি প্রতিরূপ মাত্র। সাবিত্রী পুত্রশোকের আকস্মিক আঘাতে উন্মাদিনী হইয়াছিলেন, উমাসুন্দরীও কনিষ্ঠ পুত্র সুরেশের জেল হইবার সংবাদে উন্মাদিনী হইয়াছিলেন। কিন্তু সাবিত্রীর উন্মত্ততার একটি মনোবিজ্ঞানসম্মত কারণ ছিল, উমাসুন্দরীর তাহা ছিল না। পাগলের পাগ্‌লামিরও যে একটা ধারা আছে তাহা দীনবন্ধু যেমন বুঝিয়াছিলেন, গিরিশচন্দ্র তেমন বুঝিতে পারেন নাই।

সেইজন্য সাবিত্রীর পাগলামি সার্থক হইয়াছে, কিন্তু উমাসুন্দরীর পক্ষে তাহা সার্থক হইয়াছে, একথা বলিতে পারা যায় না।

'প্রফুল্ল'র জ্ঞানদা চরিত্রও 'নীল-দর্পণে'র সৈরিন্ধ্রী চরিত্রের প্রতিচ্ছায়া মাত্র। তবে সৈরিন্ধ্রীর ভাষায় যে আড়ষ্টতা ছিল, জ্ঞানদার ভাষায় তাহা ছিল না; কলিকাতা অঞ্চলের সহজ ও স্বাভাবিক মেয়েলী ভাষাই তিনি তাঁহার সংলাপে ব্যবহার করিয়াছেন। 'নীল-দর্পণে' সৈরিন্ধ্রীর মৃত্যু দেখা যায় নাই, কিন্তু 'প্রফুল্লে' জ্ঞানদার একটি মৃত্যুদৃশ্যের অবতারণা করা হইয়াছে। তাহাতে দেখা গেল, পথে পড়িয়া তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার এই মৃত্যুদৃশ্যটি অত্যন্ত অস্বাভাবিক হইয়াছে। মৃত্যু এখানে অনিবার্যভাবে তাঁহার জীবনে আসে নাই, বরং কাহিনীর প্রয়োজনে একান্ত অস্বাভাবিক ভাবেই আসিয়াছে। তথাপি নাটকের প্রথম অংশে তাঁহার চরিত্র অনেকখানি বাস্তবানুগ বলিয়াই অনুভূত হয়। তিনি গিরিশচন্দ্রের অন্যান্য নারীচরিত্রের মত পতির যে কোন আচরণকেই মাথা পাতিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই; যেখানে ত্রুটি দেখিয়াছেন, সেখানে ঘৃণা ও তিরস্কার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কোন সতর্কতাই যোগেশকে সর্বনাশের পথ হইতে রক্ষা করিতে পারিল না।

প্রফুল্ল চরিত্রের কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহা যে একদিকে 'নীল-দর্পণে'র সরলতা এবং অন্যদিকে 'স্বর্ণলতা'র সরলা চরিত্রের প্রভাব-জাত তাহা অস্বীকার করা যায় না। অভিনয়-সূত্রে এই দুইটি রচনার সঙ্গেই গিরিশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল এবং ইহাদের চরিত্রের তাৎপর্য তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও প্রফুল্ল-চরিত্রের স্বাতন্ত্র্যও ছিল। নাটকের প্রথম অংশে প্রফুল্লকে নাট্যকার মূঢ়া বালিকা করিয়াই চিত্রিত করিয়াছেন; মদ খাওয়া যে কি, তাহা সে জানে না; যোগেশকে মাতলামি করিতে দেখিয়া বিশ্বাস করিয়াছে, কে-তাহাকে কি খাওয়াইয়া দিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে কলিকাতার নাগরিক জীবনে বাস করিয়া এই বিষয়ক তাহার অজ্ঞতা তাহার সরলতার নামান্তর বলিয়াই নাট্যকার প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু নাটকের শেষ দৃশ্যেই দেখা গেল, সে পরিণতবুদ্ধি প্রবীণা নারীর মতই কথা বলিতেছে। পঞ্চম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে সে স্বামীকে বলিতেছে,—'তুমি এখনো প্রতারণা কচ্ছো? তোমায় অধিক কি বল্‌বো, তুমি কার জন্য এ' সর্বনাশ কচ্ছ? তুমি কার জন্য সহোদরকে পথের ভিখারী করেছ? কার জন্য কনিষ্ঠকে জেলে দিয়েছ? কার জন্য

বংশধরকে অনাহারে মেরে টাকা রোজগার কচ্ছ? ......এ মহাপাতকে লাভ কি? পরকালের কথা দূরে থাকুক, ইহকালে কি সুখলাভ করবে? সদাশিব বড় ভাই মদে উন্মত্ত; মা পাগলিনী হ'য়েছেন, ছোট ভাই কয়েদ খেটেছে, বংশের একটি ছেলে অনাহারে মৃত্যু শয্যায়—এ ছবি তোমার মনে উদয় হ'বে, তোমার জীবনে কি সুখ, আমি ত বুঝ্‌তে পাচ্ছি নি'। রমেশও বোধ হয় তাহার মুখ হইতে এমন কথা শুনিতে প্রস্তুত ছিল না, তাই বলিল,—'দেখ প্রফুল্ল, ছোট মুখে বড় কথা কস্‌নি। ভাল চাস্ ত দূর হ', নইলে তোকে খুন কর্‌ব।' এটর্নির পক্ষে যোগ্য উত্তর সন্দেহ কি?

ভারতীয় সনাতন নারীত্বের আদর্শ সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র শ্রদ্ধাশীল ছিলেন; সেইজন্য যোগেশের মত স্বামীরও পায়ের উপর মাথা রাখিয়া জ্ঞানদার মৃত্যুর অবকাশ দিয়াছেন; স্বামীকে অধর্মের পথ হইতে নিবৃত্ত করিতে প্রফুল্ল সাহায্য করিয়াছে। সে স্বামীকে নিজের মুখেই বলিয়াছিল, 'আমি সতী, আমার কথা শোন—যদি মঙ্গল চাও, আর ধর্মবিরোধী হয়ো না!' প্রফুল্লকে গিরিশচন্দ্র সর্ববিষয়ে আদর্শ ভারতীয় সতী নারী রূপেই প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্র তাঁহার পৌরাণিক নাটকে যে 'গৈরিশ ছন্দ' বা ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাঁহার সামাজিক নাটক রচনার ভাষায় তাহা পরিত্যাগ করিয়া তাহাতে আদ্যোপান্ত গদ্যের ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু রামনারায়ণের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া দীনবন্ধু পর্যন্ত যেমন সামাজিক নাটকে গদ্য ভাষার মধ্যেও চরিত্রের পরিচয় অনুযায়ী ভাষার রূপ নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, গিরিশচন্দ্র তাঁহার সামাজিক নাটকে গদ্য সংলাপ ব্যবহার করিলেও চরিত্রের পরিচয় অনুযায়ী ভাষার রূপ নিয়ন্ত্রিত করিতে যান নাই। তাঁহার সামাজিক নাটকের ভাষার মধ্যেই বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম নাটকীয় সংলাপের ভাষার এক অখণ্ড রূপ প্রকাশ পাইল। নাটকীয় চরিত্রগুলিকে বাস্তব রূপ দিবার প্রয়াস হইতেই সংস্কৃত নাটকেও যেমন চরিত্রানুযায়ী ভাষার পরিকল্পনা করা হইত, বাংলা নাটকেও সেই প্রবৃত্তি হইতেই এই রীতির উদ্ভব হইয়াছিল। যদি তাহা না হইত, তবে যে-দীনবন্ধুর সঙ্গে সংস্কৃত নাটকের কোন সম্পর্কই ছিল না, তিনিও প্রত্যেকটি চরিত্রের পরিচয় অনুযায়ী ভাষার পরিকল্পনা করিতেন না। তবে গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে একটি কথা বলিতে পারা যায় যে, তিনি একটি মাত্র অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া যেমন কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন, তেমনই প্রধানত এক শ্রেণীর চরিত্রই তাঁহার কাহিনীর উপজীব্য ছিল—ইহাদের শিক্ষায়, দীক্ষায়,

সামাজিক সংস্কারে বিশেষ কিছু পার্থক্য ছিল না। কেবল একটি মাত্র চরিত্র ইহার ব্যতিক্রম ছিল, তাহা রমেশ। সে উচ্চশিক্ষিত, সুতরাং রামনারায়ণ কিংবা দীনবন্ধুর নীতি অনুসরণ করিলে তাহার মুখে যে ভাষা শুনিতাম, গিরিশচন্দ্রের পরিকল্পিত রমেশের মুখে সে ভাষা শুনিতে পাই নাই—সেও অন্যান্য অশিক্ষিত এবং ইতর শ্রেণীর চরিত্রের মতই ভাষা ব্যবহার করিয়াছে। তাহার ভাষায় এবং আচরণে শিক্ষা কিংবা উচ্চ-সংসর্গের কোন প্রভাব নাই ; সে কথা পূর্বেও উল্লেখ করিয়াছি। গিরিশচন্দ্র বাংলা কথ্যভাষার একটি রূপের সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন—তাহা উত্তর কলিকাতা অঞ্চলের অশিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত জনসাধারণের ভাষা। সেই ভাষাই কেবলমাত্র যে তিনি তাঁহার সামাজিক নাটকগুলিতে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাই নহে—তাঁহার রচিত পৌরাণিক নাটকের মধ্যেও যেখানে তাঁহার গদ্যসংলাপ ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হইয়াছে, সেখানেও তাহাই ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার পৌরাণিক নাটকের বিদূষক, বিদূষকপত্নী যে ভাষায় কথা বলিয়াছে, তাঁহার কাঙ্গালী-জগমণিও সেই ভাষায়ই কথা বলিয়াছে ; এমন কি, রমেশ এবং প্রফুল্লও যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছে, তাহাও ইহা হইতে বিশেষ স্বতন্ত্র নহে। অবশ্য একথাও সত্য যে, গিরিশচন্দ্রের সমসাময়িককালে উত্তর কলিকাতা এবং দক্ষিণ কলিকাতায় কোন সুস্পষ্ট পার্থক্য সৃষ্টি হয় নাই ; ইহার কারণ, দক্ষিণ কলিকাতার তখন জন্মই হয় নাই। সুতরাং গিরিশচন্দ্র যে গদ্য সংলাপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা তদানীন্তন কলিকাতারই ভাষা ছিল, উত্তর কলিকাতার বলিয়া স্বতন্ত্র কিছু ছিল না।

প্রত্যেক জাতির ভাষার মধ্যেই একটি বিশেষ প্রাণশক্তি (vitality) আছে। জাতির প্রবাদ-প্রবচন, বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ ইত্যাদি ব্যবহারের মধ্য দিয়াই ভাষার সেই প্রাণশক্তির প্রকাশ হইয়া থাকে। কিন্তু এই বিষয়ে রামনারায়ণ, দীনবন্ধু, এমন কি, অমৃতলাল বসুরও যে অধিকার ছিল, গিরিশ-চন্দ্রের তাহা ছিল না ; ইহাদের ব্যবহার তাঁহার গদ্যভাষায় যে তুলনায় অকিঞ্চিৎ-কর, সেই তুলনায়ই তাঁহার ভাষা দুর্বল।

যদিও গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটক রচনাতেই সর্বাধিক দক্ষতা দেখাইয়াছেন এবং তাঁহার পৌরাণিক নাটকই সংখ্যার দিক দিয়া অধিক, তথাপি একথা সত্য যে, তাঁহার 'প্রফুল্ল' নাটকখানি সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। তিনি সমসাময়িক সমস্যা অবলম্বন করিয়া আরও কয়েকখানি নাটক রচনা করিয়া-

ছিলেন সত্য, যেমন, 'বলিদান', 'শাস্তি কি শাস্তি' প্রভৃতি [তথাপি 'প্রফুল্ল' নাটকখানির জনপ্রিয়তা তাঁহার অন্য কোন সামাজিক নাটক স্পর্শও করিতে পারে নাই। ইহার কারণ একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক।

প্রথমত দেখা যায়, 'প্রফুল্ল' নাটক যে জনপ্রিয়তা একদিন অর্জন করিয়াছিল, আজ আর তাহার সেই জনপ্রিয়তা নাই। আজ ব্যবসায়ী কিংবা সৌখীন রঙ্গমঞ্চে ইহাকে অভিনীত হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না, একমাত্র কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকা ব্যতীত ইহার আর কোথাও স্থান নাই। ইহা হইতে এ কথাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, সমসাময়িকতার গুণই ইহার ব্যাপক জনপ্রীতির কারণ ছিল। কিন্তু সেই গুণগুলি কি?

দেখা যায় যে, বাংলা রঙ্গমঞ্চের বিশিষ্ট কয়েকজন অভিনেতা গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটকের যোগেশ চরিত্রে অভিনয় করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ (দানীবাবু) এবং শিশিরকুমারের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। গিরিশচন্দ্র স্বয়ং যোগেশের ভূমিকায় বহু রাত্রি অভিনয় করিয়া অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন, তাহার ফলে যোগেশের কতকগুলি সংলাপ প্রবচনের মত কলিকাতার নাগরিক সমাজের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রথমত অভিনয়ের গুণে সমসাময়িককালে ইহার জনপ্রিয়তা অত্যন্ত ব্যাপক হইয়াছিল।

দ্বিতীয়ত দেখা যায়, সমসাময়িক বিষয়বস্তুর সমসাময়িক কালে বিশেষ একটা আবেদন প্রকাশ পায়; কিন্তু সেই কাল এবং যুগ-পরিবেশ উত্তীর্ণ হইয়া গেলে তাহার জনপ্রিয়তাও হ্রাস পায়। গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা যুগন্ধরের প্রতিভা। তাঁহার সকল নাটকেই যুগের প্রেরণা সক্রিয় দেখিতে পাওয়া যায়। 'প্রফুল্ল' নাটকের মধ্য দিয়াও উনবিংশ শতাব্দীর যুগচিত্রের জীবন্ত পরিচয় যে কি ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। সুতরাং এই নাটকের মধ্যে সমসাময়িক সমাজ-জীবনের যে রূপটি প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা তৎকালীন দর্শকদিগের মধ্যে বিশেষ আবেদন সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছিল। মদ্যপান তখন সমগ্র কলিকাতার নাগরিক সমাজের এক দুরন্ত ব্যাধি রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল; সুতরাং মদ্যপানের কু-ফলের চিত্রগুলি দেখিবার জন্য সেই সমাজ স্বভাবতই ঔৎসুক্য বোধ করিয়াছে। তখন ঘরে ঘরেই যৌথ পরিবার ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল; তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' হইতেই তাহার চিত্র সাহিত্যের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছিল; 'প্রফুল্ল'

নাটকের মধ্যেও তাহার রূপটি প্রত্যক্ষ করিয়া সমসাময়িক দর্শকসমাজ নিজেদের পরিবারিক জীবনের অবস্থার সঙ্গে তাহার তুলনা করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। সেই জন্তই ইহা দর্শকদিগের অত্যন্ত রুচিকর হইয়াছিল।

তৃতীয়ত বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গিয়াছে, প্রধানত স্ত্রীচরিত্রের স্বার্থপরতার জন্তই সেদিন যৌথ পরিবারগুলি ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। তারকনাথের 'স্বর্ণলতা'র মধ্যেও তাহাই নির্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু গিরিশচন্দ্র স্ত্রীজাতির ভারতীয় সনাতন আদর্শ সম্পর্কে বিশ্বাসী ছিলেন, তাহাদের দ্বারা পারিবারিক জীবনে কোন অনিষ্ট হইতে পারে, একথা তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই। সেই আদর্শের উপর লক্ষ্য রাখিয়াই তিনি প্রফুল্ল চরিত্রের পরিকল্পনা করিলেন। ইহাতে দেখা গেল, স্বার্থপর পুরুষই যৌথ পরিবার ধ্বংস করিবার জন্ত দায়ী, বরং নারী প্রাণ দিয়া তাহা রক্ষা করিবারই প্রয়াস পাইয়াছিল। নারীচরিত্রের এই মহত্ত্বের দিকটার প্রতিও সে দিন সমাজ শ্রদ্ধাশীল হইয়া উঠিয়াছিল। চারিদিককার সামাজিক অধঃপতনের মধ্যে একটি উচ্চ আদর্শমূলক স্ত্রীচরিত্র সমাজের সকল ঔৎসুক্য সহজেই আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

সর্বশেষে উল্লেখযোগ্য যে, মধ্যে মধ্যে নাটকের সংলাপে যে জনহিতকর বক্তৃতা শুনিতে পাওয়া গিয়াছে, তাহাও সমসাময়িক শ্রোতার উদ্দেশ্তেই নাট্যকার প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাদের মধ্য দিয়া সমাজ-সেবার যে শুভেচ্ছা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাও সমসাময়িক সমাজের শিক্ষার কাজ করিয়াছে। যেমন জ্ঞানদার সংলাপের এক স্থানে শুনিতে পাওয়া যায়—

'আমি কি কর্‌বো বোন, সহরে অলিতে গলিতে শুঁড়ির দোকান, কিনে খেলেই হ'ল। আহা! কোম্পানীর রাজ্যে এত হচ্ছে, যদি মদের দোকানগুলি তুলে দেয়, তা হলে ঘরে ঘরে আশীর্বাদ করে, আর লোকে, ভাতার-পুত নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর করে (৩।৫)।' এই বক্তৃতাধর্মী সংলাপ শুনিবার সে দিনে সমাজের বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

ভাগ্য-বিপর্যয়ের কাহিনী সাহিত্যের চিরন্তন কাহিনী। ইহার যোগেশ চরিত্রের ভাগ্য-বিপর্যয়ের মধ্যে মানুষ নিয়তির যে ক্রিয়া দেখিতে পাইয়াছে, তাহাতে নিজেদের জীবনেও নিয়তির শক্তি অনুভব করিয়াছে। কিন্তু তথাপি একথা সত্য, যদি চিরন্তন নিয়তিবাদের বিরুদ্ধে মানুষের অসহায় অবস্থার প্রতি

লক্ষ্য রাখিয়াই ইহা রচিত হইত, তবে আজিও ইহার জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ণ হইত না। সুতরাং যুগাশ্রয়িতাই ইহার জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ।

দীর্ঘকাল যাবৎ গিরিশচন্দ্র এবং তাঁহার সমসাময়িক অন্যান্য নাট্যকারগণ তাঁহাদের নাটকের মধ্য দিয়া বাঙ্গালী দর্শককে কেবলমাত্র পৌরাণিক কাহিনী শুনাইতেছিলেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী তাহার নিজের ঘরের কথাও সাহিত্যের মধ্য দিয়া শুনিতে চাহিয়াছিল। সেই জন্য বঙ্কিমের সমসাময়িক কালে আবির্ভূত হওয়া সত্ত্বেও তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' উপন্যাস-খানি এত ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ইহা হইতেই গিরিশচন্দ্র উপলব্ধি করিলেন যে, পৌরাণিক কাহিনী শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর নিজের ঘরের কথাও শুনিবার আগ্রহ জাগ্রত হইয়াছে। ইতিপূর্বে বাংলাদেশে সমাজ-জীবনাশ্রিত যে সকল নাটক রচিত হইয়াছিল, তাহা প্রধানত বৃহত্তর কোন সামাজিক বা রাজনৈতিক সমস্যা অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছিল, 'স্বর্ণলতা' ব্যতীত পারিবারিক জীবনের নিবিড় রূপ অন্য কোন রচনার মধ্য দিয়া প্রকাশ হইবার সুযোগ পায় নাই। বিশেষত গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'প্রফুল্ল' নাটকে জীবনের যে পরিচয়টি প্রকাশ করিলেন, তাহা নাগরিক জীবনাশ্রিত পরিবার। রামনারায়ণই হোন কিংবা দীনবন্ধুই হোন, তাঁহারা তাঁহাদের সামাজিক নাটক কিংবা প্রহসনগুলির ভিতর দিয়া যে সমস্যার কথা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে একদিকে যেমন পল্লী-জীবন এবং তাহার সমস্যার রূপায়ণ দেখা গিয়াছে, তেমনই অন্যদিকে সে সকল সমস্যার অধিকাংশেরই মূল্য ছিল একান্ত সমসাময়িক। কুলীনের বহু বিবাহ শিক্ষাবিস্তার দ্বারা ইতিমধ্যেই দূরীভূত হইয়া গিয়াছিল ; এমন কি, নীলকরের অত্যাচারও লাঘব হইয়াছিল ; বিশেষত নীলকরের অত্যাচার নাগরিক সমাজের নিকট নিতান্ত গৌণ ছিল, ইহা তাহাদের চোখের সম্মুখেও ঘটে নাই। অথচ যোগেশের পারিবারিক জীবনের সমস্যাটি নাগরিক সমাজের নিকট অতি পরিচিত হওয়ায়, নগরের দর্শক সমাজ ইহাতে বিশেষ কৌতূহল অনুভব করিয়াছে। মধুসূদন তাঁহার 'একেই কি বলে সভ্যতা' কিংবা দীনবন্ধু তাঁহার 'সধবার একাদশী' প্রভৃতি নাটকের ভিতর দিয়া নাগরিক সমাজের আচার-আচরণের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইঁহারা নাগরিক সমাজের বিকৃত কিংবা দূষিত স্থানটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছিলেন ; কিন্তু গিরিশচন্দ্র শুধু ইহার বিকৃত কিংবা দূষিত রূপটিই দেখান নাই, ইহার মধ্যে শিবনাথ, পীতাম্বরের মত, কিংবা জ্ঞানদা,

প্রফুল্লর মত উচ্চ নৈতিক-আদর্শে উদ্বুদ্ধ পুরুষ ও নারী চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। বিশেষত প্রফুল্লর চরিত্রের ভিতর দিয়া সমাজ একথা উপলব্ধি করিয়াছিল যে, স্ত্রীজাতির মধ্যে কল্যাণী শক্তি তখনও তিরোহিত হইয়া যায় নাই। প্রফুল্ল আত্মত্যাগ দ্বারা জ্ঞানদার শিশুপুত্রকে রক্ষা করিয়া স্বামীর অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করিয়া, নিজের ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিল; ইহা সে দিনের নাগরিক দর্শকগণের নিকট আশার বাণী বহন করিয়া আনিয়াছিল। প্রফুল্ল চরিত্রের মধ্য দিয়া সমাজ সেদিন নিজেদের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে নূতন এক আশার আলো দেখিতে পাইয়াছিল। এই বিষয়টিও 'প্রফুল্ল' নাটককে জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল।

'প্রফুল্ল' নাটকের একটি নৈতিক মূল্যও ছিল। যদিও ইহাতে সৎকার্যের কোন পুরস্কারের উল্লেখ নাই বটে, তথাপি ইহাতে অসৎকার্যের শাস্তি পাওয়ার কথার উল্লেখ আছে। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের মধ্যে এই ভাবটি প্রায় সর্বত্রই প্রকাশিত হইয়াছে এবং এই সামাজিক নাটকখানির মধ্য দিয়াও তিনি তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। 'নীল-দর্পণ' নাটকে অন্যায়কারী কোন শাস্তি পায় নাই, তোরাপ কেবলমাত্র ছোট সাহেবের নাসিকাগ্রটি ছিন্ন করিয়া আনিয়াছিল; কিন্তু 'প্রফুল্ল' নাটক অন্যায়কারীর দণ্ডলাভের ভিতর দিয়া কাহিনী পরিসমাপ্ত হইয়াছে। এই বিষয়টিও সাধারণের বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

'হারানিধি' গিরিশচন্দ্রের একখানি মিলনান্তক সামাজিক নাটক। ইহার বিষয়বস্তুও গিরিশচন্দ্রের অন্যান্য সামাজিক নাটকেরই অনুরূপ। বাল্যবন্ধু ধনী ও দুশ্চরিত্র মোহিনীমোহনের বিশ্বাসঘাতকতায় কলিকাতার মধ্যবিত্ত গৃহস্থ হরিশ কি ভাবে বিপন্ন হইয়া পড়িয়া অবশেষে অনুতপ্ত সেই বন্ধুর সহিত পুনর্মিলিত হয়, তাহারই কাহিনী ইহাতে ব্যক্ত হইয়াছে। চরিত্রগুলি অধিকাংশই রক্ত-মাংসের সম্পর্কহীন। হরিশের পুত্র নীলমাধবের চরিত্রের উপর দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত 'নীল-দর্পণ'এর নবীনমাধবের প্রভাব বিশেষভাবেই অনুভূত হয়। কেবলমাত্র দলিল, রেহান, জামীন, নীলাম, ডিক্রি, ক্রোক, দখল ইত্যাদি মামলা-মোকদ্দমা সম্পর্কিত বিষয়ের মধ্যেই হরিশের ভাগ্য পরিবর্তন নিবদ্ধ রহিয়াছে— প্রকৃত নাট্যিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়া তাহা প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে পারে নাই, সেইজন্য এই মিলনান্তক নাটকের ফল তত কার্যকরী বলিয়া মনে হয় না। হরিশের দূর সম্পর্কীয় ভ্রাতা নব, ও মোহিনীর রক্ষিতা কাদম্বিনী এই নাটকের

দুইটি আদর্শ সাধুচরিত্র, ইহাদের সহায়তায় মিলন নিষ্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু নাটকের মধ্যে চরিত্র দুইটির সংযোগ খুব নিবিড় নহে; বিশেষত চরিত্র দুইটির অস্বাভাবিকতা অত্যন্ত পীড়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছে। অঘোর কলিকাতার বাটপাড়ের একটি প্রতিমূর্তি। মোহিনী ও অঘোরের চরিত্রের আকস্মিক পরিবর্তনের উপরই নাটকের মিলনাত্মক পরিণতি নির্ভর করিয়াছে, অথচ ইহাদের এই পরিবর্তনের কারণ খুব সুসঙ্গত ও সুস্পষ্ট নহে। গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকের মধ্যে বিয়োগান্তক নাটকই যে মিলনান্তক নাটক অপেক্ষা কতকটা শক্তিশালী, তাহা এই নাটকখানি হইতেই প্রমাণিত হইবে।

দৃশ্যত বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত গিরিশ-চন্দ্রের 'মায়াবসান' নাটকখানি একখানি পূর্ণাঙ্গ বিয়োগান্তক রচনা; ইহার কাহিনীটি সংক্ষেপে এই—

কালীকিঙ্কর বসু একজন প্রবীণ ভদ্রলোক, তিনি বিপত্নীক। সংসারে এক পুত্র ছিল, তাহার দিকে তাকাইয়া দ্বিতীয় বার দার-পরিগ্রহ করেন নাই। যথাকালে পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু পুত্র ও পুত্রবধূ উভয়েই অকালে কালগ্রাসে পতিত হইল। কালীকিঙ্কর তখন জ্ঞানচর্চায় সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন, এক নিরাশ্রয়া বৈষ্ণবী-কন্যাকে নিজের কন্যার মত লালন পালন করিতে লাগিলেন, তাহাকে নানা বিদ্যায় পারদর্শিনী করিয়া তুলিলেন। বৈষ্ণবী-কন্যার নাম রঙ্গিণী, বৈষ্ণবীর নাম বিন্দু। কালীকিঙ্করের দুই ভ্রাতুষ্পুত্র ও এক ভাগিনেয় ছিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর ভ্রাতুষ্পুত্র দুইটিকে নিজেই প্রতিপালন করিতেছিলেন, মাতৃপিতৃহীন ভাগিনেয়টিকেও শৈশব হইতেই প্রতিপালন করিয়াছিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্র দুইটির নাম যাদব ও মাধব এবং ভাগিনেয়ের নাম হলধর। ভ্রাতুষ্পুত্র দুইজন বিবাহিত, কিন্তু হলধর অবিবাহিত। যাদবের স্ত্রীর নাম নিস্তারিণী ও মাধবের স্ত্রীর নাম মন্দাকিনী। কালীকিঙ্করের আর একজন বিধবা ভ্রাতুষ্পুত্র-বধূ ছিল, তাহার নাম অন্নপূর্ণা। অন্নপূর্ণা সর্বজ্যেষ্ঠা এবং সে-ই বৃদ্ধ খুড়শ্বশুরকে পিতার মত যত্ন করিত। স্বামিপরিত্যক্তা হইয়া নিস্তারিণী ও মন্দাকিনী পিত্রালয়ে বাস করিত, তাহারা দুই সহোদরা ভগিনী। কালীকিঙ্করের সংসার-জীবন নির্বিঘ্নেই কাটিতেছিল, কিন্তু তাহার প্রতিবেশী সাতকড়ি ইহার মধ্যে দুষ্টগ্রহের মত প্রবেশ করিল। সে যাদব ও মাধবকে তাহাদের পিতৃব্য [illegible] বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিতে লাগিল, তাহার ফলে কালীকিঙ্করকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিয়া সকল বিষয়-

সম্পত্তি তাহার নিকট হইতে নিজেরা গ্রহণ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। গণপতি শর্মা নামক এক গণক বিষ যোগাইল। পোর্টের সঙ্গে বিষ মিশাইয়া রাখা হইল। অন্নপূর্ণা বিষের কথা কিছু না জানিয়া কালীকিঙ্করের কথামত তাহার খাইবার পূর্বে সেই পোর্টের বোতল তাহার হাতে দিল, খাইয়া কালীকিঙ্কর অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রাণে বাঁচিয়া গেলেন। এই ঘটনার সূত্র ধরিয়া পুলিশ আসিল এবং সাতকড়ি ও তাহার এটর্নিদের সহায়তায় যাদব-মাধবের পারিবারিক স্বার্থদ্বন্দ্ব নানা বিচিত্র গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। জ্যেষ্ঠা বধূ অন্নপূর্ণার কলঙ্কিনী অপবাদ রটিল, ইহাতে সে গৃহত্যাগ করিয়া গেল, বিন্দু বৈষ্ণবী তাহার সন্ধানে বাহির হইল; যাদব ও মাধব নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত চিত্তে নিজেরাও অন্নপূর্ণার সন্ধান করিতে গেল, ছদ্মবেশে তাহাদের স্ত্রীগণও তাহাদের সঙ্গিনী হইল। পতি-পাগলিনী হইয়া একাকিনী পথে পথে ঘুরিয়া যখন অন্নপূর্ণার জীবনের অন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত হইয়াছে, তখন বিন্দু বৈষ্ণবী তাহার সাক্ষাৎ পাইল। ক্রমে একে একে সকলেই তাহার শ্মশান-শয্যাপার্শ্বে আসিয়া সমবেত হইল। সকলের চোখের সম্মুখে অন্নপূর্ণা অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। গণপতি শর্মা আসিয়া সেখানে বিষপানে আত্মহত্যা করিয়া নিজের প্রায়শ্চিত্ত করিল।

গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাট্যরচনার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি এখানে সকলই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। পারিবারিক স্বার্থদ্বন্দ্বজাত মামলা-মোকদ্দমা, ঋণ-ডিক্রিজারী, উইল ইত্যাদির মধ্য দিয়া পরিকল্পিত আকস্মিক ভাগ্য-বিপর্যয়ের উপর ভিত্তি করিয়াই গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকগুলি প্রধানত রচিত হইয়াছে;—'মায়াবসান' নাটকে তাহার সকল দিকগুলির সঙ্গেই সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। ইহার মধ্যে বাহিরের দ্বন্দ্বই চরিত্রগুলির অন্তরের সৌন্দর্য আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে—এমন কি, যে নারীচরিত্রের মধ্য দিয়া বাঙ্গালী পারিবারিক জীবনের নিজস্ব রূপটি সাধারণত ধরা পড়ে, ইহাতে সেই নারীচরিত্রগুলিকেও বাহিরের বিক্ষোভের মধ্যে আনিয়া স্থাপন করিবার ফলে ইহাদেরও কোন বৈশিষ্ট্য ইহাতে প্রকাশ পায় নাই। অতএব বাংলার নিজস্ব সামাজিক জীবনের পরিবেশের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের এই নাটকটির পরিকল্পনা করা হয় নাই বলিয়া এদেশের যথার্থ সমাজ-জীবনের কোন পরিচয় ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পায় নাই।

কালীকিঙ্কর নাটকের প্রধান চরিত্র, তাঁহাকে নাটকের নায়ক বলা

যাইতে পারে। কিন্তু এই চরিত্রটি আনুপূর্বিক আদর্শবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইঁহার মধ্যে রক্তমাংসের কোন সম্পর্ক অনুভব করা যায় না। তিনি তাঁহার জীবনের আদর্শ সম্পর্কে নাটকের উপসংহারে বলিতেছেন, 'তোমায় এতদিন উপদেশ দিয়েছি—পরের উপকার করো; আমিও পরহিতে জীবন উৎসর্গ করেছিলাম। কিন্তু শান্তি পাইনি কেন জানো? মুখে বল্‌তেম্—নিষ্কাম ধর্ম—নিষ্কাম ধর্ম; কিন্তু অভিমান ফলকামনা ছাড়ে না। সুখ-আশায় পরহিত করেছি, ধর্ম উপার্জন করতে পরহিত করেছি, আত্মোন্নতির জন্য পরহিত করেছি,—ফলকামনায় পরহিত করেছি। আজ গঙ্গাজলে সব বিসর্জন দিয়ে পরকার্যে রইলেম; রইলেম কি—জগতে মিশ্‌লেম।' (৫।৩)

নিষ্কাম কর্মের আদর্শ বিচার করাই এই নাটকখানির প্রধান উদ্দেশ্য। কালীকিঙ্করের ভিতর দিয়া এই আদর্শই প্রচার করা হইয়াছে, তাঁহার আর কোন পরিচয় এই নাটকের মধ্যে পরিস্ফুট হয় নাই। একটি স্ত্রী-চরিত্রের ভিতর দিয়াও এই একই আদর্শ প্রচার করা হইয়াছে, তাহা কালীকিঙ্করের শিষ্য রঙ্গিণীর চরিত্র। রঙ্গিণী শিষ্যা হইয়াও আর এক দিক দিয়া কালীকিঙ্করের গুরু —সে তাঁহাকে ক্ষমাগুণ শিক্ষা দিয়াছে। এইভাবে নিষ্কাম কর্মের আদর্শ ও ক্ষমাগুণের মাহাত্ম্য প্রচার লইয়াই প্রধানত এই নাটক রচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইবে।

একান্ত আদর্শানুরক্তির জন্য এই নাটকের কোন চরিত্রসৃষ্টিই সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই। ইহাতে সর্বাপেক্ষা অসঙ্গত কালীকিঙ্করের সহিত রঙ্গিণীর সম্পর্ক। রঙ্গিণী পতিতালয় হইতে উদ্ধারপ্রাপ্তা এক বৈষ্ণবীর যুবতী কন্যা। সে কালীকিঙ্করের শিষ্যা, কিন্তু সে কালীকিঙ্করকে 'ভালবাসে', মুহূর্তের জন্য তাহার সঙ্গত্যাগ করিতে চাহে না। এই ভালবাসার প্রকৃতিটি অস্পষ্ট। অবশ্য লেখক দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, তাহা নিষ্কাম ভালবাসা। কিন্তু এমন নিষ্কাম ভালবাসার দৃষ্টান্ত এই প্রকার ক্ষেত্রে বড়ই অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইবে। এইভাবে এই স্ত্রী-চরিত্রটিকে নানাদিক হইতে কতকগুলি আদর্শের মধ্যবর্তী করিবার ফলে তাহার মধ্যে কোন সহজ মানবিক গুণের বিকাশ সম্ভব হয় নাই।

কালীকিঙ্করের বিধবা ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ অন্নপূর্ণার চরিত্র এই নাটকের অন্যতম প্রধান স্ত্রী-চরিত্র। তাঁহার চরিত্রের দুইটি দিক—একটি নিষ্কাম সেবার ও অপরটি নিষ্কাম প্রেমের; কালীকিঙ্করকে অবলম্বন করিয়া নিষ্কাম সেবা ও

মৃত পতির স্মৃতি অবলম্বন করিয়া নিষ্কাম প্রেমের দিক প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু একটির অবসানে আর একটির উদয় হইয়াছে, দুইটিই এক সঙ্গে অগ্রসর হয় নাই। অন্নপূর্ণা নিষ্কাম সেবার মধ্যে আত্মবিলোপ করিয়া দিয়াছিল, এমন সময় পার্থিব একটি আঘাত তাহার উপর আসিয়া পড়িল, সেই মুহূর্তেই সে এই সেবার কথা বিস্মৃত হইয়া নিষ্কাম প্রেমের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া গেল। এই চরিত্রটির সঙ্গে সংসারের ধূলিমাটির কোন সম্পর্ক নাই, ইহার মূল্য বিচার করিবার কালে এই কথাটি বিস্মৃত হওয়া চলে না।

এই নাটকের আর দুইটি আদর্শ স্ত্রী-চরিত্র নিস্তারিণী ও মন্দাকিনী। নিষ্কাম পতিসেবার আদর্শই তাহাদের জীবনের লক্ষ্য। স্বামীরা তাহাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা সত্ত্বেও তাহাদের বিপদের সময় তাহাদিগকে সকল ভাবে রক্ষা করাই তাহাদের লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছিল, এই বিষয়ে তাহারা কোন দুঃখকষ্টই দুঃখকষ্ট বলিয়া মনে করে নাই।

অতএব দেখা যাইতেছে, সকল দিক দিয়া নিষ্কাম ধর্ম প্রচারই এই নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য। গিরিশচন্দ্রের উদ্দেশ্যমূলক সামাজিক নাটক রচনার যাহা বৈশিষ্ট্য, ইহার মধ্যে তাহাই সর্বত্র প্রকট হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া অনুভূত হইবে।

'প্রফুল্ল' ও 'হারানিধি' গিরিশচন্দ্রের প্রথম যুগের রচনা। তারপর অনেক দিন পর্যন্ত তিনি আর কোনও সমস্যামূলক সামাজিক নাটক রচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। তিনি তাঁহার নাট্যরচনার দ্বিতীয় যুগ উত্তীর্ণ হইয়া একেবারে তৃতীয় বা শেষ যুগের প্রারম্ভে, 'হারানিধি' রচনার বৎসর পনর পর আর একখানি এই শ্রেণীর সামাজিক নাটক রচনা করেন, তাহার নাম 'বলিদান'। নাটকখানি উদ্দেশ্যমূলক; বাংলার পণপ্রথার বিষময় ফল নির্দেশ করিয়া একখানি নাটক রচনা করিবার জন্য তিনি স্বর্গত সারদাচরণ মিত্র কর্তৃক অনুরুদ্ধ হন। ইহার ফলস্বরূপ 'বাঙ্গালায় কন্যা সম্প্রদান নয়—বলিদান (৫।১)' এই কথা প্রচার করিয়া, তিনি 'বলিদান' রচনা করেন। উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য নাটকখানি যতদূর সম্ভব রোমাঞ্চকর করিয়া ইহার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি যাহাতে আকর্ষণ করা যাইতে পারে, তাহার প্রতি নাট্যকার লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। তাহার ফলে অতিনাট্যিক ঘটনার সমাবেশে নাটকখানি অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। নাটক হিসাবে ইহা ত্রুটি-বহুল হইলেও উদ্দেশ্যের সফলতায় ইহা বাংলার জনপ্রিয় সামাজিক নাটকগুলির অন্যতম।

একজন সমালোচক বলেন, 'বলিদানের তুল্য বর্তমান হিন্দুবিবাহসংক্রান্ত নাটক বা উপন্যাস, এমন কি প্রবন্ধ আজ পর্যন্ত বাহির হয় নাই।' ইহার কাহিনী এই প্রকার—

করুণাময় বসু একজন মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবী। তাঁহার তিন কন্যা—কিরণ্ময়ী, হিরণ্ময়ী ও জ্যোতির্ময়ী, এবং এক পুত্র নলিন। করুণাময়ের পত্নীর নাম সরস্বতী। করুণাময় অনেক সন্ধান করিয়া প্রথমা কন্যা কিরণ্ময়ীর বিবাহ দিলেন—জামাতা মোহিত মাতাল ও লম্পট, শাশুড়ী বউকাঁটকী। স্বামী ও শাশুড়ীর নির্যাতনে কিরণ্ময়ী অল্পদিনের মধ্যেই পিত্রালয়ে আশ্রয় লইল। দ্বিতীয় কন্যা হিরণ্ময়ী বিবাহযোগ্যা হইল। বহু সন্ধানে তাহার জন্য দ্বিতীয় পক্ষের এক রুগ্ন বর জুটিল। বিবাহের অল্পদিন পরই হিরণ্ময়ী বিধবা হইল। স্বামীর প্রথম পক্ষের পুত্রেরা সৎমাকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিল। হিরণ্ময়ী পিত্রালয়ে আশ্রয় লইল। দুই কন্যার বিবাহ দিয়া করুণাময় ঋণভারগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। অর্থের অনটনে একমাত্র পুত্রের পড়া বন্ধ হইল। পিতার দুঃখ দেখিয়া বিধবা কন্যা হিরণ্ময়ী জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিল। তখনও তৃতীয় কন্যা অনূঢ়া। তাহারও বিবাহের বয়স হইয়া আসিল। করুণাময় তাঁহার প্রতিবেশীর এক দুশ্চরিত্র লম্পট পুত্রের সহিত জোতির্ময়ীর বিবাহ দিবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হইলেন। অবস্থার বিপর্যয়ে পড়িয়া করুণাময় তখন এক প্রকার অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার প্রতি করুণা-পরবশ হইয়া এক উদার-প্রাণ শিক্ষিত ও ধনবান্ যুবক জ্যোতির্ময়ীকে স্বেচ্ছায় বিবাহ করিয়া তাঁহাকে কন্যাদায় হইতে মুক্ত করিতে চাহিল। যুবকের নাম কিশোর। কিশোরের সঙ্গে জ্যোতির্ময়ীর বিবাহের দিন স্থির হইল। বিবাহের লগ্নও আসন্ন হইতে চলিল; এমন সময় করুণাময়ের পূর্ব চুক্তি অনুসারে উক্ত লম্পট পুত্রের পিতা বিবাহসভায় আসিয়া কন্যাকে তাহার পুত্রের নিকট বাগ্‌দত্তা বলিয়া দাবী করিল। করুণাময় পরম সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। শেষ বয়সে তিনি সত্যভ্রষ্ট হইলেন বলিয়া আত্মগ্লানিতে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল, অথচ তখন ফিরিবার আর উপায় ছিল না—কিশোরের সঙ্গেই জ্যোতির্ময়ীর বিবাহ হইয়া গেল; কিন্তু করুণাময় এই অনুশোচনায় সেই বিবাহের রাত্রেই উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিলেন; সরস্বতী পতির অনুগামিনী হইলেন। এইখানেই এই শোচনীয় বিয়োগান্তক নাট্যের যবনিকাপাত হইল।

সাধারণ নাটকের আদর্শে 'বলিদানে'র মূল্যবিচার করিবার উপায় নাই,

উদ্দেশ্যমূলক রচনা হিসাবেই ইহার বিচার করিতে হয়, তাহা হইলেই ইহার পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করা হইবে।

করুণাময় বসুর পরিবারের প্রতি পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার জন্য ইহার প্রত্যেকটি চরিত্রই যেমন আদর্শরূপে উপস্থাপিত করা হইয়াছে, তেমনই তদ্ব্যতীত অন্যান্য চরিত্রগুলিকে পাঠকের বিরক্তিভাজন করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে সকলপ্রকার দোষের আকর করিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে। নৈতিক বিচারে এই নাটকের মধ্যে পরস্পর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এই দুই শ্রেণীরই চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যাইবে। অবিমিশ্র গুণ ও অবিমিশ্র দোষ ইহার প্রত্যেকটি চরিত্রের বিশেষত্ব। অতএব ইহাতে কোন বাস্তব প্রকৃতির মানব-চরিত্রের পরিচয় লাভ করিবার উপায় নাই। দীনবন্ধু আন্তরিকতার গুণে উদ্দেশ্যমূলক নাটকের মধ্যেও বাস্তব মানব-চরিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন, কিন্তু উদ্দেশ্যের প্রতি সুগভীর আন্তরিকতা না থাকার জন্যই গিরিশচন্দ্র অন্যের অনুরোধে লিখিত তাঁহার 'বলিদান' নাটকে তাহা সম্ভব করিয়া তুলিতে পারেন নাই। কিন্তু ইহাও সত্য যে, 'নীল-দর্পণে'র পর বাংলা সাহিত্যে 'বলিদান'ই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী উদ্দেশ্যমূলক নাটক—তবে তাহা রচনার দিক দিয়া নহে, উদ্দিষ্ট বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ও ব্যাপকতার দিক দিয়া। ইহার বিয়োগান্তক ঘটনাবলীর পরিকল্পনায় গিরিশচন্দ্র যে 'নীল-দর্পণে'র নিকটও ঋণী নহেন, তাহাও বলিবার উপায় নাই।

'বলিদান' নাটকের স্থানে স্থানে অতিশয়োক্তি ও অতিরঞ্জনের দোষ বিরক্তি উৎপাদন করে। কিরণ্ময়ীর শাশুড়ীর চরিত্রের মধ্যে কোন মানবোচিত অনুভূতি নাই—অত্যাচারের প্রাণহীন একটি যন্ত্ররূপেই লেখক তাহাকে দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন। 'প্রফুল্ল' নাটকে তাঁহার এই শ্রেণীর দুই একটি চরিত্র সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। বলিদানের 'দুলালচাঁদ' একান্ত অস্বাভাবিক চরিত্র—দীনবন্ধুর নিমচাঁদের ক্ষীণ ছায়া মাত্র। করুণাময় বসুর চরিত্র-পরিকল্পনায় লেখক কতকটা কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার প্রতি পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার ব্যগ্রতায় লেখক তাহাকে একবার উন্মাদ ও তারপর আদর্শ-রক্ষায় আত্মঘাতী করিয়া শেষ পর্যন্ত ইহার মর্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। 'বলিদানে'র আর একটি চরিত্র সম্বন্ধে উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না। তাহা উন্মাদিনী জোবির চরিত্র। জোবি লম্পট স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা, শাশুড়ী-লাঞ্ছিতা ও বিমাতা কর্তৃক

পিতৃগৃহ হইতে বিতাড়িতা; এক মাথায় এত দুঃখের বোঝা বহিয়াও তাহার অন্তরে পতিভক্তির নিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। বাস্তবতার দিক দিয়া কোন মূল্য না থাকিলেও আদর্শের দিক দিয়া চরিত্রটি সুন্দর। লোক-শিক্ষার যে সুমহান্ আদর্শ ইহা দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে, তাহাই এই চরিত্রটির একমাত্র আকর্ষণ।

উদ্দেশ্য-প্রণোদিত রচনা বলিয়া কিংবা চরিত্র-পরিকল্পনার এই সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও একমাত্র বিষয়-বস্তুর গুণে 'বলিদান' অল্পদিনের মধ্যেই বিশেষ লোক-প্রীতি অর্জন করিয়াছিল। এদেশের সামাজিক ব্যবস্থার ত্রুটি নির্দেশ করিয়া বাংলা নাট্যসাহিত্যের জন্মকাল হইতেই বহু নাটক রচিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাদের মধ্যে লঘু ব্যঙ্গের ভাবই অধিক অনুভূত হইত। 'বলিদানে' বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের একটি গভীর ক্ষতস্থান উন্মুক্ত করিয়া দেখাইতে গিয়া লেখক যে গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার গুণেই ইহা সমাজ-হিতৈষী মাত্রেরই গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

'বিধবা সম্বন্ধে ঋষিদের যেরূপ ব্যবস্থা তা—শাস্তি কি শান্তি' ইহা বুঝাইতে গিয়া গিরিশচন্দ্র একখানি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক রচনা করেন—ইহার নাম 'শাস্তি কি শান্তি'। গিরিশচন্দ্রের অন্যান্য সামাজিক নাটকের মতই ইহা হত্যা, অপমৃত্যু, জাল-জুয়াচুরি, মামলা-মোকদ্দমা, নিষ্ঠুরতা, প্রবঞ্চনা ইত্যাদি অতিনাট্যিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। মুখ্যত বিধবা-বিবাহের বিষয় লক্ষ্য করিয়া ইহা রচিত হইলেও, ইহার ভিতর দিয়া গিরিশচন্দ্র মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পরিবারের তরুণী বিধবাদিগের জীবন-সংক্রান্ত সমস্যার দিকেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। কাহিনীটির ভিতর দিয়া বাঙ্গালীর সামাজিক জীবন সম্পর্কে গিরিশচন্দ্রের রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কাহিনীটি সংক্ষেপে এই—

প্রসন্নকুমার কলিকাতার এক ধনী ব্যক্তি। তাঁহার বিধবা পুত্রবধূ নির্মলা তাঁহার সংসারে থাকিয়াই নিষ্ঠাবান্ জীবন যাপন করিতেছে। প্রসন্নকুমারের জ্যেষ্ঠ জামাতা অকালে কালগ্রাসে পতিত হইল, তাহার পত্নী ভুবনমোহিনী তাহার স্বামীর বন্ধু প্রকাশের প্রণয়-পাশে আবদ্ধ হইয়া কুপথগামিনী হইল। বিবাহের রাত্রেই প্রসন্নের কনিষ্ঠা কন্যা প্রমদাও বিধবা হইল। জ্যেষ্ঠা কন্যার অধঃপতন দেখিয়া প্রসন্নকুমার বিধবা কনিষ্ঠা কন্যাকে এক লম্পটের সঙ্গে বিবাহ দিয়া দিলেন। অর্থের জন্য লম্পট স্বামী প্রমদাকে সর্বদা উৎপীড়ন করিত,

অবশেষে একদিন তাহার গৃহ হইতে সে তাহাকে বিতাড়িত করিয়া দিল। সে গঙ্গায় ডুবিয়া মরিতে গেল, কিন্তু দৈব উপায়ে কোনমতে রক্ষা পাইল। প্রকাশের সংসর্গে ভুবনমোহিনী গর্ভিণী হইল। গর্ভপাত করিবার চেষ্টা করিয়া সে বিফল হইল। সমাজে প্রসন্নর মুখ দেখান ভার হইয়া উঠিল। প্রমদার নিরুদ্দেশ সংবাদ শুনিয়া প্রসন্নর স্ত্রী পার্বতী উন্মাদিনী হইয়া গেলেন, প্রমদা ফিরিয়া আসিলেও তাহাকে চিনিতে পারিলেন না, এই দুঃখে তাঁহার মৃত্যু হইল। দুঃখে ও মনস্তাপে প্রসন্নকুমার জ্যেষ্ঠা কন্যা ভুবনমোহিনীকে নিজেই ছুরিকাঘাতে হত্যা করিয়া নিজেও আত্মঘাতী হইলেন। অনুতাপে দগ্ধ হইয়া প্রকাশও আত্মহত্যা করিল।

অন্যান্য আরও কয়েকটি সামাজিক নাটকের মত গিরিশচন্দ্রের 'শাস্তি কি শাস্তি'ও উদ্দেশ্যমূলক রচনা। পূর্বেই বলিয়াছি, গিরিশচন্দ্র তাঁহার উদ্দেশ্যমূলক নাটক রচনায় দীনবন্ধুর 'নীল-দর্পণ'কেই নানাভাবে অনুসরণ করিয়াছিলেন—এই নাটকখানির উপরও 'নীল-দর্পণে'র প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। নাটকখানি দীনবন্ধু মিত্রকেই উৎসর্গীকৃত—অতএব এই প্রভাব সম্বন্ধে নাট্যকারও সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। উদ্দেশ্যমূলক নাটক মাত্রেরই যে সকল ত্রুটি নিতান্ত অপরিত্যাজ্য হইয়া থাকে, ইহাতেও তাহাই পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছে। গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' ও 'বলিদান' নাটক দুইখানির পরিবেশের সঙ্গে ইহার কোন পার্থক্য নাই—'প্রফুল্ল'র জগমণি চরিত্র এখানে চিত্তেশ্বরী, 'প্রফুল্ল'র পাগলা মদন ঘোষ এখানে পাগলা সদাগর—এই প্রকার আরও অনেক ছোট-খাট চরিত্রেও উক্ত দুইখানি নাটকেরই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।

বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও 'বিষবৃক্ষে'র ভিতর দিয়া যে মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন, এই নাটকখানির ভিতর দিয়া গিরিশচন্দ্রেরও সেই মনোভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। নিষ্ঠাবতী ব্রহ্মচারিণীর জীবনের ভিতর দিয়াই বৈধব্যজীবনের শান্তি আসিতে পারে—বিধবার বিবাহের ভিতর দিয়াও নহে, কিংবা তাহার অসংযমের ভিতর দিয়াও নহে—এই নাটকের ভিতর দিয়া গিরিশচন্দ্রের এই মনোভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। গিরিশচন্দ্রের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবের বিকাশের যুগে যে নিষ্কাম জীবনের আদর্শ তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, ইহাও সেই যুগের রচনা বলিয়া, ইহার মধ্যেও সেই ভাবই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে—বিধবা নির্মলা চরিত্রের ভিতর দিয়া এই ভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাতে যে নিষ্কাম আদর্শের বিকাশ দেখা

যায়, 'মায়াবসানে' তাহারই উন্মেষ দেখিতে পাওয়া যাইবে। নাট্যকারের বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ম ইহার চরিত্রগুলির কার্যাবলী প্রধানত নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে বলিয়া ইহার মধ্যে কোন চরিত্রসৃষ্টিই সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই—ইহাদের মধ্যে পাগল সদাগর ও হরমণির চরিত্র সর্বাপেক্ষা অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইবে। পিতা কর্তৃক কলঙ্কিনী বিধবা কন্যাকে হত্যার বর্ণনাও স্বাভাবিকতা-বোধকে নির্মমভাবে পীড়িত করে।

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে গিরিশচন্দ্র 'গৃহলক্ষ্মী' নামক একখানি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। গিরিশচন্দ্রের পুত্র স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ইহার অবশিষ্ট অংশ সম্পূর্ণ করিয়া ইহা প্রকাশিত ও অভিনীত করেন। গিরিশচন্দ্রের অসম্পূর্ণ রচনা বলিয়া ইহার আলোচনা এখানে পরিত্যক্ত হইল।

সামাজিক নক্সা

বড়লাট লর্ড রিপন কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে সর্বপ্রথম স্বায়ত্ত-শাসন-প্রথা প্রবর্তন করেন, কমিশনর নির্বাচনোপলক্ষে তখনই সর্বপ্রথম কলিকাতায় ভোট-যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই বিষয়-বস্তু অবলম্বন করিয়া গিরিশচন্দ্র একখানি ক্ষুদ্র প্রহসন রচনা করেন, তাহার নাম 'ভোট-মঙ্গল' বা 'সজীব পুত্‌লো নাচ'। নাট্যকার ইহাকে 'সাময়িক ব্যঙ্গনাট্য' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা মাত্র একটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ। ইহার মধ্যে ভোট-প্রার্থী কমিশনরদিগের মধ্যে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতার যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহা খুব বাস্তব ও জীবন্ত বলিয়া মনে হয় না। একজন নাচওয়ালার কতকগুলি পুত্তলিকা-চরিত্রের সঙ্গে এক কল্পিত কথোপকথনের ভিতর দিয়া এই চিত্রটি প্রকাশ করা হইয়াছে, সেইজন্যই চিত্রটি জীবন্ত হইতে পারে নাই।

গিরিশচন্দ্রের 'বেল্লিক-বাজার' এক অঙ্কে সম্পূর্ণ একটি ক্ষুদ্র সামাজিক প্রহসন। নাট্যকার ইহাকে 'বড়দিনের পঞ্চরং' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কলিকাতায় বড়দিন উপলক্ষে অভিনীত হইবার মুখ্য উদ্দেশ্যেই ইহা রচিত। ইহার মধ্যে রঙ্ বা তামাসার দিকটি সুন্দর জমিয়াছে, এতদ্ব্যতীত ইহাতে আর কিছু নাই। পিতার মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধের ভার পুরোহিতের

উপর সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিয়া একমাত্র কুলাঙ্গার পুত্র যে কি ভাবে এক বেকার ডাক্তার ও উকিলের কুমন্ত্রণায় বাগান-পার্টির আয়োজন করিয়াছিল এবং সেই পার্টি-স্থলে দুই মাতাল গোরার অভ্যুদয়ের ফলে তাহা যে কি ভাবে পণ্ড হইয়াছিল, তাহারই হাস্যকর কাহিনী এই 'পঞ্চরং'-এর ভিত্তি। ইহার কোন কোন স্থলে গিরিশচন্দ্রের হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস সাফল্য লাভ করিয়াছিল বলিয়া অনুভূত হইবে। ইহার কাহিনীর মধ্যে কেন্দ্রীয় ঐক্যের অভাব আছে। নৃত্যগীতগুলিও কাহিনীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নহে, কিন্তু তথাপি সমগ্রভাবে পাঁচমিশালী রঙ্গরস সৃষ্টি করিতে ইহারাও সহায়ক হইয়াছে। কর্মহীন উকিল, ডাক্তার ও পূর্ববঙ্গবাসী দালালের চরিত্র কয়টি সুচিত্রিত হইয়াছে।

'বড়দিনের পঞ্চরং'-এর মত গিরিশচন্দ্র পূজোপলক্ষে অভিনয় করিবার জন্য পূজার পঞ্চরংও একখানি রচনা করিয়াছিলেন—তাহার নাম 'সপ্তমীতে বিসর্জন'। কলিকাতা নাগরিক জীবন হইতে কতকগুলি অসংলগ্ন ও বিচ্ছিন্ন চিত্র সংগ্রহ করিয়া ইহাকে রূপদান করা হইয়াছে। চিত্রগুলি অনেক ক্ষেত্রে উন্নত রুচির পরিচায়ক নহে—ইহার মধ্যেও পাঁচমিশালী রং-এর দিকটিই অধিক প্রকাশ পাইয়াছে, কোন কাহিনী দানা বাঁধিয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই।

বড়দিন উপলক্ষে অভিনয় করিবার জন্য গিরিশচন্দ্র আর একখানি ক্ষুদ্র রঙ্গনাট্য রচনা করেন, তাহার নাম 'বড়দিনের বখ্‌শিশ্‌'। উহাকে নাট্যকার 'পঞ্চরং' ও ইহার অভিনেতাদিগকে 'রঙ্গদার' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। নূতন ইংরেজি সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া তদানীন্তন কলিকাতার নাগরিক জীবন যে কি প্রকার উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল, এই ক্ষুদ্র রঙ্গনাট্যখানির মধ্য দিয়া তাহাই প্রকাশ করা হইয়াছে; কিন্তু ইহার চিত্রগুলি অতিরঞ্জিত ও পরস্পর অসংলগ্ন। ইহা ইংরেজি সাহিত্যে প্রচলিত Extravaganza শ্রেণীর রচনা। চিত্রগুলি অনেক সময় বাস্তবতার ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া গিয়াছে এবং ইহার প্রচ্ছন্ন শ্লেষ ইহার নির্মল হাস্যরস সৃষ্টির অন্তরায় হইয়াছে; এইজন্য একান্ত প্রাণ খুলিয়া ইহার আনন্দ উপভোগ করা যায় না।

'সভ্যতার পাণ্ডা' গিরিশচন্দ্রের আর একখানি 'বড়দিনের পঞ্চরং'। ইহার মধ্যেও এই প্রকার পাঁচমিশালী তামাসা ব্যতীত আর কিছুই নাই। ইহাতে জীবিত অবস্থায় নব্যশিক্ষিত স্বামী-স্ত্রীর শ্রাদ্ধ, বরের নিলাম,

বৃদ্ধার সহিত বিবাহ, ষড়ঋতুর নায়িকা, পশুশালায় পশুদিগের কথোপকথন ইত্যাদির চিত্র আছে। নববর্ষে আধুনিক সভ্যতা যে কোন্ পথে কতদূর অগ্রসর হইবে, এই চিত্রগুলির ভিতর দিয়া তাহাই প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহাতে আত্মভ্রষ্ট সমাজের পাশ্চাত্ত্যকরণের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ প্রকাশ করা হইলেও, ইহার চিত্রগুলি অন্যান্য পঞ্চরঙের চিত্রের মতই অতিরঞ্জনের দোষে দুষ্ট।

'পাঁচ কনে' গিরিশচন্দ্র রচিত এইপ্রকার আর একটি 'বড়দিনের পঞ্চরং'। ইহার মধ্যেও অসংলগ্ন চিত্র, অবিশ্বাস্য ঘটনা ও অসম্ভব চরিত্রের সমাবেশ করা হইয়াছে। সমাজ-সংস্কার, রাজনৈতিক আন্দোলন, কন্যাদায়, সম্মতি আইন ইত্যাদি বহু সমসাময়িক অবস্থার প্রতি এখানেও ইঙ্গিত করা হইয়াছে; কিন্তু চিত্রগুলি এতই অতিরঞ্জিত এবং দৃশ্যগুলি পরস্পর এতই ক্ষীণ সূত্রে আবদ্ধ যে সমগ্রভাবে ইহার কাহিনী কোনই ঔৎসুক্য সৃষ্টি করিতে পারে নাই। তবে পূর্বেই বলিয়াছি, পাঁচমিশালী বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া ক্ষণিক উত্তেজনা সৃষ্টি করাই ইহাদের উদ্দেশ্য—নিতান্ত সাধারণ শ্রেণীর দর্শকের নিকট হয়ত ইহার সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় নাই। নাটকের উপসংহারে একটি ইংরেজি সমবেত সঙ্গীতের ভিতর দিয়া দর্শকদিগের জন্য এই প্রকার শুভ বড়দিন ও নববর্ষের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

Patrons and friends dear
To all a merry Christmas, a happy New Year.

এই সকল রচনার ব্যবসায়িক মূল্য ছাড়া আর কোন মূল্য নাই; সুতরাং ইহাদিগকে সেইভাবে বিচার করা কর্তব্য।

কন্যাদায়গ্রস্ত নিম্ন-মধ্যবিত্ত গৃহস্থের দুর্দশা বর্ণনা করিয়া গিরিশচন্দ্র একখানি নাতিবৃহৎ সামাজিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাহার নাম 'আয়না'। নাট্যকার ইহাকে 'সামাজিক নক্সা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ইহার মধ্যে উচ্চতর নাটকের কোন দাবীই পূরণ করা হয় নাই। ইহাতে একদিক দিয়া যেমন মধ্যবিত্ত পরিবারের কন্যাদায়ের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, আবার অন্যদিক দিয়া বৃদ্ধের বিবাহ-সাধ সম্পর্কিত কৌতুককর চিত্রও পরিবেষণ করা হইয়াছে। তাহার উপর 'সভ্য' যুবক ও 'শিক্ষিতা' যুবতী কর্তৃক সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার ব্যর্থ প্রয়াসের কথাও বর্ণিত আছে। এই সকল ছাড়াও ঘটক, উকিল প্রভৃতির ব্যবসায়ের উপরও কটাক্ষপাত করা হইয়াছে। বিষয়গত কোন ঐক্য না

থাকিবার জন্ত ইহার চিত্ররসও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, কোথাও নিবিড় হইয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই। ইহার মধ্যে দীনবন্ধু মিত্রের 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'রও একটু প্রভাব অনুভব করা যায়। কাহিনীটি জটিল হইলেও স্বাভাবিক বলিয়া ইহা গিরিশচন্দ্রের অন্যান্য সামাজিক নাটকের মত ভারাক্রান্ত নহে—রুচি উন্নত ও মার্জিত স্তরের না হইলেও, কোন কোন স্থলে হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। বৃদ্ধ গৌরীশঙ্কর মিত্র তাঁহার তৃতীয়া পত্নীর মৃত্যুর পর এক কিশোরবয়স্কা কন্যার পাণিপীড়ন করিতে চাহিলে কি ভাবে তাহার এক প্রতিবেশীর কৌশলে সেই কিশোরী কন্যার সঙ্গে তাঁহার পরিবর্তে তাঁহার পৌত্রের বিবাহ নিষ্পন্ন হইয়া গেল, তাহাই এই নাটকের মূল বক্তব্য। কিন্তু ইহা অবলম্বন করিয়া অনেক অবান্তর কাহিনী আসিয়া ইহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। ঘটনার প্রবাহ ইহাতে অত্যন্ত জটিল গতিতে অগ্রসর হইয়াছে; সমসাময়িক সমাজ সম্পর্কে লেখকের বহু বিচ্ছিন্ন বক্তব্য ইহার মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে—এই সকল কারণে ইহা 'নক্সা'র দাবীই পূরণ করিয়াছে বলিয়া মনে হইবে।

ফরাসী নাট্যকার মলেয়ারের একখানি রচনা অবলম্বন করিয়া গিরিশচন্দ্র একটি ক্ষুদ্র প্রহসন রচনা করেন—তাহার নাম 'য্যায়সা-কা-ত্যায়সা'। পর হইয়া যাইবার আশঙ্কায় একমাত্র কন্যার বিবাহ দিবার বিরোধী এক ধনাঢ্য ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত কন্যার অসুখের ছলনায় তাহার প্রেমাস্পদকে চিকিৎসকরূপে গৃহে প্রবেশ করিতে দিয়া যে কি ভাবে তাহার হস্তেই কন্যা সম্প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন, ইহাতে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। প্রহসনখানির শেষ দৃশ্যে একটি চরিত্রের মুখ দিয়া দর্শকদিগের নিকট এই আবেদন প্রচার করা হইয়াছে, 'এখন আমার অবিবাহিত ছেলের বাপদের প্রতি যোড়করে নিবেদন যে, তাঁদের পাওনার দৌরাত্ম্যেই হিন্দুর ঘরে সব ধেড়ে মেয়ে রাখ্‌তে বাধ্য হচ্ছে। হিন্দুয়ানীর মুখ চেয়ে কামড় একটু কম করুন। তা' হ'লে গৌরীদান প্রভৃতি প্রাচীন শুভ বিবাহ-ক্রিয়া আবার স্থাপিত হয়।' ইহা হইতেই প্রহসনখানির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কতকটা আভাস পাওয়া যাইবে। ফরাসী নাটকের ভিত্তিতে ইহা রচিত হইলেও, গিরিশচন্দ্র ইহার পরিবেশটি সম্পূর্ণ বাঙ্গালী করিয়া লইয়াছিলেন। বিষয়ের মধ্যে বৈচিত্র্য না থাকিলেও এই নাটকে মধ্যে মধ্যে উচ্চাঙ্গের কৌতুক রস প্রকাশ পাইয়াছে।

ঐতিহাসিক নাটক

ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু লইয়া গিরিশচন্দ্র যে সকল পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা করিয়াছেন, তাহাদিগকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ববর্তী ও স্বদেশী আন্দোলনের সমসাময়িক। স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে গিরিশচন্দ্র তখনও দেশাত্মবোধের আদর্শের সন্ধান পান নাই—সেইজন্য ইহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গিরিশচন্দ্রের নিজস্ব নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের বাহন হইয়া আছে। স্বদেশী আন্দোলনের সমসাময়িক নাটকগুলির মধ্যে নাট্যকার একটি সুস্পষ্ট আদর্শের সন্ধান লাভ করিয়াছিলেন—তখন সব কিছু অতিক্রম করিয়া দেশ তাঁহার নিকট বড় হইয়া উঠিয়াছে; ইহার মর্যাদা রক্ষার জন্য তিনি সম্পূর্ণ সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন। তখন সুদূর রাজপুতানার কাহিনী পরিত্যাগ করিয়া প্রধানত বাংলা দেশকেই তিনি তাঁহার নাটকের ভিত্তি করিয়া লইলেন। কারণ, প্রধানত বাংলা দেশকে কেন্দ্র করিয়াই স্বদেশী আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই যুগেই গিরিশচন্দ্রের কয়খানি শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাটক রচিত হয়। তাঁহার শ্রেষ্ঠ কয়খানি ঐতিহাসিক নাটক বাংলা দেশকেই অবলম্বন করিয়া রচিত।

কিন্তু যে সকল ঐতিহাসিক নাটক প্রত্যক্ষভাবে স্বদেশী আন্দোলনের ফলে রচিত নহে, তাহাদের মধ্য দিয়া গিরিশচন্দ্র তাঁহার আধ্যাত্মিক আদর্শ প্রচার করিবার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন। তবে এ'কথা সত্য যে, ঐতিহাসিক তথ্য অবজ্ঞা করিয়া তিনি তাঁহার নিজস্ব আদর্শানুযায়ী আধ্যাত্মিক তথ্য তাঁহার কোন নাটকের মধ্যেই আরোপ করেন নাই, যেখানে ঐতিহাসিক তথ্য দুর্লভ কেবলমাত্র সেখানেই তিনি এই সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক তথ্যের প্রতি গিরিশচন্দ্রের পরম নিষ্ঠা ছিল—কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ববর্তী নাটকগুলিতে বাংলার ইতিহাস বহির্ভূত যে সকল উপাদান তাঁহাকে ব্যবহার করিতে হইয়াছে, তাহা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়া গ্রহণযোগ্য ছিল না। সেইজন্য ইহারা প্রকৃত ঐতিহাসিক নাটক হইয়া উঠিতে পারে নাই। স্বদেশী আন্দোলনের সমসাময়িক নাটকগুলির মধ্যে তাঁহার যে ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা প্রকৃতই বিস্ময়কর।

পূর্ণাঙ্গ নাটক ব্যতীতও গিরিশচন্দ্র সমসাময়িক কতকগুলি খণ্ড রাজনৈতিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া কয়েকটি ক্ষুদ্র নাটিকা রচনা করিয়াছিলেন—ইহাদিগকে ঐতিহাসিক নাট্যচিত্র বলা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে প্রচার ও বক্তৃতার ভাব এত বেশি যে তাহার ফলে নাট্যরস জমিয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই।

রাজপুত ইতিহাসের কাহিনী অবলম্বন করিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্তই সর্বপ্রথম বাংলায় নাটক রচনা করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহারই ধারা অনুসরণ করিয়া গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'আনন্দ রহো' নামক নাটক রচনা করেন। রাণা প্রতাপের মৃত্যু, মানসিংহকে হত্যা করিতে আকবরের ষড়যন্ত্র, মানসিংহের কন্যা লহনার প্রেম ইত্যাদি বিষয়ের উপর নির্ভর করিয়া ইহা রচিত; কিন্তু এই সকল বিচ্ছিন্ন কাহিনীর মধ্য দিয়া মূল নাট্যকাহিনীর কেন্দ্রীয় ঐক্যটি সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিতে পারে নাই। রাণা প্রতাপের চরিত্রগত দৃঢ়তা ইহাতে রক্ষা পায় নাই, আকবর ও মানসিংহের চরিত্রের ঐতিহাসিক মর্যাদা ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তদুপরি অন্যান্য ঐতিহাসিক ও অর্ধ-ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিও সুপরিকল্পিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইবে না। টডের রাজস্থান গিরিশচন্দ্রের ভিত্তি হইলেও তিনি স্বকপোলকল্পিত বহু ঘটনা ও চরিত্র ইহাতে আনিয়া যুক্ত করিয়াছেন। ঘটনার বাহুল্যে কাহিনীর অগ্রগতি ব্যাহত হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, মূল কাহিনীর ধারাটি অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে; বেতাল বলিয়া পরিচিত গুপ্তচরের চরিত্রটি অত্যন্ত অসঙ্গত, অস্বাভাবিক ও অস্পষ্ট হইয়াছে। সে 'আনন্দ রহো' এই ধ্বনি (slogan) তুলিয়া তাহার কার্যসিদ্ধি করিত—তাহা হইতেই এই নাটকের এই নামকরণ হইয়াছে। পৌরাণিক নাট্যরচনায় গিরিশচন্দ্র মূলের প্রতি যে আনুগত্য দেখাইয়াছেন, ইহাতে তাহা দেখান নাই; অথচ একটি নির্দিষ্ট পরিবেশ অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে নাট্যকাহিনী রচনা করিতে হইয়াছে; অতএব এই বিষয়ে তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অবলম্বন করিবারও উপায় ছিল না—সেইজন্য ইহাতে কাহিনীর রস জমাট বাঁধিয়া উঠিতে পারে নাই। মোগল অন্তঃপুরের প্রণয়-ঘটিত ষড়যন্ত্র অবলম্বন করিয়া বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস রচনায় যে ধারার প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাব গিরিশচন্দ্রের এই নাটকখানির উপর পড়িয়াছিল, কিন্তু বঙ্কিমের কল্পনা ও সৃজনীশক্তি তাঁহার ছিল না বলিয়া তাহা জীবন্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই। নাটকখানি আদ্যোপান্ত সহজ গদ্যে রচিত, ইহার মধ্যে গিরিশচন্দ্র তাঁহার নিজস্ব পদ্যছন্দ ব্যবহার করেন নাই।

রাজপুত বীরত্বের কাহিনী অবলম্বন করিয়া গিরিশচন্দ্র আর একখানি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন, তাহার নাম 'চণ্ড'। চিতোরের সঙ্গে রাঠোর রাজবংশের বিবাহের কাহিনী লইয়া ইহা রচিত—ইহার সঙ্গে মোগল দরবারের কোন যোগ নাই। কাহিনীটির মধ্যে উচ্চাঙ্গের নাটকীয় উপাদান ছিল, কিন্তু আদর্শবাদের প্রভাববশত সেই উপাদান ইহাতে যথাযথ ব্যবহৃত হইতে পারে নাই। কয়েকটি চিত্রে ইহাদের উন্মেষটুকু মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহাদের সহজ বিকাশ ইহার মধ্যে নাই। নাটকের কাহিনীটি এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতে পারে—

রাঠোরের ভাট চিতোরের রাণার নিকট তাঁহার পুত্রের জন্য রাঠোর রাজকুমারীর বিবাহের প্রস্তাব লইয়া আসিল। প্রচলিত প্রথানুসারে ভাট একটি নারিকেল আনিল—যে নারিকেল গ্রহণ করিবে, সে-ই রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিবে। বৃদ্ধ চিতোরের রাণা পরিহাস করিয়া ভাটকে কহিলেন, 'তোমাদের রাজা বোধ হয় বৃদ্ধের হাতে এই নারিকেল দিতে নিষেধ করিয়াছে', ইহাতে সভাস্থ সকলে হাসিয়া উঠিল। চিতোর রাজকুমারও সভায় উপস্থিত ছিল, সে ইহা শুনিয়া ভাবিল, পিতা যে-রাজকুমারী সম্বন্ধে এই প্রকার পরিহাস করিলেন, সে তাহার বিবাহযোগ্যা নহে, বরং মাতৃতুল্যা—এই বলিয়া সে বিবাহ করিতে অসম্মত হইল। রাণার শত অনুরোধও সে রক্ষা করিল না। অগত্যা বৃদ্ধ রাজা নিজেই রাজকন্যাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, এই স্ত্রীর গর্ভে যদি তাঁহার পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তবে তিনি রাজকুমারকে সিংহাসন না দিয়া তাহাকে সিংহাসনে বসাইবেন। রাজকুমারের নাম চণ্ড। সে ইহাতে স্বীকৃত হইল। কনিষ্ঠা রাণীর নাম গুঞ্জমালা। যথাসময়ে তাঁহার এক পুত্র জন্মিল, তাহার নাম মুকুল; ক্রমে মুকুল বাল্যে পদার্পণ করিল। বৃদ্ধ রাণা সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া গেলেন, তখন মুকুলকে সিংহাসনে বসাইয়া চণ্ডই তাহার নামে রাজ্যপালন করিতে লাগিল। রাণী গুঞ্জমালার ইহা ভাল লাগিল না; তিনি মিথ্যা অপবাদ দিয়া চণ্ডকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়া নিজের পিতাকে রাঠোর হইতে চিতোরে ডাকাইয়া আনিলেন। তিনি আসিয়া নিজেই চিতোরের কর্তৃত্বভার লইলেন এবং মুকুলকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিয়া চিতোরের সিংহাসন নিজের জন্য নিষ্কণ্টক করিয়া লইবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। রাণী গুঞ্জমালা ইহা বুঝিতে পারিয়া নিরুপায় হইয়া পড়িলেন এবং অবশেষে নির্বাসিত রাজকুমার

চণ্ডের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। চণ্ড তাহার ভীল সৈন্য-দিগের সাহায্যে আসিয়া চিতোর আক্রমণ করিয়া রাঠোরদিগের কবল হইতে চিতোর উদ্ধার করিল। তারপর পুনরায় মুকুলকে সিংহাসনে বসাইয়া তাহার নামে প্রজাপালন করিতে লাগিল।

এই কাহিনীর মধ্যে দুই একটি বড় সুন্দর নাট্যিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টির দুর্লভ অবকাশ ছিল। প্রথমত গুঞ্জমালার সঙ্গে চণ্ডের সম্পর্ক। রাজকুমার চণ্ডের সঙ্গে রাজকুমারী গুঞ্জমালার বিবাহ হইবে—ইহা সকলেরই অভিপ্রায় ছিল, গুঞ্জমালাও তাহা নিশ্চয় অবগত ছিলেন; কিন্তু ঘটনাচক্রে গুঞ্জমালা চণ্ডের বিমাতা হইলেন। তিনি যখন বৃদ্ধ রাণার সংসার করিতে আসিলেন, তখন চণ্ডকে কাছেই পাইলেন, কিন্তু তাহার সঙ্গে তখন তাঁহার এমন এক সম্পর্ক হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, তখন তাঁহার অন্তরকে অসাড় করিয়া রাখা ভিন্ন উপায় ছিল না—তাহাকে তাঁহার সম্মুখ হইতে বিদায় করিতে না পারিলে তাঁহার বাঁচিবার আর কোন পথ ছিল না। সেইজন্য মিথ্যা অপবাদ দিয়া তাহাকে রাজপ্রাসাদ হইতে বনবাসে পাঠাইলেন। সুতরাং রাঠোররাজ যখন তাহাকে হত্যা করিতে লোক পাঠাইল, তখন গুঞ্জমালা ব্যাকুল চিত্তে সেই ঘাতককে প্রতিরোধ করিবার জন্য পুনরায় নিজে লোক পাঠাইলেন। উচ্চ আদর্শবাদের প্রেরণায় গুঞ্জমালার মনের এই দ্বন্দ্বটি নাট্যকার অধিক বিকাশ হইতে দেন নাই, মধ্যপথেই ইহার অবসান ঘটাইয়াছেন। নতুবা ইহাতে উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজিডির উপাদান ছিল। চণ্ডের চরিত্রটি আনুপূর্বিক আদর্শবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

এই নাটকখানির রচনায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত কাব্যসমূহের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। ইহার ছন্দ প্রচলিত গৈরিশ ছন্দ নহে, মধুসূদনের অনুকরণ-জাত অমিত্রাক্ষর ছন্দ। বলা বাহুল্য, ইহার মধ্যে মধুসূদনের যতিবিন্যাসবৈচিত্র্য ও ধ্বনিগুণ মোটেই নাই, তবে প্রতি চরণে চৌদ্দটি অক্ষর আছে মাত্র এবং ইহাকে একেবারে অমিত্র পয়ারও বলা যায় না। কারণ, ইহাতে যতিবিন্যাসের কিছু কিছু বৈচিত্র্য আছে, যেমন—

আত্মত্যাগী মহাজন, স্বার্থ পরিহরি
রাখিলে পিতার নাম। পদানত জনে
দেহ শক্তি মহোদয়, প্রতিজ্ঞা-পালনে;
কি কারণে পুন মোরে দিতে চাহ রাজ-

কার্যভার? কর নাই উদ্বাহ স্বীকার,
রাঠোর-নন্দিনী সনে জনক-বচনে
কর্তব্যের অনুরোধে, যবে প্রভু তুমি
নারিকেল করিলে বর্জন, পিতৃরোষ
লয়ে শিরোপরে।—(১।১)

এই সকল পরীক্ষামূলক রচনার ভিতর দিয়াই গিরিশচন্দ্র অবশেষে নিজস্ব ছন্দের সন্ধান পাইয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্কে আসিবার পর তাঁহার প্রত্যক্ষ প্রভাবে গিরিশচন্দ্র যে কয়খানি নাটক রচনা করেন, 'কালাপাহাড়' তাহাদের অন্যতম। ইহাকে নাট্যকার 'ভক্তিরসাত্মক ঐতিহাসিক নাটক' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাকে ঐতিহাসিক নাটকের অন্তর্ভুক্ত করা কঠিন—ইহা গিরিশচন্দ্রের অন্যান্য ভক্তিরসাত্মক নাটকেরই সমধর্মী। পরমহংস-দেবের সংস্পর্শে আসিবার পর হইতে গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলির মধ্যে যথার্থ নাটকীয় উপকরণের দৈন্য দেখিতে পাওয়া যাইতে থাকে, তখনকার সকল নাটকের মধ্যেই এক অধ্যাত্মমুখীনতার ভাব ফুটিয়া উঠিতে দেখা যায়। 'কালাপাহাড়' নাটকের মধ্যে সেই ভাব অধিকতর প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে; কারণ, ইহার চিন্তামণি নামক একটি প্রধান চরিত্র আনুপূর্বিক পরমহংসদেবের আদর্শে পরিকল্পিত হইয়াছে; তাঁহার উক্তির মধ্যে 'রামকৃষ্ণ-কথামৃতে'রই প্রতিধ্বনি সর্বত্র শুনিতে পাওয়া যায়। 'কালাপাহাড়ে'র চরিত্রের মধ্যেও গিরিশচন্দ্রের নিজস্ব অধ্যাত্মবোধের ক্রমবিকাশের ধারাটি লক্ষ্য করা যায়। গিরিশচন্দ্রের প্রথম জীবনে ঈশ্বর সম্পর্কিত ধারণা খুব স্পষ্ট ছিল না, বিচিত্র মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ভিতর দিয়া পরিণামে তাঁহার মধ্যে অদ্বৈত ব্রহ্মবোধ বিকাশ লাভ করিয়াছিল। এই ভাবটি কালাপাহাড়ের অন্তর্দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া সহজ অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। অতএব এই নাটকখানিকে গিরিশচন্দ্রের বিশিষ্ট অধ্যাত্মবোধের ক্রমবিকাশের মধ্যে আনিয়া স্থাপন করিতে হয়—এই জন্যই ইহার মধ্যে নাটকীয় গুণ সম্যক্ বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। ইহাতে কয়েকটি ঐতিহাসিক চরিত্রের নামোল্লেখ থাকিলেও ইহা প্রকৃত ঐতিহাসিক নাটক নহে, ইহার ধর্ম রোমান্টিক। চরিত্রসৃষ্টিও ইহাতে সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই, অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক চরিত্র ব্যতীতও ইহার মধ্যে একটি অশরীরী ও একটি নৈর্ব্যক্তিক চরিত্রের সমাবেশ করা হইয়াছে। ইহা

গিরিশ-প্রতিভার অস্তযুগের রচনা; অতএব ইহার ভিতর হইতে অধিক কিছু আশাও করা যাইতে পারে না। ইহা প্রচলিত গৈরিশ ছন্দেও রচিত নহে, অমিত্রাক্ষরের অক্ষম অনুকরণ-জাত ছন্দে রচিত। বৈচিত্র্যহীন ছন্দে সুদীর্ঘ সংলাপ ইহার বহু অংশে পীড়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছে। তবে ইহার গুণ নাট্যিক নহে বরং আধ্যাত্মিক—সমসাময়িক আধ্যাত্মিক চৈতন্যের বাহনরূপে ইহার কিছু মূল্য প্রকাশ পাইয়াছে। পরমহংসদেবের সর্বধর্মসমন্বয়ের আদর্শটি চিন্তামণির মুখে এই ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে—

> এক বিভু বহু নামে ডাকে বহু জনে,
> যথা জল, একওয়া, ওয়াটার, পানি,
> বোঝায় সলিলে, সেইমত আল্লা, গড,
> ঈশ্বর, যিহোবা, যীশু নামে, নানা স্থানে
> নানা জনে, ডাকে সনাতনে।—৩।৬

'কালাপাহাড়ে'র বিষয়বস্তুর মধ্যে যথার্থ নাট্যিক উপাদান ছিল, কিন্তু অধ্যাত্মবোধ দ্বারা প্রভাবিত হইবার ফলে নাট্যকার সেদিকে আর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারেন নাই; অতএব ঐতিহাসিক কালাপাহাড় চরিত্রের মূল লক্ষ্যবস্তু পরিত্যাগ করিয়া নাট্যকার এখানে প্রেম, ভক্তি ও ঈশ্বর-বিশ্বাসের জয়গান গাহিয়াছেন।

গিরিশচন্দ্র 'রাণা প্রতাপ' নামকও একখানি ঐতিহাসিক নাটক রচনায় হস্তক্ষেপ করেন, ইহার প্রথম অঙ্ক ও দ্বিতীয় অঙ্কের দুইটি দৃশ্য মাত্র লিখিত হয়, ইহা আর কোনদিন সম্পূর্ণ করেন নাই।

'সিরাজদ্দৌল্লা'ই গিরিশচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাটক; শুধু গিরিশচন্দ্রের কেন, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌল্লা'র একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। ইহার তথ্য-সংগ্রহে নাট্যকার যে সতর্কতা ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা তৎকালীন বাংলার ঐতিহাসিক সাহিত্য রচনায় খুব সুলভ ছিল না। সিরাজদ্দৌল্লা সম্পর্কে তিনি ইংরেজ ঐতিহাসিক পরিবেষিত তথ্য বর্জন করিয়া এতদ্দেশীয় ঐতিহাসিকদিগের সর্বশেষ গবেষণালব্ধ তথ্যের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন, এই সম্পর্কে তিনি ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন, 'বিদেশী ইতিহাসে সিরাজ-চরিত্র বিকৃত বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়,

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শিক্ষিত সুধীগণ অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে বিদেশী ইতিহাস খণ্ডন করিয়া রাজনৈতিক ও প্রজাবৎসল সিরাজের স্বরূপ চিত্র প্রদর্শনে যত্নশীল হন। আমি ঐ সমস্ত লেখকগণের নিকট ঋণী।' গিরিশচন্দ্র রচিত 'সিরাজদ্দৌল্লা' নাটকের একটি প্রধান গুণ এই যে, ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক পরিবেষিত তথ্যের সঙ্গে নাট্যকার তাঁহার নিজস্ব কল্পনা আনিয়া কোথাও সক্রিয়ভাবে যোগ করেন নাই—কেবলমাত্র সামান্য দুই একটি চরিত্রের মধ্যে কতকটা অনৈতিহাসিক কাল্পনিক তথ্য প্রকাশ পাইলেও সমগ্র-ভাবে নাটকের ঘটনা-প্রবাহ সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ধারা অনুসরণ করিয়াই অগ্রসর হইয়াছে।

ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক নাট্যরচনার ভিতর দিয়া দেশাত্মবোধ প্রচারের সবে মাত্র সূত্রপাত হইয়াছে; কিন্তু 'সিরাজদ্দৌল্লা'র পূর্বে ঐতিহাসিক তথ্য সন্নিবেশ সম্পর্কে এমন সতর্কতা আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় নাই। দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক নাটকগুলির প্রধান ত্রুটি এই ছিল যে, ইহারা অতিমাত্রায় ভাবপ্রবণতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল—ভাবাবেগের সম্মুখে ঐতিহাসিক তথ্য অনেক ক্ষেত্রেই শুষ্ক তৃণের মত ভাসিয়া গিয়াছে; কিন্তু পৌরাণিক কিংবা সামাজিক নাট্য রচনায় গিরিশচন্দ্র নিজেও যে ভাবপ্রবণতার প্রশ্রয় দিয়াছিলেন, 'সিরাজদ্দৌল্লা' নাটকে তাহার লেশমাত্রেরও অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না। অথচ ইহার মধ্যে ভাবপ্রবণতা প্রকাশের প্রচুর অবকাশ ছিল। একমাত্র ঐতিহাসিক তথ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া গিরিশচন্দ্র এই মনোভাব ইহার সর্বত্র সংযত করিয়া রাখিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে সংযম অনেক ক্ষেত্রেই নির্মম ভাবে লঙ্ঘিত হইয়াছে।

একথা সত্য যে, বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের ভিত্তির উপরই 'সিরাজদ্দৌল্লা' নাটক রচিত হইয়াছে; সেইজন্য ইহার স্থানে স্থানে দীর্ঘ 'স্বদেশী বক্তৃতা'র অবতারণা করা হইয়াছে (১।১০ ও ৪।১ দ্রষ্টব্য)—তাহা নাট্য-কাহিনীর পক্ষে ভারস্বরূপ হইলেও সমসাময়িক রাজনৈতিক আন্দোলনের সহায়ক ছিল। প্রধানত এই কারণেই ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নাটকখানির অভিনয় ও প্রকাশ নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু নাটকের এই সকল অংশ বাদ দিলেও ইহার যে একটি স্থায়ী মূল্য আছে, তাহা স্বীকার করিতেই হয়।

সিরাজের চরিত্রই এই নাটকের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য চরিত্র।

সিরাজই এই ঐতিহাসিক ট্র্যাজিডির নায়ক। নাট্যকার এই নাটকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, 'আলিবর্দির জীবিতাবস্থাতেই সিরাজ-চরিত্র বিকাশ পাইতেছিল। সিরাজ-চরিত্র লইয়া দুই খণ্ড নাটক লিখিলে, প্রকৃত অবস্থা বর্ণিত হইতে পারিত। কিন্তু উপস্থিত দর্শকদের তৃপ্তিকর হইত কি না জানি না।' নাট্যকার এই নাটকের সর্বত্র এমন একটি আভাস দিয়া গিয়াছেন যাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, সিরাজের সমগ্র জীবন দুইটি সুস্পষ্ট বিভাগে বিভক্ত—আলিবর্দির জীবিতকালে সিরাজ যাহা ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর বাংলার মস্‌নদে উপবিষ্ট হইয়া সিরাজ তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া যান। অথচ আলিবর্দির জীবিতকালেই তাঁহার চরিত্রের যে পরিচয় জনসাধারণ লাভ করিয়াছিল, বাংলার নবাবী লাভ করিবার পরও তাঁহার উপর হইতে জনসাধারণের সেই ধারণা লুপ্ত হয় নাই—সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ইহাই কারণ। সিরাজ-চরিত্রের দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ তাঁহার নবাবী লাভ করিবার পরবর্তী অংশের উপর আলোচ্য নাটকের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে তাঁহার পূর্ববর্তী অংশের কোন প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকিবার জন্য অনেক স্থলে যে সিরাজের চরিত্র সুপরিস্ফুট ও কার্যকরী (effective) হইতে পারে নাই, তাহা লক্ষ্য করিতে পারা যায়। এই সম্পর্কে এখানে দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

সিরাজ কর্তৃক হুসেন কুলির বধ এই নাট্যকাহিনীর পূর্ববর্তী ঘটনা। এই নাটকে ইহার পরোক্ষ উল্লেখ মাত্র আছে, কিন্তু প্রত্যক্ষ পরিচয় নাই; সেইজন্য এই ঘটনা পাঠকের মনে কোন কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। অথচ 'সিরাজদ্দৌল্লা' নাটকের মধ্যে এই অপ্রত্যক্ষ ঘটনাটির উপর অত্যন্ত জোর দেওয়া হইয়াছে; বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপের ভিতর দিয়া এই প্রসঙ্গের বার বার উল্লেখ করা হইয়াছে—ইহারই প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য হুসেন কুলির পত্নী জহরা প্রত্যক্ষ ভাবে এই ট্র্যাজিডির ঘটনা-প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত হইয়া ইহার করুণ পরিণতি সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে—একটি অপ্রত্যক্ষ ঘটনার উপর দৃশ্যত এই নাট্যকাহিনীর পরিণতিকে ভিত্তি করিবার জন্য ইহার রস নিবিড় হইয়া উঠিতে পারে নাই। তারপর এই সম্পর্কে আরও একটি কথা এই যে, সিরাজের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার মূলে তাঁহার চরিত্রের উপর তাঁহার পারিষদদিগের অবিশ্বাস যতখানি কার্যকরী ছিল, ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থবোধ তত কার্যকরী ছিল না। অথচ সিরাজ-চরিত্রের যে অংশের উপর ভিত্তি করিয়া এই [illegible] সৃষ্টি,

তাহাও এই নাট্যকাহিনীর পূর্ববর্তী। অতএব এই ষড়যন্ত্র রচনার কারণও ইহাতে সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না। গিরিশচন্দ্র তাঁহার নাটকের এই ত্রুটি সম্পর্কে সজাগ ছিলেন, সেইজন্য তিনি স্বীকার করিয়াছেন, 'সিরাজচরিত্র লইয়া দুই খণ্ড নাটক লিখিলে, প্রকৃত অবস্থা বর্ণিত হইতে পারিত।' কিন্তু একই বিষয় লইয়া একাধিক খণ্ডে নাট্যরচনা ইংরেজি সাহিত্যে প্রচলিত থাকিলেও বাংলা সাহিত্যে তাহা আদরণীয় হইবে কিনা এই বিষয়ে তাঁহার সংশয় ছিল বলিয়া এই দিকে তিনি আর অগ্রসর হন নাই।

তথাপি এই নাটকের মধ্যে সিরাজ-চরিত্রের পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া অনুভূত হইবে না। সিরাজ-চরিত্রের মধ্যে নাট্যকার একটু সুস্পষ্ট মানবিক অনুভূতি দান করিয়াছেন এবং তাহাই প্রধানত ইহাকে যথার্থ নাটকীয় গৌরব দান করিয়াছে। সিরাজের প্রতি গিরিশচন্দ্রের সহানুভূতির ভাবও অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তাহার ফলেই নাট্যকার ইহাকে প্রায় সকল প্রকার দোষ হইতে মুক্ত রাখিতে পারিয়াছেন। এই নাটক একটি করুণ ট্র্যাজিডি; ট্র্যাজিডির যাহা প্রধান ধর্ম তাহা ইহার নায়ক সিরাজের চরিত্রের ভিতর দিয়াও প্রকাশ পাইয়াছে। সিরাজকে যদি সকল দিক দিয়া আদর্শ চরিত্র না করা হইত, তাহা হইলে তাঁহার পতন সার্থক ট্র্যাজিডির সৃষ্টি করিতে পারিত না—গিরিশচন্দ্র এই বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন, সেইজন্য তিনি সিরাজকে প্রজাবৎসল নবাব, আদর্শ স্বামী ও স্নেহময় পিতা রূপে চিত্রিত করিয়াছেন—এই সকল বিষয়ে তাঁহার চিত্র কোথাও এতটুকু ম্লান হইতে দেন নাই।

কিন্তু সিরাজ ট্র্যাজিডির নায়ক, সেইজন্য নাট্যকার তাঁহার চরিত্রের মধ্যে দুই একটি দুর্বলতারও স্থান দিয়াছেন, এই দুর্বলতার ছিদ্রপথ দিয়াই ট্র্যাজিডির বিষ তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। দৃঢ়তার অভাব ও ভীরুতা তাঁহার চরিত্রের প্রধান দুর্বলতা ছিল। মীরজাফর প্রমুখ তাঁহার অমাত্যবর্গকে তিনি প্রথম হইতেই ষড়যন্ত্রকারী বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন, বার বার তাঁহাদের বিরুদ্ধে তিনি কঠোর শাস্তির কল্পনা করিয়াও একমাত্র আলিবর্দি-মহিষীর মধ্যস্থতায় সে-কার্য হইতে বিরত হইয়াছেন। অথচ আলিবর্দি-মহিষীর প্রতি তাঁহার যে অন্ধ শ্রদ্ধাবোধ ছিল তাহাও নহে; কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়, শেষ পর্যন্ত তিনি আলিবর্দি-মহিষীর অনুরোধও প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। সিরাজ-চরিত্রের মধ্যে যদি দৃঢ়তার অভাব ন

থাকিত, প্রথম হইতেই যখন তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, মীরজাফর-জগৎশেঠ-রায়দুর্লভ ইত্যাদি তাঁহার অহিতাকাজ্ঞী, তখনই যদি তিনি আলিবর্দি-বেগমের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়াও ইহাদের উপর উপযুক্ত শাস্তিবিধান করিতেন, তবে সিরাজ-জীবনের এই ট্র্যাজিডি সম্ভব হইত না—নাট্যকার অতি কৌশলে সিরাজ-চরিত্রের এই দুর্বলতাটুকু স্থানে স্থানে প্রকাশ করিয়াছেন। ভীরুতা সিরাজ-চরিত্রের অন্যতম দুর্বলতা। গড়ের মাঠে তাঁহার সৈন্যের উপর অতর্কিত নৈশ আক্রমণের পর তিনি রাজা রায়দুর্লভকে বলিতেছেন, 'এই দণ্ডে সন্ধির প্রস্তাব করে, ইংরাজ-শিবিরে দূত প্রেরণ করুন। যে স্বত্বে ইংরাজ সন্ধি করতে প্রস্তুত, সেই স্বত্বে সন্ধি হোক (২।৬)।' মীরজাফরকে তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী জানিয়াও তিনি পলাশীর যুদ্ধের প্রারম্ভে তাঁহাকে ক্লাইভের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য কাতর প্রার্থনা করিতেছেন; তিনি তাঁহাকে বলিতেছেন, 'আমার আহার নাই, নিদ্রা নাই,—শয়নে-স্বপনে ক্লাইভের ভীষণ মূর্তি আমার সম্মুখে বিরাজিত (৩।৫)।' যুদ্ধক্ষেত্রের শিবিরে উপস্থিত হইয়াও তিনি নিজের মনেও এই বিশ্বাস করিতেছেন, 'পরাজয় নিশ্চয় আমার (৪।২)।' এই প্রকার কাপুরুষোচিত উক্তিতে তাঁহার চরিত্রের নায়কোচিত গুণ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। তাঁহার চরিত্রে কেবলমাত্র পূর্বোল্লিখিত দৃঢ়তার অভাব দ্বারাই তাঁহার ট্র্যাজিডি সম্ভব করা যাইত, ইহার জন্য তাঁহার মধ্যে এই প্রকার কাপুরুষোচিত ভীরুতার কল্পনা না করিলেও চলিত। ইতিহাসের কোন সূত্র হইতেই গিরিশচন্দ্র সিরাজ-চরিত্রের মধ্যে এই ভীরুতার সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহাই রূপায়িত করিতে গিয়া নাটকের নায়ক-চরিত্র ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। পলাশীর শিবিরে উপস্থিত থাকিয়াও সিরাজ যে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই বরং সেখান হইতে পলাইয়া আসিলেন, ইহা হইতেই গিরিশচন্দ্র তাঁহার চরিত্রের মধ্যে ভীরুতার সন্ধান পাইয়া থাকিবেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্রের এই দিকটির প্রতি অতিরিক্ত জোর দিবার ফলে নাটকের করুণ রস আশানুরূপ নিবিড় হইয়া উঠিতে পারে নাই—বীরের পতন দ্বারাই ট্র্যাজিডির সার্থকতা, কাপুরুষের পতন দ্বারা তাহা সম্ভব নহে—গিরিশচন্দ্র স্বদেশী যুগের আদর্শানুরূপ সিরাজকে স্বাধীন বাংলার নিঃশেষ গৌরব বলিয়া কল্পনা করিয়াও একান্ত ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠার জন্য এই পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁহার চারিত্রিক মর্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। স্বদেশী যুগের বাঙ্গালীর নবপ্রবুদ্ধ জাতীয়তাবোধ দ্বারা যে সিরাজ ষড়যন্ত্রকারী

ইংরেজ কর্তৃক অন্যায়ভাবে রাজ্যচ্যুত বলিয়া কীর্তিত হইতেছিলেন, তাহারই চরিত্র রূপায়িত করিতে গিয়া ঐতিহাসিক মর্যাদা রক্ষার জন্য গিরিশচন্দ্র তাঁহার সম্পর্কিত জাতির নবোন্মেষিত শ্রদ্ধাবোধকে ব্যাহত করিয়াছিলেন বলিয়াই মনে হইবে। তাঁহার সিরাজ প্রজা-বৎসল, ক্ষমাশীল, পত্নী-প্রেমিক, সন্তান-বৎসল হইয়াও দুর্বলচিত্ত ও ভীরু; কিন্তু বাঙ্গালীর মানস-লোকে সেদিন যে সিরাজের চিত্র জাগিয়াছিল, তাহাতে তাঁহার দুর্বল-চিত্ততার যে স্থানই থাকুক না কেন, তাহাতে যে ভীরুতার স্থান ছিল না তাহা সত্য।

ঐতিহাসিক চরিত্রের মধ্যে সিরাজের পরই ঘসেটি বেগমের উল্লেখ করিতে হয়। ঈর্ষ্যাপরায়ণারূপে ঘসেটির চরিত্রটি সুন্দর পরিস্ফুট হইয়াছে। তাহার ঈর্ষ্যাগ্নিতে হুসেন কুলির জীবন বিনষ্ট হইয়াছে, ইহা এই নাটকের পূর্ববর্তী ঘটনা হইলেও ইহার ফল নাটকে এত সুদূরপ্রসারী হইয়াছে। এই ঈর্ষ্যার নিদর্শনটি হইতে ঘসেটি-চরিত্রের নীচতা সুস্পষ্ট হইয়াছে। সে হুসেন কুলির প্রতি অবৈধ প্রণয়াসক্ত ছিল বলিয়া নিজেই প্রকাশ করিয়াছে; কিন্তু অস্থিরচিত্ত হুসেন কুলি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যখন তাহারই কনিষ্ঠা ভগ্নী আমিনার প্রতি আসক্ত হইয়াছে, তখন সে আমিনার প্রতি ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া হুসেন কুলির বধ-সাধনে সম্মতি দিয়াছে—নাটকের মধ্যে এই ঘটনার উল্লেখ মাত্র থাকিলেও ইহাদ্বারা ঘসেটির চরিত্রটি দর্পণের মত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—এই চরিত্রের পক্ষে সংসারের কোন দুষ্কার্যই অসাধ্য বিবেচিত হইতে পারে না। সে বিধবা, কিন্তু মৃত পতির প্রতি তাহার কোন শ্রদ্ধাবোধ নাই, একমাত্র তাঁহার প্রদত্ত হীরা-জহরৎ ও লালকুঠির বিলাস-জীবনেই তাহার আসক্তি, ইহা হইতে বঞ্চিত হইয়া সে ভীষণতর হইয়া উঠিল এবং সিরাজের পতন অনিবার্য করিয়া তুলিবার জন্য সর্ববিধ সহায়তা করিল। ট্র্যাজিডির খল (villain) চরিত্ররূপে তাহার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় নাই। জহরা-চরিত্র ঘসেটি-চরিত্রেরই একটি প্রসারিত রূপ; ঘসেটি রক্তমাংসের সৃষ্টি, জহরা তাহারই ছায়া মাত্র।

সিরাজ-মহিষী লুৎফউন্নিসার চরিত্রটি নাট্যকারের পরিকল্পনায় ইহার সকল সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছে; সে সরলা, শত্রুমিত্র চিনিতে পারে না। ঘসেটির কূট চক্রান্ত বুঝিতে না পারিয়া স্বামীর মোহর শত্রুর হাতে তুলিয়া দিয়াছে, তাহার এই সরলতার ছিদ্রপথ দিয়াই তাহার দাম্পত্য জীবনে

সর্বনাশের কালসর্প প্রবেশ করিয়াছে। সে সামান্ত রমণী হইতে মহিষীর পদে উন্নীত হইয়াছিল, অতএব তাহার আচার-আচরণের মধ্যে রাজপরিবারোচিত আভিজাত্যবোধ ছিল না, একটু নির্বোধ সরলতাই তাহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল, ইহাই তাহার পতনেরও মূল হইল। ওয়াট্‌স্‌-পত্নীর সঙ্গে তাহার ব্যবহারে তাহার একটি সহজ নারী-স্বভাবের সুন্দর পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে।

সিরাজের প্রতি একান্ত স্নেহশীল দেখাইতে গিয়া নাট্যকার আলিবর্দি-বেগমকে তাঁহার উচ্চ রাজ-মর্যাদা হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। তিনি বার বার অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদিগের সম্মুখীন হইয়াছেন এবং কাতর অনুনয়দ্বারা তাহাদের মনের গতি ফিরাইতে চাহিয়াছেন। পলাশীর যুদ্ধের প্রারম্ভে বিশ্বাসঘাতী মীরজাফরের বাটীতে আসিয়া তাহার সম্মুখে তিনি এই ভাবে নতজানু হইয়া সিরাজের জন্য সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছেন—

'নাও, নাও, আমার সিরাজকে নাও। যে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার-অধিপতির প্রধানা বেগম ছিল—যার সম্মুখে শত শত জানু ভূমিস্পর্শ করেছে, শত শত রাজমুকুট অবনত হয়েছে, (জানু পাড়িয়া) সেই আজ অবনত-মস্তকে ভূমিতে জানুস্পর্শ করে ভিক্ষা চাচ্ছে ;—ভিক্ষা দাও —সন্তান-ভিক্ষা দাও—বঞ্চনা করো না'—৩।৫

বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার অধিপতি প্রধানা বেগমের পরিচয় এখানে কেবল বক্তৃতা দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে, আচরণের দ্বারা প্রকাশ করা হয় নাই—ইহাই এই চরিত্রটির প্রধান ত্রুটি। গিরিশচন্দ্র আলিবর্দি-বেগমের মধ্যে বাঙালী দৌহিত্রের দিদিমাকেই রূপায়িত করিয়াছেন, উচ্চ রাজমর্যাদা-সম্পন্ন নবাব-মহিষীকে চিত্রিত করিতে পারেন নাই। এই জন্যই এই চরিত্রটি নাটকের ঐতিহাসিক পরিবেশও ক্ষুণ্ণ করিয়াছে বলিয়া বোধ হইবে।

সাহসিকতা, বীরত্ব ও প্রভুভক্তিতে মীর মদন ও মোহনলালের চরিত্র অপূর্ব গৌরবময় করিয়া চিত্রিত হইয়াছে, তাঁহাদের দেশভক্তি ও আত্মত্যাগের আদর্শ সে যুগের বাঙ্গালীর দেশাত্মবোধের প্রেরণা যোগাইয়াছে।

এই নাটকের অন্যান্য ঐতিহাসিক চরিত্র বৈশিষ্ট্য-বর্জিত—ইতিহাসে নাট্যকার তাহাদিগকে যেমন পাইয়াছেন, প্রধানত সেই ভাবেই তাহাদিগকে নাটকে আনিয়া ব্যবহার করিয়াছেন, ইহার বিশেষ কোন ব্যতিক্রম করেন নাই।

ঐতিহাসিক চরিত্র দানশা ফকির সম্পর্কে এ'বার দু'একটি কথা বলিব। সে পূর্ণিয়ার নবাব সকতজঙ্গের অর্থপুষ্ট, তাহারই স্বার্থের জন্য সে সিরাজের

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রচার করিয়া দণ্ডলাভ করিয়াছে। ফকিরি তাহার ভণ্ডামির আবরণ মাত্র। ধর্মের নাম করিয়া যে ভণ্ডামি করে, তাহার মত নীচাশয় আর কেহ নাই। অতএব তাহা দ্বারা যে কোন হীন কার্যই সম্ভব। সকতজঙ্গের মৃত্যুর পর সে নিরবলম্বন হইয়া পড়িয়া এক দরগাতে বাস করিতে লাগিল, কিন্তু দরগা তাহার ধর্ম-সাধনার স্থান ছিল না,—জীবিকা-অর্জনের উপায় ছিল। সিরাজ তাহাকে যে দণ্ড দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার রাষ্ট্রের স্বার্থের জন্য রাষ্ট্রের সঙ্গত নিয়মানুসারেই দিয়াছিলেন, এমন কি ফকির বলিয়া তাহার দণ্ড কিছু লঘুই হইয়াছিল; কিন্তু ইহার জন্য কৃতজ্ঞতা দূরে থাকুক, এই হীনাত্মার মনে নবাবের বিরুদ্ধে যে প্রতিহিংসার ভাবই প্রচ্ছন্ন হইয়া ছিল, ইহা তাহার মত চরিত্রের পক্ষে স্বাভাবিক; সেইজন্য সে অতি সহজেই চরম বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সিরাজ-পরিবারকে ধরাইয়া দিল—তাহার বিষেই ট্র্যাজিডির পাত্র পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

সমগ্র নাটকটির মধ্যে দুইটি মাত্র চরিত্র অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইবে—প্রথমত জহরার চরিত্র। জহরা হুসেন কুলির বিধবা পত্নী, স্বামীর মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য সে হিংস্র হইয়া উঠিয়াছিল, সিরাজের হত্যার সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতিশোধ-স্পৃহা নিবৃত্ত হইয়াছে। এই চরিত্রটির কার্যাবলী সর্বাংশে ইতিহাস-সম্মত নহে। কিন্তু ইহার সম্বন্ধে একটি কথা এই যে, এই চরিত্রটি কোন কোন স্থলে দৃশ্যত ঘটনার প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে বলিয়া মনে হইলেও কার্যত তাহা হয় নাই—সে যেন দুর্বার নিয়তির রূপ ধরিয়া এই নাটকের ঘটনার মধ্যে প্রত্যক্ষ হইয়া রহিয়াছে। সে কোন রক্তমাংসের চরিত্র নহে, নাটকের রসরূপ বৃদ্ধি করিবার জন্যই তাহার পরিকল্পনা হইয়াছে। তাহার প্রেরণা কোন ঐতিহাসিক ঘটনাজাত নহে; অতএব সে যদি এই নাট্য-কাহিনীর মধ্যে না থাকিত, তাহা হইলেও ইহার মূল কাহিনী অন্য রকম হইত না; তবে সে ইহাতে থাকিবার ফলে ইহার অনেক অস্ফুট ইঙ্গিত ও অদৃশ্য ঘটনা সাধারণ দর্শকের নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে মাত্র। সে ভাগ্য-বিড়ম্বিত সিরাজ-জীবনের নিয়তিরূপিণী এবং নাট্যকাহিনীর অলঙ্কার-স্বরূপ মাত্র—এইভাবে বিচার করিলেই এই চরিত্রটির তাৎপর্য সম্যক্ বুঝিতে পারা যাইবে।

কিন্তু আনুপূর্বিক স্বপ্ন-চরিত্ররূপে জহরার চরিত্র যদি চিত্রিত করা হইত, তাহা হইলে ইহার সম্পর্কে আর কিছুই বলিবার থাকিত না। এই চরিত্রটির

একটি প্রধান ত্রুটি এই যে, ইহাকে নাট্যকার স্বপ্নরাজ্য হইতে কোন কোন সময় বাস্তবের রাজ্যেও আনিয়া ফেলিয়াছেন, এই সকল ক্ষেত্রে স্বপ্ন ও বাস্তবের মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি হয় নাই। হুসেন কুলির সঙ্গে তাহার সম্পর্কের কথা মধ্যে মধ্যে এমন জোর দিয়া বলা হইয়াছে যে, তাহার ফলে তাহার স্বপ্নরূপ বাস্তবের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে; কিন্তু পরক্ষণেই তাহার অবাস্তব রূপ আবার এমন প্রকট হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহার সম্পর্কিত সকল বাস্তব পরিকল্পনাই বাষ্প হইয়া উড়িয়া গিয়াছে। সিরাজ তাহার স্বামী হুসেন কুলিকে হত্যা করিয়াছেন বলিয়াই সে পতিহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া নাট্যকার উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু এই নাটকের মধ্যে হুসেন কুলির যে চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়, অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে ঘসেটি ও আমিনা বেগমের সহিত তাহার অবৈধ প্রণয়—তাহা হইতে জহরার প্রতি তাহার স্বামীর একনিষ্ঠ প্রণয়াসক্তির পরিচয় প্রকাশ পায় না। হুসেন কুলিকে কোন ব্যক্তিগত আক্রোশ বা স্বার্থসিদ্ধির প্রেরণায় যে সিরাজ শাস্তি দিয়াছিলেন, তাহা নহে; নবাবের অন্তঃপুর অবৈধ প্রণয়দ্বারা কলুষিত করিবার পাপেই তাহাকে দণ্ডদান করা হইয়াছিল—এই দণ্ড যে ভ্রান্ত বিচারের ফল, তাহাও ত বলা যায় না; কারণ, এই অবৈধ প্রণয়ের কথা ঘসেটি বেগম নিজের মুখেই এইভাবে স্বীকার করিয়াছে—

'স্বর্ণকান্তি হুসেন কুলিকে কে বধ করলে? নারীর প্রতিহিংসা! হুসেন, হুসেন—কুক্ষণে আমায় বর্জন করে তুই আমিনার প্রেমে আবদ্ধ হয়েছিলি। নচেৎ সিরাজের কি সাধ্য, যে সে তোরে রাজপথে বধ করে।—দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নবাব-অন্তঃপুরের এই অবৈধ প্রণয়ের কথা মুর্শিদাবাদের সকলেই ত জানিত, জহরারই বা তাহা না জানিবার কি কারণ ছিল? কারণ, একদিন আমির বেগও মৃত হুসেনের স্মৃতির প্রতি জহরার সুগভীর আকর্ষণ দেখিয়া এই বলিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছে—'হুসেনের প্রতি এর এত ভালবাসা! হুসেন তো ঘসেটি আর আমিনা বেগমকে নিয়েই ছিলো, এর প্রতি তো ফিরেও চাইতো না (চতুর্থ অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক)।' অতএব এই অবস্থায় হুসেন কুলির বধের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য জহরার মধ্যে এমন দুর্দমনীয় হিংসানল প্রজ্বলিত হইবার কোন কারণ নাই; অথচ প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে গেলে তাহার সক্রিয় প্রতিহিংসাবোধই এই ট্র্যাজেডির মূল বলিয়া মনে হইতে

পারে। জহরার পতিপ্রেমকে নাট্যকার এখানে অসঙ্গত প্রাধান্ত দিয়া নাটকের বাস্তবধর্ম ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন।

করিম চাচার চরিত্র এই নাটকের অন্যতম অস্বাভাবিক চরিত্র। গিরিশ-চন্দ্রের পৌরাণিক ও সামাজিক নাটকের মধ্যে যে এক একটি পাগলরূপী প্রচ্ছন্ন 'মহাপুরুষ' থাকে, 'সিরাজুদ্দৌলা' নাটকে করিম চাচা তাহাই। সেও পাগল, সংসারের কোন বিষয়ের সঙ্গে তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থের সম্পর্ক নাই। নবাব-দরবার হইতে আরম্ভ করিয়া মীরজাফরের গুপ্ত ষড়যন্ত্র-সভা পর্যন্ত তাহার গতিবিধি অবারিত। গিরিশচন্দ্রের এই শ্রেণীর পাগল চরিত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহারা নাট্যকাহিনী নিয়ন্ত্রিত করিতে কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে না—কাহিনীর অলঙ্কার স্বরূপ হইয়া থাকে মাত্র। কিন্তু 'সিরাজুদ্দৌলা'র করিম চাচার চরিত্র ইহার অলঙ্কার মাত্র না হইয়া ইহার ভারস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। পৌরাণিক নাটকের কাহিনীতে যে অলঙ্কার শোভাবর্ধনের কার্য করে, ঐতিহাসিক নাটকে তাহা ভারস্বরূপ হইতে বাধ্য, গিরিশচন্দ্র ইহা অনুভব করিতে পারেন নাই। 'সিরাজুদ্দৌলা' নাটকের কাহিনী দ্রুত সঞ্চরণশীল, প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ইহা কোথাও বিরাম লাভ করিতে পারে নাই। করিম চাচার বৈচিত্র্যহীন ও বিরক্তিকর সংলাপ নাট্যকাহিনীর অগ্রগতিতে সর্বত্র বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। কাহিনীর নাট্যিক গতির করিম চাচাই একমাত্র অন্তরায়, অবাস্তব চরিত্র হইয়া জহরাও এই অন্তরায় সৃষ্টি করিতে পারে নাই। করিম চাচার হিতোপদেশ-গুলি কাহিনীর নিবিড়তা বিনষ্ট করিয়াছে, ইহার দৈর্ঘ্যও অনাবশ্যক বৃদ্ধি করিয়াছে। এই নাটকের সংলাপের মধ্যে প্রায় সর্বত্র যে একটি প্রত্যক্ষতা-(directness) গুণ প্রকাশ পাইয়াছে, করিম চাচার অস্পষ্ট হেঁয়ালীর মত উক্তি-প্রত্যুক্তিতে ইহার সেই গুণ মধ্যে মধ্যে বিনষ্ট হইয়াছে। তাহার চরিত্রের পরিকল্পনাটির মধ্যে অসঙ্গতি সকল মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে—এদেশে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের পূর্বেই সে জুলিয়স্ সীজারের ইতিহাস শিখিয়াছে, হানিবলের জীবন-বৃত্তান্ত সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হইয়াছে, আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ সম্বন্ধেও জ্ঞান লাভ করিয়াছে (তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য দ্রষ্টব্য), সিরাজের নিত্যসহচর হইয়াও সে মীরজাফরের গোপন ষড়যন্ত্র বৈঠকে অবাধ প্রবেশের অধিকার লাভ করিয়াছে ; ইহাতে কেবলমাত্র যে তাহার নিজের চরিত্রেরই অবাস্তবতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা নহে, ইহা

দ্বারা গোপন রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বৈঠকের নাটকীয় পরিবেশটিও বিনষ্ট হইয়াছে। ঐতিহাসিক নাটকের পক্ষে ইহা যে একটি গুরুতর ক্ষতির কারণ হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। পৌরাণিক নাটক রচনায় সিদ্ধহস্ত গিরিশচন্দ্র যে ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিতে গিয়াও তাঁহার পৌরাণিক নাট্যরচনার রীতিগত সংস্কার হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন নাই, 'সিরাজদ্দৌলা'র জহরা ও করিম চাচাই তাহার প্রমাণ—দুইটি চরিত্রই তাঁহার উপর পৌরাণিক নাটক অথবা সমসাময়িক গীতাভিনয়ের প্রভাবেরই প্রত্যক্ষ ফল।

জহরার আলোচনা সম্পর্কে বলিয়াছি যে, স্বপ্ন-চরিত্র যদি আনুপূর্বিক স্বপ্নরূপ রক্ষা করিয়া চলিতে পারে, তবে তাহা দ্বারা বস্তুধর্মী কাহিনীরও বহিঃ-সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়; কিন্তু তাহা যদি বাস্তব জীবনকে স্পর্শ করে, তবে ইহার দ্বারা সেই সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়। অবাস্তব চরিত্র করিম চাচাকে দিয়া নাট্যকার একটি বাস্তব বা ব্যবহারিক (practical) প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ করিয়া লইয়াছেন —ইহা নাট্যকাহিনীর পক্ষে এক গুরুতর ত্রুটির কারণ হইয়াছে—করিম চাচাই পলায়মান নবাবের পরিচ্ছদের সঙ্গে নিজের পরিচ্ছদ বিনিময় করিয়া লইয়াছে। নাট্যকাহিনীর আনুপূর্বিক যাহাকে সকল রকম বাস্তব সম্পর্ক হইতে মুক্ত দেখিতে পাইয়াছি, নাটকের শেষাঙ্কে তাহাকে দিয়াই নাট্যকার এই বাস্তব ঘটনাটি অভিনীত করাইবার ফলে, তাহার চরিত্রটি বিশেষ কোন একটি অবিমিশ্র উপাদানে গঠিত বলিয়া মনে হইবে না—বাস্তব ও অবাস্তবের মিশ্র উপাদানে গঠিত বলিয়া মনে হইবে। বিপরীতধর্মী উপাদানের একটি সংমিশ্রণের ফলে চরিত্রটির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে। সেইজন্য সকল প্রকার ব্যবহারিক সম্পর্কশূন্য এই অবাস্তব চরিত্রটিকে শেষ পর্যন্ত যখন দুইজন প্রহরি-কর্তৃক বন্দিরূপে মীরজাফরের সম্মুখে উপস্থিত হইতে দেখি, তারপর প্রথমে শূলদণ্ড ও পরে সাধারণভাবে প্রাণদণ্ডের আদেশ গ্রহণ করিতে শুনিতে পাই, তখন কিছুতেই দৃশ্যটির বাস্তব গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারি না। একটি স্বপ্ন-চরিত্রকে কঠিন বাস্তবের সংস্পর্শে আনিয়া নাট্যকার এই প্রকার নির্মমভাবে বিনষ্ট করিয়াছেন। করিম চাচার মধ্য দিয়া এই নাটকে যে কোন কোন স্থানে হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও নিতান্তই ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া অনুভূত হইবে।

এই নাটকের আরও দুই একটি ছোটখাট ত্রুটি সম্পর্কেও এখানে উল্লেখ

করা যাইতে পারে। ইহার প্রায় সর্বত্রই মৃত্যুকালে যে আলিবর্দি সিরাজকে তাঁহার অমাত্যবর্গের হাতে তুলিয়া দিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে সিরাজকে সকল রকমে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কথা বার বার উল্লেখ করা হইয়াছে—কিন্তু ঘটনাটি নাটকের পূর্ববর্তী বলিয়া ইহা দৃশ্যত পরিত্যক্ত হওয়ায় ইহার কার্যকারিতা (effect) অনুভূত হয় না, ইহা কেবলমাত্র একটি বক্তৃতার মতই মনে হয়। এই দৃশ্যটি নাট্যকাহিনীর সঙ্গে যদি সংযুক্ত থাকিত, তবে দর্শকের মনে ইহার ফল সক্রিয় হইত, অমাত্যবর্গের বিশ্বাসঘাতকতা প্রত্যক্ষ হইয়া নাটকের করুণরস অধিকতর নিবিড় করিয়া তুলিত।

সমসাময়িক রাজনৈতিক বক্তৃতার অনেক কথা এই নাটকের মধ্যে অসঙ্গত ভাবে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। যদিও আধুনিক হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ইংরেজ রাজত্বেরই সৃষ্টি, তথাপি সিরাজের মুখে ইহার নিন্দাবাদ শুনা যাইতেছে (২।৬)। এই নাটকে গিরিশচন্দ্র কোন কোন স্থলে তাঁহার নিজস্ব গৈরিশছন্দও ব্যবহার করিয়াছেন। পৌরাণিক নাটকে গৈরিশছন্দের উপযোগিতা যাহাই থাকুক না কেন, 'সিরাজুদ্দৌল্লা'র মত ঐতিহাসিক নাটকে যে তাহা সম্পূর্ণ অনুপযোগী তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সিরাজুদ্দৌল্লার গদ্য-সংলাপ নাটকীয় গুণ-সমৃদ্ধ, কিন্তু ইহার গৈরিশছন্দে রচিত অংশ সকল দিক দিয়াই ব্যর্থ রচনা। এই নাটক রচনায় গিরিশচন্দ্র তাঁহার পৌরাণিক নাটকের প্রভাব যে অতিক্রম করিতে পারেন নাই তাহা জহরা ও করিম চাচার চরিত্র সমালোচনা সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছি, ইহাতে গৈরিশছন্দের প্রয়োগ তাহারই আর একটি নিদর্শন।

'সিরাজুদ্দৌল্লা' নাটক সম্পর্কে আর একটি কথা মনে হইতে পারে—ইহা পারিবারিক ট্র্যাজিডি না রাজনৈতিক ট্র্যাজিডি? অবিমিশ্র পারিবারিক ষড়যন্ত্রের ফলে কোন রাজা বা রাজপুরুষের যদি পতন হয়, তবে তাহা পারিবারিক ট্র্যাজিডি বলিয়া নির্দেশ করা যায়, কিন্তু বহির্জীবনে প্রজা কিংবা রাজকর্মচারীদের ষড়যন্ত্রের ফলে যদি কোন রাজা কিংবা পদস্থ রাজকর্মচারীর পতন হয়, তবে তাহা রাজনৈতিক ট্র্যাজিডি হইতে পারে। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে একটু সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। রাজনৈতিক ট্র্যাজিডির ঘটনাবলী অনেক সময় ইহার নাটকের আয়ত্তাধীন থাকে না। ষোড়শ লুইর জীবনে যে শোচনীয় ট্র্যাজিডি সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার জন্য তিনি নিজে কতটুকু দায়ী

ছিলেন? পূর্বপুরুষের সঞ্চিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাঁহাকে একাই করিতে হইয়াছে। কিন্তু পারিবারিক ট্র্যাজিডির ঘটনার ক্ষেত্র এত বিস্তৃত নহে, ইহার ঘটনাবলীর জন্য নায়কই প্রধানত দায়ী হয়। এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে 'সিরাজুদ্দৌল্লা'র কি স্থান? অবশ্য এখানে একটি কথা অবশ্যই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মানব-জীবনের ঘটনাসমূহ পরস্পর কতকগুলি সুস্পষ্ট ও স্বতন্ত্র ধারায় সর্বদা প্রবাহিত হইয়া যাইতে পারে না, ইহা প্রায়ই আপেক্ষিক হইয়া থাকে। পারিবারিক জীবনের ঘটনাসমূহ বহির্জীবনের ঘটনাবলীর উপর যেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, তেমনই বহির্জীবনের ঘটনাবলীও পারিবারিক জীবনের উপর অনেক সময় প্রভাব বিস্তার করে। অতএব পারিবারিক বিষয় ও রাজনৈতিক বিষয় অনেক সময় একত্র মিশিয়া যাইবারও সম্ভাবনা আছে। 'সিরাজুদ্দৌল্লা' নাটকের ক্ষেত্রে কি হইয়াছে, এখন তাহাই বিচার করিতে হইবে।

'সিরাজুদ্দৌল্লা'র কাহিনী সাধারণভাবে বিশ্লেষণ করিলেই দেখিতে পাওয়া যে, ঘসেটি বেগমকে যদি সিরাজের পরিবারস্থ লোক বলিয়া ধরিতে পারা যায়, তবে একমাত্র সে ব্যতীত সিরাজের পরিবারস্থ অন্য কেহ তাঁহার বিরুদ্ধে কোন প্রকার ষড়যন্ত্রের সহায়তা করে নাই। ঘসেটি বেগমেরও উদ্দেশ্য রাজনৈতিক, সে তাহার পালিত পুত্র এক্রামদ্দৌল্লাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু ঘটনাচক্রে তাহার এই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে বরং তাহার পরিবর্তে তাহার কনিষ্ঠা ভগিনীর পুত্র সিংহাসন অধিকার করিয়াছে—ঘসেটির সঙ্গে সিরাজের এখানেই বিরোধের সূত্রপাত। তখনও ঘসেটি এক্রামদ্দৌল্লার শিশু সন্তানকে নামেমাত্র সিংহাসনে স্থাপন করিয়া নিজেই দেশ শাসন করিবার উচ্চাভিলাষ পোষণ করে, এই কার্যেই সে রাজা রাজবল্লভকে নিযুক্ত করিয়াছিল; কিন্তু রাজবল্লভ এই কার্যে সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। অতএব সিরাজের সঙ্গে তাহার শত্রুতার ধারা অব্যাহত হইয়া চলিয়াছে। তারপর সিরাজ এই সকল ষড়যন্ত্রের কথা জানিতে পারিয়া মতিঝিল ধূলিসাৎ করিলেন, ঘসেটির ঐশ্বর্য অধিকার করিয়া লইলেন এবং নিজের প্রাসাদে আনিয়া বন্দিনী করিয়া রাখিলেন। পরম ঈর্ষ্যাপরায়ণা ঘসেটির ক্রূরপ্রবৃত্তিসমূহ অন্তরের ভিতরে জটিলতা সৃষ্টি করিয়া চলিল। তাহারই অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া স্বরূপ নবাবের বিরুদ্ধে তাহার প্রতিহিংসার অনল দীপ্ততর হইয়া উঠিল। ঘসেটি নবাব-প্রাসাদে বন্দিনী হইয়াছিল,

অতএব সে সিরাজের বিরুদ্ধে যে প্রতিহিংসার ভাবই পোষণ করুক না কেন, কেবলমাত্র তাহাদ্বারা সিরাজ জীবনের এই পরিণতি কদাচ সম্ভব হয় নাই। সিরাজের বিরুদ্ধে সক্রিয় ষড়যন্ত্র তাঁহার পরিবারের বহির্ভূত প্রবলতর রাজনৈতিক কূটনীতিবিদ্‌গণের দ্বারাই সৃষ্ট হইয়াছিল, ঘসেটির সঙ্গে সিরাজের পরিবার-বহির্ভূত এই ষড়যন্ত্রকারী দলের সঙ্গে কোন যোগাযোগ ছিল বলিয়া অনুভব করা যায় না। ঘসেটি মীরজাফরকে নবাব করিতে চাহে নাই। অতএব ঘসেটি প্রত্যক্ষভাবে সেই দলটিকে সক্রিয় সাহায্য করিয়াছে বলিয়াও মনে হয় না, সে নিজের পথেই নিজের হিংসাত্মক কার্যাবলী করিয়া গিয়াছে। কিন্তু সিরাজের মূল পরাজয় আসিয়াছে তাঁহার পরিবার-বহির্ভূত সেই বৃহত্তর ষড়যন্ত্রকারী দলটি হইতেই। পলাশীর ক্ষেত্রে পরাজয়ের পর মুর্শিদাবাদের নবাব-সৈন্যদের ঘসেটি অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়াছিল সত্য, কিন্তু মুর্শিদাবাদের নবাব-সৈন্যগণ সেদিন পলাশী-বিজয়ী ক্লাইভকে প্রতিরোধ করিতে পারিত না। পলাশীতেই সিরাজের ভাগ্য স্থির হইয়া গিয়াছিল। অতএব 'সিরাজুদ্দৌল্লা' প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক ট্র্যাজিডি, পারিবারিক ট্র্যাজিডি নহে।

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে মহারাজ অশোকের মত এত নাটকীয় ঘটনা-সঙ্কুল চরিত্র আর কাহারও বড় নাই। যে-সকল উপাদানের উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহার জীবনী রচিত হইয়া থাকে, তাহা নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক উপাদান বলিয়াই গৃহীত হয়। সেইজন্য তাহা অবলম্বন করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে প্রকৃত ঐতিহাসিক নাটক রচনার প্রচুর অবকাশ আছে। কিন্তু মহারাজ অশোকের জীবনের ঘটনাবলী এত বিচিত্র ও বিভিন্নমুখী যে, তাহা দ্বারা একখানি মাত্র নাটক রচনা করিলে ইহাদের কাহারও যথার্থ তাৎপর্য প্রকাশ পাইতে পারে না। অতএব তাঁহার জীবনের এক একটি বিশেষ অংশ লইয়া যদি এক একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা করা যায়, তাহা হইলেই এই বিচিত্র কর্মবহুল জীবনের যথার্থ পরিচয় প্রকাশ পাইতে পারে। গিরিশচন্দ্র মহারাজ অশোকের সমগ্র জীবন-বৃত্তান্ত একখানি মাত্র পঞ্চাঙ্ক নাটকের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার ফলে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, তাঁহার চরিত্রের কোন দিকই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইতে পারে নাই। যৌবনের উচ্ছৃঙ্খল রাজকুমার অশোক ও বার্ধক্যের সর্বত্যাগী মহারাজ প্রিয়দর্শন অশোকের মধ্যে বহুদূর ব্যবধান রহিয়াছে,—একটি নাটকের পরিমিত পরিধির মধ্যে সেই ব্যবধান অতিক্রম করা দুঃসাধ্য।

ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে গিরিশচন্দ্রের 'অশোকে'র একটি প্রধান ত্রুটি এই যে, ইহার মধ্যে কতকগুলি অলৌকিক চরিত্র আনিয়া প্রত্যক্ষভাবে জড়িত করা হইয়াছে—যেমন মার, তাহার অনুচর চণ্ডগিরিক ও মারের কন্যা তৃষা প্রভৃতি। ইহারাও ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির সঙ্গে প্রায় সমান অংশ গ্রহণ করিয়া চলিয়াছে। অবশ্য একথা সত্য যে, ইহারা কাহিনীর অলঙ্কার স্বরূপ হইয়াই আছে, ইহাদের দ্বারা মূল নাট্যকাহিনী নিয়ন্ত্রিত হয় নাই—তথাপি একটি ঐতিহাসিক নাটকের পরিবেশের মধ্যে ইহাদের প্রত্যক্ষ আচরণ সংযত হওয়া উচিত ছিল। এইজন্যই প্রধানত ঐতিহাসিক পরিবেশের মধ্যে এই নাটকখানি পৌরাণিক লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

মহারাজ অশোক কর্তৃক প্রচারিত বৌদ্ধধর্মের অহিংস আদর্শের মধ্যে গিরিশচন্দ্র সর্বমূলীভূত এই একক সত্যের সন্ধান লাভ করিয়াছিলেন—সন্ন্যাসী উপগুপ্ত বলিতেছেন, "জগতের সমস্ত ধর্মের সার মর্ম—'অহিংসা—সর্বভূতে আত্মজ্ঞান।' এই জগৎ-প্রেম লাভই সকল ধর্মের লক্ষণ, জগৎ-প্রেমে আত্মবিসর্জন। ভিন্ন ভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মপ্রচার হ'তে পারে; কিন্তু ধর্মের এই সার বর্জিত যে ধর্ম; ধর্ম নয়, ধর্মের নামে অধর্ম।" বলা বাহুল্য, ইহার মধ্যে রামকৃষ্ণশিষ্য গিরিশচন্দ্রের নবোদ্বুদ্ধ সর্বধর্ম-সমন্বয়ের আদর্শই ধ্বনিত হইয়াছে। তথাপি মূল নাট্যকাহিনীর মধ্য দিয়া গিরিশচন্দ্র এই ভাবটি ফুটাইয়া তুলিতে যান নাই।

ঐতিহাসিক বলিয়া পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও গিরিশচন্দ্র এই নাটকখানিকে অলৌকিকতায় ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছেন। এক হিসাবে ইহাকে চরিত-নাটকের অন্তর্ভুক্ত করাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়; কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, গিরিশচন্দ্র মহাপুরুষদিগের জীবন-চরিতকে নাট্যরূপ দিতে গিয়া বহু ক্ষেত্রেই অলৌকিকতার আশ্রয় লইয়াছেন; কিন্তু এই নাটকখানির মধ্যে প্রধানত ঐতিহাসিক তথ্যই লক্ষ্য ছিল বলিয়াই ইহা 'ঐতিহাসিক' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তবে ইহা গিরিশচন্দ্রের চরিত-নাটক ও ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যবর্তী রচনা বলিয়া গ্রহণ করাই সঙ্গত।

অশোকের চরিত্রের পরিবর্তন তাঁহার জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়—ইহা উচ্চাঙ্গের নাটকীয় গুণ-সমৃদ্ধ। মানবিক উপায়ে এই পরিবর্তন দেখাইতে পারিলে ইহাদ্বারাই এই নাটকের মূল্য বৃদ্ধি পাইত; কিন্তু গিরিশচন্দ্র অলৌকিক উপায়ে এই কার্য সাধন করিয়াছেন—ইহাতে অশোক

চরিত্রের ঐতিহাসিক মর্যাদা যেমন ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তেমনই ইহার নাটকীয় মূল্যও প্রকাশ পায় নাই।

নাটকখানিকে অশোক সম্পর্কিত ঐতিহাসিক বিবরণের সংক্ষিপ্ত তালিকা মাত্র বলা যাইতে পারে—ইহাতে ইতিহাসে উল্লিখিত তাঁহার সম্পর্কিত কোন ঘটনারই উল্লেখ বাদ যায় নাই; অথচ ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, জীবনের বিশেষ একটি দ্বন্দ্ব কিংবা বিরোধই নাটকের বিষয়ীভূত হইতে পারে—সংঘাতহীন একটানা ঘটনা-প্রবাহ কোনদিনই নাটকের উপজীব্য রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না। তথ্য-সংগ্রহে অধ্যবসায় এক জিনিস ও মৌলিক সৃজনী শক্তি অপর জিনিস। 'অশোক' নাটকের ভিতর দিয়া নাট্যকারের অধ্যবসায়েরই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, নাট্যিক সৃষ্টিকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। মনে হয়, অতিরিক্ত তথ্যনির্ভরশীলতার জন্যই ইহার এই ত্রুটি প্রকাশ পাইয়াছে।

সমসাময়িক ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া গিরিশচন্দ্র কতকগুলি সংক্ষিপ্ত চিত্র রচনা করিয়াছিলেন। নাট্যাকারে রচিত হইলেও নাটকের প্রাণ ইহাদের নাই, গিরিশচন্দ্রের নাট্যরচনার বৈচিত্র্য নির্দেশ করিবার জন্যই ইহাদের এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

কলিকাতায় জাতীয় মহাসমিতির (Congress) অধিবেশন উপলক্ষে গিরিশচন্দ্র 'মহাপূজা' নামক একখানি ক্ষুদ্র নাটক রচনা করিয়া ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেন; নাট্যকার ইহাকে 'রূপক' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—ইহার মধ্যে লক্ষ্মী, সরস্বতী, ভারতমাতা, বৃটানিকা ইত্যাদি চরিত্রের উল্লেখ আছে, কোন বিশিষ্ট নাটকীয় মানব-মানবীর চরিত্র নাই; ভারতসন্তানগণ বলিয়া কতকগুলি চরিত্রের উল্লেখ থাকিলেও তাহাদের কাহারও বিশিষ্টতা ইহাতে ফুটিয়া উঠে নাই। সমসাময়িক কালের জাতীয় মহাসভার যাহা আদর্শ ছিল, ক্ষুদ্র নাটকখানির ভিতর দিয়া গদ্য ও পদ্যাকারে তাহাই প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহার জাতীয়তাবোধক এই পদ্যোক্তিটি সমসাময়িক কালে বিশেষ লোক-প্রীতি অর্জন করিয়াছিল—

> ভারত-সন্তান কর কোলাকুলি
> দুখনিশা অবসান;
> কি হেতু নীরব এ'মহা উৎসবে
> প্রাণ খুলে কর গান। (১।২)

ইহার মধ্যে এই প্রকার পদ্যোক্তি ও ভারত-সন্তানগণের অন্তঃসারশূন্য বক্তৃতা ভিন্ন প্রকৃত নাটকীয় উপকরণ আর কিছু মাত্র নাই।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ষাট বৎসর রাজ্যকাল পূর্ণ হওয়ায় সমগ্র ভারতব্যাপী যে হীরক জুবিলী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই উপলক্ষে 'নটের রাজভক্তি উপহার' স্বরূপ গিরিশচন্দ্র 'হীরক জুবিলী' নামক একখানি ক্ষুদ্র গীতিনাট্য রচনা করেন। ইহাতে বিভিন্ন শ্রেণীর নাগরিক ও নাগরিকগণের কথোপকথনের ভিতর দিয়া ভিক্টোরিয়ার চরিত্র-মাহাত্ম্য তাঁহার রাজত্বকালে ভারতবাসীর বিবিধ বিষয়ক উন্নতির কথা কীর্তন করা হইয়াছে। ইহার একটি দৃশ্য 'লণ্ডন—উইণ্ডসর ক্যাসেলের সম্মুখে' স্থাপন করা হইয়াছে—অন্যান্য দৃশ্য কলিকাতা ও বাংলার বিভিন্ন পল্লী-অঞ্চলে স্থাপন করা হইয়াছে। একটি সমসাময়িক বিষয়বস্তুকে রূপ দিবার ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য ব্যতীত ইহার কোন সার্থকতা নাই।

হীরক জুবিলী উৎসবের তিন বৎসর পরই মহারাণী ভিক্টোরিয়া পরলোক-গমন করেন। এই উপলক্ষে গিরিশচন্দ্র আর একখানি ক্ষুদ্র নাটক রচনা করেন, ইহার নাম 'অশ্রু-ধারা'। নাটিকাখানি মাত্র চারিটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ। নাট্যকার ইহাকে 'রূপক' নাটক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; কারণ, ইহাতে কতকগুলি নৈর্ব্যক্তিক চরিত্র—যথা ভারতমাতা, দুর্ভিক্ষ, প্লেগ, অরাজকতা ইত্যাদির ভিতর দিয়া বিষয়টি ব্যক্ত করা হইয়াছে। ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুতে ভারতবাসিগণ দুর্ভিক্ষ, প্লেগ ও অরাজকতার আশঙ্কা করিতেছে; কিন্তু সিংহাসনোপরি সপ্তম এডোয়ার্ডকে উপবিষ্ট দেখিয়া তাহারা আশ্বস্ত হইয়াছে—এই বিষয়ই সাধারণ-ভাবে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসে বুয়র সেনানায়কগণের আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজদিগের সহিত বুয়রদিগের শান্তি স্থাপিত হয়। এই শান্তিস্থাপন উপলক্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিজয়োৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুন তারিখ সমগ্র ব্রিটিশ সামাজ্যব্যাপী এই বিজয়োৎসব অনুষ্ঠানের দিন নির্ধারিত ছিল। গিরিশচন্দ্র এই উপলক্ষে এই বিষয় অবলম্বন করিয়াই 'শান্তি' নামক একখানি একাঙ্ক নাটক রচনা করিয়া বিজয়োৎসব পালনের নির্ধারিত তারিখেই তাহা কলিকাতা ক্লাসিক থিয়েটারে সর্বপ্রথম অভিনীত করেন। নাট্যকার ইহাকে 'বুয়র সমর সংক্রান্ত রূপক' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। নাটকের মধ্যে কতকগুলি রূপক চরিত্র—যেমন,

শান্তিদেবী, কৃষিদেবী, শিল্প ও বাণিজ্য ইত্যাদির অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অবতারণা থাকিলেও ব্যাপকভাবে ইহা রূপক নাটক নহে, ইহা সর্বতোভাবে ইংরেজের বিজয়োৎসবে অনুষ্ঠিত হইবার মত উপযোগী করিয়াই রচিত। ইহাতে ব্রিটিশ সেনাপতি ও ব্রিটিশ-রাজমন্ত্রীর বদান্যতা ও শত্রুর প্রতি উদারতা প্রদর্শনের কথা বিশেষ ভাবে কীর্তিত হইয়াছে। রচনার দিক দিয়া ইহাতে আর কোন বিশেষত্ব নাই, তবে ইহাতে যে সকল দ্বৈত ও একক সঙ্গীত সংযোজিত হইয়াছে তাহা গিরিশচন্দ্রের সঙ্গীত রচনার দক্ষতারই পরিচায়ক।

পূর্বেই বলিয়াছি, বাংলা নাট্যসাহিত্যের আদিযুগে সংস্কৃত নাটক ও সেক্সপীয়রের কয়েকখানি ইংরেজি নাটকের অনুবাদ প্রকাশিত হইলেও, ইহার মধ্যযুগে এই অনুবাদের প্রবৃত্তি হ্রাস পাইয়া আসিয়াছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এই অনুবাদের ধারাটি আরও কিছু দূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু যখন বাঙ্গালী নাট্যকার তাঁহার নিজস্ব বিষয়বস্তুর সন্ধান পাইলেন, তখন অন্যের নিকট ঋণ স্বীকার করিবার তাঁহার আর প্রয়োজন রহিল না। অনুবাদ নাটক রচনার ধারাটি গিরিশচন্দ্র প্রধানতঃ রোধ করিয়া দিলেন। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের কোন প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ প্রভাব তাঁহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ ত দূরের কথা, তাহার কোন বিচ্ছিন্ন চিত্র কিংবা চরিত্রও তাঁহার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। গিরিশচন্দ্র ইংরেজি নাট্যসাহিত্য বিশেষত সেক্সপীয়র দ্বারা বাহ্যত প্রভাবিত হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি একখানি মাত্র নাটক ব্যতীত তাঁহার আর কোন নাটকেরই আনুপূর্বিক অনুবাদ রচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই—সেক্সপীয়রের যে নাটকখানি তিনি বাংলায় আনুপূর্বিক অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা 'ম্যাকবেথ'। ইহার অনুবাদ কার্যে গিরিশচন্দ্র যে দক্ষতা দেখাইয়াছেন, তাহা সত্যই বিস্ময়কর।

'ম্যাকবেথ' নাটকের পরিবেশ বাঙ্গালীর জীবনে সম্পূর্ণ অপরিচিত; কিন্তু 'ম্যাকবেথ'এর মধ্যে সেক্সপীয়র যে মানবচরিত্র-সমূহ চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা দেশকালপাত্র-নিরপেক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। গিরিশচন্দ্রের অনুবাদের ভিতর দিয়া ইহার চরিত্রগুলির এই চিরন্তন মানবিকতার দিকটি আচ্ছন্ন হইয়া যায় নাই বলিয়াই, ইংরেজি-অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী পাঠক মাত্রই ইহার রসগ্রহণে সমর্থ। 'ম্যাকবেথ' নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে যে তিনজন ডাকিনীর চিত্র আছে তাহাদের রহস্যঘন কথোপকথনটি গিরিশচন্দ্র যে কি কৌশলে

অনুবাদ করিয়াছেন, তাহার একটু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

১ম ডাকিনী। দিদি লো, বল্‌না আবার
মিল্‌ব কবে তিন বোনে ?
যখন ঝরবে সেথা ঝুপুর, ঝুপুর
চক চকাচক হান্‌বে চিকুর,
কড় কড়াকড় কড়াৎ কড়াৎ
ডাকবে যখন ঝন্‌ঝনে্। (১।১)

অনুবাদ হিসাবে নাটকখানিকে বাংলায় একটি আদর্শ রচনা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। অনুবাদ রূপে রচনাখানি সাফল্যলাভ করিলেও ইহার অভিনয় জনপ্রিয় হয় নাই বলিয়া গিরিশচন্দ্র অনুরূপ কার্যে আর কদাচ হস্তক্ষেপ করেন নাই ; কারণ, মঞ্চ-সাফল্যের দিকেই লক্ষ্য রাখিয়া যে গিরিশচন্দ্র নাট্য-রচনায় প্রবৃত্ত হইতেন, সে কথা পূর্বেও বলিয়াছি।

উপন্যাসকে নাট্যরূপ দান করিতেও গিরিশচন্দ্র যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহাও উপেক্ষণীয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। বিশেষত তিনি যখন এই কার্যে হস্তক্ষেপ করেন, তখন এই বিষয়ে তাঁহার সম্মুখে কোন আদর্শও ছিল না। তিনি ন্যাশানাল থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য ১৮৭৩ সনে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'র নাট্যরূপ দান করেন, ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে 'মৃণালিনী'র নাট্যরূপ দেন, ইহা সেই বৎসরই ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হয়। গিরিশচন্দ্র ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে 'বিষবৃক্ষে'র নাট্যরূপ প্রকাশ করেন। তিনি 'দুর্গেশনন্দিনী'রও প্রথম নাট্যরূপ দেন, ইহাতে অতুল মিত্রও তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। বঙ্কিম-চন্দ্র তখন জীবিত ছিলেন এবং তাঁহার উপন্যাসের কোন কোন নাট্যরূপের অভিনয়ে তিনি স্বয়ং উপস্থিতও ছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

অমৃতলাল বসু

(১৮৭৫—১৯২৮)

বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যযুগে আবির্ভূত হইয়াও যুগোচিত প্রেরণা হইতে বঞ্চিত হইবার ফলে অমৃতলাল বসুর নাট্যরচনা এক সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়াছিল। পূর্বেই বলিয়াছি, মধ্যযুগ পৌরাণিক নাটকের স্বর্ণযুগ; এতদ্ব্যতীত বাঙ্গালীর নব-প্রবুদ্ধ আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় চেতনা অবলম্বন করিয়া এই যুগের নাট্যসাহিত্য পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ইহাদের কাহারও সহিত অমৃতলালের আন্তরিক সহানুভূতি ছিল না। বিশেষত সর্ববিষয়ক প্রগতি বা নবজাগরণকেই তিনি বিদ্রূপের দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন,—চিন্তা ও কর্মের রাজ্যে তিনি ছিলেন সর্বতো-ভাবে রক্ষণশীল। সমাজ যখন প্রকৃতই বহুদূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে, এমন কি এই প্রগতির পথে নিজে ইহা নিজের শক্তি সঞ্চয় করিয়া লইয়াছে—তাহা রোধ করিবার আর কোন উপায়ই নাই—তখনও অমৃতলাল অতীত যুগের স্বপ্নবিলাসে আচ্ছন্ন। তাঁহার ভাবধারা যুগের গতির সঙ্গে তাল রাখিয়া অগ্রসর হইতে পারে নাই, তিনি ইহার বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছেন। সেই জন্য তাঁহার রচনা-সমূহও সেই অনুপাতেই যুগ-চিন্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে ব্যর্থকাম হইয়াছে।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যযুগ প্রধানত বাঙ্গালী সমাজের আদর্শ-সেবার যুগ। চিন্তায় ও কর্মে সর্বদিকেই বাঙ্গালী তখন নূতন নূতন আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছে এবং তাহার সাধনায় তাহাদেরই প্রতিষ্ঠার প্রয়াস দেখা গিয়াছে। অমৃতলালই সেই যুগে ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম—তিনি নিজেও যেমন আদর্শ-বাদী ছিলেন না, তেমনই আদর্শ-সেবার প্রকৃত লক্ষ্য যে কি হইতে পারে, তাহাও উপলব্ধি করিতে পারেন নাই; সেইজন্য সেদিন বাঙ্গালীর যাহা ছিল জীবন-পণ সাধনা, তাহাই তাঁহার লঘু ব্যঙ্গের বিষয় হইয়াছে। ইংরেজ এদেশে আসিয়া তাহার নিজস্ব শিক্ষা বিস্তার করিয়াছে, তাহার শিক্ষার একটা আকর্ষণী শক্তি আছে, তাহার সভ্যতার একটা সক্রিয় আবেদন আছে, এই

সকল বিষয় সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া কূপমণ্ডুকের ন্যায় অবিচল অবস্থার মধ্যে চিরস্থায়িত্ব লাভ করিবার স্বপ্ন যেমন অলীক, তেমনই হাস্যকর। অমৃতলাল তাঁহার প্রহসন রচনার ভিতর দিয়া সমাজকে হাস্যরস পরিবেশন করিবার ভার লইয়াছিলেন, কিন্তু দূরদৃষ্টি দ্বারা দেখা যাইবে যে, তিনি হাস্যরস সৃষ্টির যথার্থ উপাদানের সন্ধান পান নাই।

অমৃতলাল প্রধানত হাস্যরস-স্রষ্টা বা 'রসরাজ' বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের দৃষ্টি জীবনের সুগভীর স্তরে গিয়া ন্যস্ত হইত, উপরিস্তরের বিষয় তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারিত না; সেইজন্য তাঁহার রচনায় হাস্যরসের অভাবই লক্ষ্য করা যায়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, সেই যুগে গিরিশচন্দ্রের এই অভাব অমৃতলালই পূরণ করিয়াছিলেন। এই হিসাবে অমৃতলালকে কেহ কেহ গিরিশচন্দ্রের পরিপূরক (Complement) বলিয়াও মনে করিতে পারেন। কিন্তু এই ধারণা ভুল। প্রকৃত হাস্যরস (humour) বলিতে যাহা বুঝায় তাহা অমৃতলালে নাই। তাঁহার দুই একটি রচনায় ইহার সঙ্গে যে সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায়, তাহাও তাঁহার মৌলিক পরিকল্পনার ফল নহে—পাশ্চাত্ত্য রসসাহিত্য হইতে গৃহীত। তিনি যাহা পরিবেশন করিয়াছেন, তাহা ব্যঙ্গ (satire); কিন্তু ব্যঙ্গেরও যে একটি শিল্প-সম্মত সাহিত্যিক রূপ আছে—বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ তাহা দেখাইয়াছেন। অমৃতলাল সাহিত্য-সম্মত ব্যঙ্গ পরিবেশন করিতে পারেন নাই, তাঁহার সেই প্রতিভাও ছিল না; তিনি ব্যঙ্গের নামে যাহা পরিবেশন করিয়াছেন, তাহা আরও নিম্ন স্তরের। ইহা কি শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিব বুঝিতে পারিতেছি না—ব্যক্তিগত কুৎসা বা পরনিন্দা শ্রবণ করিলে এক শ্রেণীর যে গ্রাম্য আমোদ সৃষ্টি হয়, ইহা প্রকৃতপক্ষে তাহাই; অতএব ইংরেজি satire শব্দটির কোন প্রতিশব্দ এখানে ব্যবহার করিতে পারা যায় না। তাহার ব্যঙ্গ জাত তুলিয়া গালি দিয়া কাহাকেও ক্ষেপাইয়া আমোদ সৃষ্টি করিবার মত—তাঁহার বহু প্রহসনের মধ্য দিয়াই এই উপায়ই তিনি প্রত্যক্ষভাবে অবলম্বন করিয়াছেন। অতএব ইহা গ্রাম্যরুচির সীমা অতিক্রম করিয়া রস-সাহিত্যের মর্যাদায় উন্নীত হইতে পারে নাই।

বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস-সৃষ্টিতে অমৃতলালের পূর্বে আর এক জন নাট্যকার যে কিরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন, তাঁহার কথা যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি—তিনি দীনবন্ধু মিত্র। অমৃতলালের মধ্যে দীনবন্ধুর প্রতিভা

ছিল না, এমন কি তাঁহাকে অনুসরণ করিবারও তাঁহার ক্ষমতা ছিল না; তাঁহার শক্তি ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রমুখী। দীনবন্ধুর হাস্যরস ইংরেজী humour-এর পর্যায়ভুক্ত, ইহার মধ্যে যে রস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তাহার অনাবিল ধারায় হৃদয়মন স্নিগ্ধ হইয়া যায়। অমৃতলালের হাস্যরস জ্বালাময়—ইহা একের ক্ষণিক আমোদ সৃষ্টি করিলেও, অপরের পক্ষে মৃত্যুতুল্য যন্ত্রণাদায়ী। রসের আবেদন যেখানে সর্বজনীন না হইয়া আংশিক, সেখানে হাস্যরস ব্যর্থ। হাস্য একটি ক্ষণিক স্নায়বিক উত্তেজনা মাত্র নহে, হৃদয়মনের উপর ইহার একটি স্থায়ী প্রভাব কার্যকর হইয়া থাকে। যে সুনির্মল হাস্যরস বাহ্য কোন ঘটনার তাড়নায় মনের মধ্যে সহসা সৃষ্টি হয়, তাহার বাহ্য প্রকাশ ক্ষণিক হইলেও মনের মধ্যে তাহা একটি স্থায়ী রেখাপাত করিয়া থাকে; সেই রেখার উপর যখন পুনরায় স্মৃতির স্পর্শ লাগে, তখনই পুনরায় হৃদয়মন পুলকে শিহরিত হইয়া উঠে। অমৃতলালের হাস্যরসের আবেদন যেমন আংশিক, তেমনই ক্ষণস্থায়ী। নাপিতের পুত্র জজ হইয়াছে, তাহার এই কৃতিত্বের কথা বিস্মৃত হইয়া তাহাকে জজ-নাপিত বলিয়া সম্বোধন করিলে কাহার মনে হাস্যরসের সৃষ্টি হইতে পারে? বিষয়টি গভীর ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে, ইহা দ্বারা কাহারও মনেই প্রকৃত হাস্যরসের সৃষ্টি হয় না। কারণ, প্রত্যেকেরই নিজস্ব একটি কুল-পরিচয় আছে, সেই পরিচয়ের উপর কাহারও কোন অধিকার নাই; অতএব তাহার এই বিষয়ে যে দুর্বলতা আছে, তাহা সে নিজে যেমন ভুলিয়া থাকিতে চাহে, সমাজের নিকটও আশা করে যে, সমাজও ইহা ভুলিয়া থাকিবে। সহৃদয় সমাজের মধ্যে এই সহজ উদারতাটুকু আছে বলিয়াই এখানে ছোটবড় সকলে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে। কিন্তু তাহার পরিবর্তে তাহাকে সেই স্থানেই যদি প্রকাশ্যে আঘাত করা হয়, তবে সে-ই যে শুধু মর্মাহত হইবে তাহা নহে, প্রত্যেকেই নিজেদের এমনই স্বকীয় পরিচয়টুকু লইয়া শঙ্কিত হইয়া পড়িবে। আমি নিজে খোঁড়া বলিয়া কেহ কাণাকে কাণা বলিলে এই মনে করি যে, বুঝি বা ইহা দ্বারা আমার উপরও পরোক্ষে কটাক্ষপাত করা হইল। প্রত্যেকের মধ্যেই কোন না কোন এমন ত্রুটি আছে, যাহার উপর তাহার কোন হাত নাই; অতএব এই সকল বিষয় ব্যঙ্গের ভিত্তি করিলে কেহ স্বচ্ছন্দভাবে তাহা হইতে হাস্যরস আস্বাদন করিতে পারে না, নিজের ত্রুটিগুলি স্মরণ করিয়া সঙ্কুচিত হয় মাত্র।

অমৃতলাল নিজেকে সব দিক হইতে আদর্শ মনে করিতেন; সেইজন্য তিনি ও তাঁহার নিজস্ব সঙ্কীর্ণ সমাজটি ছাড়া আর সকলকে লইয়াই কৌতুক অনুভব করিয়াছেন। ইহাই যে কতদূর হাস্যকর, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। অতএব দীনবন্ধুর সঙ্গে তাঁহার সুদূর পার্থক্য পরিলক্ষিত হইবে। দীনবন্ধু কবি ঈশ্বর গুপ্তকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন; কিন্তু গুরুর সঙ্গে তাঁহার অনেক পার্থক্য ছিল। হাস্যরস-স্রষ্টা হিসাবে অমৃতলালের সঙ্গে কবি ঈশ্বর গুপ্তের কতকটা সম্পর্ক ছিল, দীনবন্ধুর সঙ্গে তাঁহার কোন সম্পর্ক ছিল না। এই হিসাবে বরং অমৃতলালকে ঈশ্বর গুপ্তেরই শিষ্য বলিতে পারা যায়, দীনবন্ধুর শিষ্য বলিতে পারা যায় না। কবি ঈশ্বর গুপ্ত রক্ষণশীল ছিলেন, সামাজিক কোন প্রগতি তিনি স্বীকার করিতেন না। স্ত্রীশিক্ষা স্ত্রীস্বাধীনতা ইত্যাদি তিনিও অমৃতলালের মতই তীব্রতম বিদ্রূপের বাণে বিদ্ধ করিয়াছেন; কিন্তু তথাপি একথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালীর সাহিত্যরসের ক্ষেত্রে এক নবযুগেরও জন্মদাতা—তিনি আধুনিক বাংলা কাব্য-সাহিত্যের জনক; অতএব তাঁহার সৃজনী-প্রতিভা ছিল। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, অমৃতলালের সেই প্রতিভা ছিল না; সেইজন্য তিনি বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে শিষ্য হইয়াই রহিয়াছেন, ঈশ্বর গুপ্ত কিংবা দীনবন্ধুর মত গুরুর আসনে কোনদিন উপবেশন করিতে পারেন নাই। হাস্যরস রচনায়ও তিনি ঈশ্বর গুপ্তেরই শিষ্য মাত্র, প্রতিভা ছিল না বলিয়াই গুরুর নিকট হইতে যাহা পাইয়াছিলেন, তাহা নিজের হাতে লইয়া আরও বিকৃত করিয়াছেন; অতএব বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস সৃষ্টির দিক দিয়া তাঁহার স্থান তাঁহার পূর্ববর্তী দুইজন বিশিষ্ট হাস্যরস-স্রষ্টার বহু নিম্নে।

অমৃতলালের হাস্যরসের সর্বপ্রধান অবলম্বন ছিল সে-যুগের শিক্ষিতা নারী। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নব-প্রবুদ্ধ বাংলার সমাজ এদেশের অবহেলিত স্ত্রীজাতিকে নূতন মর্যাদা দান করিয়া ইহার অগ্রগতির পথ সুগম করিবার প্রয়াস পাইতেছিল। কিন্তু সেকাজ যে কত কঠিন বাধাবিঘ্নের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতেছিল, অমৃতলালের নাটকগুলিই তাহার প্রমাণ। অনুদার ও রক্ষণশীল সমাজ নারীর কোন মর্যাদা দানের স্বীকৃতির পরিবর্তে প্রগতিশীল সমাজের এই বিষয়ক প্রথম প্রচেষ্টাকে যে তীব্র আঘাত করিয়াছিল, এই নাটকগুলি হইতে তাহাই প্রমাণিত হইবে। অমৃতলালই সাহিত্যের ভিতর দিয়া রক্ষণশীল সমাজের মনোভাব ব্যক্ত করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন;

ইহার মধ্য দিয়া তাঁহার মনোভাবের সঙ্কীর্ণতার যে পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার ফলেই তাঁহার সমগ্র জীবনের সাহিত্যিক প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। কারণ, সাহিত্যের দাবী সত্যের দাবী—যে দাবীতে সত্য নাই, সাহিত্যের ভিতর দিয়া তাহার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইতে পারে না। জীর্ণ প্রাসাদের শিথিল ভিত্তি মাত্র অমৃতলালের সাহিত্য সাধনার অবলম্বন হইয়াছিল—যাহা ইতিপূর্বেই ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছে, রোধ করিবার আর কোন উপায়ই নাই, তাহাই তিনি আশ্রয় করিয়াছিলেন; সেইজন্য স্বাভাবিক নিয়মেই তাঁহার সৃষ্টি ও ইহার আশ্রয় এক সঙ্গেই ধূলিসাৎ হইয়াছে।

অনেক সময় অমৃতলালকে রক্ষণশীলও মনে করা যাইতে পারে না, বরং ইহা অপেক্ষাও তাঁহাকে নিম্নস্তরের ভাববিলাসী বলিয়া মনে হয়। রক্ষণশীলতারও একটি শক্তি আছে, সেই শক্তির গুণেই বহু জীর্ণ বস্তুও দীর্ঘকাল সমাজ দেহে আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিয়া থাকে। রক্ষণশীলতার এই শক্তির সঙ্গে অমৃতলালের পরিচয় ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে যে রক্ষণশীলতা ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র রক্ষণশীলতার এই যে শক্তিটির কথা বলিলাম, তাহার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন; সেইজন্য রক্ষণশীলতার মধ্যেও তাঁহার প্রতিভার বিকাশ দেখা গিয়াছে। এই দিক দিয়া বিচার করিলে অমৃতলালকে রক্ষণশীল বলিতে পারা যায় না, তিনি ছিলেন নিতান্ত সঙ্কীর্ণচেতা। মানবতার প্রতি যে সহানুভূতি দ্বারা সাহিত্যেও সার্থকতা লাভ করা যায়, তাহা তাঁহার একেবারেই ছিল না। তিনি মানুষকে জাতিতে জাতিতে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে খণ্ডিত করিয়া দেখিয়াছেন। তিনি এই বিষয়ে হিন্দু সমাজের জাতি-বিভাগের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রাহ্মণ মূর্খ ও ভিক্ষুক, অন্যান্য লোক জাত-ব্যবসায়ী মাত্র, বিদ্যা-বুদ্ধি বিষয়-আশয় সমস্তই একমাত্র কায়স্থের। তাঁহার প্রায় প্রত্যেক প্রহসনের মধ্যেই তিনি অকারণে এক বা একাধিক ভিক্ষাজীবী বা পণ্ডিত-মূর্খ ব্রাহ্মণের অবতারণা করিয়াছেন; এতদ্ব্যতীত কলু নাপিত ইত্যাদির জাত-ব্যবসা তুলিয়া অকারণ বিদ্রূপ করিয়াছেন। জাত তুলিয়া গালি দিবার নীচ প্রবৃত্তি তিনিই সাহিত্যের ভিতর স্থান দিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিন্তু ইহাতে মানবতার লাঞ্ছনা হইয়াছে বলিয়াই তাঁহার প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে। কারণ, সাহিত্যের মধ্যে যে মানুষ আমরা পাই, তাহার কোন জাতি

নাই—তাঁহার একমাত্র পরিচয় সে মানুষ। এই মানুষ অমৃতলালের রচনায় অপমানিত হইয়াছে; সেইজন্য তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টিও সার্থক হইতে পারে নাই।

প্রহসন রচনায় অমৃতলাল সিদ্ধহস্ত বলিয়া পরিচিত; কিন্তু তাঁহার প্রহসনের প্রধান ত্রুটি এই যে, তাহাতে আনুপূর্বিক কোন সুবিন্যস্ত কাহিনী নাই, কতকগুলি বিচ্ছিন্ন চিত্র ও চরিত্রের সমাবেশেই তাহা প্রধানত রচিত; কেবলমাত্র ফরাসী নাট্যকার মলিয়ারের অনুকরণে তিনি যে দুই একখানি প্রহসন রচনা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যেই বিশিষ্ট কাহিনীর সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। আনুপূর্বিক মৌলিক একটি কাহিনী পরিকল্পনা করিয়া বিচিত্র ঘটনা-সংঘাতের ভিতর দিয়া হাস্যরস-সৃষ্টি তাঁহার সাধ্যাতীত ছিল। অতএব তাঁহার হাস্যরসাত্মক রচনাসমূহ প্রহসন হয় নাই। যদি তাঁহার পরিকল্পিত সামাজিক চিত্র ও চরিত্রসমূহ বস্তুধর্ম রক্ষা করিয়া পরিবেশন করা হইত, তবে ইহাদিগকে নক্সা বা সমাজ-চিত্র বলা যাইত; কিন্তু তিনি ইহাদের রচনায় একান্ত আত্মসচেতনতার পরিচয় দিয়া ইহাদের বস্তুধর্ম (objectivity) নষ্ট করিয়াছেন বলিয়া ইহাদিগকে নক্সার পর্যায়ভুক্তও করিতে পারা যায় না। যে নৈর্ব্যক্তিতা নাট্যরচনার বিশিষ্ট ধর্ম, তাহা অমৃতলালের কোন রচনাতেই নাই, একান্ত আত্মনির্লিপ্ত হইয়া বস্তুধর্মী সাহিত্যরচনা তাঁহার পক্ষে কদাচ সম্ভব ছিল না; সেইজন্য নক্সার মত বস্তুধর্মী রচনাও তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তিনি তাঁহার অধিকাংশ প্রহসনের ভিতর দিয়াই একটি চরিত্র বাছিয়া লইয়া তাহার মুখ দিয়াই নিজস্ব মতবাদসমূহ প্রচার করিয়াছেন, প্রহসনের মধ্য হইতে এই চরিত্রটি চিনিয়া লইতে বিশেষ কোন বেগ পাইতে হয় না, ইহা দ্বারাই তাঁহার রচনার নাটকীয় গুণ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। অতএব অমৃতলালের রচনা যদি প্রহসনও নয় কিংবা নক্সা বা সমাজচিত্রও নয়, তবে তাহা কি? অমৃতলাল গিরিশচন্দ্রের অনুকরণে তাঁহার কোন কোন রচনা 'পঞ্চরং' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পঞ্চরং-এর অর্থ যদি পাঁচ রকম বিষয় লইয়া তামাসা করা হয়, তবে 'পঞ্চরং' সংজ্ঞাটই অমৃতলালের প্রায় সকল রস-রচনার উপরই প্রযোজ্য হইতে পারে।

বাংলার বিচিত্র ও বহুমুখী সমাজ-জীবনের সঙ্গে অমৃতলালের কোন পরিচয় ছিল না, একমাত্র উত্তর কলিকাতার একটি নির্দিষ্ট সমাজই তাঁহার অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত ছিল; সেইজন্য তিনি সামাজিক বিষয় লইয়া 'পঞ্চরং'

রচনা করিলেও কোন বৃহত্তর সামাজিক নাটক রচনা করিতে পারেন নাই। একটি মাত্র সামাজিক নাটক যে তিনি রচনা করিয়াছেন, বিষয়-বস্তুর দিক দিয়া তাহাও তাঁহার প্রহসনগুলি হইতে স্বতন্ত্র নহে; বিশেষত তাঁহার নিজস্ব সমাজ-সংস্কার-মূলক মনোভাব তাহার ভিতর দিয়াও অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

পৌরাণিক নাটক রচনাতেও অমৃতলাল অনুরূপ ব্যর্থ হইয়াছেন। তিনি মাত্র দুইখানি পূর্ণাঙ্গ পৌরাণিক নাটক রচনা করিয়াছেন, কিন্তু দুইখানির মধ্যেই একটি প্রধান ত্রুটি এই প্রকাশ পাইয়াছে যে, তাঁহার তীব্র আত্মসচেতনতার জন্যই তিনি কাহারও পৌরাণিক পরিবেশ রক্ষা করিতে পারেন নাই, দুইখানি নাটকের মধ্যেই কালাতিক্রমণের (anachronism) দোষ ঘটিয়াছে, তিনি উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধ ইহাদের মধ্যেও স্থাপন করিয়াছেন। কৃষ্ণলীলা লইয়া রচিত গীতি-নাটকের মধ্যে পর্যন্ত তিনি তাঁহার নিজস্ব সামাজিক পরিবেশটি আরোপ করিয়াছেন অতএব পৌরাণিক নাটক রচনারও তাঁহার কোন প্রতিভা ছিল না। কোন বিষয়ে কাহারও যদি প্রতিভা থাকে, তবে তাহা দ্বারা তিনি সকল বিষয়ই স্পর্শ করিতে পারেন, কিন্তু যেখানে ইহার অভাব দেখা যায়, সেখানে কোন বিষয়ই সার্থক হইতে পারে না। অমৃতলালেরও তাহাই হইয়াছিল।

অমৃতলাল কয়েকখানি রোমান্টিক নাটক এবং একখানি মাত্র পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু অমৃতলালের যে বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করিলাম, তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, রোমান্টিক কিংবা ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিবার শক্তিও অমৃতলালের ছিল না। রোমান্টিক নাটক রচনায় কল্পনার যে সংযমের প্রয়োজন, তাহা অমৃতলালের ছিল না; রোমান্টিক জগৎ এবং প্রত্যক্ষ জগতের মধ্যে যে একটি সুস্পষ্ট সীমারেখা আছে, তাহা অমৃতলাল অনুভব করিতে পারেন নাই; সেইজন্যই তিনি পৌরাণিক নাটক রচনায় ব্যর্থকাম হইয়াছেন। আত্মবোধ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিয়া দিতে না পারিলে ঐতিহাসিক নাটক রচনাও সম্ভব নহে। অমৃতলাল একান্ত আত্মসচেতন লেখক, আত্মবিলোপ করিয়া কোন রচনা প্রকাশ করা তাঁহার শক্তির অতীত। অতএব তাঁহার একমাত্র ঐতিহাসিক নাটকখানিও তাঁহার নিজস্ব মতবাদ-প্রচার-মূলক বক্তৃতাতেই পর্যবসিত হইয়াছে।

সঙ্গীতের বাহুল্য অমৃতলালের রচনার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। চরিত্র-নির্বিশেষে অমৃতলাল একই প্রকার সঙ্গীত পরিবেশন করিয়াছেন—এমন কি, কর্তা, গৃহিণী ও 'বয়' বা বালক পরিচারক এক সঙ্গে একই সঙ্গীতে যোগদান করিয়াছে। সঙ্গীতগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুরচিত বলিয়া ইহাদের স্থানকাল-পাত্রের অনৌচিত্য বাঙ্গালী দর্শক মনকে সহসা আঘাত করিতে পারে নাই।

অমৃতলালের মধ্যে কৌতুকের (wit) যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাই তাঁহার প্রধান গুণ; কিন্তু এই কৌতুক বাগ্‌বৈদগ্ধ্য দ্বারাই সৃষ্ট, ঘটনা-সংস্থাপনের দ্বারা নহে। বাগ্‌বৈদগ্ধ্যজাত কৌতুকের গুণেই তাঁহার রস-রচনা-সমূহ কোন কোন স্থানে সমৃদ্ধ হইয়াছে।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' প্রকাশিত হইবার পর ইহা দ্বারা প্রত্যক্ষ ভাবে প্রভাবিত হইয়া যে কয়খানি কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক গীতিনাট্য রচিত হয়, অমৃতলালের 'ব্রজলীলা' তাহাদের অন্যতম। ইহা তিনটি ক্ষুদ্র অঙ্কে সম্পূর্ণ বিভিন্ন গীতিকবিতার সমষ্টি মাত্র। গীতিগুলির রচনায় বৈষ্ণব কবিতার মাধুর্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। 'গীত-গোবিন্দে'র এই অনুবাদটি হইতে এই কার্যে অমৃতলালের যে দক্ষতা ছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে,

তোমার মিলন আশে মদনমোহন বেশে
কুঞ্জবনে আছে বসি শ্যাম
বিলম্ব করো না প্যারি, অধীর মুরলীধারী
বাঁশরীতে সদা রাধা নাম। (৩।১)

ইহার প্রথম অঙ্কে বস্ত্রহরণ, দ্বিতীয় অঙ্কে চন্দ্রাবলী ও নৌকাবিলাস প্রসঙ্গ ও তৃতীয় অঙ্কে রাসলীলা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বিভিন্ন অঙ্কগুলি কাহিনীর দিক দিয়া সংযোগহীন; অতএব ইহার গীতিমূল্য যাহাই থাকুক, ইহা সম্পূর্ণ নাট্যগুণবর্জিত।

'সতী কি কলঙ্কিনী' গীতিনাটকটি ভ্রমবশত অমৃতলালের গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, ইহা প্রকৃতপক্ষে দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক রচিত ও তাঁহার ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ইহা ১৮৭৪ সনে ন্যাশান্যাল থিয়েটারে অভিনীত হয়। ('সাহিত্য-সাধক চরিতমালা', অমৃতলাল বসু, পৃ. ৫৮ দ্রষ্টব্য)।

কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক নাটকও পৌরাণিক নাট্যরচনারই অন্তর্গত, পৌরাণিক নাটক রচনায় প্রত্যক্ষ পরিবেশ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইবার যে প্রয়োজনীয়তা আছে,

ইহার লেখকের তাহা অনুভব করিবার শক্তি ছিল না। পরিচিত জগৎটি নাট্যকারের পৌরাণিক নাটকের মধ্যেও উঁকি মারিয়া ইহার রোমান্টিক ধর্ম বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে। সেইজন্য কুটিলা শ্রীরাধাকে আয়ান ঘোষের 'মাগ' বলিয়া উল্লেখ করিতেছে, শ্রীকৃষ্ণকেও কলিকাতার আঞ্চলিক ভাষায় অকথ্য গালগালি দিতেছে। লেখক তাঁহার নিজস্ব পরিচিত কলিকাতার সমাজটির মধ্যেই রাধাকৃষ্ণের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। শ্রীরাধার চরিত্রের মধ্যে তিনি একটি সহজ মানবিক অনুভূতি দান করিতেও ব্যর্থকাম হইয়াছেন; কারণ, শ্রীরাধা এখানে 'বিশুদ্ধ প্রেমের তত্ত্ব' বিষয়ে সচেতন হইয়াই কৃষ্ণকে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের মধ্য দিয়া প্রেমের যে তত্ত্বই থাকুক না কেন, নাটকের মধ্যে তাহার কোন স্থান নাই। প্রেমের মানবিক দিকটিই নাটকের উপজীব্য, তত্ত্বের দিকটা ইহার উপজীব্য নহে—ইহার লেখক একথা বুঝিতে পারেন নাই। তবে এই সকল দোষত্রুটির জন্য অমৃতলাল দায়ী ছিলেন।

পৌরাণিক নাটকের মধ্যে অমৃতলালের হরিশ্চন্দ্র নাটকখানি বিষয়গৌরবের জন্য ব্যাপক প্রচার লাভ করিয়াছিল। ইহার রচনায় অমৃতলাল ক্ষেমীশ্বর-রচিত 'চণ্ডকৌশিক' নামক সংস্কৃত নাটক কিংবা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কর্তৃক ইহার অনুবাদ দ্বারাই মুখ্যত প্রভাবিত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ইহার কোন কোন চিত্র ও চরিত্রের মধ্যে কালিদাস-রচিত অভিজ্ঞান-শকুন্তলা নাটকেরও প্রভাব অনুভব করা যায়। ইতিপূর্বে মনোমোহন বসু ইহার বিষয়বস্তু লইয়া 'হরিশ্চন্দ্র' নামক যে নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাবও ইহার মধ্যে অনুভূত হয়। এই সকল দিক বিচার করিলে, ইহা অমৃতলালের মৌলিক রচনা বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত হয় না। বিশেষত তিনি যে সকল ক্ষেত্রে স্বকীয়তা দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন, সেখানে তাঁহার প্রয়াস সার্থক হইয়াছে বলিয়াও বোধ হইবে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইহার দুই একটি চরিত্রের বিষয় এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। কেহ কেহ বলেন, অমৃতলাল বসুর নামে প্রচলিত 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকখানি নিত্যগোপাল রায় এবং 'বিজয় বসন্ত' রাজকৃষ্ণ রায় রচিত। ইহাদের মধ্যে কিছু কিছু অংশ মাত্র অমৃতলাল নিজে রচনা করিয়া যোগ করিয়া দিয়াছেন। সেইজন্যই ইহা অমৃতলাল বসুর নামেই প্রচারিত হইয়াছে। এই উক্তি সত্য বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

ইহার নায়ক হরিশ্চন্দ্রের চরিত্রের একটি প্রধান ত্রুটি এই যে, সর্বস্ব দান

করিয়া আসিবার পরও হরিশ্চন্দ্র তাঁহার পূর্ব অবস্থা স্মরণ করিয়া সর্বদাই পরিতাপ করিয়াছেন—ইহাতে তাঁহার দানের মহিমা যে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তাহা নাট্যকার বুঝিতে পারেন নাই। সেইজন্য ইহাতে হরিশ্চন্দ্রের প্রকৃত মহত্ব প্রকাশ পায় নাই; অতএব ইহাতে নাটকের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়াছে। ইহার নায়িকা শৈব্যার চরিত্রটিও একান্ত আদর্শমুখী। ধর্ম, নীতি ও পতিভক্তি বিষয়ক বক্তৃতার মধ্যেই তাঁহার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার চরিত্রের ভিতর দিয়া সহজ মানবিক বৃত্তিগুলি বিকাশের যে দুর্লভ সুযোগ ছিল, নাট্যকার তাহাদের একটিরও সন্ধান পান নাই। সেইজন্য তাঁহার চরিত্র নিষ্প্রাণ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু রোহিতাশ্বের চরিত্রের ভিতর দিয়াই নাট্যকারের সর্বাধিক ত্রুটি প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা আনুপূর্বিক অবাস্তব। বাল্যবয়স হইতেই তাহার মনে দান-মাহাত্ম্যবোধ জন্মিয়াছে, সেই বয়সেই বিজ্ঞজনের মতো বিশ্বামিত্রের কথা সে মুখের উপর প্রতিবাদ করিয়াছে। জটাধারী একটি কথায় রোহিতাশ্বের সম্পূর্ণ পরিচয়টি এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছে, 'কেরে ছোঁড়াটা? ভারী ডেঁপো' (৩৩)। রোহিতাশ্বের চরিত্রে আদ্যোপান্ত ডেঁপোমি বা অকাল-পক্কতার প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার ফলে রোহিতাশ্ব দর্শকের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে: অতএব হরিশ্চন্দ্র-চরিত্রের মহত্ত্ব যেখানে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারা যায় নাই, কিংবা রোহিতাশ্বের চরিত্রের প্রতিও দর্শকের স্বাভাবিক সহানুভূতি সৃষ্টি সম্ভব হয় নাই, সেখানে হরিশ্চন্দ্র-বিষয়ক নাটক রচনা কোন দিক দিয়া যে সার্থক হইয়াছে, তাহা বলিবার উপায় নাই। প্রকৃতপক্ষে নাটকটি বক্তৃতা-ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। কতকগুলি চারিত্রিক সদ্‌গুণ বিষয়ক বক্তৃতা ইহার নাট্যিক কাহিনীর ধারা কিংবা চরিত্রসৃষ্টি ব্যাহত করিয়াছে।

পৌরাণিক বিষয়-বস্তু অবলম্বন করিয়াই গিরিশচন্দ্রের সর্বশেষ নাটকখানি রচিত, ইহার নাম 'যাজ্ঞসেনী'—গিরিশচন্দ্রের অনুকরণে মহাভারতোক্ত বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া ইহা রচিত। পৌরাণিক নাটক রচনায় অমৃতলালের যে সকল বাধা ছিল, তাহা নাট্যকার ইহার মধ্য দিয়াও কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। কালাতিক্রমণের (anachronism) দোষে ইহার পৌরাণিক পরিবেশ অনেক স্থলেই ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। নাটকের নাম 'যাজ্ঞসেনী' হইলেও যাজ্ঞসেনী বা দ্রৌপদী ইহার কেন্দ্রীয় চরিত্রের রূপ লাভ করিতে পারে নাই। মহাভারতের বিচিত্র ঘটনাজালের মধ্যস্থিত দ্রৌপদী-চরিত্র অবলম্বন করিয়া নাটক রচনার যে সুযোগ ছিল, নাট্যকার তাহার ব্যবহার করিতে

পারেন নাই। পরিণত বয়সেও যে তিনি পৌরাণিক নাটক রচনার কৌশল আয়ত্ত করিতে পারেন নাই, এই নাটকখানিই তাহার প্রমাণ। ইহা গদ্য ও অমিত্র পদ্য মিশ্রিত রচনা। কিন্তু রচনার দিক দিয়াও ইহার মধ্যে কোন কৌশল প্রকাশ পায় নাই।

বরোদার গাইকোয়াড় মলহররাও হোলকর তথাকার রেসিডেণ্টকে পানীয়ের সঙ্গে হীরকচূর্ণ বিষ প্রদান করিয়া হত্যা করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া রাজ্য হইতে নির্বাসিত হন। বিষয়টি ভারতবর্ষের সর্বত্র তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিল। ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহ গাইকোয়াড়ের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে, কিন্তু ইংরেজ-পরিচালিত সংবাদপত্রসমূহ তদানীন্তন ভারত-গভর্ণমেণ্টের এই কার্য সমর্থন করে। সমসাময়িক এই উত্তেজনামূলক বিষয়টি অবলম্বন করিয়াই অমৃতলাল তাঁহার 'হীরকচূর্ণ' নাটক রচনা করেন। গাইকোয়াড়ের প্রতি সমবেদনা প্রকাশই নাটকটির যথার্থ উদ্দেশ্য, সেইজন্য ইহাতে গাইকোয়াড়কে নির্দোষ ও আদর্শচরিত্র পুরুষ রূপে উপস্থিত করা হইয়াছে। ইহা সুদীর্ঘ পঞ্চাঙ্কে সম্পূর্ণ, কিন্তু ইহাকে যথার্থ নাটক বলিয়া উল্লেখ করা যায় না। নাট্যরচনার আঙ্গিক অমৃতলাল তখনও আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। ইহাতে কোন নাট্যিক ক্রিয়ার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারা যায় না, কেবল ঘটনার পর্যালোচনাতেই ইহা আদ্যোপান্ত পর্যবসিত হইয়াছে। সুদীর্ঘ স্বগতোক্তি ইহার অন্যতম গুরুতর ত্রুটি। ইহাতে কোন নাট্যিক ক্রিয়া উপস্থিত না করিয়া কেবলমাত্র স্বগতোক্তি ও সংলাপের ভিতর দিয়াই ইহার কাহিনী অগ্রসর করিয়া লওয়া হইয়াছে বলিয়া ইহাদের দৈর্ঘ্য অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। গাইকোয়াড়ের বিচার-সভায় আসামী পক্ষের উকিলের একটি ছয়পৃষ্ঠা ব্যাপী বক্তৃতা আছে, নাটকের মধ্যে ইহার অনুপযোগিতা সম্পর্কে নাট্যকার অবহিত হইতে পারেন নাই। তদানীন্তন ভারত গভর্নমেণ্ট কর্তৃক গাইকোয়াড় অন্যায়ভাবে রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন তাহা শেষ পর্যন্ত দেখাইয়াও নাট্যকার এই গভর্নমেণ্টের তদানীন্তন কর্ণধার লর্ড নর্থব্রুকের সর্বত্র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। অতএব মনে হয়, নাট্যকার ইহার মধ্য দিয়া দুইটি উদ্দেশ্যই সাধন করিতে চাহিয়াছেন—প্রথমত ইংরেজ সরকারের মনস্তুষ্টি ও দ্বিতীয়ত গণমতের সমর্থন; সমসাময়িক প্রেরণায় নাটক রচনা করিলেও কাহারও তিনি বিরাগভাজন হইতে চাহেন নাই।

বহির্বাংলার ঐতিহাসিক বিষয়-বস্তু লইয়া রচিত এই নাটকখানির

ভিতর দিয়াও অমৃতলাল জাতি-সম্পর্কিত তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অনুদার মনোভাব ব্যক্ত করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক 'জাত্যংশে তেলি'—তাঁহার সম্পর্কে এই অকারণ অবান্তর মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে—

'ওঃ? তাই বলি—তেলি! হাত পিচ্‌লে গেলি, অনরেবল হলি—তবে বাবুর যেমন আকৃতি তেমন প্রকৃতি! মহাশয়, দাঁড়কাকের বাসায় কি কখন শুকপক্ষী বাস করে?' ৪।২

নাটক-প্রহসন-নক্সা সকল শ্রেণীর রচনাতেই অমৃতলাল যে অকারণ জাত তুলিয়া খোঁটা দিয়াছেন, এখানে তাহার সূত্রপাত।

রাজমহিষী লক্ষ্মীবাঈর চরিত্রটি সংক্ষিপ্ত হইলেও সুন্দর।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে অমৃতলাল 'বিলাপ বা বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন' নামক একখানি ক্ষুদ্র নাটিকা রচনা করেন, ইহা মাত্র একটি অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহার মধ্যে কোন নাটকীয় চরিত্র নাই। বাস্তব নাটকের আকারে রচিত হইলেও ইহা শোক-কাব্য মাত্র।

অমৃতলাল একখানি মাত্র পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাহার নাম 'তরুবালা'। এই নাটকখানির একটু বিস্তৃত আলোচনা করিলেই সামাজিক নাটক রচনায় অমৃতলালের দোষ-ত্রুটির পরিচয় পাওয়া যাইবে। ইহার কাহিনীটি সংক্ষেপে এই: অখিল একজন সঙ্গতিসম্পন্ন যুবক, স্ত্রী তরুবালার প্রতি তাহার প্রণয় হয় নাই বলিয়া তাহার প্রতি সে বিমুখ; এক দালালের চক্রান্তে পড়িয়া সে পারুল নামক এক বেশ্যার প্রতি আসক্ত হইল—মনে করিল, তাহার সহিত তাহার পবিত্র প্রণয়ের সঞ্চার হইয়াছে। স্ত্রী তাহাকে এই পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চাহিলে স্ত্রীকে একদিন সে পদাঘাত করিয়া পারুলের গৃহে চলিয়া গেল। কিন্তু একদিন গিয়া যখন দেখিল অন্য এক ব্যক্তি পারুলের গৃহে বসিয়া আমোদ করিতেছে, সেইদিনই সে বুঝিতে পারিল, পারুলের প্রণয় মিথ্যা। নিদারুণ আঘাত পাইয়া গৃহে ফিরিয়া সে তরুকে এক নূতন রূপে দেখিতে পাইল। বুঝিল, যথার্থ প্রণয় তরুর মধ্যেই আছে, ভাবিয়া তাহাকে সে হৃদয়ে তুলিয়া লইল।

নাটকের উপরোক্ত মূল কাহিনীর সঙ্গে আর দুইটি উপকাহিনী আছে, তাহা বেণী-শান্তার ও মৃত্যুঞ্জয়-আমোদিনীর। মূল কাহিনীর সঙ্গে প্রথম উপকাহিনীটির কোনই যোগ নাই, দ্বিতীয়টির যোগও অত্যন্ত ক্ষীণ। উপরে নাটকের যে কাহিনী বর্ণিত হইল, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে

যে, সমসাময়িক শিক্ষিত সমাজের মধ্যে বেশ্যাসক্তি যে প্রবল আকার ধারণ করিয়া কলিকাতার বহু সঙ্গতিপন্ন পরিবারের মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি করিতেছিল, তাহারই কুফল নির্দেশ করিবার শুভবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া অমৃত-লাল এই নাটকখানি রচনা করিয়াছিলেন—কোন সুগভীর শিল্পবোধের প্রেরণা হইতে ইহা রচনা করেন নাই। অতএব সে যুগের এই শ্রেণীর বহু নাটকের মতই ইহাও একখানি সমাজ-সংস্কারমূলক নাটক। ইহার মধ্য দিয়া অমৃত-লালের কোন সুগভীর জীবনদৃষ্টির পরিচয় প্রকাশ পায় নাই, জীবনের অগভীর স্তরে যে সকল ক্ষণিক বিকার দেখা দেয়, ইহা তাহারই পর্যালোচনা মাত্র। প্রহসন ও নক্সা রচনার মধ্যেই যিনি প্রায় সমগ্র জীবনের সাধনা নিয়োজিত রাখিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট হইতে প্রকৃত সামাজিক নাটক আশা করাও দুরাশা মাত্র। এই নাটকের পরিণতিতে ইহার নায়ক-চরিত্র যদিও জীবনের একটা মহান্ সত্যের সন্ধান পাইয়াছিল, তথাপি তাহার আচরণ সর্বত্রই প্রহসনের চরিত্রের মতই প্রকাশ পাইয়াছে। সে সর্বদাই সুস্থ মানুষের পরিবর্তে যেন বাতিকগ্রস্তের মত ব্যবহার করিয়াছে। প্রথম দৃশ্যে সে তাহার বিধবা জননীকে 'লভ্' (love)-এর মহিমা বুঝাইতেছে, এই 'লভ্' যে তাহার জীবনের গভীরতম স্তরের অনুভূতি নহে, উপরিস্তরের একটা মনো-বিকার মাত্র, তাহা তাহার পারুলের সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের দিনেও এমনি ভাবেই প্রকাশ পাইয়াছে। সেখানে সে পারুলের গৃহে এক চৌবেকে বসিয়া আমোদ করিতে দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, 'কে তুমি ? আমার প্রণয়ে তুমি কি ওসমান ?' প্রণয় যদি তাহার সুগভীর অনুভূতির বিষয় হইত, তাহা হইলে তাহা লইয়া সে এমন লঘু আচরণ করিতে পারিত না। সুস্থ মানুষের পরিবর্তে এমনি এক বাতিকগ্রস্তের মত আচরণ করিবার জন্যই শেষ পর্যন্ত তাহার মোহমুক্তি পাঠকের মনে কোন স্বস্তি আনিয়া দিতে পারে নাই—যতটুকু আনিয়াছে তাহা তরুর প্রতি সহানুভূতির জন্য, তাহার ভ্রান্তি বিদূরণের জন্য নহে। অতএব যে নাটকের নায়ক-চরিত্র আদ্যোপান্ত এমনই বাতিকগ্রস্ত বলিয়া বোধ হয় এবং যে নাটকের সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট, তাহা সামাজিক প্রহসন বা নকসা ব্যতীত প্রকৃত সামাজিক নাটকের মর্যাদা লাভ করিতে পারে না।

পূর্বেই বলিয়াছি, কাহিনীর দিক হইতে এই নাটকে বেণী ও শান্তার প্রসঙ্গ অনাবশ্যক। কিন্তু শান্তার ভিতর দিয়া নাট্যকার একটি সামাজিক উদ্দেশ্য

সাধন করিয়াছেন—রক্ষণশীল অমৃতলালের বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক মনোভাব এই প্রসঙ্গের ভিতর দিয়া স্পষ্টই প্রকাশ পাইয়াছে। বিধবা শান্তার মুখে বিধবা-বিবাহের বিরোধী যে বক্তৃতাগুলি তিনি দিয়াছেন, তাহা যে নাট্যকারের এই বিষয়ক নিজস্ব মতবাদ, তাহা বুঝিতে এতটুকুও বেগ পাইতে হয় না। অখিলের মোহমুক্তির প্রসঙ্গে শান্তার এই বক্তৃতাগুলি অপ্রাসঙ্গিক, সেইজন্য ইহা যেমন কাহিনীর অন্তর্নিবিষ্ট হইতে পারে নাই, তেমনই ইহা-দ্বারা শান্তার মানবিক পরিচয়েরও ব্যাঘাত হইয়াছে। সমাজ সংস্কারই যাঁহার নাট্যরচনার মুখ্য উদ্দেশ্য, তাঁহার পক্ষে এই বিষয়টি ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ ছিল না।

মৃত্যুঞ্জয় ও আমোদিনীর চরিত্র এই নাটকের মধ্যে যথার্থই সার্থক সৃষ্টি। মৃত্যুঞ্জয় একমাত্র আমোদিনীর চরিত্রের গুণে তৃতীয় পক্ষের ভার্যা লইয়াও যে কত সুখী, নাট্যকার তাহা সার্থকভাবে দেখাইয়াছেন। অখিল-তরুর সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয় আমোদিনী চরিত্রের নাট্যিক বৈপরীত্য সৃষ্টি করাই শেষোক্ত চরিত্র দুইটির উদ্দেশ্য ছিল। বয়সের মধ্যে প্রচুর ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও ইহাদের দাম্পত্য-জীবনের যে নিবিড়তা নাট্যকার এখানে নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা দ্বারা তরুণ দম্পতি অখিল-তরুবালার জীবনের সুন্দর বৈপরীত্য সৃষ্টি হইয়াছে। আমোদিনী বৃদ্ধ বর পাইয়াও নিজের ভাগ্যের সঙ্গে যে কি সুন্দর বোঝাপড়া করিয়া লইয়াছে, তাহা নাট্যকার সুন্দর ভাবেই প্রকাশ করিয়াছেন। মৃত্যুঞ্জয়ের মধ্যে একটু রক্তমাংসেরও স্পর্শ অনুভব করা যায়। তরুবালার চরিত্রটি একটু অপরিস্ফুট হইলেও, কোথাও অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইবে না।

অমৃতলাল তাঁহার এই একমাত্র সামাজিক নাটকখানি রচনাকালেও তাঁহার প্রহসন রচনার আঙ্গিক সংযত রাখিতে পারেন নাই। হারাণ, বিহারী এই সকল চরিত্র তাঁহার প্রহসনের জগৎ হইতে ধরিয়া আনিয়া যেন এখানে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। নাটকের গম্ভীর পরিবেশের সঙ্গে ইহাদের লঘু আচরণের সর্বদা সহজ যোগ স্থাপিত হইতে পারে নাই। ইহার মধ্যেও অমৃতলাল তাঁহার অন্যান্য রচনার মতই একজন ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকের অকারণ অবতারণা করিয়া তাঁহার ব্রাহ্মণ জাতির প্রতি ব্যক্তিগত মনোভাবের পরিচয় দিতে ব্যতিক্রম করেন নাই।

বাংলার সুপরিচিত রূপকথা শীত-বসন্তের কাহিনী অবলম্বন করিয়া বাংলা

নাট্যসাহিত্যের আদিযুগেই একাধিক নাটক রচিত হইয়াছিল। তাহারই ধারা অনুসরণ করিয়া অমৃতলাল তাঁহার 'বিমাতা বা বিজয়-বসন্ত' নামক নাটকটি রচনা করিয়াছেন। ইহাকে নাট্যকার 'পারিবারিক নাটক' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; অবশ্য এই কথাটির তাৎপর্য যতটুকু বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে ইহার এই পরিচয় খুব সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। একান্ত পারিবারিক ঘটনাই ইহার ভিত্তি নহে,—ইহার মধ্যে রাজ্যলাভ, ঐশ্বর্যলোলুপতা, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রও যে কার্যকরী হয় নাই, তাহা বলিতে পারা যায় না। প্রকৃতপক্ষে ইহা রোমান্টিক নাটক। ইহার কাহিনীটি পূর্বপ্রচলিত; অতএব ইহার পরিকল্পনায় নাট্যকারের নিন্দা কিংবা প্রশংসার কিছুই নাই। পূর্বনির্দিষ্ট কাহিনীর ধারা অনুসরণ করিয়া নাট্যকার ইহাতে যে রক্তমাংসের চরিত্রসৃষ্টি করিবার গৌরব লাভ করিতে পারিতেন, তাহা হইতে তিনি এখানে বঞ্চিত হইয়াছেন, তাহাই এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

রাজা জয়সেনের চরিত্রের ভিতর দিয়া কোন সুকুমার মানবিক বৃত্তির প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না। রাণীর প্রতি আসক্তি যেমন তাঁহার বয়সোচিত স্বাভাবিকতা রক্ষায় নিষ্ফল হইয়াছে, পুত্রদিগের প্রতি ব্যবহারেও তেমনি পিতৃ-স্বভাবোচিত কোন সঙ্গতি প্রকাশ পায় নাই। রাণী দুর্জয়ময়ী সর্বত্রই এক কৃত্রিম পুত্তলিকাবৎ আচরণ করিয়াছে। তাঁহার আস্ফালন ও আসক্তি উভয়ই সহজ মানবিকতার সম্পর্কশূন্য। বিজয়-বসন্তের প্রতি নাট্যকার পাঠকদিগের কোন সহানুভূতি সৃষ্টি করিতে পারেন নাই; কারণ, তাঁহাদেরও চরিত্র অস্বাভাবিক করিয়া চিত্রিত হইয়াছে, বয়সোচিত চরিত্রগুণের পরিবর্তে ইঁহাদিগকে তত্ত্বদর্শী ও হরিভক্তিপরায়ণ করিয়া নাট্যকার অঙ্কিত করিয়াছেন। অবশিষ্ট সকল চরিত্রই এক একটি ছাঁচ (type) মাত্র, কাহারও মধ্যে কোন বিশিষ্ট পরিচয় প্রকাশ পায় নাই।

নাটকটি ঘটনা-বহুল, সংলাপের ভিতর দিয়া ইহার ঘটনার বর্ণনা অনেক সময় যাত্রার উত্তেজনা লাভ করিয়াছে। নাট্যকার ঘটনাগুলিকে আনুপূর্বিক শিল্পসম্মত নাট্যিক রূপ দিবার কোন প্রয়াস পান নাই। শেষ দৃশ্যে রাজা ও রাজপুত্রদিগের মিলন-চিত্র যথোচিত নাটকীয় গৌরব লাভ না করিয়া নিতান্ত শিথিল হইয়া রহিয়াছে, অথচ এই দৃশ্যেরই ফলাফলের উপর নাটকের কার্যকারিতা (effectiveness) নির্ভর করিয়াছে

ইহা প্রকৃতপক্ষে যাত্রা; উচ্চতর সাহিত্যিক গৌরব ইহার কিছুমাত্র নাই।

অমৃতলালের স্বাভাবিক দোষক্রটিগুলি এই নাটকের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইবার কোন সুযোগ পায় নাই। এই হিসাবে ইহা তাঁহার অন্যান্য নাটক বা প্রহসন হইতে কতকটা স্বাতন্ত্র্য দাবী করিতে পারে।

আরব্য উপন্যাসের সুপরিচিত ধীবর ও দৈত্যের কাহিনী অবলম্বন করিয়া অমৃতলাল একখানি রোমান্টিক নাটক রচনা করেন, ইহার নাম 'যাদুকরী'। 'ধীবর ও দৈত্য' নামেই ইহা সর্বপ্রথম অভিনীত হইয়াছিল, ইহা পুনর্লিখিত হইয়া 'যাদুকরী'তে পরিণত হইয়াছে। পৌরাণিক নাটকের মধ্যে অমৃতলাল মধ্যে মধ্যে যেমন কালাতিক্রমণের (anachronism) দোষ হইতে অব্যাহতি পান নাই, এই রোমান্টিক নাটকটির মধ্যেও তাঁহার সেই ক্রটি প্রকাশ পাইয়াছে। আরব্য উপন্যাসের রঙিন স্বপ্ন-জগতের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও বাস্তব জগৎ হইতে ধূলাবালি উড়িয়া গিয়া তাহা আবিল করিয়া তুলিয়াছে—স্বপ্ন ও বাস্তবে মিলিয়া রসহানি করিয়াছে। অমৃতলাল কোন অবস্থাতেই যে তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জ্বালাগুলি ভুলিতে পারেন নাই, ইহাই তাহার প্রমাণ। সেইজন্য আরব্য উপন্যাসের রাজ্যেও মিউনিসিপ্যালিটির স্থান দিয়াছেন। অতএব তাঁহার পক্ষে হাস্যচটুল প্রহসন রচনা কতকটা সম্ভব হইলেও সার্থক পৌরাণিক কিংবা রোমান্টিক নাটক রচনা করা একেবারেই সম্ভব ছিল না। তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-ভার-পীড়িত মন কিছুতেই অতীত কিংবা কল্পনার রাজ্যে লঘু পক্ষবিস্তার করিয়া উড়িতে পারিত না। তাহার ফলেই তাঁহার এই রোমান্টিক নাটকখানির পরিকল্পনা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। অলৌকিকতা ইহার একান্ত অবলম্বন; অতএব ইহা নাটক বা প্রহসন কিছুই নহে, বিকৃত কল্পনার একটি শোচনীয় অপচয়ের নিদর্শন মাত্র।

Damon ও Pytheus-এর প্রাচীন গ্রীক আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া অমৃতলাল তাঁহার 'আদর্শ-বন্ধু' নাটকখানি রচনা করেন। বিষয়-বস্তুর দিক দিয়া যেমন ইহাতে প্রাচীন গ্রীক-সাহিত্যের উপাদান ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহার রূপায়ণের মধ্য দিয়াও গিরিশচন্দ্র ঘোষকে অনুসরণ করিবার প্রয়াস দেখা দিয়াছে। ইহা আনুপূর্বিক গৈরিশ ছন্দে রচিত; কিন্তু এই ছন্দ রচনায় অমৃতলালের দক্ষতা ছিল না বলিয়া উচ্চাঙ্গ নাটকীয় বিষয়-বস্তু থাকা সত্বেও ইহা রচনার দিক দিয়া ব্যর্থ হইয়াছে। প্রথমত আকস্মিক উত্তেজনাপ্রসূত একটি ঘটনার উপর ইহার সমগ্র কাহিনীর ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে, দ্বিতীয়ত ইহার চরিত্রগুলির অভিভাষণের দোষ ইহার নাট্যিক ক্রিয়ার ক্ষিপ্র প্রবাহের

মধ্যে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। তৃতীয়ত ইহার কাহিনী যেখানে আনিয়া শেষ করিলে ইহার পরিণতি সর্বাপেক্ষা কার্যকরী (effective) হইত, তাহা সেখানেই আনিয়া শেষ না করিয়া অনাবশ্যক দীর্ঘ করা হইয়াছে। উচ্চাঙ্গ নাট্যিক ক্রিয়ার (dramatic action) ইহার কাহিনী পরিপূর্ণ, এই নাট্যিক ক্রিয়াসমূহ শিল্পসম্মতভাবে ব্যবহার করিতে পারিলে ইহা দ্বারা একখানি যথার্থ নাটক রচিত হইতে পারিত। কিন্তু যে অতিভাষণের দোষ অমৃতলালের নাট্যরচনার একটি প্রধান ত্রুটি, তাহা ক্রিয়াবহুল নাট্যরচনার বিশেষ পরিপন্থী —এই নাটকটির মধ্যে ইহাই বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে

স্বদেশী আন্দোলন প্রকৃত রূপ গ্রহণ করিবার পূর্ব হইতেই সাহিত্যের ভিতর দিয়া যে কি ভাবে জাতীয়তাবোধের বিকাশ হইতেছিল, অমৃতলালের এই নাটকখানি হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। প্রজাতন্ত্রের পরিবর্তে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হওয়ায় ইহার স্বাধীনতাকামী চরিত্র দিনকর এই বলিয়া আক্ষেপ করিতেছে—

> ওগো মা জনম-ভূমি!
> আজি মনে রেখো তুমি,
> তোমার উদ্ধার তরে
> অনেক যতন ক'রে না পেয়ে উপায়,
> ম্লান রাঙা পায়
> এই দেহ দিব বলিদান।—২।৩

গিরিশচন্দ্র-রচিত পূর্ববর্তী 'শ্রীবৎস চিন্তা' নাটকে যে প্রজাতন্ত্র (Republic) রাজ্যের উল্লেখ আছে, ইহার মধ্যে তাহারই বিস্তৃততর পরিচয় আছে। অতএব বন্ধুত্বের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহা দ্বারা সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রচারকার্যও সম্ভব হইয়াছিল।

দিনকর ও পৃথ্বী এই নাটকের আদর্শ বন্ধুর চরিত্র। উভয়ের মধ্যেই নাট্যিক ক্রিয়ার প্রচুর অবকাশ ছিল, নাট্যকার তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকটিরই সদ্ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। অতিভাষণ দোষ উভয় চরিত্রেরই প্রধান ত্রুটি। তাঁহাদের পত্নী হিরণ্ময়ী ও আশাবতীর চরিত্র দুইটি সুপরিকল্পিত হইয়াছে, নারীচরিত্র বলিয়াই অতিভাষণ ইহাদের ততটা ত্রুটি বলিয়া মনে হয় না। দণ্ডার সিংহের চরিত্রটিও পরিস্ফুট হইয়াছে, বীরত্বের সঙ্গে মহত্ত্বের সংমিশ্রণ লাভ করিয়া তাঁহার চরিত্র অপূর্ব গৌরব লাভ করিয়াছে।

দিনকরের ভীল-ভৃত্য লট্‌কার চরিত্রটি আদিজাতি-সুলভ সরল ও সুন্দর হইয়াছে। চটসাই চরিত্রটি গিরিশচন্দ্রের অনুকরণ-জাত বলিয়া নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর সৃষ্টি বলিয়া বোধ হইবে। উদরায়ণ অমৃতলালের অপরিহার্য উদরপরায়ণ মূর্খ ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ-চরিত্র—ক্রিয়াবহুল রোমান্টিক পরিবেশের মধ্যে ইহার অবস্থান বড়ই বিসদৃশ হইয়াছে।

সুদীর্ঘ সংলাপ ও স্বগতোক্তিতে ভারাক্রান্ত দুইটি গতানুগতিক প্রণয়-বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া অমৃতলাল একখানি মিলনাত্মক নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাহার নাম 'নব যৌবন'। ইহার কোন কোন অংশ যে অভিনয়ের অযোগ্য তাহা নাট্যকার নিজেই বুঝিতে পারিয়া অভিনয়কালে তাহা পরিত্যাজ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু যাহা অভিনয়ের মধ্যে পরিত্যাজ্য নাটকের মধ্যে তাহার স্থান লাভ করিবার কোন অধিকার নাই, তাহা উপন্যাসের উপজীব্য হইতে পারে। অতএব ইহা নাটকাকারে রচিত একখানি উপন্যাস মাত্র। কোন উচ্চাঙ্গ নাটকীয় কৌশল ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পায় নাই; অতএব ইংরেজি নাটকের কোন আঙ্গিক কিংবা তাহার কোন চরিত্রের সঙ্গে যে ইহার কোন কোন স্থলে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা আকস্মিক মাত্র।

বিদেশের সামাজিক নাটকের বিষয়বস্তু বাংলায় পরিবেশন করিতে হইলে এদেশের সমাজের মধ্যে তাহা স্বাঙ্গীকৃত করিয়া লইতে না পারিলে যে কতদূর বিসদৃশ হয়, অমৃতলালের 'চোরের উপর বাটপাড়ি' প্রহসনখানিই তাহার সর্বাপেক্ষা জ্বলন্ত প্রমাণ। ফরাসী নাট্যকার মলিয়ারের *The School for Wives* নামক প্রহসনের বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া অমৃতলাল তাঁহার উপরোক্ত প্রহসনখানি রচনা করিয়াছেন, কিন্তু ফরাসী দেশের সামাজিক জীবন এবং বাংলার সামাজিক জীবনে সুদূর পার্থক্য হেতু তাঁহার এই প্রচেষ্টা যে কেবল ব্যর্থই হইয়াছে তাহা নহে, বাংলার সামাজিক জীবনের আদর্শে ইহা নিতান্ত নীতি-বিরুদ্ধ হইয়াছে। ফরাসী নারীর সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে যে স্বাধীনতা আছে, বাঙ্গালী নারীর তাহা নাই; বাঙ্গালী বিবাহিতা নারীর জীবনের আদর্শ তাঁহার ফরাসী ভগিনী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; অতএব ফরাসী নারীর আদর্শ বাঙ্গালী নারীর উপর আরোপ করিয়া তাহা দ্বারা হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস সার্থক হইতে পারে না। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের অসঙ্গতি একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকিয়াই সার্থক হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়া থাকে, কিন্তু ইহা তাহা। এই নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম

করিয়া গেলে পীড়াদায়ক হইয়া উঠে। অমৃতলাল এই সাধারণ কথাটি বুঝিতে পারেন নাই। সেইজন্য ফরাসী নারীর আদর্শে এখানে এক বাঙ্গালী বিবাহিতা নারীকে মদ্যপায়িনী ও স্বৈরাচারিণী করিয়া কল্পনা করিয়াও গৃহধর্মে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন। ইহার মূল কাহিনীর মধ্যে যে কৌতুককর ঘটনাটি ফরাসী নাট্যকার পরিবেশন করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালী সমাজের নীতি ও রুচির অনুকূল নহে; সেইজন্য ইহার স্বাঙ্গীকরণও সহজ নহে। অমৃতলাল এই দুরূহ প্রয়াস না করিলেই ভাল করিতেন।

নাট্যমঞ্চে যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া যে-সকল বিষয় দর্শক সাধারণের দৃষ্টির অগোচর থাকিয়া যায়, তাহা অবলম্বন করিয়া অমৃতলাল তাঁহার 'তিলতর্পণ' প্রহসনখানি রচনা করেন। ইহাদের মধ্যে তিনি নাটকের যে একটি বিদ্রূপাত্মক সংজ্ঞা দিয়াছিলেন, যথা 'ন+আটক বা যাহার কিছুতেই আটক বা বাধা নাই তাহাই নাটক' তাহা তাঁহার নিজের নাটক সম্পর্কেও প্রযোজ্য। এই সংজ্ঞাটি সে-যুগের নাট্যসাহিত্যের একটি সাধারণ পরিচয় ছিল।

দ্বিতীয় পক্ষের সুন্দরী ও প্রগল্‌ভা স্ত্রীর উপর স্বামীর সন্দেহ শেষ পর্যন্ত যে কি ভাবে বাতিল বা 'ডিস্‌মিস্‌' হইয়া গেল, তাহারই একটি সংক্ষিপ্ত কাহিনী অবলম্বন করিয়া অমৃতলালের 'ডিস্‌মিস্‌' প্রহসনখানি রচিত হইয়াছে। স্বামীর সন্দেহ বাতিল হইবার কারণ এখানে যেমন অকিঞ্চিৎকর, ইহার কাহিনীর বিন্যাসও তেমনই শিথিল। কতকগুলি অনাবশ্যক চরিত্র কাহিনীর শেষ ভাগে অকারণ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ইহার প্রথমাংশে দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী প্রমদার চরিত্রটি সুন্দর পরিকল্পিত হইয়াছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নাট্যকার তাহার চরিত্রের মাধুর্য ও স্বাভাবিকতাটুকু রক্ষা করিতে পারেন নাই। অবান্তর চরিত্রের আধিক্যের জন্য কাহিনী শেষ পর্যন্ত জমাট বাঁধিয়া উঠিতে পারে নাই।

Cox and Box এবং *Box and Cox* নামক দুইখানি ইংরেজি প্রহসনের অনুকরণ করিয়া অমৃতলাল 'চাটুজ্যে বাঁড়ুজ্যে' নামক একখানি প্রহসন রচনা করেন। ইংরেজির অনুকরণ-জাত বলিয়া অমৃতলালের প্রহসন-রচনার মৌলিক দোষত্রুটিগুলি ইহার ভিতর দিয়া প্রকাশ পায় নাই সত্য, কিন্তু ইংরেজ সমাজের বিষয় বাংলার সমাজের সঙ্গে কোন কোন স্থলে স্বাঙ্গীকৃত হইতে পারে নাই বলিয়া স্থানে স্থানে ইহা একান্ত অবাস্তব

হইয়া উঠিয়াছে। বর হইতে কনে 'বত্রিশ বৎসর তিন মাসের বড়' এই পরিকল্পনার মধ্যে হাস্যরসবোধ যাহাই থাকুক না কেন, বাংলার সামাজিক জীবনে ইহাতে যে অসম্ভাব্যতা প্রকাশ পায় তাহা ইহার সকল রসই ভঙ্গ করিয়া দেয়; অথচ ইংরেজ সমাজে ইহা দ্বারাই হাস্যরসের সৃষ্টি হইতে পারে। বাস্তব জীবনের ছোটখাট অসঙ্গতি অবলম্বন করিয়াই সার্থক প্রহসনের সৃষ্টি হয়,) কিন্তু এই ছোটখাট অসঙ্গতি যদি নিতান্ত অসম্ভাব্যতার স্তরে পৌঁছিয়া যায়, তবে তাহা দ্বারা হাস্যরস সৃষ্টির ব্যাঘাত হয়। ইংরেজি প্রহসন অনুকরণ করিবার কালে অমৃতলাল এই বিষয়টি এখানে বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

প্রহসনটি মাত্র একটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ, ইহার মধ্যে কোন ঘটনা নাই, কেবলমাত্র সংলাপ দ্বারা ইহার হাস্যরসাত্মক পরিবেশটি সৃষ্টি করা হইয়াছে। এক হোটেল-রক্ষক তাহার একই কক্ষ চাটুজ্যে এবং বাঁড়ুজ্যে নামক দুইজন ব্যক্তিকে পরস্পরের অজ্ঞাতে দিনে ও রাতে ভাড়া দিয়া যে কি ভাবে দুইজনের নিকট হইতেই ভাড়া আদায় করিত, তাহারই কাহিনী ইহার প্রথমার্ধে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার শেষাংশে ইহারা উভয়েই একই অনভিলষিত কুলীন-কন্যার জন্য প্রস্তাবিত পাত্র বলিয়া পরিচয় পাইয়াছে। কাহিনীটির মৌলিক পরিকল্পনার জন্য অমৃতলালের কোন কৃতিত্ব না থাকিলেও, ইহার সংলাপের মধ্যে তাঁহার কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। হোটেলের ঝি ভবতারিণীর চরিত্রটি সংক্ষিপ্ত হইলেও সুপরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু চাটুজ্যে কিংবা বাঁড়ুজ্যের মধ্য দিয়া নাট্যকার বিশিষ্ট কোন চরিত্র রূপায়িত করিতে পারেন নাই, ইহারা একই অবস্থার অধীন হইয়াও যে পরস্পর সুস্পষ্টভাবে স্বতন্ত্র, অমৃতলাল তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। সেইজন্য ইহার মধ্যে চাটুজ্যে এবং বাঁড়ুজ্যে একাকার হইয়া গিয়াছে, কে যে দর্জির দোকানের ও কে যে ছাপাখানার কর্মচারী তাহা ইহা পড়িতে পড়িতেও সুস্পষ্টভাবে মনে রাখিতে পারা যায় না। অমৃতলালের এই প্রহসনখানি সম্পর্কে একজন সমালোচক বলিয়াছেন যে ইহা 'একটা হট্টগোলের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।' ইহার সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা সার্থক উক্তি আর কিছুই হইতে পারে না। তবে ইহার সংলাপের মধ্য দিয়া মধ্যে মধ্যে যে বাক্-চাতুর্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা এই হট্টগোলের মধ্যেও সার্থক হাস্যরসের সৃষ্টি করিতে পারে।

'বিবাহ-বিভ্রাট' প্রহসনখানির ভিতর দিয়া অমৃতলাল পণপ্রথার দোষ

কীর্তন করিবার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা ও নব্যবঙ্গের কলেজী শিক্ষার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছেন। ইহা তাঁহার একখানি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য-মূলক রচনা। ইহার ভরতবাক্যে ইহার অন্যতম প্রধান চরিত্র বরের পিতা গোপীনাথ উল্লেখ করিয়াছেন, 'ভিক্ষার ঝুলি আছে, গলায় দেবার দড়ি আছে —সেও ভাল, কিন্তু কেউ যেন ছেলেমেয়ের বিয়ে দিয়ে টাকা রোজকারের চেষ্টা না করে—অতি ইতর! অতি চামার! অতি কসায়ের কাজ (২।৪)।' প্রহসনখানির মধ্য দিয়া ইহাই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

ইহার কাহিনীর মধ্যে কোন জটিলতা নাই। পুত্রের বিবাহে উচ্চ পণ গ্রহণ করিয়া বরের পিতার নিজের ঋণশোধ করিবার সকল কৌশল পুত্র স্বয়ং ব্যর্থ করিয়া দিয়া সে নিজেই সে অর্থ অধিকার করিয়া কি ভাবে যে বিলাত চলিয়া গেল তাহাই কাহিনীতে বর্ণনা করা হইয়াছে। বরের পিতা ও কনের পিতা দুজনই এখানে আদর্শ চরিত্র (type) মাত্র, একজন হৃদয়হীন অত্যাচারী, আর একজন উপায়হীন অত্যাচারিত—ইহাদের কাহারও কোন বিশিষ্ট রূপ প্রহসনখানির ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতে পারে নাই। উদ্দেশ্যমূলক রচনা বলিয়া এই অত্যাচারের চিত্রের মধ্যে যে অতিরঞ্জনের দোষ প্রবেশ করিয়াছে, তাহা মধ্যে মধ্যে পাঠকের নিকট পীড়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি, অমৃতলাল স্ত্রীশিক্ষা কিংবা স্ত্রীস্বাধীনতাকে সহানুভূতির দৃষ্টি দ্বারা দেখিতে পারেন নাই। এই বিষয়ে ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে তাঁহার বড় বেশি প্রভেদ ছিল না। এই প্রহসনের বিলাসিনী কার্ফরমার চরিত্রের ভিতর দিয়া তাহারই পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। সহানুভূতিহীন সৃষ্টি বলিয়া ইহা যে কেবলমাত্র নিষ্প্রাণ তাহা নহে, ইহার মধ্য দিয়া শিক্ষিতা নারীর একটি অতি শোচনীয় বিকৃত রূপ প্রকাশ পাইয়াছে। এই প্রকার চরিত্র সেই যুগে যেমন বর্তমান ছিল না, তেমনই কোন যুগের কোন সমাজেই বর্তমান থাকিতে পারে না। ইহার মধ্য দিয়া তিনি তাঁহার ভবিষ্যৎ কালের শিক্ষিত বাঙ্গালী নারী-চরিত্রের একটি বিকৃত কল্পনা প্রকাশ করিয়াছিলেন মাত্র, তাঁহার সেই কল্পনা সত্যাশ্রয়ী ছিল না বলিয়াই তাহা অতীতে যেমন নিষ্ফল হইয়াছে বর্তমানেও তাহাই হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও তাহাই হইবে। এই চরিত্রটির দ্বারা নাটকের মধ্যে হাস্যরস সৃষ্টির যে চেষ্টা

করা হইয়াছে, তাহা উচ্চ রসদৃষ্টি-সম্ভূত নহে বলিয়াই আধুনিক দর্শকের নিকট বিরক্তিকর বোধ হইবে।

নন্দলালের ভিতর দিয়াও কলেজী শিক্ষার এক বিকৃত পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। যদিও অমৃতলাল যখন এই প্রহসন রচনা করেন, তখন বাঙ্গালী শিক্ষিত যুবসম্প্রদায় ইংরেজি প্রভাবের প্রথম সংঘর্ষ কাটাইয়া উঠিয়াছে, তথাপি মাইকেল এবং দীনবন্ধুর অনুকরণে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত যুব-সম্প্রদায়কে লইয়া উপহাস করিবার প্রবৃত্তি রক্ষণশীল সমাজের মধ্যে একেবারে হ্রাস পায় নাই, নন্দলালই ইহার প্রমাণ। বিলাত-প্রত্যাগত ইংরেজ-ভাবাপন্ন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত সমাজের প্রতিও রক্ষণশীল মন তখন স্বভাবতই সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিল না। এই প্রহসনের মিস্টার সিং তাহার প্রমাণ। তবে শিক্ষিতা বঙ্গমহিলা মিসেস কার্ফরমার মত তাহাকে তিনি বিকৃত করিয়া তুলেন নাই, ইহার সংলাপ ও আচরণের ভিতর দিয়া বহুলাংশেই বাস্তবতা প্রকাশ পাইয়াছে। এই প্রহসনের একটি চরিত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তাহা ঝি। বরের বাড়ীর ঝি হইলেও তাহার স্বাধীন গতিবিধি কলিকাতা সহরের সর্বত্র বিদ্যমান। প্রয়োজনমত নাট্যকার যেখানে ইচ্ছা সেখানেই ইহার আবির্ভাব ঘটাইয়াছেন। অতএব ইহা বাস্তব পরিচয় প্রকাশ পাইতে পারে নাই। এই চরিত্রটি গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক কিংবা জীবন-চরিত নাটকের প্রভাব-জাত। বিবেক, বুদ্ধি, ধর্ম, ন্যায় ইত্যাদি নৈর্ব্যক্তিক গুণেরই ইহা একটি মানবিক রূপ মাত্র। এই প্রহসনের মধ্যে ইহা এমন এক প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছে যে, ইহা দ্বারা এই সামাজিক প্রহসনের বাস্তব পরিবেশ অনেকাংশেই ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। এই প্রহসনের ভাবায় উচ্চাঙ্গ নাটকীয় গুণ প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার বাসরঘরের চিত্রটি বাস্তব বলিয়াই জীবন্ত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার অগ্রগতি দেখিতে পাইয়া রক্ষণশীল অমৃতলাল এই ভাবিয়া আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে একদিন পুরুষের সমস্ত অধিকারই নারী নিজেরাই কাড়িয়া লইয়া পুরুষদিগকে অন্তঃপুরে বন্দীজীবন যাপন করিতে বাধ্য করিবে। তাঁহার 'তাজ্জব ব্যাপার' প্রহসন তাঁহার সেই আতঙ্কেরই ফল। ইহার মধ্যে নারী উকিল, জজকোর্টের সেরেস্তাদার, সংবাদপত্রের সম্পাদিকা পুলিশের হেড্ কনস্টেবল, বিবাহ বাসরের ঘটকী ইত্যাদির কল্পিত ও অতিরঞ্জিত চিত্র পরিবেশন করা হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে নারীর স্বভাবজাত দুর্বলতা লইয়াও অশিষ্ট

পরিহাস করা হইয়াছে। ইহার পরিবর্তে পুরুষ অন্তঃপুরচারী ও শিশুর প্রতিপালক রূপে চিত্রিত হইয়াছে। নাট্যকার তাঁহার এই রচনাটিকে 'গীতিরঙ্গ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পক্ষে যাহা রঙ্গ, অন্যের পক্ষে তাহা মৃত্যুতুল্য হইয়াছে। এ দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের প্রথম যুগে রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের এই শ্রেণীর রঙ্গ-রচনা যে ইহার অগ্রগতি সাধারণের মধ্যে কতদূর প্রতিহত করিয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু যাহা সত্য তাহার পথ রোধ করিতে পারা যায় নাই। এই প্রহসনখানির ভিতর সে-যুগের নারী সমাজের প্রকৃত পরিচয় যেমন প্রকাশ পায় নাই, ইহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনারও কোন পরিচয় নাই; সেইজন্য সাময়িক উৎকট রঙ্গরস পরিবেশন ব্যতীত ইহার কোন স্থায়ী মূল্য প্রকাশ পায় নাই। দূরদৃষ্টি ও জীবনের প্রতি সহানুভূতির অভাব থাকিলে নাট্যরচনা যে কতদূর ব্যর্থ হইতে পারে, অমৃতলালের প্রহসন রচনার প্রায় সকল আঙ্গিকেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।

পূর্ববঙ্গের এক নিরক্ষর গ্রাম্য জমিদার যে কি ভাবে রাজা খেতাব লাভ করিবার লোভে কলিকাতায় আসিয়া এক ধূর্তের কবলে পড়িয়া সর্বহারা হইয়াছিলেন, তাহারই কাহিনী অবলম্বন করিয়া অমৃতলাল তাঁহার 'রাজা বাহাদুর' নামক প্রহসন রচনা করিয়াছেন। ইহাকে অমৃতলাল 'রং সং' বলিয়া উল্লেখ করিলেও আঙ্গিকের দিক দিয়া ইহা তাঁহার অন্যান্য প্রহসন হইতে স্বতন্ত্র নহে; অতএব 'রং সং' সংজ্ঞাটি তিনি প্রহসন সম্পর্কেই ব্যবহার করিয়াছেন। অমৃতলালই সর্বপ্রথম পূর্ববঙ্গের কথ্যভাষা ব্যাপক ভাবে তাঁহার প্রহসনে ব্যবহার করিয়া তাহা দ্বারা হাস্যরস সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কাহিনীর মধ্য দিয়া যখন কৌতুক সৃষ্টি সম্ভব হয় না, তখন এই একটি সহজ উপায় অবলম্বন করিয়া কেহ কেহ যে প্রহসন রচনার প্রয়াস পাইয়াছেন, অমৃতলাল তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তাঁহার 'রাজা বাহাদুর' প্রহসন আদ্যোপান্তই পূর্ববঙ্গের কথ্যভাষায় রচিত এবং ইহাই ইহার হাস্যরস সৃষ্টির প্রধান অবলম্বন। বলা বাহুল্য, এই শ্রেণীর রচনার ভিতর দিয়া কোন উচ্চাঙ্গ শিল্পগুণ প্রকাশ পাইতে পারে না। পূর্ববঙ্গের গ্রাম্য নারীচরিত্র সম্পর্কে অমৃতলালের কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না, তাহাদের মুখে তিনি যে সকল গালাগালি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম্য নারীদিগেরই কথা—কেবলমাত্র পূর্ববঙ্গের ভাষায় অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। পূর্ববঙ্গবাসীকে বাঙাল

বলিয়া ক্ষেপাইয়া যে হাস্যরস সৃষ্টি হয়, ইহার হাস্যরসও সেই শ্রেণীর—জাতের খোঁটা দিয়া লোক ক্ষেপাইয়া হাস্যরস সৃষ্টিরই ইহা অন্যতম পরিচয় মাত্র। এই শ্রেণীর হাস্যরস সৃষ্টিতেই অমৃতলালের দক্ষতা সর্বত্র প্রকাশ পাইয়াছে ৷৷

সহবাস-সম্মতির বয়স লইয়া ভারত সরকার যে আইন প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা লইয়া এদেশে সমসাময়িক কালে কিছু আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহাই অবলম্বন করিয়া নাট্যকার 'সম্মতি-সঙ্কট' নামক প্রহসন রচনা করেন। ইহার মধ্যেও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের মূর্খতা লইয়া নাট্যকার অহেতুক ব্যঙ্গ করিতে ক্ষান্ত হন নাই।

অমৃতলালের রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচায়ক অন্যতম প্রহসন 'কালাপানি বা হিন্দুমতে সমুদ্রযাত্রা'। ইহা আকারে ক্ষুদ্র, মাত্র ছয়টি দৃশ্যে সম্পূর্ণ, নাটকীয় ঘটনাবলীর পরিবর্তে ইহা কেবলমাত্র কতকগুলি বক্তৃতায় পরিপূর্ণ। ইহার মধ্যে নাট্যকার নব্য সম্প্রদায়ের হিন্দুমতে বিলাত যাত্রার প্রয়াসের মধ্য দিয়া হাস্যরস সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন; কিন্তু সে প্রয়াস সার্থক হইয়াছে বলিয়া অনুভব করা যায় না। কারণ, বিষয়টি এমনই অকিঞ্চিৎকর যে, ইহার রসাবেদন গভীর হইতে পারে না। তবে সেই যুগে উভয় কুল রক্ষা করিয়া নব্যবঙ্গের একটি সম্প্রদায় যে গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার উপরই ইহা দ্বারা নাট্যকার লঘু কটাক্ষপাত করিয়াছেন; কিন্তু ইহার ভিতর দিয়া কোন নাটকীয় কৌশল প্রকাশ করিতে পারেন নাই; ইহাতে বিলাত যাওয়ার বিরুদ্ধে তিনকড়ি মামা যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা যে নাট্যকারের নিজস্ব মতবাদ তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। অনুরূপ বিষয়ক প্রায় সকল সামাজিক প্রহসনের ভিতর দিয়াই তিনি এই সকল যুক্তির পুনরুল্লেখ করিয়াছেন। বিলাত যাওয়া সম্পর্কে অমৃতলালের নিজস্ব মত এই যে, 'এমনও ঢের কাজ আছে যে দেশে থেকেই করতে পারা যায়', অতএব কোন কাজের জন্যই বিলাত যাওয়ার প্রয়োজন করে না। তিনকড়ি মামার মুখ দিয়া এই কথাগুলি তিনি নিজেই বলিয়াছেন।

বিলাত যাওয়ার বিরুদ্ধে যুক্তি যে তিনকড়ি মামার মত একজন রক্ষণশীল ব্যক্তিই দেখাইতেছেন তাহা নহে, নিরক্ষর কাঁসারি পিসি ও নাপতানী পর্যন্ত ইহার বিরুদ্ধে যুক্তি দেখাইতেছে। এমন কি কাঁসারি পিসি একথাও জানে যে, 'সমুদ্রের জাহাজ বড় দোল খায়।' (২য় দৃশ্য) প্রহসনটি এই প্রকার অবান্তর পরিকল্পনায় পরিপূর্ণ। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের দারিদ্র্য সর্বদাই

অমৃতলালের তীব্র উপহাসের বিষয় হইয়াছে। ইহাতে তাহা সকল মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে। একটি চরিত্রের মুখ দিয়া তিনি এখানে তাঁহার এই শাস্ত্রজ্ঞান প্রচার করিয়াছেন, 'শাস্ত্রেও ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য জাতের ভিক্ষা করতে নিষেধ আছে' (৬ষ্ঠ দৃশ্য)। এই প্রহসনের মধ্যে তাঁহার পরিকল্পিত ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকের চিত্রগুলিই সর্বাপেক্ষা জীবন্ত হইয়াছে।

'কালাপানি' প্রহসনের ভিতর দিয়া অমৃতলাল হিন্দুর সমুদ্রযাত্রার প্রতি যেমন কটাক্ষপাত করিয়াছেন, তেমনই এই জাতির হুজুগপ্রিয়তারও নিন্দা করিয়াছেন। নববঙ্গ সম্প্রদায় হিন্দুমতে বিলাত যাওয়ার হুজুগ পরিত্যাগ করিয়া নাট্যকাহিনীর উপসংহারে অন্য এক অকিঞ্চিৎকর নূতন হুজুগে মাতিয়া উঠিয়াছে, তাহা ভিক্ষুক-দমন। অকিঞ্চিৎকর বিষয়, অগভীর রস-পরিকল্পনা ও সুতীব্র আত্মসচেতনতার জন্য অমৃতলালের এই প্রহসনখানি একটি ব্যর্থ রচনা বলিয়াই অনুভূত হইবে। ইহার সঙ্গীতগুলি সুরচিত—তবে নাট্য-কাহিনীর সঙ্গে ইহারা ক্ষীণতম যোগসূত্রে আবদ্ধ।

সর্ববিধ সামাজিক প্রগতির বিরোধী অমৃতলাল তাঁহার 'বাবু' প্রহসনের ভিতর দিয়া দেশের প্রগতিশীল সমাজ-আন্দোলনের জনক ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে তীব্রতম বিষ উদ্গার করিয়াছেন। এই সঙ্গে ভণ্ড দেশহিতৈষী, অপরিপক্ব-জ্ঞান বৈজ্ঞানিক, হুজুগপ্রিয় সংস্কারক, স্বার্থপর সম্পাদক, কপট ধর্মধ্বজ সকলের বিরুদ্ধেই একযোগে তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ ব্যঙ্গ প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহার ভাষা যেমন জ্বালাময়ী, আক্রমণও তেমনই প্রত্যক্ষ। আনুপূর্বিক একটি অখণ্ড কাহিনীর পরিবর্তে ইহার মধ্যে নাট্যকার কতকগুলি অসংলগ্ন চিত্র ও বিচ্ছিন্ন চরিত্রের সমাবেশ করিয়াছেন। ইহাতে কোন সুনির্দিষ্ট কাহিনীর অভাবে ইহা নাটক কিংবা প্রহসন কিছুই হয় নাই, নাট্যকার নিজেও ইহাকে 'নক্সা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু নক্সার যে একটি বস্তুধর্ম (objectivity) থাকা প্রয়োজন, ইহাতে তাহাও নাই। ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত চিত্রই যদি ইহাতে প্রকাশ পাইত, তাহা হইলে বলিবার কিছুই ছিল না; কিন্তু তাহার কতকগুলি উচ্চ আদর্শকে বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া এখানে উপস্থিত করা হইয়াছে বলিয়া ইহার বস্তুধর্ম খর্ব হইয়াছে, অতএব ইহা নক্সাও নহে। আত্মনিরপেক্ষ বস্তুবিশ্লেষণ, অর্থাৎ অকৃত্রিম বস্তুধর্ম (objectivity) নক্সার বৈশিষ্ট্য, কিন্তু ইহা নাট্যকারকৃত ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যামাত্র—নাট্যকারের বিশিষ্ট একটি মনোভাব এখানে একেবারে নগ্নরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বিধবা-বিবাহ

ও স্ত্রীস্বাধীনতাই এই 'নক্সা'র তীব্রতম আক্রমণের বিষয়। এই সম্পর্কে নাট্যকার যে সকল চিত্র ও সংলাপ পরিবেশন করিয়াছেন, তাহা শালীনতার মাত্রা বহুদূর অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের ভ্রাতা-ভগিনী সম্পর্কটি লইয়া তিনি গ্রাম্যস্তরের রসিকতা করিয়াছেন। বিধবা-বিবাহ বলিতে তিনি 'ঠানদিদি'র বিবাহ ধরিয়া লইয়া সুলভ কৌতুকের সৃষ্টি করিয়াছেন। স্বাধীনা মহিলাগণ ইহার সূচনায় 'সবে ভাঙ্গিব জানানা' বলিয়া গান গাহিয়াছিল, কিন্তু এক ছদ্মবেশী গোরার আক্রমণের পর 'ছি ছি ছি হব না আর ঘরের বার' বলিয়া গান গাহিয়া ইহার সমাপ্তি টানিয়াছেন। এই নিতান্ত সুলভ ব্যঙ্গই ইহার উপজীব্য। ইহা নক্সা বা সমাজ-দর্পণ নহে, অমৃতলালের নিজস্ব মনোদর্পণ। ইহার মধ্যেও অমৃতলালের স্বভাবসিদ্ধ জাত তুলিয়া গালি দিবার প্রবৃত্তি প্রকাশ পাইয়াছে।

হিন্দুসমাজের জাতিবিভাগ সম্পর্কিত অমৃতলালের নিতান্ত রক্ষণশীল মনোভাবের সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার 'একাকার' নামক প্রহসনে। ইংরেজি শিক্ষার ফলে দেশের নীচ জাতির লোকসমূহও যে সকলের সঙ্গে সমানাধিকার লাভ করিতেছে, ইহাই এই নাটকে বিদ্রূপের বিষয় হইয়াছে। বিশেষত নীচ জাতিসমূহ ইংরেজি শিক্ষার মোহে আকৃষ্ট হইয়া তাহাদের জাতব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া আপিশের কেরাণীগিরি লাভ করিবার ফলে দেশে যে বেকার সমস্যা ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিয়াছে, ইহাও এই প্রহসনের প্রতিপাদ্য বিষয়। তবে ইংরেজি শিক্ষাকে এখানে নাট্যকার নিন্দা করিতেছেন না; ইংরেজি শিক্ষা লাভ করিয়া কৃষক যদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকার্য করিতে পারে, তবে তাহা তাহার আপিশের কেরাণীগিরি অপেক্ষা অধিকতর গৌরব ও লাভজনক হয়—তাহাই এখানে নাট্যকারের বক্তব্য। এই বিষয়টিকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া এই প্রহসনখানির মধ্যে এক অতি ক্ষীণ কাহিনীর সূত্র অবলম্বন করিয়া কতকগুলি বক্তৃতারই সমাবেশ করিয়াছেন; সেইজন্য ইহা কাহিনীবিন্যাস কিংবা সংলাপ কোন দিক দিয়াই নাটকীয় গৌরব লাভ করিতে পারে নাই। অনেক স্থলেই ইহা জাত তুলিয়া গালি দেওয়ার মত অনুদার-মনোবৃত্তির পরিচায়ক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সত্যের পথে সমাজের অগ্রগতিকে রোধ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই এদেশের প্রাচীন সমাজব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, কুটির-শিল্প ও অন্যান্য যে সকল ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করিয়া মধ্য-

যুগের সমাজে জাত-ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান ও তাহা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক জীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল, ইংরেজ-অধিকারের পর স্বভাবতই তাহা দ্রুত পরিবর্তিত হইতে লাগিল—নাগরিক জীবনকে কেন্দ্র করিয়া তখন যন্ত্রশিল্প এদেশে এক নূতন অর্থনৈতিক বনিয়াদ গড়িয়া তুলিতে লাগিল। এই বিষয়টি উপেক্ষা করিয়া আজ আমরা পুনরায় মধ্যযুগের সমাজ-ব্যবস্থায় ফিরিয়া যাইতে পারি না। নাট্যকার এখানে এই কথাটি বিস্মৃত হইয়াছেন। প্রহসনের মধ্য দিয়া অমৃতলাল এখানে যে বিষয়টি প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন, তাহার দাবী সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না, বরং সংস্কারের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেইজন্য শিক্ষিত নাগরিক সমাজ ইহার সঙ্গে অন্তরের যোগ অনুভব করিতে পারে নাই। এদেশের সমাজের উপর হইতে জাতিগত বৈষম্য দূর করিয়া ব্যক্তিমহিমার প্রতিষ্ঠাই ইংরেজি শিক্ষার গোড়ার কথা ছিল। এই প্রহসনের মধ্যে সেই বিষয়টিই অস্বীকার করা হইয়াছে। জাতি-সম্পর্কিত এক নিতান্ত অনুদার ও সঙ্কীর্ণ মনোভাব ইহার রসস্ফূর্তিতে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে।

নিরুপদ্রব গ্রাম্য জীবনে কয়েকজন ইংরেজি শিক্ষিত যুবকের উৎসাহে মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে তাহাতে দলাদলির সৃষ্টি হইয়া ইহার শান্তি যে কি ভাবে বিনষ্ট করিয়া দিল, তাহারই বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া অমৃতলালের 'গ্রাম্য বিভ্রাট' প্রহসনটি রচিত হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য সংস্পর্শজাত সকল বিষয়েই কেবলমাত্র অশুভ দিকটাই যেমন অমৃতলাল অন্যত্র প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এখানে তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। মিউনিসিপ্যালিটির যে একটি ভাল দিকও আছে, তাহা নাট্যকার এখানে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছেন, ইহা তাঁহার রক্ষণশীল মনোভাবের অন্যতম পরিকল্পনা। নাটক কিংবা প্রহসন হিসাবে ইহার কোনই মূল্য নাই, ইহা সামাজিক নক্সাও নহে, ইহা সাময়িক একটি গ্রাম্য উত্তেজনার চিত্র। কিন্তু গ্রামবাসী পুরুষদিগের বহির্মুখীন কাৰ্যাবলীর অন্তরালে ইহার নারীজীবনের যে চিত্রগুলি পরিবেশন করা হইয়াছে, তাহা নাট্যকাহিনীর সঙ্গে কোন প্রকার যোগ রক্ষা করিতে না পারিলেও অত্যন্ত বাস্তবধর্মী বলিয়া বোধ হইবে। নারীর গালাগালির ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে অমৃতলাল দীনবন্ধু মিত্রের সমকক্ষ, এই বিষয়ে মধ্যযুগে কেহ তাঁহার, মত দক্ষতা দেখাইতে পারেন নাই। এই গুণেই 'গ্রাম্য বিভ্রাট' প্রহসনের নারী-চরিত্রগুলিই জীবন্ত হইয়া আছে

কতকগুলি মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত নরনারীর বিকৃত চরিত্র অবলম্বন করিয়া অমৃতলালের 'বৌমা' প্রহসনখানি রচিত। ইহার মধ্যেও কপট 'ভারত-সন্তান' ও অপরিপক্ব-শিক্ষা নারীচরিত্রের কয়েকটি অতিরঞ্জিত পরিচয় প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহারও স্থূল আক্রমণের লক্ষ্য ব্রাহ্মসমাজ ও ইহার স্ত্রীস্বাধীনতা। ব্রাহ্মসমাজের 'ভ্রাতা-ভগিনী' সম্পর্কটি লইয়া ইহাতেও স্থূল রসিকতা করিবার প্রবৃত্তি অত্যন্ত উৎকট আকার লাভ করিয়াছে। তবে ব্রাহ্মসমাজের যে একটি কল্যাণকর দিকও আছে, তাহা ইহাতে নাট্যকার সর্বপ্রথম স্বীকার করিয়াছেন। ইহার বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপের মধ্যে অমৃতলাল তাঁহার পূর্ববর্তী দুইখানি প্রহসনের কয়েকটি চরিত্রের নাম ও কার্যকলাপের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা কেবলমাত্র যে কোন স্বাধীন রচনার পক্ষে ত্রুটিরই পরিচায়ক তাহা নহে, ইহা হইতে স্পষ্টতই বুঝিতে পারা যায় যে, প্রহসন রচনার দিক দিয়া অমৃতলালের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিবার কোন প্রতিভাই ছিল না, একই বিষয়বস্তু বার বার নানাভাবে তিনি পরিবেশন করিয়াছেন মাত্র। 'বৌমা' প্রহসনের কোন চরিত্রসৃষ্টির মধ্যেই নাট্যকারের কোন কৌশলই প্রকাশ পায় নাই। ইহার মধ্যে কিশোরী বৌমা ও হিড়িম্বার চরিত্র দুইটি বিকারগ্রস্ত রোগীর মত, ইহাদের স্বামী দুইজনের চরিত্রও সুস্থ অবস্থার পরিচায়ক নহে। মতিলালের মুখ দিয়া নাট্যকার নিজেই তাঁহার মতবাদ প্রচার করিয়াছেন, একমাত্র বিধবা জননী অন্নপূর্ণার চরিত্রের মধ্যে কতকটা বাস্তবতার স্পর্শ অনুভব করা যায়, কিন্তু তাহাও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও পরিস্ফুট। আনুপূর্বিক কোন সুপরিচ্ছন্ন কাহিনী নাই, নাট্যকার ইহাকে 'নক্সা' বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার মধ্যেও নাট্যকার নাম করিয়া কয়েকটি ঔষধের বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন।

লর্ড কার্জনের শাসনকালে কলিকাতায় যে নূতন মিউনিসিপ্যাল আইন প্রবর্তিত হয়, তাহার প্রতিবাদ স্বরূপ কলিকাতা ও সহরতলীর আটাশজন কমিশনর একযোগে পদত্যাগ-পত্র দাখিল করেন। একজন মাত্র কমিশনর তাঁহাদের পথ অনুসরণ করিতে বিরত থাকেন। এই বিষয়টি এদেশের তদানীন্তন শিক্ষিত সমাজের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহাই অবলম্বন করিয়া অমৃতলাল তাঁহার 'সাবাস আটাশ' প্রহসনখানি রচনা করেন। কিন্তু ইহার মধ্যে পদত্যাগকারী কমিশনরদিগের একতা ও সৎসাহসের বর্ণনার পরিবর্তে কতকগুলি অবান্তর বিষয়ই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ইহাতে এক

পেটেন্ট ঔষধের অশ্লীল বিজ্ঞাপনদাতার নিন্দা ও অন্য এক পেটেন্ট কেশতৈল আবিষ্কারের নামোল্লেখপূর্বক প্রশংসা আছে। অতএব আটাশজন পদত্যাগ-কারী কমিশনরের সাধুবাদ অবলম্বন করিয়া একটি কেশতৈলের বিজ্ঞাপন প্রচার করাই ইহার উদ্দেশ্য। এই সুস্পষ্ট ব্যবসায়-বুদ্ধি-প্রণোদিত রচনাখানিও কলিকাতার এক জনপ্রিয় সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়। অমৃতলালের প্রায় সকল প্রহসনেরই যাহা বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মূর্খতা প্রতিপন্নের ও অশুদ্ধ ইংরেজি বলিয়া হাস্যরসসৃষ্টির সুলভ প্রয়াসও ইহার মধ্যে অপ্রাসঙ্গিকভাবে স্থান লাভ করিয়াছে।

যে বিষয়টি অবলম্বন করিয়া অমৃতলাল এখানে প্রহসনখানি রচনা করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে প্রহসন রচনার বিষয় নহে। যে জাতীয় মর্যাদা-বোধ বাঙ্গালীকে সেদিন স্বদেশী আন্দোলনের মহত্তর আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, এই সকল ঘটনার মধ্যে তাহারই প্রস্তুতি রচিত হইয়াছিল; অতএব তাহা লঘু প্রহসনের বিষয় নহে। সেইজন্য অমৃতলাল এখানে প্রকৃত বিষয়টিকে গৌণ করিয়া কতকগুলি অবান্তর বিষয়কেই প্রাধান্য দিতে বাধ্য হইয়াছেন। জাতীয় কিংবা ব্যক্তিজীবনের গভীরতর স্তরে কোনদিনই অমৃতলালের দৃষ্টি প্রসারিত হইতে পারে নাই, সেইজন্য জাতীয় গৌরবসূচক কোন বিষয় অবলম্বন করিয়া যখনই তিনি কোন নাটক কিংবা প্রহসন রচনা করিয়াছেন, তখনই তিনি শোচনীয়ভাবে ব্যর্থকাম হইয়াছেন। ইহা তাঁহার এই প্রকার ব্যর্থতারই অন্যতম নিদর্শন।

এক কৃপণ কি ভাবে শ্বশুরের কলসী উৎসর্গের জন্য একটি মাত্র টাকা ব্যয় করিতে বিমুখ হইয়া ছদ্মবেশী সন্ন্যাসীর প্রতারণায় পরশ পাথর লাভ করিবার জন্য দশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছিল, মূলত তাহারই কাহিনী অবলম্বন করিয়া অমৃতলালের 'কৃপণের ধন' প্রহসনটি রচিত হইয়াছে। ইহা ফরাসী নাট্যকার মলিয়ারের *The Miser* প্রহসনটি অনুকরণে রচিত হইলেও অমৃতলাল ইহাকে এদেশের সমাজের সঙ্গে সার্থক স্বাঙ্গীকরণ করিয়া লইয়াছেন। মলিয়ার রচিত প্রহসনের নায়কের মধ্যে যেমন একটা চরিত্রগত দুর্বলতা ছিল এবং তাহাই অবলম্বন করিয়া তাহার অর্থব্যয় হইয়া গিয়াছিল, অমৃতলালের প্রহসনেও ইহার নায়ক-চরিত্রের মধ্যে অনুরূপ নৈতিক ত্রুটির ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়; কিন্তু তাহার দশহাজার টাকা ব্যয় যে মুখ্যত ইহা অবলম্বন করিয়াই সম্ভব হইয়াছে, তাহা তেমন স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই। অমৃতলাল তাঁহার নায়কের

চরিত্রগত নৈতিক ত্রুটির সঙ্গে তাহার কার্পণ্যদোষের মিশ্রণটি মলিয়ারের মত এমন সহজ করিয়া তুলিতে পারেন নাই। সেইজন্ত তাহার মত কৃপণের পক্ষে অকস্মাৎ নগদ দশহাজার টাকা একজন অপরিচিত সন্ন্যাসীর নিকট অর্পণ করার বৃত্তান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। অমৃতলালের প্রহসনের মধ্যে একটি প্রণয়-বৃত্তান্ত আছে, তাহা মন্মথ ও কুন্তলার প্রেম। সেক্সপীয়র-রচিত *The Merchant of Venice* নাটকের শাইলক-দুহিতার প্রণয়-বৃত্তান্তের সঙ্গে ইহার ঐক্য আছে। অমৃতলাল তাঁহার এই প্রহসনখানির রচনায় মলিয়ার এবং সেক্সপীয়র উভয়ের নিকট হইতেই সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু নায়ক-চরিত্রের কার্পণ্যের দিকটি অমৃতলাল যত সহজে স্বাঙ্গীকৃত করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন, প্রণয় বৃত্তান্তটি তেমন পারেন নাই। অমৃতলালের প্রহসন রচনার সাধারণ কতকগুলি ত্রুটি ইহার ভিতর দিয়াও প্রকাশ পাইয়াছে; যেমন অকারণ ব্রাহ্মণ পুরোহিতের টিকি ধরিয়া টানিয়া সুলভ হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা, নাম করিয়া কেশতৈলের বিজ্ঞাপন প্রচার ইত্যাদি। কৃপণের চরিত্রটি শেষ পর্যন্ত সার্থক না হইলেও, কৃপণ-গৃহিণী দয়াময়ীর চরিত্রটি আদ্যোপান্ত সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে।

সমসাময়িক কালের অধিবাসী উত্তর কলিকাতার ব্যক্তিবিশেষকে ব্যঙ্গ করিয়া অমৃতলাল তাঁহার 'অবতার' নামক প্রহসনখানি রচনা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে এমন কতকগুলি সমসাময়িক ঘটনা ও ব্যক্তির উল্লেখ আছে যে, বর্তমানে তাহাদের পরিচয় পাওয়া দুঃসাধ্য। ব্যক্তিবিশেষের প্রতি লক্ষ্যই ইহার মধ্যে এত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে যে, তাহা অতিক্রম করিয়া নাট্যকার ইহার সম্পর্কিত কোন প্রকার শিল্পগত দায়িত্ব পালন করিবার অবকাশ পান নাই। ইহার কাহিনীর কোন ক্রমপরিণতি নাই, চরিত্রেরও কোন ক্রমবিকাশ নাই। অবশ্য অমৃতলালের অধিকাংশ প্রহসনই এই প্রকার; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও নাট্যকার ইহার মধ্যে এই সকল বিষয়ে যতখানি উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছেন, তাঁহার অন্য প্রহসনের মধ্যে ততখানি হন নাই। ইহার অধিকাংশ চরিত্রই কোন না কোন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া রচিত, এই চরিত্রগুলি স্বভাবতই পরস্পর-বিচ্ছিন্ন, ইহাদের মধ্যে পারস্পরিক যে যোগ স্থাপন করিয়া এই কাহিনী গ্রথিত হইয়াছে, তাহা এতই শিথিল যে, তাহা দ্বারা সমগ্রভাবে কাহিনীর কোন রস জমাট বাঁধিয়া উঠিতে পারে নাই। চরিত্রগুলি প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র হইতে নির্বাচিত করা সত্ত্বেও নাট্যকার ইহাদিগকে সজীব করিয়া তুলিতে পারেন নাই, বরং আরও কৃত্রিম করিয়া ফেলিয়াছেন। এইখানেই দীনবন্ধু এবং অমৃতলালের পার্থক্য;

এমন কি ঈশ্বর গুপ্তও প্রত্যক্ষ বস্তুকে বর্ণনার গুণে যে প্রকার সজীব করিয়া তুলিতে পারিতেন, অমৃতলাল তাহাও পারিতেন না। আনুপূর্বিক একটি চরিত্রের গঠন অমৃতলালের যে কত সাধ্যাতীত ছিল, 'অবতারের' প্রথম-হিল্লোলের চরিত্রই তাহার প্রমাণ। এই প্রহসনের মধ্যে দুইজন অবতারের কথা আছে—একজন বিষ্ণুর অবতার, আর একজন শঙ্করাচার্যের অবতার। প্রথমোক্ত অবতারই প্রহসনের লক্ষ্য হইলেও শেষোক্ত অবতারই নাটকীয় চরিত্রের ক্ষীণতম মর্যাদা রক্ষায় সক্ষম হইয়াছে। কর্তা-গিন্নী ও 'বয়' চাকরকে একসঙ্গে সমবেত সঙ্গীতে যোগদান করাইয়া ইহাতে রসসৃষ্টি করা হইয়াছে; অতএব এই রস আর যাহাই হউক, নাটকীয় রস নহে। জীবনের মূলে সুগভীর দৃষ্টির অভাব থাকিলে প্রত্যক্ষদৃষ্ট চরিত্রই হউক কিংবা কল্পিত চরিত্রই হউক, কাহারও দ্বারা রসসৃষ্টি সম্ভব হয় না।

কোন্ বিষয় যে যথার্থ নাটকের ভিতর দিয়া প্রকাশ করা যাইতে পারে, কোন্ বিষয় যে তাহা পারা যায় না, এই বিষয়ে অমৃতলালের মন একেবারেই সচেতন ছিল না; সেইজন্য স্বদেশী যুগের কতকগুলি রাজনৈতিক বক্তৃতা বা আলোচনা সুদীর্ঘ কথোপকথনের আকারে পরিবেশন করিয়াই তাহা তিনি নাটক, প্রহসন, নক্সা, নাট্যলীলা ইত্যাদি বলিয়া দাবী করিয়াছেন। এই বিষয়ে তাঁহার 'নবজীবন' 'নাট্যলীলা'র কথাই সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ইহার প্রথম দৃশ্যে কংগ্রেস কি কি ভাল কাজ করিয়াছে, দ্বিতীয় দৃশ্যে ভারত-লক্ষ্মীর কলিকাতা পরিক্রমণ ও তৃতীয় দৃশ্যে 'হিমালয় পর্বতে সিংহাসনে ভারতমাতা উপবিষ্টা—সম্মুখে ভারতসন্তানগণ নিদ্রিত' এই চিত্র বর্ণনা করা হইয়াছে। অথচ ইহাকে নাট্যলীলা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যাঁহাদের জন্য আমাদের দেশে নাটক সম্বন্ধে সাধারণের মনে একটি অতি শিথিল ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল, অমৃতলাল তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। কারণ, নাটকের বিষয়-বস্তু ও তাহার পরিবেশন সম্পর্কে তাঁহার মত স্বেচ্ছাচারিতা আর বড় বেশি কেহ অবলম্বন করেন নাই। তাঁহার 'নবজীবন' এবিষয়ে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

বিভিন্ন বিষয়ের কতকগুলি বাতিকগ্রস্ত চরিত্র অবলম্বন করিয়া অমৃতলাল 'বাহবা বাতিক' নামক একখানি প্রহসন রচনা করেন। ইহার মধ্যে তাঁহার আক্রমণের লক্ষ্য প্রত্নতাত্ত্বিক, ব্যবহারজীবী, বাগ্মী, বৈজ্ঞানিক, স্বদেশপ্রেমিক ও শিক্ষিতা নারী। ইহাদের সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব অন্যত্র

যে ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, এখানেও তাহার কোন ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় না।

স্বদেশী যুগে বিদেশী বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণ বিষয়ক যে আন্দোলন এদেশে দেখা দিয়াছিল, তাহাই সমর্থন করিয়া অমৃতলাল 'সাবাস বাঙ্গালী' নাটকাখানি রচনা করেন। ইহাকে প্রকৃতপক্ষে প্রহসন বলা যায় না; কারণ, ইহার মধ্যে কোন বিষয় লইয়া নাট্যকারের ব্যঙ্গ কিংবা হাস্যরস সৃষ্টি করিবার প্রবৃত্তি প্রকাশ পায় নাই। নাট্যকার ইহাকে সামাজিক নক্সা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা সামাজিক নক্সাও নহে—ইহা সমসাময়িক রাজনৈতিক চিত্র মাত্র। সে যুগের বিলাতী-বর্জন-মূলক স্বদেশী বক্তৃতাগুলি এখানে নাট্যাকারে পরিবেশন করা হইয়াছে। একটি উচ্চ আদর্শ সম্মুখে ছিল বলিয়া ইহাদের ভিতর দিয়া অমৃতলালের ব্যক্তিগত রক্ষণশীল মনোভাবের কোন পরিচয় প্রকাশ পায় নাই। কলেজের ছাত্রদিগের আত্মত্যাগের আদর্শে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাহাদের গুণ কীর্তন করিয়াছেন, এমন কি যে স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি তিনি সর্বদাই বিরূপ মনোভাব পোষণ করিতেন, তাহার মধ্যেও তিনি এখানে মহত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছেন। শিক্ষিতা মহিলা মিসেস গুপ্তার চরিত্রটি সেইজন্যই তিনি গৌরবজনক বলিয়াই কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু 'সাবাস বাঙ্গালী' নাটক, প্রহসন কিংবা নক্সা কিছুই নহে,—ইহা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক (propaganda) রচনা, ইহার প্রায় প্রত্যেক চরিত্রই উচ্চ আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ, সেইজন্য ইহার সংলাপও রাজনৈতিক বক্তৃতা মাত্র। কেবলমাত্র ইহার ইংরেজ ব্যবসায়ীদিগের চরিত্রের মধ্যে সামান্য একটু বাস্তব গুণ প্রকাশ পাইয়াছে।

আনুপূর্বিক একটি কাহিনী অবলম্বন করিয়া অমৃতলালের 'খাসদখল' প্রহসনটি রচিত। এই দিক দিয়া ইহা তাঁহার অন্যান্য প্রহসনের একটি দুর্লভ ব্যতিক্রম। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার পূর্ববর্তী প্রহসনোক্ত কোন কোন চরিত্রেরই অনুরূপ চরিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায়। শিক্ষিতা বধূ যে কি প্রকার ব্যবহারিক জ্ঞানশূন্য, বিধবা বিবাহের সপক্ষে যে সকল যুক্তিতর্কের অবতারণা করা হইয়া থাকে তাহা যে কত অসার, তাহাই প্রধানত এই প্রহসনে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অমৃতলালের প্রহসন রচনার অন্যান্য প্রায় সকল আঙ্গিকই ইহার মধ্যেও ব্যবহৃত হইয়াছে। একটি আনুপূর্বিক কাহিনী থাকা সত্ত্বেও ইহার প্রায় কোন চরিত্রই বিশিষ্ট নাটকীয় রূপ লাভ

করিতে পারে নাই, তাঁহার অন্যান্য প্রহসনের মত প্রত্যেকটি চরিত্রই এখানে আদর্শ বা ছাঁচরূপেই উপস্থিত করা হইয়াছে।

অমৃতলালের 'খাসদখল' প্রহসনটি সেকালে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। ইহা মোট তেরটি দৃশ্য-সম্বলিত তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট প্রহসন। মূল নাট্যকাহিনী আরম্ভ হইবার পূর্বে ইহাতে কলি, রতি ও মর্ত্যবাসিগণকে লইয়া একটি 'পূর্বরঙ্গ' সংযোজিত হইয়াছে। সংক্ষেপে ইহার নাট্যকাহিনী বর্ণনা করা যাইতেছে :

লোকেনবাবু আলিপুরের নামজাদা উকিল। তাঁহার অর্থের অভাব নাই—তিনি কয়েকজন দুঃস্থ অভাগাকে প্রতিপালনও করিতেছেন। তিনি মনে-প্রাণে আধুনিক এবং বিধবা বিবাহের সমর্থক। তাঁহার স্ত্রী মোক্ষদাও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা এবং কবিযশঃপ্রার্থিনী। ইতিমধ্যেই তাঁহার কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি যে সর্বপ্রকার ধর্মীয় সংস্কারকে অতিক্রম করিয়াছেন তাহা অন্য পাঁচজনকে জানাইবার জন্য তাঁহার চেষ্টার অন্ত নাই। শেলী, কীট্‌স্ ও শেক্সপীয়রের উদ্ধৃতি-ভারাক্রান্ত তাঁহার কথাবার্তা হইতে বুঝা যায় যে, ইংরেজী কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রেও তিনি বিচরণ করিয়াছেন। প্রহসনের সুরুতেই জানা গেল, এহেন মোক্ষদার সামান্য জ্বর হইয়াছে। লোকেনবাবু তাঁহার বসিবার ঘরে মক্কেলদের লইয়া ব্যস্ত থাকায় মোক্ষদাকে সময়মত দেখাশুনা করিতে পারেন নাই। স্বামীর এই অবজ্ঞামিশ্রিত ঔদাসীন্যে অভিমানাহত হইয়া মোক্ষদা তাঁহার সঙ্গিনী গিরিবালার নিকট অভিযোগ করিলেন। গিরিবালার স্বামী নন্দলাল বিবাহের অল্প কয়েকদিন পরেই গিরিবালাকে ত্যাগ করিয়া নিরুদ্দিষ্ট হয়। অসহায় অবস্থায় গিরিবালা লোকেনবাবুর বাটীতে আশ্রয় লাভ করে। লোকেনবাবু তাঁহার কাজকর্ম সারিয়া অসুস্থা স্ত্রীর সহিত দেখা করিতে আসিলেন এবং অভিমানিনী স্ত্রীর অল্পকটু অভিযোগ-বাণী শুনিবার পর বিলাত-ফেরৎ ডাক্তার মিত্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। পরে স্ত্রীকে কিছুটা সুস্থ দেখিয়া একটি জরুরী 'কেস' করিবার জন্য কাছারীর উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িলেন।

কিছুদিন হইতে অত্যধিক কাজের চাপে লোকেনবাবুর শরীর ভাল যাইতেছিল না। সেইজন্য কাছারীতে সওয়াল করিতে করিতেই তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন। ভৃত্যরা ধরাধরি করিয়া লোকেনবাবুকে তাঁহার ঘরে আনিয়া শোওয়াইয়া দিল। স্বামীর অবস্থা দেখিয়া মোক্ষদা অত্যন্ত উত্তেজিত ও

ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি সহরের তিন-চারজন নামকরা ডাক্তারকে একই সঙ্গে ডাকিয়া পাঠাইলেন, সঙ্গে একজন নামকরা কবিরাজকে আনা হইল। এতগুলি ভিন্ন মতের চিকিৎসক-চক্রের মধ্যে পড়িয়াও লোকেনবাবুর আরোগ্যলাভের কোন চিহ্ন দেখা গেল না। অবশেষে ডাক্তার ব্যানার্জীই পরামর্শ দিলেন যে, এতগুলি ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে থাকিলে রোগীর কিছু উপকার হইবে না : তাহার পরিবর্তে কোন পাহাড়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়া হাওয়া বদল করিতে পারিলে উপকার হইতে পারে। লোকেনবাবু ডাক্তারের পরামর্শ মত হাওয়া বদল করিতে গেলেন। তিনি অল্পদিনের মধ্যেই সুস্থ হইয়া উঠিয়া তাঁহার রোগমুক্তির সংবাদ দিয়া স্ত্রী মোক্ষদাকে একখানি চিঠিও দিলেন। এই সংবাদে মোক্ষদা খুসী হইলেন। একদিন মোক্ষদা তাঁহার শিক্ষিতা বান্ধবীবর্গের সহিত যখন আলাপ করিতেছিলেন, সেই সময়ে বাড়ীর পরিচারিকা আহ্লাদী আসিয়া সংবাদ দিল যে লোকেনবাবু যেখানে স্বাস্থ্যান্বেষণে গিয়াছিলেন, সেখানকার এক পাহাড়ে বেড়াইতে গিয়া বাঘের কবলে পড়িয়া সম্ভবত মারা গিয়াছেন। তারপর চার-পাঁচদিন দিবারাত্র অন্বেষণ করিয়াও লোকেনবাবুর কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। পর্বতের একস্থানে তাঁহার নিয়তসঙ্গী একতারা ও পানের ডিবাটি পড়িয়া ছিল এবং তাহার পাশেই রক্তের দাগ থাকায় সকলে সিদ্ধান্ত করিল যে লোকেনবাবুকে বাঘে লইয়া গিয়াছে।

এইবার মোহিতবাবুর পরিচয় দেওয়া দরকার। মোহিতবাবুও অল্পস্বল্প কাব্যচর্চা করিয়া থাকেন। তাঁহার সঠিক পরিচয় কাহারও জানা নাই। বন্ধুত্বসূত্রে লোকেনবাবুর পরিবারের সকলের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। মোক্ষদার প্রতিই তাঁহার সবিশেষ দৃষ্টি। মোক্ষদার সামান্য কিছুতেই তিনি অতিরিক্ত আবেগ প্রকাশ করিয়া থাকেন। মোহিত-বাবু প্রথমাবধি মোক্ষদা সম্বন্ধে এক দুর্বলতা মনের মধ্যে পোষণ করিতেছিলেন। এক্ষণে লোকেনবাবুর মৃত্যুসংবাদে তিনি বিধবা মোক্ষদাকে বিবাহ করিবার মনস্থ করিলেন এবং লোকেনবাবুর মৃত্যু-সংবাদ-স্তম্ভিত পরিবেশের মধ্যে আপনার গোপন বাসনা চরিতার্থ করিবার সম্ভাবনায় অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে আনন্দ প্রকাশ করিলেন। মোক্ষদাও লোকেনবাবুর বিরহে বেশী দিন মুহ্যমান রহিলেন না। শীঘ্রই তিনি মোহিতবাবুর সহিত বিবাহে মত দিলেন। মোক্ষদা এক অদ্ভুত যুক্তি দেখাইয়া বলিলেন,

'লোকেনবাবু বৈধব্যযন্ত্রণা দেখিতে পারিতেন না এবং চিরকালই তিনি বিধবা-বিবাহের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন; অতএব মোক্ষদা যদি দীর্ঘদিন বিধবা থাকেন, তবে লোকেনবাবুর আত্মা কষ্ট পাইবে।' প্রস্তাবিত বিবাহ-সংবাদে কেহ কেহ খুসি হইলেও লোকেনবাবুরই অন্নে প্রতিপালিত সরলপ্রাণ নিতাই এবং লোকেনবাবুর পিসতুতো ভাই সুরেশ অসন্তুষ্ট হইল। সুরেশ ইতিমধ্যে সংবাদ পাইয়াছে যে, মোহিতবাবু অন্যত্র বিবাহ করিয়াছেন এবং প্রথমা পত্নীকে ত্যাগ করিয়া মোক্ষদাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। সুরেশ যে-কোন প্রকারে এই বিবাহ বন্ধ করিতে উদ্যোগী হইল। সে এই ব্যাপারে গিরিবালার সাহায্য প্রার্থনা করিল। প্রকৃত প্রস্তাবে এই মোহিতবাবুই গিরিবালার নিরুদ্দিষ্ট স্বামী নন্দলাল। বিবাহের পরদিন হইতেই দুইজনের দেখাসাক্ষাৎ নাই। এখন নাম ভাঁড়াইয়া লোকেনবাবুর পরিবারের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। সুরেশ গিরিবালাকে সমস্ত সংবাদ জানাইল।

এদিকে মোহিতবাবুর সহিত মোক্ষদার বিবাহের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছে। বিবাহ-বাসরে মোহিতবাবু বরবেশে উপস্থিত হইয়াছেন। বিবাহ-পরিচালকও উপস্থিত আছেন। এমন সময় সন্ন্যাসিবেশে লোকেনবাবুকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মোক্ষদা ও মোহিতবাবু সম্মুখে ভূত দেখার মত চমকাইয়া উঠিলেন। সকলের চোখে-মুখে স্তম্ভিত বিস্ময় লক্ষ্য করিয়া লোকেনবাবু জানাইলেন যে, তিনি জীবন্ত মানুষই, অন্য কিছু নহেন। তাঁহাকে বাঘে খায় নাই—পা পিছলাইয়া তিনি পাহাড়ের নীচে পড়িয়া গিয়াছিলেন। জ্ঞান হইবার পর দেখেন যে, তিনি এক নবীন দিব্যকান্তি সন্ন্যাসীর পাশে এক গুহায় তৃণশয্যায় শায়িত রহিয়াছেন। ইহার পরের ঘটনা অতি সাধারণ। মোক্ষদা লোকেনবাবুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মার্জনা ভিক্ষা করিল এবং অত্যধিক স্বাধীনতা দেওয়াতেই স্ত্রী আজ এই অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে বুঝিয়া লোকেনবাবুও মোক্ষদাকে ক্ষমা করিলেন এবং মোহিতবাবুর সহিত তাঁহার পরিত্যক্তা স্ত্রী গিরিবালার মিলনের মধ্য দিয়া প্রহসনের মিলনান্তক পরিসমাপ্তি সূচিত হইল।

উপরিলিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতেই বুঝা যাইবে যে, নাট্যকাহিনীর মধ্যে নাটকীয় বৈচিত্র্য বলিতে কিছু নাই। তবে নাট্যকাহিনীটি একটি হাস্যতরল প্রবাহের মধ্য দিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সহজ গতিতে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে এবং এই গুণেই প্রহসনটি বিশেষ জনপ্রিয় হইতে

পারিয়াছিল। হাস্যরসাত্মক রচনামাত্রেই প্রধানত যুগরুচির উপর নির্ভর করিয়া থাকে। যে যুগ-পরিবেশকে লইয়া প্রহসনটি রচিত হইয়াছিল, আমরা আজ তাহা হইতে বহু দূরে চলিয়া আসিয়াছি বলিয়া ইহার হাস্যরসধারায় আজ আর তেমন অভিস্নাত হই না।

এই প্রহসনের নায়িকা মোক্ষদার চরিত্র রূপায়ণের দিকে নাট্যকারের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তৎকালীন এক শ্রেণীর শিক্ষিতা স্ত্রীর সার্থক রূপায়ণ এই মোক্ষদা চরিত্রটি। আপন স্বামীর মঙ্গল-কামনায় পরিচারিকা মঙ্গলচণ্ডীর নাম লইলে মোক্ষদা তাহাও সহ্য করিতে পারে না, ইহার পরিবর্তে প্রভুর নাম লইতে বলে। বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর সমাবেশে মোক্ষদা চরিত্রটি স্ফুটতর হইয়াছে।

এই প্রহসনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় চরিত্র নিতাই। সে তাহার বিচিত্র ইংরেজী ভাষণের ভঙ্গিতে একটি লোকপ্রিয় চরিত্র হইয়া উঠিয়াছে। তাহার 'জ্যাঠাইমা, আর ইউ ইজ দি কাটিং বাঁশ'—এই ধরণের বিচিত্র ইংরাজী একসময়ে লোকের মুখে মুখে ফিরিত। নিতাই সরলপ্রাণ—দেবদ্বিজে তাহার আন্তরিক ভক্তি আছে; কিন্তু প্রভুগৃহের বিরুদ্ধ আবহাওয়ায় থাকিতে হয় বলিয়া মুখে ঈশ্বরবিদ্বেষের কথা উচ্চারণ করে। অথচ কাহারও অসুখ করিলে লুকাইয়া দেবতার স্থানে মানৎ করিতে যায়। একবার মন্দিরে পূজা দেওয়ার সময় ঠাকুরদার হাতে তাহার ধরা পড়িয়া যাইবার একটি অসহায় অথচ মধুর ছবি নাট্যকার উপহার দিয়াছেন। নাটকের উল্লেখযোগ্য মুহূর্তগুলিকে নিতাই তাহার হাস্যরসের ঝর্ণাধারায় সজীব করিয়া রাখিয়াছে।

'খাসদখলে' অমৃতলাল তৎকালীন জীবনচর্চার অনেক কিছুকেই ব্যঙ্গ করিতে চাহিয়াছেন। স্ত্রীশিক্ষা, বিধবা-বিবাহ, কথায় কথায় ইংরাজী বলা, দেবদ্বিজে ভক্তিহীনতা—অনেক কিছুই তাঁহার ব্যঙ্গের বিষয়ীভূত। কিন্তু সেই ব্যঙ্গের মধ্যে জ্বালা অল্প। তৎকালীন একশ্রেণীর শিক্ষিতা স্ত্রীকুলের উৎকট জীবনচর্চার প্রতি নাট্যকারের ব্যঙ্গ সহজলক্ষ্য। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তৃত হইতেছে—নারীরা বহুদিনের সামাজিক অবরোধ ভেদ করিয়া বাহিরে আসিতেছেন, বোটানিক্যাল গার্ডেনে তাঁহাদের বনভোজন হইতেছে। নারী প্রগতির চিহ্নগুলি দেখা দিয়াছে; কিন্তু সমাজে স্থিতিস্থাপকতা দেখা দেয় নাই। সেই যুগেরই ছবি 'খাসদখলে' পাওয়া যাইবে। বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে নাট্যকারের ধারণা যে খুব শ্রদ্ধাশীল ছিল না, তাহা প্রথমত নাটকের পরিণামদৃষ্ট

হইতে বুঝা যায়। দ্বিতীয়ত, বিধবা-বিবাহের স্বরূপটি নাট্যকার গিরিবালার মুখ দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে মোহিতবাবু গিরিবালাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, 'বিধবা বিবাহ কি মন্দ?' তাহার উত্তরে গিরিবালা জানাইয়াছে, 'আকাশ-পিদ্দিম কি চাঁদ?' এই অংশটি যেমন প্রথম শ্রেণীর নাটকীয় সংলাপের দৃষ্টান্তস্থল, তেমনি ইহা বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে নাট্যকারের মনোভঙ্গীরও পরিচায়ক।

তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যটিতে নাট্যকার হিসাবে অমৃতলালের দুর্বলতা প্রকাশ পাইয়াছে। দৃশ্যের প্রারম্ভেই মোহিতবাবুর স্বগতোক্তি সার্থক হয় নাই। তাহা ছাড়া, এই দৃশ্যে খোঁড়া লোচনের মোহিতবাবুকে অভিবাদন জানাইতে আসা, বঙ্গচন্দ্রের পূর্ববঙ্গীয় ভাষা, তোৎলা প্যারীর তোৎলামি, খোনা নেপালের অনুনাসিকতা—সবই একপ্রকার জোর করিয়া নাটকের মধ্যে আনা হইয়াছে। ইহাদের কেহই উচ্চশ্রেণীর রসরসিকতার গৌরব দাবী করিতে পারে না। আঙ্গিকের দিক দিয়া এই প্রহসনখানির উপর দীনবন্ধুর নাটকের প্রভাব আছে।

এই প্রহসনের অন্তর্ভুক্ত পনেরটি সঙ্গীত ইহার বিশিষ্ট সম্পদ। গীতগুলি ঘটনাপ্রবাহের সহিত সুপ্রযুক্ত, বাণীবিন্যাসভঙ্গীও মনোরম। তন্মধ্যে 'আমরা এবার বিলাত গিয়ে বেচবো দই', 'সখি বিধিমত রীতিমত হও শোকাকুল' এবং 'হলো না ইজ দি নতুন বন্দোবস্ত' খুবই জনপ্রিয় হইয়াছিল। তবু এই প্রসঙ্গে ইহাও বলিতে হইবে যে, দুই একটি গান আধুনিক রুচির বিচারে পীড়াদায়ক। যেমন দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে গিরিবালার স্বামীপ্রশস্তিমূলক গানটি। কিন্তু ইহা তৎকালীন লোকরুচির অনুগামী ছিল বলিয়াই বর্তমান কালের বিরূপ সমালোচনার ক্ষেত্রেও কিছুটা সঙ্কুচিত বলিয়া বোধ হইবে।

'খাসদখলে'র অব্যবহিত পরে 'নবযৌবন' নামক একখানি অকিঞ্চিৎকর নাটক রচনার তের বৎসর পরে আর মাত্র দুইখানি রসরচনা বাঙালী বিদগ্ধ সমাজে নিবেদন করিয়া রসরাজ অমৃতলালের রস পরিবেশন চিরদিনের জন্য ক্ষান্ত হইয়া যায়। তাঁহার শেষ দুইখানি প্রহসনের নাম 'ব্যাপিকা বিদায়' ও 'বন্দে মাতরম্'—ইহারা একই বৎসর (১৯২৬) রচিত হইয়াছিল। বাংলা নাট্যসাহিত্যের আধুনিক যুগ বহুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, তথাপি অমৃতলাল ইহার মধ্যযুগের ধারা অনুসরণ করিয়া

এই যুগেও এই দুইখানি প্রহসন রচনা করেন। সুদীর্ঘকাল ব্যবধানে রচিত হইলেও প্রথমোক্ত প্রহসনটির মধ্যে তাঁহার বিষয়-বস্তুর নূতনত্ব কিছুই নাই, ইহাতেও শিক্ষিতা নারীর বিরুদ্ধে অহেতুক আক্রমণ ও অন্যান্য বিষয়ক আদর্শ বা ছাঁচ (type) চরিত্রের সমাবেশ হইয়াছে। রক্তমাংসের চরিত্র ইহার মধ্যেও নাই। দ্বিতীয় প্রহসনটির মধ্যে তাঁহার অন্যান্য গতানুগতিক বিষয়ের সঙ্গে একটি নূতন বিষয়ও স্থান লাভ করিয়াছে, তাহা হিন্দু-মুসলমান বিবাদ। সমসাময়িক কালে বাংলার কোন কোন স্থানে এই যে নূতন সমস্যা জাগিয়া উঠিয়াছিল, এই প্রহসনে তাহারই প্রথম পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। অমৃতলালের শেষ রচনা তাঁহার নির্বাণোন্মুখ জীবনের সর্বশেষ দীপ্তিতে ভাস্বর হইয়া উঠিতে পারে নাই।

অমৃতলালই বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যযুগের ধারাটি বিংশ শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশ কাল পর্যন্ত অগ্রসর করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার যুগের তিনি সর্বশেষ প্রতিনিধি ছিলেন। বিংশ শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশ কাল ব্যাপিয়া বর্তমান থাকিলেও তিনি নিজের জীবন কিংবা সাধনার মধ্যে বিংশ শতাব্দীর কোন আদর্শই গ্রহণ করেন নাই। এমন কি গিরিশচন্দ্রও তাঁহার শেষ জীবনে যেমন বাংলা নাট্যসাহিত্যের আধুনিক যুগের আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন, অমৃতলাল তাহা হন নাই। অমৃতলাল দ্বিজেন্দ্রলাল-রবীন্দ্রনাথের যুগে বর্তমান থাকিয়াও তাঁহাদের যুগান্তকারী প্রভাবকেও নিজের সাধনার মধ্যে স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই। তাঁহার এই দুর্দমনীয় রক্ষণশীলতার জন্যই তিনি বাংলা নাট্যসাহিত্যের আধুনিক যুগে কোন স্বাক্ষর রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। সেইজন্য বিংশ শতাব্দীতে উত্তীর্ণ হইয়া নূতন যুগ-পরিবেশের মধ্যে তাঁহার কোন নাটক কিংবা প্রহসন রচনাই আর সার্থকতা লাভ করিতে পারিল না।

পঞ্চম অধ্যায়

রাজকৃষ্ণ রায়

(১৮৭৫—১৮৯৩)

গিরিশচন্দ্র ঘোষকে অনুসরণ করিয়া বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যযুগে যাঁহারা আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রাজকৃষ্ণ রায় কেবল মাত্র যে অন্যতম তাহাই নহে, তিনিই সর্বপ্রধান। তবে তিনি অনুকরণকারীই ছিলেন, মৌলিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না এবং গিরিশচন্দ্রের সকল দোষগুণই যে তিনি অনুকরণ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাও নহে—গিরিশচন্দ্রের কেবলমাত্র ভক্তিমূলক পৌরাণিক নাট্যরচনার ধারাটিই তিনি কতকটা সাফল্যের সঙ্গে অনুকরণ করিয়াছেন, তাঁহার অন্য কোন বিষয়ের দিকে তিনি বিশেষ অগ্রসর হন নাই; এমন কি, যেখানে অগ্রসরও হইয়াছেন, সেখানেও সফলকাম হইতে পারেন নাই।

এক দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিতে গেলে ভক্তিমূলক পৌরাণিক নাটক রচনায় রাজকৃষ্ণ একটু বিশেষত্ব দান করিতেও সক্ষম হইয়াছিলেন। গিরিশ-চন্দ্রের ভক্তিবাদের মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের শ্রদ্ধা-ভক্তির কথা প্রকাশ পাইয়াছে। ভক্তি, বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণের মধ্যে সেখানে কোন দ্বিধা, সংশয় কিংবা কামনা নাই। কিন্তু রাজকৃষ্ণের ভক্তিবাদের সঙ্গে মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্যের আধ্যাত্মিক আদর্শেরও সংমিশ্রণ অনুভব করিতে পারা যায়। চণ্ডীর ভক্ত শ্রীমন্তকে মশানে কোটালের হস্ত হইতে যেমন চণ্ডী আসিয়া স্বয়ং রক্ষা করিয়া তাঁহার উৎপীড়কের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিলেন, ধর্ম-ঠাকুরের ভক্ত লাউসেনকে প্রতিপদেই ধর্মঠাকুর রক্ষা করিয়া তাঁহার উৎপীড়ক মহামদ পাত্রকে যেমন লাঞ্ছিত করিয়াছিলেন, তেমনই বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া তাঁহার উৎপীড়ক হিরণ্যকশিপুকেও বিষ্ণু স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া বিনাশ করিলেন। অহৈতুকী ভক্তির সমুচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শ যাহাই থাকুক না কেন, সাধারণ মানুষ তাহা লইয়া তৃপ্ত হইতে পারে না। মুখে যে যাহাই বলুক না কেন, প্রত্যেকেই তাহার আধ্যাত্মিক সাধনার একটা প্রত্যক্ষ ফল প্রার্থনা করিয়া থাকে। গিরিশচন্দ্রের 'জনা'র বিদূষক-চরিত্র তাহার শ্রদ্ধা ভক্তির বিনিময়ে কোন প্রত্যক্ষ ফল লাভ করিতে পারে নাই,

প্রহ্লাদও তাহার ভক্তির জন্য কোন প্রত্যক্ষ ফল কামনা করে না সত্য, কিন্তু তথাপি সে তাহা লাভ করিয়াছে। শ্রদ্ধা ভক্তি অনুভূতি-সাপেক্ষ ও ভাব-সর্বস্ব (abstract) মাত্র, কিন্তু ইহার পরিবর্তে যাহা দ্বারা একটা কিছু প্রত্যক্ষ ফল লাভ হইল, তাহার আবেদন জনসাধারণের মধ্যে অধিক। প্রহ্লাদ ইহলোকে পিতার হস্ত হইতে নিষ্ঠুর নির্যাতন মাত্র লাভ করিয়া পরলোকে গিয়া যদি চিরবৈকুণ্ঠবাসী হইত, তাহা হইলেও সাধারণের মন তৃপ্তি পাইত না, বরং তাহার পরিবর্তে ইহলোকেই বার বার যে বিষ্ণু তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া কঠিন পরীক্ষা হইতে তাহাকে বার বারই পরিত্রাণ করিয়াছেন এবং পরিশেষে নৃসিংহ রূপ ধারণ করিয়া তাহার অত্যাচারীকে স্বহস্তে বিনাশ করিয়াছেন, ইহাতে দর্শকের মন অধিকতর তৃপ্তিলাভ করিয়াছে। মঙ্গল-কাব্যের দেবদেবীগণও তাহাই করিয়াছেন—তাঁহারা ভক্তকে রক্ষা করিয়াছেন এবং অভক্তকে বিনাশ করিয়াছেন। দেবভক্তি দ্বারা মঙ্গলকাব্যে যে ফল লাভ হইয়াছে তাহা প্রত্যক্ষ, তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া রাজকৃষ্ণের ভক্তিবাদ গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া ইহার সঙ্গে একটি জাতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার যোগ স্থাপিত হইয়াছিল। সেইজন্য রাজকৃষ্ণের 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' প্রমুখ ভক্তি-মূলক নাটক সর্বসাধারণের প্রীতিকর হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের ভক্তিমূলক নাটক সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল দর্শকের প্রিয়, কিন্তু রাজকৃষ্ণের ভক্তিমূলক নাটক সাধারণ বাঙ্গালী দর্শকের নিকট আদরণীয়।

কিন্তু ভক্তিরসের প্লাবনে রাজকৃষ্ণের মধ্যে প্রকৃত নাট্যরসবোধ প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল। কাহিনীর ধারা অনুসরণ করিয়া বিশিষ্ট একটি আধ্যাত্মিক ভাবের যে যথাযথ বিকাশ, তাহা রাজকৃষ্ণের নাটকে দেখিতে পাওয়া যায় না; কাহিনী সংস্থাপনার ভিতর দিয়া তিনি তাঁহার ভক্তিরসের বিকাশের পরিবর্তে তিনি ইহার যথেষ্ট বিকাশ দেখাইয়াছেন; সেইজন্য তাঁহার ভক্তিমূলক রচনাগুলি যথার্থ নাটক না হইয়া যাত্রা হইয়াছে। এইজন্যই ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করিয়া রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি প্রত্যক্ষ করিতেছেন, পাতালে নাগকন্যাগণ হরিনাম কীর্তন করিতেছে, তরণীসেন রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে দাঁড়াইয়াও রামনাম করিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতেছে। এই সকল পরিকল্পনার মধ্যে কোন নাটকীয় গুণ নাই, কিন্তু সাধারণ জনমন অধিকার করিবার যে শক্তি আছে, তাহাতেই রাজকৃষ্ণের ভক্তিমূলক নাটকগুলি সমাদর লাভ করিতে পারিয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যযুগের প্রবর্তক মনোমোহন বসু যে কি ভাবে যাত্রা বা গীতাভিনয়ের ধারাটি অনুসরণ করিয়া নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। সমগ্র মধ্যযুগ ব্যাপিয়া ইহার প্রভাব যে অব্যাহত ছিল, রাজকৃষ্ণ রায়ই তাহার অন্যতম প্রমাণ। রাজকৃষ্ণের পৌরাণিক নাটক মাত্রই যাত্রা, প্রকৃত নাটক নহে; অথচ পূর্বেই বলিয়াছি, এই পৌরাণিক নাটক রচনাতেই তাঁহার একমাত্র সার্থকতা। অতএব একদিক দিয়া যেমন তিনি এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের নিকট ঋণী, তেমনি অন্য দিকে এই যুগের প্রবর্তক মনোমোহন বসুর নিকটও তাঁহার ঋণ অস্বীকার করিতে পারা যায় না। এই উভয় প্রভাবের মধ্যবর্তী হওয়ায় তাঁহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশের কোন সুযোগ হয় নাই।

এই সকল প্রভাবের কথা ছাড়িয়া দিলেও রাজকৃষ্ণের স্বকীয় যে কোন বিশিষ্ট প্রতিভা ছিল, তাহা সহজে অনুভব করা যায় না। যে সুগভীর অনুভূতি-শীলতা থাকিলে লোকচরিত্র সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিতে পারা যায়, তাহা রাজকৃষ্ণের একেবারেই ছিল না, সেইজন্য তাঁহার নাটকে কোন চরিত্র সৃষ্টির সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায় না। সামাজিক অভিজ্ঞতাও তাঁহার ব্যাপক ছিল না। সেইজন্য কোন সামাজিক নাটক যেমন তিনি রচনা করিতে পারেন নাই, তেমনই যে সামান্য কয়খানি 'প্রহসন' তিনি রচনা করিয়াছেন, তাহাতেও শোচনীয় ভাবে ব্যর্থকাম হইয়াছেন। এক কথায় বলিতে গেলে নাট্যরচনায় রাজকৃষ্ণের কোন প্রেরণা ছিল না, কেবলমাত্র প্রয়োজনীয়তার তাগিদে তাঁহাকে নাট্যরচনায় হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যযুগের অন্যান্য নাট্যকারের মতই তিনি রঙ্গমঞ্চ পরিচালনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, সেই-জন্যই তাঁহাকে নূতন নূতন নাটক পরিবেশন করিবার ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। অন্তরে প্রেরণা না থাকিলে বাহিরের তাগিদে সাধারণত যে বস্তু সৃষ্টি হইয়া থাকে রাজকৃষ্ণের নাটকগুলিও তাহাই হইয়াছে, ইহারা অন্তরের দিক দিয়া ত নাটক হয়ই নাই, এমন কি বাহিরের দিক দিয়াও অনেক সময় নাটকের রূপ লাভ করিতে পারে নাই। অলৌকিকতা ইহাদের মধ্যে অন্যায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। সর্বসাধারণের মধ্যে অলৌকিকতার যে একটি সুলভ আবেদন আছে, তাহার ফলেই সমসাময়িক কালে ইহারা ক্ষণিক আকর্ষণ সৃষ্টি করিলেও চিরন্তন সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইহাদের যে কোনই স্থান নাই, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। রাজকৃষ্ণের প্রায় প্রত্যেক নাটকই অলৌকিক

দৃশ্যে ভারাক্রান্ত। যাদুবিদ্যার (magic) প্রতি শিশুমনের যেমন একটা অর্থহীন আকর্ষণ থাকে, এই শ্রেণীর অলৌকিক দৃশ্যগুলির প্রতিও সাধারণ দর্শকের তেমনি একটি শিশুসুলভ আকর্ষণ ছিল, কিন্তু তাহার কার্যকারিতা ক্ষণিক বলিয়াই সাহিত্যের ইতিহাসে ইহাদের স্থান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ।

রাজকৃষ্ণের কল্পনাশক্তি ছিল না; সেইজন্য রোমান্টিক নাটক রচনায়ও তিনি ব্যর্থকাম হইয়াছেন। অধ্যবসায় দ্বারা তথ্যানুসন্ধানের কোন শক্তি তাঁহার ছিল না—সেইজন্য যে দুই একখানি ঐতিহাসিক নাটক রচনায় তিনি হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহাতেও তিনি সফলকাম হইতে পারেন নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, সামাজিক অভিজ্ঞতা তাঁহার ছিল না বলিয়া সামাজিক নাটক কিংবা প্রহসন রচনাও তাঁহা দ্বারা সম্ভব হয় নাই। তাঁহার মধ্যে সূক্ষ্ম কৌতুকবোধের (wit) অভাব ছিল, তিনি স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন; অতএব প্রহসনের নামে তিনি যে কয়খানি অকিঞ্চিৎকর রচনা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে ব্যঙ্গের ভাবই অধিকতর প্রকাশ পাইয়াছে।

রূপায়ণে যে ত্রুটিই প্রকাশ পাক না কেন, রাজকৃষ্ণের রচনা সমসাময়িক অনেক নাটকের মতই দূষিত নীতি ও রুচি বোধের পরিচায়ক নহে। যে হরিভক্তি তাঁহার পৌরাণিক নাটকগুলি পবিত্র পুষ্পচন্দনে সুরভি করিয়াছে, তাহারই সৌগন্ধ্যে সকল প্রকার নীতি ও রুচিগত দোষ তাঁহার রচনা হইতে দূর হইয়া গিয়াছে। তাঁহার রচনায় কোন কোন স্থলে গ্রাম্যতা প্রকাশ পাইয়াছে সত্য, কিন্তু কোথাও অশ্লীলতা প্রকাশ পায় নাই। তিনি সমসাময়িক নাট্য-রচনার প্রভাব বশত কয়েকখানি প্রহসন রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা দ্বারা কাহাকেও তিনি আঘাত করেন নাই কিংবা আঘাত করিলেও তাহাতে কোন জ্বালা নাই। অমৃতলালের প্রহসনগুলি যে দোষে দোষী, তাঁহার যুগে বাস করিয়াও রাজকৃষ্ণ সেই দোষ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। ব্যক্তি, জাতি কিংবা বিশেষ সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি তাঁহার কোন আক্রোশ ছিল না। গভীর ভাবে কোন বিষয়ই তিনি ভাবিতেন না, সেইজন্য সুগভীর অনুরাগের পরিচয় যেমন তাঁহার রচনার মধ্যে নাই, তেমনই কোন বিরাগের ভাবও তাহাদের ভিতর দিয়া প্রকাশ পায় নাই। কোন কোন সমাজ-ব্যবস্থার তিনি নিন্দা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনি তাহা দ্বারা কাহাকেও আঘাত করেন নাই।

নাট্যসাহিত্য পরিবেশন করিবার মত ভাষার উপর অধিকার রাজকৃষ্ণের ছিল না। সে যুগের এমন কোন লেখক নাই, যাঁহার ভাষা তিনি অনুকরণ

করিবার প্রয়াস পান নাই; কিন্তু কোন অনুকরণই তাঁহার মনঃপূত হয় নাই—এ বিষয়ে তাঁহাকে বার বার নূতন নূতন পরীক্ষা করিতে দেখা গিয়াছে। প্রথমত গৈরিশ ছন্দ অনুকরণ করিয়াই তিনি তাঁহার পৌরাণিক নাটকগুলি রচনা করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু গৈরিশ ছন্দের মূল শক্তি যে কোথায় নিহিত আছে, তাহা তিনি বুঝিতে না পারিয়া তাহা পরিত্যাগ করেন। অতঃপর তিনি নিজেই এক ছন্দের উদ্ভাবন করেন, তিনি তাহার নামকরণ করেন 'পদ্যপংক্তি গদ্য' ছন্দ। বলা বাহুল্য, ইহা গদ্যই—কেবল মাত্র গৈরিশ ছন্দের আকারে লিখিত। ইহার মধ্য দিয়া যে যথার্থ নাটকীয় রস পরিবেশন করা সম্ভব হইতেছে না, তাহা অনুভব করিবামাত্র পুনরায় তিনি গৈরিশ ছন্দেরই দ্বারস্থ হইলেন, এমন কি কতক নাটক উভয়বিধ ছন্দেও রচিত হইল। কালক্রমে উভয়ই পরিত্যাগ করিয়া তিনি সাধারণ গদ্যের আশ্রয় লইলেন। কিন্তু তাঁহার গদ্যেরও কোন রচনা-শৈলী (style) নাই।—ইহা অত্যন্ত নীরস। তিনি তাহা উপলব্ধি করিয়া এই পথে আর অধিক দূর অগ্রসর হইলেন না। কতকগুলি প্রহসন রচনায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমিত্রাক্ষর ছন্দেরও তিনি ব্যর্থ অনুকরণ করিয়াছেন। রাজকৃষ্ণের রচনাগুলি বিষয়ানুসারে এখন স্বতন্ত্রভাবে বিচার করিয়া দেখা যাইতেছে।

সাবিত্রী-সত্যবানের সুপরিচিত কাহিনী অবলম্বন করিয়া রাজকৃষ্ণ একখানি পৌরাণিক নাটক রচনা করেন, নাট্যরচনার ইহাই তাঁহার সর্বপ্রথম প্রয়াস বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সঙ্গীত ইহার মধ্যে এমন প্রাধান্য লাভ করিয়াছে যে, তাহা দ্বারা কাহিনীর একটি ক্ষীণতম সূত্রও রচিত হইতে পারে নাই, সেইজন্য ইহা নাটকীয় মর্যাদা লাভ করিতে পারে নাই। ইহার পর ভরত মুনির নাট্যশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া একখানি বর্ণনাত্মক রচনার পর রাজকৃষ্ণ সুপরিচিত পৌরাণিক নাটক 'অনলে বিজলী' রচনা করেন। ইহার বিষয়বস্তু সীতার অগ্নি-পরীক্ষা। ইহার ঘটনার দৈন্য লেখককে দীর্ঘ ভাবাত্মক বক্তৃতা ও নানা অবান্তর বিষয় দ্বারা পূর্ণ করিতে হইয়াছে বলিয়া নাটক হিসাবে ইহার রচনা ব্যর্থ হইয়াছে।

'তারক-সংহার' নাটকের মধ্যে রাজকৃষ্ণ রায় তাঁহার নাটক রচনার প্রণালী বিষয়ে একটি নূতন পরীক্ষা করিলেন। তাঁহার অন্যান্য পৌরাণিক নাটকে যেমন গিরিশচন্দ্রের অনুকরণে গৈরিশ ছন্দ কিংবা স্বীয় উদ্ভাবিত 'পদ্যপংক্তি গদ্য' ব্যবহার করিয়াছেন, ইহাতে তাহা না করিয়া আদ্যোপান্ত গদ্য ব্যবহার

করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, গৈরিশ ছন্দ সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে না পারিয়াই তিনি 'পদ্যপংক্তি গদ্যে'র উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, পরে ইহারও অসারতা নিজেই উপলব্ধি করিয়া সহজ গদ্যই তিনি অবলম্বন করিলেন। কিন্তু দীর্ঘ সংলাপ ও স্বগতোক্তির যথেচ্ছ ব্যবহারের জন্য গদ্যসংলাপের ভিতর দিয়াও এই নাটকের রসস্ফূর্তি সম্ভব হয় নাই। 'তারক-সংহার' সুদীর্ঘ নাটক, ইহা ছয়টি পূর্ণাঙ্গ অঙ্কে সম্পূর্ণ। ঘটনার বাহুল্য ইহার কেন্দ্রীয় বিষয়-বস্তু আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে। ইহার আদ্যোপান্ত গদ্যসংলাপ বৈচিত্র্যহীন বলিয়াই বিরক্তিকর হইয়া উঠে।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের রামভক্ত তরণীসেন চরিত্রটি অবলম্বন করিয়া রাজকৃষ্ণ 'তরণীসেন বধ' নামক একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। ইহা কৃত্তিবাস-পরিকল্পিত ঘটনাবলীর একটি বৈচিত্র্যহীন নাট্যরূপ মাত্র। অন্যত্র রাজকৃষ্ণ যে বাল্মীকি-রামায়ণের প্রতি আনুগত্য দেখাইয়াছেন, ইহাতে তাহা নাই; কারণ, তরণীসেন চরিত্র বাল্মীকির রামায়ণে নাই। এই নাটক রচনায় রাজকৃষ্ণ মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'মেঘনাদবধ কাব্য' ও গিরিশচন্দ্রের 'রাবণ-বধ' নাটক দ্বারাও প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। ভক্তিরসের আধিক্যে ইহার কাহিনী শিথিলবদ্ধ হইয়াছে, অসংযত হৃদয়োচ্ছ্বাসই ইহার বৈশিষ্ট্য। রাজকৃষ্ণের অন্যান্য পৌরাণিক নাটকের মতই ইহাও অলৌকিক দৃশ্যে ভারাক্রান্ত। এই কাহিনীটির মধ্যে একটি উচ্চাঙ্গ নাটকীয় গুণ বিকাশ করিবার দুর্লভ সুযোগ ছিল —তরণীসেন বিভীষণের পুত্র, বিভীষণ রামচন্দ্রের মিত্র; মিত্র-পুত্র শত্রুভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে রামচন্দ্রের সম্মুখীন হইয়াছে, তাহার সঙ্গে আচরণে রামের মধ্যে একটি নাটকীয় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিবার যে একটি সূক্ষ্ম অবকাশ ছিল, স্থূলদৃষ্টি নাট্যকার তাহা অনুভব করিতে পারেন নাই; সেইজন্য একটি উচ্চাঙ্গ নাটকীয় বিষয় বস্তু নিজের আয়ত্তের মধ্যে লাভ করিয়াও, তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই। যে সূক্ষ্ম দৃষ্টির বলে নাটকীয় চরিত্রের ঘটনার দূঢ় তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায়, রাজকৃষ্ণের মধ্যে তাহার অভাব ছিল বলিয়াই তাঁহার নাটকের সংখ্যাই বৃদ্ধি পাইয়াছে, গুণ বৃদ্ধি পায় নাই।

স্বপরিকল্পিত 'নূতন ধরণের গদ্যে' রাজকৃষ্ণ 'রাজা বিক্রমাদিত্য' নামক একখানি রোমান্টিকধর্মী পৌরাণিক নাটক রচনা করেন। ইহাকে তিনি 'a romantic tragi-comedy' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার 'নূতন ধরণের গদ্যে'র নিদর্শন এই,

বিক্রম। ওঃ, কি ভয়ানক অন্ধকার!
এ'ক কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী,
তাতে আবার বৃক্ষের পর বৃক্ষ—অনন্ত বৃক্ষ।
বিশাল আকাশের ক্ষীণালোক
অরণ্য-হৃদয়ে প্রবেশ ক'র্ত্তে পাচ্ছে না।
যত দূর দেখি—কেবল অন্ধকার!
নৈশ সমীরণ সন্ সন্ শব্দে ব'চ্চে
বৃক্ষ পত্র কম্পিত হচ্ছে,
কিন্তু দেখ্তে পাচ্ছি না।—১।১

নাটকখানি আদ্যোপান্ত এই 'নূতন ধরণের গদ্যে' রচিত। ইহা নূতন ধরণের গদ্য না বলিয়া নূতন প্রণালীতে লিখিত গদ্য বলিয়া উল্লেখ করাই সঙ্গত। নাট্যকার স্বয়ং ইহাকে 'পদ্যপংক্তি গদ্য' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিক্রমাদিত্য সম্পর্কিত নাটক হইলেও ইহাতে নবরত্ন সভা কিংবা কালিদাসের কোন উল্লেখ নাই, বিদূষককে দিয়া নাট্যকার এখানে এক স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য সাধন করাইয়াছেন। ইহার অধিকাংশ চরিত্রই অলৌকিক। যক্ষ, তাল, বেতাল, ভূত, প্রেত, পিশাচই ইহার প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। অতএব ইহাও যথার্থ নাটক বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে না।

রাজকৃষ্ণ রায়ের ভক্তিমূলক পৌরাণিক নাটকের মধ্যে 'প্রহ্লাদ-চরিত্র'ই সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। প্রথম অভিনীত হইবার এক বৎসরের কিছু উর্ধ্বকালমধ্যে ইহার যে সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার ভূমিকায় নাট্যকার উল্লেখ করিয়াছেন, 'এক "প্রহ্লাদ-চরিত্র" নাটকের অভিনয়ে লক্ষাধিক দর্শক সংখ্যা হইয়াছে এবং উক্ত থিয়েটর (বেঙ্গল থিয়েটার) কোম্পানি প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা উপার্জন করিয়াছেন। ইহা আমার পক্ষে বড় সৌভাগ্যের কথা।' বাংলার জনসাধারণের মধ্যে ভক্তিরসের যে একটি সহজ আবেদন আছে, প্রধানত তাহাই অবলম্বন করিয়া নাটকখানি রচিত হইয়াছিল বলিয়াই ইহা এত ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু নাটক হিসাবে বিচার করিতে গেলে ইহার মধ্যে কতকগুলি গুরুতর ত্রুটি লক্ষিত হইবে। বিষ্ণুর বিরুদ্ধে হিরণ্যকশিপুর আক্রোশের বৃত্তান্ত লইয়াই নাটকখানি রচিত, কিন্তু কেবলমাত্র প্রস্তাবনার ভিতর সনকের অভিশাপের যে বিবরণ আছে, তাহার উপরই এই আক্রোশের কারণ নির্দেশ করা হইয়াছে; অবশ্য নাটকের প্রথম দৃশ্যেই বিষ্ণু কর্তৃক হিরণ্যাক্ষ-বধের উল্লেখ আছে, কিন্তু

তাহার কোন কারণের উল্লেখ নাই, তাহাতে এই বিষয়টি নাট্যকাহিনীর ধারা নিয়ন্ত্রিত করিবার মত শক্তিলাভ করিতে পারে না। অতএব বিষ্ণুর প্রতি হিরণ্যকশিপুর আক্রোশের কারণ এই নাটকের মধ্যে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই; সেইজন্যই তাঁহার বিষ্ণু-দ্বেষ কেবলমাত্র অপস্মার বা মূর্ছাগ্রস্ত রোগীর অহেতুক অঙ্গ আস্ফালনের মত বোধ হয়। বিষ্ণুর প্রতি হিরণ্যকশিপুর এই তীব্র আক্রোশের সঙ্গত কারণ যদি নিদেশ করা যাইত, তবে হিরণ্যকশিপুর প্রহ্লাদের প্রতি আচরণও কতকটা সঙ্গত বোধ হইত; অতএব এখানে পিতা হিরণ্যকশিপু পুত্র প্রহ্লাদের প্রতি যে অমানুষিক আচরণ করিয়াছেন, তাহার কারণটি স্পষ্টতর করিয়া তোলা একান্ত আবশ্যক ছিল। নাট্যকার তাহা করিতে পারেন নাই।

প্রহ্লাদ আজন্ম কৃষ্ণভক্ত; সেইজন্য তাহার চরিত্রের কোন ক্রমবিকাশ নাই। এমন কি, যে কৃষ্ণভক্তি তাহার জীবনের একান্ত অবলম্বন, তাহাও কোন ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করিতে পারে নাই, যেন ভক্তিসিদ্ধ হইয়াই সে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। শৈশবেই সে পিতাকে নির্গুণাদ্বৈতবাদের কথা বলিয়াছে,—

> নির্গুণ পুরুষ হরি,
> নির্গুণ হরিরে
> কোন গুণে শর তব পারে পশিবারে?—৩।৪

কিন্তু প্রহ্লাদ যে-হরির গুণ প্রচার করিয়াছে, তিনি নির্গুণ নহেন—তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম পরিকল্পিত সর্বগুণাধার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। নাটকখানির মধ্যে কোন কোন স্থলে এই প্রকার উচ্চ দার্শনিক কথা থাকিলেও, তাহা কাহিনীর মূল রসধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে নাই।

প্রহ্লাদ-জননী কয়াধুর চরিত্রের ভিতর দিয়া নাটকীয় গুণ প্রকাশ করিবার সুযোগ ছিল; একদিকে বিষ্ণুভক্ত সন্তান, অন্যদিকে বিষ্ণুদ্বেষী পতি—এই উভয়ের মধ্যবর্তী হইয়া তাঁহার চরিত্রে নাটকীয় দ্বন্দ্ব বিকাশ লাভ করিয়াছে, নাট্যকার তাঁহার চরিত্রের এই দিকটি প্রকাশ করিয়া তুলিতে কতকটা সফলকাম হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত নাটকখানি কেবলমাত্র হিরণ্যকশিপু কর্তৃক প্রহ্লাদের উপর উৎপীড়নমূলক বৃত্তান্তের তালিকায় পর্যবসিত হইয়াছে। হাস্যরসসৃষ্টির প্রয়াসও স্থূল গ্রাম্যতা-দোষদুষ্ট।

হিরণ্যকশিপু-বধের পরবর্তী ঘটনা অবলম্বন করিয়া রাজকৃষ্ণ রায় ইহার পর 'প্রহ্লাদ-মহিমা' নামক একখানি স্বতন্ত্র নাটক রচনা করেন। মাতা ও গুরুর অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া সিংহাসন প্রত্যাখ্যানপূর্বক কি ভাবে যে প্রহ্লাদ হরিনাম প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে একাকী বহির্গত হইয়া দস্যুহস্তে পতিত হইয়াছিল, তাহারই কাহিনী ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, হরিনামের কৃপায় দস্যুহস্ত হইতে তাহার অলৌকিক উপায়ে নিষ্কৃতি ঘটিয়াছিল। ইহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যও হরিনাম কীর্তন করিয়া থাকেন। এই প্রকার সর্বতোমুখী হরিনাম প্রচারই 'প্রহ্লাদ-মহিমা'র উদ্দেশ্য। অলৌকিক ঘটনার সমাবেশে ইহার নাটকীয় গুণ বিনষ্ট হইয়াছে। বাংলা নাট্যসাহিত্যের আদিযুগের অনুবর্তন করিয়া নাট্যকার ইহাতে ত্রিপদী ও পয়ার ছন্দে রচিত পদ্য-সংলাপ ব্যবহার করিয়াছেন। তাহাতে অবাস্তবতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। 'প্রহ্লাদ-চরিত্রে'র মত এই নাটকখানি এত জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে পারে নাই।

যদুবংশ ধ্বংসের বিয়োগান্তক কাহিনী অবলম্বন করিয়া 'যদুবংশ ধ্বংস' নামে রাজকৃষ্ণ একখানি নাটক রচনা করেন। ইহার ঘটনাসমূহ যেমন সুবিন্যস্ত নহে, চরিত্র-কল্পনাও তেমনি সার্থক হইতে পারে নাই, অথচ ইহার মধ্যে যথার্থ নাটকীয় উপকরণের অভাব ছিল না। অনুভূতির অভাব থাকিলে যাহা হয়, ইহাতেও তাহাই হইয়াছে। ইহাতে কেবলমাত্র ঘটনার তালিকা আছে, অথচ অনুভূতির স্পর্শ লাভ করিলে তুচ্ছ ঘটনাও যেমন মহান্ হইয়া উঠিতে পারে, ইহাতে তাহার লেশমাত্রও পরিচয় পাওয়া যায় না। সেইজন্য ইহার পরিণতিতে একটি বিষাদঘন পরিবেশ রচিত হইতে পারে নাই। সংস্কৃত নাটকের আদর্শে ইহা মিলনান্তক করিবার জন্য ইহার শেষ দৃশ্যে 'সিংহাসনে লক্ষ্মীর সহিত বিষ্ণু উপবিষ্ট' এই চিত্রটির অবতারণা করা হইয়াছে।

মধ্যযুগের বাংলায় 'গঙ্গা-মঙ্গল' বা 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী' নামক এক শ্রেণীর ভক্তিরসাত্মক আখ্যানমূলক কাব্য প্রচলিত ছিল। তাহাতে ভগীরথ কর্তৃক মর্ত্যে গঙ্গা আনয়নের বৃত্তান্ত ও গঙ্গামাহাত্ম্য কীর্তিত হইত। তাহারই ধারা অনুসরণ করিয়া রাজকৃষ্ণ রায় 'গঙ্গা-মহিমা' নামক একখানি নাটক রচনা করেন। অলৌকিক কাহিনী ও চরিত্র দ্বারা ইহা পরিপূর্ণ; কাহিনী বর্ণনাচ্ছলে ইহাতে সৃষ্টিতত্ত্বের অনেক নিগূঢ় কথারও অবতারণা করা হইয়াছে। অতএব ইহা যথার্থ নাটকীয় মর্যাদা লাভ করিতে পারে নাই।

দ্বৈতবনে চিত্রসেন গন্ধর্ব কর্তৃক কৌরবদিগের বন্ধন ও বনবাসী যুধিষ্ঠিরের নিকট দুর্বাসার সশিষ্য আতিথ্য গ্রহণের বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া রাজকৃষ্ণ 'দুর্বাসার পারণ' নামক একখানি নাটক রচনা করেন। গন্ধর্বহস্তে কৌরবদিগের পরাজয় ও দুর্বাসার পারণ কাহিনী দুইটি ক্ষীণতম যোগসূত্রে আবদ্ধ হইলেও পরস্পর স্বতন্ত্র—ইহাদের রসও বিভিন্ন। অতএব ইহাদিগকে একই নাটকের অঙ্গীভূত করিবার ফলে ইহার কেন্দ্রীয় রস নিবিড় হইয়া উঠিতে পারে নাই, বরং বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার আর একটি প্রধান ত্রুটি এই যে, ইহাতে একই দৃশ্যে একই চরিত্র কোন সময় 'পদ্যপংক্তি গদ্য' ও কোন সময় গৈরিশ ছন্দের সংলাপ ব্যবহার করিয়াছে। ইহাতেও নিবিড় রসসৃষ্টির ব্যাঘাত হইয়াছে। চরিত্র-সৃষ্টি কিংবা কাহিনী-বিন্যাসে ইহার মধ্যেও নাট্যকারের কোন কৃতিত্ব প্রকাশ পায় নাই।

'রাজা বিক্রমাদিত্যে'র মত আনুপূর্বিক 'পদ্যপংক্তি গদ্যে' রাজকৃষ্ণ 'বামন-ভিক্ষা' নামক একখানি পৌরাণিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন। বামনবেশী বিষ্ণু কর্তৃক বলির ছলনার বৃত্তান্তই ইহার উপজীব্য। এই বৃত্তান্ত বর্ণনাচ্ছলে নাট্যকার ইহার ভিতর দিয়া হরিনামের মহিমা প্রচার করিয়াছেন। ইহাতে পাতালের নাগকন্যাদিগের মুখেও হরিনাম উচ্চারিত হইয়াছে।

রামচরিতাবলী অবলম্বন করিয়া রাজকৃষ্ণ প্রথমত, তিনখানি নাটক একসঙ্গে রচনা করেন—'দশরথের মৃগয়া', 'হরধনুভঙ্গ' ও 'রামের বনবাস'। রাজকৃষ্ণ বাল্মীকি-প্রণীত মূল সংস্কৃত রামায়ণ বাংলায় পদ্যানুবাদ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তিনি মনে করিতেন, 'দেবোপম বাল্মীকির অমৃত-সমুদ্র স্বরূপ রামায়ণ কেবল পঠন ও শ্রবণ করিয়া প্রাণানন্দ ও জ্ঞানানন্দ লাভ করিলে আশার পূর্ণমাত্রায় তৃপ্তি হয় না—দর্শনানন্দও ভোগ করা চাই।' সেইজন্য 'রামচরিত-নাটকাবলী' নামে তিনি রামচন্দ্রের জীবনের বিভিন্ন অংশ অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন নাটক রচনা করিতে মনস্থ করেন। এই বিষয়ে তাঁহার প্রথম প্রয়াসস্বরূপ উল্লিখিত তিনখানি নাটক রচিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে তাঁহার নিজস্ব 'পদ্যপংক্তি গদ্য' ও গৈরিশ ছন্দ উভয়ই ব্যবহৃত হয়। 'দশরথের মৃগয়া' ও 'রামের বনবাস' পূর্ণাঙ্গ বিয়োগান্ত নাটক। ইহাদিগকে নাট্যকার কোন অলৌকিক উপায় অবলম্বন করিয়া মিলনাত্মক রূপ দিবার প্রয়াস পান নাই। পরশুরামের দিক হইতে বিবেচনা করিতে গেলে 'হরধনুভঙ্গ'ও বিয়োগান্তক নাটকেরই সমকক্ষ, তবে ইহার করুণরস পূর্বোল্লিখিত দুইখানি নাটকের মত

এত নিবিড় হইয়া উঠিতে পারে নাই। 'রামের বনবাস' নাটকখানি সুরচিত বলিয়া অনুভূত হইবে। ইহাতে বাল্মীকির মূল সংস্কৃত রামায়ণ অনুসরণ করিবার সার্থক প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়।

রাজকৃষ্ণের 'ভীষ্মের শরশয্যা' নাটকের প্রধান ত্রুটি এই যে, মহাভারতের যে অংশ হইতে কাহিনীর সূত্রপাত করিলে ভীষ্মের শরশয্যা বিষয়টির উপর স্বভাবতই কাহিনীর লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত হইত, নাট্যকার তাহা সেইস্থল হইতে আরম্ভ না করিয়া তাহার বহু পূর্ববর্তী কাল হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস হইতে ইহার কাহিনীর সূত্রপাত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে ভীষ্মের শরশয্যা ব্যাপারের মুখ্যত কিংবা গৌণত কোন যোগই নাই, তারপর উদ্যোগ পর্ব ও যুদ্ধ পর্বের বিস্তৃত ঘটনা অতিক্রম করিয়া ভীষ্মের শরশয্যা বিষয়ে পৌঁছিতে হইয়াছে। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, নাটকের উপযোগী করিয়া কাহিনী বিন্যাস করিবার কৌশল রাজকৃষ্ণের আয়ত্ত ছিল না। বাধ্য হইয়াই নাট্যকাহিনীর শেষাংশ সংক্ষিপ্ত করিবার ফলে ভীষ্ম-চরিত্রের মহিমা সুপরিস্ফুট হইতে পারে নাই। অতএব নাটকের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়াছে।

রাজকৃষ্ণের কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক দুইটি গীতিনাট্যের নাম 'দুটি মনচোরা' ও 'চতুরালী'। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত রচনাটিকে নাট্যকার 'উপনাট্য গীতি' বলিয়া ও দ্বিতীয়োক্তটিকে 'কৌতুক গীতিনাট্য' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমটি মাত্র চারিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃশ্যে সম্পূর্ণ এবং আদ্যোপান্ত ব্রজবুলি ভাষায় রচিত পদাবলীর সমষ্টি। বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যযুগে কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক বহু গীতিনাট্যই প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু ব্রজবুলি ভাষায় কোন গীতিনাট্যই রচিত হয় নাই, বৈষ্ণব পদাবলীর ধারা অনুসরণ করিয়া রাজকৃষ্ণই কেবলমাত্র যে এ বিষয়ে প্রথম প্রয়াস করিয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহার এই প্রয়াস সার্থক হইয়াছিল বলিয়াই অনুভূত হইবে। রচনার দিক দিয়া ইহা রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহের পদাবলী'র সমকক্ষ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু ইহা বড়ই সংক্ষিপ্ত। 'চতুরালী'র মধ্যে গদ্য ও গীতি-সংলাপের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু ব্রজবুলি পদও ব্যবহৃত হইয়াছে। বৃন্দাবনলীলার সাধারণ বিষয় উভয় গীতি-নাট্যেরই উপজীব্য। রচনা দুইটি ভক্তিচন্দনের সুপবিত্র সুরভি-মিশ্র। রাজকৃষ্ণ 'চন্দ্রাবলী' নামক একখানি গীতি-নাট্য রচনা করেন, কিন্তু তাহা চন্দ্রাবলীর অভিসার বিষয়ক এক হাস্যরসাত্মক রচনা, ইহার মধ্যে ভক্তিরস ফুটিবার অবকাশ পায় নাই; এমন কি, তাহার পরিবর্তে ইহা রুচির দিক দিয়া গ্রাম্যতা-দোষদুষ্ট।

রাধাকৃষ্ণের বিষয় ব্যতীতও আরও কয়েকটি বিষয় অবলম্বন করিয়া রাজকৃষ্ণ কয়েকটি গীতি-নাট্য রচনা করেন। তাহাদের মধ্যে রামায়ণের আদিকাণ্ডের অন্তর্গত ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনী অবলম্বন করিয়া রচিত তাঁহার 'ঋষ্যশৃঙ্গ' নাটকটি উল্লেখযোগ্য। গীতিরচনায় রাজকৃষ্ণের দক্ষতা ইহার মধ্যে সুপরিস্ফুট হইয়াছে। একখানি উর্দু কাব্য অবলম্বন করিয়া রাজকৃষ্ণ 'বেণেজির বদ্রেমণি' নামক একখানি গীতি-নাট্য রচনা করিয়াছিলেন। বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী হইতে হীরামালিনীর বৃত্তান্তটি অবলম্বন করিয়া তিনি 'হীরে মালিনী' নামকও একখানি গীতি-নাট্য রচনা করেন। প্রথমটি উর্দুশব্দবহুল ও দ্বিতীয়টি কৌতুকরসাশ্রিত; রচনার দিক দিয়া ইহাদের মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য অনুভব করা যায় না।

কংস কর্তৃক আঙ্গিরস যজ্ঞানুষ্ঠান উপলক্ষে 'শ্রীকৃষ্ণের অন্নভিক্ষার' বিবরণ অবলম্বন করিয়া রাজকৃষ্ণ একখানি নাটক রচনা করেন। পৌরাণিক নাটকে ঘটনার স্বাভাবিকতা এবং অস্বাভাবিকতার কোন দায়িত্বই থাকিবে না—ইহাই রাজকৃষ্ণের বিশ্বাস ছিল। মাতৃকণ্ঠে ঘুমপাড়ানি গান শুনিয়া যে শিশু কৃষ্ণ দোলনায় ঘুমায়, সে ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়াই শ্রীরাধার সঙ্গে যুবজনোচিত প্রণয় আচরণ করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ দেবতা হইলেও মানুষ—চিরদিনই মানুষ দেবতাকে নিজের অনুভূতি দিয়াই কল্পনা করিয়াছে—এই পরিকল্পনায় মানবোচিত স্বাভাবিকতা নাই বলিয়াই ইহা নিতান্ত পীড়াদায়ক। ভগবদ্বিশ্বাস ও ভক্তিতে রাজকৃষ্ণের হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল, সেইজন্য ব্যবহারিক জীবনের এই প্রকার সঙ্গতি-অসঙ্গতির দিকে তিনি লক্ষ্য রাখিতে পারিতেন না। কিন্তু এই প্রকার মনোভাব লইয়া কাব্য কিংবা পুরাণ রচিত হইলেও নাটক যে রচিত হইতে পারে না, রাজকৃষ্ণ তাহা বুঝিতে পারেন নাই। এই নাটকখানি এই প্রকার বহু অলৌকিক দৃশ্য এবং চরিত্রে পরিপূর্ণ, অতএব রাজকৃষ্ণের অন্যান্য রচনার মত ইহাও নাটক নহে। তবে ইহার এই ঘুমপাড়ানি গানটি উদ্ধৃত করিবার যোগ্য—

আমার, গোপাল দোলে দোলার কোলে,
সোনার দোলা আলো করে
যেন, সুধার সরে বিহার করে।
সুনীল কমল ঘুমের ঘোরে।
আয় রে প্রভাত বায়,
হাত বুলা রে গায়,
বাছার, ঘাম হয়েছে দে রে মুছে
ঘুম না ভেঙে যায়।

রাজকৃষ্ণ যে যথার্থই কবি ছিলেন, নাট্যকার ছিলেন না, ইহা হইতেও তাহা প্রমাণিত হইবে।

পৌরাণিক বিষয়-বস্তু অবলম্বন করিয়া রাজকৃষ্ণ 'হরি-হর-লীলা' নামকও একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন, নাট্যকার ইহাকে 'নাট্যরসিক' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে হরি ও হরের মধ্যে সমন্বয় সাধনের কথা আছে—কিন্তু নাট্যরস নাই। রাজা রুরু তাঁহার নিজ আয়ুর অর্ধেক দান করিয়া পত্নী প্রমদ্বরাকে যে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন, সেই পৌরাণিক বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া রাজকৃষ্ণ 'প্রমদ্বরা' নামক একখানি নাটক রচনা করেন। যথার্থ নাটকীয় বিষয়-বস্তু থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র অনুভূতিশীলতার অভাবে নাট্যকার ইহাতেও সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই।

একজন সত্যনারায়ণ-ভক্ত কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া রাজকৃষ্ণ সত্যনারায়ণের মহিমা-প্রচারমূলক তিনখানি নাটক রচনা করেন, ইহাদের নাম 'সত্যমঙ্গল' 'লক্ষপতি' ও 'রাজবংশধ্বজ'। নাট্যকার শেষোক্ত নাটক দুইখানিকে প্রথমোক্ত নাটকখানির পরিশিষ্ট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সত্যপীর ও সত্যনারায়ণের পাঁচালীতে যে কাহিনীটি আছে, তাহাই মূলত ভিত্তি করিয়া নাটক তিনখানি রচিত হইয়াছে। ইহাও তাঁহার অন্যান্য পৌরাণিক নাটকের মত অলৌকিক ঘটনা ও চরিত্রের সমাবেশে পূর্ণ। সত্যনারায়ণের সঙ্গে যে মুসলমান ধর্মের কোন প্রকার সংস্রব আছে এই সন্দেহ কাহারও মনে যাহাতে না থাকে, সেজন্য কাহিনীটি পৌরাণিক ঘটনা ও উদ্ধৃতিতে পূর্ণ করা হইয়াছে। চারিত্রিক ক্রমবিকাশ কিংবা ঘটনার স্বাভাবিক ক্রমপরিণতি কিছুমাত্র ইহাদের মধ্যে নাই, সেইজন্য ইহারাও সম্পূর্ণ নাট্যগুণ-বর্জিত।

পৌরাণিক নাটকের মধ্যে রাজকৃষ্ণের 'নরমেধ যজ্ঞ' বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। ইহার ঘটনার মধ্যে উচ্চাঙ্গ নাটকীয় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিবার যে সুযোগ ছিল, নাট্যকার তাহার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হইবে না। যযাতি করুণ-হৃদয় নৃপতি, কিন্তু তাঁহার উপর তাঁহার পিতা নহুষের অতৃপ্ত আত্মার তৃপ্তি বিধানের জন্য এক অষ্টমবর্ষীয় ব্রাহ্মণ বালককে অগ্নিতে আহুতি দিয়া যজ্ঞ করিবার আদেশ দেওয়া হইল। ইহাতে এক দিক দিয়া পিতার অতৃপ্ত আত্মার পরিতৃপ্তির দায়িত্ব, আর এক দিক দিয়া অতৃপ্ত আত্মার বালকের প্রতি স্বাভাবিক করুণাবোধ, এই উভয়ের মধ্যে যযাতির চরিত্রের সুকৌশলে বিকাশ লাভ করিবার পূর্ণ সুযোগ ছিল। কিন্তু নাটকের মধ্যে

যযাতি চরিত্রটি প্রাধান্য লাভ করিতে না পারিবার জন্য ইহার এই দিকটি তেমন বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। ইহার মধ্যে কুসীদজীবী রত্নেশ্বরের চরিত্রটিই একমাত্র বাস্তবধর্মী হইয়া উঠিতে পারিয়াছে।

রাজকৃষ্ণ 'গিরিগোবর্ধন' নামক একখানি ক্ষুদ্র পৌরাণিক নাটক রচনা করেন। গোপগণকে ইন্দ্র-পূজায় নিবৃত্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কি ভাবে যে গিরিগোবর্ধনের পূজায় প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন, তাহারই কাহিনী সংক্ষেপে নাট্যাকারে এখানে বর্ণিত হইয়াছে। ইন্দ্র শেষ পর্যন্ত কি ভাবে 'শ্রীকৃষ্ণের পদধারণ' করিয়া নিজেও কৃষ্ণভক্ত হইয়াছিলেন, ইহাতে তাহারও উল্লেখ আছে। কৃষ্ণমহিমা প্রচারই ইহার উদ্দেশ্য, সে উদ্দেশ্য ইহাতে ব্যর্থ হয় নাই।

ঐতিহাসিক বিষয়-বস্তু লইয়া রাজকৃষ্ণ সামান্য কয়খানি মাত্র নাটক রচনা করিয়াছিলেন; ইহাদের মধ্যে ভারত-ইতিহাসের একাংশ অবলম্বন করিয়া 'ভারতসান্ত্বনা', রাজপুত কাহিনী অবলম্বন করিয়া 'লৌহ-কারাগার' ও 'বনবীর' এবং বৈষ্ণব-জীবনী অবলম্বন করিয়া 'হরিদাস ঠাকুর' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু পৌরাণিক নাটকের মধ্যে তিনি তাঁহার নিজস্ব অনুভূতিজাত ভক্তিরস পরিবেশনের যে অবকাশ পাইতেন, ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে তাহা পাইতেন না বলিয়া এই ঐতিহাসিক নাটকগুলি তাঁহার পরিকল্পনায় কোন দিক দিয়াই সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই। এমন কি তাঁহার 'হরিদাস ঠাকুর' নাটকটিরও ভক্তিরস তেমন নিবিড় হইতে পারে নাই। ইহাদের মধ্যে তাঁহার কোন তথ্যনিষ্ঠারও পরিচয় পাওয়া যায় না।

রাজপুত কাহিনী অবলম্বন করিয়া রাজকৃষ্ণের 'মীরাবাঈ' নাটকখানি রচিত হইয়াছে। কিংবদন্তীই ইহার ভিত্তি, ইতিহাস ইহার ভিত্তি নহে; সেইজন্য ইহা রাজকৃষ্ণের ঐতিহাসিক নাটকের অন্তর্ভুক্ত নহে। ইহা তাঁহার ভক্তি-রসাত্মক পৌরাণিক নাটকেরই স্বধর্মী। ইহার মধ্যে তাঁহার হরিভক্তি মূর্তিমতী হইয়া আবির্ভূত হইয়াছে। 'চন্দ্রহাস' রাজকৃষ্ণের অনুরূপ হরিভক্তিমূলক নাটক।

রাজকৃষ্ণের উচ্চাঙ্গের কল্পনা-শক্তি ছিল না; সেইজন্য দীনবন্ধু হইতে আরম্ভ করিয়া সেকালের প্রত্যেক নাট্যকারই যেমন তাঁহাদের অন্যান্য নাটকের সঙ্গে রোমান্টিক নাটকও রচনা করিয়াছেন, রাজকৃষ্ণ সেদিকে অগ্রসর হন নাই। তাঁহার 'চমৎকার' নাটকখানি ইহার অন্যতম ব্যতিক্রম, কিন্তু রচনার দিক দিয়া ইহা একেবারেই ব্যর্থ। সুপরিচিত পারস্যদেশীয় রোমান্টিক কাহিনী অবলম্বন

করিয়া রাজকৃষ্ণ যে 'লায়লা-মজনু' নামক নাটক রচনা করেন, তাহা রচনার দিক দিয়া কতকটা সার্থক বলিতে পারা যায়, অবশ্য ইহার বিষয়বস্তুর পরিকল্পনায় রাজকৃষ্ণের কোন কৃতিত্ব নাই।

পতিতা লক্ষহীরার কিংবদন্তীমূলক কাহিনী অবলম্বন করিয়াও রাজকৃষ্ণ 'লক্ষহীরা' নামক একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহা বর্ণনাত্মক রচনামাত্র, কোন প্রকার নাটকীয় গৌরব লাভ করিবার ইহা অযোগ্য।

হুগলী জেলার মাহেশের দ্বাদশ গোপালের মেলা উপলক্ষে পূর্বে গঙ্গাবক্ষে যে মদ্যপান ও বারবনিতা-লীলা হইত, তাহারই একটি চিত্র পরিবেশন করিয়া রাজকৃষ্ণ 'দ্বাদশ গোপাল' নামক একটি ক্ষুদ্র নক্সা রচনা করেন। ইহা সমাজ-সংস্কারের শুভবুদ্ধি প্রণোদিত রচনা হইলেও ইহার বাস্তব রসটির প্রকাশে কোন বাধা হয় নাই।

মাতালের অসংলগ্ন প্রলাপ যে কতদূর উৎকট হইতে পারে, তাহাই নির্দেশ করিয়া রাজকৃষ্ণ 'উৎকট বিরহ বিকট মিলন' নামক একখানি নক্সা রচনা করেন। নাট্যকার ইহাকে parodical comedy বা 'উপহাসিক হাস্যনাটক' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার রচনায় অমিত্রাক্ষর, গৈরিশ ও বিবিধ বাংলা পদ্য ছন্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। রচনা কিংবা চিত্র-পরিকল্পনায় ইহাতে লেখকের কোন কৃতিত্ব প্রকাশ পাইতে পারে নাই।

'কাণাকড়ি' নামক 'বিদ্রূপ হাসক' বলিয়া বর্ণিত একখানি ক্ষুদ্র রচনায় রাজকৃষ্ণ এটর্নি, ডাক্তার, সম্পাদক, বড়বাবু ও সমালোচককে লইয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন। ইহার ভাষা রাজকৃষ্ণের অন্যান্য হাস্যরসাত্মক রচনা অপেক্ষা একটু বেশি জ্বালাময়ী। মনে হয়, ইহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতেই তিনি ব্যক্তিগতভাবে আঘাত পাইয়াছিলেন।

রঙ্গমঞ্চের নৈতিক আবহাওয়া যাহাতে দূষিত না হইতে পারে, সেজন্য রাজকৃষ্ণ রঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রী নিয়োগের বিরোধী ছিলেন, তিনি স্ত্রীর অংশ পুরুষ দ্বারা অভিনয় করাইবার পক্ষপাতী ছিলেন। রঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রী নিয়োগের কুফল বর্ণনা করিয়া তিনি একখানি বিদ্রূপাত্মক প্রহসন রচনা করেন—ইহার নাম 'কলির প্রহ্লাদ'। ইহাতে কেবল মাত্র নাট্যকারের বিশিষ্ট একটি মনোভাবের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, কোনও নাট্যকৌশল প্রকাশ পায় নাই।

ইংরেজিতে যাহাকে tableau (মৌন দৃশ্য) বলে, তাহারই অনুকরণে রাজকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর বর্ণনাত্মক একটি রচনা প্রকাশ করেন। তাহাতে একদিকে

যেমন কংসের কারাগার, বসুদেব কর্তৃক যমুনা অতিক্রম, নন্দগৃহ, মথুরার বধ্যভূমি প্রভৃতির চিত্র পরিবেশন করা হইয়াছে, তেমনই ইহাদের প্রত্যেকটি দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলি ব্যঙ্গদৃশ্যও পরিবেশন করা হইয়াছে। স্বর্গীয় পবিত্রতার পাশে পাশে মানুষের ভণ্ডামি কতদূর পর্যন্ত গিয়া পৌছিয়াছে, তাহাই নির্দেশ করা ইহার উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহাতে কোন রস কিংবা লেখকের কোন বিশিষ্ট উদ্দেশ্য কিছু স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই।

কতকগুলি অভিন্ন চরিত্র লইয়া রাজকৃষ্ণ তিনখানি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের নাম 'খোকাবাবু', 'বেলুনে বাঙ্গালী বিবি' ও 'জুজু'। শেষোক্ত প্রহসন দুইটিকে নাট্যকার প্রথমোক্ত প্রহসনখানির পরিশিষ্ট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহারা প্রহসন নহে, কয়েকটি বিচ্ছিন্ন চিত্র মাত্র, বর্ণনার দোষে চিত্রগুলি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই। ইহাদের মধ্যে এক আদুরে ছেলে ও স্ত্রৈণ স্বামীর চিত্র পরিবেশন করা হইয়াছে। প্রহসন রচনায় দক্ষতা না থাকিলেও মানব-চরিত্রের অভিজ্ঞতায় রাজকৃষ্ণ যে তাঁহার সমসাময়িক কোন নাট্যকার অপেক্ষাই পশ্চাৎপদ ছিলেন না, এই চিত্র তিনখানিই তাহার প্রমাণ। অতিরঞ্জনের দোষ থাকিলেও কলিকাতার সেকালের এক শ্রেণীর ধনি-পরিবারের পরিচয় ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায়।

চিকিৎসা-ব্যবসায়কে ব্যঙ্গ করিয়া রাজকৃষ্ণ 'ডাক্তারবাবু' নামে একটি ক্ষুদ্র নক্সা রচনা করিয়াছেন, ইহার মধ্যে কোন নাট্যগুণ প্রকাশ পাইতে পারে নাই। কেবলমাত্র একজন ডাক্তারের চরিত্রহীনতা ও একজন কবিরাজের অক্ষরজ্ঞানশূন্যতার কথাই ইহাতে বর্ণনাকারে পরিবেশন করা হইয়াছে। 'টাট্‌কা-টোটকা' নামক তাঁহার একটি অনুরূপ রচনার মধ্যে এক চরিত্রহীন ছাত্রের চরিত্র-সংশোধনের কথা বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদের কাহারও মধ্যে প্রকৃত প্রহসনের কোন গুণই প্রকাশ পায় নাই। রাজকৃষ্ণের প্রহসনগুলির মধ্যে 'জগা পাগ্‌লা'র মধ্যে একটু অভিনবত্ব আছে। এক ভাবুক পাগলের চরিত্র অবলম্বন করিয়া ইহা রচিত, তাহার উক্তি-প্রত্যুক্তি ও আচরণের মধ্যে গভীর কয়েকটি জাগতিক সত্য প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু প্রহসন হিসাবে ইহার কোন মূল্য নাই। প্রহসন রচনায় রাজকৃষ্ণের যে কোনই দক্ষতা ছিল না, তাঁহার 'লোভেন্দ্র-গবেন্দ্র' নামক রচনাটিই তাহার সর্বাপেক্ষা জলন্ত প্রমাণ। নাট্যকার ইহাকে প্রত্যক্ষভাবে প্রহসন না বলিয়া 'সামাজিক ব্যঙ্গনাটক' বলিয়া

উল্লেখ করিয়াছেন ; ইহা সামাজিক বটে, ইহার মধ্যে ব্যঙ্গও আছে, কিন্তু নাটকত্ব ইহার কিছুমাত্র নাই। একটি অতি ক্ষীণ কাহিনীর সূত্র অবলম্বন করিয়া ইহাতে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন চিত্র পরিবেশন করা হইয়াছে। চিত্রগুলিও এমন অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত যে ইহাদের দ্বারা কোন প্রকার রসসৃষ্টিই সম্ভব হয় নাই। যেখানে সুচতুর ঘটনা-সংস্থাপনা দ্বারা হাস্যরস-সৃষ্টি সম্ভব হয় না, সেখানে বাগ্‌বৈদগ্ধ্য দ্বারা কৌতুক (wit) সৃষ্টি হইতে পারে—অমৃতলাল বসু শেষোক্ত পথই অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজকৃষ্ণের ঘটনা-সংস্থাপনা দ্বারা হাস্যরস সৃষ্টি করিবার যেমন কোনও শক্তি ছিল না, তেমনই বাগ্‌বৈদগ্ধ্য দ্বারা কৌতুক (wit) সৃষ্টি করিবারও কোন ক্ষমতা ছিল না। সেইজন্য তাঁহার হাস্যরসাত্মক রচনা মাত্রেই ব্যর্থ হইয়াছে। সামাজিক নক্সা অনেক সময় কৌতুকাবহ হইয়া থাকে, কিন্তু সেই নক্সার যদি কোন বাস্তব ভিত্তি না থাকে, তবে তাহাই অত্যন্ত পীড়াদায়ক হইয়া পড়ে। রাজকৃষ্ণের 'লোভেন্দ্র-গবেন্দ্র' নামক সামাজিক ব্যঙ্গনাটকও তাহাই হইয়াছে। একটি লক্ষ্যহীন, অবাস্তব ও অতি শিথিল কাহিনী ইহার উপজীব্য। ইহার সংলাপে মধ্যে মধ্যে পদ্য ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে ইহার পরিবেশ আরও কৃত্রিম হইয়া পড়িয়াছে। ইহার মধ্যে অশ্লীলতা নাই সত্য, কিন্তু ইহার রুচি যে গ্রাম্যতা-দোষদুষ্ট, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অতুলকৃষ্ণ মিত্র

(১৮৭৬—১৯০০)

এই যুগের অন্যান্য নাট্যকারের মত রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া নাট্যরচনায় গিরিশচন্দ্রের দ্বারা যাঁহারা সর্বতোভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অতুলকৃষ্ণ মিত্র, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় এবং অমরেন্দ্রনাথ দত্তের নামই উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা প্রায় সকলেই গিরিশচন্দ্রের সমসাময়িক—কেহ বা তাঁহার সহকারিরূপে তাঁহারই পরিচালিত রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, কেহ বা স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া তাঁহারই মত স্ব-পরিচালিত রঙ্গমঞ্চে নূতন নূতন নাটক পরিবেশনের ভার লইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে একমাত্র বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের নাট্যকার-জীবন রাজকৃষ্ণ রায়ের মত খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিলেও অতুলকৃষ্ণ ও অমরেন্দ্রনাথের নাট্যরচনা বিংশ শতাব্দীর প্রায় দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যযুগের ধারাই তাঁহারা অনুসরণ করিয়াছেন, গিরিশচন্দ্রের মত নূতন যুগে প্রবিষ্ট হইয়া নূতন রসচৈতন্য লাভ করিতে পারেন নাই। সেইজন্য ইঁহারা সকলেই বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যযুগেরই প্রতিনিধি।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যযুগের অন্যান্য প্রতিনিধির ন্যায় অতুলকৃষ্ণ পৌরাণিক, রোমান্টিক, চরিত্রমূলক, হাস্যরসাত্মক, গীতিমূলক, সমাজচিত্রমূলক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ক নাটক রচনা করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও অমৃতলালের মত তিনিও ফরাসী প্রহসনকার মলিয়ারের দুই তিনখানি নাটক বাংলায় ভাবানুসরণ করেন। সংখ্যার দিক দিয়া তিনি অমৃতলাল অপেক্ষাও অধিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রকে অনুকরণ করিবার প্রবণতা তাঁহার মধ্যে এত অধিক প্রকাশ পাইয়াছে যে, তাহা অতিক্রম করিয়া তাঁহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশের সামান্য সুযোগও দেখা দিতে পারে নাই।

গিরিশচন্দ্রের মত অতুলকৃষ্ণেরও পৌরাণিক নাটকের সংখ্যাই সর্বাধিক। ইহার পরই তাঁহার গীতিনাট্য। সামাজিক নক্সা-জাতীয় রচনার সংখ্যাও

তাঁহার অল্প নহে, কিন্তু বাস্তব দৃষ্টির অভাবে তাহাদের একখানিও জীবন্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই। অতুলকৃষ্ণ একখানি মাত্র রোমান্টিক ও একখানি চরিত-মূলক নাটক রচনা করিয়াছিলেন—শেষোক্ত নাটকখানি রচনায় একটু নূতনত্ব সৃষ্টি করিবার মোহে দূরদৃষ্টির অভাবের পরিচয় দিয়াছেন। সামাজিক নাটক রচনায় গিরিশচন্দ্র কোন উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিতে পারেন নাই বলিয়াই তাঁহার অনুসরণকারীদের মধ্যে সামাজিক নাটক রচনার কোন প্রেরণা কার্যকরী হইতে পারে নাই। অতুলকৃষ্ণ একখানিও সামাজিক নাটক রচনা করেন নাই। বিষয়ানুসারে এখানে তাঁহার কয়েকটি নাটকের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

সাবিত্রী-সত্যবানের পরিচিত পৌরাণিক বিষয়-বস্তু লইয়া অতুলকৃষ্ণ তাঁহার প্রথম পৌরাণিক নাটক 'আদর্শ সতী' রচনা করেন। ইতিপূর্বে রাজকৃষ্ণ রায় এই বিষয় অবলম্বন করিয়াই 'পতিব্রতা' নামক যে নাটিকা রচনা করিয়াছিলেন, রচনার দিক দিয়া তাহা যেমন কোনই সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই, অতুলকৃষ্ণের রচনাও তদতিরিক্ত কিছুই হয় নাই। কাহিনীটিকে বাহ্যত একটি নাটকীয় রূপ দেওয়া ব্যতীত ইহার ভিতর হইতে কোন নাটকীয় গুণ প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। অতুলকৃষ্ণের এই প্রথম রচনাখানিতে তাঁহার ভবিষ্যৎ প্রতিভারও কোন আভাস পাওয়া যায় না।

গিরিশচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে অতুলকৃষ্ণ তাঁহার দ্বিতীয় পৌরাণিক নাটক 'নন্দ-বিদায়' রচনা করেন। নাট্যকার ইহার ভূমিকায় গিরিশ চন্দ্রের নিকট তাঁহার এই প্রত্যক্ষ ঋণের কথা স্বীকার করিয়াছেন; অতএব ইহার দোষগুণ যাহাই থাকুক, ইহাতে যে তাঁহার স্বাধীন প্রতিভার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যাইবে না, তাহা সত্য।

ইতিপূর্বেই গিরিশচন্দ্র মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া বাংলা নাট্যরচনার যে ধারা প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহাই অনুসরণ করিয়া অতুলকৃষ্ণ তাঁহার 'মা' নামক নাটকখানি রচনা করেন। গিরিশচন্দ্র ইতিপূর্বে চণ্ডীমঙ্গল হইতে ধনপতি সদাগরের কাহিনীটি অবলম্বন করিয়া তাঁহার 'কমলে কামিনী' নাটক রচনা করিয়াছিলেন, অতুলকৃষ্ণ ইহার অন্যতম কাহিনী কালকেতু-ফুল্লরার বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া এই নাটকটি রচনা করিয়াছেন, ইহা পরে ফুল্লরা নামে পুনরায় প্রকাশিত হয়। ইহার নিতান্ত সহজ পার্থিব কাহিনীটির উপর নাট্যকার এক গূঢ় আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আরোপ

করিয়াছেন, তাহার ফলে ইহা আবিল হইয়া উঠিয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর কাহিনীটিকে নাট্যরূপ দিতে অতুলকৃষ্ণ যে কতকটা সার্থক হইয়াছিলেন, তাহা অনুভব করিতে পারা যায়; তাঁহার কয়েকটি চরিত্র সংক্ষিপ্ত হইলেও সুপরিস্ফুট হইয়াছে।

গিরিশচন্দ্রের 'প্রভাস-যজ্ঞ' নাটক রচিত হইবার পূর্বেই অতুলকৃষ্ণ প্রভাস মিলনের বিষয়-বস্তু অবলম্বন করিয়া 'প্রণয়-কানন বা প্রভাস' নামক একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের নাটকের বিপুল মঞ্চ-সাফল্যের জন্য অতুলকৃষ্ণের এই বিষয়ক নাটকখানি কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই, কোনদিন ইহা অভিনীত হইয়াছিল বলিয়াও বোধ হয় না।

রাজকৃষ্ণ রায়ের 'ভীষ্মের শরশয্যা' নাটক প্রথম অভিনীত হইবার পূর্বেই অতুলকৃষ্ণ এই নামেই একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন, ইহার মধ্যে মহাভারতের অন্তর্গত যুদ্ধপর্বের বিভিন্ন চিত্র বিচ্ছিন্ন ভাবে পরিবেশন করা হইয়াছে বলিয়া ইহাতে সমগ্রভাবে কোন রসসৃষ্টি হইতে পারে নাই। তবে রাজকৃষ্ণ যেমন উদ্যোগপর্ব হইতেই তাঁহার 'ভীষ্মের শরশয্যা' নাটকের কাহিনীর সূত্রপাত করিয়াছিলেন, ইহাতে তাহা করা হয় নাই—যুদ্ধপর্বের বিভিন্ন বৃত্তান্তের সমাবেশেই ইহা রচিত হইয়াছে, তথাপি কাহিনীর মধ্য দিয়া একটি সামগ্রিক ঐক্য সৃষ্টি হইতে পারে নাই।

বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা বর্ণনা করিয়া অতুলকৃষ্ণ 'নিত্যলীলা বা উদ্ধব-সংবাদ' নামক একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। রচনার ত্রুটির জন্য ইহার ভাবটি সুপরিস্ফুট হইতে পারে নাই।

অতুলকৃষ্ণের গীতিনাট্যের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। পৌরাণিক নাটকের মত গীতিনাট্য রচনায়ও গিরিশচন্দ্রই অতুলকৃষ্ণের আদর্শ ছিলেন। একান্তভাবে এই আদর্শ অনুসরণের জন্য গীতিনাট্য রচনার ক্ষেত্রেও অতুলকৃষ্ণ মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন নাই।

অতুলকৃষ্ণের প্রথম গীতিনাট্য 'বাপ্পারাও'। রাজপুত-জীবনের বীররসাত্মক কাহিনী এখানে তিনি গীতি (lyric)-রসের ভিতর দিয়া পরিবেশন করিয়াছেন—এই প্রয়াস যে সার্থক হইতে পারে না, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। অতুলকৃষ্ণের এই প্রয়াসও সার্থক হয় নাই। যে-কোন বিষয়ই যে গীতিনাট্যের উপযোগী হইতে পারে না, অতুলকৃষ্ণের এই বোধ ছিল না; একটু নূতনত্বের মোহেই তিনি এই ভ্রান্তির বশবর্তী হইয়াছিলেন।

পারস্য দেশীয় সুপরিচিত প্রণয়-কাহিনী অবলম্বন করিয়া অতুলকৃষ্ণ তাঁহার 'শিরী ফরহাদ' গীতিনাট্য রচনা করিয়াছিলেন। ইহার নৃত্য ও গীত রঙ্গমঞ্চে একদিন দর্শকের নিকট বিশেষ আকর্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। প্রণয়-বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া রচিত 'লুলিয়া' অতুলকৃষ্ণের অন্যতম গীতিনাট্য, ইহারও নৃত্যসম্বলিত সঙ্গীত একদিন রঙ্গমঞ্চে বহু দর্শক আকর্ষণ করিত। গীতি ব্যতীত ইহার মধ্যে নাটকীয় উপাদান কিছুই নাই। মোগল ইতিহাসের একটি ক্ষীণতম প্রণয়-বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া অতুলকৃষ্ণ 'আয়েষা' নামক একখানি গীতিনাট্য রচনা করিয়াছিলেন। নাটকের লঘু ও গীতিবহুল পরিবেশের সঙ্গে ইহার বিয়োগান্তক ঐতিহাসিক কাহিনী সহজ সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারে নাই। সেইজন্য ইহা তাঁহার পূর্ববর্তী গীতিনাট্য দুইখানির মত মঞ্চসাফল্য লাভ করিতে ব্যর্থকাম হইয়াছে। আগমনী-বিজয়া সম্পর্কিত কয়েকটি স্বরচিত সঙ্গীত নাটকীয় আকারে পরিবেশন করিয়া অতুলকৃষ্ণ 'বিজয়া বা সতীনাট্য' নামক একখানি ক্ষুদ্র গীতিনাটক রচনা করিয়াছিলেন। ইহা সঙ্গীতের সমষ্টি মাত্র—নাটকীয় বৈশিষ্ট্য ইহার কিছু মাত্র নাই। অপ্সরার সঙ্গে মানুষের কল্পিত প্রণয়-বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া অতুলকৃষ্ণ 'রত্নদেবী বা অপ্সর-কানন' নামক একখানি গীতিনাট্য রচনা করিয়াছিলেন। অনুরূপ বিষয়-বস্তু অবলম্বন করিয়া ইহার পূর্বে বা পরে বাংলায় আরও নাটক রচিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা হইতে বিষয়-বস্তু সংগ্রহ করিয়া অতুলকৃষ্ণ 'গোপী-গোষ্ঠ বা রাধাকৃষ্ণের দিবামিলন' নামক গীতিনাট্য রচনা করিয়াছিলেন। স্বরচিত গীতিপদের সঙ্গে ইহাতে তিনি প্রচলিত বৈষ্ণব পদও ব্যবহার করিয়া ইহার গীতিমাধুর্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। অতুলকৃষ্ণ অনুরূপ আরও কয়েকখানি গীতিনাট্য রচনা করিয়াছিলেন।

ইহার পরই অতুলকৃষ্ণের প্রহসনের কথা উল্লেখ করিতে হয়। সমসাময়িক নাট্যকারদিগের অনুকরণে অতুলকৃষ্ণ কয়েকখানি প্রহসন রচনা করিলেও ইহাদের মধ্যে তাঁহার কোন প্রাতিভার পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহাদের প্রায় কাহারও মধ্যে কোনও সুসংবদ্ধ কাহিনী নাই, সেইজন্য ইহারা অধিকাংশই চিত্রধর্মী বা নক্সা-জাতীয়। এমন কি চিত্র বা নক্সার মধ্যেও যে কতকটা বাস্তব পরিচয় প্রকাশের দাবী আছে, ইহাদের কাহারও সেই দাবী নাই। অতএব ইহারা সকল দিক দিয়াই বিশেষত্ব-বর্জিত—ইহাদের ভিতর দিয়া অতুলকৃষ্ণের পরানুকরণ-প্রবৃত্তিই প্রকাশ পাইয়াছে, কোন শিল্পকৌশল

প্রকাশ পায় নাই। অতএব ইহাদের কয়েকটির নাম যেমন, 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না', 'গাধা ও তুমি', 'আমোদ-প্রমোদ', 'বিধবা কলেজ চাবুক', 'কালির হাট', 'বুড়ো বাঁদর' ইত্যাদি।

অতুলকৃষ্ণের 'গাধা ও তুমি' ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহার পূর্ব বৎসর প্রকাশিত উপেন্দ্রনাথ দাস রচিত 'দাদা ও আমি' প্রহসনের অনুকরণে ইহার নামকরণ হইয়াছে। গ্রন্থ-পরিচিতি রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ইহা 'ভাক্ত সমাজ-সংস্কারকের নিখুঁত ফটোগ্রাফ।' ইহার কাহিনী এই প্রকার—

বামনদাস গুঁই কলিকাতার একজন বিত্তশালী লোক; তবে একটু রক্ষণশীল। তাঁহার দুই পুত্র—সারদা দাস ও বরদা দাস। জ্যেষ্ঠ সারদা। সদ্য বিলাত হইতে আসিয়াছে, কনিষ্ঠ বরদা ইহাতে গর্ব অনুভব করে; সে নানাবিষয়ে এতদিন বক্তৃতা দিয়া নাম কিনিতে পারে নাই, দাদাকে আশ্রয় করিয়া সে একটা পত্রিকা বাহির করিবে, দাদার কলমে আর ভাইয়ের গলার জোরে সহজেই সংস্কারক হিসাবে তাহাদের নাম দাঁড়াইবে। দাদা আসিয়া প্রথমেই ভাইয়ের দেশী পোশাক ছাড়াইল, সাহেবি পোষাক পরাইল। তারপর সমাজ-সংস্কারের তাহাদের এই কর্মসূচী স্থির হইল, পোষাক পরিবর্তন, স্ত্রীস্বাধীনতা প্রচার ও বেশ্যাবিবাহ। বামনদাসের খুড়ো আচার্যের পুত্র পেলারাম বেশ্যাসংগ্রহে পটু। দুই ভাইয়ে পেলারামকে ধরে, বিবাহার্থে দুইটি বেশ্যা সংগ্রহ করিয়া দিতে বলে। পেলারাম অনেক খুঁজিয়া লালনমণি এবং তাহার কন্যা ল্যাভেণ্ডারকে সংগ্রহ করিল এবং তাহাদের সব কথা খুলিয়া বলিল,—এমনকি বাবুদের মস্তিষ্কবিকৃতির কথাও। লালন বয়স্কা এবং অনেক ঘাটের জল খাওয়া। তাহার ধারণা বাবুরা তাহাদের সম্পত্তি হাত করিবার জন্য এই চাল চালিয়াছে। সে আপত্তি করে। পেলারাম অনেক বুঝাইয়া রাজী করায়। বলে, কিছু অর্থপ্রাপ্তিযোগ বরং ঘটতে পারে। অবশেষে মায়েঝিয়ে রাজী হয়। লালনের বাড়ীতে বিবাহের ঠিকঠাক্‌। পেলা পুরোহিত। আওড়ায় বিকৃত সংস্কৃতে পেলা শ্রাদ্ধের মন্ত্র। জিজ্ঞাসিত হইয়া বলে,—'মন্তরের এইটুকুই তো আমার শেখা sir! তা শ্রাদ্ধই বল আর বিবাহই বল।' দুই ভাইয়ে মিলিয়া মা আর মেয়েকে বিবাহ করে। অনুষ্ঠান চলিতেছে, ইতিমধ্যে একটা কাণ্ড ঘটিয়া যায়। লালন বামনদাসের রক্ষিতা।

সম্প্রদান কালে দারোয়ান আসিয়া হঠাৎ খবর দেয়—লালনের বাবু এসেছেন জামাই সাহেবকে নিয়ে। সবাই পালাইবার পথ খোঁজে। কিন্তু ইতিমধ্যে বামনদাস ও John Bull আসিয়া পড়ে। দুই ভাই তখন বেপরোয়া। তাহারা দুইজনে দুই বেশ্যার হাত চাপিয়া ধরিয়া রাখে। আইনগত অধিকার। অবশেষে বাবার ধমকে ছোট ভাই হার মানে, এবং সব কথা খুলিয়া বলে। বলে, সব পরামর্শের মূলে—'দাদা ও আমি।' বামনদাসকে John Bull এদিকে বলে যে সে বিলাত হইতে সারদাকে ধাওয়া করিয়া এখানে আসিয়াছে। সারদা দাগী আসামী। বুল্ সারদাকে জেলে পুরিতে চায়। বামনদাস কান্নাকাটি করে। অবশেষে নাকে খৎ দিয়া দুইজনে রেহাই পায়। ল্যাভেণ্ডারের ঘরে একটা গাধার মুখোস ছিল। বুল্ সেটা আনাইয়া সারদাকে পরিতে বলে। তারপর ইংরাজী একটা বই হাতে দিয়া বলে—'দেখ্ তোম্ গাধা হায়—এই কিতাবঠো পড়ো, পড়নেসে বুঝোগে Social Reformation কেস্কো বোলে।" সারদা সমাজ-সংস্কারের পরিণাম বিষয়ক পয়ার আবৃত্তি করে। শেষে সে দর্শককে বলে—'সভ্য মহাশয়, আমরা ভাক্ত সমাজ সংস্কারক, আপনাদের মধ্যে আমাদের মত কেউ আছেন কি? থাকেন তো সাবধান !!!'

ইহার মধ্যে মাইকেলের 'একেই কি বলে সভ্যতা ?' হইতে আরম্ভ করিয়া অমৃতলালের প্রহসন পর্যন্ত বহু রচনারই অন্ধ অনুকরণ দেখা যায়।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে অতুলকৃষ্ণের 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না' প্রহসন প্রকাশিত হয়। ইহার পরিচিতি রূপে লেখা আছে, 'A curious inheritance' কাহিনীটি এই—

চার ভাই—লখিন্দর, অজারাম, ভয়ানক চন্দ্র এবং যণ্ডামার্ক। প্রথম তিনটি ভাই নিজের মায়ের খোঁজখবর নেয় না। যণ্ডামার্ক এবং বিধবা ভগ্নী মায়ের দেখাশুনা করে। তাহাদের জ্ঞাতিখুড়া রংলালও মধ্যে মধ্যে খবর নেন। একদিন রংলাল লখিন্দর, অজা এবং ভয়ানককে কিছু উপদেশ দিতে চেষ্টা করেন এবং বলেন পুত্র হিসাবে তাহাদের মাকে দেখা উচিত। তখন তাহারা সকলেই এক একটা ওজর দেখায়। লখিন্দর হ্যাণ্ডনোটের দালালী করে, অনেক নাবালকের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া দুই পয়সা রোজগার করে। পরে জোচ্চুরিতে ধরা পড়িয়া তিন বছরের জন্য জেলে যায়। জেল হইতে বাহির হইয়া ভুষিমালের ব্যবসা করে।

লখিন্দর বলে,—ওর দুটো সংসার। একটা বৌএর এবং আর একটি তাহার রক্ষিতার। ক্রমে রক্ষিতার ছেলেপুলে এবং সংসারবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। একেতেই তাহাদের খরচ, উপরন্তু তাহার আত্মীয় কুটুমরাও আসিতে আরম্ভ করিয়াছে,—তাহাদের খরচও টানিতে হয়। 'এমনি ভোঁদড়ের মা কুড়ুনিই সব টাকা নিয়ে নেয়। মাকে দেবার পয়সা কোথায় পাবো?' অজারামের সমস্যাও অনুরূপ। সে মোক্তারি পাস করিয়া যাহা হউক করিয়া চালাইতেছিল। পরে বিধবা শালীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক ঘটে, তাহার ঔরসে এখন শালীর গর্ভে ১০টি সন্তান। আসল বৌএর মাত্র দুইটি সন্তান; সুতরাং শালীর সন্তানদেরই দাপট। তাহাদেরই দেখিতে হয়। তাহাতেই অর্থ নিঃশেষিত হয়। তৃতীয় সহোদর ভয়ানক চন্দ্র ব্রাহ্ম। তাহার রক্ষিতা নাই, কিন্তু তার স্ত্রী মিসেস মন্দামণি সকলের উপর দিয়া চলে। তাহা ছাড়া নিজেও অনেকটা স্বার্থপর। কিন্তু সে সব কথা উল্লেখ না করিয়া সে ধর্মীয় বক্তৃতার ভঙ্গীতে প্রমাণ করে যে, মাতা পরম শত্রু। দাড়ি নাড়িয়া প্রচুর তৎসম শব্দ সহকারে সে বলে যে, 'মা তাকে দশমাস পেটে ধ'রে নরক যন্ত্রণা ভোগ করিয়েছেন। তারপর এই দুঃখময় পৃথিবীতে ছেড়ে দিয়ে স্বয়ং শত্রুতারই কাজ করেছেন।' সুতরাং পরম শত্রু মাতাকে উপবাসী রাখাই সাব্যস্ত হইল। খুড়ো রংলাল তিনজনকেই তিরস্কার করেন। কিন্তু রক্ষিতার পুত্ররা আসিয়া পড়ায় তাহাদের দল ভারী হয়। দুর্বিনীত রক্ষিতা-পুত্রদের কটু কথা শুনিবার অপেক্ষা প্রস্থান করা খুড়ো উচিত বিবেচনা করিলেন।

এদিকে অজার শালী তথা রক্ষিতা বাতাসী ও লখিন্দরের রক্ষিতা কুড়ুনি কুকুর-কুকুরীর বিবাহ দেয়; প্রায় দুইশত টাকা খরচ করে। সমস্ত বিশ্বে নাম ছড়াইবে এই লোভ দেখাইয়া ভয়ানক চন্দ্র তাহাদের ব্রাহ্মমতে বিবাহ দেয়। রেজেস্ট্রী করিয়া Civil marriage সূত্রে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়, কুকুরগুলি পোষাক পরিহিত থাকে। ভয়ানক চন্দ্র তাহাদের নগ্নতার অশ্লীলতা সহ্য করিতে পারে না। ব্যাপার বেশি দূর গড়ায় দেখিয়া ষণ্ডামার্ক, রংলাল, এবং তাহাদের মা ব্রহ্মময়ী মিলিয়া যুক্তি আঁটেন এবং তদনুযায়ী অগ্রসর হন। ষণ্ডামার্ক লখিন্দরকে বলে 'মা মর মর। মার সিন্দুকে প্রায় ২০০০০৲ টাকা আছে। আসলে কৃপণ তাই এসব এতোদিন ছেলেদেরও জানতে দেয়নি। রংলালকে শতকরা ১০৲ সুদে ৫০০০৲ ধার দিয়েছেন। চৈতন্য কবিরাজ দেখছে। মা আজকালই মরবে।' অতএব সে মার সিন্দুক দখলের জন্য

হন্তদন্ত হইয়া আসিয়াছে। অবশেষে লখিন্দরকে বলে ৩৫০৲ টাকা মার দেনা আছে। সেটুকু তাহাকে ব্যবস্থা করিতে হইবে। লখিন্দর কুড়ুনির উৎসাহে ও আশ্বাসে সানন্দে রাজি হয়। লখিন্দর বলে, অন্য কেহ এ ব্যাপার যেন না জানে। লখিন্দর চলিয়া গেলে অজা এবং ভয়ানক—সকলের সঙ্গেই ষণ্ডামার্ক একই রকম সর্ত করে, সকলেরই ধারণা অন্য দুই ভাই এই সর্ত সম্বন্ধে কিছুই জানে না। ব্রহ্মময়ী শয্যাগতা। ষণ্ডামার্ক এবং তারা উপস্থিত। চৈতন্য কবিরাজ চিকিৎসায় ব্যাপৃত। এমন সময় ভয়ানক আসে। ভয়ানককে ষণ্ডামার্ক বলে, ঐ টাকা দিয়া যে মায়ের দেনা শোধ করিবে তাহাকেই মা তাঁহার সম্পত্তি দিবেন। তিনজনই এক এক করিয়া মায়ের দেনা শোধ করিবার জন্য সাড়ে তিনশত টাকা দিয়া চলিয়া যায়—কেহই কাহারও কথা জানিতে পারে না। কবিরাজ এইবার বলিল, আর দেরী নাই, গঙ্গাযাত্রার উদ্যোগ কর। তারা ক্রন্দনের ভান করে; কান্না শুনিয়া অজা, ভয়ানক সকলেই ছুটিয়া আসিল, সকলেই সকলের মতলব বুঝিতে পারিল। তথাপি বেপরোয়া হইয়া সকলে সিন্দুক ঘেরিয়া দাঁড়াইল। খুড়া রংলাল তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়া লাইন করিয়া দাঁড়াইতে বলেন। তারপর খুড়া সিন্দুক খুলিয়া এক একটি জুতার মালা তিনজনের গলায় পরাইয়া দেন; সিন্দুকের ভিতর হইতে তিনটি মুড়ো ঝাঁটার মালা বাহির করিয়া মন্দামণি, বাতাসী ও কুড়ুনিকে পরাইল। ভাইয়েরা যখন মাথা গরম করিতে চায়, তখন খুড়া জানাইলেন, বাহিরে দশজন জোয়ান বাগ্দী তিনি লাঠি হাতে বসাইয়া রাখিয়াছেন, অগত্যা তাহারা শান্ত হয়। মা ব্রহ্মময়ী অর্থলোভী সন্তানদের ধিক্কার দেন।

নাগরিক জীবনে যৌথ-পরিবার প্রথা ভাঙ্গিয়া পড়িবার যখন প্রথম সূচনা দেখা দিয়াছিল, তখনকার পারিবারিক জীবন ভিত্তি করিয়া ইহা রচিত হইলেও, ইহা সমাজ-জীবনের অতিরঞ্জিত চিত্র ছাড়া আর কিছুই নহে; ইহার বাস্তব গুণ কিছুমাত্র নাই।

ইহার পরই অতুলকৃষ্ণের 'বকেশ্বর' প্রহসনটি রচিত হয়। ইহারও পরিচয়রূপে নাট্যকার এই ইংরেজি বাক্য উল্লেখ করিয়াছেন, "A faithful picture of the growing evils of an unworthy cause." কাহিনীটি এই: অজ্ঞান খাস্তগীর বিলাত-ফেরত এবং ree Flove আন্দোলনের প্রবর্তক। চালাক গড়গড়ি তাহার সহায়ক এবং বন্ধু। বিশেষ করিয়া সে

একজন সম্পাদক। চালাকের সহায়তায় অজ্ঞান monied man খোঁজে; কারণ, পিছনে টাকা থাকিলে যে-কোনও আন্দোলনই সাথক হয়। বৈঠকখানায় অজ্ঞান বসিয়া ইউরোপের ও আমেরিকার স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রশস্তি গায়। চালাক আসে। কথাপ্রসঙ্গে বলে, তাহাদের এই নতুন আন্দোলন 'বাঙ্গালরা অনেকটা take up করেছে, কিন্তু এদেশীয়রা একটু বায়না তুল্‌ছে।' সে আশ্বাস দেয়—'বিপক্ষদলে ধনী ব্যক্তির নিতান্ত অভাব—সুতরাং কোন ভয় নেই।' এইবার অজ্ঞান জোড়ায় জোড়ায় 'রোল কল্' করে। একটি করিয়া পুরুষ অপরের বিবাহিতা স্ত্রীর হাত ধরাধরি করিয়া ঘরে ঢোকে। এমনি করিয়া অনেক জোড়া ঘরে উপস্থিত হয়। তখন অজ্ঞান তাহাদের Free love আন্দোলনের মাহাত্ম্য বোঝায়। বলে,—'হায়, না জানি কবে—আর কত বৎসর পরে ঘৃণিত বিবাহ-প্রথা উঠিয়া গিয়া নরনারীর মধ্যে স্বাধীন সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে।' অবশেষে তাহারা চলিয়া যায়,—

> হাঁটি হাঁটি পা পা, গায়ের উপর দিয়ে গা।
> গুটি গুটি চল ভাই, জোড়া গেঁথে বাড়ী যাই।

ইতিমধ্যে অজ্ঞানের মেয়ে Miss অবলা থাপ্তগীর তাহাদের বাড়ীর বামুন-ঠাকুরের সঙ্গে প্রণয় করে। স্বাধীন প্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রকাশ পায়। স্বাধীন প্রেম আন্দোলনের সমর্থক হইয়াও অজ্ঞান বামুনঠাকুর রামকিঙ্করের উপর চোট্‌পাট করে। এমন কি, বিবাহের মত একটা ঘৃণিত কাজও বাধ্য হইয়া দিবার প্ল্যান করে। অবলা অন্তঃসত্ত্বা। কেহ তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিবে না। কিন্তু একজন মেথর জমিদার আছে। তাহার সঙ্গে বিবাহ দিলে বরং একজন টাকাওয়ালা লোক হাতে থাকিবে। একথা বলে চালাক। অজ্ঞান ইহাতে সানন্দে রাজী হয়। বক্কেশ্বর মাষ্টার অবলাকে পড়ায়। অবলা উদ্ধারের চেষ্টায় প্রেমের দোহাই দিয়া বক্কেশ্বর অনুরোধ করে তাহাকে বিবাহ করিতে। তাহার স্ত্রীকে সে ত্যাগ করিতে বলে। তার স্ত্রী চতুরা মেথর জমিদার চৌথসরামের সঙ্গে প্রেম করিয়াছিল। বক্কেশ্বর কথা প্রসঙ্গে তাহাকে ত্যাগের কথা বলিলে চতুরা সানন্দে চৌথসরামের হাত ধরিয়া বাহিরে আসে। ইতিমধ্যে অবলা বক্কেশ্বরের বাড়ীতে রাত্রি করিয়া গিয়া বলে, 'কাল তাকে মেথরের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাই আজই বক্কেশ্বর তার ওপর অধিকার প্রয়োগ করুক।' অবলার পূর্বপ্রণয়ী বামুনঠাকুর অবলাকে লইতে আসিয়া অবশেষে বক্কেশ্বরের পা ভাঙ্গিয়া দিয়া চলিয়া যায়।

অজ্ঞানের বৈঠকখানায় অজ্ঞান ভবিষ্যৎ ভাবিতেছে। এমন সময় বক্কেশ্বর অবলাকে বিবাহ করিবার কথা অজ্ঞানকে বলে। চৌখস উপস্থিত ছিল। অজ্ঞান তাহার কাছে ৫০০০৲ আগাম লইয়াছে। সে কনে ছাড়িবে কেন? বক্কেশ্বর হতভম্ভ হইয়া যায়। এমন সময় চৌখসের স্ত্রী চিকণ আসিয়া চৌখসকে বলে, তাহার নতুন কনে অন্তঃসত্ত্বা। চৌখস টাকা ফেরৎ চায়। অজ্ঞান টাকা খরচ করিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং দিতে পারে না। চৌখস বলে, এক উপায় আছে, অজ্ঞান এবং চালাককে দুই ভাঁড় ময়লা কাঁধে করিয়া ডিপোয় লইয়া যাইতে হইবে। বাধ্য হইয়া অজ্ঞান আর চালাক ময়লা ঘাড়ে করিয়া পথ চলে। বক্কেশ্বর হতাশ হইয়া বোষ্টম হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। অজ্ঞানের বাড়ীর ঝি বলে, সে বোষ্টমী হইতে চায়। ঝিকে বোষ্টমী করিতে বক্কেশ্বর রাজী হয়।

অতুলকৃষ্ণের 'বুড়ো বাঁদর' প্রহসনখানি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহারও একটি ইংরেজি পরিচায়িকা আছে, তাহা 'The Old Cuckold'; কবিতায়ও একটি পরিচিতি আছে, তাহা এই, 'বুড়ো বয়সে বিয়ে করা। আপনা হাতে জ্যান্তে মরা॥' দীনবন্ধুর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' রচনার পর এই বিষয়ে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসের মধ্য যুগ ব্যাপিয়া যে অনুরূপ বিষয়ক অসংখ্য নাটক রচিত হইয়াছে, ইহা তাহাদেরই অন্যতম মাত্র। দীনবন্ধুর মধ্যে রুচির যে পরিচয়ই প্রকাশ পাক, তাঁহার সৃজনী প্রতিভার গুণে তাহা অনেক ক্ষেত্রেই রসোত্তীর্ণ হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার অনুকরণ-জাত রচনায় কেবল মাত্র অশ্লীলতাই আছে, অন্য কোন গুণ নাই। ইহাতে বৃদ্ধ ষণ্ডেশ্বরের দুই পত্নীর মধ্যে কনিষ্ঠা পুঁটে কি ভাবে ভ্রষ্টা হইয়াছিল এবং শেষ পর্যন্ত কি ভাবে সে শিক্ষালাভ করিয়াছিল, তাহারই বর্ণনা আছে। নাট্যকার ইহার ভিতর দিয়া সমাজকে এই শিক্ষাই দিতে চাহিয়াছেন, বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করাও যেমন দোষ, বৃদ্ধের তরুণী ভার্যা হইয়া পর-পুরুষাসক্তিও তেমনই দোষ। এই নীতিকথা প্রচার ব্যতীত এই নাটকের আর কোন মূল্য নাই। ইহার কাহিনী নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, 'বুড়ো বাঁদর' নামকরণও উদ্দেশ্যহীন।

সমাজ-সম্পর্কে অতুলকৃষ্ণের অমৃতলালের মত স্বকীয় কোন মনোভাব কিংবা বিশ্বাস ছিল না; সেইজন্য দশজন যাহা লইয়া সমাজকে ব্যঙ্গ করিয়াছে, তিনিও তাহা লইয়াই সমাজকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন।

রাজকৃষ্ণের মতই অতুলকৃষ্ণেরও কল্পনা-শক্তি অত্যন্ত দুর্বল ছিল ; সেইজন্য রোমাণ্টিক নাটকের যে ধারা বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যযুগেও বিশেষ সক্রিয় ছিল, তিনি তাহা অনুকরণ করিতে পারেন নাই। একখানি মাত্র রোমাণ্টিক নাটক রচনা করিয়াই এই বিষয়ে তিনি তাঁহার সামর্থ্যের পরিচয় পাইয়াছিলেন। তাঁহার এই একমাত্র রোমাণ্টিক নাটকখানির নাম 'পিশাচিনী বা যাতনা-যন্ত্র'। ইহার কাহিনী নিতান্ত গতানুগতিক এবং অনুরূপ কাহিনী অবলম্বন করিয়া ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে একাধিক নাটক রচি হইয়াছে। প্রথম পক্ষের গুণবতী স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় বার বিবাহ করিবার ফলে এক বৃদ্ধ রাজার পরিবারে কি শোচনীয় দুর্দশা দেখা দিয়াছিল, তাহাই ইহার বর্ণিতব্য বিষয়। ইহার কাহিনী সংস্থাপনায় নাট্যকারের যেমন কোন কৌশল প্রকাশ পায় নাই, চরিত্র-সৃষ্টিতেও তিনি তেমনই কোন সার্থকতা দেখাইতে পারেন নাই। দ্বিতীয়া রাণী সুরঙ্গিনীকে তিনি যাতনা দিবার একটি যন্ত্র স্বরূপই কল্পনা করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে রক্তমাংসের কোন সম্পর্ক রাখেন নাই; সেই দিক দিয়া নাটকখানির 'যাতনা-যন্ত্র' নামটি খুবই সার্থক। ইহার মধ্যে যান্ত্রিক ক্রিয়াই প্রকাশ পাইয়াছে, মানবিক ক্রিয়া প্রকাশ পায় নাই। অলৌকিক এবং অবাস্তব ঘটনা দ্বারা নাটকটি পরিপূর্ণ। নাটকখানির দোষত্রুটি সম্পর্কে অবহিত হইয়াই পরবর্তী কালে অতুলকৃষ্ণ ইহা আনুপূর্বিক মার্জিত করিয়া গীতিনাট্যরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহার নূতন নামকরণ করিয়াছিলেন 'সপত্নী'—কিন্তু গীতিনাট্যরূপেও ইহা সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই।

গিরিশচন্দ্র মহাপুরুষের জীবন-চরিত অবলম্বন করিয়া নাট্যরচনার যে ধারা প্রবর্তিত করিয়াছিলেন, তাহাই অনুসরণ করিয়া অতুলকৃষ্ণ হজরত মোহম্মদের জীবনীমূলক 'ধর্মবীর মহম্মদ' নামক একখানি নাটক রচনা করেন। কিন্তু ইহা মুসলমান ধর্মমত বিরুদ্ধ কার্য ছিল বলিয়া ইহার অভিনয় ও প্রচার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

নাটকীয় কাহিনী পরিকল্পনা ও ঘটনা-সংস্থাপনায় যেমন অতুলকৃষ্ণ সমসাময়িক নাট্যকারদিগের অনুকরণ করিয়াছিলেন, তেমনই নাটকীয় ভাষার ব্যবহারেও তিনি কোনই মৌলিকতা দেখাইতে পারেন নাই। এই বিষয়েও তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক লেখকদিগকেই অনুকরণ করিয়াছেন। তিনি মাইকেলী অমিত্রাক্ষর, গৈরিশ ও সাধারণ গদ্য প্রভৃতি সবই তাঁহার

রচনায় ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু ইহাদের কোনটি তিনি: বিষয়ানুরূপ প্রয়োগ করিতে পারেন নাই। কোন ছন্দেরই অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে তাঁহার পরিচয় স্থাপিত হইতে পারে নাই, সেইজন্য ইহাদিগকে লইয়া তিনি যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়াছেন। অতুলকৃষ্ণের নাট্যরচনার ইহা অন্যতম গুরুতর ত্রুটি।

সপ্তম অধ্যায়

বিবিধ নাট্যকার

(১৮৭৬—১৯০০)

গিরিশচন্দ্র প্রবর্তিত পৌরাণিক নাট্যরচনার ধারাটি প্রধানত অবলম্বন করিয়া নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের আবির্ভাব হয়। তিনিও গিরিশচন্দ্রের মত জীবনের শেষদিন পর্যন্ত রঙ্গমঞ্চের সঙ্গেই সংশিষ্ট ছিলেন। সেইজন্য রচনার সংখ্যাও স্বভাবতই তাঁহার নিতান্ত নগণ্য নয়। সমসাময়িক নাট্যকারদিগের প্রভাববশত তিনিও কয়েকখানি অন্যান্য শ্রেণীর নাটক রচনা করিলেও তাঁহার পৌরাণিক নাটকের সংখ্যাই সর্বাধিক এবং ইহাদের ভিতর দিয়াই তাঁহার যৎসামান্য বৈশিষ্ট্যও প্রকাশ পাইয়াছে—এখানে তাঁহার কয়েকটি নাটকের পরিচয় দেওয়া যাইবে।

গিরিশচন্দ্রের 'রাবণ বধ' নাটকের অনুকরণ করিয়া বিহারীলাল তাঁহার প্রথম নাটক 'রাবণ বধ' রচনা করেন। গিরিশচন্দ্র যেমন একমাত্র গৈরিশ ছন্দে তাঁহার এই নাটক রচনা করিয়াছেন, বিহারীলাল তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইহাতে আরও বিভিন্ন ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন—মাইকেলী অমিত্রাক্ষরের ব্যর্থ অনুকরণ ব্যতীতও ইহাতে বিভিন্ন মিত্রাক্ষর যুক্ত পদও ব্যবহৃত হইয়াছে। চরিত্রের পরিচয় অনুযায়ী বিভিন্ন ছন্দ ইহাতে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা বিহারীলালের পরীক্ষামূলক (experimental) প্রথম রচনা মাত্র। অতএব ইহার মধ্যে রচনার দিক দিয়া যেমন কোন স্থিরতা দেখা দেয় নাই, তেমনই চরিত্র-সৃষ্টির দিক দিয়াও কোন সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যাইবে না। রামচন্দ্রের বীরত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া নাট্যকার তাঁহার চরিত্রের অন্য একটি দিক মসীলিপ্ত করিয়াছেন, রামচরিত্রের সমুচ্চ আদর্শ তিনি ইহাতে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

পাণ্ডবদিগের বনবাসের বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া বিহারীলাল 'পাণ্ডব-নির্বাসন' নামক একখানি নাটক রচনা করেন। মাইকেলী অমিত্রাক্ষরের ব্যর্থ অনুকরণজাত ছন্দ দ্বারা ইহা রচিত বলিয়া রচনার দিক দিয়া ইহা যেমন ব্যর্থ হইয়াছে, তেমনি ঘটনার ভিতর দিয়া কাহিনীর অগ্রগতি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই বলিয়া ইহার কাহিনী-বিন্যাসও সার্থক হয় নাই।

প্রভাস-মিলনের কাহিনী অবলম্বন করিয়া ইতিপূর্বে যে একখানি নাটক রচিত হইয়াছিল তাহাই অবলম্বন করিয়া বিহারীলালও 'প্রভাস-মিলন' নামক একখানি নাটক রচনা করেন। ইহার ভিতর দিয়া নাট্যকার কেবলমাত্র বিভিন্ন ঘটনাগুলি পরিবেশন করিয়াই নিজের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন. যে সুগভীর অনুভূতির উপর প্রভাস-মিলনের আনন্দ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে তাহার কণামাত্রও তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-পরিত্যাগ-বিষয়ক কাহিনী অবলম্বন করিয়া অতুলকৃষ্ণ মিত্র গিরিশচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে 'নন্দ-বিদায়' নামক যে নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাহারই অনুসরণ করিয়া বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় তাঁহার 'নন্দ-বিদায়' নামক নাটক রচনা করেন। সংলাপে বিভিন্ন ছন্দের পদ্য ব্যবহারের পরিবর্তে নাট্যকার ইহাতে কেবলমাত্র গদ্য ব্যবহার করিয়াছেন, ইহার রচনায় নাট্যকার কোন দিক দিয়াই অতুলকৃষ্ণের যশ অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

মহাভারত হইতে প্রাসঙ্গিক বিবরণ গ্রহণ করিয়া বিহারীলাল 'পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ' নামক একখানি নাটক রচনা করেন, গদ্য সংলাপের সঙ্গে ইহাতে গতানুগতিক পয়ার ছন্দও ব্যবহৃত হইয়াছে, পরিকল্পনা কিংবা রচনার দিক দিয়া ইহার কোনও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় নাই।

ঊষা-অনিরুদ্ধের সুপরিচিত প্রণয়-কাহিনী অবলম্বন করিয়া বিহারীলাল 'বাণযুদ্ধ' নাটক রচনা করেন। ইহার এই সুকোমল প্রণয়-বিবরণটির পার্শ্বে শৈব ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব বিষয়টিও সমান্তরালভাবে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে—শৃঙ্গার ও বীররস দুই-ই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, কিন্তু কাহিনী-বিন্যাস ও ঘটনা-সংস্থাপনায় গ্রন্থকার কোন নাটকীয় কৌশল দেখাইতে পারেন নাই বলিয়া ইহার রচনা বৈশিষ্ট্যহীন বলিয়াই বোধ হইবে। নানা অলৌকিক ও রোমাঞ্চকর কাহিনীতে পরিপূর্ণ হইয়া ইহা রোমান্টিক নাটকের লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছে।

মহাভারতের বিষয় অবলম্বন করিয়া বিহারীলাল 'দুর্যোধন বধ' নামক একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। বাংলা নাট্যসাহিত্যের আদি যুগে হরচন্দ্র ঘোষ 'কৌরব বিয়োগ' নামক যে নাটক রচনা করেন, ইহা কতকটা তাহারই অনুরূপ। নাটকীয় ক্রিয়া অপেক্ষা ঘটনার মৌখিক বর্ণনাই ইহার বৈশিষ্ট্য।

রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে সংশিষ্ট থাকিতেন, তাঁহারা প্রায়

প্রত্যেকেই জন্মাষ্টমী উপলক্ষে দর্শকদিগের রাত্রি-জাগরণের উপায় স্বরূপ জন্মাষ্টমী বিষয়ক এক একটি নাটক রচনা করিয়া রঙ্গমঞ্চের ভিতর দিয়া তাহা পরিবেশন করিতেন। বিহারীলালও সেই অনুযায়ী তাঁহার 'জন্মাষ্টমী' নাটক রচনা করিয়াছিলেন। এই শ্রেণীর রচনা নিদ্রার প্রতিষেধক মাত্র, কোন প্রকার শিল্পগুণ ইহাদের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতে পারে না, বিহারীলালের এই নাটকখানিও তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম নহে। এতদ্ব্যতীত বিহারীলাল 'অহল্যা-হরণ', 'দ্রৌপদী-স্বয়ংবর', 'ধ্রুব', প্রভৃতি বিবিধ পৌরাণিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন। নামের মধ্যে ইহাদের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার অতিরিক্ত ইহাদের আর কোন শিল্প-পরিচয় নাই।

বিহারীলাল একখানি মাত্র পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক রচনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, ইহার নাম 'মিলন'। ঘটনার বাহুল্য ইহার একটি প্রধান ত্রুটি। সংলাপের দৈর্ঘ্য কাহিনীর গতি সর্বত্র ব্যাহত করিয়াছে। ইহার কোন চরিত্রসৃষ্টিও সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই।

গিরিশচন্দ্রের অনুকরণে ভক্তের জীবন অবলম্বন করিয়া বিহারীলাল 'নরোত্তম ঠাকুর' নামক ধর্মমূলক নাটক রচনা করিয়াছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক নরোত্তম ঠাকুরের ত্যাগ, বৈরাগ্য ও জিতেন্দ্রিয়তার কাহিনী অবলম্বন করিয়া ইহা রচিত হইয়াছে। কাহিনীর মধ্যে নাটকীয় উপাদান থাকা সত্ত্বেও নাট্যকার তাহার যথাযথ ব্যবহার করিতে পারেন নাই। রচনার মধ্যে কোথাও ইহাতে হৃদয়ের স্পর্শ অনুভব করা যায় না, যান্ত্রিক নিয়মে যেন ইহার ঘটনাগুলি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ঘটিয়া গিয়াছে।

বিহারীলাল দুইখানি মাত্র গীতিনাট্য রচনা করিয়াছিলেন। সংখ্যার দিক দিয়া যেমন ইহা নগণ্য, শিল্পগুণের দিক দিয়াও তেমনই ইহারা অকিঞ্চিৎকর। ইহাদের নাম 'হরি-অন্বেষণ' ও 'বৃন্দাবন-দৃশ্যাবলী'। গীত রচনায় বিহারীলালের কোন দক্ষতা ছিল না বলিয়া ইহারা কোন বিষয়েই আকর্ষণ সৃষ্টি করিতে পারে নাই।

বিহারীলালের প্রহসনের সংখ্যাও তাঁহার গীতিনাট্যের সংখ্যার মতই নিতান্ত সামান্য। ইহারা হাস্যরসাত্মক রচনা হইতে পারে, কিন্তু একখানিও প্রহসন নহে। নাট্যকার সব কয়খানিকেই 'পঞ্চরং' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহাদের নাম 'নবরাহা বা যুগ মাহাত্ম্য', 'মুই হাঁদু', 'যমের ভুল' ইত্যাদি।

গিরিশচন্দ্র 'পঞ্চরং' পরিবেশন করিবার যে রীতি প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহাই অনুসরণ করিয়া বিহারীলাল তাঁহার স্ব-পরিচালিত রঙ্গমঞ্চের জন্য এই কয়খানি 'পঞ্চরং' রচনা করিয়াছিলেন, ইহাদের মূলে আর কোন প্রেরণা ছিল না। এই রচনাগুলির ভিতর দিয়া বিহারীলাল কেবলমাত্র গতানুগতিকতাই অনুসরণ করিয়াছিলেন, কোন মৌলিক বাস্তব দৃষ্টির পরিচয় দিতে পারেন নাই।

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে নাটক রচনার সূত্রপাত করিয়া বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যযুগের ধারাটি বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত অগ্রসর করিয়াছিলেন। তাঁহার অধিকাংশ নাটকই বিংশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হইলেও বাংলা নাট্যসাহিত্যের আধুনিক যুগের কোন প্রভাবই তাহার উপর কার্যকর হইতে পারে নাই। তিনি প্রধানত উনবিংশ শতাব্দীর হাস্যরসাত্মক নাট্যরচনার ধারাটিই অবলম্বন করিয়াছিলেন, ইহার পৌরাণিক ধারাটির সঙ্গে তাঁহার নিবিড় যোগ স্থাপিত হইতে পারে নাই। অমরেন্দ্রনাথও উনবিংশ শতাব্দীর অন্যান্য নাট্যকারের মতই ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, রঙ্গমঞ্চের দাবি হইতেই তাঁহার নাটক রচনার প্রেরণা আসিয়াছিল। সেইজন্য তাঁহার রচনায় বিষয়গত বৈচিত্র্যও সংখ্যাগত বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যাইবে; কিন্তু অন্তর্নিহিত গুণের দিক দিয়া বিচার করিলে ইহাদিগকে নিতান্তই নগণ্য মনে হইবে।

বড়দিন উপলক্ষে সেকালের কলিকাতার ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চে গিরিশচন্দ্র যে 'পঞ্চরং' বা পাঁচ মিশালি তামাশা পরিবেশন করিবার ধারা প্রবর্তন করিয়াছিলেন, অমরেন্দ্রনাথের রচনা অধিকাংশই সেই শ্রেণীর। ইহাদের মধ্যে প্রধানত তদানীন্তন কলিকাতার পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষিত সমাজকে ব্যঙ্গ করা একটি সাধারণ বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার হাস্যরসাত্মক রচনায় এই গতানুগতিক বিষয়ই অবলম্বন করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার নিজস্ব কোন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় নাই। সে যুগের কলিকাতার সমাজের কতকগুলি ভণ্ড চরিত্র অবলম্বন করিয়াই তিনি তাঁহার 'কাজের খতম্' পঞ্চরং রচনা করেন। তাঁহার 'মজা' নামক অনুরূপ রচনাটির মধ্যে একটি সুসংবদ্ধ কাহিনী আছে; ইহার ঘটনা-সংস্থাপনায় নাট্যকার কৌতুকরস সৃষ্টি করিতে কতকটা সাফল্য লাভ করিয়াছেন। নব স্বাধীনতা-লব্ধ স্ত্রীসমাজের স্বাধীন প্রেমই ইহার ব্যঙ্গের বিষয়। প্রতিযোগী এক রঙ্গমঞ্চ-ব্যবসায়ীকে উপহাস করিয়া অমরেন্দ্রনাথের

'থিয়েটার' নামক একখানি ব্যঙ্গাত্মক নাটক রচিত হয়। উদ্দেশ্য প্রচার ব্যতীত ইহা দ্বারা আর কোন লক্ষ্য সাধিত হয় নাই। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার মোহগ্রস্ত তদানীন্তন কলিকাতার সমাজকে আঘাত করিয়া তিনি 'চাবুক' নামক একটি ব্যঙ্গ নাট্য রচনা করেন। ইহার আঘাত যেমন ক্ষিপ্র, জ্বালাও তেমনই তীব্র। ব্যক্তিবিশেষকে উপলক্ষ করিয়া তিনি 'গুপ্তকথা' নামকও একখানি ব্যঙ্গ রচনা প্রকাশ করেন—ব্যক্তিগত বিষোদ্গার ব্যতীত ইহার আর কোন মূল্য প্রকাশ পায় নাই। 'ঘুঘু' ইহার অনুরূপ রচনা। একটি রোমান্টিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার 'কেয়া মজাদার' প্রহসনখানি রচনা করেন। ইহার মধ্যে একটি সুস্পষ্ট কাহিনী থাকিলেও সঙ্গীতে ও কবিতায় ইহার বাঁধুনি শিথিল হইয়া গিয়াছে। তাঁহার 'প্রেমের জেপলিন' নামক রচনাটির মধ্যে যে কাহিনীটি আছে, তাহা বরং ইহা হইতে অধিক সুসংবদ্ধ—ইহাকে তিনি একটি প্রহসনের রূপদান করিতে সক্ষম হইয়াছেন। অমরেন্দ্রনাথ 'লাট গৌরাঙ্গ', 'হলো কি?' 'কিসমিস' ইত্যাদি আরও কয়েকখানি হাস্যরসাত্মক রচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাদের কোন কোনটির মধ্যে কাহারও ব্যক্তিগত বিষয় লইয়া বিদ্রূপ করিবার প্রবৃত্তি অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। যথার্থ নাট্যগুণ ইহাদের কাহারও মধ্যে প্রকাশ পাইতে পারে নাই।

হাস্যরসাত্মক নাটকের পরই অমরেন্দ্রনাথের রোমান্টিক নাটকগুলির নাম উল্লেখ করিতে হয়। এবিষয়ে 'নির্মলা' নামক রচনাটিই তাঁহার সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য নাটক। একটি কিংবদন্তীমূলক কাহিনী ইহার ভিত্তি। সঙ্গীতের আধিক্যের জন্য নাট্যকার ইহাকে 'গীতিকাব্য' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার প্রণয়-কাহিনীটিতে নাটক অপেক্ষা কাব্যের প্রাণ অধিকতর স্পন্দিত হইয়াছে।

এক ক্ষত্রিয়-সন্তান ও এক ভীল নারীর প্রেমের বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া অমরেন্দ্রনাথের 'ফটিকজল' নামক নাটকটি রচিত। ইহাও গীতি-ভারাক্রান্ত রচনা—চরিত্র পরিকল্পনা এবং ঘটনা সংস্থাপনায় নাট্যকারের ইহাতেও কোন কৌশল প্রকাশ পায় নাই। বিচিত্র লোমহর্ষক ঘটনা ও বহুল নৃত্যগীতের সমাবেশে অমরেন্দ্রনাথের 'দলিতা ফণিনী' নাটকটি রচিত। নারীচরিত্রের একটি নিগূঢ় দিক নাট্যকার ইহার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সূক্ষ্ম অন্তর্বিশ্লেষণ-শক্তির অভাবে তাঁহার এই প্রয়াস সার্থক হইতে পারে নাই। অমরেন্দ্রনাথের আর তিনখানি রোমান্টিক নাটকের নাম 'আশা কুহকিনী'

'জীবনে মরণে' ও 'দু'টি প্রাণ'। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত নাটকটি অমৃতলালের পরামর্শ মত রচিত, দ্বিতীয় নাটকখানি রবীন্দ্রনাথ রচিত 'গল্পগুচ্ছে'র 'দালিয়া' নামক ছোট গল্প ও শেষোক্ত নাটকখানি সুপরিচিত বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী অবলম্বন করিয়া রচিত। ইহাদের কাহারও মধ্যে নাট্যকার কোনও মৌলিক কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই।

গিরিশচন্দ্রের মত অমরেন্দ্রনাথও নিতান্ত সমসাময়িক বিষয় লইয়া নাটক রচনা করিয়া তাঁহার নিজ-পরিচালিত রঙ্গমঞ্চের ভিতর পরিবেশন করিয়াছেন। কলিকাতার তদানীন্তন স্বদেশীভাবাপন্ন দর্শকদিগের জন্য যেমন তিনি 'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ' বা 'Partition of Bengal' নামক নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তেমনই রাজভক্ত দর্শকদিগের জন্য তিনি 'এস যুবরাজ' নামক নাটকও রচনা করিয়াছিলেন। উভয় নাটক একই বৎসর মাত্র চারি মাসের ব্যবধানে রচিত হয়। ইহাদের কাহারও মধ্যে নাট্যকারের নিজস্ব মনোভাব প্রকাশ পায় নাই, কেবল মাত্র দুই শ্রেণীর দর্শকের বিভিন্ন দুইটি মনোভাবেরই অভিব্যক্তি হইয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত আর যাঁহারা নাটক রচনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে তেমন উল্লেখযোগ্য আর কেহ নাই। যাঁহারা পৌরাণিক কিংবা রোমান্টিক নাটক রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই গিরিশচন্দ্রকে অনুসরণ করিয়াছেন, যাঁহারা সামাজিক নাটক কিংবা প্রহসন রচনা করিয়াছেন, তাঁহারাও প্রধানত অমৃতলালেরই শিষ্য ছিলেন; অনেকে মাইকেল মধুসূদনের প্রহসন দুইখানিকেও অনুকরণ করিয়াছেন। নিম্নে কয়েকজন নাট্যকারের অধুনা-বিস্মৃত যে কয়খানি নাটক ও প্রহসনের কথা উল্লেখ করা গেল, তাহাদের মধ্য হইতে এই বিষয়ই প্রমাণিত হইবে। এই নাটক ও প্রহসনগুলির বিষয়-বস্তু হইতে আরও একটি বিষয় প্রমাণিত হইবে যে, তখন সমাজের সমস্যার জন্য নাট্যকারগণ সমাজের মধ্যে দৃষ্টিপাত না করিয়া প্রধানত এই বিষয়ক পূর্ববর্তী নাটকগুলিকেই অনুকরণ করিতেন। তাহার ফলে একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তিতে নাটক ও প্রহসনগুলি ভারাক্রান্ত হইয়া রহিয়াছে। এই ভাবে অনুকরণ করিবার ফলেই বক্তব্য বিষয়ের মধ্য দিয়া যথার্থ শক্তি সঞ্চারিত হইতে পারে নাই। ইহাদের বিষয়বস্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিতান্ত তুচ্ছ, জীবনের কোন গভীর কথা ইহাদের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতে পারে নাই। সর্ববিষয়ক এই অধঃপতনের ভিতর দিয়াই এই যুগের সামাজিক নাটক ও প্রহসনের ধারাটির বিলুপ্তি ঘটিয়া

গেল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি নাটকের বিষয় এখানে একটু বিস্তৃত ভাবেই উল্লেখ করিব।

শ্যামলাল মুখোপাধ্যায় ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে 'তুমি যে সর্বনেশে গোবর্ধন' নামক একখানি প্রহসন রচনা করেন। কুসঙ্গ কিরূপে একটি শিশুকে অধঃপতনের পথে লইয়া যাইতে পারে, এই প্রহসনটির মধ্য দিয়া তাহাই দেখান হইয়াছে। ইহার কাহিনীটি এইরূপ—

হরিহরবাবুর দশ বৎসরের পুত্র গোবর্ধন কতকগুলি ইতর বালকের সহিত মিশিয়া অনেকগুলি নেশা করিতে শিখিয়াছে। পিতার যথেষ্ট প্রহার সহ্য করিয়াও সে তাহার স্বভাব পরিবর্তন করিতে পারে নাই। গোপালবাবু হরিহরবাবুর বন্ধু। তাঁহার নিকট হরিহরবাবু নিজ পুত্রের ভবিষ্যৎ লইয়া আক্ষেপ করেন; গোপালবাবু তাঁহার সন্তানকে এখন হইতেই নিয়ন্ত্রিত করিতে পরামর্শ দেন। বলা বাহুল্য, গোপালবাবুর প্রতি গোবর্ধন এবং তাহার সঙ্গিগণ নিতান্ত ক্রুদ্ধ হয়; তাহারা তাঁহাকে শাস্তি দিবার সঙ্কল্প করে। কিন্তু নেশার প্রসঙ্গ আসিয়া যাওয়ায় সে কার্য স্থগিত থাকে। প্রতিদিন অহিফেন কিংবা গঞ্জিকা আরামদায়ক নয়। সেইজন্য মদ্যপানের জন্য গোবর্ধন লালায়িত হয়। জীবন আসিয়া পরামর্শ দেয়—গণিকাগৃহে যাইয়া মদ্যপান করা প্রশস্ত। গোবর্ধনকে সে বলে,—'আমি গরাণহাটার বাড়ীতে একটি মেয়ে মানুষ দেখিয়াছি, অতি চমৎকার, শালীর কি বাহার, শালীকে দেখ্‌লে মুনির মন ভুলে যায়!' যথাসময়ে তাহারা গরাণহাটার খুকুমণি বেশ্যার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হয়। পূর্বে সংবাদ পাইয়া হরিহরবাবুও ভৃত্যের সহিত সেখানে যাইয়া আবির্ভূত হইলেন। গোবর্ধনের সঙ্গিগণ পলায়ন করিল। গোবর্ধনকে তিনি অত্যন্ত নির্দয়ভাবে প্রহার করিলেন। কিন্তু তাহাতেও কিছু ফল হয় না। গোবর্ধনের সারাগাত্রে বেদনা। গঞ্জিকা সেবনে শারীরিক বেদনা লাঘব হয়—বন্ধুদিগের হিতাকাঙ্ক্ষায় গোবর্ধন গঞ্জিকা সেবন করে এবং পুনরায় গণিকাগৃহে যাইবার সঙ্কল্প করে। অধঃপতন চরমে পৌঁছাইল। একদা গণিকাগৃহে মারামারির সুযোগে গোবর্ধন তথা হইতে একখানি মূল্যবান শাল চুরি করিয়া আনে এবং বন্ধুদিগের নিকট নিজের কৃতিত্ব প্রকাশ করে। পিতা ও মাতা পুত্রের জন্য সর্বদা আক্ষেপ করেন। দুশ্চিন্তায় পিতা হরিহরবাবুর দেহ ও মন ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি দেহত্যাগ করিলেন। গোবর্ধন অনুশোচনা এবং আক্ষেপ করে।

দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'র ধারা অনুসরণ করিয়া ক্রমাবনতির পথে

অগ্রসর হইতে হইতে বাংলা প্রহসন যে কত নীচস্তরে আসিয়া সেদিন পৌঁছিয়াছিল, ইহা তাহারই প্রমাণ।

সেই বৎসরই হীরালাল ঘোষ কর্তৃক রচিত 'রোকা কড়ি চোকা মাল' নামক নাটকে হিন্দুবিবাহে পাত্রপক্ষের পণপ্রথা গ্রহণ লইয়া কটাক্ষ করা হইয়াছে।

গোবরডাঙ্গার রাখালচন্দ্র রায়ের কন্যা বয়স্থা। বিবাহের অত্যন্ত বাধা। কারণ, পাত্রপক্ষ সাধ্যাতীত অর্থ প্রার্থনা করে। একদা ঘটক আসে। খাঁটুরা নিবাসী বসন্ত ঘোষ তাঁহার পুত্রের বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন। তিনি ঘটককে বলিয়া রাখিয়াছেন—'বর দেখে দরদস্তুর হলে তারপর গিয়ে দেখে আসব—নইলে শুধু হাঁটাহাঁটি করে কি হবে!' রাখালবাবু বিপদে পড়েন। অর্থাভাবে তিনি দত্তপুকুরের বন্ধু এবং বারাসতের মিত্রের সম্পর্ক হাতছাড়া করিয়াছেন। ইছাপুরের একজন বৃদ্ধ পাত্রের পক্ষ হইতে অবশ্য তাঁহার সাধ্যের অতিরিক্ত অর্থ চাওয়া হয় নাই। কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর ইহাতে যথেষ্ট আপত্তি আছে। বসন্ত ঘোষের গৃহে রাখালবাবু যাইয়া উপস্থিত হন এবং পাত্র দেখিবার আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করেন। বসন্তবাবু বলেন,—'আগে ইদিক্কার না চুকলে ছেলে আন্‌বো না, ক্রমে ক্রমে পাশ করে এখন আউট হয়ে বসেছে, ওর দর কত, ওকে কি হট্ বল্‌তেই যাকে তাকে দেখান যায়?' বসন্তবাবু রাখাল বাবুকে একটি তালিকা দেন এবং বলেন,—'এই ফর্দটা নেও, এতে রাজী হও তো ছেলে দেখাবো।' 'আগে বাজারটা দেখে আসুন, পরে দরদস্তুর করবেন।' একটি অভিসন্ধি গ্রহণ করিয়া রাখালবাবু ইহাতে রাজী হন। তখন বসন্ত পূর্বকৃত দুর্ব্যবহারের জন্য মার্জনা ভিক্ষা করেন এবং বিবাহের দিন স্থির হয়। গৃহের ভৃত্য মৃদুহাস্যে চিন্তা করে—'এ বাপ বেটার চেয়ে আমি বিদ্বান্ আছি, আমার বে দিলেন না কেন!' বিবাহের দিন বসন্তবাবু আসিয়া প্রথমেই রাখালবাবুর নিকট প্রাপ্য অর্থ প্রার্থনা করেন। রাখালবাবু তাঁহাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে বলেন। যথাসময়ে রূপবতী কন্যাকে তিনি তাঁহার সম্মুখে আনিয়া বলিলেন যে, 'কন্যাটি ব্যতীত অপর কিছু দিতে তিনি অক্ষম।' বসন্তবাবু ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ পাত্রটিকে টানিয়া লইয়া যাইতে চাহিলেন। কন্যার রূপমুগ্ধ হইয়া পাত্রটি বাঁকিয়া বসিল। অবশেষে বরকর্তার তীব্র অমত সত্ত্বেও রাখালবাবুর কন্যার সহিত পাত্রের বিবাহ হইয়া গেল।

নাট্যসাহিত্যের সমগ্র মধ্যযুগ ব্যাপিয়া যে এই বিষয়ক অসংখ্য নাটক রচিত হইয়াছে, ইহাতে তাহাদেরই ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র শুনা যায়।

যৌথ পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার ফলে নূতন নাগরিক জীবনে যে নূতন করিয়া পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপিত হইতেছিল, তাহাই ভিত্তি করিয়া ১৮৮১ সনে হরিপদ চট্টোপাধ্যায় 'পিণ্ডদান' নামক প্রহসন রচনা করেন। প্রহসনটির বিষয় স্ত্রীসর্বস্বতার পরিণাম। কাহিনীটি এই—

নিত্যানন্দ গোস্বামী স্ত্রৈণ ব্যক্তি। সত্য ঘটনাকে স্ত্রী মিথ্যা বলিয়া বর্ণনা করিলে তাহাই সে বিশ্বাস করিয়া লয়। স্ত্রীর নিকট নিতান্ত অবিশ্বাস্য উক্তি শুনিয়া সংশয় প্রকাশ করিলে স্ত্রী কপট অভিমান করে। সুতরাং নিত্যানন্দকেও তখন বাধ্য হইয়া তাহা বিশ্বাস করিতে হয়। সাধারণের স্ত্রৈণ বলিয়া বিদ্রূপে সে দুঃখিত, কিন্তু স্ত্রীর মৌখিক প্রেমোচ্ছ্বাসে সে দুঃখে ভাসিয়া যায়। নিত্যানন্দ একদা কর্মব্যপদেশে বাধ্য হইয়া প্রবাসে যাইবে স্থির করিল। স্ত্রী তাহার সহিত যাইতে চাহিল। নিত্যানন্দ লোকলজ্জাবশে তাহাকে বুঝাইয়া নিরস্ত করিল। স্ত্রীকে বলিল, বন্ধু বিনয় তাহার দেখাশুনা করিবে, কোনও চিন্তা নাই। নিত্যানন্দ চলিয়া গেল, বাড়িতে রহিল নিত্যের পিসীমা এবং স্ত্রী বিনোদ। পূর্ব হইতেই বিনোদের সহিত বিনয়ের অবৈধ প্রেম জন্মিয়াছিল। নিত্যানন্দের অনুপস্থিতিতে তাহাদের সুবিধা হইল। কয়েকদিন পর নিত্যানন্দ প্রত্যাবর্তন করিল। তখন বিনোদ ও বিনয় প্রেমালাপে ব্যস্ত ছিল। নিত্যানন্দের সাড়া পাইয়া বিনোদ বিনয়কে পাশের চোরকুঠরিতে লুকাইয়া রাখিল। অন্ধকার ঘর। স্ত্রীর মুখচন্দ্র দেখিবার জন্য ব্যাকুল নিত্যানন্দ প্রদীপ জ্বালিতে বলে, এমন সময় চোরকুঠরির দিক হইতে ভৌতিক স্বরে কেহ যেন জল চাহিল। বিনোদ স্বামীকে বলিল, স্বামীর অনুপস্থিতিতে প্রতিদিন এরূপ ভৌতিক উপদ্রব চলিতেছে। নিত্যানন্দ স্ত্রীর সাহসের প্রশংসা করিল; কিন্তু নিজে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল। বহুকষ্টে সাহস সঞ্চয় করিয়া ভূতরূপী আত্মগোপনকারী বিনয়কে প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিল যে, ভূত স্বয়ং তাহার পিতা হরানন্দ। শুনিয়া সে চমকিত হইল। গৃহে সাবিত্রী চতুর্দশীব্রত উপলক্ষে প্রাপ্ত একটি ডাব ছিল। তাহা ভূতকে পান করিতে দিল। ভূত তাহা পান করিয়া তাহাতে প্রস্রাব করিয়া নিত্যকে তাহা প্রসাদ বলিয়া পান করিতে বলিল। নিত্য মুখ বিকৃত করিয়া তাহা পান করিল, কিন্তু অন্যপ্রকার সন্দেহ তাহার মনে প্রবেশ করিল না। পিণ্ডদানের উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ নিত্যানন্দ গয়ায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। স্ত্রী পুনরায় স্বামীর বিচ্ছেদের আশঙ্কায় ক্রন্দনের ভাণ করে। তখন নিত্যানন্দ স্ত্রীর হস্তে একশত টাকা প্রদান করিয়া অতি সামান্য পাথেয় লইয়া গয়ায় যাত্রা করিল।

বিনোদ ও যথারীতি স্বামি-প্রদত্ত একশত টাকা পাথেয় করিয়া বিনয়কে লইয়া দেশান্তরে গমন করিল। গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া নিত্যানন্দ নিজের বুদ্ধি ও ভাগ্যকে ধিক্কার দেয় এবং অনুশোচনা করে।

স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ক অমৃতলাল বসুর মতবাদের প্রতিধ্বনি করিয়া ১৮৮৫ সালে রাখালদাস ভট্টাচার্য 'স্বাধীন জেনানা' নামক প্রহসন রচনা করেন। স্ত্রীশিক্ষার 'কুফল' লইয়া প্রহসনটি রচিত। কাহিনীটি নিম্নরূপ—

গৃহিণীর অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া এবং পিতার নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া নেপাল একটি প্রেস কিনিয়াছে। যথারীতি সে একটি সংবাদপত্রও প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু ইহাতে তাহার আর্থিক লাভ অপেক্ষা ক্ষতিই হয়। কখন কখন সে চোগা চেন ধারণ করিয়া টাউন হলের সভায় যায়। এ সকল পোষাকের ব্যবস্থা ধারকর্জ দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। সে বলে,—'এখন কার্য চাই—কেবল কার্য—কার্য—কার্য। তবেই দেখিবেন আমরা আবার উন্নত হ'ব। এখন একটা এজিটেশনের বড় দরকার হয়েছে।' প্রতিবেশী বীরেশ্বর যখন বলেন —পূর্বে নিজ মাতাপিতাকে ও নিজ-গৃহ ইত্যাদি দেখাশুনা আবশ্যক, তখন নেপাল বীরেশ্বরের ন্যায় দেশীয় ব্যক্তিগণের স্যাকৃরিফাইসিং স্পিরিটে'র অভাবের উল্লেখ করে। নেপালের স্ত্রী হেমাঙ্গিনী শিক্ষিতা। নেপাল তাঁহাকে স্ত্রীস্বাধীনতা-বিষয়ক পুস্তক পাঠ করিতে দেন। স্বাধীনা হেমাঙ্গিনী ফলে শ্বশ্রূমাতাকে অযথা তিরস্কার করেন; প্রতিবেশী কালীপদবাবুর সহিত সান্ধ্যভ্রমণ করেন; এবং স্বামীস্ত্রীর 'equality of right'কে মূল্য দিয়া চলেন। নেপাল 'ফেমিন ফাণ্ডের' গচ্ছিত অর্থ লইয়া স্ত্রীর বিলাতী পোষাক তৈয়ারী করিয়া দেয়। পুত্রবধূর গতিবিধি অশোভন বলিয়া উল্লেখ করিতে গিয়া পিতা রামকুমার পুত্র কর্তৃক তিরস্কৃত হন। পিতা নেপালকে ত্যাজ্য পুত্র করিতে চাহেন। নেপালের মাতা মোহিনী তাহাতে দুঃখিত হন এবং কিছুদিন অপেক্ষা করিতে পরামর্শ দেন। এদিকে নেপালের চারিদিকে ঋণ। পাওনাদার সিদ্ধেশ্বর দুই হাজার টাকা চাহিতে আসিয়া ব্যর্থকাম হয় এবং আদালতের ভয় দেখাইয়া চলিয়া যায়। নেপাল স্ত্রী হেমাঙ্গিনীর নিকট অর্থ প্রার্থনা করিলে হেমাঙ্গিনী বলেন—কালীপদবাবুর সহিত তাঁহার অনেক কার্য আছে, এ সকল তুচ্ছ বিষয়ে দৃক্‌পাত করিবার মত সময় তাঁহার নাই। কালীপদবাবু আসিলে তাঁহার সহিত হেম উদ্যানে ভ্রমণ করেন। তিনি কালীপদবাবুর সহিত পবিত্র প্রণয়ের প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করেন। হেম বলেন, সাহেবী সমাজে চুম্বন দোষের নয়। কালীপদবাবু বলেন, 'আমাদের

সোসাইটিতে এটা introduce করবার চেষ্টা করা উচিত।' Utilitarianism-এর দোহাই দিয়া হেম বলেন যে, মানবসমাজে 'happiness'এর amount বৃদ্ধি করিবার জন্য স্ত্রীপুরুষের অবাধ মিলন আবশ্যক। হেম কালীপদবাবুকে 'নির্জন গ্রোভের' ভিতরে লইয়া যায়। নেপাল অলক্ষ্যে সকল ঘটনা লক্ষ্য করে। কারাবাসের ভয়ে নেপাল পুনরায় স্ত্রীর গহনা প্রার্থনা করিলে স্ত্রী বলেন, 'femaleএর sacred bodyতে assault' করিলে অভিযুক্ত হইতে হইবে।' ইতিমধ্যে কালীপদবাবু আসিয়া বলেন, 'আপনার ন্যায় দৈত্যের হস্তে কখনই আমার দুর্বল female friendকে রেখে যেতে পারি না।' নেপাল বাধা দিতে আসিলে নেপাল প্রহৃত হয় এবং কালীপদবাবু ও হেমাঙ্গিনী পলায়ন করেন। নেপাল তখন স্ত্রীশিক্ষার বিষময় ফল সন্দর্শন করিয়া আক্ষেপ করে।

যে সকল বাধা বিপত্তি ও বিরূপ সামাজিক মনোভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া স্ত্রীশিক্ষা এ দেশের সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, ইহার মধ্য হইতে তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে। অমৃতলালের প্রহসনগুলির মত ইহাও বাংলা দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের ইতিহাস রচনার প্রয়োজনীয় তথ্যাদিতে পরিপূর্ণ।

নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকের এক অতিরঞ্জিত চিত্র বর্ণনা করিয়া ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রাখালদাস ভট্টাচার্য 'সুরুচির ধ্বজা' নামক প্রহসন রচনা করেন। ইহার কাহিনী এই—

বাঙ্গাল গিরিধারীর পুত্র লালচাঁদ আধুনিক যুবক হইয়াছে। স্ত্রীকে সে পছন্দ করে নাই ; কারণ, সে accomplished নয়, 'gentlemanএর societyতে move' করিতে পারে না। লালচাঁদ বলে, 'আজকালকার দিনে wife নিয়েই পসার।' 'Wifeএর জোরে' বড় বড় associationএর member হওয়া যায়, 'secretary হওয়া যায়, "social movementএ leading part' লওয়া যায়। লালচাঁদ আক্ষেপ করে, স্ত্রী সামাজিক এবং প্রগতিশীল হইলে এতদিনে সে C. I. E সমেত রাজা উপাধি পাইত। ব্রাহ্ম বন্ধু চারু স্ত্রীকে 'divorce' করিতে পরামর্শ দেয়। বলে, তাহাদের সমাজে 'a mere girl of twenty five' আসিয়াছে। তাহার সহিত লালচাঁদের বিবাহের ব্যবস্থা করা যাইবে। সমাজের আচার্য পরিণয়ের বিষয় যখন জানিলেন, তখন তাহা সাগ্রহে অনুমোদন করিলেন। উকিল প্যারী যখন বলেন, পরিণীতা স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে হইলে তাঁহার নামে মিথ্যা কলঙ্ক আনিতে হইবে, তখন আচার্য 'বিবেক' এবং 'কর্তব্য' ও 'বিবেকবুদ্ধি'তে প্রণোদিত-

হইয়া উকিলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। আচার্য ধনী লালচাঁদের নিকট হইতে কিছু অর্থের প্রত্যাশী হইয়া সমাজে তাহাকে ভিড়াইতে চাহেন। কয়েকটি সমাজসম্পর্কিত ব্যয়ের নিমিত্ত অর্থের প্রতিশ্রুতিও তিনি লালচাঁদের নিকট হইতে আদায় করিলেন। লালচাঁদের বন্ধু বা সমাজ-ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সুরুচি জানিতে পারে যে, লালচাঁদের প্রচুর অর্থ আছে, কিন্তু সে অশিক্ষিত। সুরুচি তাহাতে বিচলিত হয় না। সে লালচাঁদকে যোগ্য করিয়া লইবে। সুরুচি বিবাহিত। বঙ্গজ এবং গ্রাম্য কালাচাঁদ তাহার স্বামী। চারু তাহাকে ত্যাগ করিতে বলে। সুরুচি তাহাতে স্বীকৃত হয়। কারণ, কালাচাঁদের নিকট হইতে অর্থদোহন সমাপ্ত হইয়াছে। কালাচাঁদ সুরুচির জন্য জাতি ও কুল ছাড়িয়াছিল। কালাচাঁদ অনুশোচনা করিয়া বিদায় গ্রহণ করে। লালচাঁদ নিজগৃহে সমাজের ভ্রাতাভগ্নীদিগকে নিমন্ত্রণ করে। তাহাদের নৃত্যগীত সমাপ্ত হইলে সুরুচিকে সে ব্যক্তিগতভাবে বলে—বিবাহে তাহার পিতার অমত; সুতরাং মূল্যবান দ্রব্যাদিসহ সে সুরুচির গৃহে আশ্রয় লইবে। সুরুচি সানন্দে রাজী হয়। পিতা লালচাঁদের ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারিয়া তাহাকে তিরস্কার করেন। লালচাঁদ শূন্য হস্তে সুরুচির গৃহে আসিয়া উপস্থিত হয়। সুরুচির আশা ভঙ্গ হইল—কারণ, পিতার সম্পত্তির অধিকার হইতে লালচাঁদ বঞ্চিত হইয়াছে। পরন্তু সে কিছুই সঙ্গে করিয়া আনে নাই। সুরুচি তাহাকে প্রত্যাখ্যান করে। ক্রুদ্ধ লালচাঁদ আচার্যের নিকট প্রদত্ত অর্থ ফেরত চাহে, কিন্তু আচার্য তাহা প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকৃত হন। সুরুচি তাহাকে নির্বিবাদে গৃহে ফিরিতে উপদেশ দেয়। লালচাঁদ তাঁহার বঙ্গজ ও গ্রাম্য পিতার নিকট নিজের বুদ্ধিহীনতা স্বীকার করে।

প্রহসনটি আনুপূর্বিক চিত্র-সর্বস্ব নহে। ইহার মধ্যে ঘটনার জটিলতা সৃষ্টি করিয়া নাটকীয় গুণ বিকাশের প্রয়াসও দেখা যায়। কিন্তু তাহার কোন কার্যকর প্রভাব অনুভব করা যায় না।

বিজ্ঞানশিক্ষা তথা উচ্চশিক্ষা মানুষকে কিরূপ 'বিকৃত' করিতে পারে, ১৮৮৭ সনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক রচিত 'বিজ্ঞানবাবু' প্রহসনটির মধ্যে তাহা দেখান হইয়াছে।

গৌরহরি মুখোপাধ্যায় কলিকাতার জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি। তাহার একমাত্র পুত্র মাখন বিজ্ঞানে এম-এ পাশ করিয়া বিজ্ঞান-পাগল হইয়া গিয়াছে। তাহার 'বামহস্তে শিক্ বাঁধা, দক্ষিণ হস্তে Ganot, চক্ষে চশমা পরা।' পিতাকে সে কৈফিয়ত স্বরূপ বলে যে, জীবনের অটলস্থায়িত্বহেতু সে অর্ডার দ্বারা লৌহনির্মিত

শিক আনাইয়া non-conductor হইয়াছে। ইহার কারণ এই—'সদাই বিজ্ঞানের চর্চা করলে মানুষের শরীর থেকে electricity বহু পরিমাণে নির্গত হয়ে যায়। যাতে Volatile আর একটা পদার্থ surcharged with electricity এসে হঠাৎ আপনার শরীরে enter করতে না পারে, তারই জন্য এই conductor; এতে শরীরের সঙ্গে আর frictional electricity-ওয়ালা আর একটা bodyর সঙ্গে যাতে সদাই equilibrium থাকে তারই জন্য Scienceএ এই conductor রাখার প্রথা প্রচলিত আছে।' আমেরিকার Voxleyও নাকি ইহা অনুমোদন করেন। চশমা সম্পর্কে তাহার কৈফিয়ৎ—'বিজ্ঞানের ভিতর, আর কেবল বিজ্ঞানের ভিতরেই বা কেন, সমস্ত উচ্চশিক্ষার ভিতর যে অতি minute particles আছে, যা আমাদের naked eyeতে দেখতে পাওয়া যায় না, তা দেখবার জন্য চশমা ব্যবহার করা চাই।' পিতা বলেন, যাহাদের অর্থ নাই—তাহারা পেটের চিন্তার জন্য বিজ্ঞান পড়ে। মাখনের জমিদারী দেখাশুনা করাই উচিত। মাখন বলে, বিজ্ঞান শিক্ষা করিলে শুধু জমিদারী নয়, পৃথিবীও শাসন করিতে পারিবে। পুত্রের এই সকল ব্যবহার দেখিয়া পিতার দুশ্চিন্তা হয়; কারণ, মিতাক্ষরা মতে উন্মাদ-পুত্র সম্পত্তির অধিকারী হয় না। মাতা চন্দ্রমুখী লক্ষ্য করেন, রাত্রে ঘুমের ঘোরে পুত্র 'পটাস, পটাস' করে এবং 'বিয়েন, বিয়েন' বলিয়া চীৎকার করে। চন্দ্রমুখীর ধারণা, মাখন 'বিয়েন' (বিজ্ঞান) নাম্নী কোনও স্ত্রীলোকের প্রেমাসক্ত। দাসীরও ধারণা মাখন গোপনে বিবাহ করিয়াছে; কারণ, বিবাহিতা স্ত্রীলোকের ন্যায় দাদাবাবুও লৌহধারণ করিয়াছে। যাহ যাউক, মাখনের বিবাহের বিষয়ে সকলে নিরাশ হয়। বিজ্ঞানবিদ মাখনের মস্ত সমর্থক নগেনবাবু। তিনি তাঁহার পিতার ডাক্তারী কার্য চালান, পত্রিকা সম্পাদনাও করেন। তিনি বলেন, 'বকলমে ডাক্তারী করি, বাপকে ডাকলে নিজে যাই।' সম্পাদনাতে—'স্বকলম অপেক্ষা ব-কলমে আমার বড় জোর। কিন্তু কপির বড় অভাব। সর্বভুক্ মুদ্রাযন্ত্রকে তুষ্ট করা বড় দায়।' শনিবারে পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। কম্পোজিটার আসিয়া কপি প্রার্থনা করে। দিশাহারা নগেন অবশেষে নিজের উচ্চশিক্ষিতা স্ত্রীকে সম্পাদনার ভার দেন। স্ত্রী সানন্দে রাজী হন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অসুবিধা বোধ করেন। ইতিমধ্যে জনৈক অর্থপুস্তক-রচয়িতা তাহার পুস্তক ছাপাইবার জন্য প্রেসে দিলে নগেনের স্ত্রী তৎপ্রদত্ত অর্থপুস্তকের পাণ্ডুলিপি পত্রিকায় প্রকাশের জন্য কম্পোজিটারকে দেন এবং স্বস্তিলাভ করেন। নগেনের স্ত্রী হেমন্তকুমারী মাখনের সংস্পর্শে

আসিয়া মাখনের প্রতি আকৃষ্ট হন। হেমন্ত মাখনের সহিত সান্ধ্যভ্রমণ করেন, কারণ, শিক্ষিতা হইয়া শিক্ষিতকেই পছন্দ করা উচিত। তাঁহারা পরস্পর বিবাহের পরামর্শ করেন। হেমন্ত বলেন, 'এ স্বীকারেও একটা সুন্দর contract আছে, সেই contract অনুসারে আজ আমি Mackenzie Lyall-এর highest bidder-এ আমার দেহ বিক্রয় করবো; যদি আপনার মত ক্রেতা পাই, I would be only happy.' মাখন ইহাতে উৎসাহিত হয়। উকিল রামকান্ত পরামর্শ দেয়; বলে, বিধবা বিবাহ আইনে নিষিদ্ধ, কিন্তু সধবা বিবাহ সম্পর্কে কিছু উল্লেখ নাই, সুতরাং তাহা আইনসিদ্ধ। সধবা বিবাহ বিজ্ঞানসম্মত কিনা, তাহা জানিবার জন্য আমেরিকার Dr. R. Voxleyকে তার করিয়া তাঁহার নিকট হইতে মাখন অনুমোদন পায়। ইতিমধ্যে পত্রিকায় সংবাদের পরিবর্তে অর্থপুস্তকের বিষয় প্রকাশিত হইলে নগেন হেমন্তের নিকট তাহার কৈফিয়ৎ চাহে। হেমন্ত বলেন, তিনি বর্তমানে সম্পাদক নহেন; কারণ, তিনি মাখনের বিবাহিতা স্ত্রী। পত্রিকা সম্পর্কে তাঁহার কোনও দায়িত্ব এখন নাই। অর্থ-পুস্তক লেখক আসিয়া নগেনকে এই অবিবেচনার জন্য তিরস্কার করিলে নগেন বলে, তিনি তাহার 'বই' হারাইয়াছেন, কিন্তু সে নিজে হারাইয়াছে তাহার 'বৌ'।

স্ত্রী-শিক্ষার মত বিজ্ঞান-শিক্ষাও যে সেদিন সমাজ-নিন্দার কারণ হইয়াছিল, ইহার মধ্যে সেই রক্ষণশীল মনোভাবই প্রকাশ পাইয়াছে।

ইহার দুই বৎসর পর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'টাইটেলে'র মোহ মানুষকে কতখানি দুর্দশার পথে লইয়া যায়, 'টাইটেল না ভিক্ষার ঝুলি' নামক এই প্রহসনটি রচনা করিয়া তাহাই দেখাইয়াছেন। কাহিনীটি এই—

জমিদার মহেন্দ্র রায় অর্থব্যয় করেন বটে, কিন্তু অযথা অর্থব্যয় করেন না। মাতাপিতার নামে অতিথিশালা নির্মাণ কিংবা শ্রাদ্ধে সামাজিক ভোজ দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহার ভীষণ আপত্তি। কারণ, তাহাতে নিজের খ্যাতি হয় না। প্রতিটি মানুষের উচিত নিজ নিজ উন্নতি বিধান করা। অর্থ সদ্ব্যয়ের উপায় প্রসঙ্গে তিনি বলেন—'উপায় Title পাওয়া, Leaveতে যাওয়া, Ball and Supperএ হাওয়ার ন্যায় মেমদিগের সঙ্গে নৃত্য করা।' তিনি বলেন সাধারণ লোকেরা দয়ালু বলিয়া তাঁহার মাতাপিতার নাম করে বটে, কিন্তু সংবাদপত্র মহলে কিংবা সাহেব মহলে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি আছে। ইহাতেই প্রকৃত খ্যাতি হয়। মহেন্দ্র রাজা উপাধির জন্য পাগল হইয়া উঠেন। দাসীর ভাষায়,—'কর্তা পাগলা কুকুরের মত ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে।' মহেন্দ্র খ্যাতি

পাইবার আশায় সর্বত্র 'দান' করিয়া বেড়ান। বিষয় আশয় এবং সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষিত হয়। গৃহিণীর গহনাও বন্ধক পড়ে; সরকার মহাশয় ভীত হইয়া ভাবে—'একি উপাধি, না সমাধি?' ক্রমে ক্রমে বসতভিটাও বন্ধক পড়ে। এইরূপ দীন অবস্থায় একদিন সরকার হইতে রাজাবাহাদুর সম্মান তিনি পাইলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার দুর্দশা আরও বাড়িল। তিনি রাজা হইয়াছেন শুনিয়া অনেকে চাঁদার খাতা লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। রাজা প্রমাদ গণিলেন। একদিকে তাঁহার রাজা উপাধির সম্মান, অন্যদিকে ঋণ। পরে দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়া রাজা সে যাত্রা রক্ষা পান। কিন্তু আহারও জুটে না। বেতনের অভাবে দাসদাসী বিদায় লইয়াছে। অথচ রাজা হইয়া চাকুরীর দরখাস্ত করিতে তিনি লজ্জা পান। অবশেষে বন্ধুর কৃপায় অর্থাগমের একটি উপায় হয়। বর্ধমানের দুর্ভিক্ষের প্রতিকারে গঠিত Famine Relief Fund-এর Chairman হন। বিভিন্ন স্থান হইতে তাঁহার নিকট প্রচুর অর্থ আসে। তিনি মিথ্যা হিসাব দেখাইয়া তাহা দিয়া সাংসারিক খরচ চালান। এরূপ ভাবে দিন কাটে। তাঁহার ভাষায়—'Charity begins at home'। কিন্তু অবশেষে তিনি তহবিল তছরূপের অভিযোগে ধরা পড়েন। কনেষ্টবল প্রহার করিতে করিতে বলে—'ভদ্র হোকে কম্পানিকা রাজা হোকে, যো আদমি ঠক্‌লাতা উস্‌কো ভদ্র কোন বোল্‌তা; উ ত চামার হ্যায়।' কনেষ্টবলের প্রহার খাইতে খাইতে রাজাবাহাদুর মহেন্দ্র রায় নিতান্ত কাতর ভাবে দর্শকদিগকে 'টাইটেলে'র মোহ সম্পর্কে সাবধান করিয়া যান।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যযুগের অবসান-কালে কত অকিঞ্চিৎকর বিষয় লইয়াও যে নাটক এবং প্রহসন রচিত হইয়াছে, হরিহর নন্দী রচিত 'ছাল নাই কুকুরের বাঘা নাম' প্রহসনখানিতে তাহাই দেখা যায়। নামকরণ স্বভাবের বিপরীত হইলে তাহা হাস্যকর হয়। প্রহসনটির মধ্যে এরূপ দুইটি দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে। কাহিনীটি এই—

রসিকবাবু প্রকৃতই রসিক ব্যক্তি। তিনি বাকী রাখিয়া রসকরাওয়ালার নিকট হইতে দ্রব্য লইয়া তাহার রসাস্বাদন করেন। রসকরাওয়ালা দরিদ্র। সুতরাং প্রাপ্য মূল্যের জন্য সে পুনঃ পুনঃ রসিকবাবুর নিকট যাতায়াত করে। অবশেষে সে বিরক্ত হইয়া ধৈর্য হারাইয়া ফেলে। বলে,—'আরে বাবু ক্ষেপ কেন, খাবার বেলা মনে ছিল না যে পয়সা দিতে হবে।' রসিকবাবু তাহাকে প্রহার করেন। লোকটিও শাসাইয়া বলে যে, তাহার প্রাপ্য সে আদায় করিয়া

ছাড়িবে। অবশেষে রসিকবাবুর জনৈক বন্ধুর মধ্যস্থতায় আপোষ ঘটে। এখানে রসিক নামকরণটি যেন তাঁহার স্বভাবটিকে বিদ্রূপ করিতেছে। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত হইয়াছে। অন্ধপুত্রের নাম পদ্মলোচন রাখিলে যেমন তাহা সাধারণের নিকট হাস্যকর হয়, ঠিক তেমনই হাস্যকর হয় কেহ যদি পুত্রের নাম বিদ্যাধর রাখিয়া তাহাকে অশিক্ষিত রাখেন। দাশুবাবু তাঁহার কন্যার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক। ঘটক একটি 'বর'কে আনিয়া উপস্থিত করিল। তাহার নাম বিদ্যাধর দে। তাহাকে যথারীতি অতি সহজ কতকগুলি প্রশ্ন করা হয়—বিদ্যার পরিচয় জানিবার জন্য। বর একটিরও উত্তর দিতে পারে না। ঘটক বলে, 'মহাশয়, সময়গতিকে নিতান্ত বিজ্ঞলোকও হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে।' দাশুবাবুর বন্ধু রামকান্ত ঘটককে বলেন,—'মহাশয়, আপনে যেন আর কথা বলেন না, আপন মুখচন্দ্র মেঘমণ্ডলে ঢেকেছে আপনে যেরূপ বলেছিলেন, তাতে সকলের মনেই বিশ্বাস হয়েছিল যে ছেলেটি বোধহয় বি. এ.-ই হবে ; তা এখন প্রত্যক্ষই প্রমাণ পাওয়া গেল।' অপর বন্ধু গোপাল বলেন,—'এযে দেখি ছাল নাই কুত্তার বাঘা নাম, বিদ্যা শূন্য নাম রেখেছেন বিদ্যাধর।'

দুইটি কাহিনীর মধ্যে একটি অখণ্ড যোগসূত্রের অভাবে ইহা কোনও বিষয়ে ঐক্য রক্ষা করিতে পারে নাই।

ধর্মের নামে ভণ্ডামির পরিচয় দিয়া মধুসূদন যে প্রহসন রচনা করিয়াছেন তাহারই সুদূর প্রতিধ্বনিরূপে যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'ভণ্ড দলপতি দণ্ড' নামক প্রহসনখানি রচিত হইয়াছে। ভণ্ড দলপতি ও জমিদার হরিহর বাবুর দণ্ডপ্রাপ্তিই প্রহসনটির বিষয়বস্তু।

হরিহরবাবু ধর্মধ্বজী ব্যক্তি। সন্ধ্যা আহ্নিক না করিয়া তিনি জলগ্রহণ করেন না। দেবদ্বিজে তাঁহার অচলা ভক্তি। কিন্তু অন্তরে অন্তরে তিনি ব্যভিচারী এবং অপরের অনিষ্টাকাঙ্ক্ষী। বিলাত-প্রত্যাগত বন্ধুকে গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইবার অপরাধে প্রতিবেশী নন্দরামবাবুকে তিনি 'একঘরে' করিবার সঙ্কল্প করেন। মোসাহেব কেনারাম ও কোচওয়ান রহিমবক্স তাঁহার কুকার্যের সহায়। কিন্তু 'একঘরে' করিবার বিষয়েও হরিহর বাবুর দলে অনুগত ব্যক্তির অভাব হইল না। নন্দরামবাবু বিপদে পড়িলেন। হরিহরের একটি ফিরিঙ্গি রক্ষিতা ছিল। তাহার নাম লুসি। ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ হরিহরের ভাষাজ্ঞানের দৈন্য মোসাহেব কেনারামের প্রচেষ্টায় ঢাকা থাকে না। তাহার এরূপ ইংরাজী শুনিয়া আনন্দ পায়, তবে অর্থ-লোভে সে তাহাকে

করে। গোপনে লুসির সহিত ব্যভিচার এবং বাহিরে মালাজপ ও ধর্মকর্ম লইয়া তাঁহার দিন কাটে। বাঙ্গালী গণিকাদিগকে কার্তিকপূজা করিতে দেখিয়া লুসিরও কার্তিকপূজা করিবার বাসনা জাগিল। আধুনিক দ্রব্যাদি সহ অতি অনাচারে পূজা আরম্ভ হইল; পুরোহিত দক্ষিণাস্বরূপ ব্র্যাণ্ডি লাভ করেন। পূজা শেষ হয় লুসির নৃত্যগীত ও মদ্যপানের মধ্য দিয়া। ইতিমধ্যে প্রতিবেশী অনেকেই এই সকল গোপনীয় অনাচারের সংবাদ পাইয়াছিলেন। নন্দরামবাবু প্রতিশোধস্বরূপ হরিহরকে অপ্রস্তুত করিতে চাহিলেন। যখন উৎসবের আনন্দ চরম, সে সময় নন্দরামবাবু প্রতিবেশিগণের সহিত সদলবলে আসরে উপস্থিত হন এবং হরিহরবাবুকে অপ্রস্তুত করেন। হরিহরবাবুর ভণ্ডামির মুখোস খুলিয়া যাওয়ায় দণ্ড সম্পূর্ণ হয়।

বাংলা নাটকের সেই অধঃপতিত যুগেও যে দুই একখানি নাটকের মধ্যে নাটকীয় ঘটনা সংস্থাপনের কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের 'বৌ বাবু' নাটকটি হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে। ইহার মধ্যে চরিত্রসৃষ্টি সার্থক হয় নাই সত্য, কিন্তু কাহিনীটির একটি নাটকীয় পরিচয় যে ব্যর্থ হয় নাই, তাহাও অনুভব করিতে পারা যায়। কাহিনীটি এই—

বিক্রমপুরের রামহরি মুখোপাধ্যায় পাট কাটে এবং অতি কষ্টে অর্থ উপার্জন করে। তাহার পুত্র রামকৃষ্ণকে লেখাপড়ার জন্য কলিকাতায় পাঠাইয়াছে। তাহার আশা সে মানুষ হইয়া তাহার দুঃখ দূর করিবে। এদিকে কলিকাতায় রামকৃষ্ণ বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসাইয়াছে। ইয়ার বন্ধুদিগের সহিত কনসার্ট পার্টি খুলিয়াছে। এখন তাহার নাম রমেন্দ্রকৃষ্ণ। ইহা ব্যতীত বিভিন্ন সমিতির সহিত সে জড়িত। সুরাসংহারিণী সমিতি শৌণ্ডিকালয়ের পাওনার ভয়ে অর্ধমৃত। তবে Native Progressing Club হইতে তাহার কিছু ব্যক্তিগত অর্থাগম ঘটে। বেশ্যাদিগকে পতিত অবস্থা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য রামকৃষ্ণের মনে বাসনা জাগে। স্কুলের দারোয়ানকে ঘুষ দিয়া তাহার ঘরে একটি বেশ্যাকে পুরুষবেশে আনাইয়া তাহার বন্ধু চারুর সহিত স্বয়ম্বরসভা অনুষ্ঠিত হয়। বেশ্যা রামকৃষ্ণের কণ্ঠে মালা পরায়। রামকৃষ্ণ প্রেম ও জীবন লইয়া নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেয়। রামকৃষ্ণ ওরফে রমেন্দ্রকৃষ্ণ চশমা ও চুরোটে ভয়ঙ্কর বাবু। গ্রাম্য পিতার পরিচয় দিতে যাইয়া সে বলে—'One of our family servants' সে বহু বিবাহের বিরোধী, অর্থলোভে একটি বিবাহ করিতে রাজী হইল। যদুবাবুর কন্যা বিনোদিনীর সহিত তাহার বিবাহ হইল।

রামকৃষ্ণ মিথ্যা পরিচয়ে নিজেকে অতি অভিজাত ও শিক্ষিত বলিয়া পরিচয় দিয়াছে। ঘটক অর্থলোভে তাহাতে সহায়তা করিয়াছে। কিন্তু জামাতার অনাচারাদি দর্শনে যদুবাবু ক্ষুব্ধ হন এবং তিরস্কার করেন। শিক্ষিতা জ্যেষ্ঠ শ্যালিকা গ্রাম্য রামহরির লিখিত একটি পত্র চিৎকার করিয়া পাঠ করিয়া রামকৃষ্ণের আভিজাত্যের মুখোস খুলিয়া দাম্ভিক রামকৃষ্ণকে অপ্রস্তুত করেন। রামকৃষ্ণ তাহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া চলিয়া যাইতে চায়, স্ত্রী বিনোদিনী বাধা দিতে গেলে তাহাকে পদাঘাত করিয়া চলিয়া যায়। বিনোদিনী মনোদুঃখে আত্মহত্যা করিতে গিয়াও আত্মহত্যা করিল না, নিরুদ্দিষ্ট হইল। বহুদিন পর কালনায় গঙ্গাতীরে রুগ্ন অবস্থায় স্বামীর সহিত বিনোদিনীর সাক্ষাৎ হয়। এতদিন সে পথে পথে ভিক্ষা করিয়া এবং স্বামীকে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে। স্বামীরও যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। অভিমানে বিকারের ঘোরে তাহার শিক্ষিতা স্ত্রীকে বলিল—'আমি বাবু বৌ চাই না।' বিনোদিনী বলে—'আমি তোমার বাবু বৌ নই, তোমার বৌ বাবু।' আমি তোমার বৌ বাবু।' অবশেষে আনন্দাশ্রুর মধ্যে উভয়ের মিলন হয়।

যে কোন বিষয় লইয়াই যে সেদিন নাটক রচিত হইতে পারিত, রাজকৃষ্ণ দত্ত রচিত 'যেমন রোগ তেমনি রোঝা' নামক নাটকখানিই তাহার প্রমাণ।

বৈদ্যনাথ একজন নেশাখোর ব্রাহ্মণ। তাহার স্ত্রীটি তদুপযুক্ত। সর্বক্ষণ তাহাদের কলহ এবং প্রহারাদি চলে। প্রতিবেশী নিবারণ করিতে আসিলে ব্রাহ্মণী বলে, 'খুসি, মারবে ; তোর সে কথায় কাজ কি ?' প্রতিবেশী তখন যদি ব্রাহ্মণকে প্রহারকার্য চালাইয়া যাইতে অনুরোধ করে, তখন ব্রাহ্মণ বলে,—'তা তোমার কথায় কখন হবে না, যখন মাত্তে ইচ্ছে হবে, তখন মারবো, ও আমার মাগ বৈ তোমার নয়।' এইরূপে তাহাদের দাম্পত্য জীবন চলে। কিন্তু একদা একটি অঘটন ঘটিয়া গেল। গ্রামান্তরের গোকুলবাবুর কন্যার বাক্‌শক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহার চিকিৎসকের অনুসন্ধানে ব্রাহ্মণের গ্রামে হরি নামক এক ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। ব্রাহ্মণীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ-কালে ব্রাহ্মণী তাহাকে বলে যে তাহার স্বামীই বোবার চিকিৎসক। স্বামী কিছুক্ষণ পরেই ফিরিবে। তবে তাহার সম্বন্ধে একটু সতর্ক হওয়া আবশ্যক। তাহার একটু আত্মবিস্মৃতি আছে ; অনেক সময় সে নিজে বৈদ্য কি না, তাহাও ভুলিয়া যায়। প্রহারে সাধারণত তাহার আত্মবিস্মৃতি দূর হয়। ব্রাহ্মণকে জব্দ করিবার জন্য ব্রাহ্মণী হরিকে এই কথা বলিল। যথাসময়ে ব্রাহ্মণ আসিল এবং

হরি উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিলে সে বলিল যে সে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য নয়। হরি ব্রাহ্মণীর উক্তি স্মরণ করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রহার করিল। উভয়সঙ্কট দেখিয়া ব্রাহ্মণ বৈদ্যরূপে গোকুলবাবুর কন্যার চিকিৎসায় রাজী হইল। কিছু পাথেয় সে হরির নিকট হইতে গ্রহণ করিল। গোকুলবাবুর কন্যা কাদম্বিনী মাতুলালয়ের পার্শ্ববর্তী গৃহের পুরন্দর নামক একটি যুবকের প্রেমাসক্তা। কিন্তু গোকুলবাবু গ্রামের বৃদ্ধ বিপত্নীক জমিদার মাধবচন্দ্র রায়ের সহিত কাদম্বিনীর বিবাহ দিতে ইচ্ছুক। কাদম্বিনী ভাবিল, পাগলামির ভাণ করিলে সকল প্রকার সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যাইবে। সুতরাং কাদম্বিনীর এইরূপ করা ব্যতীত উপায় ছিল না। পুরন্দর অর্থ দ্বারা বৈদ্যনাথকে হাত করিল। সে নিজে বৈদ্যনাথের দ্রব্যবাহক সাজিল। চিকিৎসার পূর্বে বৈদ্যনাথকে তাহার বক্তব্য শিখাইয়া দিয়াছিল। বৈদ্যনাথ গোকুলবাবুকে বলিল, ঔষধ প্রয়োগে কাদম্বিনী একটি প্রার্থনা করিয়া কথা কহিবে। সে প্রার্থনা পূরণ করিলে তাহার বাক্‌শক্তি আর বন্ধ হইবে না। পত্রদ্বারা পূর্বেই কাদম্বিনীকে শিখাইয়া রাখা হইয়াছিল যে চিকিৎসকের দ্রব্যবাহকই পুরন্দর। কাদম্বিনীকে ঔষধছলে জলপান করাইলে সে দ্রব্যবাহককে বলিল, 'তুমিই আমার পতি।' গোকুলবাবু তখন সঙ্কটে পড়েন। অজ্ঞাতকুলশীল এক ব্যক্তির সহিত কন্যার কি করিয়া বিবাহ দিবেন? ইহা অপেক্ষা কন্যার বাক্‌শক্তি ফিরিয়া না আসা মঙ্গলের। অবশেষে বৈদ্যনাথের অনুরোধে পুরন্দরের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে তিনি স্বীকৃত হন। জানা যায়, পুরন্দরও তাঁহার স্বজাতি এবং তাহার বংশমর্যাদাও কম নয়। চিকিৎসকবেশী ব্রাহ্মণ বৈদ্যনাথ গোকুলবাবুর নিকট হইতে একই সঙ্গে পুরোহিত বিদায়, ঘটক বিদায় ও বৈদ্য বিদায় গ্রহণ করিল। ব্রাহ্মণীও আত্মপ্রকাশ করিয়া তাহার কৃতিত্ব ব্যাখ্যা করে এবং গরদের একখানি শাড়ী ও দশটি মুদ্রা আদায় করিয়া ছাড়ে।

কি অবস্থা এবং পরিচয়ের মধ্য দিয়া যে বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যযুগের গৌরব অধ্যায়টি লুপ্ত হইয়া গেল, তাহা বুঝাইবার জন্যই কাহিনীগুলি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিলাম। বাংলা নাটকের সে যুগের আদর্শ যে আর রক্ষা পাইতেছিল না, ইহাদের মধ্য হইতে তাহাই প্রমাণিত হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

অনুবাদ-নাটক

(১৮৫২—১৯০০)

আদি-মধ্যযুগ হইতে বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ রচনার যে একটি ধারার সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহা মধ্যযুগের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল; তারপর এদেশে যখন নূতন যুগের নূতন বাংলা সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপিত হইল, তখনও অনুবাদের মধ্য দিয়াই ইহার নবজন্ম সূচিত হইল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতমণ্ডলীর অনুবাদগ্রন্থগুলির মধ্য দিয়া আধুনিক বাংলা ভাষার সর্বপ্রথম একটি বিশিষ্ট সাহিত্যরূপ বা গদ্য বিকাশলাভ করিল। কিন্তু মধ্যযুগের বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের অবলম্বন যেমন ছিল সংস্কৃত, পারসী, আরবী কিংবা কচিৎ হিন্দী, আধুনিক অনুবাদের একটি শক্তিশালী নূতন অবলম্বন দেখা দিল—তাহা ইংরেজি। তখন হইতেই কিছুকাল পর্যন্ত একদিকে সংস্কৃত এবং অপর দিকে ইংরেজি ভাষা হইতে অনুবাদের যে দ্বিমুখী ধারা সৃষ্টি হইল, তাহা দীর্ঘদিন তদানীন্তন বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্র বিশেষভাবে অধিকার করিয়া রাখিল।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হইবার পর হইতেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের নূতন যুগ সূচিত হইলেও ইতিপূর্বেই অনূদিত বাংলা নাটকের আবির্ভাব হইয়াছিল। পাশ্চাত্ত্য ভাষা হইতে অনুবাদের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, বাংলা নাটকই সর্বপ্রথম পাশ্চাত্ত্য ভাষা হইতে অনূদিত হইয়াছিল—প্রবন্ধ, কবিতা কিংবা কাহিনী বা অন্য কিছুই নহে। সৌভাগ্যের বিষয় উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী বাংলা নাটকের একখানি অনুবাদ আমাদের হস্তগত হইয়াছে—তাহার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় আমরা জানিতে পারিয়াছি। তাহার বিষয় উল্লেখ করিয়াই বাংলা অনুবাদ নাটক সম্পর্কিত অধ্যায়ের সূত্রপাত করা যায়।

হেরাসিম লেবেডেফ (Herasim Lebedeff) নামক একজন ভাগ্যান্বেষী রুষ পরিব্রাজক ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে যে কলিকাতায় আসিয়া Bengally Theatre নামক এদেশে সর্বপ্রথম নাট্যশালা স্থাপন করেন, এবং তাহাতে অভিনয় করিবার উদ্দেশ্যে ইংরেজি ভাষা হইতে বাংলায় দুইখানি নাটক সর্বপ্রথম অনুবাদ করেন, তাহাদের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। নাটক দুখানির নাম *The Disguise* এবং *Love is the Best Doctor*. এই অনুবাদ দুইখানি

সম্পর্কে হেরাসিম লেবেডেফ তাঁহার পরবর্তী একখানি গ্রন্থে যাহা উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে –

'..... I translated two English dramatic pieces; namely, The Disguise, and Love is the Best Doctor, into the Bengal language; and having observed that the Indians preferred mimicry and drollery to plain grave solid sense, however purely expressed—I therefore fixed on those plays, and which were most pleasantly filled up with a group of watchmen, Chokey-dars ; savoyards, *canera* ; thieves, ghoonia ; lawyers, gumosta ; and amongst the rest a corps of petty plunderers.

When my translation was finished, I invited several learned pundits who perused the work very attentively ; and I then had the opportunity of observing those sentences which appeared to them most pleasing, and which most excited emotion ; and I presume I do not much flatter myself, when I affirm that by this translation the spirit of both the comic and serious scenes were much heightened, and which would in vain be imitated by any European who did not possess the advantage of such an instructor as I had the extraordinary good fortune to procure.'
(ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, পৃঃ ৪)

এই নাটক দুইটি যে কোন্ পাশ্চাত্ত্য নাট্যকারের কোন্ মূল রচনা হইতে অনূদিত হইয়াছে, তাহা লেবেডেফ উল্লেখ করেন নাই। তিনি অবশ্য এ কথা উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইহারা ইংরেজি ভাষা হইতে অনূদিত হইয়াছে ; কিন্তু ইহাদের মধ্যে একখানি নাটকের নাট্যকারের নাম সম্প্রতি জানিতে পারা গিয়াছে। তিনি এম্. জোডরেল, তাঁহার রচিত মূল ইংরেজি নাটকের নামই "দি ডিসগাইজ"। মলেয়ারের 'লা আমুর মেদিসিন' নামক একটি প্রহসন আছে। Love is the Best Doctor আর একখানি নাটক, ইহা তাহার ইংরেজি অনুবাদ হওয়া অসম্ভব নহে। যাহা হউক এইবিষয়ে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা যায় না। তবে এ কথা সত্য, বাংলা অনুবাদ নাটকের ইতিহাস'আলোচনা করিতে গেলে বিদেশী লেবেডেফ কর্তৃক অনূদিত এই দুইখানি নাটককেই প্রথম স্থান দিতে হয়।

কিন্তু বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ নাটক রচনার যে ধারার সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহার সঙ্গে এই দুইখানি নাটকের কোন যোগ নাই। ইহাদের কোনও প্রভাব সমসাময়িক সমাজের উপর স্থাপিত হইতে পারে নাই, ইহাদিগকে অবলম্বন কিংবা অনুসরণ করিয়া একখানি পরবর্তী অনুবাদ নাটকও রচিত হয় নাই। ইহার একটি প্রধান কারণ, নাটক দুইটি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই; সেই-জন্য উৎসাহ ও প্রেরণা বোধ করিলেও অন্য কোন প্রতিষ্ঠান ইহা যেমন মঞ্চস্থ করিবার সুযোগ পায় নাই, তেমনই ইহার আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া কেহ নূতন কোন নাটক রচনার সুযোগও পায় নাই। প্রকৃতপক্ষে লেবেডেফের এই অনুবাদ নাটক দুইখানি অভিনীত হইবার প্রায় ৬০ বৎসর পর বাঙ্গালী নাট্যকার কর্তৃক যে প্রথম অনুবাদ-নাটক রচিত হয়, তাহা হইতেই বাংলা নাট্যসাহিত্যের ধারায় অনুবাদ শাখাটিও জন্মলাভ করে। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে এখান হইতেই বাংলা অনুবাদ নাটকের ইতিহাস আরম্ভ করিতে হয়।

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে হরচন্দ্র ঘোষ সেক্সপীয়র-রচিত *The Merchant of Venice* নাটকখানির 'ভানুমতী-চিত্তবিলাস' নাম দিয়া একটি আনুপূর্বিক অনুবাদ প্রকাশ করেন; ইহার পরের বৎসর অর্থাৎ ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। হরচন্দ্র ঘোষ সম্পর্কিত আলোচনায় ইহার কথা উল্লেখ করিয়াছি (পৃঃ ১০৭-১০৯ দ্রষ্টব্য)।

ইহার কয়েক বৎসর পর হরচন্দ্র ঘোষ সেক্সপীয়রের *Romeo and Juliet* নাটকখানি 'চারুমুখ-চিত্তহরা' এই নামে অনুবাদ করেন। ইহার বিষয়ও পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। ইহার ভাষা তাঁহার পূর্ববর্তী অনুবাদ কিংবা মৌলিক নাটক 'কৌরব-বিয়োগ' হইতে অনেক সরল হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু তথাপি ইহার সংলাপে সাধু ভাষাই ব্যবহৃত হইয়াছে, চলিত ভাষা ব্যবহৃত হয় নাই। 'চারুমুখ-চিত্তহরা'র ভাষার একটু নিদর্শন এখানে দেওয়া যাইতে পারে—

> 'প্রেমের তো পদ্ধতিই এই; তাতে আবার তুমি খেদ ক'রে কেন আমার দেহ ছেদ কর। প্রেমাসক্তের অন্তর হইতে যে দীর্ঘশ্বাস বহে, সেই ধূমকেই প্রেম বলিলে হয়। তাহা পরিচ্ছন্ন হইলে তাহাদের নয়নে প্রেমানল দীপ্তমান্ দেখ; আর সেই ধূম নিষ্পীড়িত হইলে নয়নে বারি সৃজন করিয়া অশ্রুরূপে সাগরের (?) পুষ্টি বৃদ্ধি করে। ইহার দ্বিতীয়ার্থ এই যে, প্রেম ক্ষিপ্ততা বিশেষ, অথচ বিবেচনা বিশিষ্ট। কটুতায় বুঝি কালকূটের সমান হইবে, অথচ মিষ্টতায় প্রাণ রক্ষা করে।'

একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, হরচন্দ্রের প্রথম নাটকখানি অর্থাৎ 'ভানুমতী-চিত্তবিলাস' রামনারায়ণ-মাইকেল-দীনবন্ধুর পূর্ববর্তী রচনা হইলেও

তাঁহার 'চারুমুখ-চিত্তহরা' ইঁহাদের প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি প্রকাশিত হইবার পর ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়, সুতরাং ভাষার দিক দিয়া একটি আদর্শ যে হরচন্দ্রের সম্মুখে সেদিন ছিল না, তাহা বলিবার উপায় নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও হরচন্দ্র তাঁহার এই তৃতীয় নাট্য-রচনাখানির মধ্যেও যে বাংলা নাটকীয় ভাষার যথার্থ কোন সন্ধান পান নাই, তাহাই স্বীকার করিতে হয়।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে নন্দকুমার রায় কর্তৃক কালিদাসের সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটক 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'-এর বাংলা অনুবাদ দিয়াই বাংলা অনুবাদ নাটকের একটি নূতন ধারার সূত্রপাত হয়। তিনি বাংলা অনুবাদ-নাটকের ধারায় একটি বৈচিত্র্য সূচনা করেন। ইংরেজি শিক্ষিত সমাজ এযাবৎ কেবল মাত্র ইংরেজি নাটকের বাংলা অনুবাদের কার্যেই আত্মনিয়োগ করিয়াছিল, তিনিই প্রথম সেদিনকার ইংরেজি-শিক্ষিত সমাজের সম্মুখে সংস্কৃত নাটক অনুবাদের একটি আদর্শ স্থাপন করেন। প্রকৃত পক্ষে তাঁহার সময় হইতেই অনুবাদ-নাটকের বিষয় দ্বিমুখী ধারায় প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে; একটি ইংরেজি নাটকের অনুবাদের ধারা, অপরটি সংস্কৃত নাটক অনুবাদের ধারা। সংস্কৃত নাটকও যে বাংলায় অনুবাদের বিষয় হইতে পারে, তিনিই তাহা প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সে যুগের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত সমাজের সম্মুখে এই উপলব্ধির একটি বিশেষ মূল্য ছিল।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে রামনারায়ণ তর্করত্ন ভট্টনারায়ণ-রচিত সংস্কৃত 'বেণীসংহার' নাটকখানি বাংলায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশিত করেন। ইহার সম্পর্কে সমসাময়িক সমালোচক রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন যে, রামনারায়ণ 'সর্বত্র কাব্যরস রক্ষা করিয়া অভিনয়োপযুক্ত চলিত ভাষায় পরিপাটি-রূপে "বেণীসংহার" অনুবাদিত করিয়াছেন।'

ইহার দুই বৎসর পর রামনারায়ণ শ্রীহর্ষ-রচিত সংস্কৃত নাটক 'রত্নাবলী' বাংলায় অনূদিত করিয়া প্রকাশিত করেন। একদিক দিয়া বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে এই নাটকখানির যেমন একটি বিশেষ স্থান আছে, তেমনই বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রতিভা-উন্মেষেও ইহার বিশিষ্ট দান আছে। নানাভাবে এই অনুবাদ নাটকখানি উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে জড়িত রহিয়াছে।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে রামনারায়ণ তর্করত্ন কালিদাস-প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটক 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত করিলেন। ইহার পরিচয়-লিপিতে লিখিত হইয়াছে যে, ইহাতে 'অধুনাতন নিয়মানুসারে নাটক

অভিনয়োপযোগী করিবার নিমিত্ত স্থানে স্থানে রস ভাবাদি পরিবর্তিত, পরিত্যক্ত ও সন্নিবেশিত' হইয়াছে। একটি বিষয় ইহা হইতে লক্ষ্য করিতে পারা যায় যে, সংস্কৃত নাটক অনুবাদের ক্ষেত্রেও দেশীয় পণ্ডিতগণ ইহাদের অবিকল বা আক্ষরিক অনুবাদ করিবার জন্য কোনও সতর্কতা অবলম্বন করেন নাই। বাংলা সাহিত্যের সমগ্র মধ্যযুগ ব্যাপিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের মত ধর্ম-গ্রন্থও যে অসংখ্য অনূদিত হইয়াছে,তাহাদের মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব পণ্ডিতগণও ইহাদের আক্ষরিক অনুবাদের দিকে মনোযোগী ছিলেন না ; দেশীয় জলবায়ুতে ইহাদিগকে নানাভাবে স্বাঙ্গীকৃত করিয়া লইয়াই তাঁহারা অনুবাদ রচনা করিতেন। উনবিংশ শতাব্দীতে সংস্কৃত নাটকগুলিও যখন নির্বিচারে অনূদিত হইতেছিল, তখনও বাঙ্গালী পণ্ডিতগণ ইহাদের অনুবাদ করিতে গিয়া অন্ধভাবে মূলের অনুসরণ করিতেন না। যথাসম্ভব ইহাদিগকে দেশীয় রস ও রুচির অনুগামী করিয়া লইবার প্রয়াস পাইতেন। রামনারায়ণের মধ্যেও তাহারই পরিচয় পাওয়া যাইবে।

'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটক অনুবাদের পর রামনারায়ণ ভবভূতি-প্রণীত 'মালতী-মাধব' নাটকখানির বাংলা অনুবাদ করেন। ইহার মধ্যে তিনি কতকগুলি সঙ্গীত যোজনা করিয়াছেন, ইহাদের সম্পর্কে বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, 'নাটকের সঙ্গীত কয়েকটি শ্রীযুত বাবু বনয়ারীলাল রায় মহাশয় রচনা করিয়া দিয়াছেন।' বাংলা নাটকে, তাহা অনুবাদই হউক, কিংবা মৌলিকই হউক, কি ভাবে যে প্রথম হইতেই সঙ্গীত যুক্ত হইতেছিল, এখানেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। রামনারায়ণ তর্করত্নের অনুবাদ-নাটকের মধ্যে ইহাই সর্বশেষ রচনা। ইহার পর তিনি আর যে কয়খানি নাটক রচনা করেন, তাহাদের প্রত্যেকখানিই মৌলিক, তবে ইহাদের কোন কোনটির মধ্যে সংস্কৃত কাব্য ও পুরাণের বিষয় ব্যবহৃত হইয়াছে।

রামনারায়ণ তর্করত্নের অনুবাদ-নাটকগুলির রচনার প্রায়' সমসাময়িক কালেই সুপরিচিত বিদ্যোৎসাহী ও দেশহিতৈষী কালীপ্রসন্ন সিংহও কয়েকখানি সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদ রচনা করেন। ইহাদের মধ্যে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কালিদাস-রচিত সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটক 'বিক্রমোর্বশী'র বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত করেন। ইহার দুই বৎসর পরই তিনি ভবভূতি-বিরচিত 'মালতী-মাধব' নাটকখানির বাংলা অনুবাদ রচনা করিয়া মুদ্রিত করেন। রামনারায়ণ রচিত 'মালতী-মাধব' নাটকের অনুবাদ ইহার আট বৎসর পর রচিত হয়।

সুতরাং এই বিষয়ক ইহাই প্রথম অনুবাদ। কালীপ্রসন্ন প্রতিষ্ঠিত 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র পক্ষ হইতে ইহা মুদ্রিত হইয়া তাঁহার অন্যান্য বহু গ্রন্থের মতই বিনামূল্যে বিতরিত হয়। তিনি নাট্যশালার উৎসাহ দিবার জন্য 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ' নামে এক রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহাতে তাঁহার এই সকল অনুবাদ-নাটক অভিনীত হয়। তাঁহার বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে তাঁহার অনুবাদ-নাটক রচনা করিবার ইতিহাস জড়িত আছে। বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে রামনারায়ণ তর্করত্ন অনূদিত ভট্টনারায়ণ কৃত 'বেণীসংহার' নাটকখানির অভিনয়ের তিনি অনুষ্ঠান করেন, ইহার অভিনয়ে তিনি নিজেও একটি অংশ গ্রহণ করেন। তাঁহার অভিনয়ের সাফল্যে তিনি উৎসাহিত হইয়া নিজেই নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন; মৌলিক নাটক রচনায় প্রেরণার অভাব বশত বাধ্য হইয়া অনুবাদ রচনার পথই অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন। তিনি তাঁহার 'বিক্রমোর্বশী' অনুবাদ-নাটকের বিজ্ঞাপনে সে যুগে সংস্কৃত নাটকের বাংলায় অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিবার যোগ্য—

...'উইলসন সাহেব লেখেন প্রায় অশীতিবর্ষ অতীত হইল কৃষ্ণনগরাধিপতি ৺প্রাপ্ত শ্রীযুক্ত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র রায় বাহাদুরের ভবনে চিত্রযজ্ঞ নামক এক সংস্কৃত নাটকের অনুরূপ হয়, কিন্তু রঙ্গভূমির নিয়মানুবর্তী হইয়া অভিনয় করেন নাই, ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইবার কারণ অনেকের মনোরঞ্জন হয় নাই।

এক্ষণে এই বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধীনস্থ রঙ্গভূমিতে বঙ্গবাসিগণ পুনরায় বাঙ্গালা নাটকের অনুরূপ দর্শনে পারগ হইলেন। প্রথমতঃ বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গভূমিতে ভট্টনারায়ণ প্রণীত বেণীসংহার নাটকের রামনারায়ণ কৃত বাংলা অনুবাদের অভিনয় হয়, যে মহাত্মারা উক্ত অভিনয় সময়ে রঙ্গভূমিতে উপনীত ছিলেন, তাঁহারাই তাহার উত্তমতার বিষয় বিবেচনা করিবেন, ফলে মান্যবর নটগণ যথাবিহিত নিয়মক্রমে অনুরূপ করায় দর্শক মহাশয়দিগের প্রীতিভাজন ও শত শত ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছিলেন।

পরে উপস্থিত দর্শক মহোদয়গণের নিতান্ত আগ্রহাতিশয্যে এবং তাঁহাদিগের অনুরোধবশত পুনরায় বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধীনস্থ রঙ্গভূমিতে অনুরূপ কারণেই বিক্রমোর্বশী অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইল।'

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে 'বিক্রমোর্বশী' নাটকের অভিনয় হয়, এই অভিনয়েও কালীপ্রসন্ন নাটকের একটি অংশ কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করেন।

ইতিমধ্যে মধুসূদন এবং দীনবন্ধু মিত্রের প্রায় সকল নাটকই প্রকাশিত হইয়াছে, ইহারা একখানিও অনুবাদ নাটক রচনা করেন নাই। ইঁহাদের মৌলিক নাটকগুলিই তখন বাঙ্গালী নাট্যামোদীদিগের সকল দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া লইল। ইহাদের নাটকগুলি জনসাধারণের প্রধানত ব্যবসায়ী ও সৌখীন নাট্যশালার অভিনয়ের ভিতর দিয়া প্রচারিত হইবার ফলে ইঁহাদের নাটকই সে যুগের নাট্য রচনার আদর্শ হইয়া উঠিল। তাহার ফলে ইহার পর হইতেই বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে অনুবাদের সংখ্যা হ্রাস পাইতে লাগিল। প্রকৃত পক্ষে বাংলা নাট্যসাহিত্যের যে যুগকে আদিযুগ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি, অর্থাৎ সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী কাল পর্যন্ত মধুসূদন দীনবন্ধুর পর গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিক্রমোর্বশী' এবং নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মালতী-মাধব' ব্যতীত আর কোন অনুবাদ-নাটক প্রকাশিত হয় নাই। ইহার পর বাংলা নাট্য-সাহিত্যের মধ্যযুগে অর্থাৎ সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া স্বদেশী আন্দোলনের যুগ পর্যন্তও যে সকল নাটক রচিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে সংস্কৃত হইতেই হউক, কিংবা ইউরোপীয় কোন ভাষা হইতেই হউক, অনুবাদের সংখ্যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না। এই যুগের অনুবাদ-নাটকের ক্ষেত্রে তিনজনের নামই উল্লেখযোগ্য—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও অমৃতলাল বসু। ইঁহাদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুবাদের সংখ্যাই সর্বাধিক। তিনি মোট তেত্রিশখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে প্রায় সব কয়খানিই অনুবাদ। সংস্কৃত, প্রাকৃত, ফরাসী, ইংরেজি প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষা হইতেই তিনি অনুবাদ করিয়া সে যুগের বাংলা অনুবাদ নাটকের ধারাটি কিয়ৎ পরিমাণে পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুবাদের বিশেষত্ব নির্দেশ করিবার জন্য এখানে তাঁহার কয়েকটি অনুবাদ রচনা একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাইতে পারে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 'হঠাৎ নবাব' নাম দিয়া ফরাসী নাট্যকার মলেয়ারের 'লা বুর্জোয়া জঁতিম্ওম্' (*'L bourgeois gentilhomme'*, নাটকখানির অনুবাদ করেন। নাট্যকার লিখিয়াছেন প্রহসনখানি মলেয়ারের নাটক হইতে 'নামান্তরিত স্বাধীন অনুবাদ'।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মূলের অনুগামী অনুবাদ করিয়াছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য ফরাসী সমাজে যাহা চলে, বাঙ্গালী সমাজে তাহা চলে না বলিয়া ঘটনার বাঙ্গালীকরণ হইয়াছে; কিন্তু তাহা তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নহে। মলেয়ারের

উক্ত নাটকটি পাঁচটি অঙ্কে বিভক্ত; কোন দৃশ্য নাই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই অঙ্ক বিভাগ মানিয়া চলেন নাই। তিনি নাটকটিকে পাঁচটি অঙ্ক এবং পঞ্চাশটি দৃশ্যে ভাগ করিয়াছেন। প্রথম অঙ্কে দুইটি দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কে ছয়টি দৃশ্য, তৃতীয় অঙ্কে একুশটি দৃশ্য, চতুর্থ অঙ্কে এগারটি দৃশ্য এবং পঞ্চম অঙ্কে ছয়টি দৃশ্য; ইহার কাহিনী এই প্রকার—

জুর্দন খাঁ নামক জনৈক অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি দোকানদারী করিয়া কিছু অর্থ উপার্জন করিয়াছিল। ঐশ্বর্যের মালিক হইয়া তাহার মনে শহরের ধনী ব্যক্তিদের সমপর্যায়ভুক্ত হইবার গভীর বাসনা জাগে এবং সেইজন্য তাহাদের আচার ব্যবহার শিক্ষা করিবার জন্য সে প্রভূত অর্থব্যয় করিতে থাকে। জুর্দনের এই মূর্খতার কথা শুনিয়া দৌলত খাঁ নামক একজন দেউলিয়া নবাব তাহার সহিত বন্ধুত্ব করে এবং নবাব দরবারে তাহার প্রতিপত্তি করাইয়া দিবে এবং দিলমনিয়া নাম্নী জনৈকা বেগমকে তাঁহার সহিত পরিচিত করাইয়া দিবে, এই প্রলোভন দেখাইয়া সময়ে অসময়ে জুর্দনের নিকট টাকা কর্জ করিতে থাকে, জুর্দনও মনের আনন্দে অর্থ ব্যয় করিতে থাকে। জুর্দনের স্ত্রী, জুর্দনের এই নির্বুদ্ধিতা কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিতেছিলেন না। কিন্তু তাহাকে নিরস্ত করাও তাঁহার আয়ত্তের বাহিরে ছিল। বড় মানুষের সমপংক্তিভুক্ত হইবার বাসনা জুর্দনের এত উগ্র হইল যে, সে তাহার কন্যা রোশনী বিবির বিবাহ তাহার প্রণয়ী খেলাত খাঁ নামক জনৈক যুবকের সহিত দিতে রাজী হইল না। খেলাত খাঁ'র অনুপযুক্ততার কারণ সে সম্ভ্রান্ত বংশের ব্যক্তি নহে। দৌলত খাঁর পরামর্শে জুর্দন তাহার কন্যার বিবাহ জনৈক পারস্য সম্রাটের সহিত দিবার সিদ্ধান্ত করায়, খেলাৎ তাঁহার ভৃত্য বদলুখাঁর পরামর্শে ছদ্মবেশী সম্রাট সাজিয়া জুর্দনের দরবারে হাজির হইল এবং অবশেষে জুর্দনের স্ত্রীর পৃষ্ঠপোষকতায় তাহার কন্যাকে বিবাহ করিল।

সংক্ষেপে ইহাই হইল প্রহসনটির কাহিনী। প্রসঙ্গত ইহার মধ্যে নৃত্য-শিক্ষক, সংগীত শিক্ষক, অসিযুদ্ধ শিক্ষক, দার্শনিক, দর্জি ইত্যাদি চরিত্র আসিয়া নাটকের ঘটনাকে আরও সরস ও বিদ্রূপাত্মক করিয়াছে।

মূল ফরাসী নাটকে যেমন দৃশ্য বিভাগ আছে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাহার ব্যতিক্রম করেন নাই। কেবল কয়েকটি দৃশ্য সংক্ষিপ্ত করিয়াছেন মাত্র এবং সমগ্র ঘটনা ও পরিস্থিতিকে বাঙালীর উপযুক্ত করিয়া সাজাইয়াছেন। তত্ত্বজ্ঞানী Philosopher মূল নাটকে ফরাসী স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের আলোচনা করিয়াছে,

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেগুলি বাংলা স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের আলোচনায় রূপান্তরিত করিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদ এইদিক দিয়াই মূলানুগ নহে। অনুবাদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে মূলানুগত্য সম্ভবও নহে।

বিভিন্ন ভাষার শব্দকোষ বিভিন্ন। প্রকাশভঙ্গীরও বিশেষ পার্থক্য আছে। সুতরাং এক ভাষা হইতে আর এক ভাষার সাহিত্যে অনুবাদ সহজসাধ্য নহে। মূলের রস ভাষান্তরিত হইয়া ক্ষুণ্ণ হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। সেই কারণে আক্ষরিক অনুবাদ সম্ভব নহে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মলেয়ারের দুইটি নাটক বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। স্বভাবতই নাট্যকার যথাসাধ্য অনুবাদ কার্য মূলানুগ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তথাপি সকল ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব হয় নাই বলিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রহসন দুইটিকে অনুবাদ না বলিয়া 'ভাষান্তরিত স্বাধীন অনুবাদ' বলিয়াছেন।

নাট্যকার সংলাপের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা লইয়াছেন। নাটকের গঠনকৌশলের তিনি কোনরূপ পরিবর্তন করেন নাই। প্রয়োজন বোধে কয়েকটি দৃশ্য ঈষৎ ক্ষুদ্রকায় করিয়াছেন এই মাত্র। দীর্ঘ সংলাপের ক্ষেত্রে অনেক সময় হ্রস্বতা আনিয়াছেন বটে, তবে মোটামুটি সংলাপের অনুবাদও যথাযথ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ 'জন উড' কৃত *The Would-be Gentleman* (*L' Bourgeois Gentilhomme*)র সহিত তাঁহার 'হঠাৎ নবাবে'র সংলাপের তুলনামূলক আলোচনা করা যাইতে পারে। ইংরেজী অনুবাদের সহিত আলোচনা করিব এই কারণে যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার নাটক মূল ফরাসী হইতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইংরেজী নাটকটিও তাহাই। এই ক্ষেত্রে যদি উভয় নাটকের (*The Would-be Gentleman* এবং 'হঠাৎ নবাবে'র) সংলাপে মিল দেখা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, উভয় নাটকের সংলাপই মূলানুগ। কেন না জ্যোতিরিন্দ্রনাথ *The Would-be Gentleman* নাটকখানি দেখেন নাই; কারণ, তাহার প্রথম প্রকাশ-কাল ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ, এবং সুদূর আমেরিকায় বসিয়া উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে রচিত 'হঠাৎ নবাব' প্রহসনটি উড সাহেবের পক্ষে দেখা সম্ভব ছিল না। সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, কেহই কাহারো নাটক হইতে প্রভাবান্বিত হন নাই। উভয়েরই অনুবাদের উৎস মলেয়ারের মূল নাটকখানি। অতএব উভয়ের নাটকের মধ্যে যদি সংলাপের মিল পাওয়া যায়—তবে তাহা মূলের সংলাপের আনুগত্য স্বীকারেরই ফল।

তুলনা :—

Music Master. [to musicians] Come in here and wait until he comes.

Dancing Master. [to dancers] And you can stay on this side.

Music Master. [to his pupil] Well, is it finished ?

Music Pupil. Yes.

Music Master. [taking manuscript] Let me see.... very good !

Dancing Master. Is it something new ?

Music Master. It is air for a serenade I set him to compose while we're waiting for our friend to awake. [Act I]

গানের ওস্তাদ। (দলের প্রতি) এস হে, তোমরা এই ঘরে এসো ; যতক্ষণ না তিনি আসেন, এইখানে বোসে একটু আরাম কর।

নাচের ওস্তাদ। (তাহার দলের প্রতি) তোমরাও এইদিকে ব'স।

গানের ওস্তাদ। (ছাত্রের প্রতি) সেটা কি তৈরী হয়েছে ?

ছাত্র। হাঁ, হয়েছে।

গাঃ ওস্তাদ। দেখি ; বাঃ, বেশ হয়েছে যে !

নাঃ ওস্তাদ। ওটা কি কিছু নতুন চীজ তৈরী হলো নাকি ?

গাঃ ওস্তাদ। ওটা একটা বিরহ টপ্পা। আমার ছাত্রকে দিয়ে এইখানেই ওটা তৈরী করিয়েছি।

[প্রথম অঙ্ক ; প্রথম দৃশ্য]

Music Master. There is just one other thing, Sir. A gentleman like you, Sir, living in style, with a taste for fine things, ought to have a little musical at-home, say every Wednesday or Thursday.

Mr. Jourdain. Is that what the quality do ?

Music Master. It is, Sir.

[Act II]

গাঃ ওস্তাদ। কিন্তু হুজুর, একদিনেই কি বশ্ হবে! আপনি যে রকম দেলদরিয়া মানুষ, ভালচিজ দেখতে শুনতে আপনার যে রকম শখ, তাতে প্রতি বুধবার, আর বেস্পতিবারে আপনার বাড়ীতে গান বাজনার বৈঠক দেওয়া উচিত।

জুর্দন। বড় লোকেরা কি তাই করে?

গাঃ ওস্তাদ। আজ্ঞে হাঁ, হুজুর।

[দ্বিতীয় অঙ্ক ; প্রথম দৃশ্য]

উদ্ধৃতিতে ভারাক্রান্ত করিয়া লাভ নাই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সংলাপের অনুবাদে যে মূলের আনুগত্য স্বীকার করিয়া যথাযথ অনুবাদের প্রয়াসী হইয়াছেন, উক্ত দৃষ্টান্তগুলিই তাহার প্রমাণ।

সংগীতের অনুবাদও প্রায় যথাযথ—

Mr. Jourdain. Yes—or lambs. Now I've got it!

[Singing]

I thought my Janey dear
As sweet as she was pretty, oh!
I thought my Janey dear as gentle as a-baa lamb oh!
Alas! alas! She is ten times more cruel
Than any savage tiger oh!

জুর্দন। হাঁ, পাঁঠা!

[গানারম্ভ]

প্রিয়ে তোরে বড়ই মিষ্টি ভেবেছিলেম আগে
এমন মিষ্টি মুখশশী পাঁঠা কোথায় লাগে।
হায়, হায়, দেখছি এখন, এমন তোর কঠিন মন
তোর কাছে (প্রেয়সী আমার) হার মানে বনের বাঘে।

এই উদ্ধৃতিটি যে যথাসম্ভব আনুগত্য বজায় রাখিয়া অনুবাদের চেষ্টা, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। তবে সংগীতের অনুবাদে স্থানে স্থানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়াছেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'দায়ে পড়ে দারগ্রহ' প্রহসনটি মলেয়ার কৃত 'মারিয়াজ ফোর্সে' নাটক অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। ইহার কাহিনী এই—

জগমোহন নামক একজন ৬০।৬৫ বৎসরের বৃদ্ধ অকস্মাৎ বিবাহ করিবার জন্য

ক্ষেপিয়া উঠিলেন। তাঁহার বন্ধু সতীশবাবু প্রথমে এ বিষয়ে নিরস্ত হইবার পরামর্শ দিয়াছিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন যে, জগমোহন স্থিরপ্রতিজ্ঞ, তখন তাঁহার কথাতেই সায় দিলেন। ক্রমশ জানা গেল, জগমোহন একটি পাত্রীও পছন্দ করিয়া রাখিয়াছেন; পাত্রীর নাম কমলমণি—বয়স ১০ বৎসর। সতীশকে বিবাহবাসরে উপস্থিত থাকার জন্য পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিয়া জগমোহনবাবু কমলমণির গুণাবলীর অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। কমলমণির ভ্রাতা তুলসীদাসের সার্কাসের দল আছে। কমলমণি সেই দলে ঘোড়ার উপর ডিগবাজী খেলা দেখায়। সংবাদটা জগমোহনবাবুর তেমন মনঃপূত হয় নাই, উপরন্তু তিনি রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন যে, তাঁহাকে যেন একটি ঘোড়া ব্রেক করিবার গাড়ীতে যুড়িয়া দিয়া একটি মেয়ে চাবুক হস্তে তাড়াইয়া বেড়াইতেছে; সতীশবাবু স্বপ্নবৃত্তান্ত অবগত হইয়া ফলাফল জানিবার জন্য জগমোহনবাবুকে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট যাইতে পরামর্শ দিলেন। জগমোহনবাবু যথাক্রমে ন্যায়রত্ন ও বেদান্তবাগীশের টোলে গেলেন, কিন্তু পণ্ডিতদ্বয় তাঁহার কোন কাজেই লাগিলেন না। তাঁহারা নিজের কথাই ফলাও করিয়া বর্ণনায় মত্ত। তাঁহাদের নিকট হইতে বিরক্ত হইয়া জগমোহন চলিয়া আসিয়া রাজপথে দুইজন বেদেনীর হস্তে পড়িলেন; তিনি তাঁহাদের নিকট স্বপ্নের বিশ্লেষণ করাইতে যাইয়া যৎপরোনাস্তি অপদস্থ হইলেন। তাহারা তাঁহাকে উন্মাদ সাব্যস্ত করিয়া কাদায় ফেলিয়া পলায়ন করিল। কর্দমাক্ত কলেবরে জগমোহনবাবু তাঁহার হবু শ্বশুর রামকান্তবাবুর গৃহে পদার্পণ করিলেন। বিবাহের ইচ্ছা জগমোহনবাবুর আর বিশেষ ছিল না। বিশেষ যখন রামকান্তবাবুর বৈঠকখানায় তিনি ঘোড়া ব্রেক করিবার যন্ত্রপাতি দেখিলেন এবং তাঁহার হবু পত্নী দশমবর্ষীয়া কমলমণি কর্তৃক স্বপ্নে যেমন দেখিয়াছিলেন, সেইভাবে চাবুক দ্বারা তাড়িত হইলেন, তখন বিবাহ-বাসনা লেশমাত্র রহিল না। তিনি সেই কথা রামকান্তবাবুকে বলায়, তিনি পুত্র তুলসীদাসকে জগমোহন সমীপে প্রেরণ করিলেন। তুলসীদাস যখন তাঁহাকে হয় বিবাহ, নয় ঘোড়া ব্রেক করিবার গাড়ীতে যুতিবার ব্যবস্থা করিল তখন অনন্যোপায় জগমোহনবাবু বিবাহ করাই সাব্যস্ত করিলেন।

প্রহসনটি তিন অঙ্কে বিভক্ত। প্রথম অঙ্কে একটিমাত্র দৃশ্য—জগমোহনের বাটী। দ্বিতীয় অঙ্কে দৃশ্যসংখ্যা চার—যথাক্রমে জগমোহনের গৃহ, ন্যায়রত্নের টোল, বেদান্তবাগীশের টোল ও রাজপথ। তৃতীয় অঙ্কে দৃশ্যসংখ্যা একটি—রামকান্তবাবুর গৃহ। মোটের উপর প্রহসনখানি তিন অঙ্ক এবং ছয় দৃশ্যে বিভক্ত।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম' এবং 'সরোজিনী' নাটকও যে দুইখানি ফরাসী নাটকের অনুবাদ তাহা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনায় বিস্তৃত-ভাবে উল্লেখ করিয়াছি।

এবার গিরিশচন্দ্র ঘোষের দুই একটি অনুবাদ-নাটকের বিশেষত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা যাইবে। গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'য্যায়সা কা ত্যায়সা' প্রহসনখানি মলিয়েরের কৃত *Love is the Best Doctor* (L'Amour Medicin) অবলম্বনে রচনা করিয়াছেন।

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে হেরাসিম লেবেডেফ যে দুইটি ইংরেজি নাটকের অনুবাদ লইয়া বাংলা নাটকের প্রথম অভিনয় করেন তাহা যথাক্রমে *The Disguise* এবং *Love is the Best Doctor.* প্রথম নাটকটির রচয়িতার নাম সম্প্রতি জানা গিয়াছে—এম্. জডরেল। দ্বিতীয় নাটকটি কাহার রচনা এখনও জানা যায় নাই। বলা যায় না, শেষোক্ত নাটকখানি মলিয়েরের রচিত "লা আমুর মেদিসিন" অবলম্বনে রচিত হইতে পারে।

'য্যায়সা কা ত্যায়সা' একান্ত মূলানুগ অনুবাদ নহে। স্বদেশীয় দর্শকের রুচি ও সংস্কার অনুযায়ী গিরিশচন্দ্র নাটকটিকে ঢালিয়া সাজিয়াছেন। যে যে অংশ বাঙ্গালী সমাজে অচল, সেই সেই অংশ তিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন, অথবা বাঙ্গালী সমাজের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া রচনা করিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ Clitandre এবং Lucinde'র বিবাহের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। Clitandre স্বয়ং Notary আনিয়াছিল এবং তাহার সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া একটি বিবাহের দলিল প্রস্তুত করাইয়াছিল। কিন্তু এরূপ বিবাহ আমাদের সমাজে অচল; বিশেষত উনিশ শতকের বাঙ্গালী সমাজে। সেইজন্য গিরিশচন্দ্র রসিকমোহন-রতনমালার বিবাহ অন্যভাবে কল্পনা করিয়াছেন। রসিকমোহন ও রতনমালা পরস্পরকে ভালবাসিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহারা স্বাধীনভাবে অর্থাৎ অভিভাবকের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে পরস্পরের সহিত পরিণয়াবদ্ধ হয় নাই। রসিক-মোহনের খুড়া মহাশয়, সনাতন, এই ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন এবং তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়াই রসিক অবধূত সাজিয়া হারাধনকে ঠকাইবার জন্য আসরে নামিয়াছিল। শুধু ইহাই নহে, ঘটনাটিকে আরও স্বদেশীয় করিবার জন্য গিরিশচন্দ্র বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীর উপস্থাপনা করিয়াছেন। পরিশেষে তাহাদের উপলক্ষ্য করিয়া বরপক্ষের পণ চাওয়া প্রথার দোষ বর্ণনাও খানিকটা করিয়াছেন,

যদিও ঐ অংশটুকু নাটকের বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্যের সহিত ঠিক মিলে না।
কাহিনীটি এই প্রকার—

হারাধন বিত্তশালী বিপত্নীক। একটি মাত্র কন্যা আছে, কন্যাটিকে তিনি স্নেহ করেন, কিন্তু তাহার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক নহেন, কেননা সম্পত্তি ও কন্যা যুগপৎ বেহাত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। এদিকে কন্যা রতনমালা রসিকমোহন বলিয়া একটি যুবকের প্রণয়াসক্ত হইয়া পড়িয়াছে; অথচ ঘটনাটা পিতাকে জানাইতে পারিতেছে না, কেননা প্রতিবেশী সনাতনবাবু ওই রসিকমোহনের সহিত রতনমালার বিবাহ দিবার কথা হারাধনকে বলায় হারাধন তাহা নাকচ করিয়া দিয়াছিলেন। দ্বারের অন্তরালে থাকিয়া রতনমালা এ কথা শুনিয়াছিল। সুতরাং হৃদয়ের জ্বালা হৃদয়ে চাপিয়া রাখা ভিন্ন তাহার গত্যন্তর রহিল না। ফলে রতনমালা ক্রমশ বিমর্ষ হইয়া পড়িল। রতনকে বিমর্ষ দেখিয়া হারাধন চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু যখন শুনিলেন যে কন্যার এই বিমর্ষতার হেতু বিবাহের ইচ্ছা, তখন আরও রাগিয়া উঠিলেন। হারাধন কন্যার বিবাহ না দিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ। হারাধনের দাসী গরব রতনমালার মনের কথা জানিয়া তাহার অভীষ্ট সিদ্ধির উপায় বাহির করিল। সে রতনকে রোগের ভাণ করিয়া পড়িয়া থাকিবার নির্দেশ দিয়া, যথোচিত ক্রন্দন ইত্যাদি সহযোগে সবিস্তারে কন্যার ব্যাধির কথা হারাধনকে জানাইল। হারাধন ব্যাকুল হইয়া ভৃত্য মাণিককে বলিলেন ডাক্তার ডাকিয়া আনিতে। কর্তব্যপরায়ণ ভৃত্য এ্যালোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ, হকিম, কবরেজ, বেদেনী, জোঁকওয়ালী যাকে যেখানে পাইল, ডাকিয়া আনিল। কিন্তু কন্যার রোগ নির্ণয়ে কোন বৈদ্যই সক্ষম হইল না, বরং রোগ লইয়া তাহাদের নিজেদের মধ্যে মতভেদ দেখা গেল। অবশেষে গরব রসিকমোহনকে অবধূত সন্ন্যাসী সাজাইয়া হারাধনের নিকট লইয়া আসিল। রসিকের সহিত রতনের সাক্ষাৎ হইল। বাতায়ন হইতে যে হৃদয়-বিনিময় হইয়াছিল, তাহার ভিত্তি স্থাপিত হইল। রসিক ও সনাতন পরামর্শ করিয়া পুরোহিত, বরযাত্রী, কন্যাযাত্রী, ইত্যাদি সকলকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিল। কন্যার স্বাস্থ্যের জন্য ভুয়া বিবাহের আয়োজন প্রয়োজনীয় বলিয়া সে হারাধনকে বিবাহ অনুষ্ঠান করিতে বলিল। হারাধনও ভুয়া বিবাহ জানিয়া যথারীতি তাহার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। রসিকমোহন ও রতনমালার বিবাহ হইয়া গেল। পরে হারাধন জানিতে পারিলেন যে ইহা সনাতন ও রসিকের কারসাজি। কিন্তু তখন আর কিছুই করিবার ছিল না। সম্প্রদান হইয়া গিয়াছে। বিক্ষুব্ধ

হারাধন শান্ত হইলেন এবং মাণিকের সহিত দাসী গরবের বিবাহ দিলেন। নৃত্য, গীত, হল্লায় প্রহসনের উপর যবনিকা নামিয়া আসিল।

পূর্বেই বলিয়াছি, কাহিনী মোটামুটি একই আছে, তবে গিরিশচন্দ্র ফরাসী সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত প্রহসনটিকে বাঙ্গালী সমাজের উপযুক্ত করিয়া রচনা করিয়াছেন। সেইজন্য স্বভাবতই সমকালীন বাঙ্গালী সমাজ-জীবনের কয়েকটি ঘটনা প্রহসনটিতে আসিয়া পড়িয়াছে। যেমন বঙ্গরমণীগণের জ্যাকেট বডিস্ পরার ব্যাপারটি। এই সময় য়ুরোপীয়দের অনুকরণে এদেশে মেয়েদের জ্যাকেট পরার প্রচলন হয়; বাঙ্গালী সমাজ ইহাকে সহজে গ্রহণ করিতে পারে নাই। ঘটনাটি আলোচ্য প্রহসনের অষ্টম দৃশ্যের শেষে বঙ্গরমণীগণের প্রবেশ ও গীতের মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে। গীতটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল।

॥ বঙ্গরমণীগণের প্রবেশ ও গীত ॥

কাঙালী বাঙ্গালীর মেয়ে, কাজ কি বিবিয়ানা যাই,
বুকে পিঠে সেঁটে ধরে, জ্যাকেট বডি'র মুখে ছাই।
এখন চলছে কসতা পেড়ে শাড়ী
শাঁখার আদর বাড়ী বাড়ী
ভেঙে কাচের বাসন, কাচের চুড়ী, ঘুচেছে কাচের বালাই ॥

শেষ অংশে নাট্যকার সমকালীন সমাজের বরপণের কথা বলিয়াছেন। ইহাও ফরাসী সমাজের চিত্র নহে—বাঙ্গালী সমাজের চিত্র। সেই সময় পাত্রপক্ষের অহেতুক বরপণ চাওয়ায় অনেক কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাই কন্যার বিবাহ দিতে পারিতেন না। ফলে বহু বয়স অবধি কন্যাকে অনূঢ়া রাখিতে হইত। গিরিশচন্দ্র প্রাচীনপন্থী ছিলেন, তিনি শাস্ত্রোক্ত গৌরীদান ইত্যাদি প্রথা উঠিয়া যায় দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। এই প্রহসনের শেষে সেইজন্য পণপ্রথা সমস্যাটির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, যদিও নাটকটির মূল উদ্দেশ্য পণপ্রথার রূঢ়তা দেখান নহে। হারাধন বরপণ দিবার সামর্থ্যের অভাবে কন্যাকে গৃহে রাখে নাই, তাহার যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ ছিল। নাটকের মূল উদ্দেশ্য হইল বিভিন্ন ধরনের ডাক্তার এবং তাহাদের চিকিৎসার বিধিকে ব্যঙ্গ করা। সেইজন্য পণপ্রথার কথা বলিয়া গিরিশচন্দ্র আলোচ্য নাটকে উদ্দেশ্যচ্যুত হইয়াছেন। শেষের সংলাপগুলি নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। তথাপি গিরিশচন্দ্র ইহা সমকালীন জনরুচির অনুগামী করিয়া রচনা করিয়াছিলেন। যে সমস্যায় কন্যার পিতারা জর্জরিত, নাটকের মাধ্যমে যদি তাহার আভাস কিঞ্চিৎ দেখা যায়, ত

নিঃসন্দেহে নাটকখানি তাহাদের নিকট আকর্ষণীয় হইয়া উঠে। গিরিশচন্দ্র পেশাদার নাট্যকার, দর্শকের রুচি তিনি বেশ ভাল করিয়াই বুঝিতেন।

মাণিক ও গরবের প্রেমের দৃশ্যও মূল নাটকে নাই। উহাও সমসাময়িক জন-রুচি অনুসরণ করিয়া নাট্যকারকে রচনা করিতে হইয়াছে। মূল নাটকে 'খ্যাম্পেন' চরিত্রটিকে বাড়াইয়া গিরিশচন্দ্র 'মাণিক' চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। দাসদাসীর ঝগড়া ও প্রণয় এককালের দর্শকের নিকট খুব উপভোগ্য ছিল। বাঙ্গালা নাটকে এই ধরণের বহু 'টাইপ' দাসদাসী চরিত্র আছে। মাণিক ও গরব ইহার ব্যতিক্রম নহে।

'য্যায়সা কা ত্যায়সা' প্রহসনের কোন অঙ্কবিভাগ নাই। দশটি দৃশ্যে কাহিনী বিভক্ত। প্রথমে প্রস্তাবনা সঙ্গীত, শেষে পট পরিবর্তন ও বাসর সঙ্গীত। গিরিশচন্দ্র মলিয়েরের আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই। কাহিনী অবলম্বন করিয়া একটি প্রহসন লিখিয়াছেন মাত্র। সুতরাং অনেক অংশই তাঁহার স্ব-রচিত। যথা—মাণিক ও গরবের প্রেমের একটি দৃশ্য :—

গরব। কাউকে বলিসনি, তোরে যে করবো, তাই তোরে এখন চুপি চুপি বলছি। আমি ওর কাছে ডাইনে মন্ত্রটি শিখেছি; এখন গাছচালা মন্ত্রটি শিখতে যাচ্ছি।

মাণিক। ডাইনে মন্ত্র শিখেছিস কি রে?

গরব। নইলে তোরে যে করতে যাচ্ছি কেন? তোর কাছে শুয়ে থাকবো, আর একটু একটু করে বুকের রক্ত খাবো।

মাণিক। নে নে ঠাট্টা করিসনে, তোর কথা শুনে ভয় লাগে।

গরব। ভয় করে,—তোর বুকের রক্ত খাবো; তা কি তুই টের পাবি? এ্যাই গ্যাখ, তুই সামনে দাঁড়া দেখি, একটু খাই, তুই টেরও পাবিনে। [৮ম দৃশ্য—পথ]

কামাখ্যার ডাকিনী গাছ চালিতে পারে, এবং সেই গাছে চড়িয়া তাহারা ঘুরিয়া বেড়ায়, এই বিশ্বাস বাঙ্গালী সমাজে প্রচলিত ছিল। এমন কি, বিংশ শতাব্দীতে আমরাও বাল্যকালে দিদিমার নিকট এই গল্প শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িতাম। গিরিশচন্দ্র এই বিশ্বাসকে রূপায়িত করিয়াছেন। জনরুচির নিকট এমন ভাবে আত্মসমর্পণ বোধ হয় আর কোন নাট্যকার করেন নাই। ইহা মহৎ নাট্যকারের লক্ষণও নয়।

নাটকের শেষ দৃশ্য—রসিক কর্তৃক বিষয়ের দলিল স্ত্রী রতনমালাকে উৎসর্গ-করণ ও হারাধনকে 'ট্রাষ্টি' নিয়োগ, মূল নাটকের বহির্ভূত—কাল্পনিক দৃশ্য মাত্র।

রসিক। মহাশয় ক্রুদ্ধ হচ্ছেন কেন? এই দেখুন আমার যথাসর্বস্ব, আপনার কন্যার নামে লিখে এনেছি, আপনি তার ট্রাষ্টি। আপনার কন্যা আপনারই থাকবে, তার উপর—আজ হতে আমি আপনার পুত্র হ'লেম। [১০ম দৃশ্য]

ইংরাজি অনুবাদে আছে :—

Sganarelle (হারাধন) নিজেই Notary (পুরোহিত)কে বলিতেছে—Now Sir, draw up a marriage contract for these two young people. Write it out at once please. [To Lucinde] You see, he is drawing up the contract. [To Notary] I give her twenty thousand pounds on her marriage. Write that down.

অবশেষে Lucinde পিতার নিকট হইতে দলিলটি দস্তখৎ করাইয়া প্রমাণ স্বরূপ নিজের নিকট রাখিয়া দিল। ঘটনাটি বাঙ্গালী সমাজের পক্ষে উপযুক্ত নহে। সেইজন্য গিরিশচন্দ্র রসিকমোহনকে দিয়া পত্নীকে বিষয় উইল করাইয়াছেন।

সংলাপের অনুবাদেও গিরিশচন্দ্র মূলের যথাযথ অনুসরণ করেন নাই। জন উড কৃত ইংরাজি অনুবাদের পাঠ মিলাইয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'হঠাৎ নবাব' প্রহসন যে মূলানুগ তাহার প্রমাণ পাই। উভয় নাটকের সংলাপ যখন এক, তখন মনে হয় জন উডের অনুবাদ মূলানুগ। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের অনুবাদের সহিত জন উডের অনুবাদের সংলাপে মিল নাই। বিশেষ গিরিশচন্দ্র প্রয়োজন মত প্রহসনটিকে দেশী ছাঁচে ঢালিয়া লইয়াছেন। অনুমিত হয়, গিরিশচন্দ্র চরিত্র চিত্রণের মত সংলাপের অনুবাদেও স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া গিরিশচন্দ্রের অনুবাদ হুবহু না হওয়াই সম্ভব। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যানুবাদ সাহিত্যরস-পিপাসার অঙ্গীভূত। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের উদ্দেশ্য অভিনয় করা। পেশাদার প্রয়োগকর্তার পক্ষে দর্শকরুচিকে আমল দেওয়াই সম্ভব। সেইজন্য ঘটনা সংস্থাপন এক হইলেও সংলাপে গিরিশচন্দ্র স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়াছেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক সেক্সপীয়রের 'ম্যাকবেথ' নাটকের অনুবাদ বাংলা অনুবাদ-নাটকের আদর্শ-স্থানীয়। ইহাতে আগাগোড়া গিরিশচন্দ্র ম্যাকবেথের সংলাপের যথাযথ অনুবাদ করিয়াছেন। এমনকি মূলের যে অঙ্কের যে যে দৃশ্যে

যে সকল চরিত্র প্রবেশ ও প্রস্থান করিয়াছে, এবং যে সকল কথা বলিয়াছে, অনুবাদে গিরিশচন্দ্র তাহাই হুবহু অনুসরণ করিয়াছেন, কোথাও অন্যথা নাই। আমরা মূলের দুইটি সুপরিচিত সংলাপের সহিত গিরিশচন্দ্রের অনূদিত সংলাপের তুলনা করিলাম।

Macb. Cure her of that.
Can't thou not minister to a mind diseased,
Pluck from the memory a rooted sorrow,
Raze out the written troubles of the brain
And with some oblivious antidote
Cleanse the stuff'd bosom of that perilous stuff
Which weighs upon the heart ?
(*Act V, Sc. iii*)

ম্যাকবেথ। কর আরোগ্য প্রদান এ পীড়ায়।
পার না কি মনব্যাধি করিতে মোচন ;
স্মৃতি হতে উখাড়িতে নার কি হে তুমি
দুরন্ত সন্তাপ বদ্ধমূল ;
অগ্নিবর্ণে থরে থরে মস্তিষ্ক মাঝারে—
লেখা অনুতাপ লিপি,
আছে কি কৌশল তব মুছিবারে তায় ;
অন্তর গরল যার প্রবল পীড়নে,
ব্যথিত হৃদয়াগার,
বিস্মৃতি অমৃত বারি করি দান
ধৌত কর— পার যদি ? (৫।৩)

Macb. :—She should have died hereafter,
There should have been a time for such a word
Tomorrow and tomorrow and tomorrow,
Creeps in this petty pace from day to day
To the last syllable of recorded time,
And all our yesterdays have lighted fools
The way to dusty death. Out, out, brief candle,
Life's but a walking shadow, a poor player
That struts and frets his hour upon the stage

And then is heard no more. It's a tale
Told by an idiot, full of sound and fury
Signifying nothing.

(*Act V*, Sc. v)

ম্যাকবেথ :— মরণ আছিল শ্রেয়ঃ পরে,
রাজ্ঞী মৃত— ;
হেন কথার সময় সঙ্গত হইত কোন দিন ;
কল্য—কল্য—কল্য—
চলে ধীর পদে দিন দিন
হয় লয় নির্ণীত সময়ে—
প্রারব্ধ লিপির শেষাক্ষরে
গতকল্য একত্র হইয়ে
ল'য়ে যায় পথ দেখাইয়ে ;
মিশাইতে শ্মশান ধূলায়।
নিভে যা, নিভে যা ওরে ক্ষণস্থায়ী দীপ।
চলচ্ছায়া মাত্র এ জীবন ;
ক্ষুদ্র অভিনেতা,
নিজ অভিনয় সময়ে যেমন
মদগর্বে চলে রঙ্গস্থলে,
হস্ত পদ সঞ্চালিয়ে—গর্জন করিয়ে,—
পরে তার তত্ত্ব নাহি জানে কেহ।
বাতুলের গল্প এ জীবন,
অর্থহীন মাত্র—বহু বাক্য আড়ম্বর। (৫।৫)

মূলের আনুগত্য এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার যোগ্য।

'ম্যাকবেথ' নাটক অনুবাদে গিরিশচন্দ্র একেবারে স্বাধীনতা গ্রহণ করেন নাই, একথা বলা বোধ করি সঙ্গত হইবে না। একথা সত্য যে, চরিত্র এবং সংলাপের দিক দিয়া তিনি মূলের প্রতি আনুগত্যই দেখাইয়াছেন ; কিন্তু সঙ্গীত সম্পর্কে একথা বলা যায় না। 'ম্যাকবেথ' অনুবাদে গিরিশচন্দ্র মোট পাঁচখানি গান সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এই পাঁচখানি গানে 'ম্যাকবেথে'র পরিবেশের যে

কিছু উন্নতি হইয়াছে, তাহা বলা যায় না; কেননা তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় সেক্সপীয়রের 'ম্যাকবেথে' ঐ সঙ্গীতগুলির অভাবে যথোচিত পরিবেশ সৃষ্টি হয় নাই।

গিরিশচন্দ্রের ঐ সঙ্গীত-সন্নিবেশের মূলে রহিয়াছে উনবিংশ শতাব্দীর জনরুচির প্রভাব। একদিকে প্রাচীন যাত্রার ঐতিহ্য অপর দিকে উত্তর-ভারত হইতে আগত বিভিন্ন রাগসঙ্গীতের প্রভাব ঐ গানগুলির মধ্যে স্বীকৃত হইয়াছে।

উনিশ শতকের নাটকের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য নাটকের স্থানে অস্থানে সখীগণের প্রবেশ এবং সঙ্গীতের পরিবেশন। 'ম্যাকবেথ' নাটকে সখীর ভূমিকা সৃষ্টির কোন সুযোগ নাই; তাই বলিয়া গিরিশচন্দ্র 'সখীগণ'কে নিরাশ করেন নাই। অপরাপর ডাকিনী চরিত্রের মধ্যে তাহাদের মিশাইয়া দিয়াছেন। এই অপরাপর ডাকিনীগণ নাটকে কোন সাহায্য করে নাই, সময় সময় কেবল প্রবেশ করিয়াছে এবং গান গাহিয়া প্রস্থান করিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম অন্যান্য নাটকের 'সখীগণের প্রবেশ ও গীত' ম্যাকবেথে 'অপরাপর ডাকিনীগণের প্রবেশ ও গীতে' রূপান্তরিত হইয়াছে। ইহা সমকালীন জনরুচির প্রভাব।

অমৃতলাল বসু ফরাসী লেখক মলিয়ারের *The School for Wives* নাটকটি অবলম্বন করিয়া 'চোরের উপর বাটপাড়ি' প্রহসনখানি রচনা করিয়াছেন।

অমৃতলালের প্রহসনটি শ্লীলতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়াছে এবং স্বীকার করিতেই হয় যে, মূল নাটকটিও এতখানি অশ্লীল নহে। অমৃতলাল অঘোরবাবুর স্ত্রীকে (গিন্নী) মদ্যপায়িনী এবং স্বৈরাচারিণী করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। সমকালীন যুগে অনেক পুরস্ত্রীকে মদ্যপ স্বামীর অনুরোধে মদ্যপায়িনী হইতে হইয়াছিল, ইতিহাসে ইহার নজীর আছে। নারায়ণের নিকট প্রসঙ্গত গিন্নীও ইহা বলিয়াছেন :—'মিনষে খায়, আমাকেও শিখিয়েছে, বলে, তোর অম্বলের ব্যায়রামের উপকার হবে।' (পঞ্চম দৃশ্য) কিন্তু তাই বলিয়া পুরস্ত্রীগণ যে নিজেদের সকল শিক্ষা সংস্কার জলাঞ্জলি দিয়া বারনারীর মত ব্যবহার করিতেন, এমন কথা বলা যায় না। প্রথমত বাঙ্গালী সমাজে অবরোধ প্রথা তখনও অত্যন্ত কঠিন ছিল। পুরুষেরা মদ্যপান করিয়া বাঈজী ইত্যাদির সহিত বাগান-বাড়ীতে বাস করিলেও পুরললনাগণ সে যুগে অন্দরমহলের বাহিরে আসিতে পারিতেন না। মনস্তাত্ত্বিক নিপীড়নের ফলে তাঁহাদের কাহারো কাহারো চারিত্রিক স্খলন দেখা দিলেও তাহা বারবনিতার কার্যক্রমের মত এতখানি গর্হিত হইত না। আলোচ্য প্রহসনে গিন্নী চরিত্রটি অঘোরবাবুর বিবাহিতা স্ত্রী হইলেও

তাঁহার রক্ষিতার ন্যায় অঙ্কিত হইয়াছে। গিন্নী তাহার প্রণয়ীকে বলিতেছে, 'না ভাই, আমার রামে শ্যামে কাজ নেই—তুমি আমার বাম হয়ো না। (হস্ত ধরিয়া) বাস্তবিক ভাই, কে জানে তোমার চোখে কি আছে, এই চাউনীতেই আমায় পাগল করেছ। কিন্তু ভাই, তোমাদের বিশ্বাস কি, দুদিন বাদে চিনতে পারবে না।' (প্রথম দৃশ্য) কোন ভদ্র গৃহস্থের স্ত্রী এই ভাষায় পরপুরুষের সহিত কথা বলিতে পারে, তাহা ধারণাতীত। সত্য বলিতে কি 'গিন্নী' চরিত্রটির যথোচিত মূল্যায়ন অমৃতলাল করিতে পারেন নাই। তাঁহার কথায়-বার্তায়, আচার-আচরণে, অমৃতলালের ধারণায় হাস্যরসের সৃষ্টি হইলেও, আমাদের ধারণায় তাহা বীভৎস রসে রূপান্তরিত হইয়াছে।

মলিয়ারের মূল নাটকে চরিত্রের এইরূপ অভব্যতা নাই। 'গিন্নী' চরিত্রের সহিত মূল নাটকের 'এগ্‌নিস' চরিত্রের বিন্দুমাত্র মিল নাই। প্রথমত এগ্‌নিস অবিবাহিতা তরুণী। সে সাংসারিক জীবনে সকল ব্যাপারে অনভিজ্ঞা সরলা বালিকা। মাত্র চারি বৎসর বয়স হইতে সে নায়ক আরনল্‌ফির গৃহে প্রতিপালিত। তের বৎসর আরনল্‌ফি তাহাকে বহির্জগতের সকল ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া মানুষ করিয়াছে। এগ্‌নিস সম্পূর্ণ নিষ্পাপ :—"You can judge of her looks and her innocence when you converse with her". বন্ধু ক্রাইসলডি'র প্রতি আরনল্‌ফির এগ্‌নিস সম্পর্কে এই উক্তি হইতেই তাহা বুঝা যায়।""কিন্তু "গিন্নী"র চরিত্রে এগ্‌নিসের এই সরলতা নাই। তিনি সরলা নহেন, বরং নিপুণা নায়িকা ; অবিবাহিতা ত' নহেনই।

দ্বিতীয়ত এগ্‌নিস হোরেস্‌কে ভালবাসিয়াছিল সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়া। তাহার সে প্রেমে কামগন্ধ কোথাও ছিল না। সে তরুণী, অবিবাহিতা, ঘটনাক্রমে আর একজন অবিবাহিত তরুণের সহিত তাহার পরিচয় হইয়াছিল এবং পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইয়া প্রেমে রূপান্তরিত হইয়াছিল। ইহাতে দোষের কিছু নাই এবং অপাপবিদ্ধা এই তরুণীর প্রণয় কোথাও শ্লীলতার গণ্ডী অতিক্রম করে নাই। তাহার প্রণয় যে কতখানি সরল এবং কামগন্ধহীন ছিল তাহা নিম্নোক্ত কথা হইতে বুঝা যাইবে :—

হোরেস্ যে এগ্‌নিসকে ভালবাসে তাহা আরনল্‌ফির নিকট সে ব্যক্ত করিয়াছে। কিন্তু হোরেস্ জানিত না যে বিয়াল্লিশ বৎসরের আরনল্‌ফিও (যে সপ্তদশী এগ্‌নিসকে তাহার চারি বৎসর বয়সের সময় হইতে লালনপালন করিয়াছে) তাহার পাণিপ্রার্থী। আরনল্‌ফি যখন এগ্‌নিসের প্রণয়-বৃত্তান্তের

কথা হোরেসের নিকট শুনিল, তখন তাহার সত্যতা নিরূপণের জন্ম এগ্‌নিসের নিকট গিয়া প্রশ্ন করিল—এগ্‌নিসও সরলভাবে তাহাকে সকল কথা বলিতে আরনল্‌ফি বলিল :—

"...Yes—All these tender passages, these pretty speeches, and sweet caresses, are a great pleasure, but they must be enjoyed in an honest manner and their sin should be taken away by marriage.

Agnes.—Is it no longer a sin when one is married ?
Arnolphe.—No.
Agnes—Then please marry me quickly......"

(*Act II, Scene vi*)

এগ্‌নিস চরিত্রের এই সরলতা গিন্নী চরিত্রে কোথাও নাই। তৃতীয়ত, নারায়ণকে লুকাইবার জন্ম গিন্নী যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন এগ্‌নিস তাহা করে নাই। আরনল্‌ফি যখন তাহাকে বলিয়াছিল যে হোরেস্‌ আসিলেই সে যেন তাহার মুখের উপর দরজা বন্ধ করিয়া জানালা হইতে ঢিল মারে, তখন এগ্‌নিস তাহাই পালন করিয়াছিল ; অতিরিক্ত এই যে, সেই ঢিলের সহিত সে একটি চিঠিও প্রণয়ীকে দান করিয়াছিল। ইহা দূষণীয় নহে ; বরং উপযুক্ত পরিবেশে কৌতুককর হইয়াছে। নারায়ণকে স্বামীর নিকট হইতে গোপন করিতে, গিন্নীর যে আচরণ, তাহার সহিত 'বালজাক' বা 'বোকাসিও'র গল্পের কোন কোন চতুরা নায়িকার মিল আছে—'এগ্‌নিসে'র নহে।

মলিয়ারের *The School jor Wives* নাটকের সহিত অমৃতলালের 'চোরের উপর বাটপাড়ি' প্রহসনের ঘটনাগত সাদৃশ্য কেবলমাত্র একটি জায়গায়, তাহা আরনল্‌ফির নিকট (আরনল্‌ফি যে এগ্‌নিসের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী তাহা না জানিয়া) হোরেস্‌ যেমন এগ্‌নিসের প্রতি তাহার প্রেমের কথা অকপটে বলিয়াছিল এবং তাহা শুনিয়া ক্ষিপ্তপ্রায় আরনল্‌ফি এগ্‌নিসকে নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়া হোরেসের সান্নিধ্য হইতে সরাইয়া রাখিতে প্রয়াসী হইয়াছিল, ঠিক তেমনি অঘোরবাবু কর্তৃক নিয়োজিত নারায়ণ অঘোরবাবুর স্ত্রীর সহিত প্রণয়লীলায় ব্যাপৃত হইয়া তাঁহাকেই (গিন্নী যে অঘোরবাবুর স্ত্রী তাহা না জানিয়া) সবিস্তারে সে বিষয় বর্ণনা করিয়া, ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল, এবং তিনিও (অঘোরবাবু) নারায়ণকে হাতেনাতে ধরিবার জন্ম অনেক চেষ্টা করিয়া বিফল-

কাম হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া '*The School for Wives*'এর সহিত 'চোরের উপর বাটপাড়ি' প্রহসনের কোন মিল নাই। তাই প্রহসনটি মলিয়ারের বিষয়-বস্তুর অবলম্বন না বলিয়া, বিষয়বস্তুর বিন্যাস কৌশলের দ্বারা অনুপ্রাণিত রচনা বলাই আমাদের মতে শ্রেয়।

নির্মিতির দিক দিয়াও উভয় নাটকের অমিল লক্ষণীয়। 'চোরের উপর বাটপাড়ি' মাত্র কয়েকটি দৃশ্যে বিভক্ত (অঙ্কহীন) ক্ষুদ্র প্রহসন, *The School for Wives* একটি পূর্ণাঙ্গ পঞ্চাঙ্ক নাটক।

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত সেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট' নাটকের অনুকরণে 'হরিরাজ' রচনা করেন। নাটকের প্রারম্ভে লেখা আছে 'ঐতিহাসিক বিয়োগান্ত নাটক' ইহা যে হ্যামলেটের অনুবাদ অথবা অনুসরণ নাট্যকার তাহা কোথাও স্বীকার করেন নাই। গ্রন্থারম্ভে হ্যামলেটের প্রথম অঙ্কের দৃশ্য হইতে একটি উদ্ধৃতি আছে মাত্র।

'হরিরাজ' ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। ইহা মনে হয় গিরিশচন্দ্রের প্রভাবের ফল। নাটকটির রচনা-শৈলী উচ্চাঙ্গের নহে; ইহার কয়েকটি সঙ্গীত বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল।

'হরিরাজ' নাটকে 'হ্যামলেট' নাটকের দৃশ্যসংস্থানগুলি বজায় রাখা হয় নাই চরিত্রও নাট্যকার নূতন করিয়া কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন; যেমন সুরমা হ্যামলেটের কোন ভগিনী ছিল না, কিন্তু 'হরিরাজে'র ভগিনী হিসাবে নাট্যকার এই চরিত্রটি সৃষ্টি করিয়াছেন। হ্যামলেটের পিতার হত্যাকারী ছিল তাহার কাকা ক্লডিয়াস্; 'হরিরাজে' ক্লডিয়াসের স্থান লইয়াছে জয়াকর, জয়াকর হরিরাজের খুড়া নহে, কাশ্মীর-রাজের প্রধান সেনাপতি। ক্লডিয়াসের পত্নী চরিত্র 'হ্যামলেটে' নাই; এখানে মলিনা জয়াকরের পত্নীরূপে নূতন সৃষ্টি। দধিমুখ চরিত্রও নাট্যকারের সৃষ্টি। দধিমুখ রাজার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বিদূষক ব্রাহ্মণ। এই চরিত্রটি সংস্কৃত নাটক হইতে 'হরিরাজে' স্থান পাইয়াছে। তবে প্রত্যক্ষ ভাবে ইহা গিরিশচন্দ্রের 'জনা' নাটকের বিদূষক চরিত্রের অনুকরণ। জনার বিদূষকের আচরণ এবং সংলাপের সহিত দধিমুখের কার্য ও কথার মিল লক্ষণীয়।

কাহিনীর ক্ষেত্রে হ্যামলেট এবং হরিরাজের কিছু মিল আছে। হ্যামলেটের কাকা যেমন তাহার মাতা গিরট্রুডের প্রণয়ী এবং পিতার হত্যাকারী, জয়াকরও তেমনি হরিরাজের মাতা শ্রীলেখার প্রণয়ী এবং তাহার পিতার হত্যাকারী। হ্যামলেটের পিতার প্রেতাত্মা হ্যামলেটকে এই হত্যারহস্য জানাইয়াছিল

হরিরাজের পিতার প্রেতাত্মাও তাহাকে এই হত্যারহস্যের কথা জানাইয়াছে। পোলোনিয়াসের কন্যা ওফিলিয়ার সহিত হ্যামলেটের বিবাহ হইবার কথা; কুলধ্বজের কন্যা অরুণার সহিতও হরিরাজ বিবাহপণে আবদ্ধ। কুলধ্বজ কাশ্মীর-রাজের প্রধান সামন্ত। মাতার অবৈধ প্রণয় এবং তজ্জন্য পিতৃহত্যার কথা জানিবার পর যেমন হ্যামলেটের জীবনে দারুণ দোটানার ঝড় নামিয়া আসে (ইহা থামিয়াছে তাহার মৃত্যুর সহিত), তেমনি প্রধান সেনাপতি জয়াকরের সহিত মাতা শ্রীলেখার অবৈধ প্রণয় এবং তজ্জন্য পিতৃহত্যার কথা শুনিয়া হরিরাজের জীবনেও আসিয়াছে দারুণ সংশয়ের দোটানা এবং এই দ্বন্দ্ব হইতে সে মৃত্যুর পূর্বে মুক্তি পায় নাই।

মোটামুটি এইরূপ কিছু মিল 'হ্যামলেট' এবং 'হরিরাজে' প্রত্যক্ষ করা যায়। সেইজন্য ইহাকে 'হ্যামলেটে'র ভাবানুবাদ বলা চলে—অনুবাদ নহে।

রক্ষী সৈন্যদল হ্যামলেটের পিতার প্রেতাত্মার আবির্ভাব অনেকবার দেখিয়াছে, কিন্তু হ্যামলেটের বন্ধু হোরাশিও তাহা বিশ্বাস করে না। প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে সেই বিষয়ে রক্ষিগণ কথাবার্তা কহিতেছিল। 'হরিরাজ' নাটকের প্রথম দৃশ্যও সেইরূপ রক্ষিগণের কথাবার্তা দিয়া সুরু হইয়াছে। হ্যামলেট হোরাশিওর মুখে পিতার প্রেতাত্মার কথা শুনিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিতে উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল; কিন্তু হরিরাজ স্বপ্ন দেখিয়া পিতার জীবননাশের কারণ সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া ভাবিতেছিল।—সংলাপের অনুবাদ নাট্যকার করেন নাই।—তবে স্থানে স্থানে সংলাপের ভাবানুবাদ আছে।—

Ghost. I am thy father's spirit,
Doom'd for a certain term to walk the night,
And for the day confined to fast in fires,
Till the foul crimes in my days done of nature
Are burnt and purged away. But that I am forbid
To tell the secrets of my prison-house,
I could a tale unfold whose lightest words
Would harrow up thy soul, freeze thy young blood,
Make thy two eyes, like stars, start from their spheres

কাশ্মীর-রাজের প্রেতাত্মা :

বৎস রে,
আমি রে জনক তোর
কিন্তু আর নহি কায়াময়,
ছায়াময় প্রেতাত্মা এখন।
আগমন দানিতে সংবাদ তোরে—
শোন তবে হয়োনা অধীর।
যে কাহিনী করিব বর্ণন—
কণামাত্র করিলে শ্রবণ,
কণ্টকিত হবে তব কলেবর।
লোমকূপে স্ফুলিঙ্গ খেলিবে
হৃদিতন্ত্রী স্বকার্য ভুলিবে,
শোণিত প্রবাহ
সহসা নিথর হবে নির্মম আঘাতে।
মনে হবে প্রতিক্ষণে
ধরিত্রী যাইছে সরি চরণ হইতে।

পিতার মৃত্যু-রহস্য শ্রবণ করিয়া হ্যামলেট বলিয়াছিল—

Hamlet. O all you host of heaven ! O earth !
What else ?
And shall I couple hell? O, fie, hold, hold, my heart ;
And you, my sinews, grow not instant old,
But bear me stiffly up. Remember thee !
Ay, thou poor ghost, while memory holds a seat
In this distracted globe. Remember thee !
Yea, from the table of my memory
I'll wipe away all trivial fond records,
All saws of books, all form, all pleasures past,
That youth and observation copied there;

And thy commandment all alone shall live
Within the book and volume of my brain,

হরিরাজ। কোথা স্বর্গ, কোথা মর্ত্য।
নরক কোথায় ?
ছি ছি, ঘৃণা হয় এ জীবনে।
ধীরে ধীরে কর আঘাত হৃদয়
শিরা গ্রন্থিচয়, দৃঢ় কর বন্ধন নিচয়
বল দাও এ বেগ ধরিতে।
পিতা ভুলিব তোমায় !
পারিব না, পারিব না, জানিও নিশ্চয়—
যতদিন স্মৃতিশক্তি রহিবে আমার,
মুছিব হৃদয় হতে অতীত ঘটনা—
পড়াশুনা সকলি ভুলিব,
যৌবনে যতেক বিদ্যা করেছি অর্জন,
বিসর্জন করিব সকলি।
হৃদয়ের স্তরে স্তরে জ্বলন্ত অক্ষরে—
লেখা রবে অগুজ্ঞা তোমার।
অন্য চিন্তা অবসান আজি হতে।

তুলনামূলক আলোচনায় দেখা গেল, হরিরাজের সংলাপটি হ্যামলেটের সংলাপের প্রায় অনুবাদ। নাট্যকার এই ভাবে মধ্যে মধ্যে হ্যামলেটের সংলাপের অনুবাদ করিয়াছেন, তবে সর্বাংশে করেন নাই।

'হরিরাজ' নাটকের কাহিনী-বিন্যাসে এবং চরিত্র-চিত্রণে 'হ্যামলেট' অপেক্ষা গিরিশচন্দ্রের 'জনা' নাটকের প্রভাব অধিক। দধিমুখ চরিত্রটি জনার বিদূষকের মত। তাহার সংলাপের একটু নিদর্শন এই—

দধিমুখ। তা বটেই ত। রাজ্ঞী সিংহাসনে না বসলে মনস্তু হবে কেন ? দেখছি, এর ভেতর রকম আছে। আমি ভেবেছিলাম সোজা-সুজি, এখন বুঝেছি বিস্তর হিজিবিজি। নাঃ তর্কে তর্কে ফিরতে হল, শ্রাদ্ধ যখন এতদূর গড়িয়েছে, তখন তোমরা সব পারো।

আচ্ছা, নড় চড়, শর্মাও ঘাপ মারতে দড়— বড় একটা স
ছাড়ছিনি। (হরিরাজ ১।৫)

দধিমুখ। যা থাকে কপালে, হরিরাজকে বলে ফেলে পেটটা হালকা করি
বিশ্বাসঘাতকের ছুরি কি জানি কখন এসে মাথায় পড়ে। যতই
দেখছি, ততই আমার ধড়ে প্রাণটা ধড়াস ধড়াস করছে। বাবা!
রাণী ত নয় যেন রায়বাঘিনী। কি চাউনি—যেন সপ্ত বিষে
খনি। (হরিরাজ ৪।৪)

দধিমুখকে সকলে উন্মাদ মনে করে, সে যে সকল কথা বলে তাহার তাৎপর্য আর কেহ বুঝিতে চাহে না। দধিমুখ হরিরাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ; সে পূর্ব হইতেই জয়াকর ও শ্রীলেখার ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারিয়াছে।

জনার বিদূষকও আপাতদৃষ্টিতে উন্মাদ। সেও যাহা বলে তাহার তাৎপর্য কেহ বুঝে না। সেও নীলধ্বজ রাজার হিতাকাঙ্ক্ষী এবং কৃষ্ণের ষড়যন্ত্র হইতে রাজপরিবারকে বাঁচাইতে চাহে। জনার বিদূষকের মুখে গিরিশচন্দ্র গদ্য সংলাপ দিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রতি লাইনের শেষে অর্থাৎ অন্ত্যানুপ্রাসে মিল থাকায় তাহা পদ্যধর্মী হইয়াছে। হরিরাজের বিদূষকের সংলাপও একই রকম। মনে হয় যেন 'জনা'র বিদূষকের সংলাপগুলি হরিরাজের বিদূষকের মুখে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই চরিত্রটি জনার বিদূষকের প্রভাব নহে, অনুকরণ।

'হরিরাজে'র শ্রীলেখা এবং 'জনা'র জনা চরিত্র বিভিন্ন হইলেও, শ্রীলেখার সংলাপে মধ্যে মধ্যে জনার প্রভাব আছে। একটু তুলনা করা যাক—

শ্রীলেখা নাহি কার্য বৃথা বাক্যব্যয়ে—
চল যাই রহিগে গোপনে।
আহতা রমণী ভুজঙ্গিনী করে পরাজয়!
নরক কোথায়,—ত্রাসেতে লুকায়,
যবে নারী ধায়—
প্রতিহিংসা সাধিতে আপন।
(হরিরাজ ৫।৬)

জনা। দেখিবে জগতে পুত্রহীনা নারী ভীষণা কেমন,
সিংহিনীর দন্ত কাড়ি লব—
ফণিনীর গরল হরিব ··
... . ইত্যাদি (জনা)

ছন্দের রচনাতেও গিরিশচন্দ্রের প্রভাব লক্ষণীয়।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নাটকের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, তাহা সঙ্গীত-বাহুল্য। বাঙ্গালীর যাত্রা এবং উত্তর ভারত হইতে আগত বিভিন্ন রাগসঙ্গীতের প্রভাবে সমকালীন বাংলা নাটকে এই সঙ্গীতের প্রভাব-আধিক্য ঘটিয়াছিল। তখনকার যুগে সকল নাটকেই—কি অনুবাদ কি মৌলিক—নায়ক-নায়িকার গীত ছাড়াও 'সখীগণের প্রবেশ ও গীত' অপরিহার্য ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 'হরিরাজ' নাটকও ইহার ব্যতিক্রম নহে। সেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট' নাটকে গান অবশ্য আছে, কিন্তু একটি—ওফেলিয়ার। 'হরিরাজ' নাটকের সঙ্গীতের সংখ্যা মোট এগারখানি। কহ্লন গাহিয়াছে একখানি, অরুণা গাহিয়াছে তিনখানি, সুরমা তিনখানি এবং সখীগণ গাহিয়াছে চারখানি। সংগীতাংশের এত বাহুল্য সমকালীন সমাজ-জীবনের একটি প্রভাব বলিয়াই মনে হয়। শুধু 'হরিরাজ'-ই নহে, তৎকালীন সকল নাটকেই এই ধরণের সংগীত-বাহুল্য লক্ষণীয়।

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা নাটকের আর একটি বৈশিষ্ট্য অতিনাটকীয়তা, 'হরিরাজ' নাটকেও তাহা আছে।

অরুণা :—ঐ যাঃ—চাঁদ ডুবে গেল। কি হবে, কি হবে? আজ যে আমাদের বিয়ে। অন্ধকারে বিয়ে কেমন করে হবে, ওঃ বুঝেছি চাঁদ আমার সতীন। তাই লুকোলো—হিংসেতে ডুবলো। অন্ধকার, অন্ধকার, কিছু দেখা যাচ্ছে না। রাত্তির ঝাঁ ঝাঁ করছে। পথ দেখতে পাচ্ছিনি। একটু বসি। (উপবেশন) ও কি ও। নীচে ও কি রয়েছে? নীল আলো কোত্থেকে আসছে? ওখানে শুয়ে কে? কে ও? কে ও? অ্যাঁ, অ্যাঁ,—প্রাণেশ্বর—তুমি—তুমি···

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নলিনী-বসন্ত' সেক্সপীয়রের *Tempest*-এর অনুবাদ। চরিত্রগুলির নামকরণ মূলের অনুগত নয়। হেমচন্দ্র নেপলসকে কঙ্কনে রূপান্তরিত করিয়াছেন; ঘটনাস্থল ভারতবর্ষ হওয়ায় চরিত্রগুলিরও ভারতীয় নামকরণ করিয়াছেন। লক্ষ্য করিবার বিষয়, তাঁহার অনুবাদে মূলের হুবহু পরিচয় পাওয়া যায় না। সেক্সপীয়রের রসবস্তুর সহিত পরিচিত করাইবার জন্যই হেমচন্দ্র অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেক্সপীয়রের নাটকের শেষে 'এপিলগ' আছে; কিন্তু প্রথমে কোন প্রস্তাবনা নাই। হেমচন্দ্র অনুবাদের প্রথমে একটি প্রস্তাবনা লিখিয়াছেন—

বৈজয়ন্ত নামে রাজা কঙ্কন ভূপতি
নিরবধি যাদুবিদ্যা করি আলোচনা
হারাইল রাজ্যদেশ ভ্রাতার কপটে
ভাসিয়া সাগরনীরে, অরণ্যপুলিনে,
বালিকা কন্যার সহ দ্বাদশ বৎসর
করিল অজ্ঞাতবাস, পড়িয়া বিপাকে,
পরে কুহকের শক্তি প্রকাশি অসীম
বিপক্ষ দমন করি ফিরিল স্বদেশে।
এ আখ্যান চমৎকার শুন মন দিয়া
শুনিলে কৌতুক হবে চিত্ত বিনোদিয়া ॥

নট আসিয়া রঙ্গস্থলে প্রথমে এই প্রস্তাবনা পাঠ করিয়া যাইবার পর রঙ্গাভিনয় সুরু হইল। সংস্কৃত নাটকের মত আলোচ্য অনুবাদে হেমচন্দ্র নান্দী, সূত্রধারের প্রসঙ্গ অবতারণা করেন নাই বটে, কিন্তু নটের অবতারণা এবং তাহার মুখে প্রস্তাবনা অংশে নাটকের সমগ্র বিষয়বস্তুর সার উদ্‌ঘাটন সংস্কৃত নাটকের প্রবাহের ফল। হেমচন্দ্র মনেপ্রাণে বাঙ্গালী ছিলেন; ইংরাজি নাটকের অনুবাদ প্রসঙ্গে সেইজন্যই সংস্কৃত নাট্যরীতির প্রভাব ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

হেমচন্দ্র 'টেমপেস্ট' নাটকের আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই। মূলের কাহিনীর যথাযথ অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বটে, তবে চরিত্রগুলির মাহাত্ম্য সকল সময় বজায় রাখিতে পারেন নাই। সংলাপের অস্বাভাবিকতায় মূলের রসহানিও হইয়াছে। কতকগুলি সংলাপের তুলনা করা যায়—

সুমালী :— জয় প্রভু, জয় নাথ! জয় দেব জয়,
আকাশে উড়িতে কিবা পাতালে ডুবিতে
অনলে পশিতে কিবা মেঘেতে চড়িতে
কুণ্ডলী বাঁধিয়া যবে ওঠে সে আকাশে—
কি আজ্ঞা করুন প্রভু।

বৈজয়ন্ত :— সুমালি! প্রণালী মত বলেছিনু যথা
অনুষ্ঠান করেছ ত?

Ariel :— All hail, great master! grave sir, hail,
I come.
To answer thy best pleasure, be't to fly,

To swim, to dive into the fire, to ride
On the curl'd clouds to thy strong bidding task
Ariel and all his quality.

Pros :— Hast thou spirit,
Performed to point the tempest that I bade thee ?

(*Act I, Sc. ii*

এখানে দেখা যাইতেছে, মূলের সহিত হেমচন্দ্র যথাসম্ভব আনুগত্য বজায় রাখিয়া অনুবাদ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সকল সময় এইরূপ আনুগত্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। উনবিংশ শতকের কলিকাতার জনজীবনের প্রতিচ্ছবি অহেতুকভাবে স্থানে স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহাতে নাটকটির রসবিপর্যয় ঘটিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ 'তিলকের' সংলাপ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

তিলক :—আবার মেঘ ডাকছে—ঝড় ওঠবার উজ্জুগ হচ্ছে—যাই কোথা। এখানে ঝোপঝাপ কিছুই দেখছিনে ; কোথায় লুকুই।……… ……আ গ্যাল, এটা কি ? কি এটা পড়ে রয়েছে ? মানুষ না কচ্ছপ ? জ্যাস্ত না মরা ? উঃ কি দুর্গন্ধ…মরা কচ্ছপই বটে·— কিন্তু বড় নূতনতর দেখছি। আমি যদি এই সময় একবার কোলকাতায় যেতে পারতুম, আর এই কচ্ছপটাকে রঙচঙ করে, মানুষের ল্যাজ বেরিয়েচে বলে মাঠের ধারে একটা তাঁবু ফেলে বস্‌তে পারতুম, ত' কত পয়সাই হাত হতো—সেখানকার বাবুরা আজকাল ভারি হুজুকে হয়ে উঠেছে ; ঘোড়ার নাচ বিবির নাচ, ভূত নাচানো, সং নাচান নিয়ে বড়ই সাখরচে হয়ে পড়েছে—কিন্তু এদিকে একজন ভিকিরি এলে একমুঠো চাল জোটে না। টোল চৌপাড়িগুলো একেবারে লোপ পাবার যো হয়েছে, তবুও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের দিয়ে এক পয়সাও সাহায্য করেন না। (অঙ্ক ২য়, দৃশ্য ২য়)

বর্বট :— কর্তা, আজ্ঞা হয়ত আমার সেই কথাটা বলি।

উদয় :— শুনবো বই কি, বল্‌। হাঁটু গেড়ে বোস, জোড়হাত করে বল— ওমরাও সাহেবদের কাছে খোসামুদে ওমেদওয়ার যেমন করে বলে, তেমনি করে বল।

উদয় :— ....আহা, ও কি তেমনি জানোয়ার—আজকাল ভালমানুষের ছেলেদের ছুচার বোতল ওল্ড টমে কিছু হয় না। (৩।৩)

রূপ :— বুকে মাথা, কন্ধ কাটা প্রভৃতির যেসব গল্প শোনা গিয়েছে, তা এখন ত' সকলি সত্য মনে হয়। বোঝা গেছে দেশবিদেশে না বেড়িয়ে সোনার বেনেদের মত মাগমুখো হয়ে বসে থাকলেই কুঁজড়ো হয়ে যেতে হয়। [তৃতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য]

এই সকল সংলাপের মধ্য দিয়া উনবিংশ শতকের শহরবাসী বাঙ্গালী জীবনের একটি রূপ ফুটিয়াছে সত্য, কিন্তু সেক্সপীয়রের নাটকের অনুবাদে এই ধরণের সংলাপ রচনা করিয়া নাট্যকার মাত্রাজ্ঞানের অভাবের স্বাক্ষর রাখিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয়। ইহাতে সেক্সপীয়রের নাটকের ক্লাসিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

সঙ্গীতের মধ্য দিয়াও এই ধরণের অসঙ্গতি পরিস্ফুট হইয়াছে।

ও আমার আদরিণী প্রাণ
চলো যাবো গঙ্গাস্নানে—
হাটখোলাতে তোমায় আমায় খাবো পাকা পান
চলো আদরিণী প্রাণ।

অনুবাদ হিসাবে এই কারণেই 'নলিনী-বসন্ত'কে ব্যর্থ বলিতে হয়। ইহা ছাড়া রচনা হিসাবেও ইহা উৎকৃষ্ট হয় নাই। অধিকাংশ সংলাপই হেমচন্দ্র অমিত্রাক্ষরে রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা না পদ্য, না গদ্য, উভয়ের মাঝামাঝি একটা রূপ পাইয়া হাস্যকর হইয়া উঠিয়াছে। যেমন,

সুমালী :— 'কাহারই মস্তকের চুলটি খসেনি
বস্ত্র পরিচ্ছদে কারো দাগটি লাগেনি,
বরং অধিক আরো উজ্জ্বল হয়েছে ;...'

ইহাকে আর যাহাই বলা যাক না কেন, অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত কবিতা নিশ্চয় বলা যায় না।

'নলিনী-বসন্তে'র মত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রোমিও জুলিয়েট'ও অনুবাদ নহে। তবে 'রোমিও-জুলিয়েট'এ কিছু কিছু চরিত্রে মূলের নাম বজায় আছে। চরিত্রগুলির সব Shakespeare-এর *Romeo and Juliet*-এ নাই, কিন্তু হেমচন্দ্রের রোমিও-জুলিয়েটে আছে। চরিত্রের মধ্যে বাঙ্গালীচরিত্রের আমদানিতেই নাটকের নাটকত্ব বুঝা যায়। অনুবাদ মানে হত্যা নহে। রোমিওর সহিত ভৃত্যের বাপকে একাসনে বসাইয়া হেমচন্দ্র সেক্সপীয়রকে হত্যা

করিয়াছেন। নাট্যকার অবশ্য পাশ্চাত্য বস্তু প্রাচ্য ঢঙে সাজাইয়া দেশবাসীর হৃদয়ঙ্গম করাইতে চাহিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য সাধু, সন্দেহ নাই ; কিন্তু প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।

হেমচন্দ্র নাটকটিকে পাঁচটি অঙ্কে বিভক্ত করিয়াছেন বটে ; কিন্তু মূলের সহিত অঙ্কানুযায়ী দৃশ্যের সমতা রক্ষা করিয়া চলেন নাই। তুলনার জন্য নিম্নোদ্ধৃত অংশ উল্লেখ করা যায়—

রোমিও :— আহা কিবা রূপ দেখিলাম, রূপ সেত নয়।
রূপ যেন সে মণ্ডল আলো করে আছে,
নিশির শ্রবণে যথা কিরণের দুল
কিম্বা শ্যামাঙ্গীর কর্ণে স্বর্ণের কুণ্ডল
শোভাকর, তেমনি সে রমণীও
রমণীমণ্ডলে শোভা করে। (১।৭)

Romeo : It is the east, and Juliet is the sun.
Arise fair sun, and kill the envious moon
Who is already siek and pale with grief,
That thou her maid art far more fair than she.
B3 not her maid ; since she is envious.

(Act II. Sc. ii)

এই অনুবাদখানি সম্পর্কে হেমচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন —

'এই পুস্তকখানি সেক্সপীয়রের "রোমিও জুলিয়েট" নাটকের ছায়ামাত্র, তাহার অনুবাদ নহে। বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষায় প্রকৃতিগত এত প্রভেদ যে কোনও একখানি ইংরাজী নাটকের কেবল অনুবাদ করিলে, তাহাতে কাব্যের রস, কি মাধুর্য কিছুই থাকে না এবং দেশাচার, লোকাচার, ও ধর্মভাবাদির বিভিন্নতা প্রযুক্ত এরূপ শ্রুতিকঠোর ও দৃশ্যকঠোর হয় যে, তাহা বাঙ্গালী পাঠক ও দর্শক-দিগের পক্ষে অরুচিকর হইয়া উঠে। সেইজন্য আমি রোমিও জুলিয়েটের কেবল ছায়ামাত্র অবলম্বন করিয়া এই নাটকখানি এরূপ প্রকাশ করিলাম। মূলের কোন কোন স্থান পরিত্যাগ বা পরিবর্তন করিয়া লইয়াছি, কোথাও দু-একটি নূতন বিষয়ও সন্নিবেশিত করিতে হইয়াছে। স্ত্রীপুরুষদিগের নাম ও কথাবার্তা দেশীয় করিয়া লইয়াছি, কিন্তু প্রধান প্রধান নায়ক, নায়িকাগণ ও তাহাদের চিত্ত বা চিত্রগত ভাব, মূলে যেখানে যেরূপ আছে সেইরূপ রাখিতেই যতদূর সাধ্য চেষ্টা

করিয়াছি। ফলতঃ সেক্সপীয়রের নাটকের গল্পের ও তাহার প্রধান প্রধান নায়ক নায়িকাদিগের চরিত্রের সারাংশ লইয়া তাহা দেশীয় ছাঁচে ঢালিয়া স্বদেশী পাঠকের রুচিসঙ্গত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

আমার ধারণা এই যে, এইরূপ কোনও প্রণালী অবলম্বন না করিলে কোন বিদেশীয় নাটক বাঙ্গালা সাহিত্যে স্থানলাভ করিতে পারিবে না; এবং তাহা না হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পূর্ণ পুষ্টিলাভ ও প্রকৃতিগত উন্নতি হইবে না।'

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় সংস্কৃত ও ইংরেজী হইতে যে কত নাটক অনূদিত হইয়াছিল নিম্নের তালিকা হইতেই তাহার একটি আভাস পাওয়া যাইবে।—

সংস্কৃত

১৮২২	'আত্মতত্ত্ব কৌমুদী'	কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন
	'হাস্যার্ণব'	?
১৮২৮	'কৌতুক সর্বস্ব'	রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার
১৮৩৯	'প্রবোধ চন্দ্রোদয়'	বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ন
১৮৪৮	'অভিজ্ঞান-শকুন্তলা'	রামতারক ভট্টাচার্য
১৮৪৯	'রত্নাবলী'	নীলমণি পাল
১৮৫৫	'বেণীসংহার'	মুক্তারাম শর্মা
	'অভিজ্ঞান-শকুন্তল'	নন্দকুমার রায়
১৮৫৬	'বেণীসংহার'	রামনারায়ণ তর্করত্ন
১৮৫৭	'বিক্রমোর্বশী'	কালীপ্রসন্ন সিংহ
১৮৫৮	'রত্নাবলী'	রামনারায়ণ তর্করত্ন
১৮৫৯	'মালতীমাধব'	কালীপ্রসন্ন সিংহ
১৮৬০	ঐ	লোহারাম শিরোরত্ন
	'অভিজ্ঞান-শকুন্তল'	রামনারায়ণ তর্করত্ন
	'মালবিকাগ্নিমিত্র	শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর
	'মুদ্রারাক্ষস'	হরিনাথ শর্মা
১৮৬২	'বিক্রমোর্বশী'	দ্বারকানাথ গুপ্ত
১৮৬৭	'মালতীমাধব'	রামনারায়ণ তর্করত্ন
১৮৬৯	'বিক্রমোর্বশী'	গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	'চণ্ডকৌশিক'	রামগতি ন্যায়রত্ন

১৮৭১	'মুদ্রারাক্ষস'	হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন
১৮৭৪	'শত্রুসংহার' ('বেণীসংহার')	হরলাল রায়
১৮৭৫	'কনক-পদ্ম' (অভিজ্ঞান-শকুন্তলা)	ঐ
১৮৭৯	'প্রেম পারিজাত মহাশ্বেতা' (কাদম্বরী)	প্রমথনাথ মিত্র
১৮৮৬	'বিমুক্ত বেণীবন্ধন' ('বেণীসংহার')	নগেন্দ্রনাথ ঘোষ
১৮৮৭	'কুমারসম্ভব'	হরিভূষণ ভট্টাচার্য
১৮৮৯	'অভিজ্ঞান-শকুন্তলা'	প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
১৮৯০	'অভিজ্ঞান-শকুন্তলা'	প্রমথনাথ সরকার
১৮৯৩	'প্রবোধ চন্দ্রোদয়'	আগুনাথ বিদ্যাভূষণ
১৮৯৯	'শকুন্তলা'	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৯০০	'উত্তর চরিত'	ঐ
	'মালতীমাধব'	ঐ

ইংরেজি (সেক্সপীয়র)

১৮৫২	'ভানুমতী চিত্তবিলাস' (The Merchant of Venice)	হরচন্দ্র ঘোষ
১৮৬৪	'চারুমুখী চিত্তহরা' (Romeo and Juliet)	ঐ
১৮৬৭	'সুশীলা-বীরসিংহ' (Cymbeline)	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৮৬৮	'কুসুমকুমারী' (ঐ)	চন্দ্রকালী ঘোষ
১৮৭০	'বসন্তকুমারী' (Romeo and Juliet)	রাধামাধব কর
১৮৭৩	'ভ্রমকৌতুক' (The Comedy of Errors)	বেণীমাধব ঘোষ
১৮৭৪	'রুদ্রপাল' (Macbeth)	হরলাল রায়
	'অমর সিংহ' (Hamlet)	প্রমথনাথ বসু
১৮৭৫	'ম্যাকবেথ' (Macbeth)	তারকনাথ মুখোপাধ্যায়
১৮৭৬	'মদনমঞ্জরী' (The Winter's Tale)	অজ্ঞাতনামা
১৮৭৭	'সুরলতা' (The Merchant of Venice)	প্যারীলাল মুখোপাধ্যায়
১৮৭৮	'অজয় সিংহ ও বিলাসবতী' (Romeo and Juliet)	যোগেন্দ্রনারায়ণ দাস ঘোষ
১৮৭০	'নলিনী বসন্ত' (The Tempest)	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮৮০-৮৪	'প্রকৃতি' (The Tempest)	চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
১৮৮০	'শরৎশশী' (A Midsummer Night's Dream)	নীলরতন মুখোপাধ্যায়

১৮৮৫	'ভীমসিংহ' (Othello)	তারিণীচরণ পাল
	'কর্ণবীর' (Macbeth)	নগেন্দ্রনাথ বসু
১৮৯২	'হ্যামলেট' (Hamlet)	ললিতমোহন অধিকারী
১৮৯৪	ঐ (ঐ)	চণ্ডীপ্রসাদ ঘোষ
১৮৯৫	'রোমিও জুলিয়েট' (Romeo and Juliet)	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮৯৭	'অনঙ্গ রঙ্গিণী' (As you like it)	অন্নদাপ্রসাদ বসু
১৮৯৯	'ম্যাক্‌বেথ' (Macbeth)	গিরিশচন্দ্র ঘোষ
?	'হরিরাজ' (Hamlet)	অমরেন্দ্রনাথ দত্ত

বিবিধ

১৮৫৬	'অনুতাপ নবকামিনী' (The Fair Penitent)	শ্যামাচরণ দাস দত্ত
১৮৫৭	'চিত্তবিনোদ' (The Fatal Curiosity)	রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
১৮৬৭-৬৯	'চন্দ্রাবতী' (Loves of the Harem)	নিমাইচাঁদ শীল
১৮৭১	'প্রভাবতী' (The Lady of the Lake)	কালীপদ ভট্টাচার্য

উপরে অনুবাদ-নাটকগুলি সম্পর্কে সাধারণভাবে যে আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে ইহাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক নাটকই আক্ষরিক অনুবাদ, অধিকাংশই ভাবানুবাদ। অনেক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য জীবনের বাঙ্গালীকরণ সার্থক না হইলেও ইহাদের মধ্য দিয়াই বাংলা নাটকীয় ভাষার যে অনুশীলন হইয়াছে, তাহার ভিতর দিয়া ইহা শেষ পর্যন্ত একটি আদর্শ ভাষার সন্ধান পাইয়াছে। অনুবাদ-নাটকগুলি পরবর্তী বাংলা নাট্যসাহিত্যের ধারায় সুগভীর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, এ কথা সত্য; এমন কি, কোন অনুবাদ-নাটকেরই সার্থক অভিনয়ও দর্শকদিগের কৌতূহল সৃষ্টি করিতে পারে নাই; তথাপি ইহাদের মধ্য দিয়া একদিক দিয়া পাশ্চাত্ত্য নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে বাংলা নাটকের যেমন যোগ রক্ষা পাইয়াছে, অন্য দিক দিয়া তেমনই সংস্কৃত নাটকের আদর্শটিকেও ইহারা অপরিচিত হইতে দেয় নাই। তথাপি এ কথা সত্য, গিরিশচন্দ্রের নাটকের ব্যাপক প্রভাবের ফলে অনুবাদ-নাটক সেই যুগের মত ক্রমে অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল।

অষ্টম অধ্যায়

নাট্যশালা

(১৭৯৫-১৯১২)

॥ এক ॥

নাটক আলোচনা প্রসঙ্গে রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যশালার কথা স্বভাবতঃই আসিয়া পড়ে। নাটক প্রধানতঃ দৃশ্যকাব্য। প্রত্যেক দেশের নাট্য-সাহিত্যের অন্ততঃ গোড়ার পরিচয় তাহাই। পরে অবশ্য সভ্যতার ক্রমবিবর্তনে যখন যুক্তিবাদ ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রাধান্য দেখা দেয়, তখন পাঠ্যকাব্য হিসাবে নাটক একটি পৃথক সংজ্ঞা লাভ করে; ইবসেন, মেটারলিঙ্ক, বার্নার্ড শ' এবং রবীন্দ্রনাথ এই ধারাকে পুষ্ট ও পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন। সুতরাং বর্তমান যুগে নাটক আর শুধু দৃশ্য-কাব্যই নয়, পাঠ্যকাব্যও। কোথাও একের প্রাধান্য, কোথাও বা অন্যের। আবার উপযুক্ত শিল্পগোষ্ঠীর মাধ্যমে অনেক নাট্যকাব্যও মূক-অভিনয়ে, নাচ ও গানের মাধ্যমে অভিনীত হইয়া দর্শকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করিয়াছে। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে এই ক্রমপরিবর্তনের কোন সুস্পষ্ট পথরেখা চিহ্নিত নাই। সেইজন্য ইহার পরিচয় লাভ করিতে হইলে বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসই সন্ধান করিতে হইবে। ইউরোপীয় সভ্যতার যে সকল দান আমাদের সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে, রঙ্গমঞ্চ তাহাদেরই অন্যতম। রঙ্গমঞ্চ বা থিয়েটার বাংলার সংস্কৃতিতে ছিল না। ছিল নাটগীত, যাত্রাগান, পাঁচালী, হাফ-আখড়াই, কবিগান ও তরজার আসর। ইহাদের সঙ্গে বর্তমান সভ্যতাপুষ্ট রঙ্গমঞ্চের কোন সম্পর্ক নাই। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে অবশ্যই আমরা নাট্যকলা ও রঙ্গমঞ্চের পরিচয় পাই। কিন্তু মধ্যযুগের অনালোকের তমসা ভেদ করিয়া তাহার প্রসন্ন আশীর্বাদ আমাদিগকে অভিসিঞ্চিত করিয়া তোলে নাই। ইউরোপীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি হইতেই আমরা ইহার প্রেরণা লাভ করিয়াছি; পরে অবশ্য যুগাবগাহী ধারায় রঙ্গমঞ্চ বাংলার নিজস্ব ও শিল্প-নৈপুণ্যে জাতীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

প্রথম বাংলা রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন একজন রাশিয়ান; নাম হেরাসিম লেবেডেফ। রঙ্গমঞ্চটি প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছিল ২৫নং ডুমতলা লেনে (বর্তমান এজরা স্ট্রীট)। গোলোক নাথ দাসের কাছে এ দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া লেবেডেফ গম্ভীর ও হাস্যরসাত্মক দুইখানি ইংরেজী নাটক (*The Disguise* এবং *Love is the Best Doctor*) বাংলায় অনুবাদ করেন। মাত্র তিন মাসের প্রস্তুতিতে প্রথম নাটকটি দেশীয় অভিনেতা ও অভিনেত্রীর দ্বারা ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর মঞ্চস্থ হয়। পরের বৎসর (১৭৯৬) ২১শে মার্চ উক্ত নাটকের পুনরভিনয় হয়। লেবেডেফ-এর অর্থে তাঁহারই নক্সা অনুযায়ী রঙ্গমঞ্চটি সজ্জিত ছিল। সমসাময়িক পত্রিকা হইতে জানা যায় যে, রঙ্গমঞ্চটিকে দেশীয় রীতিতে সজ্জিত করা হয় (Decorated in the Bengali Style)। দ্বিতীয় বারের অভিনয়ে নির্দিষ্ট আসন-সংখ্যা ছিল দুই-শত।

প্রথম অভিনয়ে আসনের মূল্য ছিল—Boxes and Pit Sa. Rs. 8.
Gallery ,, 4.

কিন্তু দ্বিতীয় অভিনয়ে প্রবেশমূল্য রূপে নির্দিষ্ট ছিল সোনার একটি মোহর। বলা বাহুল্য, লেবেডেফ-এর প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

লেবেডেফ স্বদেশে চলিয়া যাইবার পর তাঁহার নাট্যশালার দ্বার রুদ্ধ হয়। ইহার পর বাংলা রঙ্গমঞ্চ বা বাঙ্গালীর প্রয়াসে স্থাপিত রঙ্গমঞ্চের সন্ধান মিলে প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে। এই দীর্ঘদিনে বিভিন্ন দিক হইতে বাংলার সমাজ-জীবনে নানা পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। তাহার প্রথম চেতনা উন্মেষিত হয় ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম কেরী কর্তৃক ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠায়, আর নবজাগরণ দেখা দেয় ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ স্থাপনে। এই সমকালের মধ্যেই ইউরোপীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে সৃষ্টি হয় বাংলা গদ্যসাহিত্য—ইহার প্রধান বাহন ছিল তখনকার বাংলা সাময়িক পত্রিকাগুলি। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় আমাদের দেশে রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের জন্য একটি অনুরোধমূলক প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। প্রস্তাবে বলা হয়—'....ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যাহাতে একত্র হইয়া ইংরেজদের মত শেয়ার গ্রহণ করিয়া একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহাতে একজন কর্মাধ্যক্ষের অধীনে বেতনভোগী যোগ্য ব্যক্তি নিযুক্ত করিয়া এতদর্থে বিরচিত গীতি ও কাব্যের মাসে একবার নূতন অভিনয় করেন, তাহা নিতান্তই বাঞ্ছনীয়। এইরূপে শ্রেণীনির্বিশেষে সমাজভুক্ত সকলেরই আনন্দবৃদ্ধি হইবে।' 'সমাচার চন্দ্রিকা'র আবেদন ব্যর্থ হয় নাই। ইহার কিছুদিনের মধ্যেই কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে আমরা সৌখীন রঙ্গমঞ্চ দেখিতে পাইলাম।

বাঙ্গালীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রথম রঙ্গমঞ্চ হইল প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'হিন্দু থিয়েটার'। ইহার কার্যনির্বাহক সমিতিতে ছিলেন—প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত, গঙ্গানারায়ণ সেন, মাধবচন্দ্র মল্লিক, হরচন্দ্র ঘোষ এবং তারাচাঁদ চক্রবর্তী। রঙ্গমঞ্চটি বিদেশী থিয়েটারের আদর্শে ইংরেজী নাটকের অভিনয়ের জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়। সেক্সপীয়রের 'জুলিয়াস সিজর'-এর অংশবিশেষ এবং উইলসন্ কর্তৃক অনূদিত ভবভূতির 'উত্তর-রামচরিত'এর অভিনয়ের মাধ্যমে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর হিন্দু থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। তখনকার দিনের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি অভিনয়ের দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন। কয়েক মাস পরে এখানে *Nothing Superfluous* নামে একখানা প্রহসন অভিনীত হয়।

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ান হেরাসিম লেবেডেফ ইংরেজী নাটকের বাংলা অনুবাদ করিয়া বাঙ্গালীর শিল্পরীতিতে সজ্জিত রঙ্গমঞ্চে দেশীয় নটনটীর দ্বারা তাহার অভিনয় করান। আর তাহার চল্লিশ বৎসর পরে বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দু থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হয় বিদেশী রঙ্গমঞ্চের আদর্শে এবং নাট্যাভিনয়ও হয় বিদেশী ভাষায়।

শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চে বাঙ্গালীর উদ্যোগে বাংলা নাটক প্রথম অভিনীত হয়। নবীনচন্দ্র বসু নিজবাটীতে প্রতিষ্ঠিত এই রঙ্গমঞ্চে (বর্তমান শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর স্থান) বৎসরে চার-পাঁচটি করিয়া নাটক অভিনীত হইত। রঙ্গমঞ্চটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে অক্টোবর এখানে 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনীত হয়। এখানে নারীভূমিকায় স্ত্রীলোকেরাই অবতীর্ণ হইতেন। 'বিদ্যাসুন্দর' পালায় অবতীর্ণ নটনটীরা ছিলেন —

সুন্দর	....	শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
বিদ্যা	....	রাধামণি বা মণি
রাণী } মালিনী }	...	জয়দুর্গা
বিদ্যার সখী	....	রাজকুমারী বা রাজু

বাংলা রঙ্গমঞ্চে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পরিচয়ও সর্বপ্রথম এই 'বিদ্যাসুন্দর পালা'তেই পাওয়া যায়।

বাংলা রঙ্গমঞ্চের গঠনপর্বে স্কুল কলেজে প্রতিষ্ঠিত সৌখীন রঙ্গমঞ্চেরও কিছু দান আছে। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় নাটক ও নাট্যাভিনয় সম্পর্কে উৎসাহিত হইয়া উঠায় নাট্যকলা ও অভিনয়-কৌশলের প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ বাড়িয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, নবীনচন্দ্র বসুর রঙ্গমঞ্চের আসর ভাঙ্গিয়া যাইবার পর এই সমস্ত স্কুল কলেজের রঙ্গমঞ্চেই বাঙ্গালীর অভিনয় স্পৃহা চরিতার্থ হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, এই সব রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইত ইংরেজী নাটক এবং ভাষার মাধ্যমও ছিল ইংরেজী। এই শ্রেণীর রঙ্গমঞ্চের মধ্যে ডেভিড হেয়ার স্কুলের রঙ্গমঞ্চ (প্রথম অভিনীত নাটক 'মার্চেণ্ট অব ভেনিস'—১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৩) এবং 'ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার' (প্রথম অভিনীত নাটক 'ওথেলো'—২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮৫৩) উল্লেখযোগ্য। উভয় রঙ্গমঞ্চেরই অভিনয় কৌশলের শিক্ষক ছিলেন কলিকাতা মাদ্রাসার ইংরেজী বিভাগের অধ্যক্ষ মিঃ ক্লিঙ্গার। 'এলিস' নাম্নী একজন ইংরেজ মহিলাও ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারের নাট্যাভিনয়ের শিক্ষিকা ছিলেন। ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চ মোটামুটি স্থায়ী ছিল এবং অভিনয়ও দীর্ঘদিন চলিয়াছিল।

ইহার পর আমরা যে রঙ্গমঞ্চের সন্ধান পাই, তাহা হইল শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র প্যারীমোহন বসুর 'জোড়াসাঁকো থিয়েটার'। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মে এখানে সেক্সপীয়রের 'জুলিয়স সীজর' অভিনীত হয়। জনসাধারণের জন্য প্রবেশমূল্যের বিনিময়ে 'প্রবেশপত্রে'র ব্যবস্থা ছিল লেবেডেফ-এর পরে এখানেই প্রথম প্রবেশমূল্যের উল্লেখ পাওয়া গেল।

বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে ঐতিহাসিক কালানুক্রম পাওয়া যায় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে। এই বৎসর আশুতোষ দেব (সাতু বাবু)-র বাড়ীতে একটি রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয়। ইহার উদ্যোক্তা ছিলেন আশুতোষ দেবের বাড়ীতে স্থাপিত 'জ্ঞান-প্রদায়িনী সভা'র সভ্যবৃন্দ; বিশেষভাবে আশুতোষ বাবুর দৌহিত্ররা। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী সরস্বতী পূজা উপলক্ষে নন্দকুমার রায়ের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নাটকের অভিনয়ের দ্বারা এই রঙ্গমঞ্চের শুভ উদ্বোধন হয়। এখানে আরও কয়েকবার অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায়। সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা এই রঙ্গমঞ্চের নাট্যাভিনয় প্রয়াসকে অভিনন্দন জানান।

বাংলা রঙ্গমঞ্চে প্রথম সামাজিক নাটক 'কুলীন-কুলসর্বস্ব' বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। নূতন বাজারে রামজয় বসাকের বাড়ীতে এই নাটকের প্রথম ও

দ্বিতীয় অভিনয়ে (১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চের প্রথম সপ্তাহ) কলিকাতায় এক বিশেষ উত্তেজনা ও উৎসাহ দেখা দেয়। বড়বাজারের গদাধর শেঠের বাড়ীতে এই নাটকের অভিনয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কিশোরীমোহন মিত্র প্রমুখ ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। চুঁচুড়াতেও নরোত্তম পালের বাড়ীতে নাটকখানি অভিনীত হয়। প্রসিদ্ধ গায়ক ও গাথক রূপচাঁদ পক্ষী এ নাটকের গানের শিক্ষক ছিলেন। নাটকের নটীর গান হাটেবাজারে গীত হইতে লাগিল —'অধিনীরে গুণমণি পড়েছে কি মনে হে?' এ অভিনয়ের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন প্রবোধচন্দ্র মণ্ডল। তাঁহারই আগ্রহে নিয়মিত নাট্যাভিনয়ের জন্য একটি স্থায়ী সভা গঠিত হয়। নিম্নরূপভাবে তাহার দপ্তর বণ্টন করা হইয়াছিল—

কর্মাধ্যক্ষ	..	ব্রজনাথ চন্দ্র
সভাপতি	....	ভগবতীচরণ লাহা
রঙ্গভূমির ব্যবস্থাপক	...	রামচন্দ্র দিচ্ছিত
সহকারী ব্যবস্থাপক	.	প্রবোধচন্দ্র মণ্ডল
কোষাধ্যক্ষ	...	নিমাইচরণ শীল

রঙ্গমঞ্চের পরিচালক সমিতির এমন পূর্ণাঙ্গ পরিচয় ইতিপূর্বে আর পাওয়া যায় নাই।

কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রতিষ্ঠিত 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' সংশ্লিষ্ট বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল রামনারায়ণ তর্করত্ন কর্তৃক অনূদিত ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার' নাটকের অভিনয় দ্বারা এই রঙ্গমঞ্চের উদ্বোধন হয়। সুপ্রীম কোর্টের তদানীন্তন বিচারপতি স্যার আরথর বুলার, ভারত সরকারের প্রধান সেক্রেটারী সিসিল বিডন প্রমুখ ব্যক্তিগণ এই অভিনয়ে দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন। অভিনয়ে কালীপ্রসন্ন সিংহও একটি অংশ গ্রহণ করেন। এই রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটকের মধ্যে কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক অনূদিত কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী' উল্লেখযোগ্য। 'হিন্দু পেটরিয়ট' পত্রিকা বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চের উচ্চ প্রশংসা করিয়া এদিকে শিক্ষিত জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বাদ্যগীতাদির সহযোগে ৫ই জুন কালীপ্রসন্নের মৌলিক রচনা 'সাবিত্রী সত্যবান নাটক'-এর 'অভিনয়িক পাঠ' হয়। রঙ্গমঞ্চে অভিনয়িক পাঠ এই প্রথম। রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও ঋতুনাট্যকে অবলম্বন করিয়া এই অভিনয়িক পাঠ বর্তমানে জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

এই পর্বের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রঙ্গমঞ্চ ছিল পাইকপাড়ার রাজভ্রাতৃদ্বয়ের —প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের—বেলগাছিয়াস্থ বাগানবাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত 'বেলগাছিয়া নাট্যশালা'। এই রঙ্গমঞ্চের প্রথম অভিনয়ে কলিকাতার অভিজাত মহলে সাড়া পড়িয়া যায়। শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' অবলম্বনে লিখিত রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী'র অভিনয়ের দ্বারা এই অভিজাত রঙ্গমঞ্চের শুভ উদ্বোধন হয় (৩১শে জুলাই, ১৮৫৮)। রঙ্গমঞ্চের সাজসজ্জা, দৃশ্যপট প্রভৃতিতে সংস্কৃত রুচি ও শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু রত্নাবলীর অভিনয়ের জন্যই রাজভ্রাতৃদ্বয় দশ হাজার টাকা ব্যয় করেন। এখানকার অভিনেতারা সকলেই ছিলেন সে যুগের ইংরেজী-শিক্ষিত বঙ্গ যুবক। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ই ছিলেন সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অভিনেতা। 'রত্নাবলী'তে বিদূষকের ভূমিকায় জীবন্ত ও বাস্তব অভিনয়ের জন্য তিনি সর্বজনের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেন এবং বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের 'গ্যারিক' নামে খ্যাত হন। রাজা ঈশ্বরচন্দ্রও একটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এই রঙ্গমঞ্চেই ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও যদুনাথ পালের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম দেশীয় ঐকতান বাদনের দল গঠিত হয়। 'রত্নাবলী'র অভিনয়ে দর্শকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলার তদানীন্তন লেফটেনেণ্ট গবর্ণর স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামনারায়ণ তর্করত্ন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিগণ।

বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে 'রত্নাবলী' ছয়-সাতবার অভিনীত হয়। দর্শক হিসাবে অনেক ইংরেজ নিমন্ত্রিত হওয়ায় রাজারা তাঁহাদের সুবিধার্থে ইংরেজীতে অনূদিত 'রত্নাবলী' পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ এই অনুবাদের দায়িত্ব লইয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা নাট্যসাহিত্যের দৈন্যের সঙ্গে পরিচিত হন এবং বাংলা নাটক রচনায় প্রেরণা লাভ করেন। এই রঙ্গমঞ্চের দ্বিতীয় অর্ঘ্যই মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা'। 'শর্মিষ্ঠা'র অভিনয় যে কতখানি জনপ্রিয় হইয়াছিল ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের এক সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে তাহার ষষ্ঠ অভিনয়েই তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। 'শর্মিষ্ঠা'র পরে এই রঙ্গমঞ্চে আর কোন নাটক অভিনীত হয় নাই। কারণ, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের অকালমৃত্যুতে এই রঙ্গমঞ্চের দ্বার রুদ্ধ হয়। বিপুল শক্তি ও ঐশ্বর্যসমন্বিত এই রঙ্গমঞ্চে যে বিরাট সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল, তাঁহার আকস্মিক অপমৃত্যুতে তাহা লুপ্ত হইয়া গেল। তবুও বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে স্বল্পস্থায়ী বেলগাছিয়া নাট্যশালার যে যুগান্তকারী দান রহিয়াছে, তাহা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

সামাজিক কুপ্রথাকে নাটকের মাধ্যমে প্রকাশ করিয়া রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন-কুলসর্বস্ব নাটক' আমাদের সমাজ ও সাহিত্যজীবনে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহার দ্বিতীয় প্রবাহ হইল উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ নাটক' (১৮৫৬)। এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহ আইন সিদ্ধ করিবার জন্য আন্দোলন করিতেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই বিধবা বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হইল। তখন এই নূতন বিষয়ে নাটক রচনার হিড়িক পড়িয়া গেল। কেশবচন্দ্র সেন সদলবলে মহাউৎসাহে 'মেট্রোপলিটন থিয়েটার'-এ (মেট্রোপলিটন কলেজ গৃহে) উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ নাটক'-এর অভিনয় করেন (২৩শে এপ্রিল, ১৮৫৯)। রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপটাদি ছিল মিঃ হলবাইন্ (Halbein) কর্তৃক অঙ্কিত। অভিনীত নাটকের সংগীত-রচয়িতা ও সুরকার ছিলেন যথাক্রমে দ্বারকানাথ রায় এবং রাধিকা প্রসাদ দত্ত। রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষ ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। নাটকটি এখানেই একাধিকবার অভিনীত হয়। বলা বাহুল্য, কলিকাতায় এই নাট্যাভিনয় প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল।

পাথুরিয়াঘাটার 'বঙ্গনাট্যালয়' এই যুগের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য রঙ্গমঞ্চ। রঙ্গমঞ্চটি মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কর্তৃক ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার নিজ-বাটীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর গোষ্ঠীর আদি বাটীতেও একটি রঙ্গমঞ্চ ছিল। সেখানে ১৮৫৯ ও ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটক অভিনীত হয়। তখন ইহার উদ্যোক্তা ছিলেন যতীন্দ্রমোহনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শৌরীন্দ্রমোহন। যতীন্দ্রমোহন প্রতিষ্ঠিত নবরঙ্গমঞ্চের উদ্বোধনী অভিনয় হয় ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে (পরিমার্জিত 'বিদ্যাসুন্দর' পালা অবলম্বনে)। পরের মাসেই পালাটির দ্বিতীয় অভিনয় হয়। উভয় অভিনয় দর্শনে প্রীত হইয়া রেওয়ার মহারাজা অভিনেতাদিগকে তিন হাজার টাকা এবং প্রত্যেক অভিনেতাকে একখানি করিয়া কাশ্মীরী শাল উপহার দেন। কিন্তু অভিনেতারা সকলেই ছিলেন শিক্ষিত এবং উচ্চবংশসম্ভূত, তাঁহারা এই 'দান' গ্রহণ করেন নাই। পাথুরিয়াঘাটার বঙ্গনাট্যালয়ে 'বিদ্যাসুন্দর' এবং 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' আট-নয় বার অভিনীত হয়। এখানে ইহার কিছুকাল পরে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'মালতী-মাধব' নাটক অভিনীত হয় (১০ই জানুয়ারী, ১৮৬৯)। রামনারায়ণ উল্লেখ করিয়াছেন যে, 'মালতী-মাধব' তথায় দশ-বার বার অভিনীত হইয়াছিল। বঙ্গনাট্যালয়ে পরবর্তী অভিনয়গুলির মধ্যে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারী 'রুক্মিণীহরণ' নাটক ও 'উভয় সঙ্কট' প্রহসনের অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

রাজপ্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুক পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়ীতে আগমন করিলে তাঁহার সম্মানার্থে এই অভিনয়ের আয়োজন করা হয়। লর্ড নর্থব্রুকের সঙ্গে বহু সম্ভ্রান্ত মহিলা ও পুরুষের আগমন হওয়ায় তাঁহাদের সুবিধার্থে অভিনীত পালা দুইটির ইংরেজী চুম্বক দেওয়া হইয়াছিল। এই রঙ্গমঞ্চের অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন ঘনশ্যাম বসু।

রাজা দেবীকৃষ্ণ বাহাদুরের ভবনে স্থাপিত 'শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি' এ যুগের উল্লেখযোগ্য রঙ্গমঞ্চ। এখানে প্রথম অভিনীত হয় মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসন (১৮ই জুলাই, ১৮৬৫, অতঃপর এখানে মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক মঞ্চস্থ হয়। কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রথম কিছুদিন ইহার কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি ছিলেন।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর রঙ্গমঞ্চ এই সৌখীন রঙ্গমঞ্চপর্বের একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। ইহার উদ্যোক্তা ছিলেন সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। এখানে প্রথমে 'কৃষ্ণকুমারী' এবং তাহার কিছুদিন পরে 'একেই কি বলে সভ্যতা' অভিনীত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অভিনয়দ্বয়ে যথাক্রমে কৃষ্ণকুমারীর মাতা এবং সার্জেন্টের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে একই নাটকের একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি জোড়াসাঁকো থিয়েটার পরিচালকদের মনঃপূত ছিল না। অভিনয়োপযোগী এবং লোকশিক্ষার সহায়ক বাংলা নাটকের একান্ত অভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা উপযুক্ত বিষয়ে নাটক রচনার জন্য জনসাধারণকে আহ্বান জানান। 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারী'র প্রধান শিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী বিষয়রূপে নির্বাচন করিলেন 'বহুবিবাহ'। উপযুক্ত পুরস্কারের (দুইশত টাকা) বিনিময়ে এই বিষয়ে নাটক লিখিবার জন্য 'ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ'-এ বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। কিছুদিন পরে সে বিজ্ঞাপন প্রত্যাহৃত হয় এবং নাটক রচনার ভার গ্রহণ করেন রামনারায়ণ তর্করত্ন। তখন রঙ্গমঞ্চের পরিচালক সমিতি 'হিন্দু মহিলাদের দুরবস্থা' ও 'পল্লীগ্রামস্থ জমিদারদের অত্যাচার'—এই দুইটি বিষয়ে নাটক রচনার আমন্ত্রণ জানাইয়া 'ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্রে বিজ্ঞাপন দেন। পুরস্কার ঘোষিত হয় যথাক্রমে দুইশত টাকা ও একশত টাকা। রামনারায়ণ রচিত বহুবিবাহ বিষয়ক 'নবনাটক'-এর বিচারক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বলা বাহুল্য, বিচারে নাটকটি উত্তীর্ণ হইয়াছিল। রামনারায়ণকে পুরস্কৃত করিবার জন্য ১

খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মে অপরাহ্ণ তিন ঘটিকায় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে এক প্রকাশ্য সভা আহূত হয়। প্যারীচাঁদ মিত্র এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভাপতির মাধ্যমে জোড়াসাঁকো থিয়েটার পূর্বপ্রতিশ্রুত পুরস্কার স্বরূপ একটি রৌপ্যপাত্রে রক্ষিত দুইশত টাকা রামনারায়ণকে উপহার দেন।

নূতন বিষয়ে নাটক রচনায় উৎসাহ দান করা জোড়াসাঁকো রঙ্গমঞ্চের সর্বপ্রধান কীর্তি। নূতন নাটক রচনার আমন্ত্রণ জানাইয়া পুরস্কার ঘোষণা এবং কৃতী নাট্যকারকে প্রকাশ্য সভায় পুরস্কৃত করিয়া সেদিন জোড়াসাঁকো থিয়েটার বাংলা নাটকের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সূচিত করেন। ইহারই ফলে রামনারায়ণের 'নবনাটক' এবং সোমড়া-নিবাসী বিপিনমোহন সেনগুপ্তের হিন্দুমহিলাদের দুরবস্থাবিষয়ক 'হিন্দুমহিলা নাটক' লিখিত হয়। ঠাকুরবাড়ীর রঙ্গমঞ্চে 'নবনাটক' পরপর আট-নয়বার অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয় হইয়াছিল ৫ই জানুয়ারী, ১৮৬৭। সুদৃশ্য, স্বাভাবিক মঞ্চসজ্জা এবং কৃতিত্বপূর্ণ অভিনয় দর্শকবৃন্দের ও সমসাময়িক পত্রিকার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। জোড়াসাঁকো থিয়েটারে 'হিন্দুমহিলা নাটক'-এর অভিনয় সৌভাগ্য ঘটে নাই। কারণ, নাটকটির বিজ্ঞাপন হইতে জানা যায় যে, ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দেই এই রঙ্গমঞ্চের দ্বার রুদ্ধ হয়।

এই যুগের আরও একটি উল্লেখযোগ্য রঙ্গমঞ্চ হইল বহুবাজারের 'বঙ্গনাট্যালয়'। বলদেব ধর ও চুনিলাল বসুর উদ্যোগে এই নাট্যালয় স্থাপিত হয়। রঙ্গমঞ্চটি প্রথমে বিশ্বনাথ মতিলালের গলিতে গোবিন্দচন্দ্র সরকারের বাড়ীতে অবস্থিত ছিল। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে মনোমোহন বসুর 'রামাভিষেক' নাটকের অভিনয় দ্বারা রঙ্গমঞ্চটির উদ্বোধন হয়। পাঁচ বৎসর পরে স্থানীয় লোকেদের চেষ্টায় ২৫ নং বিশ্বনাথ মতিলাল লেনে 'বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়' নামে নাট্যসমাজের নূতন নাট্যমন্দির নির্মিত হয়। এলাহাবাদের নীলকমল মিত্র ও অন্যান্য কয়েকজন ইহার স্বত্বাধিকারী এবং প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রঙ্গমঞ্চটির সম্পাদক ছিলেন। এই নবনির্মিত রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনীত হয় মনোমোহন বসুর 'সতী' নাটক (১৭ই জানুয়ারী, ১৮৭৪)। প্রতি শনিবার 'সতী' নাটকের অভিনয় হইত। 'সতী' নাটকের পরে মনোমোহন বসুরই 'হরিশ্চন্দ্র' এখানে অভিনীত হইয়াছিল।

সর্বশেষে উল্লিখিত হইলেও বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রঙ্গমঞ্চ ছিল 'বাগবাজার এমেচার থিয়েটার'। গুরুত্বপূর্ণ এইজন্য যে, ইহাদেরই প্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চ পরে প্রথম সাধারণ রঙ্গমঞ্চে পরিণত হয় (১৮৭২) এবং এই

দলের সৌখীন অভিনেতারাই পরবর্তী কালের সাধারণ রঙ্গমঞ্চে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা-রূপে সম্মানিত হইয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কলিকাতায় যখন নিত্যনূতন রঙ্গমঞ্চ দেখা যাইতে লাগিল, তখন বাগবাজারের কয়েকজন যুবকের মনেও নাট্যাভিনয়ের ইচ্ছা জাগিল। এই দলের নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাধামাধব কর ও অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দলের নাম রূপান্তরিত হইয়া হইল 'শ্যামবাজার নাট্যসমাজ'। এই সম্প্রদায় কর্তৃক প্রথমে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের সপ্তমীপূজার রাত্রে প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়ীতে দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' অভিনীত হয়। স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ না থাকায় বিভিন্নস্থানে 'সধবার একাদশী' এই সম্প্রদায় কর্তৃক সাতবার অভিনীত হয়। 'সধবার একাদশী'র পরে ইঁহারা দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী' নাটকের মহলা সুরু করেন। ইতিমধ্যে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে চুঁচুড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র ও সাধারণী সভার অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রমুখ কৃতবিদ্যদের প্রচেষ্টায় মহাধুমধামে 'লীলাবতী' মঞ্চস্থ হয় এবং 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় (৪ঠা এপ্রিল, ১৮৭২) অভিনয়ের প্রশংসাসূচক সমালোচনা প্রকাশিত হয়। তাহাদের এই প্রয়াস এবং প্রাপ্ত প্রশংসায় শ্যামবাজার নাট্যসমাজ 'লীলাবতী'র অভিনয়ের জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন। আয়োজন-উদ্যোগ সমাপ্ত হইলে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মে শ্যামবাজারের রাজেন্দ্রনাথ পালের বহির্বাটীতে স্থাপিত রঙ্গমঞ্চে 'লীলাবতী'র প্রথম অভিনয় হয়। রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপটগুলি ধর্মদাস সুরের তুলিতে সজীব হইয়া উঠিয়াছিল। একই রঙ্গমঞ্চে পরপর তিনটি শনিবার 'লীলাবতী'র অভিনয় বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। সমসাময়িক পত্রিকাগুলি 'লীলাবতী' নাট্যাভি-নয়ের এবং ইহার উদ্যোক্তাগণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। স্বয়ং নাট্যকারও 'লীলাবতী' নাট্যাভিনয়ের কৃতকার্যতায় মুগ্ধ ও উৎসাহিত হইয়াছিলেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে মে তারিখের 'এডুকেশন গেজেট'-এ প্রকাশিত এক পত্রে এই নাট্যাভিনয় সম্পর্কে আলোচনান্তে জনৈক পত্রলেখক মন্তব্য করেন, 'আমার বোধহয় এই নাটকাভিনেতৃগণ মনোযোগ করিলে এমন একটি দেশীয় নাট্যশালা স্থাপন করিতে পারেন, যেখানে লোকে ইচ্ছা করিলে টিকিট ক্রয় করিয়া যাইতে পারেন এবং দেশেরও অনেকটা সামাজিকতার পরিচয় হয়।'

॥ দুই ॥

এ পর্যন্ত আমরা যে সমস্ত রঙ্গমঞ্চের উল্লেখ করিয়াছি, লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, তাহার প্রত্যেকটিই ছিল সৌখীন সম্প্রদায়ের ক্ষণিক বিলাসের সামগ্রী মাত্র। রঙ্গমঞ্চকে নাচগানের আসর এবং নাট্যাভিনয়কে সৌখীন নেশা ভিন্ন ইহাকে অন্যরকম গুরুত্ব বিশেষ কেউ-ই দেন নাই। লেবেডেফ ব্যবসায়ের খাতিরেই একাজে নামিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্র বসুর রঙ্গমঞ্চ হইতে সুরু করিয়া শ্যামবাজার নাট্যসমাজ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৮৩৩ হইতে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা রঙ্গমঞ্চ রাজা, মহারাজা বা কোন ধনী লোকের পৃষ্ঠপোষকতায় ও অর্থে পুষ্ট এবং যুবসম্প্রদায়ের উদ্দীপনায় ক্রমাগ্রসর হইয়াছে। নাট্যাভিনয়ের প্রতি লোকের ঝোঁক এবং অভিনয় দর্শনের প্রতি জনরুচি ক্রমে ক্রমে গঠিত হইলেও এ সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দশ-বারোটি রঙ্গমঞ্চের একটিও স্থায়ী হইতে পারে নাই। ইহার মূলেই রহিয়াছে রঙ্গমঞ্চ এবং নাট্যাভিনয়ের প্রতি শিক্ষিত ও ধনী সম্প্রদায়ের সৌখীন অনুগ্রহদৃষ্টি, তাহা আকাশের মেঘের মতই কখন কখন কৃপা-বর্ষণ করিত। দ্বিতীয়তঃ নাট্যাভিনয়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ইহাকেই জীবনের নেশা ও পেশা রূপে তখনও কেহই গ্রহণ করেন নাই। অবশ্য সে সুযোগও তখন ছিল না। কিন্তু দর্শকের অভাবে নাট্যাভিনয় 'জমে' নাই এমন কথা কেহই বলিতে পারিবেন না। বরঞ্চ সমসাময়িক সংবাদপত্রে দেখি যে, প্রবেশপত্র নিঃশেষিত হওয়ায় বা স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় শত শত দর্শক ফিরিয়া গিয়াছেন। সুতরাং জাতিধর্মশ্রেণী-নির্বিশেষে সকলেই প্রবেশমূল্যের বিনিময়ে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করিয়া নাট্যাভিনয় উপভোগ করিতে পারে এমন একটি সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হউক—সমসাময়িক পত্র-পত্রিকার সম্পাদকগণ ও পত্রলেখকগণ একাধিকবার এ প্রস্তাব জানাইয়াছেন। কিন্তু সৌখীন রঙ্গমঞ্চের যুগে সে সুযোগ আমাদের সত্যই ছিল না। তৎসত্ত্বেও এই সৌখীন নাট্য সম্প্রদায় পরম্পরায় এখন একটি সুনির্দিষ্ট পথরেখার সন্ধান আমরা পাই, যে-পথে অনুপ্রাণিত ও অগ্রসর হইয়া এক সম্প্রদায় সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সেইজন্য বাংলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চের ভিত্তিস্থাপন পর্বে এই সৌখীন রঙ্গমঞ্চের দানকে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি জানাইতেই হইবে।

বাংলা নাটকের ইতিহাসেও এই সৌখীন নাট্যসম্প্রদায় ও রঙ্গমঞ্চের

গুরুত্বপূর্ণ দান রহিয়াছে। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, বেলগাছিয়া নাট্যশালা-মাধ্যমেই নাট্যকার মধুসূদনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় স্থাপিত হইয়াছে। রামনারায়ণ তর্করত্নও নাটক রচনার জন্য বহুবার সেখানে পুরস্কৃত হইয়াছেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর রঙ্গমঞ্চও নির্ধারিত বিষয়ে নাটক রচনার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়া এবং কৃতী নাট্যকারকে প্রকাশ্য সভায় পুরস্কৃত করিয়া নাট্যরচনায় শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন। দীনবন্ধু মিত্রের নাটক ও প্রহসনগুলি বহুবার অভিনীত হওয়ায় তিনিও নাটক রচনায় প্রেরণা লাভ করেন। পরবর্তী যুগে দেখি যে, রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনেই গিরিশচন্দ্র প্রমুখ অনেকেই নাটক রচনায় বাধ্য হইয়াছিলেন। একেবারে আধুনিক পর্বেও দেখি যে, এক একটি রঙ্গমঞ্চের জন্য এক একজন নাট্যকার নিযুক্ত আছেন ; তাঁহারা নূতন নাটক রচনা করেন, অথবা কোন উপন্যাস বা গল্পকে নাট্যরূপ দান করেন। নাটক ও রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস পরস্পরের পূরক, একের উন্নতিতে অপরের অগ্রগমন অবশ্যম্ভাবী।

বাগবাজারের সৌখীন সম্প্রদায়ের (শ্যামবাজার নাট্যসমাজের) 'লীলাবতী' নাট্যাভিনয় যে অভূতপূর্ব জনপ্রিয় হইয়াছিল, পূর্ববর্তী আলোচনায় তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহাদেরই কয়েকজনের উৎসাহ ও সম্মতিক্রমে একটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রবেশমূল্যের বিনিময়ে জনসাধারণকে অভিনয় প্রদর্শন করা ঠিক হয়। রঙ্গমঞ্চের নাম স্বরূপ 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম প্রস্তাবিত হইল। গিরিশচন্দ্র ব্যতীত অন্য সকলে প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। সাধারণ একটি নাট্যশালাকে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' রূপে গ্রহণ করিলে বাঙ্গালীর মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করা হইবে বলিয়া গিরিশচন্দ্র দল ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। এদিকে তখন নব-উদ্যমে 'নীল-দর্পণে'র মহলা সুরু হইল। চিৎপুরে 'ঘড়িওয়ালা বাড়ী' নামে খ্যাত মধুসূদন সান্যালের বহির্বাটী মাসিক চল্লিশ টাকা ভাড়ায় লইয়া তথায় রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হইল। রঙ্গমঞ্চের সম্পাদক ও মঞ্চাধ্যক্ষ ছিলেন যথাক্রমে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ধর্মদাস সুর। প্রবেশমূল্য রূপে ধার্য হইল এক টাকা ও আট আনা। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর 'নীলদর্পণে'র অভিনয়ের দ্বারা 'ন্যাশনাল থিয়েটারে'র দ্বার উন্মোচন হয়। সমসাময়িক একাধিক পত্রিকা 'ন্যাশনাল থিয়েটারে'র উদ্যমকে প্রশংসা করিয়া ইহার স্থায়িত্ব কামনা করে।

'নীলদর্পণ' নাটকের প্রথম ও দ্বিতীয় অভিনয়ের মধ্যে এখানে দীনবন্ধুর 'জামাই বারিক' অভিনীত হয়। এই অভিনয়ে আড়াই শত টাকার টিকিট

বিক্রয় হইয়াছিল। পরে এখানে 'সধবার একাদশী', 'নবীন তপস্বিনী' এবং 'লীলাবতী' পুনরভিনীত হয়। এতদিন পর্যন্ত এই রঙ্গমঞ্চে একমাত্র শনিবারে অভিনয় হইত। 'লীলাবতী'র পুনরভিনয়ের পর হইতে বুধবারেও অভিনয় হইতে লাগিল। দীনবন্ধুর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' ও কয়েকটি ব্যঙ্গচিত্রের (প্যান্টোমাইম্) অভিনয় দ্বারা বুধবারের অভিনয় সুরু হয় (১৫ই জানুয়ারী, ১৮৭৩)। এই অভিনয়ে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী কৃতিত্বপূর্ণ অভিনয় করেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত যখন রঙ্গমঞ্চটি সবেমাত্র জমিয়া উঠিতেছিল, তখনই ইহাতে ফাটল ধরিল। সম্পাদক ও হিসাবরক্ষকের মধ্যে মতভেদই ইহার মূল কারণ। নবগোপাল মিত্র প্রমুখদের লইয়া গঠিত এক কমিটি এই বিবাদ মিটাইবার ভার গ্রহণ করেন। খুব সম্ভব তাঁহাদেরই চেষ্টায় বিবাদ মিটিয়া গেল। এই সময় গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শিশিরকুমার ঘোষ ও দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এর ডিরেক্টর নিযুক্ত হন এবং ন্যাশনাল থিয়েটারের অফিস রসিক নিয়োগীর ঘাট হইতে বাগবাজারে (১১নং আনন্দ চ্যাটার্জী স্ট্রীটে) স্থানান্তরিত হয়। অতঃপর এই রঙ্গমঞ্চে 'নবনাটক' এবং পুনরায় 'নীল-দর্পণে'র অভিনয়ের পরে শিশিরকুমার ঘোষের 'নয়শো রুপেয়া' অভিনীত হয় (৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৩)। পরবর্তী ১৫ই ফেব্রুয়ারী এখানে 'জামাই বারিক'-এর অভিনয়ের পরে কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত একটি মাত্র দৃশ্যে 'ভারতমাতা' নামে একটি দেশাত্মবোধক রূপকনাট্য প্রদর্শিত হয়। 'ন্যাশনাল থিয়েটার' এই সময় অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল।

২২শে ফেব্রুয়ারী (১৮৭৩) ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে ভীমসিংহের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন স্বয়ং গিরিশচন্দ্র। এতদিন পরে গিরিশচন্দ্র আবার নিজেদের দলে যোগ দিলেন। কিছুদিন পরে এখানে 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' এবং 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' অভিনীত হইবার পর কিছুদিনের জন্য রঙ্গমঞ্চের দ্বার রুদ্ধ হইল।

ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এ দলাদলি দেখা দিয়াছে। স্বার্থপরতা চিরদিনই ঘর ভাঙ্গে, সমাজ ভাঙ্গে, সঙ্ঘ ভাঙ্গে। ন্যাশনাল থিয়েটারও দ্বিধাবিভক্ত হইল। গিরিশচন্দ্রের দল (গিরিশচন্দ্র, ধর্মদাস সুর, মহেন্দ্রলাল সুর, মতিলাল সুর, তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি) কিছুদিন পরে রাজা রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামে মঞ্চস্থাপন করিয়া অভিনয় করা মনস্থ করেন। অপর দলও (অর্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল বসু,

নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি) মঞ্চসজ্জার দৃশ্যাদি না পাইয়া লিণ্ডসে স্ট্রীটে 'অপেরা হাউজ' ভাড়া করিয়া অভিনয় করার সিদ্ধান্ত করেন। এই দলের নূতন নামকরণ হয় "হিন্দু (পরে গ্রেট) ন্যাশনাল থিয়েটার"।

'অপেরা হাউজ'-এ 'হিন্দু ন্যাশন্যাল থিয়েটার'-এর প্রথম অভিনয় হয় ৫ই এপ্রিল, ১৮৭৩। অভিনীত হইয়াছিল কয়েকটি গীতিনাট্যবহুল হাস্যরসাত্মক ব্যঙ্গনাটিকা এবং মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা'। পরের সপ্তাহে অভিনীত হয় 'বিধবা বিবাহ নাটক'। অতঃপর এ সম্প্রদায় মফঃস্বল পরিক্রমায় (হাওড়া, ঢাকা, রাজসাহী, বহরমপুর প্রভৃতি স্থানে) বাহির হয় এবং বিভিন্নস্থানে বিভিন্ন নাটকের অভিনয় করে।

গিরিশচন্দ্রের নেতৃত্বে নূতন ন্যাশনাল থিয়েটার-এর প্রথম অভিনীত নাটক 'নীলদর্পণ'। নাটকটি অভিনীত হইয়াছিল নেটিভ হাসপাতালের (বর্তমানে মেয়ো হাসপাতাল) সাহায্যকল্পে টাউন হলে (২৯শে মার্চ, ১৮৭৩)। রঙ্গমঞ্চে 'সাহায্য রজনী' অনুষ্ঠান এই প্রথম। ইহার কিছুদিন পরে ন্যাশনাল থিয়েটার শোভাবাজারে রাজা রাধাকান্ত দেবের বাড়ীতে (নাটমন্দিরে) স্থানান্তরিত হয়। এখানে প্রথম অভিনীত হয় 'কৃষ্ণকুমারী' (১২ই এপ্রিল, ১৮৭৩)। অন্যান্য অভিনীত নাটকের মধ্যে 'নীলদর্পণ', 'কিঞ্চিৎ জলযোগ', 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'কপালকুণ্ডলা'র নাম উল্লেখযোগ্য। রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে শেষ অভিনীত নাটক 'কপালকুণ্ডলা'র অভিনয় হইয়াছিল ১০ই মে, ১৮৭৩।

হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটারের দেখাদেখি ন্যাশনাল থিয়েটার সম্প্রদায়ও ঢাকায় অভিনয় দেখাইতে যায়, কিন্তু ইহাদের আসর সেখানে তেমন জমে নাই। ঢাকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া এই দুই দল মিলিতভাবে দুইটি অভিনয় করে। প্রথম অভিনয় হয় দীঘাপতিয়ার রাজকুমার প্রমদানাথ রায়ের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে এবং দ্বিতীয় অভিনয়ের উপলক্ষ ছিল 'মধুসূদনের অপোগণ্ড সন্তানদের সাহায্য করা'। এই দ্বিতীয় অভিনীত নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' মহাসমারোহে 'অপেরা হাউজে' ১৬ই জুলাই (১৮৭৩) অভিনীত হইয়াছিল।

ইহার মাস দুই পরে ন্যাশনাল থিয়েটার আবার মুর্শিদাবাদ, কাশী প্রভৃতি স্থানে অভিনয় প্রদর্শনের জন্য বাহির হয়। এইভাবে ন্যাশনাল থিয়েটারের উভয় দলের মফঃস্বল ভ্রমণের ফলে বিভিন্ন স্থানে রঙ্গমঞ্চ গঠনের ব্যাপক প্রয়াস লক্ষিত হয়।

ন্যাশনাল থিয়েটারের অনুসরণে ইহার পরই কলিকাতায় অপর একটি

সাধারণ রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয়। রঙ্গমঞ্চটির নাম 'ওরিয়েন্টাল থিয়েটার', স্থাপিত হইয়াছিল শ্যামবাজারের কৃষ্ণচন্দ্র দেবের বাড়ীতে (২২নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট)। ১২৭৯ বঙ্গাব্দের ১২ই ফাল্গুন 'মধ্যস্থ' পত্রিকায় এই রঙ্গমঞ্চটির প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাই। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী এখানে রামনারায়ণের 'মালতী-মাধব' নাটক অভিনীত হয়। অন্যান্য অভিনীত নাটকের মধ্যে মদনমোহন মিত্রের 'মনোরমা', 'বিদ্যাসুন্দর' এবং 'চক্ষুদান' উল্লেখযোগ্য।

'বেঙ্গল থিয়েটার' (আগস্ট ১৮৭৩) এ যুগের উল্লেখযোগ্য সাধারণ রঙ্গমঞ্চ। ইহার ম্যানেজার ও অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে শরৎচন্দ্র ঘোষ এবং প্যারীমোহন রায়। বেঙ্গল থিয়েটারের কিছুদিনের মধ্যেই নিজস্ব স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ গঠিত হয়, তাহা এ যুগের অপর কোন সম্প্রদায়ের ছিল না। মধুসূদনের পরামর্শমত এ রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষ নারীভূমিকাগুলি অভিনেত্রীর সাহায্যে অভিনয় করাইয়া একদিকে অভিনয়ের স্বাভাবিকতা, অন্যদিকে মহিলাদিগকে অভিনয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শনের সুযোগ দান করেন। জগত্তারিণী, গোলাপ (সুকুমারী দত্ত), এলোকেশী ও শ্যামা—এই চারজন ছিল বেঙ্গল থিয়েটারের অভিনেত্রী। সমসাময়িক পত্রিকা কিন্তু অভিনেত্রী গ্রহণের জন্য বেঙ্গল থিয়েটারের নিন্দাবাদ করে।

'সাহায্য রজনী' দ্বারাই এ রঙ্গমঞ্চের উদ্বোধন হয়। মধুসূদনের 'সহায়সম্বলহীন সন্তানদের সাহায্যার্থে' ১৬ই আগস্ট, ১৮৭৩ এখানে 'শর্মিষ্ঠা' অভিনীত হয়। পরের সপ্তাহেও এখানে 'শর্মিষ্ঠা' অভিনীত হয়। পরে এখানে একে একে 'মোহন্তের এই কি কাজ', 'স্বপ্নধন', 'বিদ্যাসুন্দর', 'যেমন কর্ম তেমনি ফল', 'মায়াকানন' (এই প্রথম অভিনীত) প্রভৃতি নাটক অভিনীত হয়। বর্ধমান মহারাজার আহ্বানে কালনার রাজবাড়ীতে গিয়া বেঙ্গল থিয়েটার 'দুর্গেশনন্দিনী'র অভিনয় (১২ই ডিসেম্বর, ১৮৭৪) করেন। এই সময় হইতে বর্ধমানের মহারাজা বেঙ্গল থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষক হন। পর বৎসর গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী (হিন্দু পরে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার হইতে বিচ্ছিন্ন এক দল)-র সহিত মিলিতভাবে বেঙ্গল থিয়েটার নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সতী কি কলঙ্কিনী' গীতিনাট্যের অভিনয় করেন। এই মিলিত সম্প্রদায় কর্তৃক পরে 'মেঘনাদবধ কাব্য' অভিনীত হয় (সর্বপ্রথম অভিনীত)। অমিত্রাক্ষর ছন্দোবদ্ধ সংলাপময় মেঘনাদের ভূমিকায় কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশংসনীয় অভিনয় করেন।

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের দেখাদেখি ন্যাশনাল থিয়েটারের দলও 'দি নিউ এরিয়ান থিয়েটার'—এই ছদ্মনামে বেঙ্গল থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চে কিছুদিন অভিনয় করেন। এখানে প্রথমে তাঁহারা 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী'র অভিনয় লইয়া মঞ্চাবতরণ করেন (১৪ই আগস্ট, ১৮৭৫)।

ইতিমধ্যে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে ন্যাশনাল থিয়েটারের উভয় দলই পৃথক পৃথক সাংবাৎসরিক উৎসবের আয়োজন করেন। উৎসবের দিনেও তাঁহারা মিলিত হইতে পারেন নাই। সাংবাৎসরিক উৎসবের পরে ন্যাশনাল থিয়েটার তাহাদের পুরাতন বাড়ীতে (মধুসূদন সান্যালের বাড়ী) রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করিয়া অভিনয় প্রদর্শন সুরু করেন। এখানে প্রথমে অভিনীত হয় 'হেমলতা' (১৩ই ডিসেম্বর, ১৮৭৩)।

এই সময় গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারও পূর্ণোদ্যমে কাজ সুরু করে। ভুবনমোহন নিয়োগীর অর্থে মহেন্দ্র দাসের জমিতে (বর্তমান মিনার্ভা থিয়েটারের স্থানে) গড়ের মাঠে 'লিউইস' থিয়েটারের অনুকরণে রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয়। মঞ্চসজ্জার ভার গ্রহণ করেন ধর্মদাস সুর। মিঃ গ্যারিক 'ড্রপসিন' এবং আরও দুই একটি 'সিন' আঁকিয়া দেন। 'কাম্য কাননে'র অভিনয়ের দ্বারা রঙ্গমঞ্চটির উদ্বোধন হয় (৩১শে ডিসেম্বর, ১৮৭৩)। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আগুন লাগিয়া অভিনয় পণ্ড হইয়া যায়। ইহার পর এখানে 'বিধবা বিবাহ', 'প্রণয় পরীক্ষা', 'কৃষ্ণকুমারী', 'কপালকুণ্ডলা', 'মৃণালিনী' প্রভৃতি নাটক অভিনীত হয়। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার এতদিনে কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমণি, যাদুমণি, হরিদাসী ও রাজকুমারী নামে পাঁচজন অভিনেত্রী গ্রহণ করে। ইহাদের মধ্যে 'সতী কি কলঙ্কিনী', 'পুরুবিক্রম', 'ভারতে যবন', 'রুদ্রপাল' (ম্যাকবেথের বঙ্গানুবাদ), 'আনন্দ কানন' প্রভৃতি অভিনীত হয়। অভিনয়ে উন্নতি দেখা দিলেও সম্প্রদায়ে গণ্ডগোল যেন লাগিয়াই থাকিল। কিছুদিনের জন্য ধর্মদাস সুরের স্থলে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ম্যানেজার নিযুক্ত হন। কিছুদিন পরে নগেন্দ্রবাবু আবার কয়েকজন অভিনেতা-অভিনেত্রী লইয়া দল ছাড়িয়া চলিয়া যান এবং বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি অভিনয় করিয়া পরিশেষে বেঙ্গল থিয়েটার-এ যোগ দেন। তখন ধর্মদাস সুর আবার ম্যানেজার নিযুক্ত হন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর এখানে হরলাল রায়ের 'শত্রু-সংহার' অভিনীত হয়। এই নাটকের একটি ছোট্ট ভূমিকা অবলম্বন করিয়া খ্যাতনামা অভিনেত্রী বিনোদিনী সর্বপ্রথম মঞ্চাবতরণ করেন। এই রঙ্গমঞ্চে অভিনীত অন্যান্য নাটকের মধ্যে 'শরৎ

সরোজিনী', 'নগননলিনী', 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' উল্লেখযোগ্য। রাজা হরেন্দ্র-কৃষ্ণের বাড়ী হোলকার সদলে উপস্থিত হইলে তাঁহার সম্মানার্থে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার কর্তৃক 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' অভিনীত হয়। এই অভিনয়ে ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজা, বেথিয়ার মহারাজকুমার, ব্রহ্মরাজদূত প্রমুখ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের শেষে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের একটি অংশ (ধর্মদাস সুর, অর্ধেন্দুশেখর, অবিনাশ কর, ক্ষেত্রমণি, বিনোদিনী প্রভৃতি) পশ্চিম ভারত পরিক্রমায় বাহির হইয়া দিল্লী, লাহোর, মিরাট, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে অভিনয় প্রদর্শন করে। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের অপর দলও এই সময়ে কলিকাতায় মহেন্দ্রলাল বসুর তত্ত্বাবধানে অভিনয় চালাইয়া যাইতেছিল। ইহারা 'সধবার একাদশী', 'নয়শো রুপেয়া', 'তিলোত্তমাসম্ভব', 'সাক্ষাৎদর্পণ', 'নন্দন কানন' প্রভৃতি নাটকের অভিনয় করেন। মহেন্দ্রলাল বসুর 'সাহায্য রজনী' হিসাবে 'পদ্মিনী' অভিনীত হয় (৩রা জুলাই, ১৮৭৫) এবং মহেন্দ্রবাবু স্বয়ং ভীমসিংহের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

কিছুদিন পরে আবার দলাদলি ও গণ্ডগোল দেখা দিলে ভুবনবাবু শ্যাম-পুকুরের কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়কে থিয়েটার 'লিজ' দেন (আগস্ট, ১৮৭৫)। তখন এই থিয়েটারের নাম হইল 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটার'। মহেন্দ্রলাল বসুর অধ্যক্ষতায় এখানে 'পদ্মিনী', 'শরৎ-সরোজিনী', 'নীল-দর্পণ', 'অপূর্ব সতী' প্রভৃতি নাটক অভিনীত হয়। 'অপূর্ব সতী' অভিনীত হয় সুকুমারী দত্তের সাহায্য রজনী উপলক্ষ্যে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে কৃষ্ণধনবাবু রঙ্গমঞ্চ পরিচালনায় ঋণগ্রস্ত হইয়া অসমর্থ হওয়ায় ভুবনবাবু বাধ্য হইয়া পুনরায় রঙ্গমঞ্চের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করেন। উপেন্দ্রনাথ দাস পরিচালক এবং অমৃতলাল বসু ম্যানেজার নিযুক্ত হইলেন। ইহার পর প্রথম অভিনীত হয় অমৃতলাল বসুর প্রথম নাটক 'হীরকচূর্ণ'। তৎপরে অভিনীত নাটকসমূহের মধ্যে 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' (প্রথম অভিনীত), 'প্রকৃত বন্ধু', 'সরোজিনী' এবং 'বিদ্যাসুন্দর' উল্লেখযোগ্য। কিছুদিনের মধ্যেই বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে এক সঙ্কট দেখা দিল।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে সপ্তম এডওয়ার্ড 'প্রিন্স অব ওয়েলস্' রূপে কলিকাতায় আসিলে হাইকোর্টের তদানীন্তন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল জগদানন্দ

মুখোপাধ্যায় নিজ গৃহে তাঁহাকে সাদর নিমন্ত্রণ জানান। মুখোপাধ্যায়-গৃহিণী ভারতীয় প্রথায় তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানান ও আপ্যায়িত করেন। এই ঘটনা তখন বাঙালী সমাজে তীব্র বিক্ষোভ ও গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করে। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া রচিত 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' নামে এক প্রহসনের অভিনয় করেন। ১৯শে ফেব্রুয়ারী (১৮৭৬) 'সরোজিনী'র অভিনয়ের পর প্রহসনখানিও অভিনীত হয়। একজন সম্ভ্রান্ত রাজভক্ত প্রজাকে প্রকাশ্যে অভিনয় মাধ্যমে ব্যঙ্গ করায় পুলিশ উক্ত প্রহসনের অভিনয় বন্ধ করিয়া দেয়। তথাপি ভিন্ন নামে প্রহসনখানির অভিনয় চলিতে থাকে। ১লা মার্চ উপেন্দ্রনাথ দাসের 'সাহায্য রজনী' উপলক্ষে 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' নাটক অভিনীত হইবার পর পুলিশকে ব্যঙ্গ করিয়া বলে *The police of Pig and Sheep'* নামে একটি প্রহসন অভিনীত হয়। ফলে রঙ্গমঞ্চকে সংযত করিবার জন্য ভারত সরকারের তদানীন্তন বড়লাট নর্থব্রুক ২৯শে ফেব্রুয়ারী (৮৭৬) একটি অর্ডিন্যান্স জারি করেন এবং এ বিষয়ে একটি আইন প্রণয়নেও সচেষ্ট হন। রঙ্গমঞ্চ শাসনে সরকারী প্রয়াস এখানেই নিরস্ত হয় নাই। ৪ঠা মার্চ তারিখে গ্রেট ন্যাশনাল রঙ্গমঞ্চে যখন 'সতী কি কলঙ্কিনী'র অভিনয় চলিতেছিল, তখন পুলিশের ডেপুটি কমিশনার সদলে উপস্থিত হইয়া উপেন্দ্রনাথ দাস (পরিচালক), অমৃতলাল বসু (ম্যানেজার), মতিলাল সুর প্রভৃতি আটজনকে গ্রেপ্তার করে। অজুহাত হইল, পূর্বে অভিনীত 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' নাটক অশ্লীল। বিচারে যথারীতি উপেন্দ্রনাথ দাস ও অমৃতলাল বসুর একমাস করিয়া বিনাশ্রম কারাদণ্ড হইল। অবশ্য ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে 'আপীল' করা হইলে 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' অশ্লীল প্রমাণিত না হওয়ায় উভয়েই মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু সরকার নিরস্ত হইলেন না। কলিকাতার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে "Dramatic Performances Control Bill" নামে যে আইনের খসড়া কাউন্সিলে পেশ করা হয়, তাহা সেই বৎসরেই আইনে পরিণত হইল। এই আইন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসের প্রথম পর্বের যবনিকাপাত ঘটে। শুধু রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষই নয়, নাট্যকারগণও নিরুৎসাহিত ও শঙ্কিত হইয়া পড়েন

॥ তিন ॥

অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন প্রবর্তিত হওয়ায় বাংলা রঙ্গমঞ্চ যে কঠিন আঘাত পাইয়াছিল, তাহা কাটাইয়া উঠিতে কয়েক বৎসর লাগিল। রঙ্গমঞ্চের স্থিতাবস্থা দেখা দিল ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে। প্রতাপচন্দ্র জহুরী তখন ন্যাশনাল থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী এবং ইহার ম্যানেজার হইলেন গিরিশচন্দ্র। এখানে প্রথম 'হাসির' নাটক অভিনীত হয় (১লা জানুয়ারী, ১৮৮১)। উপযুক্ত নাটকের অভাবে এ পর্বে গিরিশচন্দ্রকেও নূতন নাটকের জন্য বিজ্ঞাপন দিতে হইয়াছিল। কিন্তু মনোমত নাটক না পাইয়া অবশেষে তিনি নিজেই নাট্যরচনায় হাত দিলেন। তাঁহার প্রথম নাটক 'রাবণ বধ' এখানেই অভিনীত হয়। 'পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস' (প্রথম অভিনয় ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৩)-এর পরে গিরিশচন্দ্র 'ষ্টার' থিয়েটার-এ যোগদান করেন। ইহার পরেও কিছুদিন ন্যাশনাল থিয়েটার অস্তিত্ব বজায় রাখে। কেদারনাথ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের 'বউঠাকুরাণীর হাট'-এর নাট্যরূপ দান করেন 'বসন্ত রায়' নামে। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে 'বসন্ত রায়' ন্যাশনাল থিয়েটার-এ মঞ্চস্থ হইয়া বিপুলভাবে অভিনন্দিত ও সমাদৃত হয়। বসন্ত রায়ের গীতিবহুল ভূমিকায় রাধামাধব কর স্মরণীয় অভিনয় করেন।

ইতিমধ্যে পাঞ্জাবী গুরুমুখ রায় ষ্টার থিয়েটার-এর প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৮৩)। ষ্টার থিয়েটার এই সময় ছিল বিডন স্ট্রীটে, পরবর্তীকালে যেখানে 'কোহিনুর' ও 'মনোমোহন থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সেইখানে। বর্তমানে সেই জমির উপর দিয়া চিত্তরঞ্জন এভিনিউ চলিয়া গিয়াছে। রঙ্গমঞ্চের মালিক ছিলেন গুরুমুখ রায়, কিন্তু জমির মালিক ছিলেন কীর্তি মিত্র। গিরিশচন্দ্রের 'দক্ষযজ্ঞ' এখানে প্রথমে অভিনীত হয় (৬ই শ্রাবণ, ১২৯০)। গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল বসু, বিনোদিনী প্রভৃতি ষ্টার থিয়েটার-এ যোগ দেন। গিরিশচন্দ্র 'কমলে কামিনী' নাটক লইয়া মঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন (২৬শে মার্চ, ১৮৮৪)। পরে গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা'-র অভিনয়ের (২রা আগস্ট, ১৮৮৪) সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের ভাগ্য ফিরিয়া গেল। 'চৈতন্যলীলা'য় 'নিমাই ও নিতাই-র ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া বিনোদিনী ও গঙ্গামণি বাজীমাৎ করিয়াছিলেন। এই অভিনয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'পায়ের ধুলো' পাইয়া রঙ্গমঞ্চ ও অভিনেতা-অভিনেত্রীবৃন্দ ধন্য হইল।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে গুরুমুখ রায়ের মৃত্যুর পরে অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মিত্র প্রভৃতি কয়েকজন রঙ্গমঞ্চটি ক্রয় করেন। কিন্তু সৌভাগ্য ও সাফল্য সত্ত্বেও অভিনেতা সম্প্রদায় কর্তৃক পরিচালিত ষ্টার থিয়েটার বেশীদিন তাহার অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারে নাই। রঙ্গমঞ্চ চালাইবার উপযুক্ত অর্থের অভাবে রঙ্গমঞ্চের বাড়ী 'বাঁধা দিয়া' তাঁহারা চৌদ্দ হাজার টাকা সংগ্রহ করিলেন। এদিকে মতিলাল শীলের বংশধর গোপালচন্দ্র শীল নূতন রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করিবার জন্য ষ্টার থিয়েটারের জমি ক্রয় করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। দুর্ভাগ্যবশত সুযোগ বুঝিয়া পাওনাদারও ষ্টার থিয়েটারের কর্তৃপক্ষকে তাগিদ দিতে লাগিলেন। তখন ষ্টার থিয়েটারের মালিকপক্ষ রঙ্গমঞ্চের নামটুকু ছাড়া বাড়ী এবং রঙ্গমঞ্চ ত্রিশ হাজার টাকায় বিক্রী করিতে বাধ্য হন।

গোপালচন্দ্র শীল রঙ্গমঞ্চের নূতন নামকরণ করেন 'এমারেল্ড থিয়েটার'। গ্রেট ন্যাশনাল দলের অর্ধেন্দুশেখর, মহেন্দ্রলাল বসু, মতিলাল সুর, রাধামাধব কর প্রভৃতি এমারেল্ড থিয়েটারে যোগদান করেন। এখানে প্রথমে অভিনীত হয় কেদারনাথ চৌধুরীর 'পাণ্ডব নির্বাসন'। গোপালচন্দ্র গিরিশচন্দ্রকেও তাঁহার থিয়েটারে আনিবার জন্য প্রলুব্ধ করেন। প্রলোভনে ভুলিয়া নয়, নিজ সম্প্রদায়ের সনির্বন্ধ অনুরোধে এবং তাহাদের সাহায্য করিবার জন্যই গিরিশচন্দ্র মাসিক ৩৫০৲ টাকা পারিশ্রমিক এবং নগদ ২০,০০০৲ টাকা অগ্রিম 'বোনাস' লাভ করিয়া গোপালচন্দ্রের রঙ্গমঞ্চে ম্যানেজার রূপে যোগদান করেন। বোনাসের ২০,০০০৲ টাকা হইতে ১৬,০০০৲ টাকা তিনি ষ্টার থিয়েটারে নূতন রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের জন্য নিজ সম্প্রদায়কে দান করেন। ওদিকে তখন ষ্টার থিয়েটার সম্প্রদায় হাতীবাগানে রঙ্গমঞ্চের উপযোগী একটি জমির সন্ধান পাইয়া অর্থ সংগ্রহের জন্য মফঃস্বলে অভিনয় প্রদর্শন করিয়া বেড়াইতেছিলেন। এমারেল্ড থিয়েটারে অভিনীত গিরিশচন্দ্রের প্রথম নাটক 'পূর্ণচন্দ্র'। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে গোপালচন্দ্রের 'স্বপ্ন' মিটিয়া গেল। তখন মহেন্দ্রলাল বসু ও অতুলকৃষ্ণ মিত্র এমারেল্ড থিয়েটার ইজারা লইয়া চালাইতে লাগিলেন। অতঃপর এখানে অভিনীত হয় রাধামাধব করের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাধারমণ করের গার্হস্থ্য নাটক 'সরোজা'; রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী'; রাজকৃষ্ণ রায়ের 'চতুরালী চন্দ্রাবতী', 'লোভেন্দ্র গবেন্দ্র', 'লক্ষহীরা'; এবং বৈকুণ্ঠনাথ বসুর 'পৌরাণিক পঞ্চরং' (পদাবলী গানের মালা স্বল্প কথার সূত্রে গ্রথিত)। শেষোক্ত নাটকখানি অভিনীত হয় ২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩০১ বঙ্গাব্দে।

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এমারেল্ড রঙ্গমঞ্চ ভাড়া লইয়া 'ক্লাসিক' থিয়েটার খোলেন। গিরিশচন্দ্রের 'হারানিধি' সেখানে প্রথম অভিনীত হয়। অমরেন্দ্রনাথের থিয়েটারে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নাট্যাভিনয় হইল ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'আলিবাবা'-র অভিনয় (১৩০৪ বঙ্গাব্দ)। 'আলিবাবা'-র অভিনয়ে হোসেনের ভূমিকায় অমরেন্দ্রনাথ, মর্জিনার ভূমিকায় কুসুমকুমারী এবং আলিবাবার ভূমিকায় পূর্ণচন্দ্র ঘোষ দর্শকের প্রাণমন হরণ করিয়া লইলেন। বাংলার রঙ্গমঞ্চে 'আলিবাবা'-র অভিনয়সিদ্ধি বহুদিন অক্ষুণ্ণ ছিল। অমরেন্দ্রনাথের চেষ্টাতেই অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বেতন ভদ্র-পরিমাণের হয়। তিনি বঙ্গরঙ্গমঞ্চ সম্পর্কিত প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র 'রঙ্গালয়' (সাপ্তাহিক) প্রকাশ করেন (১৯০১) এবং 'নাট্যমন্দির' নামে একই বিষয়ে মাসিক পত্রও বাহির করেন (১৩১৬-১৩১৮ বঙ্গাব্দ)। ১৩০৪ বঙ্গাব্দে গিরিশচন্দ্র 'ক্লাসিক' থিয়েটারে যোগদান করেন। এখানে তাঁহার 'দেলদার', 'পাণ্ডব গৌরব', 'অশ্রুধারা', 'মনের মতন', 'শাস্তি', 'ভ্রান্তি', 'আয়না', 'সৎনাম' প্রভৃতি অভিনীত হয়। 'সৎনামে'র অভিনয়ের পর (১৩১১ বঙ্গাব্দ) গিরিশচন্দ্র 'মিনার্ভা থিয়েটার'-এ যোগদান করেন। অতঃপর এখানে নগেন্দ্রনাথ ঘোষের 'কোন্‌টা কে' ? এবং দ্বিজেন্দ্রলালের 'প্রায়শ্চিত্ত' সংশোধিত হইয়া 'বহুৎ আচ্ছা' নামে অভিনীত হয়।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে 'বেঙ্গল থিয়েটার'-এর কথা আলোচিত হইয়াছে। এ পর্বে বেঙ্গল থিয়েটার-এ রাজকৃষ্ণ রায়ের 'প্রহ্লাদ-চরিত' সর্বাপেক্ষা সমাদৃত হইয়াছিল। এখানে অভিনীত অন্যান্য নাটকের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অশ্রুমতী', গোপাল-চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'পাষাণ প্রতিমা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বেঙ্গল থিয়েটার-এ নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায়ের অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' সর্বপ্রথম অভিনীত হয় (ডিসেম্বর, ১৮৮৪)। সে অভিনয়ে দর্শকের ভীড় বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। ষ্টার-এ গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা' এবং বেঙ্গল থিয়েটার-এ 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' যেন দুইটি ভক্তমেলার সৃষ্টি করিয়াছিল।

রাজকৃষ্ণ রায় 'প্রহ্লাদ-চরিত' নাটকের অভিনয় সংক্রান্ত ব্যাপারে বেঙ্গল থিয়েটার কর্তৃপক্ষের নিকট দুর্ব্যবহার পাইয়া ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে 'বীণা' থিয়েটার স্থাপন করেন। এখানে তাঁহার 'চন্দ্রহাস', 'কুমার বিক্রম', 'ঠাকুর হরিদাস', 'মীরাবাঈ' প্রভৃতি নাটক অভিনীত হয়। গোঁড়া ও রক্ষণশীল ব্যক্তিদের পরামর্শ অনুযায়ী রাজকৃষ্ণ রায় এ যুগেও স্ত্রীভূমিকা

মেয়েদের দ্বারা অভিনয় করাইতেন না। বলা বাহুল্য, তাঁহার রঙ্গমঞ্চ জমিয়া উঠে নাই। রঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রী বর্জন ইহার একটি প্রধান কারণ। ১৮৯০-৯১ খ্রীষ্টাব্দে 'দেনার দায়ে' তিনি রঙ্গমঞ্চ বিক্রী করেন এবং অমৃতলাল বসুর চেষ্টায় নাট্যকার হিসাবে ষ্টার থিয়েটার-এ যোগদান করেন।

একাধিক সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার ফলে পরবর্তীকালে যখন সৌখীন সম্প্রদায়ের নামকরা দলগুলির অবলুপ্তি ঘটিল, অথচ সাধারণ রঙ্গমঞ্চেও নাট্যাভিনয়ের বিশেষ কোন উন্নতিসূচক অগ্রগতি লক্ষিত হইল না, তখন কলিকাতার সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর সৌখীন ব্যক্তিগণ অস্বস্তি বোধ করিলেন। এই অস্বস্তিতে বেদনার সঞ্চার করিয়াছিল পূর্ববর্তীযুগের সৌখীন ও অভিজাত রঙ্গমঞ্চগুলির উজ্জ্বল স্মৃতি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অগ্রণী হইয়া 'সঙ্গীত সমাজ'-এর প্রতিষ্ঠা করেন। 'সঙ্গীত সমাজ'-এর প্রতিষ্ঠা হয় কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' ও রঙ্গমঞ্চের গৃহে। সেইজন্য রুচি ও আভিজাত্যের দিক দিয়া এ সমাজ উপযুক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু এখানেও কিছুদিনের মধ্যে দলাদলি দেখা দিল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখ অনেকেই তখন সেই স্থান ত্যাগ করিয়া কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির'-এর অনতিদূরে একটা সমগ্র বাড়ী আশুতোষ চৌধুরীর নামে 'লীজ' লইয়া 'ভারত সঙ্গীত সমাজ'-এর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। অপর দল, 'সঙ্গীত সমিতি' নামে পূর্বস্থানেই কিছুদিন অস্তিত্ব বজায় রাখে।

সঙ্গীত সমাজ 'বিলাতী ক্লাব' ও দেশীয় বাবুদের বৈঠকখানার সংমিশ্রণ ছিল। ফরাস, তাকিয়া, জাজিম, গড়গড়া ও তাসপাশার সঙ্গে ছিল পিয়ানো, টেবিল-অর্গান, এবং বিলিয়ার্ড টেবিল। জমিদার ও ধনী সম্প্রদায় ভিড় করিলেন: ত্রিপুরাধিপতি, কুচবিহারের মহারাজা, দ্বারবঙ্গেশ্বর, বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ এবং মফঃস্বল বাংলার জমিদারগণের অনেকেই সমিতির সভ্য ছিলেন! আসিলেন বিলাত-ফেরৎ ডাক্তার ও ব্যারিস্টার। ক্রমে মিঃ (পরে লর্ড) এস. পি. সিংহ, আশুতোষ চৌধুরী এই সমাজভুক্ত হন। রবীন্দ্রনাথ প্রথম হইতেই সঙ্গীত সমাজের একজন উৎসাহী কর্মী ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন ইহার প্রথম সম্পাদক, পরে তিনি অন্যতম সভাপতিরূপে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। এখানে সঙ্গীতচর্চার আসর ও অভিনয়ের রঙ্গমঞ্চ ছিল। গৃহপ্রাঙ্গণে রঙ্গমঞ্চরূপে একটি সুবৃহৎ 'স্টেজ' বাঁধা ছিল। সমাজের সভ্যদিগকে লইয়া অভিনয়ের আয়োজন হইত। স্ত্রীলোকের ভূমিকা অভিনয়ের জন্য বেতনভোগী কয়েকটি ছেলে ছিল

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সম্পাদক রূপে যেমন সকল ব্যবস্থা ও আয়-ব্যয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন, তেমনি অভিনয়, গীত এবং নৃত্যশিক্ষার ভারও গ্রহণ করিয়াছিলেন। সংগীত চর্চার জন্য 'সঙ্গীত প্রকাশিকা' নামে স্বরলিপিবহুল একখানি মাসিকপত্র ত্রিপুরাধিপতির অর্থে এবং তাঁহারই ইচ্ছায় ভারত সঙ্গীত সমাজ এর মুখপত্র স্বরূপ প্রকাশিত হইত।

বিলাতে নূতন আবিষ্কারের খ্যাতি ও স্বীকৃতি লাভ করিয়া আচার্য জগদীশ-চন্দ্র বসু দেশে প্রত্যাবর্তন করিলে সঙ্গীত সমাজে তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইবার জন্য এক সান্ধ্য আয়োজন ও অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা 'আচার্য জগদীশচন্দ্র' এই উপলক্ষে রচিত।

অভিজাত পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ সভ্য হইলেও সঙ্গীত সমাজ-এর সকলেই মাতৃভাষায় পারদর্শী ছিলেন না। সেইজন্য অভিনয়ের পূর্বে দ্বিপ্রহরে রবীন্দ্রনাথ কাহারও বাড়ীতে বা সমাজভবনে যাইয়া তাহাদের উচ্চারণ সংশোধন করিতেন এবং সন্ধ্যায় তাহাদের ভূমিকার সংলাপ আবৃত্তি করাইয়া আনুষঙ্গিক অঙ্গভঙ্গী শিক্ষা দিতেন। এইভাবে অভিনয় প্রস্তুতি অগ্রসর হইলে নাটক মঞ্চস্থ হইত। এইরূপভাবে দীর্ঘ আট-নয় বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করার পর সঙ্গীত সমাজ যখন জাঁকাইয়া উঠিল, তখন রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িলেন (১৩০০ বঙ্গাব্দ)। সঙ্গীত সমাজে 'মেঘনাদবধ', 'আনন্দমঠ', 'মৃণালিনী' প্রভৃতির এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী দেবী ও রবীন্দ্রনাথের নাটকাদিরও অভিনয় হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অশ্রুমতী', 'অলীকবাবু', 'পুনর্বসন্ত', 'ধ্যানভঙ্গ' এবং রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন', 'গোড়ায় গলদ', 'বৈকুণ্ঠের খাতা' প্রভৃতি অভিনীত হয়। 'গোড়ায় গলদ' প্রথমে সঙ্গীত সমাজেই অভিনীত হয়। সমাজের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত অভিনেতাদের নাট্যশিক্ষার ভার গ্রহণ করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। নাটকের মধ্যমণি চন্দ্রবাবুর ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছিলেন শ্রীশচন্দ্র বসু। ১৩০৩ বঙ্গাব্দে 'বৈকুণ্ঠের খাতা'-ও সঙ্গীত সমাজে প্রথম অভিনীত হয়। কেদারের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ও অবিনাশের ভূমিকায় নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বিখ্যাত অভিনেতা রাধামাধব কর সঙ্গীত সমাজের নাট্যাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নাট্যশিক্ষা দানের ভার লইয়াছিলেন চারুচন্দ্র মিত্র।

দলাদলি সঙ্গীত সমাজেরও কাল হইয়াছিল। যে বিরাট কর্মোদ্যম, শক্তি ও সামর্থ্য সঙ্গীত সমাজের ছিল, তাহার তুলনায় ইহার দান যথেষ্ট নয়। তবে

একথা সত্য যে, সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তীযুগে যে-কয়েকটি প্রধান প্রধান সৌখীন নাট্যপ্রতিষ্ঠান আমাদের জাতীয় রঙ্গমঞ্চকে একটা নির্দিষ্ট আদর্শের দিকে অগ্রসর করিয়াছিল, সঙ্গীত সমাজ তাহাদের উপযুক্ত উত্তরসাধকের কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছে। সম্মিলিত ধনপতিদের অকুণ্ঠ দাক্ষিণ্যে এবং ততোধিক দুর্লভ শীর্ষস্থানীয় বিদ্বজ্জনের ক্ষুরধার মনীষার বিদ্যুৎ-দীপ্তিতে সঙ্গীত সমাজ এমন একটি অভিজাত সংস্থায় পরিণত হইয়াছিল, যাহা আমাদের দেশের আর কোন সভা-সমিতির ভাগ্যে ঘটে নাই।

মফস্বলে অভিনয় প্রদর্শন করিয়া সংগৃহীত অর্থে এবং গিরিশচন্দ্র প্রদত্ত ১৬০০০৲ টাকায় হাতীবাগানে নূতন উদ্যমে 'ষ্টার' থিয়েটার সম্প্রদায় নবনির্মিত ভবনে আবার 'ষ্টার' থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে)। এখানে প্রথমে গিরিশচন্দ্রের 'নসীরাম' অভিনীত হয় (১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫)। নূতন ষ্টার থিয়েটার শিল্পীগোষ্ঠীরই থিয়েটার, অবশ্য বাড়ীর মালিক হিসাবে পুরানো মালিকেরাই (অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মিত্র প্রভৃতি কয়েকজন) রহিলেন। এমারেল্ড থিয়েটার-এ কিছুদিন ম্যানেজার রূপে কার্য করিবার পর গিরিশচন্দ্র ষ্টার থিয়েটারে যোগ দিলেন। সেখানে তখন তাঁহার 'প্রফুল্ল' নাটক অভিনীত হইল।

১২৯৭ বঙ্গাব্দে গিরিশচন্দ্র ষ্টার থিয়েটার ছাড়িয়া মিনার্ভা থিয়েটারে যোগ দিলেন। সেখানে প্রথমে তাঁহার অনূদিত 'ম্যাকবেথ' ও 'মুকুল মঞ্জুরা' যথাক্রমে ১২৯৯ বঙ্গাব্দের ১৬ই ও ২৪শে মাঘ অভিনীত হয়। কয়েক বৎসর পরে, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আবার নাট্যাচার্যরূপে 'ষ্টার' থিয়েটারে যোগদান করেন। তখন সেখানে তাঁহার 'কালাপাহাড়' (প্রথম অভিনয় ১০ই আশ্বিন, ১৩০৩), 'মায়াবসান' প্রভৃতি অভিনীত হয়। ইহার পর আবার তিনি 'ক্লাসিক' থিয়েটারে চলিয়া যান।

৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বরচিত 'বাল্মীকি প্রতিভা'-য় রবীন্দ্রনাথ সদলবলে 'ষ্টার' থিয়েটারে অবতীর্ণ হন। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে তাঁহার এই প্রথম আবির্ভাব। অবশ্য সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গে তাঁহার কোন সম্পর্ক ছিল না। 'বাল্মীকি প্রতিভা'-র অভিনয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সকলেই ছিলেন ঠাকুর পরিবারভুক্ত।

রাজকৃষ্ণ রায় এই পর্বে ষ্টার থিয়েটারের নাট্যকার নিযুক্ত হওয়ায় তাঁহার 'নরমেধ যজ্ঞ', 'বনবীর', 'লয়লা মজনু', এবং 'খদ্যোৎ' প্রভৃতি নাটক ষ্টার

থিয়েটারে অভিনীত হয়। ১৯১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে যখন অমরেন্দ্রনাথ 'ষ্টার' থিয়েটারের পরিচালক তখন তিনি একবার রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' রঙ্গমঞ্চস্থ করেন এবং স্বয়ং বিক্রমদেবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসের এই পর্ব একান্ত-ভাবেই গিরিশপ্রভাবিত পর্ব। ন্যাশনাল থিয়েটার, ষ্টার থিয়েটার (উভয় পর্বেরই), এমারেল্ড থিয়েটার, ক্লাশিক থিয়েটার এবং মিনার্ভা থিয়েটার—এই সাধারণ রঙ্গমঞ্চগুলির প্রত্যেকটিরই সঙ্গে তিনি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এ যুগে তিনিই প্রধান নাট্যকার, নট ও নাট্যাচার্য। স্বনামে, ছদ্মনামে অথবা নামের উল্লেখ না করিয়াই তিনি বাংলার রঙ্গমঞ্চকে স্বরচিত নাটক জোগাইয়াছেন। শুধু বাংলা ছন্দ ও বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসেই নয়, বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসেও গিরিশচন্দ্র এক নূতন যুগের সূচনা করিয়াছিলেন। সেইজন্য ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে আবার এক বিরামচিহ্ন দেখা দিল।

বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রথম যুগের ইতিহাসে দেখা যায়, নানা বিচ্ছিন্ন প্রয়াসের মধ্য দিয়া ইহার সূচনা হইলেও কালক্রমে ইহার আদর্শের মধ্যে একটি অখণ্ড ঐক্য স্থাপিত হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র ঘোষই ইহার প্রতিষ্ঠাতা। ইতিপূর্বে সৌখীন এবং ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চের ভিতর দিয়া ইহার যে বিভিন্নমুখী লক্ষ্য দেখা দিয়াছিল, গিরিশচন্দ্র তাহাদের মধ্য হইতেই সেই ঐক্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন। ইহার প্রধান বিশেষত্ব এই ছিল যে, ব্যক্তিগত খেয়ালখুশী-মত মঞ্চ এবং অভিনয় পরিকল্পনার পরিবর্তে এই বিষয়ে একটি জাতীয় আদর্শ স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার অভিনয়ের মধ্যে দেশীয় যাত্রার আঙ্গিক যেমন প্রবেশ করিয়াছিল, তেমনই ইহার ভাবধারার মধ্যেও জাতীয় ভাবটি সর্বপ্রথম অঙ্কুরিত হইয়াছিল। এই যুগের বাংলার রঙ্গমঞ্চ লইয়া কেবলমাত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চলিয়াছিল, একদিকে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ, আর একটি দিয়া সংস্কৃত নাটকের প্রভাবকে স্বীকরণের ব্যর্থ প্রয়াস বাংলা রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে কোন স্থায়ী আদর্শ গড়িয়া তুলিবার সুযোগ সৃষ্টি করিতে পারে নাই। কিন্তু গিরিশচন্দ্র তাঁহার মঞ্চ ব্যবস্থা এবং অভিনয় পরিকল্পনার মধ্য দিয়া ইহাদের একটি জাতীয় ঐতিহ্যের ধারাকে সন্ধান করিতে লাগিলেন এবং এই কার্যে তিনি ব্যর্থ হইলেন না। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়া দর্শকদিগের মধ্যে সাময়িক যে কৌতূহলই

সৃষ্টি করা সম্ভব হোক না কেন, কোন স্থায়ী আকর্ষণ সৃষ্টি হইতে পারে না। গিরিশচন্দ্র নিজের খেয়াল-খুশী বিসর্জন দিয়া দর্শকের অনুরাগ এবং রুচির দিকে সর্বদা লক্ষ্য রাখিতেন বলিয়া স্বাভাবিক ,ভাবেই তিনি জাতীয় ঐতিহ্যের ধারাটিকে উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন।

মঞ্চও যে একটা ব্যবসায়ের অবলম্বন হইতে পারে, ইহার ভিতর দিয়াও যে জীবিকা অর্জনের সহায়তা হইয়া থাকে, এই যুগের মঞ্চ পরিচালনার মধ্য দিয়া তাহা প্রথম প্রকাশ পাইল। সৌখীন রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়াই এই যুগের সৃষ্টি হইয়াছিল একথা সত্য, কিন্তু ইহারও যে একটা ব্যবসায়িক দিক থাকিতে পারে, এই যুগের কয়েকজন মঞ্চ পরিচালক তাহা অনুভব করিয়া ইহাকে সৌখীন বিলাসভাবনার ক্ষেত্র হইতে সামাজিক জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই বিষয়ের কৃতিত্বও গিরিশচন্দ্র ঘোষেরই প্রাপ্য। তিনি কেবল মাত্র নিজের খেয়াল মিটাইবার জন্য রঙ্গমঞ্চ পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন নাই, রঙ্গমঞ্চকে তিনিই প্রথম হইতে যথার্থ একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেখিয়াছেন এবং ব্যবসায়িক স্বার্থ যত দিক দিয়া পূর্ণ হওয়া সম্ভব তাহার সবগুলি দিকই তিনি গভীর ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া তিনি তাহাতে কৃতকার্যতা লাভ করিয়াছেন। এই বিষয়ে তিনি যে ধারা প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন, পরবর্তী কালে তাহাই অনুসরণ করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে বীণা থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী রাজকৃষ্ণ রায়ের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। রাজকৃষ্ণ রায় বাংলার রঙ্গমঞ্চের তথাকথিত 'দূষিত' নৈতিক আবহাওয়া উন্নত করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ী অভিনেত্রীর পরিবর্তে পুরুষ দ্বারা স্ত্রী চরিত্রের অভিনয় করাইতে আরম্ভ করিলেন। রাজকৃষ্ণ রায় এখানে গিরিশচন্দ্রের পথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা দ্বারা নিজের পরিচালিত রঙ্গমঞ্চটিকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলেন না, নিজেও বাঁচিলেন না। প্রভূত ঋণে আবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে তাঁহার যথাসর্বস্ব বিক্রয় করিয়া সর্বস্বান্ত হইতে হইল। গিরিশচন্দ্র ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এই প্রকার অবাস্তব আদর্শবাদী ছিলেন না, তাঁহার ব্যবসায়িক একটি দূরদৃষ্টি ছিল, সেইজন্য সমাজের সকল প্রকার নিন্দা ও গ্লানি মাথায় করিয়া লইয়াও তাঁহার ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিলেন। গিরিশচন্দ্র নাট্যকার হিসাবে আদর্শবাদী হইলেও রঙ্গমঞ্চের পরিচালনা হিসাবে অত্যন্ত বাস্তববাদী ছিলেন। ব্যবসায়িক

দিক দিয়া তাহার মধ্যে কোন ব্যর্থতার পরিচয় পাওয়া যায় না। সেইজন্য তিনিই বাংলার রঙ্গমঞ্চকে একটি সুদৃঢ় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান রূপে স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মঞ্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর কাহারও মধ্যে যদি এই বাস্তব ব্যবসায় বুদ্ধি থাকিত, তবে এই যুগের বাংলার রঙ্গমঞ্চের জীবনে এত উত্থান পতন দেখা দিত না। গিরিশচন্দ্রই ইহাকে ব্যবসায়িক দিক হইতে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

বাংলা রঙ্গমঞ্চের উপযোগী এক দর্শক সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিবার কৃতিত্বও গিরিশচন্দ্রের প্রাপ্য। এই যুগে যাঁহারা সৌখীন রঙ্গমঞ্চে নাটক দেখিতেন, তাঁহাদের মধ্যে নাট্যশালা সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট ধারণা এবং বিশ্বাস গড়িয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই। কারণ, অবিচল একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠিত না হইলে একটি সুনির্দিষ্ট দর্শক সমাজও গড়িয়া উঠিতে পারে না। ইহার জন্য যে রুচি সৃষ্টি করা আবশ্যক তাহাও স্থির কোন আদর্শ ব্যতীত সম্ভব হয় না। গিরিশচন্দ্র রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কিত একটি সুনির্দিষ্ট আদর্শ স্থির করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং ক্রমাগত তাহাই রঙ্গমঞ্চের মধ্য দিয়া দীর্ঘ দিন ধরিয়া রূপায়িত করিবার ফলে দর্শক সমাজের মধ্যে এই বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট আদর্শ গড়িয়া উঠিবার সহায়তা করিয়াছিল। তাহা না হইলে বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত এবং বিচ্ছিন্ন প্রয়াসের মধ্য দিয়া তাহা কখনও সম্ভব হইয়া উঠিত না।

গিরিশচন্দ্র একাধারে নট, নাট্যকার এবং মঞ্চব্যবসায়ী ছিলেন। যে রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যখনই তিনি যুক্ত থাকিতেন, সেই রঙ্গমঞ্চকেই তিনি ব্যবসায়ের দিক দিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিতেন। তাঁহার পথ অনুসরণ করিয়াই মঞ্চ-ব্যবসায় বাংলা দেশে একটি ব্যবসায় রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। গিরিশ-চন্দ্র ব্যতীত এই কাজটি এত সহজে কিছুতেই সম্ভব হইত না। সুতরাং গিরিশচন্দ্রের কৃতিত্ব কেবল মাত্র একদিকে নহে, বাংলা নাটক এবং রঙ্গমঞ্চের বহুদিকেই তাঁহার চিন্তা এবং কর্ম প্রসারিত হইয়াছিল। প্রথম যুগের পরীক্ষা-নিরীক্ষার নানা বিশৃঙ্খলার মধ্য হইতে একটি সুস্পষ্ট আদর্শকে উদ্ধার করিয়া তিনি সম্মুখে স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়াই পরবর্তীকালে ইহার মধ্যে অধিকতর শৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট—ক

[প্রথম হইতে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত বাংলা নাটকের তালিকা]

১৭৯৫

লেবেডেফ, গেরাসিম—কাল্পনিক সংবদল

১৮৫২

গুপ্ত, যোগেন্দ্রচন্দ্র—কীর্তিবিলাস

শিকদার, তারাচরণ—ভদ্রার্জুন

১৮৫৩

ঘোষ, হরচন্দ্র—ভানুমতী চিত্তবিলাস

১৮৫৪

তর্করত্ন, রামনারায়ণ—কুলীন কুলসর্বস্ব

সিংহ, কালীপ্রসন্ন—বাবু নাটক

১৮৫৫

রায়, নন্দকুমার—অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটক

১৮৫৬*

চট্টোপাধ্যায়, উমাচরণ—বিধবোদ্বাহ

তর্করত্ন, রামনারায়ণ—বেণীসংহার

মিত্র, উমেশচন্দ্র—বিধবা-বিবাহ

" রাধামাধব—বিধবা মনোরঞ্জন

১৮৫৭

চট্টোপাধ্যায়, যদুগোপাল—চপলা-চিত্তচাপল্য

নন্দী, বিহারীলাল—বিধবা পরিণয়োৎসব

সিংহ, কালীপ্রসন্ন—বিক্রমোর্বশী

১৮৫৮

ঘোষ, হরচন্দ্র—কৌরব বিয়োগ

চট্টরাজ গুণনিধি, শ্রীনারায়ণ—কলিকৌতুক

চূড়ামণি, তারকচন্দ্র—সপত্নী নাটক

ঠাকুর, যতীন্দ্রমোহন—বিদ্যাসুন্দর

" শৌরীন্দ্রমোহন—মুক্তাবলী নাটক

তর্করত্ন, রামনারায়ণ—রত্নাবলী নাটক

মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ—চার ইয়ারে তীর্থযাত্রা

সিংহ, কালীপ্রসন্ন—সাবিত্রী-সত্যবান

*এই বৎসর বিধবা-বিবাহ বিধিবদ্ধ হয়।

১৮৫৯

দত্ত, মধুসূদন—শর্মিষ্ঠা নাটক

দে, উমাচরণ—নল দময়ন্তী নাটক

শর্মা, কালিদাস—মুক্তাবলী

সরকার, মণিমোহন—মহাশ্বেতা

সিংহ, কালীপ্রসন্ন—মালতী-মাধব

১৮৬০

ঠাকুর, শৌরীন্দ্রমোহন—মালবিকাগ্নিমিত্র

তর্করত্ন, রামনারায়ণ—অভিজ্ঞান-শকুন্তলা

দত্ত, মধুসূদন—একেই কি বলে সভ্যতা ?

" " —বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।

" " —পদ্মাবতী

" রামচন্দ্র—বাল্যবিবাহ

পীরবক্স, স্যামুয়েল—বিধবা-বিরহ

মিত্র, দীনবন্ধু—নীলদর্পণং নাটকং

" যদুনাথ—বিষবিনোদ

শ্যামাচরণ, শ্রীমাণি—বাল্যোদ্বাহ নাটক

১৮৬১

চট্টোপাধ্যায়, যদুগোপাল—চপল-চিত্ত-চাঞ্চল্য

দত্ত, মধুসূদন—কৃষ্ণকুমারী নাটক

মুখোপাধ্যায়, হারাণচন্দ্র—মনভঞ্জন

১৮৬২

গুপ্ত, দ্বারকানাথ—বিক্রমোর্বশী নাটক

ঘোষ, রামনাথ—পাড়া পাড়্যে এ কি দায় ?

চক্রবর্তী, ভুবনমোহন—জোরাংসি বহুবিঘ্নানি

পাল, কুলদেব—কাদম্বিনী

মিত্র, হরিশ্চন্দ্র—ম্যাও ধরবে কে ?

" " —শুভস্য শীঘ্রম্

১৮৬৩

কর, দুর্গাদাস—স্বর্ণশৃঙ্খল

গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র—বোধেন্দুবিকাশ

দত্ত, প্রাণনাথ—প্রাণেশ্বর

মিত্র, দীনবন্ধু—নবীন তপস্বিনী
„ হরিশ্চন্দ্র—জানকী
মুখোপাধ্যায়, ভোলানাথ—কনের মা
কাঁদে আর টাকার পুঁটলি বাঁধে
সরকার, মণিমোহন—উষানিরুদ্ধ
হালদার, রাধামাধব—বেশ্যানুরক্তি, বিষম বিপত্তি

১৮৬৪

ঘোষ, হরচন্দ্র—চারুমুখ চিত্তহরা
চট্টোপাধ্যায়, যদুনাথ—বিধবা বিলাস
দত্ত, বিশ্বম্ভর—চৌরবিদ্যা বড় বিদ্যা
মিত্র, দ্বারকানাথ—মুষলং কুলনাশনং
„ হরিশ্চন্দ্র—জয়দ্রথ বধ নাটক
শীল, নিমাইচাঁদ—কাদম্বরী

১৮৬৫

তর্করত্ন, রামনারায়ণ—যেমন কর্ম
তেমনি ফল (?)
বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাবরণ—শকুন্তলা

১৮৬৬

অধিকারী, প্রেমধন—চন্দ্রবিলাস
কর্মকার, হরিমোহন—শ্রীবৎসচিন্তা
চক্রবর্তী, ক্ষেত্রমোহন—চক্ষুঃস্থির
তর্করত্ন, যদুনাথ—দুর্ভিক্ষদমন
„ রামনারায়ণ—নব-নাটক
দত্ত, ত্রৈলোক্যনাথ—প্রেমাধিনী
দেবী, কামিনী সুন্দরী—উর্বশী
মিত্র, উমেশচন্দ্র—সীতার বনবাস
„ দীনবন্ধু—বিয়ে পাগলা বুড়ো
„ „ —সধবার একাদশী
মুখোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র—বুঝলে কিনা!
শর্মা, পূর্ণচন্দ্র—শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান

১৮৬৭

কর্মকার, হরিমোহন—জানকীবিলাপ
চট্টোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র—বারুণী বিলাস
তর্করত্ন, রামনারায়ণ—মালতী-মাধব নাটক
দত্ত, প্রাণনাথ—সংযুক্তা স্বয়ংবর
দাস ঘোষ, যদুনাথ—হেমলতা
বসু, মনোমোহন—রামাভিষেক নাটক
মিত্র, দীনবন্ধু—লীলাবতী
মুখোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ—মেঘনাদবধ
„ ভোলানাথ—কিছু কিছু বুঝি
শীল, নিমাইচাঁদ—এঁরাই আবার বড়লোক

১৮৬৮

ঘোষ, চন্দ্রকালী—কুসুম কুমারী
চট্টোপাধ্যায়, অঘোরনাথ—ধর্মস্য সূক্ষ্মা গতি
ঘোষ, বেণীমাধব—ভ্রান্তি-রহস্য
„ „ বনমালী—বরের কাশী-যাত্রা
ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ—সুশীলা-বীরসিংহ নাটক
নন্দী, বিহারীলাল—মেঘমালা
বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র—ইন্দুপ্রভা
„ বেহারীলাল—দুর্গোৎসব
বিদ্যারত্ন, যাদবচন্দ্র—কীচকবধ
মুখোপাধ্যায়, কিশোরীমোহন—বিপদই সম্পদের
মূল
„ হারাণচন্দ্র—বঙ্গকামিনী
রায় বনোয়ারীলাল—কুমুদ্বতী
সান্যাল, কালিদাস—নল-দময়ন্তী
সেনগুপ্ত, গোপালচন্দ্র—বিমাতা মনোরঞ্জন
„ বিপিনমোহন—হিন্দু মহিলা

১৮৬৯

কর্মকার, হরিমোহন—ইন্দুমতী
ঠাকুর, গণেন্দ্রনাথ—বিক্রমোর্বশী
তর্করত্ন, রামনারায়ণ—উভয় সঙ্কট
„ „ —চক্ষুদান
বন্দ্যোপাধ্যায়, বটুবিহারী—হিন্দুমহিলা
বসু, মনোমোহন—প্রণয়-পরীক্ষা
মিত্র, হীরালাল—আলালের ঘরের দুলাল

শীল, নিমাইচাঁদ—চন্দ্রাবতী
শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ—অনুরোধাহ
সাধু, কেশবচন্দ্র—স্বর্ণানন্দ
সিংহ, বিহারীলাল—রসরঞ্জন

১৮৭০

কর্মকার, হরিমোহন—মাগসর্বস্ব
কাঞ্জিলাল, ক্ষেত্রমোহন—প্রমোদনাথ
ঘোষ, কেদারনাথ—জ্ঞানদায়িনী
চট্টোপাধ্যায়, মাধবচন্দ্র—হেমাঙ্গিনী
দাস, জয়নাথ—জীবন উন্মাদিনী
দে, বিপিনবিহারী—মনোহারিণী
বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ—মালতীমাধব নাটক
বসু, ফকিরচাঁদ—শিবাজীর অভিনয়
বিদ্যালঙ্কার, জ্ঞানধন—সুধা না গরল ?
ভট্টাচার্য, কালীপদ—প্রভাবতী
ভদ্র, জগদ্বন্ধু—দেবলাদেবী
মজুমদার, মতিলাল—অদ্ভুত
মিত্র, হারাণচন্দ্র—বিচ্ছেদ নির্বাণ
" হরিশ্চন্দ্র—আগমনী
মুখোপাধ্যায়, ভোলানাথ—প্রভাস-মিলন
রায় চৌধুরী, শ্রীশচন্দ্র—লক্ষ্মণ বর্জন
সেন, অক্ষয়কুমার—ভ্রমনিরাশ
" জীবনকৃষ্ণ—কাল্‌তো ঝগড়া

১৮৭১

চক্রবর্তী, তারকনাথ—গিরিবালা
চূড়ামণি, গিরিশচন্দ্র—পার্বতী-পরিণয়
তর্করত্ন, রামনারায়ণ—রুক্মিণীহরণ নাটক
দত্ত, দ্বারকানাথ—বাঙ্গালার ভাবী মঙ্গল
দাস ঘোষ, ধীরেশচন্দ্র—কুসুম কামিনী
" দে, মহেশচন্দ্র—কুলপ্রদীপ
দে, বিপিন বিহারী—একাদশীর পারণ
বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর—রাজবালা
মিত্র, কৃষ্ণচন্দ্র—জ্ঞানদারঞ্জন
মুখোপাধ্যায়, ভোলানাথ—মৈথিলী মিলন
মুন্সী, প্রাণগোপাল—চাষা কি মানুষ নয় ?
সাধু, অক্ষয়কুমার—রতনেই রতন চেনে

১৮৭২*

গঙ্গোপাধ্যায়, কেদারনাথ—চিত্রাঙ্গিণী
ঘোষ, গিরিশচন্দ্র (ক্যাবাড়্‌ গিরিশ)—ধ্রুব-তপস্যা
" চন্দ্রকালী—কুসুমকুমারী
" শিশিরকুমার—নয়শো রূপেয়া
চট্টোপাধ্যায় প্রবোধচন্দ্র—রত্নবেদিকা
" রমণকৃষ্ণ—এই এক রকম
" সিদ্ধেশ্বর—কিন্নর কামিনী
ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—কিঞ্চিৎ জলযোগ
তর্কবাচস্পতি, তারানাথ—ধনঞ্জয়-বিজয়
দেবী লক্ষ্মীমণি—চিরসন্ন্যাসিনী
নাগ, উপেন্দ্রচন্দ্র—চমৎকার চম্পূ
'নিতম্বিনী শ্রীমতী'—অনূঢ়া যুবতী
বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার—সমাজ রহস্য
" অনুকূলচন্দ্র—দেশাচার
ভট্টাচার্য, রামকালী—হিন্দু পরিবার
মিত্র, দীনবন্ধু—জামাই বারিক
" মদনমোহন—মনোরমা
" হরিশ্চন্দ্র—ঘর থাক্‌তে বাবুই ভেজে
—প্রহ্লাদ
—রাম-বনবাস
—সপত্নীকলহ
—হতভাগ্য শিক্ষক
মুখোপাধ্যায়, তিনকড়ি—শশিপ্রভা
" , নবীনচন্দ্র—উপসংহার
" , হরিগোপাল—দারগা মশাই
শীল, নিমাইচাঁদ—ধ্রুবচরিত্র

---

* এই বৎসর ডিসেম্বর মাসে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা হয়।

১৮৭৩

ঘোষ, বেণীমাধব—ঋষিচরিত্র
" " —ভ্রমকৌতুক
", যোগেন্দ্রনাথ—মোহান্তের এই কি কাজ!
চক্রবর্তী, লক্ষ্মীনারায়ণ—নন্দবংশোচ্ছেদ
চট্টোপাধ্যায়, ক্ষেত্রনাথ—ধ্রুবোপাখ্যান
", দক্ষিণাচরণ—চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী
", দয়ালচন্দ্র—সুশীলা সরলা সুন্দরী
তর্করত্ন, রামনারায়ণ—সপ্নধন নাটক
দাস, লক্ষ্মীনারায়ণ—মোহান্তের এই কি কাজ!!!
বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণচন্দ্র—ভারতমাতা
বসু, মনোমোহন—সতী নাটক
মজুমদার, হরিনাথ—অক্রূর সংবাদ
মশাররফ হোসেন, মীর—বসন্তকুমারী
" " —জমীদার দর্পণ
মিত্র, দীনবন্ধু—কমলে কামিনী
", নিমচন্দ্র—শরৎকুমারী
মুখোপাধ্যায়, কালিদাস—মৎস্য-ধরা
", ভোলানাথ—আকাট মূর্খ
" " —মা এসেছেন!
রায়, হরলাল—হেমলতা
শীল, নিত্যানন্দ—আর কেহ যেন না করে
", নিমাইচাঁদ—তীর্থমহিমা

১৮৭৪

গুপ্ত, উমেশচন্দ্র—হেমনলিনী
ঘোষ, শিশিরকুমার—বাজারের লড়াই
চক্রবর্তী, লক্ষ্মীনারায়ণ—কুলীনকন্য
" " —আনন্দ কানন
চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গাধর—একেই কি বলে বাঙ্গালী সাহেব?
চৌধুরী, শ্রীনাথ—আমি তো উন্মাদিনী
ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—পুরুবিক্রম
দত্ত, মধুসূদন—মায়াকানন
দাস, উপেন্দ্রনাথ—শরৎ-সরোজিনী
বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণচন্দ্র—ভারতে যবন
", দেবেন্দ্রনাথ—স্বর্ণলতা
", নগেন্দ্রনাথ—সতী কি কলঙ্কিনী?
", হরিশ্চন্দ্র—বিবাহ ভঙ্গ
? ? —বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা
বসু, কুঞ্জবিহারী—ভারত অধীন
" " —তুই না অবলা!
" প্রমথনাথ—অমরসিংহ
মজুমদার, হরিনাথ—সাবিত্রী
মিত্র, প্রমথনাথ—নগনলিনী
", মদনমোহন—বৃহন্নলা
মুখোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র—বিধবার দাঁতে মিশি
", ভোলানাথ—নলদময়ন্তী
" " —মোহান্তের চক্রভ্রমণ
", রামচন্দ্র—মাতালের জননীর বিলাপ
", হরিমোহন—মণিমালিনী
রায়, হরলাল—অশ্রুসংহার নাটক
ঐ ঐ —বঙ্গের সুখাবসান নাটক
ঐ ঐ —রুদ্রপাল

১৮৭৫

কর্মকার, হরিমোহন—মালিনী
করিম, আবদুল—জগৎমোহিনী
গঙ্গোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ—বীরনারী
ঘোষ, অঘোরনাথ—পল্লীবিলাসিনী
", যোগেন্দ্রনাথ—অভয়েন্দু
", হরচন্দ্র—রজত-গিরিনন্দিনী
চক্রবর্তী, ক্ষেত্রপাল—হীরক অঙ্গুরীয়
চট্টোপাধ্যায়, দক্ষিণাচরণ—চাকর-দর্পণ
চৌধুরী, অক্ষয়কুমার—দুর্গাবতী নাটক
ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—সরোজিনী

তর্করত্ন, রামনারায়ণ—ধর্মবিজয় নাটক
ঐ ঐ —কংসবধ নাটক
দত্ত, সুকুমারী—অপূর্ব সতী
দাস, উপেন্দ্রনাথ—সুরেন্দ্রবিনোদিনী
ঐ, শ্যামাচরণ—কুরুক্ষেত্রোপাখ্যান
পাল, তারিণীচরণ—ভীমসিংহ
বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাপ্রসাদ—উষাহরণ
ঐ, কৃষ্ণধন—প্রমথনাথ
ঐ, নগেন্দ্রনাথ—পারিজাত হরণ
ঐ, ঐ —গুইকোয়ার নাটক
বসু, অমৃতলাল—হীরকচূর্ণ
ঐ, কুঞ্জবিহারী—শক্রুসিংহ নাটক
ঐ, মনোমোহন—নাগাশ্রমের অভিনয়
ঐ ঐ—হরিশ্চন্দ্র নাটক
ঐ, মহেন্দ্রলাল—চিতোর রাজসতী পদ্মিনী
ঐ সর্বাধিকারী, সত্যকৃষ্ণ—কর্ণাটকুমার
মিত্র, উপেন্দ্রচন্দ্র—গুইকোয়ার
ঐ, বিহারীলাল—বিধবা বঙ্গবালা
ঐ, মদনমোহন—বিচিত্র মিলন
মুখোপাধ্যায়, তারকনাথ—ম্যাক্‌বেথ
ঐ, প্রমথনাথ—কুসুমে কীট
ঐ, ভোলানাথ—ধ্রুবযোগাখ্যান
ঐ, ঐ —দুর্বাসার পারণ
ঐ ঐ —রামের রাজ্যপ্রাপ্তি
ঐ ঐ —কৃষ্ণান্বেষণ
ঐ ঐ —কলঙ্ক ভঞ্জন
ঐ ঐ —দানভিক্ষা
ঐ ঐ —বামন ভিক্ষা
ঐ ঐ —পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস
রায়, রসিকচন্দ্র—সীতান্বেষণ
ঐ রাজকৃষ্ণ—পতিব্রতা
ঐ ব্রজেন্দ্রকুমার—প্রকৃত বন্ধু
ঐ হরলাল—কনক পদ্ম
রায় চৌধুরী, উপেন্দ্রনাথ—বীরবালা
সরকার, দ্বারকানাথ—সৈরিন্ধ্রী
ঐ, ভুবনমোহন—ডাক্তারবাবু
হালদার, রাধামাধব—চন্দ্রলেখা
ঐ ঐ —শশিকলা
ঐ ঐ —এই কলিকাল

১৮৭৬

চক্রবর্তী, লক্ষ্মীনারায়ণ—নবাব সেরাজুদ্দৌলা
দাস দে, মহেন্দ্রচন্দ্র—মহীরাবণ বধ
বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ—বিদ্যাসুন্দর
বিশ্বাস, তিনকড়ি—কামিনীকুমার
বসাক, শ্যামলাল—সুশীলা-শ্রীপতি
বসু, অমৃতলাল—চোরের উপর বাটপাড়ি
ঐ, কুঞ্জবিহারী—ধর্মক্ষেত্র
মশাররফ হোসেন, মীর—এর উপায় কি ?
মিত্র, অতুলকৃষ্ণ—আদর্শ সতী
ঐ ঐ —নির্বাপিত দীপ
ঐ ঐ —প্রণয় কানন বা প্রভাস
ঐ ঐ —আগমনী
ঐ, প্রমথনাথ—জয়পাল
মুখোপাধ্যায়, ভোলানাথ—ভ্যালারে মোর বাপ
রায়, রাজকৃষ্ণ—নাট্যসম্ভব
হালদার, রাধামাধব—শৈব্যাসুন্দরী

১৮৭৭

ঘোষ, গিরিশচন্দ্র—আগমনী
ঐ ঐ —অকাল বোধন
ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—এমন কর্ম আর করব না
তর্কালঙ্কার, হরিশ্চন্দ্র—মেঘনাদ বধ
দাসী, কামিনীসুন্দরী—রামের অধিবাস
বন্দ্যোপাধ্যায়, কেদারনাথ—কাদম্বরী
বসু, কুঞ্জবিহারী—আনন্দ মিলন
ঐ ঐ —নিশাকুসুম

মিত্র, প্রমথনাথ—বীর কলঙ্ক নাটক [১ম খণ্ড]] : অভিমন্যুবধ

১৮৭৮

কর, রাধামাধব—বসন্তকুমারী

কর্মকার, হরিমোহন—পর্বত কুসুম

কাব্যবিশারদ, কালীপ্রসন্ন—সভ্যতা-সোপান

গঙ্গোপাধ্যায়, কেদারনাথ—রাম-অভিষেক

ঐ ঐ —রাম-বিলাপ

ঐ ঐ —রাম-বনবাস

ঐ ঐ —জরাসন্ধ বধ

ঐ ঐ —রামের রাজ্যাভিষেক

ঐ ঐ —রাবণের দিগ্বিজয়

ঐ ঐ —গৌরীমিলন

ঐ ঐ —সাবিত্রী সত্যবান

ঘোষ, গিরিশচন্দ্র—গোপন চুম্বন

ঐ ঐ —দোল-লীলা

ঐ কেশবচন্দ্র—খণ্ড প্রলয়

চট্টোপাধ্যায়, বিহারীলাল—মেঘনাদবধ ব্যঙ্গকাব্য

দাসী, কুসুমকুমারী—কৈলাস কুসুম

ন্যায়রত্ন, রামগতি—কুপিত কৌশিক

বসু, কুঞ্জবিহারী—প্রভাত-কমল

মিত্র, অতুলকৃষ্ণ—পিশাচিনী বা যাতনা যন্ত্র

ঐ ঐ —কনক প্রতিমা

ঐ ঐ —বিজয়া বা প্রতিমা বিসর্জন

ঐ উপেন্দ্রচন্দ্র—জীবন-তারা

ঐ মদনমোহন—শারদ প্রতিমা

রায়, নন্দলাল—বিদেশিনী বিলাপ

ঐ রাজকৃষ্ণ—অনলে বিজলী

ঐ ঐ —দ্বাদশ-গোপাল

১৮৭৯

গঙ্গোপাধ্যায়, কেদারনাথ—সীতার বনবাস

ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ—কৈলাস-কুসুম

ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—অশ্রুমতী নাটক

তর্কচূড়ামণি, যোগেন্দ্রনাথ—কানন কথা

দেবী, স্বর্ণকুমারী—বসন্ত উৎসব

বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ—আমি তোমারই

বসু, দেবেন্দ্রবিজয়—প্রণয়োপহার

মিত্র, গোপালচন্দ্র—চন্দ্রকান্ত

ঐ প্রমথনাথ—প্রেম-পারিজাত বা মহাশ্বেতা

মুখোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র—কামিনী কুঞ্জ

ঐ ভোলানাথ—সীতার বনবাস

ঐ ঐ —নিকুঞ্জ কানন

রায়, রাজকৃষ্ণ—ভারত সান্ত্বনা

১৮৮০

কাব্যবিশারদ, কালীপ্রসন্ন—বিষাদ-প্রতিমা

গঙ্গোপাধ্যায়, কেদারনাথ—লক্ষ্মণ বর্জন

ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ—প্রমীলার পুরী বা নারী-দেশ

চট্টোপাধ্যায়, বিহারীলাল—আচাভুয়ার বোম্বাচাক

ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—মানময়ী নাটক

বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্রনাথ—মায়ামৃগ

বসু, কুঞ্জবিহারী—বসন্তলীলা

বাগ্‌চি, দেবকণ্ঠ—নাটকাভিনয়

বিদ্যাভূষণ, নকুলেশ্বর—অপূর্ব ভারত উদ্ধার

মিত্র, অতুলকৃষ্ণ—অপ্সর কানন বা রত্নবেদী

ঐ উপেন্দ্রচন্দ্র—পৃথ্বীরাজ

ঐ ঐ —জীবনতারা

ঐ দ্বারকানাথ—নলিনী বা দিল্লীপতন

ঐ প্রমথনাথ—শুম্ভসংহার

ঐ রাধানাথ—আগমনী

ঐ ঐ —উষাহরণ

ঐ ঐ —বিজয়া

রায়, রাজকৃষ্ণ—লৌহ কারাগার

ঐ ঐ —তারক-সংহার

১৮৮১

[illegible]রের, আলী—মোহিনী প্রেমপাশ

[illegible]বাবিশারদ, কালীপ্রসন্ন—অবতার

[illegible]াষ, গিরিশচন্দ্র—মায়াতরু

ঐ ঐ—মোহিনী প্রতিমা

ঐ ঐ—আনন্দ রেহো

ঐ ঐ—রাবণ বধ

ঐ ঐ—অভিমন্যুবধ

ঐ নগেন্দ্রনাথ—মণি-মন্দির

ঐ ঐ—পার্থ-প্রসাধন

[illegible]ট্টোপাধ্যায়, বিহারীলাল—অহল্যা-হরণ

[illegible]কুর, রবীন্দ্রনাথ—বাল্মীকি-প্রতিভা

ঐ ঐ—ভগ্নহৃদয়

ঐ ঐ—রুদ্রচণ্ড

ঐ শৌরীন্দ্রমোহন—রসাবিষ্কার-বৃন্দক

[illegible]সু, অমৃতলাল—তিলতর্পণ

ঐ কুঞ্জবিহারী—কাঞ্চন কুসুম

ঐ মনোমোহন—পার্থ পরাজয়

[illegible]জুমদার, সুরেন্দ্রনাথ—হামির

[illegible]ত্র, প্রমথনাথ—বীরকলঙ্ক

ঐ রাধানাথ—প্রণয়-পারিজাত

[illegible]োপাধ্যায়, চারুচন্দ্র—মল্লিক-মঙ্গল

ঐ—রত্নময়ী

[illegible]য়, রাজকৃষ্ণ—হরধনুর্ভঙ্গ

[illegible]ন্যাল, কালিদাস—বিদ্যাসুন্দর

১৮৮২

[illegible]াষ, গিরিশচন্দ্র—সীতার বনবাস

ঐ ঐ—লক্ষ্মণ বর্জন

ঐ ঐ—সীতাহরণ

ঐ ঐ—রামের বনবাস

ঐ ঐ—মলিন মালা

ঐ ঐ—ভোট মঙ্গল

ঐ নগেন্দ্রনাথ—বিমুক্ত বেণীবন্ধন

চট্টোপাধ্যায়, বিহারীলাল—রাবণ বধ

ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—স্বপ্নময়ী নাটক

ঐ রবীন্দ্রনাথ—কালমৃগয়া

বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ—হাতে হাতে ফল

বসু, অমৃতলাল—ব্রজলীলা

মিত্র, রাধানাথ—মায়াবতী

ঐ ঐ—মেঘেতে বিজলী

ঐ ঐ—কমলে কামিনী

ঐ ঐ—হরবিলাপ

রায়, রাজকৃষ্ণ—রামের বনবাস

সরকার, কিশোরীলাল—বেহুলা

১৮৮৩

খাঁ, মহেন্দ্রলাল—মথুরা-মিলন

ঘোষ, গিরিশচন্দ্র—ব্রজবিহার

বন্দ্যোপাধ্যায়, রামলাল—মানস-মোহিনী

বসু, অমৃতলাল—ডিসমিস

মুখোপাধ্যায় চারুচন্দ্র—শকুন্তি

ঐ ঐ—দোললীলা

ঐ প্রফুল্লচন্দ্র—অন্ধবিলাপ

সিংহ, গোপালচন্দ্র—অপূর্ব মিলন

হালদার, হরিশচন্দ্র—বেহুলা

১৮৮৪

ঘোষ, গিরিশচন্দ্র—হীরার ফুল

ঐ ঐ—বৃষকেতু

চট্টোপাধ্যায়, বিহারীলাল—দ্রৌপদীর স্বয়ংবর

ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—হঠাৎ নবাব

„ রবীন্দ্রনাথ—প্রকৃতির প্রতিশোধ

„ „—নলিনী

বসু, অমৃতলাল—বিবাহ-বিভ্রাট

„ „—চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে

„ কুঞ্জবিহারী—কৃষ্ণলীলা

„ „—শ্রীবৎসচিন্তা

মিত্র, রাধানাথ—শ্রীবৎসচিন্তা

রায়, রাজকৃষ্ণ—তরণীসেন বধ
„ „ —যদুবংশ ধ্বংস
„ „ —রাজা বিক্রমাদিত্য

১৮৮৫

চট্টোপাধ্যায়, বিহারীলাল—রাজসূয় যজ্ঞ
বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র—নাকে খৎ
বাগ্‌চি, দেবকণ্ঠ—অশ্রুলতা
মিত্র, অতুলকৃষ্ণ—ভীষ্মের শরশয্যা
„ „ —ধর্মবীর মহম্মদ
মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ—হরিশ্চন্দ্র
„ গোপালচন্দ্র—চন্দ্রকলা

১৮৮৬

গোস্বামী, জানকীনাথ—পাষাণে-কুসুম
ঘোষ, গিরিশচন্দ্র—চৈতন্য-লীলা
দত্ত, রাজকৃষ্ণ—চন্দ্রপ্রভা
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামপদ—কামিনী কুসুম
ভট্টাচার্য, রাখালদাস—স্বাধীন জেনানা
„ „ —সুরুচির ধ্বজা
মিত্র, ভুবনকৃষ্ণ—ধর্মপরীক্ষা
মুখোপাধ্যায়, ভুবনচন্দ্র—ঠাকুরপো
সান্যাল, ত্রৈলোক্যনাথ—যুগলমিলন

১৮৮৭

ঘোষ, গিরিশচন্দ্র—বেল্লিক বাজার
„ „ —বুদ্ধদেব চরিত
„ „ —নল-দময়ন্তী
চট্টোপাধ্যায়, বিহারীলাল—প্রভাস-মিলন
তর্কচূড়ামণি যোগেন্দ্রচন্দ্র—মহাপ্রস্থান
নাথ, মহেন্দ্রনাথ—কলির অবতার
ভট্টাচার্য, কুঞ্জবিহারী—অনঙ্গমঞ্জরী
ঐ রাখালদাস—অবলা ব্যারাক
ঐ ঐ —রুক্মিণী রঙ্গ
ঐ হরিভূষণ—কুমারসম্ভব
মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র—অপূর্ব মায়ামিলন

১৮৮৮

ঘোষ, গিরিশচন্দ্র—রূপ-সনাতন
ঐ ঐ —বিল্বমঙ্গল ঠাকুর
ঐ ঐ —পূর্ণচন্দ্র
ঐ দয়ালচন্দ্র—বিদ্যাসুন্দর
চট্টোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ—তণ্ডুলপতি দণ্ড
ঐ বিহারীলাল—সীতা-স্বয়ংবর
ঐ ঐ —নন্দ-বিদায়
ঐ ঐ —পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ
চৌধুরী, প্যারীমোহন—নবলীলা
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ—মায়ার খেলা
দাস, উপেন্দ্রনাথ—দাদা ও আমি
বন্দ্যোপাধ্যায়, কমলকৃষ্ণ—বিল্বমঙ্গল ঠাকুর
ঐ নবকৃষ্ণ—বিচিত্র বিচার
ঐ সুরেন্দ্রনাথ—বিজ্ঞানবাবু
মিত্র, অতুলকৃষ্ণ—নন্দবিদায়
ঐ ঐ —হিরণ্ময়ী
ঐ রাধানাথ—আশালতা
ঐ ঐ —নববাসর
রক্ষিত, হারাণচন্দ্র—শঙ্কর বিজয়
রায়, রাজকৃষ্ণ—কলির প্রহ্লাদ
ঐ ঐ —কাণা কড়ি
ঐ ঐ —চন্দ্রহাস
ঐ ঐ —হরিদাস ঠাকুর

১৮৮৯

ঘোষ, গিরিশচন্দ্র—দক্ষযজ্ঞ
ঐ ঐ —প্রফুল্ল
ঐ ঐ —বিবাদ
ঐ নগেন্দ্রনাথ—বারাণসী-বিলাস
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ—রাজা ও রাণী
বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ—টাইটেল বা ভিক্ষার ঝুলি
বসু, কুঞ্জবিহারী—শকুন্তলা
ঐ নগেন্দ্রনাথ—ধর্মবিজয় বা শঙ্করাচার্য

বসু, মনোমোহন—রাসলীলা নাটক
মিত্র, অতুলকৃষ্ণ—রাধা ও তুমি
ঐ ঐ —গোপী গোষ্ঠ বা রাধাকৃষ্ণের দিবামিলন
ঐ ঐ —বক্কেশ্বর
ঐ রাধানাথ—তারাতীর্থ
ঐ হেমচন্দ্র—নরসিংহ
মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ—চন্দ্রহংস
রায়, রাজকৃষ্ণ—মীরাবাঈ
ঐ ঐ —চমৎকার

১৮৯০

ঘোষ, গিরিশচন্দ্র—হারানিধি
চট্টোপাধ্যায়, হরিদাস—জগা
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ—বিসর্জন
বসু, অমৃতলাল—তাজ্জব ব্যাপার
ঐ বিপিনবিহারী—শ্রীবৃদ্ধি
ঐ ঐ —মাণিক জোড়
ঐ মনোমোহন—আনন্দময় নাটক
মিত্র, অতুলকৃষ্ণ—ভাগের মা গঙ্গা পায় না
রায়, রাজকৃষ্ণ—খোকাবাবু
ঐ ঐ —বেঙ্গুনে বাঙালী বিবি
ঐ ঐ —ডাক্তার বাবু
ঐ ঐ —সত্যমঙ্গল
ঐ ঐ —চতুরালী
ঐ ঐ —চন্দ্রাবলী
ঐ ঐ —টাট্‌কা-টোট্‌কা
ঐ ঐ —লোভেন্দ্র গবেন্দ্র
ঐ ঐ —জগা-পাগলা
ঐ ঐ —জুলু

১৮৯১

ঘোষ, গিরিশচন্দ্র—মলিনা-বিকাশ
ঐ ঐ —মহাপূজা
ঐ —কমলে কামিনী
দে, দুর্গাদাস—পয়জারে পাজী
পাঠক, অঘোরনাথ—লীলা
বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ—যোগেশ
বসু, অমৃতলাল—তরুবালা
ঐ —বিলাপ
ঐ ঐ —সম্মতি সঙ্কট (?)
ঐ ঐ —রাজা বাহাদুর
ঐ জানকীনাথ—বায় বাহার
মিত্র, অতুলকৃষ্ণ—নিত্যলীলা বা উদ্ধব সংবাদ
রায়, রাজকৃষ্ণ—রাজা বংশধ্বজ
ঐ ঐ —হীরে মালিনী
ঐ ঐ —প্রহ্লাদ চরিত্র
ঐ ঐ —লক্ষহীরা
ঐ ঐ —নরমেধ যজ্ঞ
ঐ ঐ —লয়লা মজনু

১৮৯২

চট্টোপাধ্যায়, বিহারীলাল—মোহশেল
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ—চিত্রাঙ্গদা
ঐ ঐ —গোড়ায় গলদ
দত্ত, হরিদাস—সরযূ-প্রয়াণ
দাস, জগৎচন্দ্র—মণিপুর
ঐ প্রমথনাথ—নদের চাঁদ
ঐ ঐ —পুজোর রোশনাই
ঐ সুন্দরীমোহন—মিউনিসিপ্যাল দর্পণ
দাসী, গিরীন্দ্রমোহিনী—সন্ন্যাসিনী বা মীরাবাঈ
দেবী, স্বর্ণকুমারী—বিবাহ উৎসব
বসু, কুঞ্জবিহারী—শ্রীরামনবমী
মিত্র, অতুলকৃষ্ণ—কলির হাট
রায়, রাজকৃষ্ণ—বনবীর
ঐ ঐ —বল্যাপুজা
সরকার, বিহারীলাল—ভরিবে বিবাহ

১৮৯৩

ঘোষ, গিরিশচন্দ্র—মুকুল মুঞ্জরা
ঐ ঐ —আবু হোসেন

দত্ত, অমরেন্দ্রনাথ—উষা
বন্দ্যোপাধ্যায়, কেদারনাথ—রত্নাকর
ঐ রামলাল—কমলা
বসু, অমৃতলাল—বিমাতা
ঐ ঐ —কালাপানি
ঐ কুঞ্জবিহারী—হ য ব র ল
ভট্টাচার্য, শরৎচন্দ্র—তাল্তিয়া ভীল
মিত্র, অতুলকৃষ্ণ—আমোদ-প্রমোদ
ঐ ঐ —বুড়ো বাঁদর
রায়, রাজকৃষ্ণ—বেনজীর-বদরে মুনীর

১৮৯৪

ঘোষ, গিরিশচন্দ্র—বড়দিনের বখশিস্
ঐ ঐ —জনা
ঐ ঐ —আলাদীন বা আশ্চর্য প্রদীপ
ঐ ঐ —স্বপ্নের ফল
ঐ ঐ —সভ্যতার পাণ্ডা
চট্টোপাধ্যায় বিহারীলাল—মুই হ্যাঁদু
ঐ ঐ —মিলন
ঐ ঐ —হরি অন্বেষণ
ঐ ঐ —যমের ভুল
দত্ত, অমরেন্দ্রনাথ—মানকুঞ্জ
বসু, অমৃতলাল—বাবু
ঐ বৈকুণ্ঠনাথ—মান
বিদ্যাবিনোদ, ক্ষীরোদপ্রসাদ—ফুলশয্যা
মণ্ডল, কেদারনাথ—বেহদ্দ বেহায়া
মিত্র, অতুলকৃষ্ণ—মা
ঐ মন্মথনাথ—রূপমাধুরী
রায়, গোবিন্দচন্দ্র—অভিজ্ঞান শকুন্তল

১৮৯৫

ঘোষ গিরিশচন্দ্র—করমেতি বাঈ
ঐ নগেন্দ্রনাথ—দানলীলা
বসু, অমৃতলাল—একাকার
রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল—সমাজবিভ্রাট বা কল্কি অবতার

১৮৯৬

ঘোষ, গিরিশচন্দ্র—ফণীর মণি
ঐ ঐ —পাঁচ কনে
ঐ ঐ —নসীরাম
ঐ ঐ —কালাপাহাড়
চট্টোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন—শ্রাবণী
চৌধুরী, নগেন্দ্রনাথ—হরিরাজ
ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—হিতে বিপরীত
দে, দুর্গাদাস—ছবি
বিদ্যাবিনোদ, ক্ষীরোদপ্রসাদ—প্রেমাঞ্জলি
মিত্র, চারুচন্দ্র—লীলা
ঐ সিদ্ধেশ্বর—লণ্ডভণ্ড
সরকার, যশোদানন্দন—অঙ্গুরীয় বিনিময়
সেন, মনোমোহন—বসন্ত

১৮৯৭

ঘোষ, গিরিশচন্দ্র—হীরক-জুবিলী
ঐ ঐ —পারস্য প্রসূন বা পারিসা
ঐ নগেন্দ্রনাথ—দানযজ্ঞ
চট্টোপাধ্যায়, বিহারীলাল—নব রাহা
ঐ ঐ —নরোত্তম ঠাকুর
ঐ হরিপদ—দাতা কর্ণ
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ—বৈকুণ্ঠের খাতা
দাস, প্রমথনাথ—আলিবাবা
ঐ ঐ —রাধাকুঞ্জ
দে, দুর্গাদাস—শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা
ঐ ঐ —জুবিলী-যজ্ঞ
বসু, অমৃতলাল—বৌমা
বিদ্যাবিনোদ, ক্ষীরোদপ্রসাদ—আলিবাবা
মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ—মলিন মুকুল
রায়, কামিনী—পৌরাণিকী
ঐ দ্বিজেন্দ্রলাল—বিরহ

১৮৯৮

ঘোষ, গিরিশচন্দ্র—মায়াবসান
দে, দুর্গাদাস—মিস্ বনোবিবি

দেব, চুনীলাল—ফটিক চাঁদ

বসু, অমৃতলাল—গ্রাম্যবিভ্রাট

বিদ্যাবিনোদ, ক্ষীরোদপ্রসাদ—প্রমোদ-রঞ্জন

বিদ্যার্ণব, শিবচন্দ্র—গণেশ

ভট্টাচার্য, হরকুমার—শঙ্করাচার্য

মিত্র, হেমচন্দ্র—পাণ্ডিদান

সেনগুপ্ত, সত্যচরণ—সাবিত্রী

১৮৯৯

ঘোষ, গিরিশচন্দ্র—দেলদার

চট্টোপাধ্যায়, হরিপদ—কালকেতু

ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—পুনর্বসন্ত

ঐ ঐ —অভিজ্ঞান-শকুন্তলা

দত্ত, অমরেন্দ্রনাথ—শ্রীকৃষ্ণ

দে, দুর্গাদাস—এক্কোর ! ‼ !!!

বিদ্যাবিনোদ, ক্ষীরোদপ্রসাদ—কুমারী

সরকার, নগেন্দ্রনাথ—মদালসা

১৯০০

আচার্য, চারুচন্দ্র—সভ্যতা-সঙ্কট

গঙ্গোপাধ্যায়, কেদারনাথ—রাঙ্গা বৌ

ঘোষ, গিরিশচন্দ্র—ম্যাকবেথ

ঘোষ, গিরিশচন্দ্র—পাণ্ডবগৌরব

—মণিহরণ

—নন্দদুলাল

ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—বসন্তলীলা

ঐ ঐ —ধ্যানভঙ্গ

ঐ ঐ —অলীক বাবু

ঐ ঐ —উত্তর চরিত

ঐ ঐ —রত্নাবলী

ঐ ঐ —মালতী-মাধব

দত্ত, রামচন্দ্র—লীলামৃত

বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র—আবুলকাশেম

বসু, অমৃতলাল—সাবাস আটাশ

ঐ ঐ —কৃপণের ধন

ঐ ঐ —আদর্শ বন্ধু

বিদ্যাবিনোদ, ক্ষীরোদপ্রসাদ—জুলিয়া

ঐ —বভ্রুবাহন

মুখোপাধ্যায়, দামোদর—শুকন্যা

রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল—পাষাণী

ঐ ঐ —ত্র্যহস্পর্শ

সরকার, শৈলেন্দ্রনাথ—রাম

সেন, নবীনচন্দ্র—শুভানমালা

পরিশিষ্ট—খ

"নীলদর্পণ" মানহানি মামলায় আদালতের রায়

JUDGEMENT

JAMES LONG,—After a careful and patient investigation of the charge preferred against you, the Jury returned a verdict of 'guilty' on both counts, and the Court having refused to arrest the Judgement on the motion of your learned counsel. it is now my painful duty to award the punishment called for by the verdict of the Jury. And after an anxious consideration of all the circumstances of the case, you have been convicted of the offence of wilfully and maliciously libelling the proprietors of the *Englishman* and *Hurkara* newspapers, and under the second count, of libelling, with the same intent, a class of persons designated as the Indigo planters of Lower Bengal I most earnestly, I may say most strongly and pointedly, called upon the Jury to uphold and vindicate, if necessary, by their verdict the right of free discussion, and to be careful, lest by their verdict the right of liberty of the press might be endangered. In summing up the case, over and over again I recognised and maintained the right of every man to instruct his fellow-subjects by every sincere and conscientious examination which may promote the public happiness; and I stated distinctly and emphatically the privilege possessed by every man, of pointing out those defects and corruptions which exist in all human institutions. The Jury pronounced a verdict which, I have the satisfaction of feeling, rests upon a constitutional basis and cannot be used hereafter against the liberty of the press. There is not a person who would have rejoiced more than myself if the Jury had returned a verdict of 'not guilty' on the ground that they believed you had acted conscientiously and for the interest of society in publishing this book. I grieve

to say that verdict could not have been given without those twelve gentlemen believing that you have been actuated by a feeling of animosity towards the Indigo planters in publishing and circulating such a gross and scandalous libel. Partly through your instrumentality nearly three hundred libels have been circulated, and according to the evidence of Mr. Jones who gave his evidence most properly, with the apparent sanction of the Bengal Secretariat, at the public expense. I am bound to say that such a proceeding is without parallel in the history of Government department in England; and as one of the Judges of the Supreme Court it is my duty to state, and I do so most sincerely, and that I trust such a transaction may never occur again in this country, as such a proceeding must necessarily undermine that feeling of respect and confidence which ought to exist on the part of the Government towards those who are placed in authority over them I did at the trial, as I now do, scrupulously abstain from expressing any opinion directly or indirectly, as regards the personal motives or feelings which actuated the officers of Government in sanctioning the circulation of this book. It is the safest plan in life always to assume that public men act from pure and just motives until the contrary is established; and it does not follow by any means that the officials, who allowed the paper to be circulated, acted in the slightest degree illegally. The pamphlet was sent forth unaccompanied by a single word of caution or explanation, and the Indigo planters of Lower Bengal have no means of tracing the extent of the injury inflicted upon them by the circulation of the libel; but is there not reason for apprehending that certain persons in England may have been induced to bring forward serious but groundless charges against the Indigo planters? It is quite impossible to realize fully the irreparable mischief you have occasioned by causing this libel to be circulated in England. There is one feature in the case I cannot pass over without

special notice. I mean the position you hold in society as a clergyman of the Church of England. I am certain the Bishop of Calcutta, of whom it may be said that he is respected and beloved by the entire Christian community, will deeply lament the circumstance of one of his clergy being convicted of libelling a large and influential body of gentlemen scattered over a portion of his extensive diocese; and I am well assured that the great body of the clergy, with few exceptions, will sympathize with their Diocesan on the present occasion. The fact of your being a clergyman is an aggravation of your offence; and when you state publicly in Court that the advance of Christianity is impeded by the irreligious conduct of many Europeans, I think such an expression of opinion on your part, when called upon to receive the sentence of this Court for libelling many of your countrymen, is rather out of place. And perhaps the great majority of the Europeans may think that your conduct has not done much to promote real practical Christianity. You of all men ought to have inculcated and stood forth as the teacher of that inestimable precept: "Do unto all men as you would they should do unto you." My duty is a distressing one but I must not shrink from the performance of it. The sentence of the Court is that you pay a fine of Rs. 1000 to our Sovereign Lady the Queen, and that you be imprisoned in the Common Jail for the period of one calendar month, and that you be further imprisoned until the fine is paid.

পরিশিষ্ট গ।

শব্দসূচী

প্রথম ভাগ

[প্রান্তলিখিত সংখ্যাগুলি পৃষ্ঠাসংখ্যার দ্যোতক]

দ্বিতীয় ভাগ

[প্রান্তলিখিত সংখ্যাগুলি পৃষ্ঠা সংখ্যার দ্যোতক]